ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার

এম এ, পি এইচ্ ডি, এফ সি এস্,

পি আর স্কলার, সম্পাদিত।

একাদশ বর্ষ

১৩২৮

প্রতিভা— ১১শ বর্ষ ১৩২৮ সন।

বর্ষ-সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

প্রতিভা

১১শ বর্ষ | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ | ১ম ও ২য় সংখ্যা

নববর্ষ।

কালচক্রের আর এক আবর্ত্তন শেষ হইল। ঢাকা সাহিত্যপরিষদের মুখপাত্র প্রতিভাও ভাল মন্দে তাহার আদর্শ পথে আর একবৎসর অগ্রসর হইল। যে উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধরিয়া প্রতিভা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল সংসার পণ্যবীথিকার লাভ ক্ষতি গণনা না করিয়া সাধারণের ক্ষণিক প্রীতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রতিভা নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া ধীর স্থির গতিতে তাহার গন্তব্য পথে চলিয়াছে—তাহার সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র, তাহার আদর্শ মহান কিন্তু এই আদর্শ পথে কতটুক অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। গতবৎসর ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ, মনস্তত্ব বিজ্ঞান ও দর্শনমূলক প্রবন্ধ প্রভৃতির আলোচনা যথাসাধ্য করিয়াছি কিন্তু প্রতিভার আদর্শোচিত কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। মানুষের চেষ্টা মাত্রেই অধিকার ও সেইটুকুই নিজস্ব ক্ষমতা, তাহাতে আমাদের ত্রুটী নাই। প্রতিভায় সাধারণ পাঠকগণের মনোরঞ্জনকারী ক্ষুদ্র গল্প বা তথাকথিত কবিতা প্রকাশিত হয় না। বরং যাহাতে পাঠকের চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়, পৃথিবীতে আপনার স্থান কোথায় বুঝিতে পারে, নিজেরা কি ছিলাম কি হইয়াছি এবং ভবিষ্যতে কি হইতে চলিয়াছি সে বিষয়ে দৃষ্টি আসে, আপনার বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার চেষ্টা আসে তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে—এবং প্রাণপণে করিবে।

'প্রতিভা' গত বৎসরের চেষ্টা ভগবানের পদে অর্পণ করিয়া নববর্ষে নবোদ্যমে আবার নূতন বৎসরকে বরণ করিয়া লইয়া আদর্শ পথে অগ্রসর হইতে যাইতেছে। যাঁহারা 'প্রতিভা'কে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন, প্রতিভা যেন এ বৎসর আরো ভালরূপ আপন কর্ত্তব্য করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারে। চেষ্টাই জীবনীশক্তির মূল এই চেষ্টা যেন জাগ্রত থাকে।

বহুকাল আমরা আত্মবিস্মৃত ছিলাম—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর" করিয়া ছুটিয়াছি। এখন আমাদের প্রাণ ঘরের দিকে ফিরিয়াছে, আমাদিগকে আর মাতৃ অন্বেষণে হিমালয়ের দুর্গম শিখরে ছুটিতে হয় না। মা আজ 'নিরাকারাপি সাকারা'—মৃণ্ময়ে চিন্ময়ীরূপে বাংলার জল বাংলার মাটী বাংলার বায়ুতে আমাদেরই জীর্ণকুটীরে আজ জাগ্রত। এই যে দেশ মাতৃকার পূজায় আমরা আজ উদ্বুদ্ধ সে দেশের ভাষা, তাহার সাহিত্য তাহার ইতিহাস তাহার বিজ্ঞান ইহার চর্চ্চার মত মাতৃপূজার এমন আর কি উৎকৃষ্ট উপকরণ আছে? আর সাহিত্য পরিষদের মত মায়ের পূজার এমন পবিত্র মন্দিরইবা কোথায়?

গতবৎসর সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন চলিয়াছে। কি রাজনীতিক্ষেত্রে কি সামাজিকক্ষেত্রে কি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায়, সর্ব্বত্র একটা তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে—যিনি এই বিশ্বব্যাপী আলোড়নের মূল কারণ, তিনি এই আন্দোলনকে সার্থক করিবেন। আমরা যেন আমাদের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এই সব ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞানবর্ত্তিকাটীকে জাগাইয়া রাখিতে পারি—বাংলা ভাষাকে যেন পূর্ণতার পথে অগ্রসর দেখিতে পারি—'প্রতিভার' সাহিত্য সাধনা যেন সার্থক হয়!

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

নববর্ষ।

১

বর্ষরূপী নমো নারায়ণ!
চির পুরাতন হয়ে, নূতনের বার্ত্তা লয়ে,
ধরা-বুকে রাখিলে চরণ!

২

পাখী আজি গাহে নব গান,—
নব স্পর্শ সমীরণে, নব হাসি পুষ্পাননে,
নব প্রভা করে রবি দান!

৩

নাহি জানি বিশ্বনাট্যশালে
হে বিচিত্র লীলাময়! হবে কিবা অভিনয়
হাসি-অশ্রু-রৌদ্র-ছায়া-জালে।

৪

আজ শুধু দাও প্রাণ ভরে
নব শক্তি, নব আশা, আত্মহারা ভালবাসা,
নব গীতি প্রবুদ্ধ অন্তরে।

৫

শান্তি-তৃপ্তি-আনন্দ-কল্যাণ
পীযূষ-ধারার সম, বর্ষ আজি অনুপম,
বর্ষরূপী তুমি ভগবান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গৃহস্থ হিন্দু মহিলার শিক্ষার আবশ্যকতা।

মানব জীবন স্থূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম শিক্ষা জীবন, দ্বিতীয় কর্ম্ম জীবন ও তৃতীয় ধর্ম্ম জীবন। যে মানব জীবনে এই তিনটী অবস্থার কোনও একটীর অভাব পরিলক্ষিত হয়, সে জীবন হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ দেহীর ন্যায় সভ্য জগতের চক্ষে বহুল পরিমাণে হেয় ও অকর্ম্মণ্য। শিক্ষা মানবের নেত্র স্থানীয়। দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ যে ব্যক্তি শিক্ষায় বঞ্চিত, সে জন্মান্ধ।

তাহার জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই অধিক শান্তিপ্রদ। অশিক্ষিত ব্যক্তি জীবনে কখনও সুখের মুখ দেখিতে পায় না। তাহার হৃদয় দুঃখের ঘোর দাবানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষা জীবন উদ্যানের মানস সরোবরে পূর্ণ বিকশিত মধু ঢল ঢল শতদল। কি পুরুষ কি নারী উভয়েরই শিক্ষায় তুল্য অধিকার। শিক্ষা প্রকৃতি দেবীর অযাচিত বর। এই অপার্থিব বর লাভ করিবার জন্য পুরুষ ও নারী সকলেরই কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কারণ মানব জীবন মৃত্তিকা পাষাণাদির ন্যায় গতি ও উন্নতিবিহীন নিতান্ত জড় পদার্থ নহে। ইহা বিরাট চৈতন্যের ব্যষ্টি অভিব্যক্তি। শিক্ষা সেই অভিব্যক্তির শক্তিশালী সহায়। প্রকৃত শিক্ষার সাহায্যেই মানবের কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন রূপ আত্ম স্বরূপ মনুষ্যত্ব প্রকটিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ত্রিবিধ। অর্থার্জ্জন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও আনন্দ সংবেদন। শিক্ষার এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যই পুরুষে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। পুরুষ সাধারণতঃ অর্থ লাভ, জ্ঞান লাভ ও পরিশেষে আনন্দ লাভের জন্য শিক্ষার অধীন হইয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রী জাতির শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন ও আনন্দ সংবেদন। দুঃসময়ে ও স্থল বিশেষে অল্লাধিক পরিমাণে স্ত্রী জাতির শিক্ষা অর্থকরী হওয়া উচিত হইলেও উহা সাধারণ স্ত্রী সমাজে আদর্শরূপে গ্রহনীয় নহে। বিবাহিত বা দাম্পত্য জীবনের নাম গৃহস্থ জীবন। দুইটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত বিভিন্ন মুখীন জীবনকে বিবাহ পবিত্র প্রীতির সূত্রে গাঁথিয়া একত্র সম্মিলিত করিয়া দেয়, অতএব গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূল প্রসূতি। নর নারীর কর্ম্ম ও ধর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত এই বিবাহ হইতে। হিন্দু জীবন জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর বিচিত্র কর্ম্মধারায় প্রবহমান। হিন্দু বুঝে ও মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস করে, মূলে কর্ম্মেই তাহার উৎপত্তি, কর্ম্মেই তাহার স্থিতি এবং পরিণামে কর্ম্মেই তাহার উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। এ সংসার বিধাতার বিরাট কর্ম্মশালা। এখানে মানবের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেই হইবে। এ কার্য্য করিবার শৃঙ্খলা ও সুকৌশল জানিবার উপায়ের নাম শিক্ষা। শিক্ষা শব্দের প্রকৃতিগত (শিক্ষ্ ধাতু ভাববাচ্যে অ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) অর্থ অভ্যাস বা অনুশীলন। নিরন্তর সাধনাদ্বারা এই শিক্ষাকে আত্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সংহত কর্ম্ম সমষ্টিই মানবের সংসার জীবন। এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইলে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক দূর. দৃষ্টি, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, স্বাস্থ্য শক্তি, ধনবল ও জনবলের নিতান্ত আবশ্যক। এই অমূল্য ও অপরিহার্য্য গুণগুলি আত্মসাৎ করিতে হইলে উহার একমাত্র উপায় শিক্ষা। কেবল ইঞ্জিনে বা কেবল চক্রে যেমন বাষ্পীয় শকট চলিতে পারে না। সেইরূপ কেবল পুরুষ বা কেবল নারীর দ্বারা বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ কর্ম্মশালা সুপরিচালিত হইতে পারে না। তাই জ্ঞান ও বুদ্ধির সম্মিলনের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগে এই বিরাট্ কর্ম্ম জগতের বিপুল কর্ম্মকাণ্ড নির্ব্বাহ হইতেছে। একটীর অভাব বা অঙ্গহীন হইলে অপরটী বিকল ও অচল হইয়া পড়ে। এজন্য পুরুষের ন্যায় নারীরও কর্ম্মনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, ও স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে ষোলআনা জ্ঞান থাকার আবশ্যক। অবশ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থকরী বিদ্যা লাভের প্রতি পুরুষের যতখানি জোর দেওয়া দরকার স্ত্রী জাতির ততটা জোরের আবশ্যক না হইলেও সময়ে সময়ে উহার কতকটা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কারণ কালের গতি সমান নহে। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। রাজাধিরাজমহিষী শৈব্যা, কুন্তী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদীকেও দুর্দ্দৈবের করাল কবলে পড়িয়া কিরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা হিন্দুর আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট অজ্ঞাত নহে। সুতরাং জীবনের সুখবসন্ত যৌবন সময়ে ঘোর দুর্দ্দিনের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করা বা সঞ্চয় করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া রাখা হিন্দু ললনার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে পুরুষের ন্যায় নারীরও অর্থকরী, জ্ঞানকরী ও আনন্দকরী বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন কতটুকু তাহা বিবেচনীয়। উদ্দেশ্যই কার্য্যের নিয়ামক। মানব উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সংসারে যাহার উদ্দেশ্য যত উচ্চ, উদার ও মহৎ; তাহার কর্ম্মক্ষেত্র তত উন্নত বিস্তৃত সার্ব্বভৌম ও জনহিতকর।

জীবমাত্রের উদ্দেশ্য সুখ ভোগ। নিম্নের জীবী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে আকিলাজীবী দেবদেবী পর্য্যন্ত সকলেই সমভাবে সুখের জন্য লালায়িত। নিকৃষ্ট শূকরের দল ভোজ লইয়া যেরূপ বিবাদমান হয়, ভোজন কালে যেরূপ হর্ষোল্লাসময় বিরাট চীৎকার করে; আধুনিক ভোগ সর্ব্বস্ব মানব সমাজেরও ঠিক সেই দশা। ইহাদের প্রভেদ কেবল ভোগ্যবস্তু লইয়া। পুরীষভোজী কীট ও অমৃতপায়ী দেব উভয়েই জীব। মলমূত্রলিপ্তাদি মলবাহকও মানুষ, হীরকখচিত গজদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসনাসীন ভূপতিও মানুষ। উভয়েরই দেহ রক্ত মাংসে গঠিত। জন্ম, সংস্কার, সমাজ, শিক্ষা ও দীক্ষা গুণে একজন আর একজন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। এটী কেবল সমাজ, সংসর্গ ও শিক্ষার সম্পর্কজাত অপরিহার্য্য ফল। একটী ধূলি মাটি সমাবৃত আকরস্থ লৌহ, অপরটি আকর হইতে উত্তোলিত, মার্জ্জিত, সুগঠিত ও শানিত অস্ত্র। একটী বনের অপরটী সমাজের মানুষ। শিক্ষা ও সংসর্গের গুণে একই বস্তু কিরূপ বিভিন্ন পর্য্যায়ে উন্নীত ও অধঃকৃত হয় উহা আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি। সূর্য্য চন্দ্র, দিবারাত্রি না থাকিলে সংসার যেমন অসার হইয়া উঠিত, পুরুষ ও নারী না থাকিলে জগতের অস্তিত্বও প্রায় তেমনি অসম্ভব হইত। এই জন্য লীলার কালীন্ ভগবান একাত্মা হইয়াও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। আর এ জন্যই আর্য্যশাস্ত্রকারগণ, "গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে"। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয় সহ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি ধর্ম্মতঃ"॥ মনু। "শরীরার্দ্ধং স্মৃতাজায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।" দায় ভাগ। "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা মুখ্যতমঃ সখা" মহাভারত। ইত্যাদি অসংখ্য প্রমাণে হিন্দু সমাজে নারীর আসন কত ঊর্দ্ধে সংস্থাপিত হওয়া উচিত, তাহা মুক্ত কণ্ঠে বিঘোষিত করিয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিদেশীর শাসনের অধীন হিন্দুসমাজ অধুনা বিকলাঙ্গ হইলেও আদিম হিন্দুসমাজ পতি ঋষিগণ তাঁহাদের শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রম জীবনের যে সরল সুন্দর ইতিহাস, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; উহাতে আমরা পবিত্র আর্য্য গার্হস্থ্যের ও প্রাচীন হিন্দু সমাজের অবিমিশ্র চিত্র দর্শনের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করি। পশু জীবনের ন্যায় কেবল ভোজন, ভ্রমণ, শয়ন, স্বপন ও ইন্দ্রিয় তর্পণ মানব জীবনের অদ্বিতীয় লক্ষ্য নহে। পশু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল কার্য্যের ফল সিদ্ধ হইয়াছিল। মঙ্গলময় বিধাতার সাম্রাজ্যে মানব সমাগমের পূর্ব্বে ও পরে এত অসংখ্য পশু সৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের অযথা সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য মানব নামক আর একটি অদ্ভুত পশু সৃষ্টির কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বস্তুতঃ তাঁহার মধুময়ী লীলাপুষ্টির জন্যই মানব জাতির সৃষ্টি। উপাসনার জন্য শিব গড়িতে বসিয়া অজ্ঞতাবশতঃ জীব বিশেষ গড়া নির্ম্মাতার জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে, উহা তাহার দুরদৃষ্ট ও কুশিক্ষার শোচনীয় পরিণাম। প্রাক্তন কর্ম্ম ফলে আমরা সকলেই কর্ম্ম করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছি। কর্ম্মদ্বারা সুখী হওয়াই মানব মাত্রের উদ্দেশ্য। সেই প্রাপ্য সুখ লাভের উপায় কর্ম্ম গাছের ফল নহে। উহার জন্য আমাদের অমিত পুরুষকারের প্রয়োজন। এই পুরুষকারের অপর মূর্ত্তি পরিশ্রমই কর্ম্ম সম্পাদনের মুখ্য উপায়। পুরুষের করণীয় কর্ম্ম সংখ্যাতীত। অল্প শক্তি পুরুষ একাকী এই গুরুতর কর্ম্মভার বহনে অবসন্ন ও অক্ষম বুঝিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, তাহার জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুখময় ভবনে ও দুঃখময় শ্মশানে, কর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে এমন কি পরলোকেও চির সঙ্গিনীরূপে ধর্ম্মপত্নীরূপিনী এই মহতী নারী জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবনের মহাতপস্যার সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে নারীই পুরুষের যোগ্যতম উত্তর সাধক। নারীর হৃদয় নবনীত কোমল উপাদানে গঠিত। মানব মাত্রেই সর্ব্বদা নিজ নিজ সুখের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। অন্যের সুখের ভাবনা তাহাদের হৃদয়ে কেশাগ্র মাত্র অবকাশ পায় না। এই দেবীরূপিনী হিন্দু কামিনী আজন্ম মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, প্রতিবেশী বালক বালিকা; বিবাহের পর পতি দেবতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভ্রাতৃশ্বশুর, দেবর প্রভৃতির সেবা শুশ্রূষা ও সুখের জন্য নিরন্তর অকাতরে আত্ম নিয়োগ করেন। হিন্দু নারী আত্মসুখ বঞ্চিত, আত্ম প্রতারিত এমন

কি আত্মমৃত হইয়াও সতত অপরকে সুখী করিবার জন্য ব্যাকুল, পরলোকে মৃতপতির সদ্গতির জন্য সাধ্বী হিন্দু স্ত্রীর অম্লান বদনে প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মাহুতি প্রদান সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের অতুলনীয় বিধান। পত্নীর জীবিত কালে পতির পরলোক গতি ঘটিলে, তাঁহাদের বিছিন্ন আত্মার দৃঢ় সংযোগ গ্রন্থি প্রেম, ভগ্ন মৃণালখণ্ড যুগলের সূত্রের ন্যায় ব্যবহিত যুগল আত্মাকে চির সম্মিলিত করিয়া রাখে। এই মিলন মৌখিক বা দৈহিক নহে। ইহা পরস্পরের নিগূঢ় আত্মিক সংযোগ। মানবের আত্মা যেমন অজর, অমর ও অক্ষয়, সাধু দম্পতির মিলনও তেমনি চির অচ্ছেদ্য ও নিত্য। হিন্দুর বিবাহ এই মহা মিলনের স্বতঃসিদ্ধ ঘটক। অন্যান্য দেশ ও সমাজের মত হিন্দু বিবাহ রূপজ মোহ জনিত বাহ্য দেহ সংসর্গ, কিংবা সামাজিক প্রথা মাত্র নহে। হিরণ্ময়ী প্রতিমার দৃঢ়তা ও মনোমোহিনী কান্তির ন্যায় হিন্দুর বিবাহ চিরস্থায়ী ও চির সুন্দর। হিন্দু রমনীর স্বভাব বাতাহত ও পদদলিত লতার মত অপমানকারীকেও বিনীত ও মৌন ভাবে তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় ফল পুষ্প প্রদান করা। সে দলিতা ফণিনীর মত প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্নত গ্রীবা হইয়া "ফোঁস" করিতে জানে না। বরং সীতা দেবীর ন্যায় সর্ব্বান্তঃকরণে বনবাস দাতা পতিদেবতার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় রত থাকে। নলিনী কুমুদিনীর ন্যায় হিন্দুরমণী ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি। সাধ্বী হিন্দুললনাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদে ভারত সমগ্র জগতের শিরোরত্নরূপে শোভা পাইয়াছিল। আবার ইহাঁদের বোধনে, জাগরণে ও শুভানুধ্যানে আমাদের জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির সূচনা হইবে। এই নারীরূপিনী সুপ্ত কুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার উদ্বোধিনী শিক্ষার সুব্যবস্থা করা একান্ত বিধেয়। দাম্পত্য বা কর্ম্ম জীবনের নামান্তর গৃহস্থ জীবন। নারী জীবনের অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা এই ভাগটী অতি বৃহৎ ও জটিল কর্ম্ম সঙ্কুল। এখানেই নারীজন্মের পূর্ণ সার্থকতা গৃহিণীপনার চরম বিকাশ। ভারতের কবিকেশরী কালিদাসের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ "নবযৌবনা নারীকুল এইরূপ সুশিক্ষিত, সংযত, ভোগ প্রলোভন সংস্পর্শ বর্জ্জিত জীবনের মধ্যদিয়াই নারীজীবনের উচ্চ লক্ষ্য গৃহিনী পদ লাভ করেন। যাঁহারা ইহার প্রতিকূলবর্ত্তিনী, তাহারা কুলকলঙ্কিনী।" শকুন্তলা, ৪র্থ। বাস্তবিক বালিকা যখন নবীন যৌবনা বধূ হইয়া পরের গৃহে আসিয়া বড় সোহাগিনী আদরিনী, গরবিনী ও পতিগৃহের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন, তখন সংসার তাহার পক্ষে বাসন্তী প্রকৃতি প্রফুল্ল শ্বাপদ সংকুল নিবিড় কাননের ন্যায় যুগপৎ রমনীয় ভীষণাকার ধারণ করে। নবীন যৌবন, রূপের ছটা, শ্বশুর শাশুড়ীর আদরের ঘটা, স্বামীর প্রাণভরা সোহাগ আর নিত্য নূতন বিলাস সামগ্রীর উপঢৌকন—এই সকল প্রবল প্রলোভনের টানে পড়িয়া প্রকৃতি চঞ্চল অবলা জীবন কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে তাহা মনস্বি মাত্রেই অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করেন। রূপবান্ বলিষ্ঠ ধনী যুবকের ন্যায় নবীনা গৃহকর্ত্রী যুবতীর এটী জীবন মরণের সন্ধি ক্ষণ। বুদ্ধি, বিবেচনা, দৃঢ়তা, ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে নারীকে এই সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই দুর্লভ গুণরাজির অভাবে কি নর কি নারী উভয়েরই দুরারোহ অধঃপতন অনিবার্য্য। মানবের সংসার পথের পুরোগামিনী পথ প্রদর্শিনী যখন নারী তখন ইঁহারা যাহাতে সুশিক্ষিতা ও চরিত্রবতী হন তদ্বিষয়ে সকলেই বোধহয় একমত। হিন্দুনারী গৃহিনীপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপর গুরুতর কর্ম্মের চাপ আসিয়া পড়ে। তাঁহাকে তখন গৃহস্থলীরূপ ক্ষুদ্র রাজ্যের ছোট বড় যাবতীয় ব্যাপারের খোঁসখবর রাখিতে হয়। মহামতি স্মাইল্‌স্ (Smiles) বলেন, "The regulation of home affairs depends for the most part upon woman. She is necessarily the manager of every family and household. How much, therefore, must depend upon her intellectual co-operation. Man's life revolves round woman. She is the moon of her little world, the home. The comfort of every house depends upon

her, upon her character, her temper and upon her power of systematic arrangement of household affairs." অর্থাৎ, গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের অধিকতরভাগ নারীর উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক গৃহস্থপরিবারের গৃহস্থলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহপক্ষে নারীই প্রকৃত অধিকারিণী। অতএব সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে নারীকুলের মনীষা ও সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক। নারী মানব জীবন চক্রের নাভি স্থানীয়। সে তাহার গৃহরূপ নাতিবৃহৎ সংসারের পূর্ণচন্দ্র। গৃহস্থের যাবতীয় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য নারীর চরিত্র, প্রকৃতি (মেজাজ) এবং গৃহস্থলী পরিচালনার সুব্যবস্থিত শৃঙ্খলার উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

শিক্ষা সম্বন্ধে সার জন উড্রফের অভিমত।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন এ দেশের অনেক গণ্য মান্য লোকের নিকট শিক্ষা সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি সার জন উড্রফের নিকটও এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি তদুত্তরে যে লিখিত মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অপরাপরের মন্তব্য সহ উক্ত কমিশনের রিপোর্টের পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। সে মন্তব্যের কিছু বিশেষত্ব থাকায় তাহা তৎকালে খবরের কাগজেও প্রকাশিত এবং আলোচিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই বলিয়া কমিশনের প্রশ্নসংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোচনা করিব না। ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ মত অবলম্বন করা উচিত আমি সেই মূল বিষয় সম্পর্কেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সাধারণ শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পৃথক্ করা যাইতে পারে না। ছাত্রের ভাল মন্দ পরিবারে বা স্কুলে বা কলেজে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ের আমূল আলোচনা করিতে হইলে ইহা হইতে রাজনীতি, ধর্ম্ম এবং সভ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নও বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। মূল কথা এই যে গভর্ণমেণ্টই এ দেশের লোকদিগের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; এবং গভর্ণমেণ্টই এ দেশের শিক্ষার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন (অধুনা সে কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে), কিন্তু কি জাতি, কি রীতিনীতি, কি চিন্তা, কি ধর্ম্ম, কি সাধারণ সভ্যতা,—সমস্ত বিষয়েই এই গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক। বলা হইয়া থাকে যে একজন ইংরেজ এবং একজন হিন্দুর ন্যায় দুটী বিসদৃশ প্রাণী আর এ জগতে নাই; এ কথা অসঙ্গত নহে। এই অবস্থা অস্বাভাবিক এবং এ দেশের প্রকৃত স্বার্থের ক্ষতিজনক। গভর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন তাহার মূলে সম্ভবতঃ স্বার্থ প্রণোদিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে;—আমি মনে করি বাস্তবিকই রহিয়াছে। কিন্তু যদি প্রধানতঃ ভারতবাসীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও এ বিষয়ে আলোচনা করা যায় তাহা হইলেও মতভেদ হওয়ার অবকাশ আছে। ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে মত গঠন এবং কার্য্যক্ষেত্রে সেই মত কার্য্যের প্রয়োগ, এই উভয় বিষয়েই মতভেদ হইতে পারে। ইউরোপীয় সভ্যতাই উৎকৃষ্ট, অনেকে ইহা প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে এদেশে উহা চালাইতে পারিলেই ভারতবাসীর উপকার হইবে। ইহারা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারক। মেকলের 'কাল ইংরেজ' এই প্রণালীর ফল। এ দেশে শিক্ষার ঝোঁক এই দিকেই রহিয়াছে। কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আমার বন্ধু মিঃ ই, বি, হাভেল ঠিকই বলিয়াছেন যে ইংরেজী শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া এবং উহার অভাব পূরণে তৎপর না হইয়া ঐ সভ্যতার সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। সার জর্জ্জ বার্ডউড্ বলিয়াছেন যে সাহিত্যাই

জাতির প্রাণ। ইংরেজী শিক্ষার ফলে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়াছে. তাহারা এক্ষণে আর তাহাদের জাতীয় শিল্পে আনন্দ পায় না; এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে তাহারা তাহাদের পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে; তাহাদের গৃহ এবং পিতামাতা গৃহিনী ভগিনী প্রভৃতি পরিজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা হইয়াছে। এবং যেখানেই এই ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছে সেখানেই দারুণ অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে।'

এই সব লিখিবার পর মান্দ্রাজের আইন পাঠার্থীদের সমক্ষে সে দিন সার সুব্রহ্মণ্য আর্য্য যে বক্তৃতা দিয়াছেন আমি তাহা পাঠ করি। তিনি বলিয়াছেন যে ইংরেজেরা যে ভারতের অভিভাবকত্ব করিতেছেন ভারতবাসীদিগকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ইংরেজদিগের এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করিলে প্রাচ্য ভারতবাসীদের জাতীয় জীবন এবং কর্ম্মপ্রেরণা তাহাদের স্বনির্দ্ধারিত পথে অভিব্যক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি ষ্টেটষ্ নামক কাগজ হইতে ইহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে ভারতবাসীদিগকে অর্দ্ধ ইংরেজের 'জাতে' পরিণত করাই যেন বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান হয়। আমি ইহার সহিত এইটুকু যোগ করিতে চাই যে এরূপ 'জাত' তৈয়ার হইলে তাহাদের চিন্তাশক্তি পঙ্গুতা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের কার্য্য করার শক্তি লুপ্ত হইবে।

কিন্তু কিছুই একেবারে মন্দ হইতে পারে না; এই জন্য আমি নিজে বিশ্বাস করি যে এই শিক্ষায় কিছু সুফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর বিচার করিলে বলিতে হয় যে এই শিক্ষা অনিষ্টই করিয়াছে; ইহাই আমার মত। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে কি আশা করা যাইতে পারে? কুশিক্ষা শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনয়ন করে এবং চরিত্রের দৃঢ়তা বিনাশ করে। ইহাতে স্থৈর্য্য নষ্ট হয় এবং ফলে কেহ ২ দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়, কাহারও ২ মনে তুমুল বিতর্কের উদ্ভব হয় এবং সেই কারণে তাহাদের কার্য্য করার শক্তি লুপ্ত হয়; এবং সাধারণ ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই অনুকরণপরায়ণ, পরামুগত ও যন্ত্রচালিত পুতুলের মত হইয়া উঠে। এই শিক্ষার প্রভাবে ছাত্রেরা জাতীয়তা বর্জ্জিত, জীবনীশক্তি শূন্য এবং কুগঠিত হয়।

জাতীয়তার উপর আক্রমণ ইদানীং বাড়িয়া যাইতেছে। জাতীয় শক্তি এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে বলিয়া এই শিক্ষা পূর্ণরূপে কুফল প্রসব করিতে পারে না।

আমার নিজের মত এই যে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করাই সঙ্গত; এদেশীয়দের হাতেই এ দেশের শিক্ষার ভার অর্পণ করা উচিত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি নিতান্তই শিক্ষার কর্ত্তৃত্ব না ছাড়েন তবে এখন ইহা যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। ভারতের জাতীয় বিশেষত্বের দৃঢ়তা স্থায়ীত্ব ও মূল্য স্বীকার করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভারতবাসীরা আজও বাঁচিয়া আছে। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন জাতিই এইরূপ ভাবে এবং এত অধিক পরিমাণে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠতর তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। ভারতবাসীদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই শিক্ষা ও সভ্যতাই যে তাহাদের জন্য উপযোগী তাহা মানিলেই যথেষ্ট। রাজনীতি বা ধর্ম্মের খাতিরে, প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ভাবে আমাদের (ইংরেজদের) বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ভারতবাসীদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতে আমাদের (ইংরেজদের) বিরত হওয়া উচিত। কারণ তৎসমস্তই তাহাদের নিকট বৈদেশিক। পাঠ্য নির্ব্বাচনে ভারতীয় ভাষা ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম্ম এবং সাধারণ সভ্যতা সম্পর্কিত পুস্তকেরই প্রথম আসন দিতে হইবে, ভারতীয় স্বদেশ হিতৈষীগণের এই যে দাবী ইহা আমাদের (ইংরেজদের) মানিয়া লওয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করা উচিত।

শিক্ষার (Education) অর্থ যদি বিকশিত করা (Educe) হয় তবে ভারতবাসীদের বংশপরম্পরাগত জাতীয়

বিশেষত্ব ভিন্ন শিক্ষা দ্বারা আর কি বিকশিত হইবে? এই [illegible] অবহেলা করিয়া অথবা চাপিয়া রাখিয়া বিদেশী [illegible] দ্বারা ভারতবাসীদের মন বোঝাই করাকে কি শিক্ষা বলা যাইতে পারে? এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে পাশ্চাত্য বা অন্য কোন প্রকারের জ্ঞান হইতে ভারতবাসীদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে। জ্ঞানের কোন বিশেষ নাই,—তাহা পূর্ব্বদেশ হইতে আসুক বা পশ্চিম দিক হইতেই আসুক। পাশ্চাত্য জ্ঞানের মধ্যে যাহা মূল্যবান তদ্দ্বারা যদি ভারতবাসীদের পুরুষপরম্পরাগত শিক্ষা ও সভ্যতা পরিপুষ্ট হয় তবেই যে ভারতবাসীগণ তাহাদের জাতীয়তা হারাইবে, এরূপ নহে। যাহাতে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার নিশ্চিত-রূপে অনুশীলন হয় এবং অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে অনুকূল ভাব অবলম্বিত হয় তদুদ্দেশ্যেই ইহা বলা হইল।

সাতদফা প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে যে অবস্থায় ছাত্রেরা বাস করে তদ্দ্বারা তাহাদের পরম্পরাগত পবিত্র নীতির ধ্বংস হয় কি না। আমি এই প্রশ্ন যদি ঠিকরূপে বুঝিয়া থাকি তবে আমার মনে হয় যে অবস্থা শব্দ দ্বারা ছাত্রেরা মেসে হোষ্টেলে যে ভাবে জীবন যাপন করে তৎসংশ্লিষ্ট কোন স্থূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্পর্কে একেবারে নির্লিপ্ত এবং অতীতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে ও একেবারে উদাসীন। চরিত্র নীতি (আমি এই কথাটী সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করিতেছি) যেখানেই নষ্ট হইয়াছে সেইখানেই মনে করিতে হইবে যে ধর্ম্ম সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের এই তথাকথিত নিরপেক্ষতা এবং পাশ্চাত্য প্রভাব এবং এই সমস্ত কারণ সমবায়ে যে অবস্থায় উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই উহার কারণ।

যে শিক্ষা প্রণালীতে বংশ পরম্পরাগত চারিত্রনীতি সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত হয় এবং যাহার ফলে উহা সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও নাস্তিকতার কবলগ্রস্থ হয় সে শিক্ষার দ্বারা এ দেশের লোকে বংশ পরম্পরাগত চারিত্রনীতি পরিলক্ষিত হইবে কিরূপে? ভারতীয় ছাত্রের জীবনীশক্তি যদি উপেক্ষিত বা দলিত হয় এবং তাহাদের মতি গতি যদি বিদেশী সরঞ্জাম দ্বারা সঙ্কুচিত হয় তবে সে জীবনে সাফল্য লাভ করিবে কিরূপে? ইহা সত্য যে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা ইংরেজশিক্ষক ইংরেজী প্রণালীতে যে ইংরেজী শিক্ষা দিতেছে তাহার কুফল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতেছে। কিন্তু এই কুফলের মূল ধ্বংস করিবার প্রয়োজন এখনও তিরোহিত হয় নাই।

উপরে যে মত পরিব্যক্ত হইল তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, একজন খাঁটি ভারতবাসী,—যাঁহার মতি গতি ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা বিকৃতি লাভ করে নাই,—তিনি যেরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, এবং তিনি যদি শিক্ষা ব্যবসায়ী হইতেন তবে তিনি যেরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতেন, সেরূপ শিক্ষা প্রণালীই এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। যে সকল ভারতবাসীরা যোগ্য এবং উন্নত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং যাহারা প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা জাতীয়তা বর্জ্জিত হয় নাই এরূপ শিক্ষা কেবল সেই সমস্ত ভারতবাসীই প্রদান করিতে পারে। যে সমস্ত ভারতীয় শিক্ষক ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা জাতীয়তা বর্জ্জিত হইয়াছে তাহারা ইংরেজ শিক্ষকদিগের অপেক্ষা কম যোগ্য হওয়াই সম্ভব; কারণ তাহারা ইংরেজ শিক্ষকদিগের নকল মাত্র। শিক্ষকের পদের জন্য অনুরোধ উপরোধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ষড়যন্ত্র কঠোর-ভাবে দমন করিতে হইবে। অতএব শিক্ষা বিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। এবং যে ২ পদে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের আবশ্যক, কেবল মাত্র সেই ২ পদ ভিন্ন অপর সমস্ত পদেই ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে। আর ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ বলিতে যে কেবল মাত্র ইংরেজ বিশেষজ্ঞই বুঝিতে হইবে তাহা নহে। পাঠ্য তালিকায় ভারতীয় শিক্ষক ও সভ্যতা এবং ভারতীয় ভাবেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বর্ত্তমান সময়ে শিল্পের স্থান নাই; উহার স্থান দিতে হইবে। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ; অতএব কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং কৃষি বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করা উচিত। তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন

স্থানে কৃষিবিদ্যার উপদেশ দিবে (ত্রয়োদশ প্রশ্ন)। এক্ষণে আইন শিক্ষার বড় বেশী উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। আমি সাধারণের অভিমত যতটা জানি তাহাতে মনে হয় যে কেহই আর আইন ব্যবসায়ীর বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহে। যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায়ই শিক্ষা দান করা আবশ্যক। বিদেশী ভাষায় নানা বিষয় শিক্ষা করিতে ছাত্রদের বড়ই কষ্ট হয়। শিক্ষাকে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব হইতে যতদূর সম্ভব মুক্তি দেওয়া আবশ্যক; এবং শিক্ষা বিভাগকে যথা সম্ভব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত। পঠন পাঠনে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ আমার মত এই যে ভারতের অতীত ইতিহাসে এবং বর্ত্তমান ও অতীত সভ্যতা যে ভারতীয় আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

কবি বিশ্বেশ্বর ধরের "শীত বসন্ত" কাব্য।

আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলি পুরাতন পুঁথি ছিল, উহার অল্পই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ সকল পুঁথির অধিকাংশই সংস্কৃত পুরাণ। দুইখান মাত্র বাঙ্গলা কাব্য পাইয়াছি। একখানা বিশ্বেশ্বর ধরের "শীত বসন্ত", আর একখানা বেজ দুর্গারামের "নৈষধ চরিত"। আজ আমরা "শীত বসন্তের" পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

কাব্যখান পাঠ করিয়া কবির নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। কোথায় কোন্ পল্লীর নিভৃত কুঞ্জ তাঁহার "শীত বসন্ত"গানে প্রথম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন কুলের নর নারীর হৃদয় তাঁর কবিত্বের প্রসংশায় স্ফীত হইয়া উঠিত, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। কবির "ধর" উপাধিতে মনে হয় সম্ভবতঃ তিনি কায়স্থ বা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কত দিনের লোক তাহাও জানা যায় না। আমাদের নিকট যে পুথিখান আছে তাহাতে গ্রন্থের মালিক ও লিপিকারের নাম, এবং গ্রন্থের প্রতিলিপি শেষ হওয়ার তারিখ পাওয়া যায়। প্রতিলিপিখানি প্রায় ৮১ বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

মূলগ্রন্থ শেষ হইয়া গেলে লিপিকার নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন:—"ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ৫ অগ্রাহণ রোজ মঙ্গলবার রাত্র দুই প্রহরের সময় শীত বসন্ত পুস্তক সমাপ্ত হইল এই পুস্তক শ্রীব্রজকিশোর রক্ষিত সাকিন আটী—লিখিত শ্রীরামকানাই দত্ত সাং রাজধারা ইতি—

এই রামকানাই দত্ত মহাশয় ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমায় রাজ খাড়ার কায়স্থ জমিদার চন্দ্রমুন্সী বংশীয় ছিলেন। ইঁহাদের এক শাখার "লস্কর" উপাধি ছিল, তাই রামকানাই দত্তকে সকলে "লস্কর মশায়" বলিত। ইনি ঢাকা সদর কেরাণীগঞ্জ থানার আটী নামক গ্রামের ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় ব্রজকিশোর রক্ষিতরায় মহাশয়ের এ অঞ্চলস্থ সম্পত্তির নায়েব ছিলেন। লস্কর মহাশয়ের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, হলুদমাখা তুলট কাগজের উপর মুক্তার মত ঝল্মল্ করিতেছে।

পুস্তক খানির পত্র সংখ্যা ২০, আর পৃষ্ঠার সংখ্যা ৩৯। ইহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ৯৭৭টি শ্লোক আছে। ত্রিপদীর কতকগুলি রীতিমত গীত হইত। এই সব গানে নিম্নলিখিত রাগিনী কয়টির ব্যবহার হইয়াছে,—"পঠমঞ্জরী", "মালসী" (মালশ্রী), "ধানসী" (ধানশ্রী), ও "গান্ধার"।

কাব্যটি নিম্নলিখিত ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে:—

"নমো গণেশায়—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয় মুদীরয়েৎ॥
প্রণমহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
স্থাবর জঙ্গম আদি যাহার সৃজন॥
ব্যাস আদি মুনিগণ করিয়া বন্দন।
পরম ভক্তিয়ে বন্দম গুরুর চরণ॥
ভারতি চরণ শিরে করিয়া বন্দন।
রচিল পাঁচালি এক কাব্য বিবরণ॥
কালিকা চরণ যুগ মনে করি সার।
কহে বিশ্বেশ্বর ধরে রচিয়া পয়ার॥

ইতি শীত বসন্ত পুস্তক লিক্ষতে।

লাচারি—

অবন্তি রাজ্যের পতি, সুরসেন মহামতি,
বীরসিংহ নৃপতি নন্দন।
সকল সম্পদ যুত, হবে (সবে ?) মাত্র নাহি সুত,
এহি দুঃখ ভাবে অনুক্ষণ॥

এতেক বিভোগ দেখি, কিছু মাত্র নহে সুখী,
তাপ মনে থাকে নিরন্তর।
পুত্রহীন সংসার, যেন সব অন্ধকার,
অনুক্ষণ ভাবে নৃপবর॥"

আমরা এখন কাব্যের গল্পভাগ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। শীত বসন্ত কাহিনী শৈশবে আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীর মুখে শুনিতে পাই, কিন্তু উহার আরম্ভ ভাগের কিছু কিছু আমার মনে আছে মাত্র, মাতৃদেবীও স্বর্গে, গতিকেই ঐ "পরণ কথার" সঙ্গে এই কাব্যলিখিত কাহিনীর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপ দেখাইতে পারিব না। শৈশবান্তে বাল্যে যখন স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন শ্রদ্ধেয় লালবিহারী দে মহাশয়ের "Folk Tales of Bengal" নামক গ্রন্থে একটি "শীত বসন্ত" কাহিনী দেখিতে পাই, এবং পরে আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের "ঠাকুরমার ঝুলি" নামক পুস্তকে পুনরায় "শীত বসন্তের" "প্রস্তাব" নয়ন গোচর হয়। অবশ্য আলোচ্য কাব্য এবং "Folk Tales of Bengal" ও "ঠাকুরমা'র ঝুলির" লিখিত কাহিনীর পার্থক্য অনায়াসেই দেখাইতে পারিব। এই সব "পরণ কথা" বা "রূপকথার" (উপকথা) একেকটি মূল কাহিনীই নানা আকারে নানা দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের কবি হয়ত নিজ দেশ প্রচলিত শীত বসন্ত কাহিনীটি ইচ্ছা মত ছাটিয়া কাটিয়া, বা উহাতে নূতন বর্ণ যোজনা করিয়া, বা নব নব ঘটনার সমাবেশ করিয়া তাঁহার কাব্যের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। একরূপও হইতে পারে যে কবির স্বকপোল কল্পিত শীত বসন্ত কাহিনীটিই "রূপকথা" আকারে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে আমরা প্রথমোক্ত অনুমানেরই অধিক পক্ষপাতী। কাহিনীটি এই :—

সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ অবন্তীরাজ্যে বীরসিংহনন্দন সুরসেন নামক এক নরপতি ছিলেন। সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও নৃপতি পুত্রহীন হওয়ায় নিতান্তই মনোকষ্টে কালযাপন করিতে ছিলেন। অবশেষে কষ্ট অসহ্য হওয়ায় "পাত্রের" উপরে রাজ্যভার দিয়া এবং "মহাদেবী"কে রাজপুরীতে রাখিয়া তপস্যার নিমিত্ত রাজা বনে চলিয়া গেলেন। পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় নৃপতির এমন কঠোর তপস্যা দর্শনে কৈলাসে শিবের আসন টলিল। তিনি স্বয়ং আসিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রার্থনানুযায়ী বর দিতে প্রস্তুত হইয়া,—

"হাসি বলে উমাপতি, কর রাজা অবগতি,
পুত্র তোমার হইবে নিশ্চয়।
× × × × × ×
জন্মিব যমক পুত্র, রূপে গুণে অদ্ভুত,
দুই পুত্র জন্মিবে তোমার॥"

বর দিয়া আশুতোষ "বৃষরথে ভর" করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া পাত্রমিত্র সকলকে তাঁহার তপ সাফল্যের কথা বলিয়া "অন্তপুরে" "মহাদেবীর" নিকট গেলেন। কিন্তু রাণী "হৃদয় বিষাদ মন দেখিয়া" রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র বর লাভ করিয়াও কেন তাঁহার মুখ এমন মলিন ? তখন—

"রাজা বোলে প্রাণপ্রিয়া শোনহ নিশ্চয়।
পুত্রবর দিলা হর হইয়া সদয়॥
হইব যমক পুত্র পাইয়াছি বর।
অশ্বিনীকুমার জিনি রূপ মনোহর॥
আর যে কহিলা শেষে দেব মহেশ্বর।
সে কথা কহিতে মোর দগ্ধ অন্তর॥
কহিলা নির্ঘাত কথা দেব ত্রিলোচন।
পুত্র দরশনে হইব তোমার মরণ॥
ই বলিয়া নৃপতি হইলা অচেতন।

মহাদেবী ধরিয়া তুলিলা ততক্ষণ ॥
দেবী বলে মহারাজা শোনহ বচন।
মহাজন হইয়া শোক ভাব কি কারণ ॥
নিবেদন করি আমি শোন মহাশয়।
এহাতে আনন্দ অতি আমার হৃদয় ॥
পতি পুত্র বিদ্যমানে যাহার মরণ।
তাহা সম ভাগ্যবতী নাহি ত্রিভুবন ॥"

এইরূপ নানা উপদেশ দিয়া রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এদিকে শিব কৈলাসে ফিরিয়া গিয়া পার্ব্বতীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে এই ঘটনা বলিলে উমার প্রশ্নে কহিলেন যে একদা "দেববৈশ্রবণ" রম্ভার সঙ্গে রহস্যালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে "চিত্ররথ চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব নন্দন" তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে, কুবের দেব তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া বলিলেন যে নরলোকে তাহাদের জন্ম হইবে। এই গন্ধর্ব্ব নন্দনদ্বয়ই অবন্তীরাজ শূরসেনের যমক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

যথা সময়ে রাণী লীলাবতী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। শিশু দুইটি দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দর।

"শরীরের তেজেতে প্রকাশ বসুমতী।
একেকালে শোভে যেন চন্দ্র দিনপতি ॥"

কিন্তু হায়—

"পুত্র দরশন মাত্র রাণী লীলাবতী।
শরীর ছাড়িয়া স্বর্গপুরে কৈলা গতি ॥"

হর্ষময় রাজভবন বিষাদান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মহারাজ শূরসেন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। রাজরাণীর মৃতদেহ দেখিয়া—

"ভূমিতে পড়িয়া কাঁদে রাজা শূরসেন।
চক্ষুধারা পড়িছে বরিষার ধারা যেন ॥"

তিনি শোকাকুল কণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন—

"ওঠ প্রিয়া লীলাবতী, কেন বা লুটাও ক্ষিতি,
কহ মোরে স্বরূপ বচন।
বর দিলা ত্রিলোচন, পুত্র হৈল অকারণ,
তুমি বিনে তাহার মরণ ॥
হেন গতি দেখি তোর, না সহে হৃদয় মোর,
প্রাণ রাখ দিয়া আলিঙ্গন।
যেন দুই পুত্রহীন, পাখা ছেদে পক্ষী ক্ষীণ,
জল বিনে পঙ্কজ যেমন ॥"

রাজাকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া পাত্রমিত্র পুরোহিত সকলে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রাজা কথঞ্চিত স্থির চিত্ত হইলে শিশু দুইটির পরিপালনের জন্য ধাত্রী নিয়োজিত করিলেন। যথা সময়ে শিশু দুইটির নামকরণ হইল। জ্যেষ্ঠের নাম হইল "শীত" আর কনিষ্ঠের "বসন্ত"। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয়ার চন্দ্র কলার ন্যায় তাহারা বাড়িতে লাগিল। তখন সর্ব্বপ্রকারের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে যথা সময়ে ধনুর্বিদ্যাদি সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইল। দেখিয়া মহারাজের আনন্দের সীমা নাই।

এদিকে পাত্রমিত্রগণ রাজাকে পুনরায় বিবাহ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তা'দের যুক্তি——পাটরাণী বিনে যজ্ঞাদি সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্মকার্য্য পণ্ড হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় স্বর্ণ সীতা নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছিল এই কথা বলা হইল। এই উপলক্ষে কবি রামায়ণের সমগ্র ঘটনা ২৪টি শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। মন্ত্রীদিগের এই "অকাট্য" যুক্তি বলে রাজা রীতিমত ঘটক পাঠাইয়া সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং পরে "কাম্বোজ দেশের রাজা সুদক্ষিণের" পরমা সুন্দরী কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন। রাজা নির্ব্বোধ ছিলেন না, তাই প্রধান মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া শীত বসন্তকে একটি পৃথক পুরীতে রাখিতে আদেশ দিলেন, এবং পুরজন নরনারী সকলকে বলা হইল,—শীত বসন্ত নামে যে রাজার পূর্ব্বপক্ষের দুই পুত্র আছে তাহা যেন কেহ নূতন রাণীর সমক্ষে প্রকাশ না করে। রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—

"সহজে নারীর বুদ্ধি জানহ বিশেষ।
সপত্নীর পুত্রভাবে করিবেক দ্বেষ ॥"

এই ভাবে দিন চলিয়া যাইতেছে। রাজরাণী ও রাজকুমারদ্বয় বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছেন। কুমারেরা একটি অপূর্ব শুকপক্ষী পালন করিতেন। দৈববসে একদিন সেই পাখীটি হাত হইতে উড়িয়া নূতন রাণীর প্রাসাদে যাইয়া এক "চম্পকের ডালে" বসিল; এদিকে কুমারদ্বয়ও ভক্ষ্য হস্তে তাহার পাছে পাছে ছুটিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ রাণীও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দর কুমার দুটিকে দেখিলেন এবং মজিলেন। রাণী তাহাদের নিকট অন্যায় প্রস্তাব করিতেই—

"শুনিয়া দেবীর কথা দুই সহোদর।
বিস্ময় হইয়া স্মরে রাম গদাধর॥"

রাজকুমারদ্বয় এই কুৎসিত প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া দ্রুতবেগে নিজ পুরীতে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাণী "বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী" হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এমন সময়ে রাজাও অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া রাণীকে এই ভাবে ধূলাবলুণ্ঠিতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের আদরিণীকে—

"ওঠ ওঠ সুবদনী মোর প্রাণেশ্বরী।
ই বলিয়া তুলে রাজা দুই হাতে ধরি॥"

তখন রাণী রাজাকে বলিলেন যে শীত বসন্ত নামক তাঁহার দুই পুত্র হঠাৎ তাহার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বিধি কৃপায় তাহার ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। এখন

"উচিত নিয়ম যদি না কর রাজন।
গলায় কাটারী দিয়া ত্যজিব জীবন॥"

রাজা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু সত্য মিথ্যা নিরূপণ করিতে না পারিয়া নীরবে বহিরুদ্যানে চলিয়া গেলেন।

শীত বসন্ত এদিকে শুকপক্ষীসহ নিজ প্রাসাদে উপস্থিত হইলে শুক বলিল "তোমরা অবিলম্বে এ দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাও; এখানে বিমাতা সর্ব্বদাই তোমাদের অনিষ্ট চিন্তা করিবে। এই উপলক্ষে পাখী বিমাতার চিরন্তন কুব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধ্রুবোপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণন করিল এবং তনুত্যাগ করিয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই আশ্চর্য্য ঘটনায় কুমার যুগল বিস্ময়াভিভূত হইলে সে বলিল যে সে ইতিপূর্ব্বে স্বর্গের একজন অপ্সর ছিল। একদা বিহার মানসে চিত্রকুট পর্ব্বতে যাইয়া এক বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়াছিল। দৈবক্রমে সেই বৃক্ষতলে এক মুনিতনয় তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি কাহার পদদ্বয় দোদোল্যমান রহিয়াছে ইহা দেখিতে দেখিতেই অপ্সরও ভয়ে তৎক্ষণাৎ শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিল; কিন্তু মুনিকুমার তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া পক্ষীরূপেই রাখিয়া দিলেন। আজ সেই ঋষির নির্দেশানুসারেই সে পুনরায় মুক্ত হইল। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। লোক মুখে শীত বসন্ত তাহাদের বিমাতা রাজার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে যে কুৎসিত অভিযোগ করিয়াছেন তাহা শুনিতে পাইলেন। অতএব দুই ভাই পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে সেই রজনীতেই রাজপুরী ত্যাগ করিয়া ঘোটক পৃষ্ঠে কত বন পর্ব্বত ভেদ করিয়া দূর দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে বুদ্ধিমান রাজা বহিরুদ্যানে চিন্তা করিয়া করিয়া কিছুতেই রাণীর এই অভিযোগ সত্য বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। ইহা বিমাতার দুরভিসন্ধিমূলক ভীষণ ষড়যন্ত্র বলিয়াই মনে করিলেন। পরদিন প্রভাতে খবর পাইলেন যে শীত বসন্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার কোনই সন্ধান নাই। রাজা তাঁহার বহু তপস্যার ফল মাতৃহীন কুমারদ্বয়ের শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে অতি করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাণী আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলে

"কুলটা কুশীলা তুই অনিষ্টকারিণী।
পাপ যুতা পাপাশয়া দুষ্ট দুর্ভাগিনী॥"

এইরূপ নানা দুর্ব্বাণী বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন রাণী লজ্জায়, মনোদুঃখে অন্তঃপুরে পলাইলেন।

এদিকে শীত বসন্ত ভ্রমণ করিতে করিতে "অহিসেন" রাজার "কাঞ্চন নগরে" উপস্থিত হইলেন। সে নগর অতি সমৃদ্ধ ও শোভা সুখপূর্ণ। তথায়—

"দেখিয়া মজিল চিত্ত রাজার কুমার ॥
দিব্য সরোবর সব সুবাসিত জল।
তাতে সুবাসিত ভাল বিকসিত কমল ॥
হংস চক্রবাক পক্ষী ভাসে নিরন্তর।
তীরে নীরে শোভা করে পরম সুন্দর ॥
শীতল পবন নানা স্থানে কুসুমিত।
ভ্রমরা ঝঙ্কারে সদা ভ্রমরী সহিত ॥
সরোবর তীরে উপস্থিত দুইজন।
পাইল পরম সুখ তুষ্ট হৈল মন ॥
স্নান করি জলপান করিল কুতুহলে।
বিশ্রাম করিতে দুই বইসে বৃক্ষতলে ॥
পথশ্রমে অত্যন্ত পাইয়া দুঃখ ভার।
নিদ্রায় পীড়িত হইল বসন্তকুমার ॥
মস্তক রাখিয়া অগ্রজের উরুভাগে।
শয়ন করিল শিশু নিদ্রা অনুরাগে ॥
বসন্ত দেখিয়া শীত পরম বিকল।
ভ্রাতৃ হেতু পড়ে তার নয়নের জল ॥
বিলাপ করিয়া বলে শোকাকুলি মতি।
মায়ের মরণে হইল অরণ্যে বসতি ॥
যে হউক সে হউক মোর তার নাহি ভয়।
ভাইয়ের কারণে মোর দগ্ধে হৃদয় ॥
এ মত বিলাপ শীত আছে সেই স্থান।
জল হইতে ওঠে কন্যা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥
কমল দক্ষিণ হস্তে বামেতে উৎপল।
কণ্ঠেতে মুকুতা মালা কর্ণেতে কুণ্ডল ॥
ঈষৎ কটাক্ষে কহে মধুর বচন।
হের আইস শোনসিরা রাজার নন্দন ॥"

শীত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সে বলিল যে সে "বরুণ বসতি" তে বাস করে, এবং তাহার নাম "মোহিনী," পুষ্প অন্বেষণ করিতে সে তথায় আসিয়াছে। মোহিনী আরও বলিল যে সে শীতের গন্ধর্ব্বনিন্দিত রূপে বিমোহিতা হইয়াছে, শীত তাহাকে পরিণয় বন্ধনে বন্ধন করুন। তাহা হইলে শীত তাহার সঙ্গে পরম সুখে "শচী-পতির" ন্যায় দেব লোকে বাস করিতে পারিবে। শীত কিন্তু প্রাণের ভাই বসন্তকে ত্যাগ করিয়া কিছুতেই তাহার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন প্রত্যাখ্যাতা ক্রুদ্ধা মোহিনী গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অভিসম্পাত দিল,—

"যে ভাই বসন্ত বিনে প্রিয় নাহি আর।
হইব তাহার সনে বিচ্ছেদ তোমার ॥
বিস্মর হইবা তারে পঞ্চম বৎসর।
নিশ্চয় কহিল শোন রাজার কোঙর ॥"
"এ বলিয়া জলে কন্যা প্রবেশে তখনে।
সুবর্ণের মৃগী যেন লুকাইল কাননে ॥"

সাপাকুলিত শীত অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে দ্রুতবেগে সন্ধ্যা আসিয়া পৃথিবী তিমিরাবরণে আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিল। শীত বসন্তকে অশ্বত্থের পাহাড়ায় রাখিয়া নিজে নগরে আশ্রয় অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। স্থান নির্ণয় হইলে বসন্তকে আসিয়া লইয়া যাইবেন। নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই তাঁহার দেবতুল্য রূপ দর্শনে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নরনারী বিস্মিত হইয়া গেল। মানুষের এমন রূপ তারা কখনও আর দেখে নাই। মুখে মুখে এই অপূর্ব্ব রূপবান কুমারের আগমন কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া শীতকে সভায় আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। শীতও দূতসঙ্গে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তখন—

"তারাগণ মধ্যে যেন চান্দ্রর উদিত।
শরীর কিরণে সভা কৈল প্রকাশিত ॥"

বৃদ্ধ রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শীত সমস্ত কথাই বলিলেন। কেবল বলিলেন না হতভাগ্য বসন্তের কথা, দেবতার অভিসম্পাত তখন হইতেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—শীত প্রাণের ভাইটিকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। অপুত্ররাজা শীতকে দেখিবা মাত্র স্নেহের বশীভূত হইয়াছিলেন, এখন তাহার পরিচয় পাইয়া তাহার নিকট নিজের একমাত্র লাবণ্য-লতাস্বরূপা সুনন্দা নাম্নী কন্যারত্ন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত

হইলেন। পুনশ্চ বিনা আপত্তিতে রাজকন্যার পাণিপীড়ন করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা কিছু দিনান্তর সস্ত্রীক ধর্ম্ম সাধন মানসে বনে চলিয়া গেলেন। শীত পরম সুখে রাজকন্যাকে বামে লইয়া শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। চোরের শাসনের উপর তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এদিকে—

"শীত যদি প্রবেশিল রাজার নগরী।
বসন্ত রহিল তথা ঘোড়া সঙ্গে করি॥
এহি মতে তিন রাত্রি হইল অবসান।
আসিব আসিব করি করে অনুমান॥
পদ্মের মৃণাল আর সরোবরের জল।
ভক্ষণ করিয়া মাত্র আছে সেহি স্থল॥
চতুর্থ দিবসে অস্তে গেল দিনমণি।
মুগচক্ষু অন্ধকার প্রথম রজনী॥"

ক্ষুধায় আরত প্রাণ রক্ষা পায় না! শীত যখন এ কয় দিনেও ফিরিলেন না, আর আশা কি? বসন্ত বড়ই ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে রজনী ঘনঘটাচ্ছন্ন, বসন্ত—

"পদ দুই চারি গিয়া ফিরি ফিরি আইসে।
মেঘ ঠাটা বিদ্যুৎছটা দেখিয়া তরাশে॥"

তখন উচ্চকণ্ঠে ভাইকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন,—

"আছে বা না আছে ভাই আমি মরি এথা।
কাহারে বলিব ভাই কে শুনিবে কথা॥
এত বলি কাঁদে শিশু ধরণী পড়িয়া।
বৃক্ষ হ'তে পত্র খসে করুণা শুনিয়া॥"

বিদ্যুৎ চমকে এবং বজ্রগর্জ্জনে ঘোড়া দুইটি অস্থির হইয়া বন্ধন ছিঁড়িয়া বেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে বসন্ত দুর্ব্বল দেহে ছুটিতে ছুটিতে পড়িতে পড়িতে পেছনে ধাইলেন। অদূরে রাজার অশ্বশালায় হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া বসন্তের অশ্ব-দুইটিও তথায় প্রবেশ করিল। বসন্ত তথায় প্রবেশ করা মাত্রই অশ্বশালার রক্ষকগণ তাঁহাকে অশ্বচোর বলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ঘটনাক্রমে সহর কোটাল সে সময়ে তথায় উপনীত হইলে তাহাকে চোর দেখাইয়া বলিল যে ঐ দুইটী ঘোড়া অন্যত্র হইতে চুরি করিয়া আনিয়া এখানকার অশ্ব চুরি করিবার মানসে এই শিশু'চোর এখানে উপস্থিত হইতেই তাহারা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। পরদিন প্রভাতে কোটাল তথা কথিত চোরের বিষয় রাজ-সমীপে নিবেদন করিলে তাহার কারাবাসের হুকুম হইল। পাশবদ্ধ নিরুপায় বসন্ত কারাগৃহে একমনে ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন এবং স্তবতুষ্টা মহাদেবী তাহার দারুন বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। বসন্তকুমার নিদ্রিত প্রহরীকুলের সম্মুখ দিয়া কারাগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, এবং এক সময় ব্রাহ্মণগৃহে আশ্রয় লইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে "অতিথি" পাইয়া—

"ব্রাহ্মণী সহিতে আতি ভক্তি কৈল অতি॥"

ব্রাহ্মণ গৃহে পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে তাহাকে আত্ম বৃত্তান্ত সমুদয় বলিলেন। ব্রাহ্মণও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বসন্ত অতঃপর কি করিবে, কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বসন্ত বলিলেন যে তিনি কোন পুণ্যবান, সুবিচারক রাজার রাজ্যে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন 'তুমি চন্দ্রকেতু নামক রাজার রাজ্যে যাও, তিনি বড়ই ধর্ম্মশীল রাজা।" তদনুসারে বসন্ত চন্দ্রকেতু রাজ্যে রওনা হইলেন, কিন্তু পথ না চিনিতে পারিয়া বহুদূরে এক গহন অরণ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে সূর্য্যাস্ত হইলে এক "সিংহসপা" (সিংসপা) বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া বসন্ত রজনী অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন, এখন "সেহ বৃক্ষে থাকে বিহঙ্গম পক্ষীবর।" পাখীগুলি প্রভাতে আহারান্বেষণে চলিয়া গিয়াছিল, এখন দিবাবসানে সকলেই ঐ গাছের উপরে আসিয়া বসিল, এবং নীচে একটী "অগ্নিশিখা সমতেজ পরম সুন্দর" মানব দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং "বৃদ্ধ পক্ষী স্থানে" সবিনয়ে ইহার কথা জিজ্ঞাসা করিল। "বৃদ্ধ বিহঙ্গম" ভূত ভবিষ্যত বলিতে পারিত অতএব সে রাজকুমার বসন্তের আদি অন্ত সকল খবরই

পক্ষীদিগকে বলিল। পক্ষাকুল কুমারের দুঃখে আকুলিত হইয়া তাহার উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে—

"পক্ষী বলে এহি বৃক্ষের পত্র যদি খায়।
বনচর ভয় তবে নাহি সর্ব্বদায়॥
বিশেষ এহার পুষ্প করিলে ভক্ষণ।
অগ্নি জলে মৃত্যু নাহি শুনহ কথন॥
ফল পুষ্প যদি এহার করয়ে ভোজন।
হাসিতে সুবর্ণ চাঁপা স্রবে অনুক্ষণ॥
পত্র পুষ্প ফল খাইলে রাজার তনয়।
হইব বহুল গুণ ঘুচিবে সংশয়॥"

রাজার ছেলে একাকী সেই চন্দ্রকেতু রাজার রাজ্যে চলিয়াছে, কিন্তু "সমুদ্র লঙ্ঘিয়া" তথায় যাইতে হয়, নৌকা বিনা যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাহারও উপায় বলা যাইতেছে। এই কাঞ্চন নগরে "মণিভদ্র" নামে এক অতি ধনবন্ত বণিক আছে, সে দিবা নৌকা আরোহণ করিয়া চন্দ্রকেতুর নগরে বাণিজ্য করিতে যাইতেছে. কুমার নদীর তীরে গেলেই তার সঙ্গে সাগর লঙ্ঘন করিয়া তার অভিষ্ট স্থানে অনায়াসে যাইতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া বসন্ত অবিলম্বে সেই গাছের পত্র পুষ্প ফল খাইয়া "অভীঃ" হইলেন, এবং রজনী প্রভাতে সমুদ্রতীরে যাইয়া সমুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাহাদের "আকাশ সমান হইয়া গভীর গর্জ্জন" শুনিলেন। তখন—

"তীরে বসি সিন্ধু মধ্যে নেহালে কুমারে।
নৌকার আকার দেখি চিনিতে না পারে?
হয় বা না হয় নৌকা করে অনুমান।
কিবা রাজ হংসগণ করিছে পয়ান॥
এমতে বসন্ত মনে ভাবিতে লাগিল।
আসিতে আসিতে নৌকা নিকটে আসিল॥"

সেই নৌকার মধ্যে লোকজন সহ মণিভদ্র সাধু বসিয়া আছে। বসন্ত তাহার নিকটে যাইয়া অতি বিনয়ের সহিত তাহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং ইহাও বলিলেন যে এই উপকারের বিনিময়ে প্রতিদিন সাধুকে তিনি একটি করিয়া সুবর্ণ চম্পক উপহার দিবেন। সাধু সানন্দে তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বসন্ত তাহাকে সকল কথা বলিলেন। সাধু তাহাকে নিজ সঙ্গে চন্দ্রকেতু নগরে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুতি দিয়া কহিল যে বসন্ত কুমার যেন তথায় সকলের নিকট সাধুর তনয় বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। সাধু পরম যত্নে তাহাকে লইয়া চলিল। এদিকে—

"হাসিতে সুবর্ণ চাঁপা প্রতিদিন ঝরে।
দেখিয়া সন্তোষ অতি সাধুর অন্তরে॥"

যথা সময়ে সাধুর তরণী সুসমৃদ্ধ চন্দ্রকেতু নগরে পঁহুছিল। সাধু তথায় বসন্তকে সঙ্গে লইয়া নগরের এক রম্যস্থলে বাসা করিয়া রহিল। তথাকার লোকে তাহাকে "নৃপতি সমান" সম্মান করিতে লাগিল।

রাজা চন্দ্রকেতুর প্রিয়ম্বদা নাম্নী একটি দুহিতা ছিল। সে "রূপেতে কমলা সম পণ্ডিত সারদা।" তাহাকে—

"যার যেই দিব্যরূপ আছে পৃথিবীত।
তাহা আনি বিধাতায় করিছে নির্ম্মিত॥"

অর্থাৎ—

"সর্ব্বোপমা দ্রব্য সমুচ্চয়েন।
× × × ×
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না॥"

প্রিয়ম্বদা একদিন সখীসঙ্গে একটি প্রস্ফুট কমল শোভী সরোবরে স্নান করিতে আসিলেন। ঘটনাক্রমে সরোবরস্থ কমল রাজির সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বসন্তকুমারও তথায় উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইলে উভয়ের প্রাণ বাঁধা পড়িল।

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে?"

বসন্ত এমন রূপ জীবনে কখনও দেখেন নাই, প্রিয়ম্বদাও তাই। সখীগণ অতি কষ্টে প্রিয়ম্বদাকে "অন্তপুরে" লইয়া গেল। রাজকন্যা বিরহজ্বরে যায়যায়। তখন মস্তকে ঘন

ঘন [illegible] দেওয়া হইতে লাগিল, কমলপত্রে তাহাকে [illegible] করা হইল, শীতল চন্দনে সর্ব্বগাত্রে প্রলেপ দেওয়া হইল, তাহার কেশগুচ্ছেরই অনুকারী চামরব্যজন চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সেই দারুণ বিরহজ্বালা প্রশমিত হইল না। দেহাভ্যন্তর তাপে. কমলপত্র শুকাইয়া উঠিল, [illegible] গুড়া হইয়া পড়িতে লাগিল, গলার ফুলের মাল "শুষ্ক" হইয়া গেল। সেই অজানিত পুরুষরত্নকে পাইবার জন্য প্রিয়ম্বদা অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, সখীগণ নানা বাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

বসন্তকুমারও প্রাণে প্রিয়ম্বদার অবস্থা নিয়াই বাস গৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে সখীগণ রাজকুমারীর অবস্থা মহারাণীকে জানাইল। রাণীও মহারাজকে সমস্ত নিবেদন করিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজ পাত্র মিত্র পুরোহিত সহ মন্ত্রনা করিয়া কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিতেই মনস্থ করিলেন, এবং তদনুসারে দেশে দেশে রাজকুমারদিগকে [illegible] প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। অবিলম্বে রাজপুরী তোরণ [illegible], বিচিত্র পতাকায়, পুষ্পমাল্যে, দীপ মালায় উৎসব বেশ ধারণ করিল। এদিকে দেশবিদেশের রাজকুমারগণের আগমনে নগরী কোলাহলময় হইয়া উঠিল। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত জানবাহন, লোকজন, সৈন্য সামন্ত। দেখিতে দেখিতে স্বয়ম্বরের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। রাজনন্দনগণ বিচিত্র বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সেই পরমরমনীয় [illegible] স্বয়ম্বর-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যার যার নির্দ্দিষ্ট [illegible] উপবেশন করিলেন। বসন্তও রম্যবেশে স্বয়ম্বর দর্শন মানসে সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে বিবাহ বেশে সজ্জিতা দিব্যাভরণ ভূষিতা রাজকন্যা প্রিয়ম্বদা মনে মনে ভক্তিভরে শিবের আরাধনা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ মানসে প্রার্থনা করিলেন,—

"যে পুরুষ দেখি মোর স্থির নহে মতি।
এই বর দেও মোরে সেহি হউক পতি॥
ই বলিয়া প্রিয়ম্বদা * * * *।
সখিসঙ্গে সভা মধ্যে করিল প্রবেশ॥
প্রিয় সখি হাত ধরি নৃপতির বালা।
ধরিছে দক্ষিণ হস্তে চম্পকের মালা॥
ধীরে ধীরে চলে কন্যা রাজ হংস গতি।
শরীর কিরণে সভা দীপ্তি করে অতি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ যত রাজগণ।
অনিমিখ আঁখি সবে করে নিরীক্ষণ॥
যে খানে প্রথম দৃষ্টি পড়িল যাহার।
না চলিল অন্যস্থানে নয়ন তাহার॥"

কন্যা যখন চলিতে চলিতে সভা মধ্যে নতশিরে মালাহস্তে দণ্ডায়মানা হইলেন,

"হেন কালে দেব দূতে থাকিয়া গগনে
উচ্চস্বরে ডাকি বলে শোনে সর্ব্বজনে॥
হাসিতে যাহার মুখে স্বুবর্ণ চম্পক।
অবিরত স্রবে সেহি মনুষ্য তিলক॥
এহি রাজ কন্যা সে করিব পরিণয়।
অন্যথা নাহিক হবে জানিবা নিশ্চয়॥

দৈববাণী শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না দেখিয়া রাজগণ বড়ই বিমর্ষ হইলেন। হায়, এমন কামিনীরত্ন কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। ধিক, বৃথাই জীবন। রাজা চন্দ্রকেতু ও কন্যা চিরদিনই অনূঢ়া থাকিবে এই আশঙ্কায় বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন, কারণ মানুষের মুখ হইতে সোনার চাঁপাফুল পড়ে এমন অস্বাভাবিক কথা কে কবে শুনিয়াছে? এদিকে কন্যাপাণিপ্রার্থী কুমারগণের বিলাপ শুনিয়া এবং তাহাদের শোচনীয় অবস্থা—

"দেখিয়া হাসিল তবে কুমার বসন্ত॥
অন্তরে কৌতুক হইয়া বহিলেক হাসি।
সভা মধ্যে স্বুবর্ণ পুষ্প পড়ে রাশি রাশি।"

দেখিয়া সভাশুদ্ধ লোক আরও বিস্মিত হইল, এবং বলিতে লাগিল এ নিশ্চয়ই কোন "দেবের তনয়।"

তখন

"প্রিয়ম্বদা এক দৃষ্টে বর নিরীক্ষয়।
যে পুরুষ সরোবরে দেখিল নিশ্চয়॥

সেহি বর মোরে আনি মিলাইল বিধি।
যে আছিল দুঃখ মোর হাতে আইল নিধি ॥
এ বলিয়া নৃপসুতা মনে অনুমানি।
বসন্তের গলে পুষ্প মালা দিল আনি ॥
প্রণমি করিয়া বামে বসিল যুবতী।
অধিক হইল শোভা মদনের রতি ॥"

আর অমনি

"গগনে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥"

তখন রাজা চন্দ্রকেতু বসন্তের সঙ্গে কুমারী প্রিয়ম্বদার যথাশাস্ত্র বিবাহ দিলেন। জয় হুলাহুলিতে রাজপুরী পূর্ণ হইয়া গেল।

রাজা চন্দ্রকেতু কিন্তু বসন্তের কুলশীল না জানিয়াই মাত্র দৈববাণীর উপরে নির্ভর করিয়া তাহাকে কন্যা সমর্পণ করিলেন। পরদিন বসন্তের বিবাহ সংবাদ শুনিয়া মণিভদ্র সাধু রাজসমীপে আসিয়া নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন যে বসন্ত তাহারই পুত্র। রাজা তাঁহার কন্যা হীন কুলে পড়ে নাই দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। এদিকে বসন্ত প্রিয়ম্বদা পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে বসন্ত রাজকন্যাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। রাজকন্যাও রাজপুত্রের হাতে পড়িয়াছেন জানিয়া পরম সুখী হইলেন। বসন্ত কিন্তু রাজকুমারীকে একথা গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিটি বৎসর কাটিয়া গেল। সাধু মণিভদ্র বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভবান হইলে, এবং রাজসমীপে যাইয়া পুত্র পুত্রবধুসহ নিজ দেশে যাইবার প্রস্তাব করিলে, রাজা বিমর্ষ চিত্তে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন। রাজপুরী কন্যা জামাতার আসন্ন বিরহাশঙ্কায় বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। রাণী সরোদনে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"মোর ঘর শূন্য করি, যাইবা পরের পুরী
কে করিবে তোমারে পালন।
ক্ষুধা হইলে আগো ঝি, কে দিব খাইতে কি
অভাগীরে করিবা স্মরণ ॥"

রাজা মহারাণীর ইচ্ছানুযায়ী ধন রত্ন দাস দাসী সঙ্গে দিয়া কন্যাকে যাত্রা করাইলেন। সাধু কিন্তু ধন রত্ন সমস্তই গ্রহণ করিল, দাস দাসী একজনও নিল না। বলিল তার এসব বিস্তর আছে। ক্রমে যথাসময়ে সজ্জিত তরণী রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রসাদ পবনে নীল সাগরজলে ভাসিয়া চলে। রাজা চন্দ্রকেতু যতদূর চক্ষু যায় সেই প্রাণ সমা কন্যা-বাহী তরণীখানি দেখিতে দেখিতে আর না দেখিয়া বিষাদাচ্ছন্ন বদনে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

নৌকা বহুদূরে আসিলে পর একদিন দুরভিসন্ধি পূর্ণ মণিভদ্র আপনার মনোভিলাস সাধন করিতে তৎপর হইল। সে মনে মনে বহুদিন হইতেই রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। আজ স্থির করিল যে বসন্তকে মারিয়া কন্যাকে নিজে গ্রহণ করিবে। যেই সঙ্কল্প সেই কাজ। মাঝি মাল্লাদিগকে বলিল "অবিলম্বে বসন্তকে ধরিয়া অকূল জলে ফেলিয়া দাও।" তাহারা অসতর্ক সুখাসীন বসন্তকে বলপূর্ব্বক হাতে পায়ে ধরিয়া সাগর জলে ফেলিয়া দিল। হায় বসন্তের—

"পারা পরশী নাহি নাহি বাপ ভাই।
ডাকিলে শুনিব হেন আর কেহ নাই ॥
আকাশ সমান ঢেউ দেখি লাগে ভয়।
ঠেলা মারি ফেলে তাথে রাজার তনয় ॥
দেখিতে দেখিতে সোতে নিল বহুদূর।
জন্মিল সাধুর মনে হরিষ প্রচুর ॥

বসন্ত ভগবতীর নাম হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে ঔষধের গুণে বিনা কষ্টে ভাসিতে ভাসিতে সত্বরই নিরুদ্দেশ হইলেন।

এদিকে প্রাণপ্রিয়তম স্বামীর এই দশা দেখিয়া প্রিয়ম্বদা—

"আপনে পড়িতে চাহে জলের ভিতর।
ধরিয়া রাখিল আসি দুষ্ট সদাগর ॥
পড়য়ে সাগর মধ্যে প্রভু প্রভু করি।
রাবণে রাখিল যেন জানকী সুন্দরী ॥"

তৎপরে নর পিশাচ নানা ভাবে কন্যার মন পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বুদ্ধিমতী বিদুষী কন্যা দেখিলেন যে কৌশল অবলম্বন না করিলে এ রাক্ষসের হস্তে নিস্তার নাই। তিনি তাহাকে বলিলেন আমার সম্বৎসর পর্য্যন্ত একটী ব্রত আছে, এবং বিশেষতঃ স্বামীর মৃত্যুতে আমি অশৌচগ্রস্তা এ অবস্থায় তুমি এক বৎসর অপেক্ষা কর, বৎসরান্তে আমি তোমার হইব। আর তুমি যদি আমার সঙ্গে এইরূপ আচরণ না কর তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব। মণিভদ্র বাধ্য হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত নিয়ম পালনে স্বীকৃত হইল, এবং বলিল দেশে গিয়া রাজ কন্যাকে সে ভিন্ন পুরিতে পরম যত্নে রাখিবে।

অনুকূল পবনে অল্প সময়েই নৌকা কাঞ্চন নগরে পঁহুছিল। সকলে সাধুর ভাগ্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সে প্রচুর লাভ করিয়া অগণিত ধনরত্ন ত আনিয়াছেই, তার উপর পরম রূপবতী রাজকন্যা বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। এমন যোরকপাল কার? কন্যাকে অতি যত্নে ও আদরে ভিন্ন পুরীতে রাখা হইল।

"এহি মতে আছে কন্যা দুষ্ট সাধু ঘরে।
অন্তরে দারুণ শোক প্রকাশ না করে॥
রাজার কুমার যদি থাকে জীবমান।
অবশ্য হইব দেখা না হইব আন॥
বৎসরের মধ্যে যদি নহে দরশন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন॥
এমত ভাবিয়া মনে রহিল সুন্দরী।
রাজপুত্র বসন্তের রূপ ধ্যান করি॥"

এদিকে বসন্ত দিবা রাত্রি বিরাম নাই বিশ্রাম নাই কেবলই সমুদ্র প্রবাহে অকূলে ভাসিয়া চলিলেন। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ আর নিম্নে অপার নীল নীর। কেবল মহৌষধির গুণেই তাহার জীবনটী বাঁচিয়া আছে মাত্র। এক দিন হঠাৎ সাগরের স্রোতবেগ কিছু বাড়িয়া গেল, এবং বসন্তও সেই বর্দ্ধিত স্রোতে ঘটনাক্রমে কাঞ্চননগরী তীরে এক ফুলবাগানে আসিয়া ঠেকিলেন। এবং তথায় উঠিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অরুণোদয় হইল, এমন সময় রাজার মেলেনী সুবেশা ডালি হাতে ফুল তুলিতে আসিল এবং বসন্তের বাগান আলোকরা রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইল। মেলেনী আরও দেখিল যে তাহার পুষ্পবনে ইহার আগমনে অকাল বসন্তোদয় হইয়াছে; প্রতি তরুর ডালে ডালে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, মধুর গন্ধে শীতল বাতাস ভুরভুর করিতেছে, ভ্রমরকুল ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল হইয়া অবিরত গুঞ্জন করিতেছে, কোকিল সুমধুর কুহুধ্বনিতে কুঞ্জকানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। বসন্ত মেলেনীকে সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন যে সে যদি তাহাকে তাহার "আশ্রমে" থাকিতে দেয় তাহাহইলে সে মেলেনী মাসিকে প্রতিদিন একটী করিয়া সুবর্ণ চম্পক উপহার দিবে। এ প্রস্তাবে মেলেনী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহাকে লইয়া গৃহে গেল। বসন্তও তথায় মেলেনীর বহিনপো পরিচয়ে পরম সুখে রহিলেন।

একদিন বসন্ত মেলেনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কাহার মালা যোগায়? মেলেনী বলিল যে এই নগরীর অধিপতি মহারাজ শীতের পাটরাণী মহাদেবী "সুনন্দার" ফুল যোগানই তাহার প্রধান কর্ম্ম। ক্রমে শীতের সমস্ত পরিচয় দিয়া সে বলিল যে রাজা শীত বসন্তেরই মত অপূর্ব্ব দর্শন, এমন কি যেন তাহারা দুইটি সহোদর ভাই! ইহা শুনিয়া শীত বড়ই হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে মেলেনী বলিল যে সে রাণীকে ফুলমালা যোগাইয়া তৎপর সাধু মণিভদ্রের নব পরিনীতা স্ত্রীকে মালা যোগায়। মণিভদ্র সম্প্রতি বাণিজ্যে গিয়া চন্দ্রকেতু রাজার কন্যা প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে কিন্তু সেই রাজকন্যা এক বৎসর ব্রতধারিণী হইয়া আছেন বলিয়া তাহাকে পৃথক পুরিতে পরম যত্নে রাখিয়াছে। সেই কন্যা একবৎসর পুরুষ সাক্ষাৎকার করিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া বসন্ত যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখে অভিভূত হইলেন, কিন্তু মেলেনীকে কিছুই জানিতে দিলেন না।

একদিন মেলেনী রাজকন্যা প্রিয়ম্বদার মালা যোগাইতে যাইবে শুনিয়া বসন্ত তাহাকে গৃহকার্য্য করিবার পরামর্শ দিয়া নিজে এক অপূর্ব্ব মাল্য রচনা করিলেন, এবং ঐ মাল্যের মধ্যস্থলে অন্যান্য পুষ্পের সঙ্গে বিচিত্র কৌশলে একটি সুবর্ণ চম্পক বসাইয়া দিলেন, মেলেনী যথাসময়ে কন্যার নিকট

উপস্থিত হইয়া এই পরম রমনীয় মালাটি দিতেই তিনি ইহার অপূর্ব্ব গঠন-সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণ চম্পক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং মেলেনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোথায় এ সোনার চাঁপা ফুল পাইয়াছে? মেলেনী তাহার নবাগত বোনপোর কথা বলিলে, রাজকন্যা প্রিয়ম্বদা অতি কৌতুহলী হইয়া তাহার বিষয় খুটিনাটি করিয়া সকল জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং বলিলেন সে যেন রোজ এমনই সোনার চাঁপা আনিয়া তাহাকে দেয়, তাহা হইলে তিনি প্রচুর ধন দিবেন। মেলেনী ফিরিয়া আসিয়া কুমারকে সকল কথা বলিলে বসন্ত মনের আনন্দে হাসিতে লাগিলেন আর অজস্র সোনার চাঁপা পড়িতে লাগিল। তিনি মেলেনীকে বলিলেন "তুমি এখনই যাইয়া রাজকন্যাকে এই ফুল উপহার দিয়া বল যে আমি সাগর জলে ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছি, এখন দুঃখের অবসান হইল, আর তাহার চিন্তা নাই।" মেলেনী রাজকন্যার নিকট যাইয়া উপহার দিয়া ঐরূপ বলিলে

"মাইলানীরে আলিঙ্গন দিয়া শশিমুখী।
মাইলানীরে বলে কন্যা তুমি মোর সখী॥
সুবেশা মাইলানীর গলে দুই হস্তে ধরি।
করুণা করিয়া কান্দে রাজার কুমারী॥"

তখন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রাজকন্যা পুনরায় বলিলেন—

"এহি সাধু পাপাশয়, ধর্ম্ম শাস্ত্রে নাহি ভয়,
পুত্র বলি রাজার কুমার।
গহিন সাগর জলে, ধরিয়া ফেলাইল বলে,
নয়ানে দেখিল আপনার॥
সেহি হইতে প্রাণ ফাটে, চমকি চমকি ওঠে,
চারি দিকে অন্ধকার দেখি।
দারুণ সাধুর ডরে, অন্তরে আকুল করে
সতত কাতর হইয়া থাকি॥
নাহি বন্ধু, বাপ, ভাই, কহিব কাহার ঠাঁই,
কে করিব দুঃখ নিবারণ।
নিরবধি তনু মোর, অন্তরেতে জর জর,
প্রকাশিতে নাহি বন্ধুজন॥
তনু-মাত্র এথা আছে, প্রাণ কুমারের কাছে,
দেখ মোর মনুষ্য আকার।
যেন পাকাইয়া দড়ি, রাখিছে অনলে পুড়ি,
তেন মত শরীর আমার॥
কহিও কুমার ঠাঁই, আর মোর লক্ষ্য নাই,
প্রভুবিনে নাহিক উপায়।
আমি হেন শত শত, আছে তান কত কত,
তথাপি ত্যাগিতে না জুয়ায়॥"

মেলেনী আসিয়া রাজকুমারকে কন্যার কথা সবিস্তারে বলিল। কুমার কন্যা উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাই রাজ্যলাভ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কোন্ লজ্জায় আর তাঁহার কাছে উপস্থিত হইবেন? বিশেষতঃ এ রাজ্যে বিচার নাই, না হলে ঘোড়া চোর বলিয়া তাহার কারাবাস হয়? অবশেষে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন,—

"কালে সৃজে কালে পালে কালে সে সংহারে।
লাভালাভ ভাবাভাব কালে সব করে॥
অবশ্য করিব কালে এহার বিচার।
এত ভাবি রহে তবে রাজার কুমার॥"

এদিকে রাজকন্যা প্রিয়ম্বদার সম্বৎসর ব্রতের আর মাত্র দুইমাস বাকি আছে। এমন সময় বসন্তোৎসবের কাল উপস্থিত হইল, নাগরিকগণ সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাত্র মিত্রগণ রাজসমীপে যাইয়া বসন্তোৎসবের কথা উত্থাপন করিতেই

"বসন্তের নাম রাজা শুনি মন্ত্রীমুখে।
বিষমাখা বান যেন হানিলেক বুকে॥
মোহিনীর সাপ সেই দিন মুক্ত হৈল।
তখনে বসন্ত ভাই মনেতে স্মরিল॥
আহা ভাই বসন্ত বলিয়া নৃপবর।
সিংহাসন ছাড়ি পড়ে ধরণী উপর॥"

ক্রমে চৈতন্যলাভ করিয়া রাজা বলিলেন,—

"আহারে বসন্ত ভাই, কোথা গেলে তোমা পাই,
কোথা গেলে পাইব উদ্দেশ।

পক্ষী হইয়া উড়ি যাইব, যথাতে তোমারে পাইব,
নহে মোর প্রাণ হৈব শেষ॥"

রাজা শীত এইভাবে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে রাজ-ভ্রাতা বসন্তকুমারকে যে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, আর যে তাঁহার অনুসন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

দেশে দেশে দিকে দিকে বসন্ত কুমারের উদ্দেশে দূতগণ ছুটিয়া চলিল, কিন্তু কেহই কোন খবর পাইল না। একদিন মেলেনী এ সংবাদ পাইয়া বসন্তকে কহিলে তিনি বলিলেন যে তিনিই মহারাজ শীতের কনিষ্ঠ সহোদর। তাহাকে আরও বলিলেন "মেলেনী, তুমি যাইয়া দূতকে বল যে তুমি বসন্ত কুমারের খবর জান এবং কল্য প্রভাতে তুমিই বসন্ত কুমারকে রাজসমীপে উপস্থিত করিবে।" সুবেশা মেলেনী দূতকে এইরূপ বলিলে সে তাহাকে মন্ত্রীর নিকট লইয়া গেল; মন্ত্রীকে সব কথা বলিলে মহারাণী তাহাকে ডাকাইয়া নিয়া একথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুবেশা নিশ্চয় করিয়া বলিলে রাণী রাজাকে খবর দিলেন।

"বসন্তের নাম শুনি নৃপতি তখন।
চক্ষু মেলি চারিদিকে করে নিরীক্ষণ॥
না দেখিয়া বসন্ত নয়নে পুনরপি।
মুদিত করিল চক্ষু ভাই ভাই জপি॥"

পরদিন রজনীপ্রভাতে প্রজারা সকলে উল্লসিত মনে পুরোহিত ও পাত্র মিত্র সঙ্গে মেলেনীর ভবনে উপস্থিত হইয়া পরম যত্নে সুসজ্জিত "বিমানে" কুমার বসন্তকে নিয়া রাজ-পুরীতে প্রবেশ করিল। বসন্ত কুমার শোকশয্যাশায়ী ভ্রাতাকে দেখিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজা শীত মন্ত্রীর বচনে বসন্তের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া—

"চক্ষু মেলি বসন্তেরে দেখিল সাক্ষাৎ॥
আহা ভাই বসন্ত বলিয়া ততক্ষণ।
বাহু পসারিয়া ধরি দিল আলিঙ্গন॥
উচ্চস্বর করিয়া কাঁদিছে দুই ভাই।
শ্রীরাম ভরত যেন হইল (এক ?) ঠাঁই॥"

তখন পরস্পর দুই ভ্রাতার পূর্ব্ব কাহিনী বর্ণিত হইলে, মণিভদ্র সদাগরের পৈশাচিক ব্যবহারের কথা শুনিয়া মহারাজ ক্রোধে অগ্নিবৎ হইলেন, এবং তাহাকে সবংশে বন্ধন করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। এদিকে রাজাদেশে রাজপুরোহিত, প্রধান মন্ত্রী এবং বহু দাস দাসীও মেলেনী সুবেশাকে সঙ্গে লইয়া কুমার বসন্তের প্রাণস্বরূপা রাজকন্যা প্রিয়ম্বদাকে চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করাইয়া রাজপুরীতে লইয়া আসিলেন। অমনি মহারাণী সুনন্দা আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মণিভদ্রকে সবান্ধবে গলায় পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ডুবান হইল এবং তাহার সমুদয় ধনরত্ন রাজকোষে আনা হইল। অবশ্য মণিভদ্রের নিরপরাধ পরিজনদিগকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় রাজা শীতের হৃদয়ের প্রশংসা করা যায় না।

এর পর পরম সুখে দিন যাইতে লাগিল। দুই ভাইর দুইটি পুত্র জন্মিয়াছে। তাহারা রূপে গুণে পিতৃ অনুরূপ। শীতের পুত্রের নাম রাখা হইল "শরৎ" আর বসন্তের পুত্রের নাম রাখা হইল "শিশির"। ছেলেরা উপযুক্ত হইলে একদিন মহারাজ শীত বৃদ্ধ পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার দর্শন জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন, বসন্তও একথা শুনিয়া অস্থির হইলেন। সুতরাং শরৎ শিশির দুই ভ্রাতার উপর রাজ্য ভার রাখিয়া তাহারা দুই রাণী সঙ্গে অবন্তী রাজ্যে পিতা রাজা শূরসেনের চরণ বন্দনা করিতে চলিলেন। পথে আর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই, কেবল একদিন এক রজনীতে এক গহন অরণ্যের মধ্যে দুই ভাই একটা বিকটাকার রাক্ষস বধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা যখন গজ বাজি রথ লোকজন সঙ্গে অবন্তী নগরে পঁহুছিলেন তখন তথায় কোলাহল পড়িয়া গেল। সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী গিয়া আনন্দে

"শীঘ্রগতি তখনে জানাইল নৃপতিত॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল নৃপতির মন।
মৃতক শরীরে যেন লভিল জীবন॥

তখন পুত্রদ্বয়ের মুখ দেখিয়া রাজা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে

লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নয়নদ্বয় অন্ধবৎ হইয়াছিল, এখন পুত্র মুখকমল দর্শনে উহা প্রসন্ন হইল। তখন

"হস্ত প্রসারিয়া ধরি পুত্র দুইজন।
আনন্দিত মনে রাজা কৈল আলিঙ্গন॥"

মহাদেবীর স্বভাব ও কালে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সংশোধিত হইয়াছিল, তাই

"মহাদেবী শুনিলেক থাকি অন্তঃপুরী।
আশুবারি দুই বধূ নিল কোলে করি॥

তখন

"মহা হুলাহুলি কৈল রাজার পুরিত।
নানা মহোৎসব করে বাদ্য নৃত্য গীত॥
শুনিয়া সকল প্রজা আনন্দিত হৈল।
বাল বৃদ্ধ যুবা সব দেখিতে আসিল॥
দুই পুত্র সঙ্গে রাজা হরিষ অন্তর।
মহা সুখে রাজ্যভোগ যেন পুরন্দর॥
দান ধর্ম্ম যজ্ঞ মহোৎসব অনুক্ষণ।
পুত্রবৎ করে রাজা প্রজার পালন॥
কতকাল রাজ্য ভোগ করিয়া রাজন।
পুত্রে রাজ্য সমর্পিয়া প্রবেশিল বন॥
মহাদেবী সনে রাজা থাকি তপোবন।
মুনিগণ সঙ্গে কৈল ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥
এহি মতে পুস্তক হইল সমাধান।
বিশ্বেশ্বর ধরে কৈল পয়ার বাখান॥"

আমার মাতৃদেবীর নিকট শীত বসন্তের যে রূপকথাটি শুনিয়াছি তাহার যতটুক মনে আছে তাহা এই:—

এক রাজার সুয়ো ও দুয়ো দুই রাণী ছিল। রাজা, যেমন হয়ে থাকে, সুয়ো রাণীকেই ভালবাসতেন এবং অপরিমিত আহ্লাদ দিতেন। দুয়ো রাণীকেত দেখ্‌তেই পার্‌তেন না। দুই রাণী সত্ত্বেও রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। কালক্রমে বড় রাণী অর্থাৎ দুয়ো রাণীর দু'টি জমজ পুত্র হ'ল। তাদের নাম রাখা হ'ল শীত আর বসন্ত। এর মধ্যে শীত বড়। সুয়ো রাণী এতদিন একরকম ভালই ছিলেন। বড় রাণীর সঙ্গে হিংসা করতেন বটে, কিন্তু এখন তা বড়ই বেড়ে গেল। ছেলে দুটিকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। একদিন, কি জানি কেন মনে নাই, তিনি শীত বসন্তের উপর ভয়ানক চটে গেলেন, এবং রাজাকে ব'লে তাদের গর্দ্দান নওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাদের সফেন রক্ত দিয়ে স্নান না করলে তাঁর রাগ আর কিছুতেই পড়বে না। স্ত্রৈন রাজা জল্লাদকে ডেকে হুকুম দিলেন "তুই অবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি কর।" এদিকে দুয়োরাণী এই দারুণ সংবাদ পেয়ে প্রাণের শীত বসন্তকে বল্লেন "তোরা শিগগির এ পুরী থেকে পালিয়ে অন্য রাজার অধিকারে যা। তোদের সৎমা সুয়োরাণী রাক্ষসী। সে ক্রমে ক্রমে এ পুরীর কাউকে ও রাখবে না, আমাকেত নাই,—খেয়ে ফেলবে। কিন্তু আমার ত আর রাজাকে ছেড়ে কোথা ও যাওয়া হবে না বাপ। শীত বসন্ত কাঁদতে কাঁদতে রওনা হ'ল। মা যাওয়ার সময় একটা বাটিতে ক'রে ছেলেদের হাতে খানিকটা আপন বুকের দুধ নিঙড়ে দিলেন, এবং বল্লেন বাছারা, যখন দেখবি যে এই দুধ একটু একটু ক'রে ঘুরপাক খাচ্ছে, তখনই বুঝবি রাক্ষসী সুয়োরাণী আমাকে খেয়ে ফেলবার জন্যে পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে, ঘুরপাক খাওয়া ক্রমেই বাড়বে, তখন বুঝবি আমি প্রাণপণে ছুটছি, সেও ছুটছে, তারপর যখন দেখবি দুধ আবার স্থির হ'তে লাগল, তখন বুঝবি আমাকে ধরেছে, তারপর যেই দেখবি দুধ একেবারে স্থির হয়ে লালবর্ণ হয়ে গেল, তখনই বুঝবি তোদের হতভাগিনী মা আর নেই—তাকে ঐ রাক্ষসী খেয়ে ফেলেছে।" শীত বসন্ত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। জল্লাদ তাদের সঙ্গে গেল বটে কিন্তু তাদের ছেড়ে দিল,—আর তাদের দুঃখে বড় কাঁদল, এবং একটা কুত্তা কেটে, সেই সদ্য রক্ত নিয়ে সুয়ো রাণীকে দিল, তিনি মনের আনন্দে তা দিয়ে স্নান করলেন। এদিকে শীত বসন্ত বহুদূরে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। বহুদিন চলে গিয়েছে, একদিন হঠাৎ তারা দেখল যে তাদের মায়ের বুকের দুধ একটু একটু করে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের কোমল প্রাণ শিহরে উঠল।

জোরেই দুধ ঘোরে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে অবশেষে স্থির হয়ে স্থৈর্য ধারণ করল। তখন তারা বুঝল—সব শেষ হয়ে গেছে। দুই ভাই কেঁদে কেঁদে অস্থির হ'ল। শিশু বসন্ত জল পান করতে চাইলে, শীত সরোবরে জল আনতে গেল। এক "রাজ হস্তী" এসে তার কপালে রাজটীকা দেখে শীতকে আপন পিঠে তুলে নিয়ে সেই রাজ্যের রাজ সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করে দিল। শীত রাজা হয়ে বসন্তকে ভুলে গেল। এদিকে বহুক্ষণ দাদা না আসাতে বসন্ত বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

এর পর যে কি হ'ল তা আমার এক বর্ণও মনে নাই, তবে শেষটা ভাই ভাই ও পিতা পুত্রে মিলন হয়েছিল, তাহা মনে পড়ে। কিন্তু ঐ "দুধের বাটির" কথাটা আজীবন ভুলব না। মা যখন আমাদের ঐ যায়গাটা বলতেন তখন আমাদের শিশু বক্ষের তরুণ রক্ত চঞ্চল হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকত, শেষে যেন ঐ দুধেরই মত স্থির হয়ে শেষটা জমাট বেঁধে উঠ্‌ত, আর আমাদের চোখের জলে বুক ভিজে যেত।

শ্রদ্ধেয় লালবিহারী দে মহাশয়ের Folk Tales of Bengal নামক পুস্তকে যে শীত বসন্তের গল্প আছে, তাহার সংক্ষেপ এই—

এক বণিকের এক আহ্লাদে ছেলে ছিল। সে এক বাগান বাড়ীতে থাকত। রোজ বাড়ী থেকে তার মা তার খাবার পাঠাতেন। সে একদিন একটা টুনটুনীর ডিম এনে দেয়াল আলমারায় রেখে দিল, এবং পরে একথা ভুলে গেল। কএকদিন পরে ডিম ফুটে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা বের হ'ল। ক্রমে হাটতে শিখলে সেই কন্যা রোজই আলমারা থেকে বেরিয়ে বণিকের ছেলের খাদ্য থেকে কতকটা খেয়ে ফেলত। ক্রমে সে বেশ বড় সড় হল এবং বেশী বেশী খেতে লাগল, তাই বণিকপুত্র সন্দেহ করে মাকে কম ভাত দেওয়ার কথা জানাল। কিন্তু মা বললেন, তিনি নিজে দেন, কম হওয়ার কথা কি? একদিন বণিক পুত্র স্নান করতে না গিয়া লুকিয়ে রইল, আর কন্যা বাইরে এসে খাওয়া শেষ করতেই তাকে ধরে ফেল্ল। তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে কিছু বলতে পারল না। এমন পরমা সুন্দরী ষোলবছরের মেয়ে দেখে, বাপ মায়ের অনুমতি নিয়ে বণিকপুত্র তাকে বিয়ে করল। যথা সময়ে তাদের শীত বসন্ত নামে দু'টি ছেলে হল। শীত বড় হ'লে তার বিয়ে হয়ে গেল। ইতি মধ্যে বুড়ো বণিক ও তার স্ত্রী স্বর্গে গেলেন। কিছু দিন পরে শীতের মায়েরও মৃত্যু হ'ল। শীতের বাবা অবিলম্বেই আর একটি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে আনলেন। কিন্তু তবুও শীতের স্ত্রী বয়সে বড় বলে' সেই ঘরের গিন্নী হয়ে রইল। একদিন এক জেলে শীতের বাপকে একটা মাছ দিয়ে বলে' গেল "এ মাছ যে খাবে তার হাসিতে মানিক আর কান্নায় মুক্তো ঝরবে।" বণিকপুত্র মাছটি এনে শীতের বৌকে দিয়ে কেবল তাকেই এটা রেঁধে দিতে বললেন। এখন শীতের স্ত্রী তার ও জেলের কথোপকথন শুনেছিল, সে উহা শীত ও দেবর বসন্তকে খাওয়াবার সঙ্কল্প করল। শ্বশুরকে একটা বেড় রেঁধে দিলেইত চলবে। এদিকে বসন্তের কবুতর উড়ে' এসে তার সৎমায়ের ঘরে পড়ায় তার সঙ্গে বড় ঝগড়া বাধল, এবং শীত এসে কবুতরটা কেড়ে' নিয়ে গেল। সৎমা তাদের শাশিয়ে বল্লেন- "আজ কর্ত্তাকে বলে' তোদের খুন করে' রক্ত আনব তবে ছাড়ব।" শীতের স্ত্রী একথা শুনে স্বামী ও দেবরকে ঐ মাছ খাইয়ে মণিমুক্তোর বাক্সটী নিয়ে তিন জনে অবিলম্বে একটি ঘোড়ায় চড়ে' সেই রাত্রেই এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এখন চল্‌তে চল্‌তে একদিন গভীর অরণ্যের মধ্যে শীতের রাত্রে শীতের স্ত্রীর একটী ছেলে হ'ল। শীত আগুনের সন্ধানে চলে' গেল কিন্তু কোথেকে একটা রাজ হস্তী এসে তাকে তুলে' নিয়ে গিয়ে এক দেশের রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দিল। সেই দেশে রোজই এক এক জনকে এইরূপ ধরে' এনে রাজা করা হ'ত। কি কারণে কেউ জানে না, রাত্রেই সেই হতভাগ্য রাজা প্রাণ হারাত। শীত মহাভয়ে ভীত হয়ে, কিন্তু খুব সাহসের সহিত রাণীর ঘরে শু'তে গেল, এবং খোলা তলোয়ার হাতে সারা রাত জেগে রইল। দুপুর রাতে পরম রূপবতী নিদ্রিতা রাণীর নাকের এক ছিদ্র দিয়ে একগাছি

সুতো বের হ'ল। ওমা দেখতে দেখতে সেই সুতো প্রকাণ্ড এক অজগর সর্প হয়ে যেই ফণা ধরেছে অমি শীত তাকে তলোয়ারের এককোপে কেটে টুকরো ২ করে' ফেল্লে। পরদিন প্রভাতে মন্ত্রীরা মরা রাজার সৎকার করতে এসে জ্যান্ত রাজাকে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত ও পরম সুখী হ'ল। রাজ্য উৎসবময় হয়ে উঠল। রাজা শীত স্ত্রী পুত্র এবং ভাইর কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

বসন্ত ভাইর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে, পরে খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে গিয়ে কাঁদতে লাগল, আর সেখানে মুক্তা ঝরতে লাগল। দূরে নৌকা থেকে এক বণিক তা দেখে' বসন্তকে যোড় করে' নৌকায় তুলে বেঁধে রাখল, আর বসন্ত আরও কেঁদে কেঁদে মুক্তার স্তূপ করে ফেল্ল। বণিকের আনন্দ দেখে কে। সে বসন্তকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে রোজই এইরূপ নানা যন্ত্রনা দিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করতে লাগল। এক দিন কৌতুকবশতঃ বসন্তকে কাতুকুতু দিতেই বসন্ত হেসে ফেল্ল, আর তার মুখ থেকে মানিক ঝরে পড়ল। আর যাবে কোথা, এখন রোজই বসন্তকে নানা উপায়ে একবার হাসানো আর বার কাদানো চলতে লাগল, আর মুক্তো মানিকে বণিকের ঘর ভরে গেল।

এদিকে শীতের স্ত্রী সদ্য প্রসূত ছেলেটিকে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এমন সময় সহর কোতোয়াল তার এক মরা ছেলে নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হল। তার ছেলেও সেই দিনই হয়েছিল। তার যত ছেলে হয় এইরূপই মরে যায়। কোতোয়াল নিজের মরা ছেলে শীতের মূর্চ্ছিতা স্ত্রীর বুকে দিয়ে তার জ্যান্ত ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে চলে' গেল। রজনী প্রভাতে শীতের স্ত্রী ছেলেট মরে গেছে দেখে কাঁদতে কাঁদতে তাকে নিয়ে নদীর পারে গেলেন, এবং জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হ'লেন। এমন সময় এক সদাশয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে নিবারণ করে এবং নানারূপ সান্ত্বনা দিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। শীতের স্ত্রী ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সঙ্গে তথায় তাঁর কন্যা পরিচয়ে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে কোতালের ঘরে শীতের ছেলেটি এখন যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে। সে হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মণ গৃহে সেই যুবতীকে দেখে তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোতোয়াল ব্রাহ্মণের কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠে বল্লেন "কি, এত বড় কথা? বামন হয়ে চাঁদে হাত!" কোতাল পুত্র এ কথা শুনে' ব্রাহ্মণের কন্যাকে জোড় করেই আনবে মনস্থ করে' গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণের বাড়ীর প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তার খড়ো গোয়াল ঘরের চালায় উপর উঠল। কিন্তু নীচে নামার পূর্ব্বেই এইরূপ কথা শুনতে পেল,—

প্রথম বাছুর।—মানুষেরা আমাদিগকে পশু বলে, কিন্তু তারা আমাদের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী পশু।

দ্বিতীয় বাছুর।—এমন কথা কেন বলছিস্ ভাই?

প্রথম।—এই মাত্র যে ছেলেটা আমাদের ঘরের চালার উপর দাঁড়িয়েছে, তার মত নর পিশাচ আর কে আছে?

দ্বিতীয়।—কেন, এত আমাদের কোতালের ছেলে, তাকেত মন্দ বলে' জানি না?

প্রথম।—তুমি জান না, কিন্তু আজ আমার কাছে শোন,— সে আজ তার মাকে জোর করে' বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

তখন প্রথমোক্ত বাছুরটি শীত বসন্তঃ শীতের স্ত্রী ও এই দুর্বৃত্ত ছেলের কাহিনী সবিস্তারে বলিল। সকল কথা শুনে শীতের পুত্র বড়ই বিস্মিত ও ভীত হ'ল, এবং কোতোয়ালকে বলে' তার নিষেধ সত্বেও রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' সে আজ যে আশ্চর্য্য কাহিনী শুনেছে সবিস্তারে বলল। রাজা শীত ভোর হইতেই স্ত্রীকে আনিয়ে রাণীর আসনে বসালেন, বসন্তকে উদ্ধার করলেন, এবং নিজ পুত্রকে গ্রহণ করে' যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। আর দুষ্ট বণিককে হেঁটে কাঁটা উপরে মাটি দিয়ে পুতে ফেল্লেন। এর পর থেকে তাঁরা বহুদিন সুখে সচ্ছন্দে রাজত্ব করেছিলেন।

দ'ক্ষণা বাবুর "ঠাকুরমার ঝুলির কপ কথাটি এই:—

এক রাজার দুয়ো সুয়ো দুই রাণী ছিলেন। সুয়োরাণীর শীত বসন্ত নামে দুইটি ছেলে। সুয়োরাণী নিঃসন্তান' তাই

হিংসায় জ্বলে মরেন। একদিন নদীতে মাথা ঘসার ছলে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর মাথায় একটি ঔষধের বড়ি টিপে লাগিয়ে দিলেন আর তৎক্ষণাৎ দুয়োরাণী টিয়াপাখী হয়ে উড়তে উড়তে বহুদূর এক রাজার বাড়ীতে গেলেন, রাজা তাকে ধরে তার টুকটুকে সুন্দর মেয়েটিকে পালতে দিলেন। রূপবতী রাজকন্যা তাকে একটি সোনার খাচায় রেখে দিলেন।

এদিকে সুয়োরাণীর ক্রমে তিনটি ছেলে হ'ল, কিন্তু তারা সকলেই বাঁসপাতার মত, বড় রোগা, কিন্তু সতীন ছেলে শীত বসন্ত কেমন নাদুস নুদুস। সুয়োরাণী এই হিংসায় জ্বলে'জ্বলে একদিন শীত বসন্তকে অত্যন্ত গালি দিলেন, ফিরে আবার রাজাকে উল্টো বুঝিয়ে তাদের রক্ত চাইলেন। রাজা অমনি জল্লাদকে হুকুম দিলেন। জল্লাদ শীত বসন্তকে নিয়ে গভীর অরণ্যে গেল, কিন্তু তাদের পালাতে পরামর্শ দিয়ে শেয়াল কুকুরের রক্ত এনে রাণীকে দিল। শীত বসন্ত বহু দূরে এক বনে গেলেন, তখন বসন্ত পিপাসার্ত্ত হওয়ায় শীত জল আনতে গেলেন। কিন্তু যেই জল নিতে সরোবরে নেমেছেন অমনি এক শ্বেত হস্তী তাকে পিঠেতুলে দ্রুতবেগে চলে গেল, এবং রাজপুরীতে প্রবেশ করল। সেই রাজ্যের পাত্র মিত্র সকলে এসে প্রণাম করে শীতকে রাজা করল। শীত রাজ কার্য করতে করতে বসন্তকে একেবারে ভুলে গেলেন। বন্যে একাকী বসন্ত দাদার আশায় বহুক্ষণ বসে' বসে কাঁদছেন, এমন সময় এক মুণি এসে তাকে সস্নেহে নিয়ে গেলেন। বসন্ত মুণির আশ্রমেই রইলেন।

সুয়োরাণীর পাপে তিন দিন যেতে যেতেই রাজার রাজ্য ছারেখারে গেল। তিনি মনের দুঃখে বনে গেলেন। আর সুয়োরাণী ছেড়া নেকড়া পরে' তিন ছেলে সঙ্গে নিয়ে ভিখারিণীর মত লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে' ফিরতে লাগলেন। একদিন আর দুঃখ সহ্য করতে না পেরে সমুদ্রের কূলে গেলেন, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জল পারে উঠে তার তিন ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তখন সুয়োরাণী পুত্র শোকে পাগলিনীর মত হয়ে মাথায় পাথর মেরে মরে' গেলেন।

এদিকে রূপবতী রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। সব রাজপুত্ররা সভায় বসেছেন। রাজ কন্যা সাজ করতে করতে টিয়া পাখীকে জিজ্ঞেস্ করলেন কেমন হচ্ছে? তখন পাখীর উপদেশে নানা আভরণে সজ্জিত হলেন। কিন্তু সর্ব্বশেষ টিয়া পাখী বল্লে "গজমতি না হলে এ কিছুই হল না।" তখন রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভায় খবর পাঠালেন যে, যে রাজপুত্র তাকে গজমতি এনে দিতে পারবে তারই সঙ্গে তিনি বিয়ে বইবেন। যারা তা পারবেনা তারা রাজকন্যার দাস হয়ে থাকবে। তখন গজমতির খোঁজ পড়ে গেল। রাজা শীত একথা শুনে রাজকন্যার পুরী আটক করে রাখলেন।

বসন্ত মুনির আশ্রমে আছেন। একদিন বসে আছেন এমন সময় আশ্রমের শুকসারী পরস্পর বলতে লাগল, দুধ সাগরের ধবল পাহাড় থেকে যে গজমতি আনতে পারবে সেই রূপবতী রাজকন্যাকে লাভ করবে। বসন্ত একথা শুনে, যেতে প্রস্তুত হলেন। তখন শুক সারীর উপদেশে আশ্রমের শিমূল গাছের কাছ থেকে চেয়ে রাজপোষাক ও রাজ মুকুট এবং মুনির কাছে থেকে তাঁর ত্রিশূল নিয়ে দুধ সাগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বসন্ত পৌছতেই দুধ সাগর শুকিয়ে গেল, তিনি তখন গজমতি নিয়ে রওনা হলেন। পায়ের নীচে শব্দ হল "ভাই আমাদের নেও।" বালি খুঁড়ে দেখেন তিনটি সোনার মাছ। তাদের সঙ্গে নিলেন।

রাজা শীত এদিকে মৃগয়া করতে করতে সেই গাছের তলায় এসে বস্‌লেন যেথান হতে জল্লাদ তাঁদের দু'ভাইকে বিদায় দিয়েছিল। বসা মাত্রই তাঁর বসন্তের কথা মনে হ'ল, এবং তিনি শোকে আকুল হয়ে পড়লেন।

বসন্ত গজমতি নিয়ে রূপবতী রাজকন্যার দেশে এসে দেখলেন পুরী অবরুদ্ধ। তখনই তিনি শীত রাজার রাজ্যে গেলেন। মন্ত্রীরা বল্‌ল রাজা শীত তার ভাই বসন্তের শোকে সাতদিন রাজকার্য্য বন্ধ রেখেছেন। বসন্ত গজমতি নিয়ে সাতদিন বসে' রইলেন। সাতদিন গেলে রাজার কাছে তিনটি সোনার মাছ উপহার পাঠালেন। দাসী মাছগুলিকে যেই কাটতে যাচ্ছে অম্‌নই তারা বলে' উঠ্‌ল "মাসি আমাদের কেট না, আমরা শীত রাজার ভাই।" খবর পেয়ে রাজা

এলেন, তখন তারা মানুষের রূপ ধরে' সব কথা বলল। তখন শীত কাঁত ও অন্য তিন ভাইর মিলন হ'ল।

রাজা শীত রূপবতী রাজকন্যার পুরস্কার খুলে দিলেন, এবং গজমতি সঙ্গে বসন্তকে নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে সোনার বেদীতে বস্‌লেন। রাজকন্যা টিয়া পাখীর মুখে রাজপুত্র বসন্তের গজমতি সহ আগমন সংবাদ শুনে আনন্দে কাঁচা হলুদ দিয়ে যেই পাখীকে স্নান করাতে লাগলেন, অম্‌নি তার মাথার ওষুধখানা ঘসা লেগে' খসে' পড়ে' গেল, আর সে দিব্য স্ত্রীরূপ ধরে সম্মুখে দাঁড়াল! রাজ কন্যা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন। শীত বসন্তের মাতা দুয়োরাণী তখন আপন পরিচয় দিয়ে রাজকন্যাকে কোলে টেনে নিলেন। রাজকন্যা তাঁর কোলে বসে চতুর্দ্দোলায় চড়ে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। দোলা থেকে বের হয়ে দুই ছেলের নাম ধরে ডাকতেই শীত বসন্ত বিস্মিত হয়ে মায়ের পায়ে পড়লেন। তার পর রাজকন্যার গলায় বসন্ত প্রদত্ত গজমতির মালা ঝল মল করতে লাগল। তারপর যথারীতি বসন্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। দুই ভাই বৃদ্ধ রাজাকে বন থেকে আনালেন। সুখের সীমা নেই। শীত বসন্ত বললেন যে এ সময়ে সুয়োরাণী থাকলে কেমন সুন্দর হ'ত, কিন্তু আগেইত সে মরে' গেছে।

এই কাব্যে যে সকল অধুনা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) মনান্বিত = এক মনে ?

(২) বিদিত = নিকটে, বিদ্যমানে। যথা,—

"পুত্র হেতু নরপতি, কঠোর করিয়া অতি,
শিব পদ ভাবে মনান্বিত।
কঠোর দেখিয়া অতি, তুষ্ট হৈয়া উমাপতি,
আসিলেন নৃপতি বিদিত॥"

(৩) দড় = দৃঢ়।

(৪) অন্তপুর = অন্তঃপুর।

(৫) নির্ঘাৎ = অব্যর্থ। যথা :—

"কহিলা নির্ঘাত কথা দেব ত্রিলোচন।"

৬। পরিহার = মিনতি ? ব্যগ্রতা ? যথা :—

"মহাদেবী পুছিল করিয়া পরিহার।"

৭। পুছিল = জিজ্ঞাসা করিল।

৮। ই বলিয়া = ইহা বলিয়া।

৯। দিল। ইহা উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :—

"শিবে বোলে × × × × ×
হইতে অমক পুত্র দিল তারে বর।"

১০। তুহ = তুমি।

১১। ঠাটা = বজ্র। (গ্রাম্য শব্দ এখনও ব্যবহার আছে)।

১২। নেহালে = দেখে।

১৩। দুস্ক = দুঃখ।

১৪। পুনি = পুনঃ।

১৫। এড়িয়া = এড়াইয়া, ছাড়িয়া।

১৬। হিন্দোলে = দোলায়।

১৭। ব্যাজ = গৌণ ; দেড়ি।

১৮। কহসি = কহ।

১৯। শোনসিয়া = শুন।

২০। পুছার = জিজ্ঞাসা।

২১। সমবায় = নিয়ম, প্রতিজ্ঞা ? বন্দোবস্ত ? যথা :—

"রজনী প্রভাতে বাপু যাইবা তথায়।
করিয়া আসিছি আমি এহি সমবায়॥"

২২। নৃপতিত = নৃপতিকে। যথা,—

"দূতমুখে শুনি মন্ত্রী মহা আনন্দিত।
শীঘ্রগতি তথবে জানাইল নৃপতিত॥"

২৩। মৃতক = মৃতের। যথা :—

"শুনিয়া আনন্দ হৈল নৃপতির মন।
মৃতক শরীরে যেন লভিল জীবন॥"

এইরূপ "ক" এর ব্যবহার কি হিন্দি ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তির "কো" এর প্রয়োগ হইতে আসিয়াছে ? যথা,—"রামকো", "শ্যামকো" অর্থাৎ রামের, শ্যামের।

সদাগর কর্ত্তৃক বসন্তকে নৌকা হইতে সাগরজলে নিক্ষেপ, তথায় তাহার জীবন রক্ষা, ভাসিতে ভাসিতে রাজবাড়ীর

মেলেনীর ফুলবাগানে আসিয়া উঠা, তাহার আগমনে বাগানে অজস্র কুসুম বিকাশ, এবং মালিনী গৃহে তাহার আশ্রয় লওয়ার কাহিনী, পূজ্যপাদ কাশীরাম দেব মহোদয়ের মহাভারতোক্ত শ্রীবৎসোপাখ্যান হইতে আমাদের কবি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে কাব্যখানির ভাষাটি বেশ স্বচ্ছ সরল। স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে।

"তনু মাত্র এথা আছে, প্রাণ কুমারের কাছে,
দেখ মোরে মনুষ্য আকার।
যেন পাকাইয়া দড়ি, রাখিছে অনলে পুড়ি,
তেন মত শরীর আমার ॥"

মেলেনীর কাছে বসন্ত-পত্নী প্রিয়ম্বদার এই উক্তিটি কেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক।

আখ্যানটির মধ্যে নানাভাবের সমাবেশ আছে সত্য, কিন্তু কোথাও কৌতুহল জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা নাই; এক একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধান করা হইয়াছে। তবে আখ্যান ভাগের কোন স্থানে আরষ্টভাব নাই——বেশ অবাধ গতিতে চলিয়া গিয়াছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পুরাতন কাব্য হইলেও ইহাতে অশ্লীল বর্ণনা একেবারেই নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

অচিন সাথী।

(১)

ঘর বেঁধেছে একটী কোকিল অনেক বছর আজ,
ঘরের কোণে পত্রনিবিড় আম্রঝোঁপের মাঝ।
রসাল তরু রসাল করে'
নিত্য তাহার কণ্ঠ ঝরে,
ফাগুন শ্রাবণ নাই ভেদাভেদ সদাই আমার পাশে
কুহুর সনে দেয় সে পরশ প্রাণের মাঝে পশে'।

(২)

নাই কালাকাল পাগল পাখী এম্‌নি খেয়াল গুরু
হঠাৎ ডেকে কাজের মাঝে দাঁড়ায় এসে মোর।
হাজার ভাষা বক্ষ ভরে'
আমায় কেবল স্তব্ধ করে,—
ভাগ করে দেয় দুঃখের বোঝা আমায় ফুরে এসে,
কি যেন গো কিসের আগুন জ্বালিয়ে তোলে প্রাণে।

(৩)

নিশীথ রাতে বিশ্ব যখন নিঝুম ঘুমের ঘোরে,
আচম্বিতে জানিয়ে ব্যথা জাগায় পাখী মোরে।
কি যে তাহার প্রাণের জ্বালা,
কিছুতে তা হয় না বলা,—
বুকের বোঝা পাষাণ হয়ে তেমনি বুকে রয়,
পাখীর পরাণ অমন ব্যথা কেমন করে সয়!

(৪)

আমায় পাখী এম্‌নি যে তোর ব্যথায় গেঁথে দিলি,
হারাই তোরে কতই সময়, থাক্‌তে নারি ভুলি'।
ছিলি কি মোর পরম কেহ,
আস্‌লি আবার বদ্‌লে দেহ
হৃদয় নিয়ে তেম্‌নি তাজা, ঘরের কাছে মোর,
আমার প্রাণে ঢালিস্ কি তাই প্রাণের জ্বালা তোর?

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

জার্ম্মান রাজপরিবার।

এথেল হাওয়ার্ড যিনি একসময়ে জার্ম্মান যুবরাজগণের গভর্ণেস্ ছিলেন তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম তাঁহার কথাকে দিয়ে বিবৃত করা গেল:—

আমি আমার পিতার কনিষ্ঠ কন্যা, আমার ছোট আর একটী ছিল। অন্যান্য ভগ্নিদের মত আমার সজ্জিত ও চিত্র

বিদ্যার দিকে বিশেষ ঝোক না থাকাতে পিতা আমাকে বালকোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে বয়সে বালিকাগণ আমোদ উল্লাসে কাটায় সে বয়সে আমি ভার্জ্জিল ও ইউক্লিড্ পড়িতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া পিতাকে বলিয়াছিলাম যে বালিকার পক্ষে এই শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে পিতা বলিলেন যে "যদি কখন কোন বালককে তোমার শিক্ষা দিতে হয় তবে তোমাকে উহা আর নূতন করিয়া পড়িতে হইবে না।" ইহার পরে পাঠ শেষ করিয়া আমি শিক্ষকতা আরম্ভ করিলাম। আমার প্রথম ছাত্র যখন বৃত্তি পাইল তখনই আমার কার্য্য কতক সফলকাম হইয়াছে বুঝিলাম। শ্যাম রাজের ভ্রাতষ্পুত্র কুমার সীতিকরন্ আমার দ্বিতীয় ছাত্র। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমি জর্ম্মন রাজকুমারদের গভর্ণেস্ হইব। ১৮৯৫ সনের হেমন্ত কালে আমি একখানা পত্র পাইলাম। উহার বাহ্যিক চেহারাতেই বুঝা যায় যে উহা কোন রাজ-পরিবার হইতে আসিয়াছে। উহাদ্বারা আমাকে জর্ম্মন কুমারদের গভর্ণেস্ নিয়োগ করা হইয়াছে। আমি মনে করিলাম যে আমার কোন আত্মীয় আমাকে কৌতুক করিবার জন্য ঐরূপ পত্র দিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরে বাথ্ নগরের রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমাদের পরিবারের একজন হিতৈষী বন্ধু মিস্ ওয়েকার আমাকে এক পত্র লিখিলেন। তিনি জর্ম্মান সম্রাজ্ঞীর বালিকা বয়সের গভর্ণেস্ ছিলেন। তিনি আমাকে অনুযোগ দিয়া লিখিয়াছেন যে আমি কেন জর্ম্মান রাজ-দরবারের পত্রের উত্তর দেই নাই। আমি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিলাম যে আমি ফরাসি ভাষা খুব ভাল জানি না, অধিকন্তু আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞ কাযেই আমি গভর্ণেসের কার্য্যের অনুপযুক্ত। কিন্তু তথাপি সম্রাজ্ঞী আমাকে চাহেন জানিয়া আমি অত্যন্ত ভয়ের সহিত উক্ত পদ গ্রহণ করিলাম। ১৮৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি বার্লীন্ রওনা হইলাম। গাড়ীতে উঠিয়া দূরদেশে যাইতে আমার এত ভয় হইতে লাগিল যে আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। আমার মাতা সঙ্গে ছিলেন তিনি আমাকে পুনরায় গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

আমি বার্লিনে উপস্থিত হইলাম। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমার পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণেস্ গাড়ী লইয়া উপস্থিত ছিলেন। আমাকে রাজ প্রাসাদের সংলগ্ন অতিথিদের থাকিবার দালানের এক কক্ষে বাসা দেওয়া হইল। আমার পূর্ব্বের গভার্ণেস অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য ছাড়িয়া যাইতেছেন। তিনি আমাকে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য এবং রাজপ্রাসাদের আদব কায়দা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমাকে একেবারে রাজপ্রাসাদে কেন নেওয়া হইল না তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে সাধারণ লোকের অনেক সময়ে রাজ বাড়ীর বৈভব আদি দেখিয়া মাথা খারাপ হইয়া যায়। কাজেই ক্রমে ২ উহাতে অভ্যস্ত করিয়া নেওয়া দরকার। আমি যাওয়ার পরে যে দাসী আমার কার্য্যাদি করিত একদিন সে আসিয়া আমার পদ চুম্বন করিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম যে উহাই বোধ হয় রাজ বাড়ীর এক কায়দা। কিন্তু পর দিবস আমার কার্য্য করার জন্য এক নূতন দাসী আসিল। তাহার নিকট অবগত হইলাম যে ঐ পদচুম্বন-কারিণী দাসীর মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতেই সে ঐরূপ করিয়াছিল এবং সে জন্য তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে কোন গোল হয় তাহা মনে করিয়া আমি কুমারদের নাম, জন্ম তারিখ ইত্যাদি নোট করিয়া পূর্ব্ব হইতেই মুখস্ত করিয়া নিয়াছিলাম।

রাজকুমারদিগকে দেখিবার পরে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল তাহা আমার ডাইরিতে নিম্নলিখিতরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম।

যুবরাজ উইলহেল্ম্ (Wilhelm)কে আমার বড়ই ভাল লাগে। সে খর্ব্বাকৃতি সুপুরুষ, তাহার গায়ের রং বড়ই সুন্দর। হাসি যেন তাহার চক্ষে লাগিয়া আছে। সে অত্যন্ত অভিমানী এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। সে তাহার নিজের জিনিষ ভ্রাতাদিগকেও স্পর্শ করিতে দেয় না। যখন ইংলণ্ড এবং জর্ম্মণী সম্বন্ধে আলোচনা হইত তখন সে অত্যন্ত চতুরতার সহিত কথা বলিত। সে তাহার ভ্রাতাদিগকে অত্যন্ত বিরক্ত করিত। একদিন আমি

তাহাকে নির্জ্জনে বলিলাম যে, তাহার ভ্রাতাদিগকে উত্যক্ত করাতে আমার কার্য্যের বড়ই অসুবিধা হয়। তাহাতে সে দুঃখিত হইয়া বলিল যে ভবিষ্যতে সে ঐরূপ করিলে আমি তাহাকে ইঙ্গিতে "উত্যক্তের" পরিবর্ত্তে কেবল "উ" বলিলেই সে বিরত হইবে। তাহার ঐরূপ স্বভাবসত্বেও ভ্রাতাদের সহিত তাহার বিশেষ ভালবাসা ছিল।

রাজকুমার ফ্রিজ দেখিতে মোটা সোটা। আমি তাহাকেও যুবরাজের মত ভালবাসি। সে অত্যন্ত সহিষ্ণু ও মিষ্ট স্বভাব কিন্তু সে সৈনিক বিভাগের পাগল ছিল। সে জর্ম্মাণ, ফরাসি এবং অন্যান্য দেশের সৈনিক বিভাগের যাহা কিছু জানিবার তাহা জানিত। সে উহাদের বর্ণনা করিবার সময়ে এতই উত্তেজিত হইয়া পরিত যে দ্রুত কথা বলিতে যাইয়া তাহার মুখদিয়া শব্দ বাহির হওয়া কষ্টকর হইত।

রাজকুমার এডেলবার্ক ঠিক যেন তাহার পিতার প্রতিমূর্ত্তি। অত্যন্ত কর্কশ স্বভাব অথচ স্নেহশীল। দুষ্টের শিরোমণি এবং লোভী। কুমার অগাষ্ট উইলহেল্‌ম একটু হাবা রকমের! সময়ে অসময়ে সে হাসিতে ২ মাটিতে লোটাইয়া পরিত।

রাজকুমার অস্কার অত্যন্ত সুপুরুষ এবং মধুর প্রকৃতি। সে চিন্তাশীল অথচ কৌতুক করিতে জানিত।

কুমার জোয়াকিন্ ও রাজকুমারী অত্যন্ত শিশু ছিল এবং ধাত্রীর নিকট থাকিত। তাহারা উভয়েই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিল।

কুমার জোয়াকিনের ডাকনাম ছিল পাইক। এক দিবস ডাক্তার শ্রীমান পাইককে একটি চূর্ণ খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীমান ও শ্রীমতী রাজকুমারী উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে ডাক্তার চূর্ণ (Powder) অর্থাৎ বারুদ খাইতে দিবে। ইহাতে উভয়েরই ভয় হইল। যে বারুদের দ্বারা বন্দুক, কামান ইত্যাদি ছাড়া হয়, তাহা মানুষ খাইলে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে!! ডাক্তার আসা মাত্র রাজকুমারী কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় "আশা করি আপনি আমাদের পাইককে বারুদ দিয়া উড়াইয়া দিবেন না?"

শ্রীমতী রাজকুমারী আমার নিকট যতদিন রহিয়াছে তন্মধ্যে একদিন তাহার সহিষ্ণুতা ও পদোচিত সম্মান রক্ষার চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। এলসেস্ লোরেণের অধিবাসীগণ সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট। এই এলসেস্ লোরেণের অন্তর্গত মেজ্ দুর্গে একদা আমি রাজকুমারীর সহিত গাড়ীতে যাইতেছিলাম। সম্রাটের প্রতি লোরীর লোকদের যেরূপ ভাবই থাকুক কিন্তু তাহাদের এই বালিকা কুমারীকে দেখিয়া যেন রাজভক্তি উথলিয়া উঠিল। তাহারা ফুলের মালা ও তোরা দ্বারা কুমারীকে সমস্ত রাস্তায় অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। বালিকা ফুলের ভারে অবনত এবং তাহাদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে ২ এরূপ ক্লান্ত হইয়া পরিল যে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মিস্ হাওয়ার্ড, আর কত সময় এরূপ চলিতে হইবে?" রাস্তা অল্পই বাকি ছিল কিন্তু তাহাও সে সহিষ্ণুতার সহিত সহাস্য বদনে অভিবাদন গ্রহণ করিতে ২ কাটাইয়া দিল। ইহার পরে গৃহে যাইয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পরিল।

যুবরাজ ভিন্ন অপর রাজকুমারদের সম্রাটের পুত্র বলিয়া কোনরূপ অভিমান ছিল না। অনেক সময়ে তাহারা যেন তাহাদের বংশগত মর্য্যাদা ভুলিয়া যাইত। কুমার অস্কার গাড়ীচালকের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে এরূপ প্রকাশ করিত। অপর কুমারগণও সামান্য কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে কুণ্ঠিত ছিল না।

একদা আমি কুমার এডেলবার্ককে নিয়া সহরের বাহিরে বেড়াইতে গিয়া এক বিপদে পরিয়াছিলাম। একটি অদ্ভুত রকমের লোক হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কোনরূপ অভিবাদন না করিয়াই কুমারকে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে ক্ষুধার্ত্তদের জন্য সে কোন কাষ দিতে পারে কি না। কুমার তাহার উদ্ধতভাব দেখিয়া তাহার কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করিয়া নির্ভীকভাবে চলিয়া যাইতে লাগিল! এরূপ লোক আমাদের অসহায় অবস্থাতে কোনরূপ বিপদ ঘটাইতে পারে মনে করিয়া আমি কুমারকে

একটু সরম হইতে ইঙ্গিত করিলাম। সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া ঐ লোকটির সহিত ২।১টী এরূপ আলাপ করিল যে সে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

একদা আমি কুমার অচ্‌কারের সহিত ষ্টেসন হইতে ওয়াইল্ড পার্কের দিকে যাইতেছিলাম। তখন ইউনিফর্ম পরিহিত বিচিত্র চেহারার একটী লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে সম্রাট কখন আসিবে। আমি কুমারকে কিছু বলিতে না দিয়া সম্মুখে আসিয়া তাহার কথার উত্তর দিলাম এবং তাহাকে জানাইলাম যে আমরা সম্রাট সম্বন্ধে কোন খবরই রাখি না। এই জাতীয় লোক-দ্বারা বিপদ ঘটা অসম্ভব নয় বিবেচনা করিয়াই আমি সতর্ক হইয়াছিলাম।

অনেক স্থলে দেখা যায় যে অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে-পিলেদিগকে চাটুকারগণ শৈশব হইতেই বাবু, কর্ত্তা বাবু, মহারাজ প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দেয়। কিন্তু জর্ম্মণকোর্টে সম্রাটের বড় পুত্র শ্রীমান উইল্‌হেলমকে ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহ যুবরাজ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে নাই।

আমি কুমারদিগকে নানারূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতাম। আমাকে পূর্ব্বে একবার উহা পাঠ করিয়া নিতে হইত। কারণ যেখানে যাহা বাদ দেওয়া দরকার তাহা দাগ দিয়া রাখিতাম। আমি একদিবস "জুলিয়ান হোম" পড়িতে২ অসতর্কভাবে নায়ক নায়িকার কথোপ-কথন পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নায়ক তাহার প্রেমাস্পদাকে বলিতেছে "তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?" উত্তরে নায়িকা ব্রীড়াবনত মুখে বলিল "হাঁ"। ইহা শুনিবা মাত্র একজন কুমার আনন্দে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল "এখন আমি বুঝিলাম কুমারীর নিকট কিরূপে বিবাহের প্রস্তাব করিতে হয়।" ইহাতে আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম।

পরীক্ষার সময়ে আমাদের বালকগণ যেরূপ চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়ে রাজকুমারগণও ঠিক সেইরূপই হইত, তাহাদের তেজ বীর্য্য যেন পরীক্ষার ভীতিতে নিষ্প্রভ হইয়া যাইত।

এক দিবস রাজকুমারগণ সূর্য্যোদয় দেখিতে এক পাহাড়ে যাইবে স্থির হইল। অতি প্রত্যূষে গভর্ণারদের সহিত পদব্রজে তথায় যাত্রা করিল। উচ্চ পাহাড়ে উঠিবার সময়ে পথশ্রান্ত হওয়াতে কুমার অউইর মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। কিন্তু তাহাতেও ক্ষান্ত হইবার যো নাই। গভর্ণার তৎক্ষণাৎ শীতল জলধারা তাহার মুখ প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় লইয়া চলিল। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে অবশ্য কুমারদিগকে গাড়ীতে আনা হইয়াছিল। গাড়ীতে কুমার অচ্‌কারের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, সে জন্য তাহাকে দুর্ব্বল বলিয়া বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

কুমারদের গভর্ণারগণ গম্ভীর ও কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল অথচ তাহারা মহিলাদের সহিত রসিকতা করিতে ছাড়িত না, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও তাহাদের পদ মর্য্যাদার সীমা লঙ্ঘন করিতে দেখি নাই।

কুমারগণ কখন কাঁদিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহারা চখের জল ফেলিলে গভর্ণারদের নিকট রিপোর্ট করা হইত।

রাজকুমারগণ আদেশ পালন করিতে কিরূপ অভ্যস্ত ছিল তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এজন্য আমাকে বিশেষ অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল। কুমার ফ্রিজের স্বভাব ছিল, সে উপর হইতে নীচে নামিবার সময়ে গোলমাল করিত এবং দুই তিন সিড়ি বাকি থাকিতেই লম্ফ দিয়া মেজের উপরে পরিত। আমি একদা তাহাকে বলিলাম যে "তুমি উপর হইতে নীচে শান্তভাবে নামিবে, যেন সম্রাটের কোন শান্তি ভঙ্গ না হয়। ইহার কিছু কাল পরে যখন তাহারা নামিতে-ছিল তখন আমি রেলিংএর নিকট দাঁড়াইয়া বলিলাম "কুমার ফ্রিজ, যাহা বলিয়াছি মনে থাকে যেন।" ইহার কিছুকাল পরে সম্রাজ্ঞী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে বলিলেন যে আপনি এক আদেশ দুইবার করিয়া ভাল করেন নাই। শ্রীমান ফ্রিজের মনে হইয়াছে যে আপনি তাহার কর্ত্তব্য বোধে সন্দিহান। ইহারা আজন্ম সৈনিক শাসনে গঠিত, ইহারা জানে যে সৈনিক

বিভাগে আদেশ পালন না করার অর্থ মৃত্যু।" আমি ইহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। আমি সম্রাজ্ঞিকে সাহুনয়ে জানাইলাম যে, আমার বিশ্বাস ছিল কুমারগণ বালক, একবার বলাতে ভুলিয়াও যাইতে পারে, তাই দ্বিতীয়বার মনে করাইয়া দিয়াছিলাম।

কুমারদের দুষ্টামিতে আমি ব্যতিব্যস্ত থাকিতাম।

একদা আহার করিবার সময়ে খাদ্য জিনিসের আস্বাদন করাইবা মাত্র টেবিলের উপরে ভেক লাফাইতে আরম্ভ করিল। আমার অসাক্ষাতে যুবরাজ এই কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখিয়া তাহাদের আমোদের সীমা রহিল না। সে দিবস আমার আহার একরূপ হইল না বলিলেই হয়।

রাজকুমার এডেলবার্ক আমার সহিত এক দিবস নিকটস্থ পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। তথায় পাহাড়ের উপরে সাইকেল দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমার আতঙ্কে শরীর কাঁপিতে লাগিল। যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইল। কুমার সাইকেলসহ নীচে গড়াইয়া পরিল। আমি ব্যাকুলভাবে দৌড়াইয়া যাইয়া দেখি, কুমার যেন সঙ্গাহীন বর্ত্তমান সময়ের মেয়েদের মত হইলে আমি প্রাথমিক চিকিৎসা করিতাম। কিন্তু আমি তখন তাহা জানিতাম না। নিকটে অপর কেহ নাই, কাযেই আমি কুমারকে বহন করিয়া লইয়া রওনা হইলাম। একে পার্ব্বত্য পথ, তাহাতে আমি দুর্ব্বল, বিশেষত তখন আমার স্বাস্থ্য তত ভাল না। অধিকন্তু কুমার এডেলবার্ক সুস্থ সবল দ্বাদশ বৎসরের বালক। এই গুরুভার লইয়া পার্ব্বত্যপথে চলিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল। আমার এরূপ অবস্থা হইল যে কুমারকে ফেলিয়া দেই কি নিজে পরিয়া যাই, ঠিক সেই সময়ে কুমার আমার স্কন্ধ হইতে লাফাইয়া পরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

রাজবাড়ীতে সকলেই ইউনিফর্ম পরাতে আমাকে অনেক সময়ে গোলে পরিতে হইত। আমি সকলকে চিনিতে পারিতাম না। একদা কুমার অচ্‌কার অপরিষ্কার হাতে আহারে আসিয়াছে। সম্রাজ্ঞী আদেশ করিলেন, আমি চাকরকে ইহা জানাই। আমি কুমারকে নিয়া কক্ষের বাহির হইতেই ইউনিফর্ম পরা একটী ভৃত্য দেখিলাম। আমি ভালরূপ জর্ম্মণ ভাষা না জানাতে, মনে করিলাম যে ভৃত্যকে কার্য্যত দেখাইয়া দেই কিরূপে কুমারদের হাত ছাফ করিতে হয়। যখন আমি শ্রীমান্ অচ্‌কারকে নিয়া তাহার হাত ধোয়াইয়া ভৃত্যকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি যে কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, তখন সকলেই মুচ্‌কি ২ হাসিতেছিল। আমার মনে হইল যে আমার অদ্ভুত জর্ম্মণভাষা শুনিয়াই সকলে হাসিতেছে। ইহার পর বৈঠকখানায় আসিবার কিছুকাল পরে সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতার সহিত দেখা করিবার জন্য আমার ডাক পরিল। আমি শশব্যাস্তে উপস্থিত হইয়া দেখি, যাহাকে ভৃত্য মনে করিয়া আমি হস্ত প্রক্ষালন প্রণালী শিখাইয়াছিলাম তিনিই সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতা। আমি কিরূপ লজ্জিত হইলাম তাহা আর বলিবার নহে। একদা আমার কার্য্য শেষ করিয়া আমার কক্ষে আসিয়া বিশ্রাম করিব মনে করিয়া কাপড় ছাড়িয়াছি। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আহারে বসিয়াছেন। এমন সময়ে এক কুমার শশব্যাস্তে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল যে সম্রাট আমাকে তাহার খুরিমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। আমি তারাতারি কোনরূপে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিলাম। কুমার আমাকে প্রাসাদের সুদূর প্রান্তে এক কক্ষে লইয়া গেল। তথায় এক বৃদ্ধা বসিয়াছিল। আমি তাহাকে অভিবাদন করিয়া যখন হস্ত চুম্বন করিতে যাইব এমত সময়ে বৃদ্ধা উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিল এবং আমার নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কুমারগণ খিল ২ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে জানিতে পারিলাম এই বৃদ্ধা সম্রাটের ধাত্রী, সে বৎসরে একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।

১লা এপ্রিল। কুমার তহির পরীক্ষা। পরীক্ষার নামে সাধারণ বালকদের মত কুমারগণও ভীত হইত। অস্য চক্ষের চতুষ্পার্শ্ব কৃত্রিম উপায়ে কাল করিয়া অসুখ হইয়াছে বলিয়া ওহি যাইয়া বিছানায় শয়ন করিল, তাহার গভর্ণার ইহা শুনিবা মাত্র শশব্যাস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ কুমারদের

অসুখ হইলে সকলেই ব্যাতিব্যাস্ত হইত। গভর্ণার উদ্বিগ্ন মনে কুমারকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিছু সময় পরে গভর্ণারকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া কুমার ওহি "এপ্রেল ফুল" বলিয়া হাসিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া পরিল। ভাগ্যক্রমে ঐ দিবস ১লা এপ্রিল ছিল তাই কুকার ক্ষমা পাইল, নচেৎ সাজা পাইতে হইত।

রাজকুমারগণ বাগান হইতে বাদাম সংগ্রহ করিয়া উহা সম্রাটের নিকটে বিক্রয় করিত। সম্রাট ইহা তাহার হরিণকে খাওয়াইতেন। গুরুতর রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলে সম্রাট কখন ২ কুমারদের সহিত টেনিস্ খেলিতেন। আমি একদা সম্রাটকে এক বৃহৎ কক্ষে কুমারদের সহিত ফুটবল খেলিতে দেখিয়াছি।

সম্রাট মফঃস্বলে গেলে আমরা স্ত্রীলোকে মিলিয়া নানারূপ খেলা করিতাম। সম্রাজ্ঞী আমাদের সহিত যোগ দিতেন। একদা এইরূপ খেলিবার সময়ে সম্রাজ্ঞী প্রস্তাব করিলেন একটা ময়দার পিপার মধ্যে একটা গুটি ফেলিয়া কে উহা হাত বারাইয়া বাহির করিতে পারে। কথা অনুযায়ী কার্য্য হইতে লাগিল। ইহার কিছুকাল পরে রাণী তাঁহার একটী আংটী ময়দার ভিতরে ফেলিয়া বলিলেন—যে উহা বাহির করিতে পারিবে উহা তাহার হইবে। ঘটনাক্রমে আমি উহা বাহির করিলাম। সম্রাজ্ঞী তখন কাতরভাবে বলিলেন যে ঐ আংটী সম্রাট তাঁহাকে দিয়াছেন, কাযেই উহা অপরকে দেওয়া ঠিক হইবে না। এই ময়দার খেলাতে লাভের মধ্যে কুমারদের অত্যাচারে আমার একটী কাল জামা নষ্ট হইল। ঘরে বসিয়া যে সব খেলা হইত তাহার মধ্যে দবা খেলাই কুমারদের অধিক প্রিয় ছিল।

এক দিবস সম্রাটের অনুপস্থিতে আমি নাটকে যাইব মনে করিয়াছি, এমন সময়ে রাণী ডাকিয়া পাঠাইলেন যে বল্ নাচ হইবে। আমি নাটকে যাওয়া স্থগিত করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। এই "বলে" কুমারগণ নানারূপ বিচিত্র পোষাক পরিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বা তুরস্কদের পোষাক এবং কেহ বা নাগরিকের পোষাকে হাজির হইল। এই নাচে কোন-রূপ দরবারের আদপ কায়দা রক্ষা করা হয় নাই। সকলেই স্বাধীন ও সরলভাবে মিলা মিশা করিয়াছি। যখন ভৃত্যগণ চিঠি কিম্বা টেলিগ্রাম নিয়া আসিয়াছে তখনই কেবল আদপ কায়দা দেখান হইয়াছে। জর্ম্মান দরবারে তিন বৎসরের মধ্যে আমার এই একটী বিশেষ আমোদের দিন।

জর্ম্মান রাজপরিবার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সম্রাটের সম্বন্ধে কিছু না বলা অস্বাভাবিক।

জর্ম্মান সম্রাট অত্যন্ত সুপুরুষ। তাঁহার বাম হস্ত একটু খাট এবং অস্বাভাবিক। সম্রাট অঙ্গুরী অত্যন্ত ভালবাসেন, চার আঙ্গুলেতেই আংটী পরিয়া থাকেন। তিনি কর মর্দ্দন করিতে হস্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে যে তাঁহার সহিত কর মর্দ্দন করে সে হাতে বেদনা বোধ করিয়া থাকে। তিনি উজ্জ্বল প্রতিভা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে কেবল জর্ম্মনী কেন সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার বিশ্বাস তিনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা বলে তিনি যে একজন জননায়ক হইতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি বাক্-চাতুর্য্যে বিশেষ সুপটু। কোন একটা গল্প তাঁহাকে আমি দুইবার বলিতে শুনি নাই, এবং তিনি কখনও এক কথা বার ২ বলিতেন না। তাঁহার স্মরণ শক্তি অসাধারণ। একদা তাঁহার সহিত আমার সম্রাজ্ঞীর পুত্র শা[illegible] সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। ইহার প্রায় $1\frac{1}{2}$ মাস পরে তিনি তাহার অবিকল পুনরাবৃত্ত করিলেন।

সম্রাটের একটী প্রাসাদ অত্যন্ত সুন্দর এবং ছোট ছিল। এক সময়ে আমরা তথায় থাকা কালীন আমি উহাকে পুতুলের ঘর বলিয়াছিলাম। ইহার এক বৎসর পরে সম্রাট একদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি "পুতুলের ঘরে" বেড়াইতে যাইতে চাহি কি না।

আমার দৃষ্টি শক্তি কম থাকাতে আমি মাঝে ২ বড়ই গোলে পরিতাম। আমি একদা সম্রাজ্ঞীর সহিত গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হই। ইহার পূর্ব্বে আমাকে একজন

গভর্ণার বলিয়াছিলেন যে আমাকে কর্ত্তব্য কার্য্য করার সময়ে আদপ কায়দা ভঙ্গের জন্য লজ্জা দিবেন। রাজদরবারে নিয়ম, যখন রাজা কিংবা রাণীর সহিত থাকা যায় তখন অপর কাহার সহিত আলাপ, হাস্য কিম্বা ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় করা আদপ কায়দা বিরুদ্ধ। ঐ দিবস আমাদের সহিত পথিমধ্যে তিনজন অশ্বারোহী সৈনিকের সাক্ষাৎ হয়। তাহার মধ্যে একজন আমাকে "প্রাতঃ প্রনাম, মিস্ হাওয়ার্ড" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আমিও গম্ভীর ভাবে তাহাকে মাত্র "প্রাতঃ প্রনাম বলিলাম।" আমার মনে হইল যেন ঐ ব্যক্তি সেই পূর্ব্ব কথিত গভর্ণার। সে জন্য আমি আরো বিশেষ সতর্ক হইলাম। ইহার পরে যখন জানিতে পারিলাম যে আমাকে অভিবাদনকারী স্বয়ং সম্রাট, তখন আমার ক্ষোভ ও ভয়ের অবধি রহিল না। কারণ আমি সম্রাটকে প্রকাশ্যে অপমান করিয়াছি। ইহাতে আমি সম্রাটের নিকট ক্ষমা চাহিয়া একখানা পত্র লিখিলাম, সেই অবধি সম্রাট আমাকে সর্ব্বদা চস্‌মা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। সাধারণতঃ রাজ-সমীপে চস্‌মা ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই।

রাজদরবারে নিয়ম প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বদাই দস্তানা ব্যবহার করিতে হইবে। আমি একদা হেমন্ত কালে একাকী বেড়াইতে বাহির হই। আমার একান্ত ইচ্ছা দস্তানা খুলিয়া রাখিয়া একটু স্বাধীনভাবে বেড়াই। কিন্তু পাছে সম্রাজ্ঞীর সহিত দেখা হয়, এবং তিনি কিছু মনে করেন এই ভাবিয়া দস্তানার আঙ্গুল কয়টী ফেলিয়া দিয়া উহা পরিধান করিয়া বাহির হইলাম। কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়। আমারও ঠিক তাহা হইল। কিছু দূরে যাওয়ার পরে দুইটী সৈনিক সহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়া কর মর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। আমি ভয়ে আমার হস্তদ্বয় পশ্চাতে লুকাইলাম। সম্রাট বলিলেন "মিস্ হাওয়ার্ড, আপনি কি আমার সহিত কর মর্দ্দন করিবেন না?" আমি প্রায় কাঁদ ২ ভাবে উভয় হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলাম "মহারাজ আমার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছি।" ইহাতে সম্রাট প্রথমে চমকিত হইলেন পরে আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি অত দস্তানার অত আদপ কায়দার ধার ধারে না কিন্তু সম্রাজ্ঞী হইলে মুস্কিল হইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

কাঙ্গাল।

পথের কাঙ্গালে কোলে তুলে নিতে
কেবা আছে প্রভু আর?
কে মুছাবে বল জনম দুঃখীর—
আঁখিজল বেদনার?
দু'হাত পাতিয়া ভিখারীর মত
মাগিনু করুণা-দান,
দিবসের শেষে আসিনু ফিরিয়া
নিরাশায় ম্রিয়মাণ।
আজি এ সাঁঝের আঁধারের আড়ে
তুমি কি লুকায়ে রও?
অবশ পরাণ বাহু পাশে প্রভু
তুলে লও তুলে লও।

শ্রীআশুতোষ রায়।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

সপ্তম প্রস্তাব—অনার্য্য কে? (প্রথম অংশ)

ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথমভাগে লেফটনান্ট কর্ণেল জেমস্ টড সাহেব রাজস্থানের ইতিহাস সঙ্কলন কালে "ছত্রিশ রাজকুলের পরিচয় প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তিনি রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে রাজপুত রাজাদিগের বংশাবলীতে সূর্য্য, চন্দ্র, নাগ এবং অগ্নিকুল ইত্যাদি বংশ পরিচয় থাকিলেও, রাজপুতানার রাজপুত জাতি ভারতের প্রাচীন আর্য্যশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত নহেন পরন্তু তাঁহাদের অনেকেরই ভিতর ভারতের বাহিরের অনার্য্য-শ্রেণীর নানাজাতির শোণিত-সংস্রব ঘটিয়াছে। "ছত্রিশ রাজকুলের" মধ্যে যদু, পুরীহর (প্রতীহার), চালুক্য (সোলাঙ্কী) প্রামার (পরমার), চাহমান (চৌহান), চৌর (পৌর) তক্ষক, জিট (জাট) হুণ, কাটি, বল্ল, এবং ঝালা ইত্যাদি কুলের রাজপুতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ জাতিতে শক বা শিথীয় ছিলেন এবং তাহারা ভারতবর্ষের বাহিরে মধ্য এসিয়ার আমু এবং অকসূস নদীবিধৌত প্রদেশ হইতে সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্ম ও আচার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় ক্ষত্রিয় বর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজপুত জাতি যে প্রধানতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর (মোঙ্গল, হুণ, জিট ইত্যাদি শাখা) শকবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই মত সংস্থাপন করিবার জন্য কর্ণেল টড তাঁহার "রাজস্থান" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথমভাগে অনেক চেষ্টা চরিত্র এবং প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কর্ণেল টডের দ্বারা এই অভিনব জাতিতত্ত্ব প্রচার হইবার পর য়ুরোপের পণ্ডিতেরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজও দেশীয় বিদেশীয় "বৈজ্ঞানিক" ঐতিহাসিকগণ সমস্বরে রাজপুত জাতির অনার্য্য সংস্রবের গীত গান করিয়া আসিতেছেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের বিষয় এখন এদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুরাও মুখস্থ করিতেছে। বিদেশী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে সেই সময় হইতে ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তে একটি গ্রীক রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে সেই রাজ্যের গ্রীকগণের বংশধরগণও এদেশের লোকেদের ধর্ম্ম ও সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে "ক্ষত্রিয়" হইয়া গিয়াছেন। রাজপুত জাতির ভিতর এই জন্য শক এবং যবন শোণিতের অত্যন্ত প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, "আর্য্য অভিযানের" পূর্ব্বে ভারতের নানাস্থানে "দ্রবিড়" নামক এক অনার্য্য জাতির বাস ছিল। এখন দক্ষিণাপথের প্রায় সর্ব্বত্রই দ্রবিড় জাতির বংশধরেরা একরূপ অবিমিশ্রভাবেই বাস করিতেছেন এবং আর্য্যাবর্ত্তেরও অনেক অংশে উচ্চনীচ সকল জাতির ভিতরই দ্রবিড় সম্পর্ক ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার বেহার প্রদেশের পশ্চিম ভাগের অধিবাসিগণের দেহে দ্রবিড় শোণিতের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে আর্য্য, শাক ও যবন শোণিত প্রবাহিত হইতেছে এবং বেহার হইতে পূর্ব্বদিকের ভদ্রাভদ্র সর্ব্বশ্রেণীর মনুষ্যের দেহে দ্রবিড় শোণিতের সহিত প্রাচ্য এসিয়ার "মোঙ্গল" শোণিতের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে আর্য্য শোণিতের অংশ থাকিলেও নিতান্তই অল্প পরিমাণেই আছে। এই সকল পণ্ডিতের মতে পঞ্চনদ প্রদেশের অধিবাসিগণের দেহেই আর্য্য শোণিতের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইতে আর্য্য শোণিতস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে হইতে বেহার প্রদেশেই প্রায় নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে হয়ত হোমিওপ্যাথিক উচ্চ ডাইলুশনের অনুপাতে আর্য্য-শোণিত সংস্রব থাকিতে পারে, কিন্তু

*য়ুরোপীয় মতে গ্রীক (যবন) গণ "আর্য্য" বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পূর্ব্বাংশে আর তাহার চিহ্ন পাওয়াও কঠিন। এই যে মত, তাহা স্বনামধন্য রিজলী প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়া শিষ্যানুশিষ্যক্রমে এদেশের "জাতিতত্ত্ব ব্যবসায়িগণের" সকলেরই হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে। এদেশের যাঁহারা এইমত বেদ-বাক্যের মত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন, তাঁহারা "অব্যবসায়ী" ও "অনধিকার চর্চ্চাকারী" ইত্যাদি অভিধানে আপ্যায়িত এবং অভিনন্দিত হইয়াছেন।

এই প্রবন্ধের তৃতীয়-প্রস্তাবে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে য়ুরোপীয়-পণ্ডিতগণের অগ্রণী ম্যাকস-মুলার "আর্য্য" কথাটিকে "জাতিতত্ত্বের" পরিভাষার অন্তর্গত করেন নাই, পরন্তু তিনি "আর্য্যশোণিত" "আর্য্যকরোটি" ও "আর্য্যকেশ" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের প্রতিকূলে স্পষ্টভাষায় মত প্রদান করিয়াছেন। আমাদের মনুসংহিতা যাঁহাদিগকে "আর্য্যবাচঃ" অথবা "আর্য্য-ভাষাভাষী" বলিয়াছেন, ম্যাক্সমূলার তাঁহাদিগকেই "আর্য্য" বলিতে চাহিয়াছিলেন। পরে কিন্তু, বিদেশী গুরু এবং এদেশী শিষ্যেরা ম্যাক্সমূলারের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা জাতিতত্ত্বের ভিতর আনিয়া খুব গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিয়াছেন। এই সেদিন এক বাঙ্গালী "উচ্চশিক্ষিত" ব্রাহ্মণ সন্তান "বাঙ্গালা ভাষা"র কুলের কথা কহিতে গিয়া "বাঙ্গালী" ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চজাতির কুলজী প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে "বাঙ্গালী জাতি একটি খিচুড়ী,—যাহার ডাল ও চাল উভয়েই অনার্য্য, তবে হয়ত তাহাতে আর্য্য গরম মশলার ছিটা ফোঁটা থাকিলেও থাকিতে পারে।" প্রতিভাবান্ নবীন পণ্ডিতের এই মত নাকি শ্বেতাঙ্গ গুরুগণের নিকট খুব প্রশংসা পাইয়াছে এবং যাঁহার এই মত, তিনি খাস য়ুরোপের-গুরুকুলে গিয়া অধ্যয়নের অধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেও করিয়াছি।

য়ুরোপীয় মত এই যে, দ্রবিড় জাতি এদেশের পুরাতন অনার্য্য এবং শক, হূণ, মোগল ও চীন ইত্যাদি জাতি নূতনাগত অনার্য্য এবং ইহাদের সহিত আসল আর্য্য-জাতির অল্লাধিক শোণিত সংস্রবে ভারতের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (রাজপুত, কায়স্থ ইত্যাদি) প্রভৃতি উচ্চ হিন্দুজাতি গঠিত হইয়াছে। বাল্যকালে আমরা ইংরেজের লিখিত ইতিহাসে পাঠ করিতাম যে আদিম আর্য্যগণ "চাষা" থাকিলেও ভারতবর্ষের সভ্যতা তাঁহাদিগেরই সৃষ্টি এবং আদিম নিবাসী দ্রবিড়গণ অসভ্য এবং বর্ব্বর ছিল;—এখন আবার সেই ইংরেজের ঠিক বিপরীত সুরের গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক বিদ্বদ্‌বর্গের লিখিতগ্রন্থে অথবা (বাঙ্গালী শিষ্য-সম্প্রদায়ের) লিখিত "বৈজ্ঞানিক" ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে আর্য্যগণই নাকি অসভ্য ছিল এবং দ্রবিড়েরাই সুসভ্য ছিল। বাস্তবিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র, কলাবিদ্যা এবং লিপিবিদ্যা নাকি দ্রবিড়দেরই নিজস্ব ছিল এবং পরে আর্য্যেরা উহা হস্তগত করিয়া উহাদের উপর "আর্য্যত্বের" ছাপ এমন করিয়া মারিয়া দিয়াছিলেন যে প্রথমে পণ্ডিতগণ আসল "তত্ত্বকথা" বুঝিতেই পারেন নাই। সম্প্রতি শিল্পশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত ই, বি, হাভেল মহোদয় অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া এই সকল আধুনিক "বৈজ্ঞানিক" বিদ্বদ্‌বর্গের নূতন মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাদের কৌতুহল হয়, তাঁহারা পাদটিকায় উল্লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে অনেক রহস্য দেখিতে পাইবেন।*

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শক, হূণ, চীন এবং দ্রবিড়গণকে অনার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ জাতিগুলি "আর্য্য" এবং ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।

* (1) The History of Aryan Rule in India. (2) Ancient and Medieval Architecture of India. (3) Ideals of Indian Art.

আমরা এইবার সেই প্রবাদের প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে নিন্দিত ক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

(১) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, এবং দ্রবিড় এই (সাতটি) জাতিগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। †

(২) (শাস্ত্র-বিহিত) ক্রিয়ার লোপ এবং ব্রাহ্মণগণের অদর্শন জন্য নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় জাতিগুলি ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন (বৃষল) হইয়াছেন, যথা:—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খস। ‡

উল্লিখিত মনুবচন হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে "দ্রবিড়" এবং "খস" এই দুইজাতি প্রথম এবং দ্বিতীয় এই উভয় প্রকার নিন্দিত শ্রেণীর মধ্যেই পড়িয়াছে।

এই সকল নিন্দিত শ্রেণীর ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ বংশ বা উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যথা:—

(১) যবন—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র (শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর গর্ভজাত) তুর্ব্বসুর বংশে উৎপন্ন। (১)

(২) শক—সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা বৈবস্বত মনুর পঞ্চম পুত্র নরিষ্যন্তের বংশজ। (২)

(৩) দ্রবিড়—পাণ্ড্য, কেরল এবং চোল এই তিন শাখার রাজগণ দ্রবিড় জাতির অন্তর্গত,—ইঁহারাও যযাতিপুত্র তুর্ব্বসুর বংশে উৎপন্ন। (৩)

যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত ষোড়শ (বর্ত্তমান সময়ে দশ) বিধ, বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার করেন নাই, সেই দ্বিজগণকে "ব্রাত্য" বলিয়া শাস্ত্রে নিন্দা করা হইয়াছে।* এইরূপ ভাবে ব্রাত্য অথবা পতিত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মনুসংহিতার

---

† "ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥ ২২॥"

‡ "শণকৈস্তক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাশকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খসাঃ॥ ৪৪॥"

মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়ে। "বৃষল" শব্দের অর্থ "ধর্ম্মহীন"—কিন্তু ক্রমশঃ ইহার অর্থ "শূদ্র"ও করা হইয়াছে। মনুমহারাজ বলিয়াছেন,

"বৃষোহি ভগবান্‌ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতেহ্যলম্‌।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥ ১৬॥"

মনুসংহিতা অষ্ট অধ্যায়।

(১) যদোস্তু যাদবা জাতাঃ তুর্ব্বসোর্যবনাস্মৃতাঃ।
দ্রুহ্যো সুতাস্তু বৈ ভোজা আনাস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ ৩৪॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায় এবং মৎস্যপুরাণ, ৩৪ অধ্যায়, ৩০শ শ্লোক।

(২) নরিষ্যতঃশকাঃ পুত্রা নাভাগস্তু ভারত।
অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভসত্তমঃ॥ ২৮॥
হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, দশম অধ্যায়।

(৩) তুর্ব্বসুবংশে--পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব চোলঃ কুল্যস্তথৈবচ।
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলা স কেরলাঃ॥ ৬

বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায় এবং মৎস্যপুরাণ ৪৮ অধ্যায়, ৫ শ্লোক। মৎস্যপুরাণে "কুল্যঃ" স্থলে "কর্ণঃ" পাঠান্তর আছে।

* দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্‌।
তান্‌ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্যানিতি বিনির্দ্দিশেৎ॥২০
মনুসংহিতা দশম অধ্যায়।

আষোড়শাদ্‌ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রীনাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥ ৩৮॥
অতঃ ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতাব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ ৩৯॥
মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

সময়ে অম্লমর ইত্যাদি সাতটি জাতির পরিচয়ও তাহাদের নিন্দিত হওয়ার কারণ পাওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন অপর ধর্ম্মহীন (বৃষল) ক্ষত্রিয় জাতিগুলির পাতিত্যের কারণ,—অর্থাৎ সর্ব্বজনমান্য ক্ষত্রিয়গণ কেন যে ক্রমশঃ ক্রিয়াহীন হইয়াও ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাইয়া "বৃষল" হইলেন,—তাহার কোন কারণ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অন্যশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইবারে আমরা সেই কারণের নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভারতবর্ষের কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম্মনাশের এক অতিশয় প্রাচীন ঐতিহ্য মহাপুরাণাদিতে বিবৃত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বজন প্রামাণ্য বায়ু ও বিষ্ণু এই দুই মহাপুরাণ এবং মহাভারত (হরিবংশ সহিত) ও রামায়ণ হইতে এই ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলিয়া দিতেছি।

যযাতি মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবযানী-নন্দন যদুর বংশে মাহিষ্মতী পুরাধীশ্বর বিখ্যাত মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের জন্ম হয়। পরশুরামের সহিত বিবাদের ফলে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য এবং তাঁহার অনেকগুলি পুত্র নিহত হইলেও তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি পাঁচ জন রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই হৈহয় এবং তালজঙ্ঘের বংশধরগণ ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া অবশেষে অযোধ্যা আক্রমণ করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশী রাজা "বাহু"কে পরাস্ত এবং তাঁহার কোশলরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ, পহ্লব এবং খশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতির বীরেরা হৈহয়দিগের সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মিলিত সৈন্যবলের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অযোধ্যারাজ বাহু দুই মহিষীর সহিত হিমালয় সন্নিহিত বনে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ সম্ভবতঃ মহারণ্য মধ্যেও মহারাজ বাহুকে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে দেয় নাই এবং অনেক কষ্ট ভোগ করিবার পর তিনি বনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার প্রাণত্যাগের সময়ে মহিষীদ্বয়ের মধ্যে একজন অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। বিপদের সময় বন্ধুও শত্রু হয়,—সুতরাং অন্যা সপত্নী সেই অন্তঃসত্ত্বা মহিষীর প্রাণনাশের জন্য বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার ভিতরও হৈহয় অথবা শকাদি শত্রুর ষড়যন্ত্র ছিল। যাহা হউক, হৈহয়দিগের পরম শত্রু ভৃগুবংশজ ঔর্ব্ব ঋষির আশ্রয়ে বাহু রাজার অন্তঃসত্ত্বা মহিষী নিরাপদে অবস্থিতি করিতে থাকেন এবং ঔর্ব্ব ঋষির আশীর্ব্বাদে সপত্নীর প্রদত্ত বিষ নিষ্ফল হইয়া যায়। যথাসময়ে রাজমহিষী সর্ব্বসুলক্ষণসংযুক্ত এক পুত্র প্রসব করেন; প্রসূত সন্তানের সহিত প্রসূতির পূর্ব্বনীত বিষও বাহির হইয়া যায়। পুত্র বিষ বা গরের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া আশ্রয়দাতা ঔর্ব্ব ঋষি তাঁহার "সগর" এই নামকরণ করেন এবং তিনিই নবজাত কুমারকে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে সংস্কৃত ও শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া অবশেষে উভয় বংশের শত্রু হৈহয়দিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করেন। সগর ক্রমশঃ সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া পিতৃশত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি হৈহয়াদির সাহায্যকারী শক যবনাদি জাতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। পরাভূত শক যবনাদি অবশেষে নিরুপায় হইয়া সগরের কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়া আপন আপন প্রাণ ভিক্ষা করেন। দয়ার সাগর বশিষ্ঠ ঋষি মহারাজ সগরের নিকট শরণাগত বীরগণের প্রাণভিক্ষা করায় রাজা গুরুর বাক্য রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াও স্বকীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা নিবেদন করেন। বশীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া "জীবন্মৃত" করেন এবং সগরকে বলেন যে তাঁহার প্রতিজ্ঞার গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই তিনি উহাদিগকে ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়াছেন। মহারাজ সগরও গুরুর সেই কথা স্বীকার করিয়া লইয়া পরাভূত জাতি সকলের বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলেন। তিনি যবন-

দিগের মাথা সমস্ত কামাইয়া দিলেন, শকগণের মাথার অর্দ্ধেক মুড়াইয়া দিলেন, পারদগণকে লম্বা চুল ও পহ্লব-দিগকে লম্বা দাড়ি রাখিতে বাধ্য করিলেন এবং এই সকল এবং আরও কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতিকে বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্র পাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। *

পৌরাণিক এই ঐতিহ্য মনুসংহিতার অনেক পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। যে সময়ে মহারাজ সগর পরাভূত শকযবনাদি ক্ষত্রিয় জাতির এইরূপ লাঞ্ছনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের দেশগুলির সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা জানিতে কৌতুক জন্মে। মহর্ষি বশিষ্ঠ কি কেবল অহৈতুকী কৃপা মাত্র পরবশ হইয়া উঁহাদিগের প্রাণ ভিক্ষার জন্য মহারাজ সগরের নিকট গিয়াছিলেন, না উহার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক কোন গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল? আমাদের ত মনে হয় যে, বশিষ্ঠদেবের সহিত উক্ত জাতির একটা রাজনৈতিক সম্বন্ধ অথবা সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল এবং আধুনিক রাজনৈতিক সংজ্ঞার আশ্রয় লইয়া বলা যাইতে পারে যে মহারাজ চক্রবর্ত্তী সগরের মহামন্ত্রী বশিষ্ঠদেব শক-যবন-পারদ-পহ্লব ও কাম্বোজ

* বাহোর্ব্যসনিনস্তস্য হৃতং রাজ্যং পুরা কিল।
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ শকৈঃ সার্দ্ধং সমাগতৈঃ ॥১২৭॥
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা।
হৈহয়ার্থং পরাক্রান্তা এতে পঞ্চগণাস্তদা ॥১২৮॥
হৃতং রাজ্যং বশীয়োভিরেভিঃ ক্ষত্রিয় পুঙ্গবৈঃ।
হৃতরাজ্যস্তদা বাহুঃ সন্ন্যস্য স্ব তদা নৃপঃ।
বনং প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা সহপত্ন্যা তপোঽচরৎ ॥১২৯॥

× × × ×

স তেনাস্ত্রবলেনৈব বলেন চ সমন্বিতঃ।
জঘান হৈহয়ান্ ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশুগণানিব ॥১৩৫॥
ততঃ শকান্ স যবনান্ কাম্বোজান্ পারদাং স্তথা।
পহ্লবাং শ্চৈব নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ ॥১৩৬॥

× × × ×

সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাং চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশাম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বঞ্চকার হ ॥১৩৯॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥১৪০॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥১৪১॥
শকা যবন কাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ পারদৈঃ সহ।
কলিস্পর্শা মাহিষিকা দার্ব্বাশ্চোলা খসাস্তথা ॥১৪২॥
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়গণা ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠ বচনাৎ পূর্ব্বং সগরেন মহাত্মনা॥১৪৩॥

বায়ু পুরাণ ৮৮ অধ্যায় এবং বিষ্ণু পুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৩য় অধ্যায়। হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব তৃতীয় অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে "অথৈনান্ বশিষ্ঠো জীবন্ মৃতকান্ কৃত্বা সগর মাহ" ।৪৩. ইহার টীকায় শ্রীধর এক স্মৃতির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন,—

"স্বধর্ম্মাদ্ যঃ পরিভ্রষ্টো বৃদ্ধৈশ্চৈব বহিষ্কৃতঃ।
স জীবন্নেব লোকেঽস্মিন্ মৃত ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ তখনও বহিষ্কার বা Boycott করার প্রথা এরূপ বলবতী ছিল এবং বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে লোকে "জীবন্মৃত" বলিয়া গণনা করিত। এই বিষ্ণুপুরাণ শক যবন পারদ পহ্লব ও কাম্বোজ ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতির এইরূপ লাঞ্ছনার কথা বলিয়াছেন। হরিবংশ স্থানে স্থানে পাঠান্তর ভিন্ন একটি শ্লোকে কতকগুলি অতিরিক্ত জাতির হিসাব দিয়াছেন, যথা—

"খসাং স্তুষারাং শ্চোলাংশ্চ মদ্রান্ কিষ্কিন্ধ্যকাং স্তথা।
কৌন্তলাংশ্চ তথা বঙ্গান্ সাল্বান্ কৌঙ্কনকাং স্তথা ॥২০॥

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বেও এইরূপ ধর্ম্মহীন ক্ষত্রিয় জাতির এক তালিকা আছে। সামান্য কতকগুলি পাঠভেদ মাত্র থাকায় মূল শ্লোকগুলি উদ্ধার করিলাম না।

জাতির রাজ্যের উপর Mandate (শাসনের কর্তৃত্বতার) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন এক যবন রাজার সহিত যে কোন সময়ে বশিষ্ঠ ঋষির একটা সপথ বা সন্ধির সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার আভাস মনুসংহিতা হইতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতার রাজধর্ম্ম বিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে "আবশ্যক কার্য্য উপস্থিত হইলে দেবগণ (পণ্ডিতগণ ? "বিদ্বাংসো হি দেবাঃ"—শতপথ ব্রাহ্মণ) এবং মহর্ষিগণও শপথ করিয়াছেন,—বশিষ্ঠও যবনরাজার সহিত শপথ করিয়াছিলেন।" *

ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে এই শক যবনাদি ক্ষত্রিয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, বশিষ্ঠদেব খুব সম্ভব সেই সকল দেশ হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট কর প্রাপ্ত হইতেন এবং সেই হেতু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে দ্রোণাচার্য্যের অর্জ্জুনপ্রমুখ শিষ্যসংঘ পঞ্চাল রাজ দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রুপদকে পরাস্ত করেন এবং অবশেষে দ্রুপদ বাধ্য হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে স্বকীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দেন। দ্রোণাচার্য্যও পঞ্চাল রাজ্যের এই অর্দ্ধেক হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট কর পাইতেন বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠদেবের সম্বন্ধে যে ঐতিহ্যের কথা আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি বলিতেছি।

পুরাকালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কন্যাকুব্জ (কান্যকুব্জ, কন্যকুব্জ বা আধুনিক কনৌজ) নগরে কৌশিক বংশাবতংশ মহীরাজ বিশ্বামিত্র রাজত্ব করিতেন। একদা মহারাজ বিশ্বামিত্র সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে বাহির হন এবং অবশেষে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব সমগ্র সৈন্য সামন্ত যান-বাহন সহিত মহারাজ বিশ্বামিত্রকে স্বকীয় আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিবার নিমিত্ত উপরোধ করেন এবং রাজা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজা বিশ্বামিত্রের অগণ্য সেনানী সৈন্য বল এবং তাহাদের ভৃত্যবর্গ এবং অগণ্য যানবাহনের হস্তী, অশ্ব ও বৃষভ প্রভৃতি পশুরও অতিশয় আশ্চর্য্যরূপ আতিথ্য ও পরিচর্য্যা করিয়া সকলকে পরম পরিতুষ্ট করেন। বশিষ্ঠদেব যেরূপ ভাবে এই রাজঃঅতিথির পূজা ও আদর করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র স্বয়ং অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কি উপায়ে ঋষি তাহার আশ্রমে এত লোকের এরূপ ভাবে পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হইলেন তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে তাঁহার আশ্রমে দেবগবী সুরভির দুহিতা শবলা নাম্নী কামধেনু বাস করেন,—তাঁহারই প্রসাদে তিনি রাজার আতিথ্য করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া সেই পরমাশ্চর্য্যময়ী গাভীটিকে বশিষ্ঠের নিকট চাহিয়া বসিলেন কিন্তু বশিষ্ঠ কিছুতেই তাঁহার অতিথির প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন না। রাজা বশিষ্ঠদেবকে অনেক বুঝাইলেন, লক্ষ লক্ষ গাভী এবং অন্য অনেক বস্তু বিনিময়ে প্রদান করিবেন বলিলেন, তথাপি ঋষি সম্মত হইলেন না। অবশেষে ক্ষত্রিয়ের রজোগুণ সম্ভূত কাম এবং লোভ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং রাজা বলপূর্ব্বক সেই গাভীটীকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। রাজার মুখ হইতে এই আদেশ বাক্য বাহির হইতে না হইতে তাঁহার ভৃত্যেরা গাভীকে বন্ধন করিল এবং ঋষির আশ্রম হইতে সেই সবৎসা শবলাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। গাভী তাহার বন্ধন রজ্জু ছিঁড়িয়া ঋষির সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি দোষের জন্য তিনি রাজার হস্তে তাহাকে দিতেছেন। গাভীর এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিয়া উহাকে রাজার হস্তে অর্পণ করেন নাই; বিশ্বামিত্র দেশের রাজা ও তিনি বলবাহন যুক্ত ক্ষত্রিয়, তিনি যদি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করিয়া লন,—ব্রাহ্মণের কি সাধ্য যে

* মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্য্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে বৈ যবনে নৃপে ॥১১০॥
অষ্টম অধ্যায়ে।

তাঁহাকে বাধা দেয়? বশিষ্ঠের কথায় শবলার তৃপ্তি হইল না,—তিনি বলিলেন, "সে কি কথা? ব্রাহ্মণের বল ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে একবার আদেশ দিন, এখনই এই দুরাত্মা রাজার সৈন্যবল এবং দর্প-নাশ করিয়া দেই"। বশিষ্ঠ শবলার কথা শুনিয়া বলিলেন, —"তবে তুমি শত্রুর সৈন্যবল নাশকারক সৈন্যের সৃষ্টি কর।"

বশিষ্ঠের মুখ হইতে এই আদেশ নির্গত হওয়ার পর, "সেই শবলার 'হম্বা' রবে শত শত পহ্লবেরা উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখেই তদীয় সৈন্য সমূহ বিনাশ করিতে লাগিল। তখন রাজা বিশ্বামিত্র পরম কোপাবিষ্ট হইয়া ক্রোধ বিস্ফারিত লোচনে বিবিধ শস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত পহ্লব সৈন্যকে নাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র কর্তৃক পহ্লবসৈন্যের ধ্বংস হইল দেখিয়া সেই গাভী শত শত ঘোররূপ যবনমিশ্রিত শকসৈন্য সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর্য্য, স্বর্ণপদ্মের কিঞ্জল্কের ন্যায় বর্ণযুক্ত, স্বর্ণবর্ণ বর্ম্মাবৃত এবং সুতীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী শক-যবন বীরগণের দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং তাহারা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরে মহাতেজা বিশ্বামিত্র নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অস্ত্রের তেজে সেই সকল যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা আকুল হইয়া উঠিল।*"

"মহারাজা বিশ্বামিত্রের অস্ত্রের তেজে সেই সকল সৈন্যবলকে মোহিত (নষ্টচেতন,—পরাভূত) এবং আকুল (পলায়নপর) দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন, "কামধুক্ শবলে, যোগবলে (সৈন্যবল) সৃষ্টি কর।" তাহার হুঙ্কারে সূর্য্যসদৃশ অনেক কাম্বোজ, আপীনদেশ (স্তন) হইতে শস্ত্রধারী বর্ব্বরগণ, যোনিদেশ হইতে যবন, গুহ্যদেশ হইতে শক, রোমকূপ হইতে হারীত ও ম্লেচ্ছসৈন্যসমূহ উৎপন্ন হইল এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের পদাতি, অশ্ব, গজ ও রথ এই চতুরঙ্গ সৈন্যকে সংহার করিয়া ফেলিল।" *

এইরূপ যুদ্ধের পর রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং এই পরাজয়ের ক্ষোভেই তিনি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদের এইরূপে সূত্রপাত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সেই বিবাদ চলিয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে এই বিবাদ সম্বন্ধে বহুতর আখ্যায়িকা হইতে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের চরিত্রের প্রভেদ অতি স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। সেই সকল আখ্যায়িকার সহিত সম্প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। মহা-

* তস্যা হম্বারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ ॥ ১৮ ॥
নাশয়ন্তি বলং সর্ব্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥
পহ্লবান্ নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি।
বিশ্বামিত্রার্দ্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবান্ শতশস্তদা ॥ ২০ ॥
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরান্ শকান্ যবনমিশ্রিতান্।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ ॥ ২১ ॥
প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্য্যৈর্হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসিপট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ ॥ ২২ ॥
নির্দ্দগ্ধং তদ্বলং সর্ব্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ ॥ ২৩ ॥
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্ব্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ ॥ ২৪ ॥
রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৫৪ সর্গ। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

* তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।
ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্ব্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥২॥
যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।
রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ ॥৩॥
তৈস্তন্নিষূদিতং সর্ব্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
স পদাতিগজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন ॥৪॥
রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৫৫ সর্গ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

রামায়ণের এই গল্প মিথিলা রাজবাটীতে জনকের পুরোহিত শতানন্দ কর্তৃক রামকে বলা হইয়াছে,—সেই জন্য "রঘুনন্দন" সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভারতের আদিপর্বে এই শবলা গাভী লইয়া তাঁহাদের বিবাদের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি মূল সংস্কৃত শ্লোক তুলনার সুবিধার জন্য পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল। †

রামায়ণের উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে বশিষ্ঠের সেই কামধেনু শবলার প্রভাবে পহ্লব, শক, যবন, কাম্বোজ, বর্ব্বর, হারীত ও কিরাত এই সাতটি বিভিন্ন জাতির সৈন্যদল সৃষ্ট হইয়াছিল আর মহাভারতের মতে পহ্লব, দ্রাবিড়, শক, যবন, পৌণ্ড্র, কিরাত, সিংহল, বর্ব্বর, খস, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন ও কেরল এই পঞ্চদশ ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও আরও বহুবিধ ম্লেচ্ছ সৈন্য সৃষ্ট হইয়াছিল।

রামায়ণের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে শক এবং যবনগণের বর্ণ "হেমকিঞ্জল্ক সদৃশ ;" [কিঞ্জল্ক শব্দে পদ্মফুলের বীজাধার চক্রকে, চলিত বাঙ্গালায়, 'পদ্মের চাকি' কে বুঝায়, কোন কোন মতে পদ্মফুলের কেশর এমন কি রেণুও বুঝায়, উহা স্বভাবতঃই পীতবর্ণ, এখানে স্বর্ণপদ্মের কিঞ্জল্ক বলায় অতি সুন্দর গৌরবর্ণ বুঝাইতেছে] কাম্বোজগণের বর্ণও "রবিসন্নিভ"—(অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ) এবং তাহারা স্বর্ণবর্ণ বর্ম্মাচ্ছাদিত ও তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশাদি অস্ত্রে সজ্জিত। এই বর্ণনা হইতে কাম্বোজ, শক এবং যবনগণের জাতির ও সভ্যতার একটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। এসম্বন্ধে আমরা পাঠক মহাশয়গণকে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিবাদের হেতুস্বরূপা শবলা গাভীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ইহাকে একটি রূপক বলিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এই "গাভীর" অর্থ রাজ্য এবং একটি রাজ্যের প্রভুত্ব লইয়াই এই বিবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে আমরাও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুবর্ত্তী। আমাদেরও মনে হয় যে বিশ্বামিত্রের মনে বশিষ্ঠদেবের (Mandateর) অধীন প্রদেশগুলি পাইবার লোভ হইয়াছিল এবং তিনি উহা আক্রমণ করিতে গিয়া উক্ত প্রদেশবাসী বীরগণের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সকল বীরজাতি বশিষ্ঠদেবের নিদেশের (Mandateর) অধীন ছিলেন সুতরাং তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় "গো" শব্দে (গচ্ছতি ইতি গোঃ) গরু এবং পৃথিবী উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, তাই রামায়ণ ও মহাভারতের কবি এই অলঙ্কারের লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বশিষ্ঠদেবের নিদেশাধীন রাজ্যকে তাঁহার কামধেনু স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং অলঙ্কারের লোভেই যবনগণকে ঐ গাভীর যোনিদেশ হইতে, শকগণকে শকৃৎদেশ (গুহ্যদেশ) হইতে, পহ্লবগণকে "হম্বা"রব হইতে অথবা পুচ্ছ হইতে (অনুপ্রাসের মিল রাখিয়া) উৎপন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা এই অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছি এবং সেই স্থানটি আর একবার দেখিয়া লইবার জন্য পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি। "যবন" শব্দের হিব্রু ভাষারূপ Javan এবং jon এই উভয়রূপই হইয়া থাকে, * তাহার উল্লেখও পূর্ব্বে করিয়াছি।

† অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্ দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।
যোনিদেশাচ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহূন্ ॥৩৬॥
মূত্রতশ্চাসৃজৎ কাংশ্চিচ্ছবরাং শ্চৈব পার্শ্বতঃ।
পৌণ্ড্রান্ কিরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বর্ব্বরান্ খসান্ ॥৩৭॥
চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হূনান্ স কেরলান্।
সসর্জ্জ ফেনতঃ সা গৌ ম্লেচ্ছান্ বহুবিধানপি ॥৩৮॥
মহাভারত, আদিপর্ব, ১৭৫ অধ্যায় (বোম্বাই সংস্করণ)।

* "প্রতিভা"র গত ফাল্গুন সংখ্যা, ৪৪১—৪৪২ পৃষ্ঠা।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের ঐতিহ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুসংহিতার লিখিত শক যবনাদি জাতির পাতিত্যের হেতু বেশ স্পষ্ট হইয়া পড়ে। মহারাজ সগরের অনুশাসনে বাধ্য হইয়াই এই শক যবনাদি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিগুলি বৈদিক ধর্ম্ম এবং আচার পরিত্যাগ এবং কিম্ভূত কিমাকার বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম এবং আচার পরিত্যাগ করার জন্ম তাঁহাদের আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর সেই জন্যই মনুসংহিতার উক্ত জাতি ব্যূহের "ক্রিয়া লোপ এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু বৃষল বা ধর্ম্মহীন হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে।

প্রবল রাজশক্তির আদেশ অনুসারে রাজ্যের প্রজাগণের পূর্ব্বধর্ম্ম, আচার এবং বেশভূষা পরিত্যাগ ও তৎস্থলে নূতনরূপ ধর্ম্ম, আচার, এবং পরিচ্ছদাদির অবলম্বনরূপ ব্যাপার পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকবার ঘটিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। চীনসাম্রাজ্যের প্রজাদিগের মাথায় লম্বা টীকি (Pig tail= শুকরের লাঙ্গুল অবশ্য নিন্দাসূচক শব্দ) রাখার প্রথাও যেরূপ প্রবল রাজশক্তির আজ্ঞায় হইয়াছিল,—আবার সেদিন সমবেত প্রজাশক্তির উত্থানের ফলস্বরূপ (সেই রাজশক্তিরই বিভিন্ন রূপ মাত্র) প্রবল জনমতের এক আদেশে সকলেরই সেই সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ কাটিতে হইয়াছে। জগতে যখনই কোন প্রবল নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে,—এবং প্রবল রাজশক্তি সেই ধর্ম্মমতের প্রচারের উদ্দেশ্যে—আত্মশক্তির সম্পূর্ণ বিনিয়োগ করিয়াছেন, তখনই সাধারণ প্রজাকে প্রাচীন আচার ব্যবহার বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া "একেবারে নূতন" সাজিতে হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে এক হিন্দুরাই তবু অনেক পরিমাণে পুরাতন ধরিয়া রাখিয়াছেন। সেই ধরিয়া রাখার কারণ এবং তাহার ফলের সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত অবশ্য থাকিবে এবং আছে,—কিন্তু সেই হেতুতেই আজ এই "নবীনের প্রবল অভিযানের" দিনেও প্রাচীন হিন্দুকে লোকে চিনিয়া লইতে পারে। মিসর, গ্রীস, রোম, কাল্‌ডিয়া, বাবের অথবা চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের আর কোথায়ও প্রাচীনের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, শক যবন, দরদ, দ্রবিড়, পারদ, পহ্লব, চীন, কাম্বোজ, খস, ও কিরাত নামক জাতিগুলি ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অন্তর্গত যে একদিন ছিল,—তাহা রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ এবং মনুসংহিতা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ঝল্ল, মল্ল ও নিচ্ছিবি শ্রেণীরাও যে ক্ষত্রিয়বর্ণেরই ব্রাত্য বংশধর ছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আমাদের ঋষিগণের মতে ক্ষত্রিয়বর্ণ আর্য্যগণের মধ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়া থাকেন,—সুতরাং এই জাতিগুলি জন্মতঃ যে ক্ষত্রিয় এবং আর্য্য তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যদি এরূপ স্বীকার করা যায় যে এই সকল জাতির মূল পুরুষ ক্ষত্রিয় এবং আর্য ছিলেন বটে কিন্তু পরে অনার্য্যদেশে গিয়া অনার্য্যবর্ণের স্ত্রীগ্রহণের ফলে তাঁহারাও অনার্য্য হইয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধেও আমাদের ঋষিরা বিচারের একটি মূলসূত্র বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আর্য্য-পুরুষের ঔরসে অনার্য্যা স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই সন্তান গুণবান ও আর্য্যই হইবে কিন্তু অনার্য্য পুরুষের দ্বারা আর্য্যস্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান নিশ্চয়ই অনার্য্য হইবে *। এই মূলসূত্র অনুসারে শকাদি জাতিতে ঋষিদিগের মতে অনার্য্য বলিবার উপায় নাই।

শক যবনাদির কথা বলা হইল বটে, কিন্তু নাগবংশের কথা বলা হইল না বলিয়া আপত্তি উঠিবে। বস্তুতঃ কর্ণেল টড্ হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপীয় মতের প্রত্যেক লেখকই নাগবংশকে একেবারে খাঁটি অনার্য্য ধরিয়া লইয়াছেন। প্রমাণ প্রয়োগের উল্লেখ না করিয়া দ্রবিড় জাতিকে তাঁহারা যেমন সর্ব্বস্থানেই অনার্য্য বলিয়াছেন, নাগবংশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ তাঁহারা নির্ব্বিচারে ও বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে রায় দিয়াছেন। এই পণ্ডিতেরা প্রথমতঃ দক্ষিণাপথকে দ্রবিড়দিগেরই দেশ স্থির করিয়া (অবশ্য কি প্রমাণে, তাহা আমরা জানি না)

* জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।
জাতোহপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
মনুসংহিতা দশম অধ্যায়।

দক্ষিণাপথের বর্ত্তমান অধিবাসীবর্গের আকার, দেহের উচ্চতা এবং বর্ণ, নাসিকার বিশেষ গঠন ও মাথার লম্বা বা চৌড়া ভাব ইত্যাদি জাতিতত্ত্বের বাঁধা কতকগুলি গৎ আওড়াইয়া তাঁহাদের অনার্য্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন কিন্তু "নাগ" দিগের সম্বন্ধে তাঁহারা কোনওরূপ প্রমাণাভাসও দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু "নাগ" শব্দের অর্থে সর্প হইয়া থাকে সুতরাং পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়া লইলেন যে নাগেরা সাপের পূজা করে; আর সাপকে যখন পূজা করিয়া থাকে, তখন তাহারা "অনার্য্য" না হইয়া যায় না—। কর্ণেল টড্ এইরূপ প্রমাণে সূর্য্যপূজকদিগকে সূর্য্যবংশী, চন্দ্রপূজকগণকে চন্দ্রবংশী এবং অগ্নিপূজকগণকে "অগ্নিকুল" বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছেন। তিনি এসিয়ার মধ্যস্থ মরুদেশের শিথীয়গণকে সূর্য্যবংশীয়গণের, মঙ্গোলীয়া ও মানচুরিয়ার মোগলদিগকে চন্দ্রবংশীয়দিগের এবং ইরাণের অগ্নিপূজক "মগি" গণকে অগ্নিকুলদিগের নিকট-জ্ঞাতি স্থির করিয়াছেন; আর জিৎ বা জিট্‌শাখার শিথীয়দিগের ভিতর সাপের পূজক লোক পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের নাগবংশী ক্ষত্রিয়গণকেও তিনি শিথীয় অথবা শক—সুতরাং অনার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সন্ধ্যার পর নগরের উপকণ্ঠে একটি শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে যেমন শত শত শৃগাল "তারস্বরে" চীৎকার জুড়িয়া দেয়,—য়ুরোপের পণ্ডিতমহলেরও কোন একজন প্রাচ্যদেশের একটি বার্ত্তার আবিষ্কার করিলে তৎক্ষণাৎ শত শত প্রতিধ্বনিতে সেই বার্ত্তা অচিরই দেশ বিদেশ ছড়াইয়া পড়ে। তাই, ক্রমশঃ একজনের মুখ হইতে শুনিয়া অপরের আবৃত্তি করার ফলে, অধুনা সকল দেশেই "নাগবংশের" অনার্য্যত্ব প্রমাণিত সত্য তথ্যের ন্যায় স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশের বালকেরাও এই হেতু "নাগ" কথাটি শুনিলেই "নাক" সিটকাইয়া উঠে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা চতুর, তাহারা কবি ৮ নবীনচন্দ্র সেনের "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" (অর্থাৎ রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস নামক কাব্যত্রয়) হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। *।

কবি ৮নবীনচন্দ্র সেন এবং কথাসাহিত্য শিরোমণি ৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মত "সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে খুব আদৃত হইয়াছিল এবং সে জন্য সাহেবদের অনেক ভুল সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। নাগবংশের "অনার্য্য"ত্ব এইরূপ ভুলের একটি উত্তম উদাহরণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের কোথাও "নাগবংশের" মর্য্যাদার হানিকর কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই। আমাদের শাস্ত্রানুসারে নাগগণ ও দেব মনুষ্যাদির সাধারণ পিতা কশ্যপ ঋষি হইতে উৎপন্ন এবং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের উপাখ্যান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সহিত নাগবংশীয় রাজগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিয়াছে *। মহাপুরাণগুলির মতে যে মহাপদ্মনন্দ কলিযুগে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনি নাগবংশীয় (ক্ষত্রিয়) রাজার ঔরসে তাঁহার শূদ্রজাতীয়া রাণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া-

* কবি ৮ নবীনচন্দ্র সেন অতি দুর্লভ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই ভগবদ্দত্ত প্রতিভার বলে যাহা লিখিতেন, তাহাই "অমৃত মধুর" হইয়া উঠিত। তাঁহার কাব্যাবলী বাঙ্গালাদেশে প্রকৃতই অতি আদরের বস্তু। তবে, আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি নিজের স্বভাব, সঙ্গ এবং সেই সময়ের দোষে শাস্ত্রানুশীলন না করিয়াই পৌরাণিক এবং দার্শনিকের উচ্চপদ এবং ইতিহাস না জানিয়াই ঐতিহাসিকের সম্মান চাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিবার সময় যে ত্রুটির আরম্ভ হইল, পরিণত বয়সে "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" রচনায় তাহা আরও পল্লবিত হইয়া উঠিল।

* মহাভারতের আদিপর্বে, সম্ভব পর্বাধ্যায়ে ৯৫ অধ্যায়ে পুরুবংশের সহিত নাগবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্রষ্টব্য। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিষের ফলে অজ্ঞান অবস্থায় গঙ্গাস্রোতে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি নাগরাজ বাসুকির রাজধানীতে গিয়া পড়েন। তথায় নাগরাজ তাঁহাকে তদীয় দৌহিত্রের দৌহিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। রামায়ণেও

ছিলেন। মগধের এই নাগ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, শেষ নাগ অথবা শিশুগণের পুত্র বারাণসী হইতে গিরিব্রজ নগরে আসিয়াছিলেন †। কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস "রাজ-তরঙ্গিনী" গ্রন্থে নাগবংশীয় অনেক রাজার নাম ও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় "নাগ" শব্দে "সর্প" অর্থও হইয়া থাকে, তাই মহাকবি বেদব্যাস রূপকের অলঙ্কার-ময়ী ভাষায় কুরুবংশীয় পরীক্ষিত এবং তৎপুত্র জনমেজয় মহারাজার সহিত নাগবংশীয় তক্ষক রাজার বিরোধের বর্ণনা করিয়াছিলেন। মহাভারতের প্রথম হইতেই নাগবংশের নানাপ্রকার বর্ণনা মহর্ষি বেদব্যাস করিয়াছেন; নাগগণের রাজা, মন্ত্রী, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও প্রাসাদাদির বিস্তৃত উল্লেখ, নাগরাজ বাসুকীর ভগিনীর সহিত ব্রাহ্মণ জরৎকারুর বিবাহ, এবং সেই বিবাহের ফলস্বরূপ আস্তিকের দ্বারায় মহারাজ জনমেজয়ের সহিত নাগরাজের বিরোধের অবসান ও সন্ধি, ইত্যাকার বর্ণনা করিয়া ঋষি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি যথেচ্ছ অলঙ্কারের প্রয়োগ করিলেও পাঠকেরা নাগগণকে কেউটে গোখুরা প্রভৃতি সাপ বলিয়া ভুল করিবেন না। তথাচ, মানুষের বুদ্ধির দোষে ফল বিপরীত হইল; এদেশের পুরাণ-পাঠক পণ্ডিতেরা বাসুকী এবং তক্ষক প্রভৃতি নাগরাজকে এবং সুন্দরী শিরোমণি জরৎকারু, কুমুদ্বতী ও উলুপী প্রভৃতি নাগরাজকুমারীদিগকে সত্য সত্যই ফোঁস্ ফোঁস্ করা ফণাওয়ালা সাপ বলিয়াই বুঝিলেন, আর সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবেরা সেরূপ না ভাবিয়া তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া বুঝিলেও "অনার্য্য" মানুষ বলিয়া বুঝিলেন আর কবি নবীনচন্দ্রপ্রমুখ নবীনের দল "বাহাবা" দিয়া সেই দলেই যোগ দিলেন।

উপরি উদ্ধৃত পৌরাণিক প্রমাণে আমরা দেখিয়াছি যে শক, যবন, দ্রবিড় ও নাগ বংশের লোকদিগকে সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাদিগকে "অনার্য্য" বলা হয় নাই। অতএব প্রশ্ন কথিত "অনার্য্য কে?" তাহা স্থির করিতে গেলে কেবল মুখস্থ করা "শক যবনাদি" বলিয়া নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। 'ম্যাক্স-মূলার "আর্য্যবাচঃ" (অথবা আর্য্যভাষাভাষি) জন সমূহকে যে "আর্য্য" বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এক্ষণে সমগ্র ভূমণ্ডলে আর্য্যভাষার (ইংরাজি মতে) প্রাধান্য হওয়ায় অনেক দেশের লোকই আর্য্যভাষায় ভাষণ করিতেছেন। সুতরাং প্রাচীন "অনার্য্য" জাতি বলিতে এদেশে কাহাকে বুঝাইত, তাহার নির্দ্দেশ সহজ প্রণালী দ্বারা হইতে পারে না।

আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে "ভারতবর্ষের" যেরূপ ভৌগলিক সংস্থান এবং সীমার নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সংস্থান ও সীমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা অতঃপর অনুরূপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমাদের এই প্রস্তাবে পৌরাণিক প্রমাণ অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং হইবে, পরন্তু অতঃপর য়ুরোপীয় প্রমাণও যথামতি উপস্থিত করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

দেখিতে পাওয়া যায় যে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ কুমুদনাগের ভগিনী কুমুদ্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

†. বায়ুপুরাণ, ৯৯তম অধ্যায়, ৩১৫শ শ্লোক।

লোকান্তরে সমাজপতি।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।)

বিদ্যাসাগরের চির-স্নেহের পুত্তলি,
ব্রহ্মণ্যতেজের তাঁর প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ,
বাণীর মন্দিরে রচি অর্ঘ্য অহরহঃ
লভিলা বিশ্রাম আজি! শ্রদ্ধার অঞ্জলি
লয়ে এস বঙ্গবাসী, করিতে তর্পন
ভারতীয় বরপুত্রে! সুধী, বাগ্মী, ধীর,
"নলিনীর" হৃদি-সূর্য্য, বৃদ্ধা জননীর
অঞ্চলের নিধি হায়, অনিন্দ্য শোভন
"সাহিত্যের" উপাসক, দেশাত্ম বোধের
নির্ভীক সাধক শ্রেষ্ঠ, করিলা বরণ
অনবদ্য লোকান্তরে! পড়িল ভাসিয়া
শেষ কীর্ত্তি স্তম্ভ বুঝি শুভ্র প্রাচীনের!
স্মৃতি শুধু যুগে যুগে ফিরিবে কাঁদিয়া
"সাহিত্যের" দিব্যালোকে, করি অন্বেষণ
"সাজি" কোথা পুষ্পামৃতে উঠিছে ভরিয়া
বাগ্দেবীর পদাম্বুজ করিতে চুম্বন!

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

শুভা।

শুভা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল প্রণীত একখানি উপন্যাস ২৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাগজ ছাপা বাইণ্ডিং ভাল। মূল্যের উল্লেখ নাই—অমূল্য।

প্রথমেই—'উপহার'। তিনি যে "আত্মবিস্মৃতা তমসাবৃতা, অবজ্ঞাতা নারীর" উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসখানি উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহাতে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তাহাতে তাঁহাদের "আত্ম বোধ জাগ্রত, আত্মসম্মান পরিস্ফুট, অজ্ঞানান্ধকার" বিদূরীত করিবার যে উপায় তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—জানি না তাঁহারা তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। আমাদের মনে হয় ইহাতে তাঁহাদের আত্ম সম্মানে আঘাত লাগিবে। উৎসর্গের পরই "উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ"। যদিও লেখক আমাদিগকে প্রথমেই সতর্ক করিয়াছেন যে 'শুভা' উপন্যাস; Sermon নহে তথাপি ইহার ভিতর sermon এর অভাব নাই—বরং কিঞ্চিন্মাত্রাধিক্যে কাণ ঝালা পালা হইয়া ওঠে। পাশ্চাত্য সুসভ্য সমাজে নব্য নারী সমস্যা লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছে—ইবসেন, বার্ণাড'স প্রভৃতি ঔপন্যাসিক যে নারী স্বাধীনতা—নারীর স্বতন্ত্রতা ঘোষণা করিয়া সর্ব্বপ্রকার সমাজ বন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করতঃ নারী সমাজে Bolshevism প্রতিষ্ঠার জন্য মসী যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন এই উপন্যাসখানি তাহারই একটী পৃষ্ঠা মাত্র। 'শুভাকে' আমরা কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস বলিব—ইহাকে তো আমাদের সামাজিক উপন্যাস বলিতে পারি না। ইহাতে আমাদের সমাজের চিত্র কি চরিত্র অঙ্কিত দেখি না। ইহার চরিত্রগুলি যতই পড়ি তাহার ভিতর কিছুই তো আপনার বলিয়া মনে করিতে পারি না। এ যেন বিলাতী বায়স্কোপ গ্রামোফনের সম্মিলিত চিত্র দেখছি আর তাদের মুখের বুলি শুনছি। নরেশ বাবু পাশ্চাত্য উপন্যাসের একখানি পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া তাহার নায়ক নায়িকাকে আমাদের দেশী পুরন পরিচ্ছদে সাজাইয়া আমাদের সামে ধরিয়াছেন। তিনি যে "শক্তি এবং আদর্শের ক্রিয়া" দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের সমাজে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নরেশ বাবু বিজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ শিক্ষিত হইলেও বয়সে তিনি এখনও নবীন, এখনও তাঁহার রক্তের উষ্ণতা যায় নাই। বিলাতের নারী সমস্যা সম্বন্ধীয় উপন্যাস তাঁহার মনের ভিতর একটা উৎকট আন্দোলন উৎপাদন করিয়াছে। শুভা এই সকল উপন্যাস অতিমাত্রায় অধ্যয়ন-অজীর্ণতা-প্রসূত স্বপ্নাবেশে দৃষ্ট সমাজের একখানি চিত্র।

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—এই গল্পে কোন আদর্শ চরিত্র রচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি জগৎকে যেমন দেখিয়াছেন তেমনি চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি এ কোন্ জগৎ? এ কি আমাদের জলবায়ু মৃত্তিকার জগৎ না তাঁহার পাশ্চাত্য ভাবোজ্জ্বল কল্পনার জগৎ?

ইংরেজী সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে। প্রতীচ্য হইতে সাড়া না পাইলে আমার আমিত্ব বোধই থাকে না, কাজেই ইংরেজী নভেলের আদর্শেই যে আমাদের দেশে নভেলের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যে দিন হইতে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যে পরিণত করিবার চিন্তা আমাদের মনে আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই সাহিত্যের প্রাণ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। সাহিত্যযশঃপ্রার্থীগণের এখন কেবল এক চিন্তা—কিসে আমাদের সাহিত্যকে পাশ্চাত্যের গ্রহণোপযোগী করিয়া তুলিবেন। নরেশ বাবুর কল্পনার শুভা যে উদ্দেশ্য লইয়া 'ঘরী' নাটক লিখিয়াছিল তিনিও সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার 'শুভা' রচনা করিয়াছেন। এই নভেলের দ্বারা সাহিত্য জগতে একটা স্থায়ী নাম থাকিবে, ইহাতে লোক শিক্ষার সহায়তা করিবে। তাঁহার শুভার মত তিনিও ইবসনের ধাঁচেই লিখিয়াছেন। ইবসেনের নাটকে যে মহত্ব ও গৌরবের আদর্শে তাঁহার চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে সেই শ্রেণীর চরিত্র গৌরবই তিনি উঁহার নায়িকার ভিতর বরং অতি মাত্রায়ই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কথাগুলি তিনি যদি তাঁহার "উপোদ্‌ঘাতে" খুলিয়া বলিতেন তবে তাঁহাকে কতকটা মার্জ্জনার

চোখে দেখিতাম এবং তাহাকে বলিতাম এ বিদেশী পরগাছা আমাদের দেশে রোপণের বৃথা প্রয়াস।

এই উপন্যাসের কেন্দ্র চরিত্র শুভা। তাহার প্রাণের ভিতর একটা দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা—কিসে তাহার জীবন স্বার্থক হইবে—আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবে—এই চিন্তা সর্ব্বদা তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে। কিন্তু লেখক এই স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদার যে চিত্র তাঁহার উপন্যাসে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয়—হে ভগবান, এ উন্নত নারী পাশ্চাত্যেই থাকুক। ঘরের বাহির হওয়াই যদি নারী সমস্যার একমাত্র প্রতিকার হয় তবে ইহা পাশ্চাত্যেরই নিজস্ব থাকুক। আমাদের মাতৃপ্রাণ বাংলা দেশে আর এ অভিনয় দেখাইও না—আমাদের সীতা সাবিত্রীর দেশের সাহিত্যের আদর্শকে আর কলুষিত করিও না। এইবার শুভার এবং সঙ্গে সঙ্গে নরেশ বাবুর কল্পনার একটু পরিচয় দেই। শুভা সামান্য একজন কেরাণির মেয়ে হইলেও আদর যত্নে লালিতা পালিতা। তার বাপ মার অবস্থা ভাল না হইলেও তাকে ইংরেজী স্কুলে পড়াইয়াছেন। শুভা লেখা পড়ায় খুব ভাল, সব বিষয়েই প্রথম প্রাইজ পাইয়া সে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, আর একটী গুণের কথা এইখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয় কারণ এইটা তার ভবিষ্যৎ জীবনে খুব সহায়তা করিয়াছিল। তার কিছু কিছু একটীং অভ্যাস ছিল, স্কুলে প্রাইজের সময় যে action song হয় তাতে সে প্রধান part নিতো। গরীব বাপ মা—অল্প পয়সায় একটী সৎপাত্র পাইয়া শুভাকে পাত্রস্থা করেন। তার আর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না। বিবাহই যে তার কারণ তাও নয়, কারণ বিয়ের পরও শুভা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছে। যাক্—তার স্বামীরও তার সঙ্গে সঙ্গেই পড়াশুনা সাঙ্গ হলো। নিবারণের ধাত বরাবরই যেন কেমন একটু শ্লেষ্মা প্রধান, কেমন যেন নির্ব্বিকার—ভাবের কি প্রাণের চাঞ্চল্য তার ভিতরে বড় বেশী ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে দুজনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ছিল। শুভা একে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা তার উপর তার পড়ার একটা বাতিক ছিল। পাশ্চাত্য স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক কেতাব উপন্যাস পড়িয়া তার মনের ভিতর কেমন একটা অভাব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, গৃহে থাকিয়া স্বামীকে দিয়া তার কিছুই পূরণ হয় না। স্বামী যে প্রথম প্রথম তাকে ভাল না বাসিত তাও নয় কিন্তু তার ভিতর শুভা কোনরূপ প্রাণের সাড়া অনুভব করিত না। স্বামীর যে তার প্রতি আকর্ষণ তার ভিতর সে প্রানের উষ্ণতা একটুও অনুভব করিত না—এ কেবলই দেহের প্রয়োজন।

শুভার ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুর দেবতায় শ্রদ্ধা নাই। পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও বরাবরই তার মন উদার। তবুও তার দিক থেকে বলতে হয় যে শুভা তার গৃহের ভিতরেই—গৃহিণী জীবনের ভিতরেই তার জীবনের আদর্শ গড়িয়া তুলিবার জন্য যে সে একেবারে চেষ্টা করে নাই তা নয়। উদ্দাম মনকে শান্ত সংযত করিবার জন্য, বিদ্রোহী হৃদয়কে দমন করিবার জন্য সে যে একেবারে সংগ্রাম করে নাই তাও বলিতে পারি না। যার দোষেই হউক শেষটা শুভা বুঝিতে পারিল যে এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর হইতে—বিবাহিত জীবনের ক্ষুদ্র পরিবার ত্যাগ করিয়া "ঘরের বাহির" না হইলে তার জীবনের সার্থকতা লাভ হবে না। শুভাতো কখন ঘরের বাহির হয় নাই—কোথায় যাবে, কে তাকে আশ্রয় দিবে এই চিন্তা তাকে ক্ষণিকের জন্য ব্যথিত করিয়া তুলিল। এমন সময় তাদের বাড়ীর পাশের একটী বড় লোকের বাড়ীর ছাদে একটী যুবকের সঙ্গে তার চোখে চোখে মিলন হইল। আর শুভার কর্ত্তব্য স্থির করিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইল না। শুভা ভাবিল তার রূপ আছে, যৌবন আছে, তার খাইবার ভয় কি! ঘরে থাকিলেও স্বামীর নিকট শরীর বেচিয়া খাইতে হইবে, বাহিরেও না হয় তাই হইবে।" তবে স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটাকে সার্থক করিবার সুযোগ চাই। তার পরদিনই শুভা ঐ যুবকের আশ্রয়ে জীবনের স্বার্থকতা লাভের আশায় "ঘরের বাহির" হইল—ক্ষুদ্র গৃহের বেষ্টনী হইতে একেবারে বিশ্বজগতে ঝাঁপ দিল। দৈবচক্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া—নগেন তার জন্য তার ফরমাস মত একটা

হিজিবিজি বাড়ী ঠিক করে ট্যাক্সি নিয়ে তার জন্য রাজপথে অপেক্ষা করবে কথা ছিল; নগেনকে না দেখতে পেয়ে শুভা একেবারে এক থিয়েটারের গ্রীণরুমে গিয়ে হাজির। তারপর Kalidescope এর চিত্রের মত ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে শুভা কি যে দ্রুত প্রবাহে 'আত্মমর্য্যাদা' 'আত্মপ্রতিষ্ঠার' দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তা ধীর স্থীরভাবে নিরীক্ষণ করে কার সাধ্য! তবে মধ্যে মধ্যে নায়ক নায়িকার বক্তৃতা আর এই অভিনব "স্বাধীনতা "লাভের আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার" প্রণালী দেখিয়া পাঠককে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। এই থিয়েটারের গ্রীণরুমে পরপুরুষের হস্তস্পর্শে কম্পিতা ঈষৎ চকিতা শুভা তার দুদিন পরেই পুলীশ কোর্টের কি যেন একটা declaration লইয়া উপস্থিতা। থিয়েটার হইতে শুভা উহার একটী অভিনেত্রী চাঁপার সঙ্গে তার বাড়ীতে আসিয়াছে। চাঁপা তাকে আদর যত্নে রাখিয়াছে কিন্তু শুভার তা ভাল লাগছে না। পরের গলগ্রহ হইয়াই যদি জীবন কাটাতে হয় তবে সে ঘরের বাহির হইল কেন? অবশেষে ঠিক হইল শুভা গান-বাজনা শিখিয়া থিয়েটারে একটীং করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করবে। কিন্তু যদি স্বামী সন্ধান পেয়ে তাকে ধরে নিতে আসে,—তাই শুভাকে পুলীশ কোর্টে গিয়ে একটা declaration করে আসতে হবে যে সে "স্ব-ইচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।" শুভার একবার মনে হইল হয়ত চাঁপার উদ্দেশ্য ভাল নয়, সে হয়ত তাকে দিয়ে একটা লাভবান ব্যবসা করিতে চাহিতেছে।" শুভার প্রাণ একবার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল—পর মুহূর্ত্তেই সে ভাবিল—বেশ্যা বৃত্তিতে এত ভয়ের কারণ কি! শরীর বেচিয়া খাইলে এমন কি অপরাধ! তবুতো স্বাধীন হইব। এ কথা তো হিসাব করিয়াই ঘরের বাহির হইয়াছি, ইহাতে আর ভয় কিসের। শুভা স্থির করিল বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয় করবে—এই যখন স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় তখন এ দরখাস্ত সে করিবে।" তার পরদিনই শুভা পুলীশকোর্টে গিয়ে ঐ মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়া আসিল। পাঠক চমকিয়ে উঠিবেন না। ইহার একটীও আমাদের নিজের কথা নয়—এ নরেশ বাবু নাকি সমাজে নারী-চরিত্র যেমন দেখিয়াছেন এবং তাদের মুখে যে সব কথা শুনিয়াছেন তাই আমাদের দেখাচ্ছেন আর শুনাচ্ছেন'! মনে রাখিবেন তিনি ভূমিকায়ই বলিয়া রাখিয়াছেন যে তিনি যেমন দেখিয়াছেন তেমনি বিচিত্র করিয়াছেন। কেবল জিজ্ঞাস্য কোথায় দেখিয়াছেন?

যাক্ এইবার শুভার থিয়েটারের জন্য শিক্ষার পালা আরম্ভ হইল। চাঁপা তাকে গান বাজনা একটিং শিখাইল, আরো তাকে শিখিতে হইল কয়েকটা আবশ্যকীয় বিষয়—"বেহায়াপনা নির্লজ্জতা আর গ্রীনরুমে এবং সিনের আড়ালে শুচিবাইটা ত্যাগ করা"। এই যে গেরস্ত ঘরের বউর পর পুরুষের ছায়া দেখলে চম্কে ওঠা, একটা বেয়াড়া রকমের ইয়ার্কি শুনলে শরীর অসাড় হয়ে আসা এ সব "শুচিবাই" তাকে ছাড়তে হবে, "শরীর মনের সুড় সুড়ি" ভাঙ্গতে হবে। সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে শুভা যখন বুঝলো যে তাকে এখন কিছুদিন সোজাসুজি বেশ্যাবৃত্তি করিয়া তার "শরীর ও মনের সুড়সুড়ি" ভাঙ্গতে হবে তখন সে তার নিজের ঘরে ফিরে একটু কেঁদেছিল। আবার যখন চাঁপা তাকে তৈরী ক'রে এলবার্ট থিয়েটারের ম্যানেজার সুরেশবাবুর হাতে সমর্পণ করতে যাচ্ছে তখনও দেখিতে পাই, শুভা মনের দুঃখে রাতটা কেঁদে কাটালো যে একটা তুচ্ছ ঘৃণিত শরীর-সর্ব্বস্ব বেশ্যা হয়ে জীবন শেষ করিব। শুভাকে বুঝিলাম কিন্তু এইখানে নরেশবাবুকে বুঝিতে একটু খটকা লেগে গেল। যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি শুভাকে ঘরের বাহির করাইয়াছেন সে অবাধ স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা লাভের আসন্ন সুযোগের মধ্যে শুভার মনে তিনি ক্ষণিকের জন্য এ দুর্ব্বলতা এ বিদ্রোহী ভাব আনিলেন কেন? নরেশবাবু নাকি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন নূতন ধরণের culture শিক্ষা দিবেন পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার culture এর গভীরতা নিরূপণ করিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই উপন্যাসখানি পাঠ করেন তবে তিনি যেন আমাদের এ প্রশ্নটার উত্তর দেন। আমি বলি নরেশবাবু এখানে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সংকল্প করিয়া লেখনি ধরিয়াছেন যে এ গল্পে আদর্শ

চরিত্র রচনা করিবেন না। তাই তাঁর কল্পনার আদর্শ থেকে শুভাকে একটু খাটো করিয়াছেন। সদা ভয় পাছে শুভাকে একেবারে Saint করিয়া গড়িয়া না তোলেন!

মোটের উপর কথাটা এই যে শুভা রাতটা কেঁদে কাটালো। প্রাতে একটু বেলায় উঠিয়া শুভা জানালার ভিতর দিয়া যেই রাস্তার দিকে তাকাইয়াছে অমনি হঠাৎ নগেন তার চোখে পড়িল। তখন পর্য্যন্ত শুভা নগেনের নাম পর্য্যন্ত জানে না। নগেন ইঙ্গিত মাত্র উপরে গেল, শুভা সবেগে "তার দুটী হাত চাপিয়া ধরিল, নগেন তাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া 'চট' করে চুম্বন করিল—শুভা আগা গোড়া লাল হইয়া উঠিল কিন্তু তার হৃদয়ে বিদ্রোহের কোন চিহ্নও দেখা গেল না।" তার পরদিনই দেখিতে পাই যে শুভা চাঁপার প্রস্তাবে বড় অপমান বোধ করেছিল, সেই শুভা নগেনের প্রণয়িনী হইয়া স্বৈরিণী জীবনের আনন্দের সম্ভোগের একটা তীব্র নেশায় একেবারে মশগুল। নগেনের এ নিভৃত বাড়ীতে শুভার জীবন তিনদিন মাত্র, তাই পাঠক অল্পেই অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের ভিতর যত কিছু বীভৎস ও কুরুচির চিত্র সমাবেশ করা সম্ভব, লেখক তার কিছুই ক্রুটী করেন নাই। প্রথম দিনের সন্ধ্যার পরের একটু ছবি আপনাদের সাম্নে উপস্থিত করতে চাই। আমরা সেকেলে ধরণের—সংস্কার ছাড়তে পারি না—তাই কেমন বাধ বাধ বোধ হয়। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। নগেনের বাপ মা ভাই স্ত্রী সব আছে, কাজেই তাকে শুভাকে ফেলে বাড়ী যেতে হয়েছে। শুভা একাকী বিরহ-ক্লিষ্টা। "আজ তার যেটুক বাধিয়াছিল, নগেনেরও বাধিয়াছিল" যার জন্য আজকার এই সন্ধ্যাটা যেন ব্যর্থ বলে বোধ হচ্ছিল "আড়সীর" সাম্নে দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে এই নিস্ফল সন্ধ্যার জন্য অনুতপ্তা শুভা যখন "আগামী কল্যের স্বপ্ন দেখছিল তখন যতই তার অনাবৃত দেহের সৌষ্ঠব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হ'তে লাগলো ততই তার মন নগেনের সম্ভোগ লিপ্সায় মশগুল হইতে লাগিল।" "এইবার শুভা জীবনের প্রকৃত আস্বাদ পাইল। আজ সে তাহার শরীরের শিরায় শিরায় আপনার জীবন সার্থক বোধ করিল।" তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়া লেখকের লেখনীও ধন্য হইল। তার কতক দিন পর—তখন শুভা নগেন হইতে ঘটনাচক্রে দূরে—তার মনে হইল সে অন্তঃস্বত্বা। অমনি পেটের সন্তানের ভার লওয়ার জন্য নগেনকে চিঠি লিখিবার চিন্তা তার মনে উদয় হইল। লেখক পাঠকের মনের সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। তবুও বলিতে হয় যে নগেনের সঙ্গে শুভার যে সম্বন্ধ তাহার ভিতরেই শুভার চরিত্রের যা একটু মাধুর্য্য ফুটিয়াছে। আর নগেনকে হাতে পাইয়াও তার গৃহশান্তি নষ্ট করিবার ভয়ে নগেনের সরলা বালিকা স্ত্রীর কথা মনে করিয়াই শুভা যে তার চঞ্চল মনকে অন্যদিকে ফিরাইতে পারিয়াছে, তাতে তার প্রতি একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

শুভার জীবনের আরম্ভ যতই আড়ম্বরপূর্ণ না হউক, তাহার উপসংহার নেহাৎ মামুলী ধরণের হইয়াছে—ইংরেজী শিক্ষার ফলে মাদার ক্রিশ্চিয়ানের নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তর সেবাকার্য্যে আত্ম নিয়োগ। মাঝখানে পাহাড়ী মেয়ে মৈনীর ভিতর তিনি যে আত্ম নির্ভরতা ও কর্ম্মপ্রবণতা দেখাইয়াছেন তাহা অনেক পাড়াগাঁয়ের বঙ্গ বিধবার মধ্যেও দেখা যায়। তবে তাহাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ যে চা বাগানের 'বাবু' হইয়া আসিতেছে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করা অবশ্য অনুমোদন করে না। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্যই ব্যভিচারকে সমর্থন করা, স্বাধীনতার নামে ব্যভিচারকেই আদর্শ বলিয়া ধরা। ব্যভিচারের প্রতিদণ্ড বিধান অনেক স্থলে লোকপীড়ন হয় সন্দেহ নাই কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব যতদিন থাকিবে তার নীতিজ্ঞান বা বিবেকবোধ যতদিন থাকিবে ততদিন ইহা হওয়া অনিবার্য্য। চাঁপা বেশ্যার মেয়ে এবং থিয়েটারেই জীবন কাটাইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার পুনরায় পতির অনুগমন করাতে তাহার ভিতর গৃহস্থ নারী চরিত্র একটু ফুটীয়াছে।

এই খানেই আমরা সংক্ষেপে "শুভার" সমালোচনা শেষ করিলাম। উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমালোচনা অনাবশ্যক। তথাপি গ্রন্থকার উচ্চশিক্ষিত একজন "ডাক্তার" তাঁহার মত লোক যে কুৎসিত কল্পনায়

কত গভীর গর্ত্তে নিপতিত হইতে পারেন তাহা বাঙ্গালি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্যই আমাদের এই ক্ষীণপ্রয়াস মাত্র। ভরসা করি ডাক্তার নরেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

আজ প্রায় দুইমাস হইল এই সমালোচনা লিখিত হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে ইহা মুদ্রিত করা হয় নাই। গত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে "শুভা" সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। রামানন্দ বাবু গোঁড়া ব্রাহ্ম "নারী" স্বাধীনতা' শুনিলে তাঁহারা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠেন। তার জন্য আমরা ও কতকটা প্রস্তুত থাকি কিন্তু এমন কুৎসিত কল্পনাকে যে তিনি একেবারে আদর্শ বলিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিবেন এ ধারণা আমাদের ছিল না। আমাদের একজন বিলাত প্রত্যাগত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বলিলেন বোধ হয় রামানন্দ বাবু নিজে এ বিষয় কিছুই জানেন না। আজকাল নাকি অনুরোধ উপরোধেই এই সব সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। রামানন্দ বাবু অতঃপর কি বলেন জানিবার জন্য আমাদের একটু কৌতূহল থাকিল।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

দীর্ঘ নিশ্বাস।

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুসরণে)

(১)

অন্তর অস্থির, নয়নে নাহি ঘুম, হায় কি বিচ্ছেদ, জীবন যায়!
তার সেই মুখখান, তারি সে এলো চুল, দেখতে একবার হৃদয় চায়!
কই সেই কৈশোর, পুলকে ভরা বুক, স্বপ্নে ভরপুর দোঁহার প্রাণ!
যৌবন যায়-যায়, তবুও বঁধুয়ার নয় তো ভুলবার প্রেমের দান!

(২)

হর্ষের চুম্বন কত না নিশিদিন, শিউরে উঠতাম, ব্যাকুল মন!
আজ খুব হল্-দিল্, কাঁদি যে নিরাশায়, দাও গো দর্শন আপন জন!
অশ্রু উৎসব চলিছে অবিরল, হায়, এ-দুঃখের কোথায় শেষ!
অন্তর কাঁদরায় সুষমা-পিপাসায়, চিত্তে কই সেই সুখের লেশ!

(৩)

কাক-পক্ষ কুন্তল-সুবাসে আজো প্রাণ হয় যে চঞ্চল দর্শন বায়!
সেই প্রেম-পর্শন জীবনে থাকবেই, আজকে তার রূপ ভুবন ছায়!
মঞ্জুল সঙ্গীত শোনাবে কবে আর,—মর্ত্ত্যে স্বর্গের আবির্ভাব!
যৌবন নিঃসাড়, এসগো দেখা দাও, দাও গো চুম্বন চরম লাভ!

(৪)

বক্ষের উন্মেষ, চাহনি-ভরা প্রেম, হাস্ত দিনরাত, নিটোল রূপ!
কই সুখ-উচ্ছাস, পীরিতি, অনুরাগ,—পুড়ছে পাঁজরায় দুখের ধূপ!
প্রাণ-ভোর্ বিশ্বাস, ভুলিতে পারি কই, মূর্ত্তি উজ্জ্বল হৃদয়-মাঝ!
দর্শন চাই কের্, চাহি সে হাসি প্রেম, হোক্ না গর্জ্জন, পড়ুক বাজ!

(৫)

অন্তর ফাঁক মোর পূরাবে প্রিয়া তোর, মিলবে সত্যই আলিঙ্গন!
তুল্-তুল্ গালটুক হবে তা লালে-লাল, আঁকবো চুম্বন জীবন পণ!
সেইদিন ভরসায় হতাসা-যাতনায় চলছে দিনরাত পূজার ধূম!
বিহ্বল চঞ্চল হৃদয়ে বড় দুখ, আজকে নিঃশেষ প্রাণের ঘুম!

(৬)

পূর্ব্বের মনটুক কোথা যে গেছে আজ, দ্যায়না ঝঙ্কার প্রাণের তার!
ক্রন্দন আপসোস্ ছেয়েছে সারা প্রাণ, জমছে দিনদিন নয়ন-ধার!
সুন্দর চৌদিক আকাশে হাসে চাঁদ, গাইছে পিক আজ চমৎকার!
প্রাণ মন উন্মন তথাপি হতাশায়, হাল্কা হয় কই বুকের ভার!

(৭)

আজ মোর সংসার কেবলি আঁধিয়ার, করছে গর্জ্জন মেঘের দল!
বৃষ্টির নির্ঝর, বাতাসে হা-হুতাস, নামলো হায় হায় ভীষণ ঢল!
অন্তর-প্রান্তর ডুবালো আঁখিজল, ডাকলো বাণ আজ, ছাপায় কূল
দুস্তর দুঃখের হোলোনা অবসান, ভাঙলো কই মোর মনের ভুল!

(৮)

সংসার চলছেই, কেহ তো বসে নাই, দুঃখ বুঝবার মানুষ কই!
ক্রন্দন করতেই এসেছি দুনিয়ায়, আজ এ-বিশ্বের কেহই নাই!
লজ্জার নিন্দার নিয়ত ধারি ধার, চাই যে সম্মান, কাজের যশ!
নিত্যই মিথ্যার করেছি সেবা খুব, ব্যর্থ শঙ্কার ছিলাম বশ!

(৯)

নিষ্ঠুর লোক-মত, গড়া এ লোকাচার, শাস্ত্র নির্দ্দয়, বেহুঁস্ সব!
ধ্বংসের পন্থায় চলেছে এই জাৎ, পূজ্য আজ তাই জরদগব!
সত্যের বন্দন করে না কোনো জন, মূর্খ বামনের টিকির মান!
বন্ধন কাটবার কোথা সে হাতিয়ার, সত্যি জাৎটার বধির কান!

(১০)

বিচ্ছেদ-দুঃখের কিনারা কর আজ, বন্ধু, একবার দেখাও পথ!
প্রাণ মন উপ্ড়াও, নতুবা দেখা দাও, দলতে হয় হোক্ সমাজ-মত!
সয় কই এই সব বেদনা ব্যথা দুখ, হায় এ-বিচ্ছেদ কোথায় সয়!
তোর সেই মুখখান তোরি সে এলো চুল ছুঁড়বো নিশ্চয় জীবনময়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

খারমিডিস্ ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বল্লাম, "তা বই কি।"

সে কহিল,"তবে ঠিক জেনো যে,বর্ত্তমানে সকলের চেয়ে সমবয়কে সে,বেশী সংযত—এবং অন্যান্য বিষয়েও—যার বয়স তার হয়েছে, তাতেও—কারও চেয়ে হীন নহে।".

আমিও কহিলাম, "এটা খারমিডিস্ সঙ্গত বটে যে, তুমি এই সকল বিষয়ে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে; কারণ এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে এমন ত কারুরে আমি জানি না, যিনি সহজেই এথেন্সের পরিবার (১) সকলের মধ্যে এমন আর দুইটী পরিবার দেখাইতে পারবেন, যারা একত্র মিলিত হয়ে, তুমি যে দুই পরিবার হতে জন্ম নিয়েছ তার চেয়ে অধিক সুন্দর এবং অধিক উৎকৃষ্ট সন্তান সম্ভবমত উৎপাদন করতে পারে। তোমার পিতৃকুল ড্রপিডাসের (Dropidas) পুত্র ক্রিটিয়াসের বংশ এবং এই বংশ সৌন্দর্য্যে এবং ধর্ম্মে এবং অন্যান্য গণনীয় সৌভাগ্যসম্পদে (২) এমনই বিশিষ্ট ছিল যে, এনাক্রেওন এবং সোলোন এবং অন্য বহু কবির প্রশস্তি-কাব্যে স্তুত হয়েছে; আর তোমার মাতৃকুলও তেমনই প্রসিদ্ধ; তোমার মামা প্যুরিলাম্পেস্ (Pyrilampes) যখন যখন রাজপ্রতিনিধি হয়ে সেই বড় রাজার (৩) কিংবা মহাদেশস্থ (৪) অন্য কোন রাজার নিকট গেছেন, তখন তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর এবং অধিক বিশাল কোন লোক মহাদেশে দেখা যায় নাই; এবং এই সমগ্র পরিবারটীও অন্যটী হইতে কোন বিষয়েই হীন নহে। এমন দুইটী পরিবার হতে সঞ্জাত তোমার পক্ষে সকল বিষয়েই প্রথম হওয়া সঙ্গত। এবং হে প্রিয় গ্লোকন-পুত্র, আকৃতির দৃশ্যমান অংশে তুমি তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কারও চেয়ে কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট বলে আমার মনে হয় না। যদি সংযম বিষয়েও এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়েও তুমি যথাযথরূপে সঞ্জাত হয়ে থাক, তা হ'লে,—আমি বল্লাম—হে প্রিয় খারমিডিস্, ভাগ্যবান্ তোমাকেই তোমার জননী প্রসব করেছিলেন। কথাটী হচ্ছে এই :—যদি, এই ক্রিটিয়াস্ যেমন বল্লে—তুমি এরই মধ্যে সংযমের অধিকারী হয়ে থাক এবং যথার্থরূপে সংযমী হয়ে থাক, তবে, ট্সাল্-মক্সিসের কিংবা হ্যপারবরেয়াসের আবারিসের (৫) মন্ত্রসকলের আর তোমার কোন প্রয়োজন নাই, বরং খালি মাথার ঔষধটী তোমাকে এখনই দিয়ে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু যদি তোমার সে সব গুণের অভাব রয়েছে প্রতিপন্ন হয়, তবে, ঔষধটী দিবার আগে মন্ত্রপ্রয়োগ করতেই হবে। এখন তুমি নিজেই আমায় বল দেখি, এর (ক্রিটিয়াসের) কথায় তুমি সায় দেও কিনা এবং নিজেকে প্রকৃতরূপে সংযমের অধিকারী বলে মনে কর না, অনধিকারী ?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্লে খারমিডিস্কে প্রথমতঃ আরও সুন্দর দেখালো—কেন না, তার ও বয়সে লজ্জাটী মানালো বেশ—এবং তার পর সে (যা) উত্তর করলে, (সেটীও) সম্ভ্রান্তবংশের অনুপযুক্ত নয়। সে বল্লে যে,(তাকে) যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হঠাৎ উপস্থিত সময়ের মধ্যে সে সব বিষয়ে সায় দেওয়াও সহজ হতে পারে না—অস্বীকার করাও না। সে বল্লে, 'যদি আমি সংযমী নই বলে বলি, তবে সেটা—নিজের পক্ষে নিজের এরূপ একটা কথা বলা—সব সময়েই অস্বাভাবিক, আর তাতে অবশ্যই এই ক্রিটিয়াস্কে এবং অন্যান্য অনেককেও—যাদের কাছে আমি সংযমী বলে খ্যাত, তাদিগকে—মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে, কেন না উনি আমাকে ঐরূপই বলে থাকেন; আর যদি বলি 'হাঁ', তাহ'লেও নিজের প্রশংসা করা হবে এবং হয়ত সেটা একটা বেয়াদবি হবে। কাজেই আপনাকে জবাব দিবার আমার কিছু নাই।'

আমি বল্লাম, 'খারমিডিস্, আমায় তুমি ঠিক জবাবই দিয়াছ।' আমি আরও বল্লাম "আমার কিন্তু মনে হয়,

(১) মূল oikia = house, family, গৃহ, পরিবার, বংশ। (২) মূল eudaemonia. (৩) পারস্যের রাজা। (৪) এশিয়ায়।

(৫) Abaridos toy Hyperboreoy.

আমি যা জানতে চেয়েছি সেই জিনিষটা তোমার আছে কি না, সেটা একসঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত, যাতে, করে, তুমিও যা বলতে না চাও তেমন কিছু বলতে বাধ্য না হও, আর আমাকেও না জেনে শুনে চিকিৎসা আরম্ভ করতে না হয়। যদি তোমার পসন্দ হয়, তবে আমার ইচ্ছা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু বিচার করি; আর তা যদি না হয়, তবে থাক্।"

কিন্তু সব চেয়ে আনন্দের বিষয় হলো যে, সে বল্লে, "পসন্দ হয়। আর এ বিষয়েতে আপনি যে ভাবেতে বিচার করাটা ভাল মনে করেন, তাই করুন।"

আমি বল্লাম, "আমার মনে হয়, এ বিষয়ের বিচারটা এই ভাবে করলেই সব চেয়ে ভাল হয়। এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে, যদি তুমি সংযমের অধিকারী হয়ে থাক, তবে সে জিনিষটার সম্বন্ধে তুমি একটা মত প্রকাশও করতে পার। যদি এই জিনিষটা তোমাতে বর্ত্তমান থেকে থাকে তবে, বর্ত্তমান রয়েছে বলেই তার একটা অনুভূতিও তোমার হতে বাধ্য, যার থেকে সংযম জিনিষটা কি এবং কি প্রকার সে সম্বন্ধে একটা ধারণাও তোমার জন্মাবে। না, এটা তুমি স্বীকার কর না?"

সে বল্লে, "স্বীকার করি বই কি?"

আমি বল্লাম, "তুমি যা স্বীকার করছ, তার অর্থ কি এই নয় যে, যেহেতু তুমি গ্রীক্‌ভাষা কইতে জান, সুতরাং সেই জিনিষটা তোমার কাছে কেমন লাগে তাও তুমি বলতে পারবে?"

সে বল্লে, "বটেই ত।"

আমি বল্লাম, "সংযম তোমার আছে কিনা এইটা যাতে আমরা বুঝতে পারি, সেই জন্যে, বল দেখি, তোমার মতে সংযম তুমি কাকে বল?"

সে প্রথমে ইতস্ততঃ করতে লাগলো এবং জবাব দিতে মোটেই তার ইচ্ছা হলো না। তার পর সে বল্লে, যে, মনে হয় যেন, সংযম অর্থ সব কাজই সুশৃঙ্খল ভাবে এবং ধীর ভাবে করে যাওয়া—রাস্তায় হাঁটা, কথাবার্ত্তা বলা এবং অন্যান্য সব কাজও এই ভাবে করা। বল্লে, আমার আরও মনে হয়, আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন, সংক্ষেপতঃ সেটা একপ্রকার ধীরতা (১)।

আমি বল্লাম, "এটা অবশ্যই তুমি ভালই বলেছ। কেউ কেউ অবশ্যই, হে খারমিডিস্, ধীর এবং শান্ত যারা তাদিগকেই সংযত বলে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, এ কথার কোন সারবত্তা আছে কি না। আমায় তুমি বল দেখি, সংযম জিনিসটি কি সুন্দর বস্তু-সকলের কোন-একটী?"

সে বল্লে, 'নিশ্চয়ই'।

"লেখকের বেলায় তবে কোন্‌টা সব চেয়ে ভাল, অক্ষরগুলি তাড়াতাড়ি লেখে যাওয়া, না, ধীরে ধীরে?"

"তাড়াতাড়ি।"

"পড়বার বেলায় কি? তাড়াতাড়ি পড়ে যাওয়াটা, না, ধীরে ধীরে?"

"তাড়াতাড়ি।"

"আর ক্ষিপ্রতার সহিত বীণা বাজানো এবং চতুরতার সহিত কুস্তি করতে পারা মন্থর ভাবে এবং ধীরে ধীরে ঐসব কাজ করার চেয়ে ঢের ভালো?"

'হাঁ'।

"ঘুষাঘুষির বেলায় এবং হস্তাহস্তি মল্ল ক্রীড়ার বেলায় তবে কি? এইরূপই নয় কি?"

"অবশ্যই।"

"দৌড়ানো এবং লাফালাফি এবং অন্যান্য সমস্ত শারীরিক ব্যাপারের বেলায়,—যেগুলি অনায়াসে এবং তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় সেগুলিই প্রশংসনীয়, আর যেগুলি কষ্টের সহিত এবং মন্থরভাবে সম্পন্ন হয় সেগুলিই নিন্দনীয়?"

"এমনই ত মনে হয়।"

আমি বল্লাম, "আর এটাও অবশ্যই আমাদের মনে হয় যে, দেহ সম্বন্ধে মন্থরতা নয়, পরন্তু খুব বেশী ক্ষিপ্রতা এবং তীক্ষ্ণতাই সব চেয়ে সুন্দর; নয় কি?"

(১) মূল hesychiotes = তুষ্ণীভাব।

"অবশ্যই।"

"আর সংযম যে, সে একটা ভাল (১) জিনিস ?"

"হাঁ।"

"তা'হলে এখন, দেহ সম্বন্ধে ধীরতা নয়, বরং ক্ষিপ্রতাই অধিকতর সংযমের পরিচায়ক হবে, কেন না, সংযম একটা সুন্দর জিনিস।"

সে বল্লে, "তাই ত বটে।"

আমি বল্লাম, "তবে এখন? সহজে শিখ্তে পারা (২) ভাল, না, কষ্টে শিখ্তে পারা (৩)?"

"সহজে শিখ্তে পারা।"

আমি বল্লাম্ "সহজে শিখ্তে পারার অর্থ অবশ্যই তাড়াতাড়ি শিখা, আর কষ্টে শিখার মানে ধীরে ও মন্থর ভাবে শিখা?"

'হাঁ'।

"অন্যকে শিখাইতে হইলে ক্ষিপ্রভাবে এবং সতেজে (তাহা করাই) বরং ভাল, শান্ত ও মন্থর ভাবের চেয়ে?"

'হাঁ'।

"মনে করা এবং মনে রাখা (৪) ধীরে এবং মন্থর ভাবে ভাল, না, চট্ করে এবং তাড়াতাড়ি (ভাল)?"

সে বল্লে, "চট্ করে এবং তাড়াতাড়ি।"

"বুদ্ধিচাতুর্য্য মনের একটা শান্ত ভাব নয়, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণতা, নয় কি?"

"ঠিক।"

"লেখকের বেলায় কিংবা বীণা-বাদকের বেলায় কিংবা অন্যত্র সর্ব্বত্র—যা একজনে বলে তা বুঝতে হলে, যত মন্থর ভাবে পারা যায় তা নয়, কিন্তু যত সত্বর পারা যায়, সেইটাই সব চেয়ে ভাল নয় কি?"

"হাঁ।"

"মন যখন কোন বিষয় অনুসন্ধান করে, তখন এবং গবেষণার সময়, আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি সব চেয়ে মন্থর এবং যে অতি কষ্টে (কোন বিষয়) বিচার করতে পারে এবং দেখতে পায়, সেই প্রশংসার উপযুক্ত বিবেচিত হবে না, কিন্তু যে অতি সহজে এবং অতি দ্রুত ইহা সম্পন্ন করতে পারে, সে।"

সে বল্লে, "তা ত ঠিকই।"

আমি বল্লাম, "তা হ'লে, খারমিডিস্, আমাদের সকল ব্যাপারেই—মনের ব্যাপারই হউক, কিংবা শরীরের ব্যাপারই হউক—যা ক্ষিপ্রতা এবং তীক্ষ্ণতার সহিত সম্পন্ন হয়, তা, যা মন্থরতা এবং স্থূলতার সহিত সম্পন্ন হয়, তার চেয়ে ভাল?"

সে বল্লে, "তাই ত বোধ হচ্ছে।"

"তা হ'লে, এই যুক্তি অনুসারে, সংযম এক প্রকার শান্ত ভাব হতে পারে না, এবং সংযত জীবন গতিহীন (৫) নহে,—কেননা, সংযত যে সে সৎ এবং সুন্দর (৬) হতেও বাধ্য। আর এই উভয়ের মধ্যে একটা হবে:—হয়, মন্থর কার্য্য সকল আমাদের কাছে জীবনে দ্রুত এবং বেগবান্ ক্রিয়ার চেয়ে অধিক ভাল কখনও দেখায় না কিংবা কদাচিৎ দেখায়;—না হয়, ভাই, যদিই বা সৎ কার্য্যের মধ্যে মন্থর কার্য্যের সংখ্যা দ্রুত এবং ক্ষিপ্র কার্য্যের অপেক্ষা কোন অংশে কম না হয়,—তথাপি, তাতেও, ভ্রমণেতে, কথা বলায় কিংবা অন্যত্র কুত্রাপিও—দ্রুত এবং সবেগে কিছু করার চেয়ে মন্থর ভাবে করাই বরং সংযম হতে পারে না, এবং মন্থর জীবনও অমন্থর জীবনের চেয়ে অধিক সংযত হবে না,—কেননা, আমাদের কথা মতে,

(১) মূল To kalon. এখানে বলা আবশ্যক যে, গ্রীক্‌দের ভাষায় এবং ভাবে সুন্দর (to kalon) এবং সৎ (to agathon) প্রায় একই জিনিস।

(২) Eumathia. (৩) Dysmathia.

(৪) মূলে উভয় শব্দই প্রায় এক অর্থে প্রযুক্ত।

(৫) মূলে ঐ এককথা—hesychios এবং hesychiotes--কিন্তু বাংলায় 'শান্ত' কথাটী সেই ভাবটী প্রকাশ করে কিনা সন্দেহ।

(৬) Kalon.

সংযম সৎ ও সুন্দর জিনিসের মধ্যে একটী, আর এটা দেখানো হয়েছে যে, বেগবানরাও মন্থরদের চেয়ে কম ভাল নয়।"

সে বল্লে, "আপনি ঠিকই বলেছেন বলেই আমার মনে হয়, সোক্রেটিস্।"

আমি বল্লাম, "আবার এখন, খারমিডিস্, একবার মনোযোগ কর্ এবং নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখ এবং বুঝ দেখি সংযম (তোমাতে) বর্ত্তমান থেকে তোমাকে কি প্রকার করে তুলেছে, এবং সে জিনিসটাই বা কিরূপ বা এ প্রকার করেছে—এবং এই সকল চিন্তা করে স্পষ্টরূপে এবং সাহসের সহিত বল দেখি, তোমার কাছে উহা কি বলে মনে হয়?"

এর পর সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এবং যথেষ্ট সাহসের সহিত নিজেকে বুঝবার চেষ্টা করে বল্লে, "আমার ত এখন মনে হয়, সংযম লজ্জাবোধ শিক্ষা দেয় এবং মানুষকে লাজুক করে তোলে, আর এই লজ্জাশীলতাই সংযম।"

আমি বল্লাম, "বেশ; কিন্তু সংযম যে সুন্দর, তা তুমি এই মাত্র স্বীকার কর নাই কি?"

সে বল্লে, "অবশ্যই।"

"যারা সংযত তারা কি সৎলোক নয়?"

"হাঁ।"

"যা মানুষকে সৎ করে না,তা কি সৎ হতে পারে?"

"কখনই না।"

"আর সংযম শুধু সুন্দর নয়, সৎও বটে।"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

আমি বল্লাম, "তা হলে? হোমার ভাল বল্‌ছেন বলে কি তুমি বিশ্বাস কর না, যখন উনি বল্‌ছেন—

অভাবগ্রস্ত লোকের লজ্জা ভাল নয়?"

সে বল্লে "বিশ্বাস করি বই কি।"

"তা হলে বোধ হচ্ছে, লজ্জা ভাল নয় এবং ভাল।"

"তাই ত দেখায়।"

"সংযম একটী ভাল জিনিস, কেননা, উহা যাদের থাকে তাহাদিগকে ভাল করে তোলে, মন্দ করে না।"

"আপনি যেরূপ বল্‌ছেন, আমারও ত মনে হয় এ তাই।"

"সংযম তা হ'লে লজ্জাশীলতা হতে পারে না, যদি বাস্তবিক উহা একটী সৎ বস্তু হয়; কারণ, লজ্জা যে পরিমাণে মন্দ তার চেয়ে বেশী পরিমাণে ভাল নয়।"

সে বল্লে, "আমার মনে হয়, সোক্রেটিস্, এ আপনি ঠিকই বল্‌ছেন। তবে সংযম সম্বন্ধে এই কথাটী আপনার কেমন মনে হয় দেখুন দেখি—এইটী আমার এই মাত্র মনে হলো—যা নাকি পূর্ব্বে একজনের মুখে শুনেছিলাম—যে, নিজের নিজের কাজ করে যাওয়ার নামই সংযম। দেখুন দেখি, যিনি এটা বলেছেন তিনি ঠিক বলেছেন কিনা?"

আমি বল্লুম, "আরে দুষ্ট! (১) এ ত তুমি ক্রিটিয়াস্ কিংবা আর কোন পণ্ডিতের কাছ থেকে শুনেছ।"

ক্রিটিয়াস্ বল্লে, "বোধ হয় আর কারও কাছ থেকে; আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই নয়।"

খারমিডিস্ যে—সে তখন বল্লে, "কিন্তু, সোক্রেটিস্, কার কাছ থেকে শুনেছি, তাতে কি আসে যায়?"

আমি বল্লাম,"কিছুই নয়; বাস্তবিক দেখ্‌তে হবে, কে উহা বলেছে তা নয়, কিন্তু উহা সত্য বলা হয়েছে, কি না।"

সে বল্লে, "এখন আপনি ঠিকই বলেছেন।"

আমি বল্লাম, "দেবতার ইচ্ছা। (২) কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে, এটা কি প্রকার তা আমরা আদৌ বুঝতে পারব কিনা; এটা ত একটা হেঁয়ালী বলে মনে হয়।"

সে বল্লে, "যেহেতু সে কি প্রকার?"

---

(১) মূল Miaros = Brutal &c. Jowett অনুবাদ করিয়াছেন, 'You monster!'

(২) মূল Ne Dia = By Zeus.

আমি বল্লাম, "যেহেতু, যিনি বলেছেন নিজের কাজ করে যাওয়ার নামই সংযম, তিনি যে ভাবে এই কথা-গুলি বলেছেন, মনে মনে নিশ্চয়ই সে ভাব রাখেন নাই। অথবা, তুমি কি মনে করবে যে, লিপিকর যখন কিছু লেখে কিংবা পড়ে, তখন সে কিছুই করে না?"

সে বল্লে, "আমি ত মনে করি, করে।"

"আর তোমার কি মনে হয়, লিপিকর শুধু তার নিজের নামই লেখে এবং পড়ে অথবা তোমাদিগকে ছেলেদিগকেও শিক্ষা দেয়—অথবা তোমরাও তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের বন্ধুদের নামের চেয়ে তোমাদের শত্রুদের নাম কিছু মাত্র কম লেখ নাই, নয় কি?"

"কিছু মাত্র কম নয়।"

"আর তাই করে তোমরা কি যা তা করেছিলে (১) এবং অ-সংযত হয়ে পড়েছিলে?"

"কিছুতেই নয়।"

"কিন্তু এই সব করে তোমরা নিজের কাজ করনি,—অবশ্যই যদি লেখা এবং পড়া একটা কিছু করা হয়?"

"তা একটা কিছু করাই ত বটে।"

"আর, ভাই, চিকিৎসা করা, অথবা গৃহনির্ম্মাণ অথবা তন্তু বয়ন করা অথবা যা কিছু শিল্প-সাধ্য কাজ তার কোন একটা কোন শিল্প সাহায্যে সম্পন্ন করা, নিশ্চয়ই একটা কিছু করা।"

"অবশ্যই।"

আমি বল্লাম, "তা হ'লে? তোমার কি মনে হয়, রাষ্ট্র এইরূপ একটা আইনের অধীন হ'লে সুশাসিত হবে, যে আইন আদেশ করে প্রত্যেককেই নিজের নিজের পোষাক বুনে নিতে এবং ধুয়ে লইতে এবং চামড়া কেটে নিজের জুতা তৈয়ার করে নিতে, এবং ঘটি বাটী (২) এবং গা পরিষ্কারের সরঞ্জাম (৩) এবং এই প্রকারের অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য (তৈয়ার করে নিতে),—এবং পরের কোন কাজে হাত না দিতে—প্রত্যেককেই নিজের সমস্ত কাজ (নিজে) করে সম্পন্ন করে নিতে?"

সে বল্লে, "না, তা আমি মনে করি না।"

আমি বল্লাম, "রাষ্ট্র সংযত ভাবে শাসিত হ'লে সু-শাসিতও হবে?"

সে বল্লে, "না হবে কেন?"

আমি বল্লাম, "তা হলে এখন এই সব কাজ এবং এই প্রকারে নিজের কাজ করে যাওয়া সংযম হতে পারে না?"

"পারে বলে ত মনে হয় না।"

"তবে বোধ হচ্ছে—যা নাকি আমি এইমাত্র বলছিলাম—যিনি বলেছেন যার তার নিজের কাজ করাই সংযম, তিনি কোন গূঢ় অর্থে এই কথা বলেছেন, নিশ্চয়ই তিনি এমন একটা বোকা ছিলেন না। না, কোন নির্ব্বোধের কাছ থেকেই এ কথা শুনেছ, খারমিডিস্?"

সে বল্লে, "কিছুতেই না, আমি বরাবরই তাঁকে পণ্ডিতই মনে করেছি।"

"তা হ'লে নিশ্চয়ই—আমার যেরূপ মনে হয়—উনি কোন গূঢ়ার্থেই এই কথাটা বলে থাকবেন, কারণ, নিজের কাজ করে যাওয়া যে কি, তা জানা দুষ্কর।"

সে বল্লে, "তা হবে।"

"নিজের কাজ করার মানে কি? তুমি বলতে পার?"

সে বল্লে, "দোহাই ঈশ্বর, আমি জানি না; আর হয়ত এটা হতেও বাধা নাই যে, যিনি এ কথা বলছিলেন তিনি নিজেই জানতেন না কি যে ওঁর মনে ছিল।"

(১) মূল epolypragmoneete = (কথায় কথায়) বহু কাজে (একসঙ্গে) হাত দিয়াছিলে।

(২) Lecython = Flask. (৩) Stlengis = strigil—গায়ের চামড়া পরিষ্কার করবার জন্যে ধাতু কিংবা শিংয়ের তৈয়ারী একপ্রকার জিনিস।

এই কথা বলেই সে লুকিয়ে একটু হাস্‌লে এবং ক্রিটিয়াসের দিকে চোখ ফিরালে।

আর ক্রিটিয়াস্—সেও অনেকক্ষণ ধরে থারমিডিস্ এবং উপস্থিত অভ্যাগতের কাছে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে স্পষ্টতঃ বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, এতক্ষণ অবশ্যই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল, কিন্তু এখন আর পারলে না; এবং তাতে বরং আমার কাছে এটা সত্য বলেই মনে হইল—যা আমি সন্দেহ করেছিলাম—যে, সংযম সম্বন্ধে এই জবাবটা থারমিডিস্ ক্রিটিয়াসের নিকটই শুনেছে। আর থারমিডিস্‌ও এখন জবাবের ভার নিজে না রেখে ওকে দিতে ইচ্ছা করে ওকে উত্তেজিত করতে লাগলো এবং দেখালো যেন সে জবাবে জব্দ হয়ে গেছে (১)। ও কিন্তু তা মান্‌তে চাইলো না, বরং আমার বোধ হলো, এর প্রতি চটে গেল; —কবি যেমন, যে কুশীলব ভূমিকা নিয়ে তার কাব্যটী মাটী করে, তার উপর (চটে উঠে), তেমনই। আর, এর মুখে তীক্ষ্ণভাবে তাকাইয়া বল্লে, "তুমি কি এই মনে কর, থারমিডিস্, যে, যদি তুমি না জান, তার মনে কি ছিল যে বলেছিল সংযম অর্থ যার তার কাজ করে যাওয়া, তাহ'লে সে নিজেও তা জানতে পারে না?"

আমি তখন বল্লুম, "মহানুভব ক্রিটিয়াস্, এর এই বয়সে বুঝতে না পারাটা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তোমার কিন্তু বয়সের দরুণও বটে এবং বুদ্ধির দরুণও এটা জানা উচিত। যদি এ যা বলেছে, সংযম অর্থ তুমিও তাই মনে কর এবং যদি এর পরিভাষা তুমি গ্রহণ কর, তাহ'লে, যা বলা হয়েছে তা সত্য কিনা সেটা বরং তোমার সঙ্গেই আমি খুব আনন্দের সহিত বিচার করব।"

সে বল্লে "আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি এবং গ্রহণ করি।"

আমি বল্লাম, "এখন তাহলে তুমি ভালই করেছ। আচ্ছা, আমায় বল দেখি, যা আমি এইমাত্র জিজ্ঞাসা করছিলাম, তা তুমি মান কি না—যে, সকল শিল্পীই কোন একটা কিছু করে?"

"আমি মানি।"

"আর তোমার কি মনে হয়, তারা নিজেদের কাজই শুধু করে, না পরের কাজও করে?"

"পরের কাজও করে।"

"কেবল মাত্র নিজেদের কাজ না করেও তারা সংযত হতে পারে?"

সে বল্লে, "বাধা কিসে?"

আমি বল্লাম, "আমার কিছুই না; কিন্তু দেখ দেখি, যে নিজের কাজ করাকেই সংযম ব'লে পরে আবার বলে যে পরের কাজ যারা করে তাদেরও সংযত হ'তে কোন বাধা নাই,—তার কোন বাধা আছে কিনা।"

সে বল্লে "যারা পরের কাজ করে (২) তাদিগকে যদিই আমি সংযত বলে থাকি, তবু যারা (পরের কাজ) সম্পন্ন (২) করে দেয়, তাদিগকেই আমি সংযত মনে করি।"

আমি বল্লাম, "আচ্ছা বল ত, সম্পন্ন করে দেওয়া—আর করা, তুমি একই জিনিস মনে কর না?"

সে বল্লে "নিশ্চয়ই না; কাজ করা এবং করাকেও না। এটা আমি হিসিয়ড্ (Hesiod) হইতে শিখেছি—যিনি বলেছেন যে কাজ কখনও নিন্দার বিষয় নয়। একবার ভাব দেখি, তুমি নাকি এখন বা যা বলছিলে, সেগুলিকে যদি উনি কাজ বলতেন এবং (সেগুলি করাকে) যদি উনি কাজ করা এবং (কাজ) সম্পাদন করা বল্‌তেন, তাহ'লে চামড়া কেটে জুতা তৈয়ার করায় কিংবা শুক্‌না

(১) মূল Exelencho = to refute.

(২) মূল Poeeen এবং prattaen = (Jowett এর মতে) make এবং do. বাস্তবিক এ দুটীর অর্থের বিশেষ কোন তফাৎ নাই।

মাছ বিক্রী করায় অথবা অলস ভাবে ঘরে বসে থাকায় (১) কি নিন্দার বিষয় কিছু নাই ? এরূপ মনে করবার কোন হেতু নাই, সোক্রেটিস্ ; বরং, আমার মনে হয়, উনি সম্পন্ন করে দেওয়া এবং কাজ করা হতে শুধু করাটাকে পৃথক্ মনে করতেন, এবং মনে করতেন যখন সুভাবের সঙ্গে বর্ত্তমান না থাকে তখন করাটা কখনও২ নিন্দনীয় হতে পারে, কিন্তু কাজ কখনও কোন প্রকারে নিন্দার বিষয় হতে পারে না। যা সদ্ভাবে এবং প্রয়োজনার্থে করা হয়, তাকেই উনি কাজ বল্‌তেন এবং এই সব করা-কেই কাজ করা এবং (কাজ) সম্পন্ন করা বলতেন। আর এটাও বুঝা উচিত, যে, এই সব গুলিকেই উনি মানুষের নিজস্ব কাজ মনে করতেন,আর, যা কিছু অনিষ্ট-জনক সে সমস্তগুলিকে তদ্বিরোধী মনে করতেন। এবং এই অর্থেই হিসিয়ড্ এবং অন্য যে কেহ পণ্ডিত ব্যক্তি, নিজের কাজ যে করে তাকে প্রাজ্ঞ (এবং সংযত) বলে-ছেন, বুঝতে হবে।"

আমি বলিলাম, "ক্রিটিয়াস্, তুমি আরম্ভ করবা-মাত্রই আমি তোমার কথার তাৎপর্য্য বুঝে ফেলেছি, যে, তুমি লোকের কর্ত্তব্য এবং নিজস্ব কাজকেই সৎকাজ বলবে ; আর সৎকাজ করাকেই কাজ করা (বলবে)। কারণ, প্রডিকস্‌কে(Prodicus) আমি শব্দের হাজার রকম বিভাগ করতে শুনেছি। এবং তোমাকেও আমি শব্দের প্রত্যেকটীতে যেমন তোমার ইচ্ছা অর্থ আরোপ করতে দিতে পারি ; কিন্তু যা তুমি বল, সেই শব্দটী কোন্ অর্থে প্রয়োগ কর, সেইটী শুধু (আমায়) স্পষ্ট করে বুঝাইয়া দিও। এখন একবার আবার প্রথম থেকে আরও স্পষ্ট করে বুঝাও দেখি। উত্তম কার্য্য সম্পাদন অথবা করা অথবা যে নামে তুমি ওটাকে অভিহিত করতে চাও,—সেটাকে তুমি সংযম বল ?"

সে বল্লে, "বলি বই কি।"

"খারাপ কাজ যে করে সে সংযত নয়, কিন্তু ভাল কাজ যে করে সে ?"

সে বলিল, "কিন্তু মহাশয়, আপনার কি তা মনে হয় না ?"

আমি বলিলাম, "তা যেতে দাও ; আমার যা মনে হয়, তার বিচার করছি না, কিন্তু তুমি এখন যা বলছ, তার।"

সে বলিল, "আমি তবে অবশ্যই, সৎকার্য্য নয় কিন্তু অসৎকার্য্য যে করে তাকে সংযমের অধিকারী বলব না ; আর, অসৎকার্য্য নয়, সৎকার্য্য যে করে, তাকে সংযমী বলব। আর এটা তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি যে, সৎকার্য্যের সম্পাদনকেই আমি সংযম বলি।"

"তুমি যা বলছ, তা সত্য হতে বোধ হয় কোন বাধা নাই।" 'তবে'—আমি বলিলাম—'এইটিই আমি ভাবছি কি, সংযমী লোকদের সম্বন্ধে তুমি মনে কর নাকি যে, তারা যে সংযমী তা তারা জানে না।"

সে বলিল, "তা ত আমি মনে করি না।"

আমি বলিলাম,"এই একটু আগেই তোমাকর্ত্তৃক বলা হচ্ছিল না কি, যে, অন্যের কাজ করেও শিল্পীদের সংযমী হতে কোন বাধা নাই ?"

সে বল্লে, "বলা হয়েছিলই ত ; কিন্তু তাতে কি ?"

"কিছুই না ; কিন্তু বল ত, তুমি কি মনে কর, কোন চিকিৎসক কাহাকেও আরোগ্য করে তোলে তার নিজের এবং যাকে আরাম করে, তারও উপকার করে ?"

"মনে করি বই কি।"

"এ যে করে সে কি তার কর্ত্তব্য করে না ?"

"হাঁ।"

---

(১) মূল 'Ep' oekematos kathemenos. Jowett অনুবাদ করিয়াছেন 'sitting for hire in a house of ill-fame.' টীকাকারের মতে, Lysias এর মত জেলখানার দরজায় কিংবা এথিনীয়দের মত বেশ্যাগৃহের দরজায় বসে থাকা। কথায় কথায় অর্থ হয় 'ঘরে বসে থাকা।'

"কর্ত্তব্য যে করে, সে সংযমী হয়, না ?"

"সংযমী হয় বই কি।"

"আর কখন সে সার্থক (১) চিকিৎসা করবে, কখন নয়, সেটা কি চিকিৎসকের পক্ষে জানা আবশ্যক ? এবং প্রত্যেক শিল্পীরও কি (জানা আবশ্যক), যে কাজ সে করতে যাচ্ছে তাথারা সে কখন উপকৃত হবে,কখন নয় ?"

"বোধ হয়, নয়।"

আমি বলিলাম,"কখনও কখনও তাহ'লে এই চিকিৎসক ইষ্টজনক (১) অথবা অনিষ্টজনক ভাবে কাজ করে নিজে না-ও জানতে পারে, কি সে করলো ; আর— তুমি নাকি যা বল্‌ছ—ইষ্টভাবে কাজ করলেই সে সংযত ভাবে কাজ করলো। ইহা তুমি বল নাই কি ?"

"এই ত আমি বলেছি।"

"তাহলে বোধ হচ্ছে সে কখনও ইষ্টভাবে কাজ করে সংযত ভাবে কাজ করবে এবং সংযমী হবে, কিন্তু সে যে সংযমী তা সে নিজেই জানবে না—নয় কি ?"

সে বলিল, "কিন্তু, সোক্রেটিস্, এ তো কিছুতেই হতে পারে না ; বরং যদি তুমি মনে কর আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে যা যা স্বীকৃত হয়েছে, তার থেকে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য, তাহ'লে বরং সে সব কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, এবং, নিজেকে না জেনে কোন ব্যক্তি সংযমী হতে পারে, এটা কদাপি স্বীকার করার চেয়ে বরং আমি যে যথার্থ কথা বলিনি তাই স্বীকার করতে আমি লজ্জাবোধ করব না। নিজেকে জানা—এইটীকেই বরং আমি অতি জোরের সহিত সংযম বলব এবং এবিষয়ে ডেলফসে (Delphi) যে সেই উক্তিটী (২) স্থাপন করেছে তার সঙ্গে আমি একমত। আর আমার ত এই মনে হয়, ঐ উক্তিটী যে সেখানে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, সেটা যেমন যারা ভিতরে প্রবেশ করতে যায় তাদের প্রতি দেবতার 'শুভাগমন' (৩) এই কথার পরিবর্ত্তে—অভিবাদন স্বরূপ, তেমনই এটাও বুঝাতে চায় যে, 'স্বাগত' কিংবা 'শুভমস্তু'(৩) এই অভিবাদন প্রকৃত অভিবাদন নয় এবং তা পরস্পরকে বলা উচিত নয়, বরং (বলা উচিত) 'সংযত হও'। আমার মনে হয়, (এই উক্তিটী সেখানে) যে স্থাপন করেছে, সে এই মনে করে (উহা) স্থাপন করেছে যে, মন্দিরে প্রবেশেচ্ছুদের প্রতি দেবতা এই প্রকারে মানুষ হইতে একটু পৃথক্‌ভাবে সাদরাহ্বান জানান, আর, তার মতে সর্ব্বদাই প্রবিবিক্ষুদের প্রতি দেবতা "সংযমী হও" ভিন্ন আর কিছু বলেন না। ভবিষ্যদ্বক্তার মত হেঁয়ালীর ছন্দে (এই কথা) বলেন ; লিপির যা অর্থ এবং আমার যা মনে হয়,—'নিজেকে জান' আর 'সংযমী হও' একই কথা। কেউ অবশ্যই অন্যথাও মনে করতে পারে, যেমন নাকি আমার মনে হয়, তাঁরা করেছেন যাঁরা পরবর্ত্তী লিপিসকল (সেখানে) স্থাপন করেছেন—যথা, 'কিছুই বেশী ভাল নয়' (৪) এবং "প্রতিজ্ঞা করিলে বিপদে পড়িতে হয়।" কারণ এঁরা 'নিজকে জান' এই কথাটাকে একটা উপদেশ স্বরূপ মনে করেছেন, (মন্দিরে) প্রবিবিক্ষুদের প্রতি দেবতার অভিবাদন স্বরূপ নয়। আর তাঁরাও যাতে ইহা অপেক্ষা কোনক্রমেই হীন নহে, এমন উপদেশ দিতে পারেন, তাই ইচ্ছা করে এই সব লিপি লেখে সেখানে স্থাপনা করেছেন। এই কথা যার জন্যে বলছি, সোক্রেটিস, সেটা এই ;—পূর্ব্বে যা যা উক্ত হয়েছে, সে সমস্তই আমি ছেড়ে দিচ্ছি—সে সব কথায় হয় ত তুমিই (আমার চেয়ে) ঠিক বলেছিলে,হয় ত বা আমিই ; কিন্তু যা আমরা বলেছি তাতে কিছুই স্পষ্ট হয় নাই ;—এখন আমি তোমায় এ সম্বন্ধে এইটীই বলতে বলছি ; নিজে নিজেকে জানাই সংযম, ইহা তুমি স্বীকার কর কি না।"

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১) মূলে একই শব্দ রহিয়াছে—Ophelimos.

(২) Gnothi seayton = 'আত্মানং বিদ্ধি' নিজেকে জান।

(৩) Chaire = 'বিজয়তাৎ', 'শুভমস্তু' ইত্যাদি।

(৪) Cf সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।

পুষ্করের পুণ্যতীর্থ।

পুষ্কর পুষ্কর তীর্থের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু পুষ্কর মহিমা অতি অল্প লোকেই পরিজ্ঞাত। রাজপুতনা প্রদেশে আজমীর জেলার আজমীর সহর হইতে ৮ মাইল দূরে পুষ্কর তীর্থ। প্রায় শীতাবসানে একদিন আগরা হইতে আজমীর যাত্রা করি। পথে নানাস্থানে নানাদ্রষ্টব্য দেখিয়া আজমীর আসিলাম। আজমীর রেলষ্টেসনটী দোতালা বাড়া, ষ্টেসনের কাছেই ডাক বাঙ্গলা, আমি নামিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে পত্র দিলাম, তিনি কহিলেন "আপনাকে নেওয়ার জন্য প্রসন্ন বাবুর পুত্র গাড়ীসহ আসিয়াছেন।" তারপরই তাহার সহিত পরিচয় করিয়াদিলেন। আমি বরাবর প্রসন্ন বাবুরই বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বেলা তখন প্রায় ৪টা। জলযোগ করিয়া গৃহস্বামীর পুত্রসহ বাহির হইয়া পড়িলাম। গৃহস্বামী আগে সরকারী কার্য্য করিতেন, পেনসন লইয়া কয়েক বৎসর যাবত রেল ও অন্যান্য ঠিকাদারী করিতেছেন। তিনি সেখানে কিছু জমিদারী ও বাগান করিয়াছেন। বেশ সুখে চলিয়া যায়। বৃদ্ধ আমাকে পাইয়া বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। অতি সামান্য কয়জনমাত্র বাঙ্গালী, অত্রাবস্থায় আমার আদর হইবেনা ত কি? আজমীরে দেখিবার মত অনেক আছে। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের বহু স্মরণীয় পদার্থ এখানে রহিয়াছে। এখানে কমিশনরী আফিস প্রভৃতি আছে। সেও রাজকুমার কলেজে বহুতর অর্দ্ধস্বাধীন বা মিত্ররাজপুত্রগণ বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকেন। আজ পুষ্করের কথাই কহিব, আজমীরের কথা আর একদিন বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বিশ্রামান্তে আজমীর হইতে পুষ্কর যাত্রা করিলাম। এক্কার ভাড়া সামান্য, পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ দিয়া যাইতে হয়, স্থানে স্থানে আরোহী নামাইয়া দিতে হয়। পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তার-গতি বক্র। এই ৮ মাইল পথ যাইতে অনেক সময় লাগে। পথে যাইতে যাইতে নানাস্থানে সভ্য চরিত্রের বড় জাতীয় বানর (হনুমান) দেখিতে পাইলাম। হনুমানেরা বড় ভদ্রলোক। কাহাকেও কিছু করে না। নিতান্ত বিরক্ত হইলে ভ্রূকুটী পর্য্যন্তও করে না। যে যাহা দেয় তাহাই লইয়া খায়, কাড়াকাড়ি করিয়া কাহারও নিকট হইতে লয় না। তীর্থযাত্রীরা চানা-ভাজা দিয়া যায়। ইহাদের অচঞ্চল করুণা দৃষ্টি দেখিয়া ইহা-দিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। বৃন্দাবনের অতিচঞ্চল, বদমায়েস, চোর, বানরদিগের চরিত্রের সঙ্গে তুলনাই হয় না। পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে রাস্তার ধারে বসিয়া আছে, কেহ তাহাদের হাতে কিছু দিলে তাই তাহারা খায়, ইহারা যদিও শিষ্ট শান্ত কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরস্পরের যখন বিরোধ বাধে, তখন তাহাদের ক্রোধ ও উন্মত্ততা দেখিয়া ভয় হয়। অনেক সময় অপর হনুমান মধ্যস্থ হইয়া বা পথের মানুষেরা বিবাদ ভাঙ্গিয়া দেয়।

পুষ্কর বেশ একটী ক্ষুদ্র সহর। এখানে বহুতর ধনী পাণ্ডার বাস। অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। তা ছাড়া অর্দ্ধস্বাধীন মিত্ররাজগণের বাড়ী আছে। পুষ্কর হ্রদটী অতি বড় নহে, উহারই চারিদিকে কতকগুলি মন্দির ও রাজ-ওয়ারাদের বাড়ী। এ সকল বাড়ীতে পাহাড়া মাত্র আছে, যখন তাঁহাদের লোক তীর্থার্থ আসে, তখনই বাড়ী ঘরের একটু জাকজমক হয়। হ্রদে পদ্ম বন আছে। তখন সামান্য কয়টী ফুল ছিল, বর্ষায় প্রচুর ফুল হয়। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুষ্করে পঁহুছিলাম। যে পাণ্ডার নিকট আজমীর হইতে পত্র আনিয়াছিলাম তাহার নাম করায় অপর পাণ্ডা কেহ আমাকে উপদ্রব করিল না। আমি পাণ্ডার বাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তদীয় পুত্র আসিয়া আমাকে পথ হইতে লইয়া গেলেন। আমি লটবহর নামাইয়া রাখিয়া দেবালয়ে আরতি দর্শন করিতে গেলাম। পাণ্ডার বাড়ীটী হ্রদের উপরেই, বেশ সুন্দর। পাণ্ডা খাতা বাহির করিয়া আমার আত্মীয় ও পরিচিতদের নাম বাহির করিলেন। অনাবশ্যক হইলেও আমার বিশ্বাসের জন্য তা দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। এখানে গৌড়ীয় ও সারস্বত ব্রাহ্মণেরাই পাণ্ডা। গৌড়ীয়গণ

গৌড় অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশ হইতে মানসিংহের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সারস্বতগণ ইহাদিগকে মর্য্যাদায় হীন মনে করেন, কিন্তু এখন ইহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। গৌড়ের সঙ্গে গৌড়ীয়গণের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদের কথাবার্ত্তা, পরিচ্ছদ, আহার কিছুই বাঙ্গলা বা বাঙ্গালীর সঙ্গে মিলে না। বংশ বিস্তৃতি নিমিত্ত ইহারা সংখ্যায় বহু হইয়াছিল। এই সকল পাণ্ডাগণ আওরঙ্গজেব প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে আছেন। তিনি পাণ্ডাদিগকে ৬০ হাজার বিঘা জমি নিষ্কর দিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাহাদের প্রধান আয়ের জিনিষ। কিন্তু ইহাদের বংশ বৃদ্ধি নিবন্ধন বহু অংশ হইয়া গিয়াছে। তৎপর ইহারা আত্মবলে আরো কতক জমী ইহার সামিল করিয়া লইয়াছেন।

বাদসাহ আওরঙ্গজেব বড় হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। অনেকে মনে করিবেন, তিনি নিষ্করভূমি ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন সে কি? তাহার একটী ঐতিহাসিক কথা উল্লেখ করিতেছি। আওরঙ্গজেব যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া হিন্দু ও হিন্দুদেবালয়সমূহ বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন তখন তিনি পুষ্করে আসিয়াও একদিন ছাউনি করিলেন। ব্রাহ্মণ, সেবাইতগণ পলায়ন করিলেন। যে সমস্ত সৈন্য শিবিরে ছিল রাত্রে তাহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে। বাদসাহ রজনীতে স্বপ্নে দেখিলেন যে যদি তিনি পলাইয়া না যান তবে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাহাদিগকে যজ্ঞ করিবার আদেশ করিলেন ও তিনি তাহাদিগকে ৬০ হাজার বিঘা জমি নিষ্কর দান করিয়া অত্যল্পসংখ্যক ভৃত্য পরিবৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। বেগম সেই ব্রাহ্মণ বংশের একজন সিদ্ধ পুরুষের পদানত হইলেন নিতি তাঁহার পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। ইহার পর পাণ্ডা ব্রাহ্মণদের কাজের জন্য তিনি কয়েকখানা পাকা বাড়ী করিয়া দেন ও হ্রদের চতুর্দ্দিক বাঁধাইয়া দেন এবং আজমীর হইতে পুষ্করের ভিতর দিয়া পর্ব্বত কাটিয়া বাঁধা রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। এই হইতে ব্রাহ্মণদের সুবিধা হইয়াছে। সেই জমি এখনও তাহারা ভোগ করিতেছেন। আওরঙ্গজেব তখন ব্রাহ্মণদিগকে সেই অধিবাদও দান করিয়াছিলেন।

পুষ্কর নগরে রাস্তার দুইধারেই বাড়ী ও দেবালয়। দূর হইতে সাবিত্রী-পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়াছিলাম, পুষ্করে ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিলাম। এখানে নানাবিধ দেবালয় আছে। রামানুজ সম্প্রদায়ের বহু সাধু এখানে আছেন, এই সকল সাধুদের দেবালয় ও আবাসস্থান বৃহৎ একটী স্থান ঘেরিয়া রহিয়াছে, ইহাদের আশ্রমের জমী আছে আর তাহাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ সম্বল। ইহারা দরিদ্র ও অন্ধ আতুরদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। হ্রদের মধ্যে একটি স্তম্ভ বা মন্দির আছে, এইখানে ভগবান ব্রহ্মাযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সাবিত্রীদেবী পর্ব্বতের উপর ছিলেন এখনও সেইখানেই আছেন, ব্রাহ্মণগণ সেখানে গিয়া নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। তীর্থযাত্রীরা সাবিত্রীপর্ব্বতে উঠিয়া দেবী দর্শন করিয়া থাকেন, পর্ব্বতে উঠিবার নিমিত্ত সিঁড়ি আছে, অশক্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ডুলী করিয়া উঠিয়া থাকেন। নিম্ন হইতে সাবিত্রীমন্দির অতি ক্ষুদ্র একটী শ্বেতপাত্র বলিয়া দেখায়। সেখানে গেলে মন্দিরটীকে প্রকাণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। এখানকার একটী দেবালয়ে উদয়পুর রাজের পূর্ব্বপুরুষের একটী বল্লম ও হস্তাঙ্গুরী আছে। বল্লমটী আমি তুলিতে পারিলাম না, হস্তাঙ্গুরী আমার কনুইর কাছে আসিয়া পঁহুছিল। একটী কথাঞ্চিৎ কৃশকায় লোকের অনন্তের মত ব্যবহার করা চলে। পাণ্ডাজী যে রাজার নাম করিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই।

প্রাতে উঠিয়া হ্রদে স্নানান্তে তীর্থ প্রাপ্তিহেতু শ্রাদ্ধ করিলাম। স্নান করিতে গিয়া দেখি বহু কুমীর হ্রদে বিচরণ করিতেছে, স্নানার্থী কাহাকেও কিছু বলে না। আমার সাহস হইল না, আমি তীর হইতে ঘটী দিয়া জল তুলিয়া কাজ সারিলাম। অনেককে দেখিলাম নির্ভাবনায় জলে নামিয়া স্নান করিতেছে। এখানে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী গম্ভীরানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি আমাকে তাঁহার কাছে মধ্যাহ্নাহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া তাঁহাকে প্রণামী দিতে চাহিলে তিনি নিতে চাহিলেন না। আমি কহিলাম "আমি গৃহী, তীর্থে পরান্ন করিব না।" ইহার পর তিনি আহারের মূল্য মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ফেরত দিলেন।

তিনি কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের সম সাময়িক ও একস্থানেই চাকরী করিতেন পরে পেন্‌সন লইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। হ্রদের একধারে একটী আশ্রম পাইলাম, একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী এখানে সস্ত্রীক বাস করেন। পাণ্ডাদের পুত্রগণ প্রায় সকলেই মূর্খ, যাত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিন গুজরাণ বেশ তাদের চলিয়া যায়। এই বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী পাণ্ডাপুত্র-দিগকে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়াইয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী বালিকাদিগকে পড়াইয়া থাকেন। একদিন প্রাতে তাঁহার আশ্রমের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দেখিয়া আনন্দানুভব করিয়াছি। ব্রহ্মচারী ও তৎপত্নী ভাল হিন্দি জানেন। তাঁহারা নাকি কাশীবাসী বাঙ্গালী। ইঁহাদের আহারাদির ব্যয় পাণ্ডারা দিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী-পত্নীর গহেনাগুলি লতা দিয়া প্রস্তুত, সামান্য পরিধেয় বস্ত্র। ইহাঁরা আহারাদি ব্যতীত অন্য কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না। গৃহে মৃৎপাত্রই দেখিলাম, শয্যা তৃণদিয়া প্রস্তুত, আসনগুলি কুশনির্ম্মিত। ইহাদের এই অবস্থা দেখিয়া পুরাকালের আর্য্যঋষিগণের কথা মনে হইল। ইহাদের উপর বড় ভক্তি হইল। দেখিলাম সকলেই ইহাদিগকে ভক্তি করে। আমি ইহাদিগকে কিছু দিতে চাহিয়া তাদের অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রহ্মচারী কহিলেন "আমার ত কোন অভাবই নাই। আমার ত বিলাসিতা নাই, অন্ন বস্ত্র পাণ্ডারা দেন বলিয়া আমি ভিক্ষা করি না।" আমি তাঁহার পত্নীকে একখানা লালপাড় সারি ক্রয় করিয়া দিলাম। তখন ব্রহ্মচারী আশ্রমে ছিলেন না, তাই তিনি তাহা লইতে রাজী হইলেন না। পরে ব্রহ্মচারী আসিয়া আদেশ করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক এই ঋষিপত্নীর মাতৃরূপ দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। জননী আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বৃদ্ধ নহেন, তাঁহার পত্নীও যুবতী, নিঃসন্তান। ব্রাহ্মণীর আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত স্নেহপূর্ণ মলিন বদন দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। এমন দেবীর চরণলাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? পুষ্কর ত্যাগ করিয়া আজমীর আসিয়া এই দেবীর চরণে বাঙ্গালী বন্ধুর গৃহ হইতে শঙ্খের বালা একজোড়া ও অন্যরকম চুড়ী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। বাস্তবিক ইঁহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকার পুরাকালের ঋষিদের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। এখনও ভারতের এই সকল দেখিলে পাশ্চাত্য ঋষিগণও মোহিত হইয়া যাইবেন। কে বলে ভারতও ভারতীয়গণের ত্যাগ ও ত্যাগধর্ম্ম নাই? এখনও এইরূপ ঋষি স্থানে ২ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে বহু ঋষি এখনও আছেন যাহারা অন্ন, বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতবাসী ত্যাগী, ত্যাগের মহিমা ভারতই বুঝিতে পারিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেও ভারতে রত্ন লোপ হয় নাই।

তিন দিন পুষ্করবাস করিয়া একদিন বিকালে তথা হইতে আজমীর যাত্রা করিলাম। এক্কাওয়ালা যে ভাড়া পাইবে তাহা দিতে গিয়া টাকা দিয়াছিলাম সে ভাঙ্গিয়া পয়সা ফিরাইয়া দিবে কিন্তু সে অমনিই তাহা লইয়া চম্পট দিল। উহা আজমীর বাসগৃহের কাছেই হইয়াছিল কিন্তু আর উপায় কি? এক্কার নম্বর মনে রাখি নাই বলিয়া মিউনিসি-পালিটীতে জানাইতে পারিলাম না। আজমীর আরো দু'তিন দিন থাকিয়া অন্যত্র যাত্রা করিলাম। আজমীর ইংরেজাধিকৃত জেলা। ইহার চতুর্দ্দিকে রাজপুতনার স্বাধীনরাজ্য সমূহ।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

'ঢাকাই কবি' কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহদেবতা।

'ঢাকাইকবি' কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রাম যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া দেশ বিদেশে সুপরিচিত কাটবয়ের গৃহদেবতা বাসুদেব তাহাদের অন্যতম। এই মূর্ত্তিটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন, মূর্ত্তিটি কষ্টিপাথরের বলিয়া বোধ হয়। ইহা উচ্চতায় দুইফিট হইবে। মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট, পরিধানে অজানুলম্বী কটিবাস, গলে কটি-দেশাবলম্বী যজ্ঞোপবীত ও অজানুলম্বী বনমালা। দক্ষিণাধঃ হস্তে চক্র, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে পদ্ম ও বামাধঃহস্তে শঙ্খ

বিরাজমান, এবং দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তা শ্রী ও বামপার্শ্বে বীণাহস্তা পুষ্টি দণ্ডায়মানা। মূর্ত্তির পাদনিম্নে গরুড়, গরুড়ের দক্ষিণে দুইটী ও বামে একটী অপরিজ্ঞাত মূর্ত্তি। বাসুদেবের স্কন্ধদেশের একটু উপরে চালে দুইদিকে দুইটি করিয়া চারিটি মূর্ত্তি এবং তাহার আর একটু উপরে দুইদিকে পাঁচটি করিয়া দশটি মূর্ত্তি প্রথাদিত আছে। সেগুলি দশবতারের দশমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এই মূর্ত্তিগুলির উপরে তৈল ও চন্দনের প্রলেপ পড়ায় সেগুলি এরূপ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমানে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

এই বাসুদেব মূর্ত্তি কোন্ সময়ে, কোথা হইতে কাহার দ্বারা, কি ভাবে আনীত হইয়াছিলেন তার সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে তাহা এইরূপ :—

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সেনহাটী গ্রামে নরহরি দাস কবীন্দ্র বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কামাখ্যাধিপতির রাজধানীতে কিছুদিন ঘর পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ৺কামাখ্যা মহাপীঠ স্থানে উৎকট তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, এই তপস্যাকালীন একবার মহানবমীর দিন প্রত্যূষে অকস্মাৎ তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। চক্ষুরুন্মিলন করিয়াই তিনি সম্মুখে একটী অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকার অলৌকিক রূপ দর্শনে ও শ্রুতি সুখকরী মধুরা বাণী শ্রবণে তাঁহাকেই তাঁর ইষ্টদেবী বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এবং বিহ্বলচিত্তে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, যদি আসিয়াছ, তবে একবার আমাকে তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ কর।' কবীন্দ্র বিশ্বাসের কথা শুনিয়া বালিকারূপিনী মহামায়া উত্তর করিলেন—'বাছা, এখন আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিব না। যদি একান্তই তোমার ইষ্টদেবী দেখিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আমি তাহার উপায় তোমাকে বলিতেছি। আমার বর পুত্র মেহার গ্রামের সর্ব্বানন্দ নাথ কাশী যাইবার পথে এখন তোমার বাসভূমি সেনহাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি রাত্রিযোগে নিজ বাটীতে পৌছিয়া তাঁহার নিকট সিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ কর। তাহা হইলেই অল্পকাল মধ্যে ইষ্টরূপ দর্শন করিতে পারিবে। আমি তোমাকে আর একটী কথা বলিতেছি—'এই মন্দিরের পশ্চাতে লক্ষ্মী ও বাসুদেব বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কালিকাপুরাণ দেখিতে পাইবে। তুমি যত্নপূর্ব্বক বিগ্রহাদি গ্রহণ করিয়া যত্ন ও ভক্তির সহিত রক্ষা ও পূজা করিবে, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে।'

দেবীর কথা শুনিয়া কবীন্দ্র বিশ্বাস বলিলেন—'মা! এ যে বড় অসম্ভব কথা। সেনহাটী এখান হইতে বহুদূরে অবস্থিত,—কি করিয়া অদ্য রাত্রির মধ্যে আমি সেখানে পৌছিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিব?' দেবী উত্তর করিলেন 'বাছা, ভয় পাইও না। অদ্য দিবাবসানে ব্রহ্মপুত্র নদের ঘাটে উপস্থিত থাকিও, তখন যে আগ্রহ সহকারে তোমাকে নৌকায় লইয়া যাইতে যত্ন করিবে, সেই নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলেই রাত্রিকাল মধ্যে তুমি নিজ গৃহে উপস্থিত হইতে পারিবে।' এই বলিয়াই যোগমায়া অন্তর্হিতা হইলেন। কবীন্দ্র বিশ্বাসও দেবীর কথামত মন্দিরের পশ্চাৎভাগে গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মী ও বাসুদেবের বিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কালিকা পুরাণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন।

অনন্তর দিবাবসানে ব্রহ্মপুত্র তটে উপস্থিত হইবামাত্র এক নাবিক আসিয়া কবীন্দ্রকে নিজ নৌকায় লইতে যত্নপর হওয়ায় তিনি বিগ্রহাদিসহ নৌকারোহন করিলেন এবং রাত্রি মধ্যেই নিজ জন্মভূমিতে পৌছিয়া ভৈরব নদ তীরস্থিত নিজ পঞ্চবটীর অশ্বত্থ-বৃক্ষ মূলে নৌকা বাঁধিলেন। লক্ষ্মী ও বাসুদেবের উভয় বিগ্রহই আকারে বৃহৎ থাকায় তাঁহাদিগকে একেবারে লইবার সুবিধা হইল না। তাই কবীন্দ্র বিশ্বাস লক্ষ্মীকে নৌকায় রাখিয়া প্রথমে বাসুদেব বিগ্রহ, শঙ্খ ও পুরাণ লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে লক্ষ্মীকে লইবার জন্য পুনরায় ঘাটে আসিয়া লক্ষ্মীসহ সেই মায়াতরী এবং পঞ্চবটীরও চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। কবীন্দ্র বিশ্বাস অবাক্ হইয়া নদী তীরে উপবেশন করিলেন। এমন সময়

কে যেন দূর হইতে বীণানিন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'কবীন্দ্র বিশ্বাস! তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে ঠাকুরকে লইয়া গিয়াছ। আমি আর তোমার গৃহে যাইব না। তুমি ঠাকুরকে ভালবাস—তাঁহাকে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দাও—তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। যাও বৎস, তোমার মন্ত্র গ্রহণের সময় যায়, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও; আমি আমার স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।'

এই দৈববাণী শুনিয়া কবীন্দ্র বিশ্বাস বিষন্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সর্ব্বানন্দ সমীপে গমন পূর্ব্বক সস্ত্রীক তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মহামায়ার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ইহার পর যথাসময়ে কবীন্দ্র বিশ্বাস বাসুদেব বিগ্রহকে স্বীয় গৃহে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার নিয়মিত সেবা পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কবীন্দ্র বিশ্বাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশ্বনাথ কবিরাজের সময় সেনহাটীর তদানীন্তন ভূস্বামী চাঁচড়ার রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় সেনহাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাসুদেব ঠাকুরের বাসের জন্য একটি ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নিয়মিত সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৩/ বিঘা জমি দান করেন। বহুদিন ধরিয়া এই জমির উপস্বত্বে বিগ্রহের সেবা পূজা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সাময়িক জীর্ণ সংস্কারের অভাবে সে মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ায় এবং নানা কারণে দেবোত্তর সম্পত্তি আয় কমিয়া যাওয়ায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র অতি যত্নে গৃহহীন বিত্তশূন্য বিগ্রহকে নিজ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক একাকী সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া তাঁহার সেবা পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের সেবা পূজার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

৺স্যার রাসবিহারী ঘোষ সি, আই, ই।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের আইন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য সর্ব্বজন সুপরিচিত। তাঁহার ন্যায় মেধাবী এবং ক্ষমতাশালী আইনব্যবসায়ী খুব কম দেশেই জন্মিয়াছেন। এবং আইনব্যবসায়ে তাঁহার ন্যায় অগাধ অর্থোপার্জ্জনও খুব কম লোকই করিয়াছেন। সম্মান এবং পদমর্য্যাদাও তিনি যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন। তিনি বহুক্লেশে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অক্লেশে তাহা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ব্যবসায়ের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত, এবং ইদানিং বাতব্যাধিগ্রস্থ হওয়ায় অনেক সময় শারীরিক ক্লেশও সহ্য করিতে হইত। অনেক সময় এক এজলাস হইতে অন্য এজলাসে চাকরেরা তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু এই সমস্ত অর্থই তিনি শিক্ষার নিমিত্ত স্বজাতীর উন্নতির জন্য অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃপণের মত অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই। দেশের জন্য দশের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই ব্রতে আত্মোনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি বাহিরে কঠিন বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ঐ কঠোর বহিরাবরণের ভিতরে যে কোমল প্রাণ ছিল, তাহার পরিচয় পাইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে ঘনিষ্টভাবে আসিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু সত্যই বলিয়াছেন, তাঁহার আবরণটী নারিকেলের ছোবড়ার মতই কঠিন এবং তাঁহার অন্তর নারিকেলের মধ্যের সুমিষ্ট রসের ন্যায় স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর। তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ মহৎ ছিল, তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি কত গভীর এবং তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহ কত প্রবল ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার দানের পরিমাণ হইতে আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁহার দানের অধিকাংশ দান করিয়াছে। জীবিতাবস্থাতে একুশ লক্ষ, এবং শেষে উইলদ্বারা আড়াই লক্ষ, মোট এই সাড়ে তেইশ লক্ষ টাকা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিয়াছেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রজাপতি ছিলেন। শেষ উইলদ্বারা তিনি জাতীয় শিক্ষার নিমিত্ত যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণও প্রায় দশলক্ষ হইবে।

রাসবিহারী বিদেশীভাবে ও বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। তথাপি তিনি এরূপ স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী ছিলেন যে একদিনের জন্যও নিজের বিশিষ্টতা ও আত্মসম্মান বর্জ্জন করেন নাই। তিনি প্রায় সমস্ত ইয়োরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিন চোগা চাপকান পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াও তাঁহার জন্মভূমি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামখানির কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমগ্রদেশের জন্য চিন্তা করিতে হইত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জন্মগ্রামটী যে তাঁহার হৃদয়ের কতটা স্থান অধিকার করিয়াছিল; তাহা তাঁহার কার্য্যে এবং শেষ উইল পত্রেই প্রকাশ। পরের দুঃখে অশ্রুপাত করিবার মত লোকের অভাব হয় না। কিন্তু ঘরের লোকের দুঃখে কান দিবার মত লোকের একান্তই অভাব। তিনি তাঁহার এই ক্ষুদ্র জন্মভূমিখানির সমস্ত অভাব পূরণ ও বহু উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে একখানি আদর্শগ্রামে পরিণত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শেষ উইলদ্বারা তিনি নিজগ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য দেড়লক্ষ টাকা এবং তাঁহার লাইব্রেরীর আইন ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকসমূহ দান করিয়া গিয়াছেন। পিতামাতার স্মৃতি-রক্ষার্থ কয়েকটী সদনুষ্ঠানের জন্য এবং স্বগ্রামে একটী মন্দির নির্ম্মাণার্থেও বহু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এবং আজন্ম কেবল বিদেশী ভাবের ও ভাষার সহিত সংপৃক্ত ছিলেন। তাই তাঁহার এই প্রতিভার অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা কয়েকটী আইন প্রণয়ন, তাহার ভাষ্যরচনা এবং বিদেশীভাষা চর্চ্চাতেই ব্যয় হইয়াছে। তিনি দেশের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ যথেষ্ট দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদপেক্ষা স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট অমূল্য কোনও মানস-সন্তান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার উইল ইংরাজীতে করিতে চাহিলে তাঁহার যে মাতৃপ্রাণতার আঘাত পাইয়া তিনি সিংহবিক্রমে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "কি, আমার উইল ইংরাজীতে? না, কখনই হইতে পারে না"—সে মাতৃপ্রাণতা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত প্রচ্ছন্ন ভাবে তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বহন করিয়া গেলেন। আমাদের মনে হয় ইদানিং স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃ-ভাষার উপর তাহার অনুরাগ যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, তিনি যদি আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে এমন কোনও সম্পদ দান করিয়া যাইতে পারিতেন, যদ্দ্বারা তিনিও ধন্য হইতেন, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও পুষ্টিসাধন ও শ্রীবৃদ্ধি হইত।

স্যার রাসবিহারীর মৃত্যুতে কি যে এক দিকপাল খসিয়া পড়িল—ভারতাকাশ হইতে কি যে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল—দেশের যে কি অভাব হইল, তাহা সম্যক বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। এমন কর্ম্মী, দাতা ও মনীষার অবতার শুধু বাঙ্গলা কেন, ভারতের গৌরব।

শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

গ্রন্থ সমালোচনা।

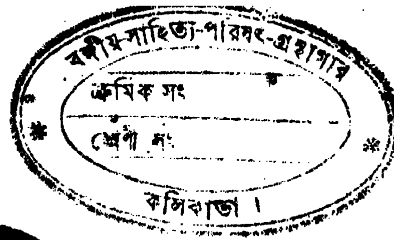
"আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর"ঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সংকলিত। একটি নানাপুষ্প-গুচ্ছে-গ্রথিত ফুলের তোড়া নলিনী বাবু আমাদের উপহার দিয়াছেন। নানাজনে রামেন্দ্র বাবুকে নানাদিক দিয়া কেমন দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষায় লিখিত মন্তব্য নলিনী বাবু সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিয়াছেন, এরূপ চেষ্টা বোধ

হয় বাংলা ভাষায় এই প্রথম। জ্ঞানাপণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি রামেন্দ্র বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, দেশাত্মবোধ, মধুর অমায়িক ব্যবহার, কর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ, যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। মহাত্মা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অসামান্য প্রতিভা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই—এ পুস্তকে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে মাত্র। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদের বিষয়গুলি যেরূপ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন ও নানারূপ পরিভাষা, সৃষ্টি করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার বংশের বিশিষ্টতার; ৺সুরেশ সমাজপতি তাঁহার দেশাত্মবোধের; মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী তাঁহার ভিতরকার ঋষিত্বের; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার দেব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের; বিদেশী আর, কিমুরা তাঁহার মধুর স্বভাব ও পাণ্ডিত্যের; দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার গভীর সহানুভূতির; ডাঃ শিশির চন্দ্র মৈত্র তাঁহার অভিমানশূন্য পাণ্ডিত্যের ও "নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প" ভাবের; অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার; জলধর সেন রামেন্দ্র সুন্দরের 'অসময়ত্ব'—অসময়ে আমাদের ত্যাগ করিয়া যাওয়ার; কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ও বিচিত্র প্রসঙ্গ লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁহার বন্ধু প্রীতি ও তাঁহার বঙ্গভাষাকে অসমাপ্ত দানের ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাঁহাদের লইয়া অধ্যাপক সঙ্ঘ গঠন ও সকলে মিলিয়া তাঁহার অক্রোধ অমাৎসর্য্য অমায়িক ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। লেখক—সর্ব্বশেষে তাঁহার পরিচয়, সাহিত্য সাধনা, শিক্ষা সংস্কারের রামেন্দ্র সুন্দর, সাহিত্য পরিষদ ও রামেন্দ্র সুন্দর সারস্বত ভবন পরিকল্পনায় রামেন্দ্র সুন্দর, সাহিত্যসম্মিলন ও রামেন্দ্র সুন্দর; চরিত্রানুশীলন এবং পরিশিষ্টে রামেন্দ্র সুন্দরের সাহিত্য সম্মিলনে নিজের লেখা প্রবন্ধ দিয়া এই সুখপাঠ্য বইখানি শেষ করিয়াছেন। এই বইখানিকে জীবন চরিত বলা যায় না—কিন্তু বইখানি বাংলাভাষায় গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে।

নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধঃ—৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ইঞ্জিনিয়ার) মহাশয় এডুকেশন গেজেটএর সম্পাদক থাকা কালে ঐ পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহারই কয়েকটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি যে সময়ের লেখা সে সময় আমরা অনেকদূর ফেলিয়া আসিয়াছি। তবুও সে আমলের পুরাণ কথা শুনিতে অনেকেরই বেশ ভাল লাগিবে।" আর যাঁহারা ইতিহাসের ভিতর দিয়া সাহিত্যকে দেখিতে চান তাঁহাদের নিকট এরূপ পুস্তকের যথেষ্ট মূল্য আছে। যে চারিটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "নাটক ও নাটকের অভিনয়" প্রবন্ধটীই প্রধান এবং অতিবিস্তৃত। এমন সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আমরা খুব কম দেখিতে পাই। নাটকের বিশেষত্ব, নাটক কবিগণের প্রতিভার বিশেষত্ব তিনি এমন সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এরূপ সমালোচনা আজকাল সাহিত্যে বড়ই দুর্লভ। লেখক নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাই বলিয়া তিনি যে কেবল বাহ্য মূর্ত্তির পরিমাপ ও বহির্দ্দেশের আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত, তাহা নয়। তিনি নাটকের চরিত্রের—তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব প্রকৃতরূপে অনুভব করিয়াছেন। এবং দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেকের প্রকৃতিতে একটা আদ্যোপান্ত একটী সঙ্গতি থাকে। এই সঙ্গতি বোধ না থাকিলে চরিত্রগুলি যেন বেসুর বেখাপ্পা হইয়া পড়ে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে অল্প বা অধিক পরিমাণে কল্পনা শক্তি অনেকেরই আছে। আমরাও অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রমণীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে স্বচ্ছ নীল সরোবর বসাইতে পারি আমরা সরোবরের তীরে লতা কুঞ্জও রচনা করিয়া সে কুঞ্জের ভিতরে সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে হরিণ শিশু রাখিতে অনায়াসে পারি, কিন্তু সে লতাকুঞ্জে পরিত্যক্তা জানকীকে ও পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে রাখিয়া তাহাদের প্রকৃতি সঙ্গত কথোপকথন করাইতে দুরূহ বা অসাধ্য বোধ করি। সৃষ্টির বাহ্যমূর্ত্তি

কল্পনা করা যত কঠিন, মানব হৃদয়ের ভাব রাশির প্রকৃত অঙ্কন তাহা অপেক্ষা শতগুণ কঠিন। লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' হইতে বুঝাইয়াছেন। রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন যে ক্ষেত্র বাবুর 'নাটক ও নাটকের অভিনয়' প্রবন্ধটী পড়িতে পড়িতে Hazzlit এর লেখা মনে করাইয়া দেয়। এই প্রবন্ধটী যে সময়ের লেখা, তখন পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনা তেমন পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। তখন কেবল মাত্র কলিকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার সর্ব্ব সাধারণের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। তখনও স্ত্রীলোক অভিনেত্রীর রঙ্গমঞ্চে অবতারণা হয় নাই। ক্ষেত্র বাবু বুঝিয়াছিলেন এই নাট্যশালা আমাদের জাতীয় জীবনে ভবিষ্যতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে। তাই বাংলা সাহিত্যে যাহাতে নাটক রচনার উন্নতি হয় ও কোনরূপ অসাধু-রুচি দূষিত নাটক সর্ব্বসাধারণে প্রচার না হয়, তজ্জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন।



প্রতিভা

১১শ বর্ষ — আষাঢ় ১৩২৮ — ৩য় সংখ্যা

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

অনার্য্য কে ? (শেষ অংশ)।

এই প্রবন্ধের "আর্য্যাবর্ত্ত" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রস্তাবে (৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৪—৪৪৫ পৃষ্ঠা,) আমরা বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইণ্ডিয়াদেশের অব্যবহিত পশ্চিমদিকে অবস্থিত পারদ (Parthia), বাহ্লীক (Balkh) এবং পরাস্য (Parsia) প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সংবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছি এবং তৃতীয় প্রস্তাবে (৯ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা ৪৭৯—৪৯৩ পৃষ্ঠা) ঐ সকল প্রদেশ যে "আর্য্য" জাতির প্রাচীন নিবাস ছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ (য়ুরোপীয়) উপস্থিত করিয়াছি। বর্ত্তমানে, আরও পশ্চিম দিকে যে "আর্য্য-জাতির" প্রাচীন নিবাসস্থান ছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু বিলাতী প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। স্বদেশী প্রমাণের সহিত এই সকল বিদেশী প্রমাণ মিলাইলে পাঠক মহাশয়গণ সহজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করিয়াই আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের ধৈর্য্যভিক্ষা করিতেছি।

(১) প্রাচীন মিডিয়া দেশ,—কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন "মিড্"গণ পারসীকদিগের সহিত খুব নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং "আর্য্য" জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহারাও জরথুস্ত্রের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত। এই দেশেই কিন্তু গ্রীক ভৌগোলিকগণ এক অনার্য্য জাতিরও অস্তিত্ব পাইয়াছিলেন।*

(১) "Media south of the Caspian sea—in modern Persia. The medians were of Aryan race, closely akin to the Persians, and professed the zoroastrian faith." "Nelson's Encyclopaedia. Vol XV. p 212. "Media lies cross wise to the west, and so presenting itself obliquely to Parthia, closes the entrance of both kingdoms into which it is devided. Its has, then, on the east the Caspii and the Parthi, on the south Sittacene, Susiane and Persis, and on the west, Adsia beni, and on the north Armenia." Pliny's Natural History, Vol II, Book VI, Ch 23, p 69. মিডিয়াকে সংস্কৃত মদ্র দেশ বলিয়াই অনুমান হয়, তাহা আমরা বলিয়াছি।

* Anariacal—(Vide Strabo XI, 508 514, Natural History Vol. II, Book VI etc)

(২) আর্মেনিয়া—আর্মেনিয়ার ভাষা ও "আর্য্য" অথবা ইণ্ডো-যুরোপীয় পরিবারের অন্তর্গত এবং উহাকে "পারসীক শাখার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। আর্মেনিয়ার কতগুলি রাজার নাম নিয়ে দেওয়া গেল। †

(৩) এসিয়া-মাইনর প্রদেশে অতি প্রাচীন কালে "হিট্টাইট" নামে এক সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতির বাস ছিল। আসিরিয়ার লোকেরা উহাদিগকে "খট্টি" এবং মিসরের লোকে তাহাদিগকে "খেটা" বলিত। "খট্টি" এবং "খেটা"—সংস্কৃত "ক্ষত্রিয়" অথবা "ক্ষত্র" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। হিট্টাইটদিগের জাতি "সেমেটিক" পরিবারের অন্তর্গত নহে বলিয়াই পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন।

(৪) হিট্টাইটদিগের দেশের নিকটে "মিটান্নী" নামক আর একটি সভ্য দেশ ছিল। মিসরের লোকেরা এদেশের অধিবাসিগণকে "নাহারাইন" বলিত এবং বাইবেলে উহাদিগকে "অরাম—নাহারাইন" বলা হইয়াছে। আমাদের মতে "মিট্টান্নী" মিত্রান্বনী "নাহারাইন" নারায়ণ ও "অরাম নাহারাইন" "রামনারায়ণ" শব্দের অপভ্রংশোৎপন্ন বলিয়াই মনে হয়।

জর্ম্মান দেশের কতিপয় পণ্ডিতের চেষ্টার ফলে "বোঘ-জাজকেনী" (লোকে বলে হিরোডোটাস এই স্থানকেই কাপা-ডোসিয়ার অন্তর্গত "টিয়া" বলিয়া গিয়াছিলেন) নামক স্থান খনন করিতে করিতে একখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত লিপিতে হিট্টাইট এবং মিটান্নী রাজের মধ্যে একটি সন্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে ঐ সন্ধিপত্রের প্রথমে স্বস্তিবচনে যে সকল দেবদেবীর নাম উক্ত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বৈদিক ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণের নাম প্রায়ই নিশ্চিতরূপে পাঠ করা গিয়াছে। * এই লিপি পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষোদিত হইয়াছিল।

বিখ্যাত "টেল—এল—আর্মনা" লিপিতে (১৪৭০—১৪০০ খৃষ্টপূর্ব্ব) মিট্টান্নী দেশের কতকগুলি রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, যথা "আর্ত্তান" (আর্ত্তত্রাণ) "আর্ত্তযুম" (আর্ত্তক্ষম), সুতার্ণ (সুত্রাণ) এবং দষরট্ট (দশরাষ্ট্র) অথবা দশরথ ?) †

(২) Armenia—Armanian itself belongs to the Indo-Germanic family of language, and has frequently been assigned to the Iranian branch. Ibid. Vol II. p 198.

† Arame (রাম ?), Sarduris (শার্দ্দূলীশ) Ursa or Rusas (ঋক্ষ) Artaxias (আর্ত্তক্ষয় ?) Valarsaces (বল-হৃষীকেশ ?) Historian's History of the World—Vol. II. pp 388–389.

(৩) "Hittites" called "Khatti" by the Assyrians and "Kheta" by the Egyptians. Historians History of the world, Vol II (India) p 380."The Hittites were not a Semitic race." Historians History of the word. Vol II p. p. 392–393'

(৪) "Mittani" called "Naharain" by the Egyptians and "Aram—Naharain" in the Bible. Ibid p 381.

* "The investigation has entired a new and more favourable stage as the result of the discoveries made by German excavators at Boghaz-Keni (said to be identical with Herodatus Ptea in Caplapadocia) where treaties between the king of the Hittites and the king of Mitanni, in the beginning of the 14th century B. C. seem almost certainly to contain the names of the gods "Mitra", "Varuna" and "Indra" which belong to the early Aryan mytholgy." Encyclopaedea. Britanica. 11th Edition Vol II. p 712. 2nd column.

† Historians History of the world. Vo II (India) p 381.

(৫) ফ্রিজিয়া—(এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত)—দেশের রাজগণের নামের মধ্যে "মীঢ়," পাওয়া যাইতেছে। বিখ্যাত চন্দ্রবংশের রাজতালিকায় ও অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়।

(৬) ক্যাপাডোসিয়া (এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত)—দেশের রাজগণের মধ্যে "আর্য্যরথ" ও "অর্কলেশ" নাম পাওয়া যাইতেছে।

(৭) কেরিয়া দেশের রাজগণের "পক্ষধর" ও "অনন্তপদ" নাম ও এক কুমারীর নাম "আড্ডা" পাওয়া যাইতেছে।

(৮) পণ্টাস্ (প্রান্ত ?—এসিয়া মাইনরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে, কাপাডোসিয়ারই একাংশ)—এখানকার প্রথম রাজার নাম "আর্য্যবর্জনেস্" (আর্যপর্জন্য ?) এবং পরে ক্রমে ক্রমে ছয়জন রাজার নাম "মিথ্রিডেটাস্" (মিত্রদত্ত) পাওয়া গিয়াছে। (মিত্র = সূর্য্য—প্রাচীন পারসীক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে)।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া জনৈক পণ্ডিত বলিতেছেন যে "আর্য্য অভিযান যে ঠিক কোন সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে বৈদিক সময়ে (প্রায় ১৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব) ভারতীয় আর্য্যগণ পাঞ্জাবে বাস করিতেছিলেন এবং প্রায় সেই সময়েই এসিয়ার পশ্চিমাংশে কতকগুলি নামের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ নামগুলি যে ইরাণীয় (আর্য্য) তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ইজিপ্টের "টেল-এল-আমর্না" লিপিতে সিরীয় দেশের কতকগুলি সামন্ত রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা আর্ত্তমন্যু, আর্যবীয়, (আর্যবীর্য ?) সুবরদত (দত্ত ?) এবং একটী নাম যাহার শেষাংশ বৰ্জন (পৰ্জন্য ?) ইত্যাদি। অপর পক্ষে ইউফ্রেটীশ নদীকূলস্থ মিটান্নী দেশের রাজগণের নাম ও আর্ত্তত্রাণ, সুতান, আর্ত্তসুমার (কুমার ?) এবং দশরথ (দশরথ অথবা দশরাষ্ট্র ?)—ইত্যাদি এত অনেক, (কত বলিব ?) প্রকৃত ইরাণী (আর্য্য ?) নাম পাওয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে দৈবাৎ মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। *

(৯) এসিরিয়া (অসুর) দেশের ক্ষোদিত লিপিতেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে উত্তর-সিরীয় প্রদেশের রাজগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ইরাণীয় (আর্য্য ?) নাম পাওয়া গিয়াছে; যথা,—কুণ্ডাস্পি (কুণ্ডাশ্ব, চণ্ডাশ্ব অথবা খণ্ডাশ্ব) এবং কুটাস্পি (কুটাশ্ব)। এই রাজগণের প্রজা সাধারণ কিন্তু ইরাণীয় (আর্য্য ?) ভাষায় কথোপকথন করিত না এবং ঐ সকল দেশের ঐ সময়ের প্রচলিত ভাষা সমূহকে আর্য্যগন্ধি ভাষা

(৫) (৬) (৭) (৮) Midas. Ariarathes, Archalaus, Pexodarus, Orontobates—(Princess) Ada. Ariobarzanes, Mithridates.

* "The date of this migration (Aryan) can not be determind with certainty. We know only that the Aryans of India already occupied the Punjab in the Vedic Era (C. 1800 B. C.) On the other hand, about the same period a number of names, undoubtedly of Iranian, made their appearance in western Asia (cf Edward Meyer). In the cuniform letters from Tell-el-Amarna in Egypt (1400 B. C.), we find among the prince-lings of Syria and palestine names like Artamanya, Arzawiya, Shuwardata, a name terminating in warzana etc, whole kings of Mitanni on the Euphrates are Artalarna, Shutarna, Arta shumara and Dushratta, names too numerous and too genuinely Iranian to allow of the hyphotheses of coincidence. Encyclopaedia Britanica, 11th Edition, Vol XXI, p 202.

বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা একেবারেই বিফল হইয়াছে *। "ব্যাবিলোনিয়া" প্রদেশের রাজগণকে "পাটেসী" (পট্টশ্রী অথবা পট্টেশ—যেমন পট্টমহারাণী—বাঙ্গলা পাটরাণী) বলিত কিন্তু "আসিরিয়া" প্রদেশের রাজাকে ইষ্‌ষাকু (ইক্ষ্বাকু) বলিত †।

(১০) বাবিলোনিয়া (বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থাবলীতে "বাবেরু" বলা হইয়াছে, যেমন "বাবেরু জাতক") প্রদেশের অতি প্রাচীন অধিবাসিগণের আকৃতি, ভাষা ও পরিচ্ছদ একেবারেই সেমেটীক জাতি হইতে পৃথক্ ছিল। উহাদের মধ্যে দক্ষিণ প্রদেশের লোকদিগকে "সুমেরিয়ান" এবং উত্তর প্রদেশের ব্যক্তিবৃন্দকে "আক্কেডিয়ান্" বলিত। এই শেষোক্ত অর্থাৎ আক্কেডিয়ান্‌গণকে কেহ কেহ সেমেটীক মনে করিয়াছেন কিন্তু বাবিলোনিয়ার প্রাচীন সভ্যতা একেবারেই সুমেরিয়ান্ এবং উত্তর বাবিলোনিয়ার তথা কথিত সেমেটীকগণ সুমেরিয়ান্‌দিগের ধর্ম্ম, ভাষা ও লিপি (কীলরূপা) গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার আসিরিয়ার লোক বাবিলোনিয়ার অধিবাসিগণের নিকট তাহাদের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও লিপির জন্য ঋণী ছিলেন ‡। এই "সুমেরিয়ান্" জাতিকে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ, তাহাদিগকে আর্য্য, কেহবা মোঙ্গলীয় বলিয়াছেন ¶। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন "সুমেরু" (দেবস্থান) পর্ব্বতের নাম হইতে আপনাদিগের জাতি নামকরণ করিয়াছিলেন, এবং "আর্য্যভাষী" ছিলেন।

এইমাত্র উপরে লিখিত হইয়াছে যে উত্তর বাবিলোনিয়ার অধিবাসিগণকে "আক্কেডিয়ান্" বলিত এবং তাহাদিগকে কেহ কেহ সেমিটীক বলিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে সুমেরিয়ান এবং আক্কেডিয়ান একই জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা এবং উহাদের ভাষাও একই প্রকার। এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যে বিষম দ্বন্দ্ব হইয়াছে, তৎসমুদয় আলোচনার পর প্রফেসার মেসপেরো বলিয়াছেন যে প্রাগুক্ত "আক্কেডিয়ান"

* "In the Assyrian inscriptions we occasionally meet with Iranian names borne by North-syrian Princes, e. g. Kundaspi, and Kutaspi. There subjects, on the contrary, speak absolutely different tongues ; for the attempts to explain the language of the Casscans, Mitanniand, Arzapians as Indo-European (Iranian) have ended in failure." Blomfild quoted in the Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Vol XXI, p 202. সংস্কৃত "অশ্ব" শব্দ প্রাচীন পারসীক ভাষায় "অশপ" এইরূপ ধারণ করিত,—এখনও নব্য পারসীক ভাষায়ও তাহাই দেখা যায় বলিয়া শুনিয়াছি।

† "Its rulers were called Ishshakku, corresponding to the Babylonian Patesi." Harmsworthe's Universal Encyclopaedia, Ed. 1920. Vol 1. page 702.

‡ The oldest inhabitants of the country that came to be called Babylonia were the Sumerians, who dwelt in the South, spoke a language, and exhibit types of face and costume wholly un-semitic. The earliest culture of Babylonia was Sumerian, but the Semites of N. Babylonia took over the cuneiform script, much of their intellectual culture, and their religions ideas. Similarly, the Assyrians were indebted both intellectually and religiously almost wholly to the Babylonians. Ibid, Vol 1. p. 812.

¶ Ancient Chaldeaa. By prof, G. Maspers. Edited by profo Sayce English 4th Edition. pp 550—551

ও "সুমেরিয়ান্" জাতির অন্তর্গত এবং তাহাদের ভাষাও সেমেটীক বলিয়া বোধ হয় না *। এই "সুমেরিয়ান" জাতির লোকে ক্রমশঃ ক্যালডিয়া, বাবিলোনিয়া ও আসিরিয়া দেশে অন্যান্য জাতির সংঘর্ষের এবং অন্যান্য জাতির রাজনৈতিক অধীনতার ফলে ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ অবশেষে তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে চিনিয়া লইবার কোনও উপায় ছিল না †। এই সুমেরিয়ান্ জাতি উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়, এবং তাহারা তাহাদের ব্যবহৃত একপ্রকার অদ্ভুত লিপিবিদ্যা (কীলরূপা) সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল; এবং এই লিপিই ক্রমশঃ দশটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, পরিবর্দ্ধিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রাচীন পারসীক বিজয়ের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য এসিয়ায় যে সকল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেরই সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই লিপির প্রসাদেই ঘটিয়াছে। ইহাদের ভাষা ক্রমে সেমিটীক ভাষার প্রাবল্যে অধিকারচ্যুত হইলেও তাহা ধর্ম্ম ও আচার এবং প্রাচীন শাস্ত্র-ব্যাখ্যার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত এবং যখনই কোন রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইবার জন্য ক্ষোদিত হইত তখন এই ভাষারই সহায়তা লইতে হইত। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও দেবোপাসনা ক্রমশঃ সেমিটীক ধর্ম্ম ও উপাসনার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। কালবশে নানা সম্প্রদায়ের যে দ্বাদশাধিক জাতি ইহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি (যেমন কালডিয়ান ও আসিরিয়ান্) সেমেটীক এবং অপরগুলি —(ইলামীয়, কশীয়, পারসিক মাকিডনীয় এবং পারদ) হয়— আদৌ সেমেটীক জাতির সহিত শোণিত সংস্রবে আবদ্ধ ছিল না, অথবা "সুমেরিয়ান" গণের সহিতই দূরসম্পর্কেই সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় ‡।

* Foot note 5, page 550 prof Maspero's "The Dawn of civilisation" 4th Edition.

† The process of fusion commenced at such an early date, that nothing has really come down to us from the time when the two races were strangers to each other. Ibid p. 551.

‡ They came, it wonded appear, from some northern country; they brought with them from their original home a curious system of writing, which, modified, transformed, and adopted by the different nations, has preserved for us all that we know in regard to the majority of the empires which rose and fell in western Asia before the Persian conquest. Their language gave way to the semitic, and tended gradually to become a language of ceremony and which was at learnt less for everyday use, than for the drawing up certain royal inscriptions, or for the interpretation of very ancient text of a legal or sacred character. Their religion became assimitated to the religion, and their gods indentified with the gods, of the semites. In the course of the ages they had to submit to the invarious and lomiation of some dozen differant races, of whom some—Assyrians and bhaldians—were descunded from a semisticstoek, white the others—Elamtes, Cossaeans, Persians, Macedonians and pasthians either are not connected with thare by any tie of blood or traced this orgin in some distant manner to the sumerian branch. Ibid, pp. 550—551.

উল্লিখিত "সুমেরিয়ান"গণের ভাষা কালডিয়া, বাবিলোনিয়া এবং আসিরিয়া প্রভৃতি দেশে যেরূপ আচার, ধর্ম্ম এবং ব্যবহার শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধাদি প্রতিপালনের এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার ভাষা স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষাও (বৈদিক এবং লৌকিক) ঠিক ঐরূপ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মকার্য্যে (দেবোপাসনা, যজ্ঞ এবং পিতৃ-ক্রিয়া) যেরূপ বৈদিক এবং পৌরাণিক সংস্কৃত ভাষা যথাযথ ব্যবহার করিতে হয় এবং উহার উচ্চারণ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গেরও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে মহা প্রত্যবায়ের আশঙ্কা জন্মে, এই সকল পাশ্চাত্য দেশেও দেব ভাষা ব্যবহার-সম্বন্ধে ঠিক তদ্রূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবার বিধান দেখা যায়। য়ুরোপীয় বিদ্বান্ নিজের সংস্কার-বশতঃ বলিতেছেন, "ভূত প্রেতাদি অশুভকর্ম্মা উপদেবতার শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য ইহারা (আসিরীয়ার অধিবাসি-বর্গ) মন্ত্র উচ্চারণ করিত; বাঁধাবাঁধি কতকগুলি মন্ত্র ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হইত, এমন কি বিশুদ্ধ ভাবে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতে পারিলেই অশুভের প্রতীকার হইবে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত এবং মন্ত্রের বর্ণ অথবা তাহার উচ্চারণের সামান্য ত্রুটি ঘটিলেই সর্ব্ব কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করিত।"*

এই প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে আমরা বলিয়াছি যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের "Aryan"(আর্য্য) শব্দটি সংস্কৃত "আর্য্যবাচঃ" অথবা আর্য্য ভাষাভাষি জনগণকে বুঝাইয়া থাকে, উহা মনুষ্যের কোন জাতিবিশেষকে বুঝায় না এবং উহাকে জাতিতত্ত্বের পরিভাষার মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নহে। গত বৎসরে (১৯২০) প্রকাশিত একখানি বিলাতী বিশ্বকোষে অনেক পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, "প্রোফেসার ম্যাকসমূলরই প্রথমে এসিয়ার কোন অংশের (পশ্চিম-মধ্য এসিয়া) নিবাসী "আর্য্য" নামক একটি আদিম মানবজাতির অস্তিত্বের কথা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে, তাঁহার পরিপক্ক জ্ঞানের সময়ে, যদিও তিনি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি, এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে প্রাচীনকালে আর্য্য ভাষাভাষী একটি পৃথক্ এবং নির্দ্দিষ্ট ভাবের আর্য্য নামধারী মানব জাতির অস্তিত্বের ধারণা রহিয়া গিয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব শাস্ত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষাগুলির মধ্যে একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে; আবার তদ্রূপ, জাতিতত্ত্বের শাস্ত্র দেখাইয়াছেন যে ঐ সকল ভাষাভাষি জনগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শোণিতস্রোত বিদ্যমান্ রহিয়াছে। ফলতঃ প্রায় এই সকল জাতি মূলতঃ ককেশীয় হইলেও জাতিতত্ত্বের হিসাবে 'আর্য্য' বলিয়া কোন মূলজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন কালেই নাই †।"

* "In order to neutralise the power of evil spirits these peoples resorted to incantations; certain formulæ were recited, even words were regarded as counter-charms if recited with perfect accuracy; but the smallest error in any part of the enchantment meant the impotence of the whole." Universal Encyclopædia, Vol. I, p. 707.

† It was Prof: Maxmuller who familiarised the public with the conception of a primitive Aryan population, dwelling in idyllic simplicity 'somewhere in (west central) Asia'. Yet, despite the vigorous protest of his maturer years, the notion that the Aryan-speaking peoples are members of a nomogeneous Aryan race still survives in popular usage. Comparative philology has established their community of speech; ethnology has no less demonstrated their diversity of blood. While almost all these peoples are radically aucacian, there is no place in the ethnic category for a generic Aryan stock." E. G. Harmer in Ibid. Vol. I, page 666.

ফলতঃ য়ুরোপীয় বিদ্বদ্‌বর্গ "আর্য্য" বা (Aryan) শব্দটিকে জাতিতত্ত্বের পরিভাষার অন্তর্গত করিয়া যে বিষম গোলোযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আভাস আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দিয়াছি। Ethnology অথবা জাতিতত্ত্ব প্রকৃত "বিজ্ঞান" উপাধি শাস্ত্রগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে অধিকারী বলিয়া আদৌ আমরা স্বীকার করি না। "মনুষ্যজাতি" যে "আর্য্য" ও "অনার্য্য" ভেদে পৃথক্ পৃথক্ জাতিতে (Race) বিভক্ত হইতে পারে, এরূপ ধারণা আমাদের দেশের ঋষিরা কখনই করিতেন না; তাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদ হইতে মনুষ্যজাতির মধ্যে বর্ণ-বিভাগের সৃষ্টি স্বীকার করিতেন; কাজেই, তাঁহাদের মতে "অনার্য্য শূদ্র"ও কালক্রমে গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে "আর্য্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" হইতে পারিত। য়ুরোপীয় জাতিতত্ত্ব মানুষের দেহের বর্ণ, উচ্চতা, মস্তক, নাসিকা এবং মুখের গঠন এবং কেশশ্মশ্রুর বাহুল্য অথবা অল্পতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতিকে "আর্য্য" ও "অনার্য্য" ইত্যাদি তথাকথিত "স্বাভাবিক" শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঘোর বিবাদের ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অভিনব জাতিতত্ত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শ্বেতকায়, উচ্চদেহ, উন্নত ঘোণ এবং কেশশ্মশ্রুবহুল "আর্য্য" নামক এক মানবজাতির কল্পনা করিয়া টিউনিক, গ্রীক, ইরাণী এবং পাঞ্জাবী প্রভৃতি কতকগুলি জাতিকে "আর্য্য" এবং তদ্ব্যতীত শক, মঙ্গোল, দ্রবিড়, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণকে "অনার্য্য" শ্রেণীতে ফেলিয়া এক ভয়ানক কলহের সৃষ্টি করিয়াছেন আর ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়-শিষ্যসঙ্ঘ সেই কলরবে যোগদান করিয়া বঙ্গকে মহা বিরোধে পরিণত করিয়াছেন। এই গোলযোগের অন্যতর জন্মদাতা ম্যাকস্‌মূলার পরিণত বয়সে উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহার প্রথম বয়সের ভুলের কথা জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিলেও পূর্ব্ব কলরবের কচকচিতে তাঁহার সে কথা লোকে শুনিয়াও শুনে নাই; পরন্ত আজিও আমাদের দেশের নবীন বৈজ্ঞানিক বিদ্বান সেই পুরাতন পাঠই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের সহিত যাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে নানাভাবে কুবাক্য বলিতেছেন। তাঁহারাই আজও প্রচার করিতেছেন যে রাজপুতজাতি অনার্য্যসংশ্রবে দুষ্ট, বেহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা প্রায় পৌনেষোলআনা অনার্য্য এবং ভারতখণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রই অনার্য্য রক্তের স্রোতে বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত প্রায় "মসীবর্ণ" হইয়া গিয়াছে। শক, মঙ্গোল, অথবা দ্রবিড়েরা যে কেন, "অনার্য্য" তাহার প্রমাণস্বরূপে আজিও তাঁহারা সেই দীর্ঘকরোটি, শ্বেতবর্ণ, উন্নত নাসিকা ইত্যাকার পাঠ পড়িতেছেন এবং উপস্থিত করিতেছেন।

আমাদের শাস্ত্রের মতে "আর্য্য" শব্দের অর্থ যে "ভদ্র, সজ্জন ও সাধু" এই কথা আরও অনেকবার বলিয়াছি। প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দ্বিজ ত্রিবর্ণের লোকই ভদ্র, সজ্জন এবং সাধু ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহারাই "আর্য্য" বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। শূদ্রের সভ্যতার স্তর অত্যন্ত নীচে ছিল, সুতরাং শূদ্রকে প্রায়ই "আর্য্য" বলিয়া গৃহীত হইত না—পরন্তু সে "অনার্য্য"ই ছিল। তথাপি এই শ্রেণী বিভাগ, সেই প্রাচীন কালে আধুনিক জাতিভেদের মত "অচলায়তন" ছিল না। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রামান্য মনুসংহিতা এবং আপস্তম্ব সূত্র স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণেরও ঐরূপ ঘটে এবং "ধর্ম্মাচরণের ফলে জঘন্যবর্ণের জাতি উত্তরোত্তর উচ্চবর্ণে উন্নত হয় এবং অধর্ম্মাচরণের ফলে উচ্চবর্ণের জাতি ক্রমশঃ নীচবর্ণে অবনত হইয়া থাকে"।* এই শাস্ত্রবাক্য যে কেবল মাত্র শাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, সমাজে রীতিমতভাবে ইহা কার্য্যকর হইত। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের বহুব্যক্তি গুণ এবং কর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণত্ব

* মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায় ৬৫ শ্লোক এবং আপস্তম্বসূত্র—। ২০১ বর্ষ "প্রতিভা"র ১৫৪ পৃষ্ঠায় পাদ টীকায় মূল উদ্ধৃত হইয়াছে।

জাত করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা এই প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাবে (১ম বর্ষ, ২৫০—২৫৬ পৃষ্ঠা) উপস্থিত করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের ব্যক্তিবৃন্দ সেকালের সভ্যসমাজে পাশাপাশি প্রতিবেশিরূপে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের ভাষা "আর্য্যভাষাই" ছিল। মনুস্মৃতিতে এই আর্য্যভাষায় কথোপকথনকারিগণকে "আর্য্যবাচঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চারিবর্ণের লোকেই বেদ এবং স্মৃতির শাসন প্রধানতঃ মান্য করিয়া সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেন।

এই চারিবর্ণের মনুষ্য ভিন্ন আর যে কেহ সেকালে আমাদের দেশে ছিলেন না, তাহা নহে। ভারতখণ্ডের প্রাচীন বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে এই দেশের মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বানির্জ্যাদি নিজ নিজ জীবিকাদ্বারা নির্ব্বাহ করেন। এবং ইহার ভিতরে ভিতরে ম্লেচ্ছগণও নিত্যই বাস করেন। ইহার পূর্ব্বভাগ কিরাতগণ এবং পশ্চিমভাগে যবনগণ বাস করিয়া থাকেন †। "ম্লেচ্ছ" কাহাকে বলে, তাহা আমরা ইত্যগ্রেই পাঠকমহাশয়গণকে নিবেদন করিয়াছি ‡।

† "দ্বীপোহ্যপ নিবিষ্টোহয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা হ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনা স্মৃতাঃ॥৮২॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধ বণিজ্যাভির্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥৮৩॥"
বায়ু পুরান, ৪৫ অধ্যায়।

এই যে " বলা হইয়াছে ইহা Indian Peninsula —" দ্বিধাপত্বাৎ স্মৃতা দ্বীপাঃ " দুইদিকে সমুদ্র থাকিলেই দ্বীপ হইতে পারে।" "ভারতবর্ষের" যে নয়টী বিভাগ আছে, এইটী তাহার নবম। বাকী আটটির কথা পূর্ব্বেই (প্রতিভা নবম বর্ষ ৩৯১ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে।

‡ "প্রতিভা, বর্ত্তমান বর্ষ, গত শ্রাবণ সংখ্যা,—প্রথম প্রবন্ধ "ম্লেচ্ছ" দেখুন।

উল্লিখিত "ম্লেচ্ছ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে প্রাচীনকালে সংস্কৃতভাষায় কথোপকারিগণ অপভ্রংশ, ভ্রান্ত অথবা ব্যাকরণ দুষ্ট সংস্কৃত এবং সংস্কৃতভাষা হইতে ভিন্ন ভাষায় কথোপকথনকারি জনগণকে "ম্লেচ্ছ" এবং তাঁহাদিগের ভাষাকে "রাক্ষসীভাষা", "পৈশাচীভাষা" অথবা "ম্লেচ্ছভাষা" বলিতেন। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের লোক ভিন্ন (অর্থাৎ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে জাত জনগণ ভিন্ন) আর সকল লোককেই, (তাহারা আর্য্যভাষা অথবা ম্লেচ্ছভাষা যাহাই ব্যবহারকরুক না কেন, তাহাদিগকে) "দস্যু" বলে *। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আচার ব্যবহার অথবা গুণকর্ম্মের দ্বারা সভ্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে কেবল মাত্র সাধুভাষা বা "আর্য্য" ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে পারিলেই সে কালে কেহ "আর্য্য" পদ বচ্য হইত না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কেবল ভাষা শুনিয়া, কাহারও সভ্যতা অথবা ভদ্রতার স্তর কেমন নর্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া তাহার জাতি নির্ণয় করাও অসম্ভব। অধুনা আমেরিকা দেশের নিগ্রোবংশধরগণ, ইংরজের বংশধরগণের মতই ইংরেজিভাষা বলিতে পারেন,—আমাদের দেশেত এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। দুই তিন পুরুষ মাত্র বঙ্গদেশে বাস করিয়া কত বেহারী, ওড়িয়া এমন কি পঞ্জাবী পরিবার ভাষায় একেবারে শুদ্ধ "বাঙ্গালী" হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় শিক্ষিত মারবারী, পাঞ্জাবী অথবা মরাঠী সজ্জন এরূপ অনেক আছেন, যাঁহাদের পক্ষে "বংগালী বোলী" একেবারে মাতৃভাষা হইয়া গিয়েছে। বেশভূষা এবং ভাষা এরূপ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই তাহার উপর নির্ভর করিয়া কাহারও জন্মভূমি, ধর্ম্ম, সভ্যতা অথবা জাতির নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রাচীনভারতে তাই এরূপ অসঙ্গতভাবে জাতি বা সভ্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই।

* "মুখবাহূরু পজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।,,
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৫॥
মনুসংহিতা দশম অধ্যায়।

সংস্কৃত ভাষাভাষী অথবা "আর্য্যবাচঃ" জনগণের মধ্যেও যেরূপ "দস্যু" বা অসাধু লোকের সংখ্যা অল্প ছিল না, তদ্রূপ "ম্লেচ্ছবাচঃ" অথবা অসংস্কৃত ভাষাভাষীগণের ভিতরও সাধু সজ্জন অর্থাৎ "আর্য্য" মানবের সংখ্যা অনেক ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আর্য্যাবর্ত্ত দেশের যে বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে এই বিশাল দেশের সর্ব্বত্রই আর্য্য ও অনার্য্য জাতি কতকটা মিশ্রভাবে বাস করিতেন। শক, যবন, পারদ, পহ্লব, চীন, খস ও দ্রবিড় প্রভৃতি জাতি যে আমাদের প্রাচীন আর্য্য ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে উদ্ভূত তাহার পৌরাণিক প্রমাণ আমরা উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রকারগণ "আর্য্য" ও "অনার্য্যের" যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া প্রাগুক্ত জাতির কাহাকেও আমরা "অনার্য্য" বলিতে পারি না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আবার এক একটি পৃথক দেশ বা স্থানকে এক একটি পৃথক পৃথক জাতির আদিম নিবাস ভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের তথা-কথিত "আর্য্য জাতির" আদিম প্রসূতি ভূমির অন্বেষণে সমগ্র প্রাচীন মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইংরেজ জাতির শাসনাধীন "ইণ্ডিয়া" দেশকে প্রথমেই পরি-বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা এসিয়ার হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে য়ুরোপের পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মরু ও পর্ব্বতময় ভূখণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ এখানে কেহবা ওখানে অথবা একজনই কখনও এখানে কখনও বা ওখানে—এইরূপ করিয়া প্রকৃত স্থান নির্ণয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সারা হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা কিন্তু অম্লান বদনে বলিয়া গিয়াছেন যে এই বিশাল দেশের সর্ব্বত্রই সভ্য ও অসভ্য (আর্য্য ও অনার্য্য) এবং সংস্কৃত ভাষী ও অসংস্কৃত ভাষী মানব চিরকাল ধরিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মতে দেশের সমাজে সভ্য ও অসভ্য মানুষ চিরকালই আছে। অবশ্য সংখ্যার অল্পাধিক্য ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, কিন্তু এই প্রভেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। গুণ এবং কর্ম্ম অর্থাৎ আচার ও ব্যবহার দেখিয়া ভদ্র ও অভদ্রের প্রভেদ তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন,—আমরা এখনও তাহাই করিতেছি। বংশ, আচার এবং ধর্ম্ম এই ত্রিবিধ লক্ষণের দ্বারা প্রথমে তাঁহারা মানুষকে "সভ্য" অথবা "আর্য্য" বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিয়া আমরাও দেখিয়াছি যে পৌরাণিক শক, যবন, পারদ, পহ্লব, চীন ও দ্রবিড়াদি জাতির কাহাকেও "অনার্য্য" বলা যায় না।

সময়ের সহিত মানুষের সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বেশ, ভূষা, পান, আহার, ভাষা, সাহিত্য এমন কি সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই কালের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা নিত্যই লক্ষ্য করিতেছি। তথাচ, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মানবজাতির সভ্যতার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনশীল অঙ্গের মধ্যে একটিকে অধিকতর দৃঢ় এবং স্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক প্রাচীন জাতির মধ্যে একটি করিয়া এমন পুরাতন ধারা চলিয়া আসে যে সেই ধারাটি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত অথবা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। এই জাতীয় ধারার মধ্যে পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন ঐতিহ্য সমূহকে আবার শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন মানব সমাজেই পৃথিবীর আদিম সৃষ্টি, দেব দেবী ও মানুষের জন্ম বিবরণ, দেব দেবীর উপাসনা ও তাহার পদ্ধতির একটী ধারাবাহিক ঐতিহ্য এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, এই ঐতিহ্য স্রোতটিকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঐ সমাজের সহিত ঐরূপ প্রাচীন অন্যান্য মানব জাতির সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এই পথ অবলম্বন করিয়াই কর্ণেল টড্ রাজপুত জাতির সহিত শক-সংশ্রবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইরূপ পথ ধরিয়াই মিঃ পোকোক প্রাচীন গ্রীসের সহিত প্রাচীন ইণ্ডিয়ার সংশ্রবের কথা বলিয়াছেন এবং এই পথ ধরিয়াই মিঃ হাভেল বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহাসিক একত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। *

* Tod's Rajsthan Vol I. Pockoke's India in Greece. Mrs. Havel's "Aryan Rule in India."

এই পথ অবলম্বন করিয়া আমরাও প্রাচীন ভারতবর্ষের এই "আর্য্য ও অনার্য্য" সমস্যা সমাধানের উপসংহার করিব। দেশের সাহিত্য এবং শিল্পকলা উভয়েই প্রাচীন অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য পরম্পরাকে ধরিয়া রাখে এবং এই উভয়ের সাহায্যেই এই পথ চলিতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা একেবারে অনভিজ্ঞ;—সে দুরূহ এবং দুরব-গাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি এবং উপাদান আদৌ নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের অধিকার নিতান্তই সীমাবদ্ধ; প্রাচীন অসুর-ভাষা, পারসীক ভাষা এবং বৈদিক সংস্কৃতভাষার দ্বার আমাদের পক্ষে চিরবিরুদ্ধ,—সুতরাং এ পথে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য বলিলেও হয়। তথাপি, ভেলক সহায়ে সাগর পার হওয়ার চেষ্টার ন্যায়, আমরা এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি; ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং পাঠকমহাশয়-গণের ধৈর্য্যই আমাদের অবলম্বন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

পহেলা আষাঢ়।

বিরহী যক্ষের ব্যথা মূর্ত্তিমান হয়ে
গুমরি' উঠিছে আজ আমায় হৃদয়ে
উদাসী ব্যাকুল করি'! প্রেয়সী আমার
পূর্ণ করি একদিন যৌবন-ভৃঙ্গার
মধুর অমৃত রসে তৃষ্ণার্ত্ত পরাণ
ভরে দিত ক্ষণে ক্ষণে অফুরন্ত গান
জাগিত মরমতলে! অভিশাপে কার
সে আনন্দ-স্বর্গ হতে হায় রে আমার
ঘটেছে পতন ঘোর—প্রিয়া মোর নাই
এ বক্ষের পাশে আর! ভাবিয়া না পাই
কোন্ দূর অলকায় মুক্ত-বাতায়নে
সে আজ রয়েছে বসি'—পড়ে না কি মনে
এ দুর্ভাগা মর্ত্ত্য জীবে! কোথা জলধর
বহিতে আর্ত্তের বার্ত্তা প্রেয়সী গোচর!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জার্ম্মান রাজ-পরিবার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সম্রাটের ৪০টী রাজপ্রাসাদ আছে তাহার কখন এখানে কখন সেখানে অবস্থান করেন।

একদা সম্রাটের সহিত আমরা রেলগাড়ীতে স্থানান্তরে যাইতেছি তখন সম্রাট আমাকে শস্যক্ষেত্র দেখাইয়া বলিলেন "দেখুন, মিস্ হাওয়ার্ড আপনাদের দেশের মত নানারূপ বিজ্ঞাপন দ্বারা আমার ক্ষেত্র নষ্ট করিতে দেই নাই।" কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে ব্যবসার খাতিরে জর্ম্মনীর ক্ষেত্র সমূহ ইংলণ্ডের অনুরূপ হইয়াছিল।

রাণী।

সম্রাজ্ঞী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি নিতান্ত সন্তান বৎসলা। তাঁহার সন্তানদের প্রথম দুধদাঁত পরিলে উহা সযত্নে রাখিয়া একটী আংটী তৈয়ার করিয়া তাহাতে মুক্তার মত ঐ দাঁতটী বসাইয়া উহা যত্নে রাখিয়া দেন।

একদা আমরা ট্রেনে যাইতেছি পথিমধ্যে এক ষ্টেসনে একটী বালিকা সম্রাজ্ঞীকে দিবে বলিয়া একটী তোরা নিয়া শীতের মধ্যে অনেক সময় বসিয়াছিল। আমরা তথায় উপস্থিত হইলে বালিকাটী কাঁপিতে ২ আসিয়া রাণীর হস্তে তোরা দিয়া যখন হস্ত চুম্বন করিবে এমন সময়ে তাহার বমির ভাব হইতে লাগিল। বালিকাটী ভয়ে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। সম্রাজ্ঞী বালিকার অবস্থা বুঝিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া শান্তনা করিলেন এবং তাহাতেই বালিকাটী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে ২ চলিয়া আসিল।

এক দিবস সম্রাজ্ঞীকে এক গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইয়াছিল। যখন ঐ প্রস্তর নীচে নামান হয় তখন উহা হঠাৎ পড়িয়া রাণীর পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে নিতান্ত আঘাত লাগে। গোলযোগ হইবে মনে করিয়া রাণী এই আঘাত-জনিত ক্ষতের কষ্ট নিঃশব্দে সহ্য করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

রাজ কার্য্যের নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া সম্রাজ্ঞীকে কখন ২ ক্রমাগত ৫ ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।

সম্রাজ্ঞী এক দিবস আমাকে বলিলেন দেখুন, আমি ঘোড়ার মত দাঁড়াইয়া ২ বিশ্রাম করিতে পারি।

এক সময়ে আমাদের বেভেরিয়া ভ্রমণ কালে আমি ক্ষুদ্র গোয়ালিয়ালা জুতা নিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐরূপ জুতা ব্যবহার করাতে সম্রাজ্ঞী একদা ঐ সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

তিনি অনবরত কয়েক ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া অপরাহ্ণে পুনঃ বল নাচে যোগ দিতে কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করিতেন না। রাজকুমার অহির জন্ম দিনে রাণী নিজে আমাকে অভিবাদন করা শিক্ষা দিয়াছিলেন। জর্ম্মান কোর্টের অভিবাদনে যে একটু সুন্দর কমনীয় ভাব আছে তাহা আমি ঠিক অনুকরণ করিতে পারিতাম না। তাই আমাকে উহা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী বলিতেন "যে কাজ ভাল করিয়া করিতে চাহ তাহা নিজ হাতে কর।"

পতিতা বালিকাদের আশ্রমের জন্য সম্রাজ্ঞীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তাঁহার দিবসের অর্দ্ধেক সময়ই হাসপাতাল ইত্যাদিতে অতিবাহিত হয়। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল এবং দয়ার্দ্র। বর্ত্তমান যুদ্ধে জর্ম্মনীর যত দোষই থাকুক না কেন কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে সম্রাজ্ঞীর ইহাতে কোনই হাত নাই। ইষ্টার পর্ব্বের সময়ে সম্রাজ্ঞী একরূপ চিনা মাটির ডিম্ব বিতরণ করেন। উহা একরূপ আতর ইত্যাদি রাখিবার পাত্র বিশেষ। জর্ম্মানীতে এই চিনা মাটির ডিম্বের কারখানা সম্রাজ্ঞীর একচেটিয়া। এই বিতরিত ডিম্বের মূল্য যদিও সামান্য তথাপি উহা রাণীর দান বলিয়া অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

রাজপরিবারের প্রত্যেকের বাৎসরিক জন্ম উৎসবে সিল্কের নূতন জামা ব্যবহার করিবার নিয়ম। আমি এক উৎসবে পূর্ব্বে ব্যবহৃত একটী জামা ব্যবহার করিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে কিছুকাল পরে রাজকুমার এডেলবার্ট আসিয়া বলিল যে, বাবা বলিয়াছেন যে "মিস্ হাওয়ার্ডের ঐ পোষাকটী তাহার উর্দ্দি (uniform)" আমি তদবধি আমার পুরাতন পোষাক কাটিয়া ছাটিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন করিয়া লইতাম। জর্ম্মন কোর্টে অপর রাজরাজড়া উপস্থিত থাকিলে মহিলাদিগকে জলযোগের সময়ে বালা এবং আহারের সময়ে ফুল সহ কণ্ঠহার ব্যবহার করিতে হইত।

রাণী বলনাচের সময়ে কখন কখন অতি সুন্দর একছড়া মুক্তার মালা ব্যবহার করিতেন। একদা আমার গলেও ঐ নমুনার একছড়া মালা ছিল। কিছুকাল পরে একজন সৈনীক পুরুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এই মালাছড়া কি খাটি মুক্তা?" আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম যে ইহা পেরিসের নকল মুক্তা মাত্র। ইহার পরের বলে নিমন্ত্রণ কার্ডের পার্শ্বে লেখা ছিল "ব্যবহার করিলে খাটি মুক্তা ব্যবহার করিবেন।"

একদা দেখি কোর্টের ডেস্সিং মিস্ট্রেস্ কুমারদিগকে নানারূপ আদপ কায়দা শিক্ষা দিতেছেন। আহারের সময়ে কিরূপে চেয়ারে বসিতে হইবে, কিরূপে থালা ধরিতে হইবে, কিরূপে চেয়ার উঠাইয়া দিতে হইবে ইত্যাদি। সে সময়ে যে গভর্ণার উপস্থিত ছিলেন ঘটনাক্রমে পর দিবস আমি আহারের সময়ে তাহার নিকট হইতে ঐরূপ কায়দা মাফিক ব্যবহার পাইয়াছিলাম।

প্রথম অবস্থাতে আমাকে রাজদরবারের আদপ কায়দার জন্য সর্ব্বদাই শশঙ্কিত থাকিতে হইত। রাজাদের মধ্যে রীতি এই যদি কোন রাজা দেখা করিতে আসেন তাহা হইলে ঐ সাক্ষাতের ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে হয়। কোন রাজা পত্র লিখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে হয়। রাজবাড়ীতে সামান্য কোন জিনিষ আনাইতে হইলেও বহু লেখা লেখি করিতে হয়।

পটস্‌ডেমে গাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম, কিন্তু কখন ২ রাজকীয় শকটে একাকী ফিরিয়া আসিতাম, ইহাতে পাহারাওয়ালারা কিছু বিরক্ত বোধ করিত। একদা রাণীর গাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম কিন্তু ফিরিবার সময়ে একাকী আসিতে হইয়াছিল। ইহাতে লোকেরা কিছু হতাশ হইয়াছিল কারণ তাহারা রাণীকে গাড়ীতে দেখিবে আশা করিয়াছিল। কখন ২ এইরূপ একাকী চলিতে ফটগ্রাফারগণ রাণী ভ্রমে আমার ফটো তুলিয়া ফেলিত।

জারের অভিষেকের সময়ে চিনের রাজপ্রতিনিধি লি-হাং-চাং আসিয়াছিলেন। পাছে বিদেশে মৃত্যু হয় এই ভয়ে তাঁহার সহিত একটী সবাধার আনিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ যেন স্বদেশে নিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অলঙ্কার ও পোষাক ভালবাসিয়া থাকে। আমিও সেই স্বভাব বশতঃ রাণীর জহরতের প্রশংসা না করিয়া পারি না। জর্ম্মান সম্রাজ্ঞীর মণি রত্ন, অলঙ্কারের অভাব নাই। তাহার বহু মূল্য প্রস্তরের মধ্যে কোন২ টী দুই ইঞ্চি ব্যাসের হইবে। রাণীর ছাতার বাটটী বহু হীরা মুক্তা খচিত।

রাজকুমারীর যখন ৫ বৎসর বয়েস তখন হইতে তাহার জন্মদিন উৎসবে ৫টী করিয়া মুক্তা তাহাকে উপহার দেওয়া হয়। উহার এক একটী মুক্তার মূল্য প্রায় ১২০০৲ শত টাকা। ইহা সংগ্রহ করিতে জহুরীদের বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এইরূপ ১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত ৫টী করিয়া মুক্তা সংগৃহিত হইলে তখন কুমারীর জন্য একটী মালা প্রস্তত করা হয়। আমি একদিন সেলাম বিভ্রাটে পরিয়া ছিলাম। একদা নাটক হইতে আসিবার সময়ে ঘটনাক্রমে আমাদের গাড়ী রাজা ও রাণীর গাড়ীর আগে পরিয়াছিল। লোকে সম্রাট আসিতেছেন ভ্রমে আমাদিগকেই সেলাম করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য আমি স্থির করিতে পারিলাম না।

একদা প্রাসাদে ফেন্সি বল (Fancy ball) হইল। নিমন্ত্রিত রাজদূত প্রভৃতি এক শতাব্দি পূর্ব্বকার পোষাক পরিধান করিয়া আসয়া ছিলেন। সে দিবস সম্রাজ্ঞীর পোষাকটী মনোরম হইয়াছিল। তিনি চুলে পাউডার মাখিয়া সেকেলে ধরাণ করিয়াছিলেন।

কোন এক পর্ব্ব উপলক্ষে রাজবাড়ীতে এক আস্ত ষাড়ের কবাব করা হয়। দরবারের লোক এবং সৈনিক পুরুষগণ উহা আহার করিয়া থাকেন। আমিও উহা গ্রহণে বঞ্চিত হই নাই।

সম্রাট অনেক সময়েই সঙ্গীরে বাহির হইয়া থাকেন। কখন একাকী কখন সপরিবারে তাঁহার দেশ ভ্রমণের জন্য একখানা রেলগাড়ী সতন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। "এই গাড়ীখানাতে আরামের যাহা কিছু কল্পনা করা যায় তাহার সমাবেশ করা হইয়াছে। গাড়ীতে চলিবার সময়ে আদপ কায়দার তত বাধা বাধি থাকে না। একদা এই গাড়ীতে চলার সময়ে রাজকুমার এডেলবার্ট আমাকে বলিল যে তাহার বিশ্বাস যদি যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে প্রয়োজন হয় তাহা হইলে, সমস্ত রাজ পরিবার সহ এই গাড়ীখানা কোন টানেলের ভিতর লুকাইয়া থাকিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্তে এই গাড়ীখানা তৈয়ার। ইহা বালকের কল্পনা-প্রসূত ভাব বলিয়া মনে হয়।

খৃষ্টমাসের সময়ে জর্ম্মান রাজপরিবারে এক প্রলয় ব্যাপার হইয়া থাকে। উৎসবের প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতে গাড়ী বোঝাই হইয়া উপহারের জিনিষ আসিতে থাকে। হাস-পাতাল অনাথ আশ্রম কিছুই সম্রাজ্ঞীর বদান্যতা হইতে বঞ্চিত হয় না। রাণী স্বয়ং সমস্ত রোগী, আতুর ও অনাথকে নানারূপ প্রয়োজনীয় বস্ত্র, পোষাক এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া থাকেন। এক দিবস সকাল বেলা রাণী আমাকে কিছু জিনিষ গুছাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমাকে বালকের পায়ের মুজা এক দিকে এবং পূর্ণ বয়স্কের মুজা অপর দিকে বাছিয়া রাখিতে হইয়াছিল। মুজা পূর্ব্বেই জোড়া মিলান ছিল কেবল মাত্র বাছিয়া রাখিতে আমি এবং আমার সহিত এক রাজকুমার ছিল। আমাদের দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়া-ছিল। ইহা মাত্র একটী জিনিষের কথা বলিলাম কিন্তু দাতব্য জিনিষের প্রত্যেকটীর পরিমাণ এইরূপ। উপহারের অধিকাংশ জিনিষই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। রাজপরিবারের চাকর বাকর কেহই উপহার হইতে বঞ্চিত নহে।

খৃষ্টমাস পর্ব্বের পূর্ব্ব রজনীতে রাজপরিবারে উপহার বিতরণ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ভৃত্যদিগকে উপহার দেওয়া হইল। অতঃপর রাত্রির আহার সমাধা করিয়া আমরা একটী প্রকাণ্ড হলে প্রবেশ করিলাম। আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে এই কয়দিন এদিকে যে কি হইতেছিল তাহার

কোন খবর নিতে পারি নাই। কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বড় ২ টেবিলের উপরে নানারূপ দ্রব্য সম্ভার সাজান রহিয়াছে, এইরূপে সমস্ত হলটী ভরপুর। হলে প্রবেশ করিয়া সম্রাট সর্ব্বপ্রথমে আমাকে ডাকিলেন। আমি নিকটে উপস্থিত হইলে প্রকাণ্ড একটী টেবিল আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "এই আপনার।" আমি তখনও সম্রাটের কথা ভালরূপে বোধগম্য করিতে পারিতে ছিলাম না। তিনি পুনরায় বলিলেন "এই টেবিলের সমস্ত জিনিষ আপনার।" আমি কেবলমাত্র উত্তর করিলাম "একজন লোক যে এত উপহার পায় তাহা আমি কখনও শুনি নাই।"

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর টেবিল নানারূপ বহুমূল্য উপহারে সজ্জিত। ইহা বিভিন্ন রাজ রাজরার নিকট হইতে প্রাপ্ত।

সেই সময়েই উপহার লইয়া যাইবার রীতি নাই। সকলের পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেকের উপহারই কয়েকদিন টেবিলের উপরে ঐরূপে সাজান থাকে।

আমার প্রয়োজন বুঝিয়া সম্রাট অন্যান্য জিনিসের সহিত, লণ্ডন হইতে আনিত, একখানা রূপার চিরুণী উপহার দিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজকুমারগণ তাহাদের সাধ্য অনুসারে উপহার বিতরণ করিয়া থাকে। তাহারা কাহাকে হয়ত একটী অঙ্গুরী দিবে স্থির করিল, যখন বলা গেল যে ইহাতে তাহাদের মোট টাকার অনেক ব্যয় হইবে এবং আরও অনেককে উপহার দিতে হইবে তাহা তাহাদের বাকি টাকায় কুলাইবে না, তখন হয় ত প্রস্তাব করিল যে এক ছড়া হাড় উপহার দিবে তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে হাড়ে খরচ অনেক পরিবে। এইরূপ নানা বিষয় আলোচনা করিয়া অবশেষে তাহাদের কাহাকে কি দিতে হইবে তাহা স্থির হয়। এইরূপে তাহাদিগকে আয় ব্যয় সম্বন্ধে একরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়।

এক সময়ে আমরা রাণীর সহিত ছদ্ম ভাবে বেভেরিয়াতে বেড়াইতে যাই। এই বেভেরিয়ার ডিউক চার্লস থিওডর আমাদের বেলজিয়ামের বর্ত্তমান রাণীর পিতা। একদা আমরা তাহাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করি। তখন রাজকুমারী এলিজাবেতের বয়স মাত্র ২১ বৎসর ছিল। বেলজিয়ামের রাণীকে আমি সে সময়ে যতটুক দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না। তবে তাঁহার সরল মনোহর সুন্দর মূর্ত্তি এবং তাহার সহিত রাজকীয় গাম্ভীর্য্য এবং প্রয়োজন হইলে আত্ম মর্য্যাদা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল।

জর্ম্মান যুবরাজ রাণীর ভগ্নিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়া ছিল। ইহাই তাঁহার কৈশোরের প্রথম ভালবাসা। যুবরাজ একদিন আমাকে বলিল যে আগামী বৎসরেও সে রাণীমাতাকে বেভেরিয়াতে বেড়াইতে আসিতে অনুরোধ করিবে। যদি রাণী না আসেন তবে সে নিজেই বেড়াইতে আসিবে।

আমি ক্রমে অসুস্থ হইয়া পরিলাম। অগষ্টা হাসপাতালে আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল। এই হাসপাতালে রাজ-বাড়ীর লোক কিম্বা অনেক খরচ দিলে বাহিরের বড় লোকদের মাত্র চিকিৎসা হইয়া থাকে। এই হাসপাতালের শুশ্রূষা কারিণীগণ ভদ্রবংশ সম্ভুতা। এই কাজ গ্রহণ করিবার সময়ে তাহাদিগকে চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। এক দিবস এক যুবতী শুশ্রূষাকারিণী আমাকে জানাইল যে এক যুবক কর্ম্মচারীর সহিত তাহার ভালবাসা জন্মিয়াছে। তাহাকে হাসপাতাল হইতে অব্যাহাত দেওয়ার জন্য রাণীর নিকট সুপারিসি করিতে আমাকে অনুরোধ করিল। আমিও তাহাকে প্রতিশ্রুত হইলাম। আমার বিশ্বাস সহৃদয়া রাণী এই ঘটনা শুনিবা মাত্র তাহাকে অব্যাহতি দিবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি উহা রাণীকে বলিতে সুযোগ পাই নাই।

বিশেষ যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু আমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। আমার স্নায়ু নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পরিয়াছিল, কাজেই আমার নিরুদ্বেগে সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তথায় আমার তাহা ঘটিয়া উঠিতে ছিল না। বন্ধু বান্ধবগণের পত্র, টেলিগ্রাফে আমি ব্যতিব্যস্ত থাকিতাম। রাণী প্রায়ই

আমাকে দেখিতে আসিতেন। রাণী আসিবার দিন ঐ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কক্ষে পুনরায় ধসা মাজার খুন পরিয়া যাইত। আমার প্রাতে পরিপর্ত্তিত বস্ত্র পুনরায় পরিবর্ত্তন করা হইত। এই খুম ধামে আমি আরও অসোয়াস্তি বোধ করিতাম। ক্রমে আমার অবস্থা আরও খারাপ হইলে সম্রাট খুব্ খবর পাওয়ার জন্য আমার কক্ষের বাহির হইতে রাজপ্রাসাদে টেলিফোঁ বসাইলেন। দেশের বড় ২ ডাক্তারগণ আমাকে দেখিতে লাগিলেন। আমার ভাগ্নিকে তার করিয়া আনা হইল। অবশেষে আমার স্বদেশের আবহাওয়াতে ভাল হইব মনে করিয়া আমাকে দেশে পাঠান স্থির হইল। আমাকে নেওয়ার জন্য কাচের একখানা গাড়ী তৈয়ার হইল। আমার কোট সহিত তাহাতে উঠাইয়া আমাকে রেলে উঠান হইল। কর্ম্মচারিগণ সকলেই আমার জন্য ব্যস্ত। সম্রাটের বিশেষ বন্দোবস্তে আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত দেশে আনা হইল। দেশে আসিয়া আমি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলাম।

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমার মনে যতই বিরক্তর ভাব হউক না কেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁহারা যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আমি এই স্থলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি না।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

মিথিলা হিন্দু বিচারালয়ের একখানি সংস্কৃত "জয়পত্র"।

বিহারের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর Sir Edward Gait মহোদয়ের আগ্রহে ও আনুকূল্যে Behar and Orissa Research Society কর্ত্তৃক উত্তর বিহারে প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিপি উদ্ধারের যে চেষ্টা ও তৎসম্বন্ধে গবেষণা চলিয়াছে তাহার ফলে পণ্ডিত বিশুলাল বস শাস্ত্রী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সম্প্রতি ত্রিহুত (বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা) জেলার অন্তর্গত মঙ্গলপুর গ্রামে একখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "জয়পত্র" (রায় বা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পত্র) আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য যত্নবান তাঁহাদের নিকট ইহা একখানি অমূল্য সামগ্রী। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু আমলের বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই জয়পত্রের তারিখ শক ১৭১৬ জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী কুজ অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ ১০ই জুন মঙ্গলবার। ইহা দশশালা বন্দোবস্তের প্রাক্কালের হিন্দু আইন শাসনের একখানি সুন্দর চিত্র। কলিকাতা উইক্‌লি নোট নজীরবহির ২৪ ভলুমে A Judgment of a Hindu Court in Sanskrit by K. P. Jayswal M. A. নামক প্রবন্ধে এই জয়পত্রখানি মূল সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণিত কাশী-প্রসাদ জয়শোয়াল পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টে এবং এখন সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ঐতিহাসিক এবং ব্যবহার জীবিগণের নিকট সুপরিচিত। এই নূতন আবিষ্কারের আলোক রেখা সম্পাতে প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের একটী অধ্যায় কিরূপ আলোকিত হইয়াছে এবং ইহাতে ভবিষ্যত গবেষণার যে কিরূপ সাহায্য করিবে পণ্ডিতজী তাঁহার প্রবন্ধে তাঁহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গ ও বিহারে মুসলমান বিজয় কখন স্থায়ী ভাব ধারণ করে নাই—মুসলমান আক্রমণ বন্যার স্রোতের মত দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষণিকের মত একটা আলোড়ন উৎপাদন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই বন্যা-স্রোতের পরিণামই প্রাপ্ত হইয়াছে, দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা সামাজিক জীবন, শাসন ও বিচারপ্রণালী পূর্ব্ব ধারায়ই চলিয়াছে। বিজয়ী মুসলমান কেবলমাত্র অধীনতা স্বীকারের নিদর্শণ স্বরূপ কর আদায় অথবা কোথায় বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাই দেখিতে পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণী বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্তির ত্রিশ বৎসর পর পর্য্যন্ত মিথিলায় হিন্দু বিচার-প্রণালীর অনুশাসন অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তখনও ত্রিহুতের রাজা

করদ ও মিত্ররাজন্যবর্গের মত খাঁটী হিন্দু প্রণালীতেই বিচার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ১৭৯৩—১৭৯৫ খৃঃ অঃ মধ্যে দেশীয় আইন আদালত রহিত হইয়া ইংরেজের আইন আদালত সংস্থাপিত হয়। এ হিসাবে এই জয়পত্রখানি হিন্দু আদালতের একখানি চরম জয়পত্র বলা যাইতে পারে। এখনও সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন সেই সময় জাহাজে করিয়া পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই অভিনব বিচার প্রণালীও এদেশে আমদানি করেন কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সে ভ্রম অনেক পরিমাণে দূর করিবে এবং আমরা ইহাতে দেখিতে পাই যে আমাদের যাহা ছিল তাহা পাইয়াছি। তাহার সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবার নহে। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বাংলাদেশের তৎকালীন এইরূপ কোন জয়পত্র সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইতিহাসের একটী বিলুপ্ত অধ্যায় উদ্ধার হইবে এবং ইহাতে ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক চেষ্টার বিশেষ সহায়তা হইবে। এই জয়পত্র পাঠে আইনজ্ঞও যেমন আনন্দ পাইবেন যিনি ঐতিহাসিক তিনিও তেমনি আনন্দ পাইবেন। ইহাতে possession,like, অনুমান প্রমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার সঠিক অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন। পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ এই জয়পত্রের ইংরাজী অনুবাদ এই সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবলম্বনে যতটুক পারিয়াছি তাহা আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা পড়িলে আমাদের প্রাচীন আমলের সহিত বর্ত্তমান বিচার প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিচারপতি সচলমিশ্র সাতজন "পর্ষদ"-সহ এই বিচার করিতেছেন। ফয়শালা প্রধান বিচারপতি সচলমিশ্রের লিখিত এবং শীরোভাগে পর্ষদগণের সম্মতিযুক্ত। এখনও প্রধান বিচারাদালতে এই প্রণালীতেই রায় হইয়া থাকে। চিফ্‌জাষ্টিস্ কিম্বা তাঁহার মনোনীত অন্য কোনও জজ লিখিত রায় উপস্থিত করেন এবং বিশেষ স্থল ব্যতীত অন্যান্য পর্ষদগণ তাহাতে শিরোভাগে না লিখিয়া নিয়ে "Concur, agree" যথা—"সম্মতিরত্র শ্রীলোকনাথস্য শ্রীরত্নপতেস্সম্মতিঃ" বলিয়া স্বাক্ষর করেন। জয়পত্রের প্রথমেই অর্থী প্রত্যর্থীর নাম। তৎপর "ভাষা" (আবেদন পত্র—আরজী) এবং প্রতিবাদীর বর্ণনাপত্রের চুম্বক। এই মোকদ্দমায় বিবাদী অস্বীকার জবাব দিয়াছে ইহার পারিভাষিক নাম "মিথ্যোত্তর"। উভয় পক্ষের বক্তব্য উল্লেখ করিবার পর প্রমাণের ভার এবং বিচার্য্য বিষয় নির্ণয় অর্থাৎ Issue ধার্য্য এবং ঐ Issueর প্রমাণের ভার কাহার উপর তাহা নির্ণয় করতঃ পক্ষগণকে সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য সময় প্রদান যাহা আমরা চলতি ভাষায় তদ্বিরের জন্য মুলতুবি বলিয়া থাকি। তৎপর বিচার কার্য্য এবং প্রমাণ আলোচনা ও তাহার গ্রাহ্যাগ্রাহ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন ও যুক্তি অবলম্বনে মিমাংসা করিয়া মূল বিচার্য্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত।

* * * *

বর্ত্তমান ভলিউম কলিকাতা উইকলি নোটে Prof. J. Jolly Ph. D. লিখিত Judgment of a Hindu Court and Javanese Joypatra নামক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি জাভা দেশ হইতে আবিষ্কৃত একখানি জয়পত্রের নমুনা এবং তাহার সহিত এই সংস্কৃত জয়পত্রের যে কত সাদৃশ্য তাহা দেখাইয়াছেন। জাভার জয়পত্রখানি ৮৪৯ শকের অর্থাৎ ৯২৮ খৃষ্টাব্দের। ইহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে সংস্কৃত জয়পত্রের মত অত সূক্ষ্ম আলোচনা ও স্মৃতিধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত দেখা যায় না, কিন্তু তাহা হইলেও মূল কার্য্যবিধি এবং বিচার প্রণালী অনেকটা এক ধরণেরই মনে হয়। এক সময় জাভাদ্বীপে হিন্দু প্রাধান্য এবং তথাকার ব্যবহার শাস্ত্রে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব যে কতদূর প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা এই দুইখানি জয়পত্র তুলনা করিলেই অনেক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে।

জয়পত্রের বঙ্গানুবাদ।

অত্র সম্মতি শ্রী—(সাতজন পরিষদের স্বাক্ষর)

অর্থী প্রত্যর্থীভাবে শ্রীতুলারাম শর্ম্মা ও তাহার শরীকগণ বাদী শর্ম্মণ জানকী শর্ম্মণ গয়রহ এবং শ্রীমণিনাথ শর্ম্মণ মৎ সমীপে উপস্থিত। বাদী তুলারাম শর্ম্মা ভাষা (আরজিতে) এই যে মতি নামক মন্দাসস্যপুত্রী সৈতানাম্নী নানাপত্যযুক্তা চেটী (দাসপুত্রী) কে, মণিনাথ শর্ম্মণ আমায় অর্পণ করিতে বাধ্য, বিবাদী মণিনাথ শর্ম্মণ তাহার "মিথ্যোত্তরে" প্রতিবাদ করে যে সৈতা পুত্রকন্যা সহ তাহার নিকট আছে কিন্তু সে কি (দাসী কি না তাহার কি Status) কি প্রকারে আলতা (উৎপন্না) তাহা আমি অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার অর্থী তুলারাম শর্ম্মার শিরে কারণ ব্যাসের বচন এই যে—

প্রাঙ্ন্যায় কারণোক্তোতু প্রত্যার্থী সাধয়েৎ ক্রিয়াম্।
মিথ্যোত্তরে পূর্ব্ববাদী প্রতিপত্তো ন সা ভবেৎ ॥

প্রাঙ্ন্যায়ে অর্থাৎ দোবারা (resjudiction) স্থলে অথবা বিশেষ কারণ (Special plea) উল্লেখ করিলে বিবাদীকে তাহার দাবী প্রমাণ করিতে হয় কিন্তু অঙ্গীকার স্থলে বাদীকে নিজ দাবী প্রমাণ করিতে হয় আর বিবাদী বাদীর দাবী স্বীকার করিলে কোন প্রমাণই আবশ্যক করে না।

এইক্ষণ প্রস্তাব হইল যে তুলারাম সৈতোর মতিদাস পুত্রীত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিবে তাহাতে প্রত্যর্থী মণিনাথ প্রতিবাদ করিল যে ইহা প্রচুর হইবে না কারণ ইহাতে অনৈকান্তিক দোষ (fallacy) বর্ত্তিবে কারণ দাসীর পুত্রী হইলেই যে আইনত দাসীর Status পাইবে অর্থাৎ দাসী গণ্য হইবে এমত নহে। এই প্রকার বাদানুবাদের পর বিবাদী বলিল যে সৈতোর মাতা যে দাসী সংজ্ঞার মধ্যে তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে। বাদী প্রমাণ উপস্থিত জন্য প্রস্তাব কর, মোকদ্দমার অন্য শুনানি ধার্য্য হইল এবং পক্ষগণ চলিয়া গেল। তৎপর দুইমাসকাল মধ্যে বিবাদীর তলপ সত্বেও বাদী হাজির হয় নাই। (ইহাদ্বারা বাদীর ত্রুটী নিবন্ধন দাবী ডিসমিস যোগ্য)। তৎপর বাদী উপস্থিত হইলে পর বিচার আরম্ভ হইল তখন বিবাদী মণিরাম এই আপত্তি উত্থাপন করিল যে শত বর্ষাধিক বিবাদকালের অর্দ্ধ বর্ষ বয়স্ক একজন মাত্র সাক্ষী গ্রাহ্য যোগ্য নহে। (শত বৎসরের সত্ব দখল লইয়া যেখানে তর্ক সেখানে ৫০ বৎসরের কেবল মাত্র একজন সাক্ষী কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? বিবাদীর এই আপত্তি সমীচিন বোধ হইতেছে কারণ শঙ্খ এব- বৃহস্পতির বচন অনুসারে কেবল একজন মাত্র সাক্ষী সর্ব্বাবস্থায়ই অগ্রাহ্য।

"উভৌতু শ্রোত্রিয়ৌ গ্রাহ্যৌ নৈকং পৃচ্ছেৎ কদাচন"।

তখন বাদী তুলারাম বলিল যে লৌকিক প্রমাণাভাবে আমি অলৌকিক প্রমাণ ভিন্ন এই দাসীপুত্রীর প্রতি আমার দাবী সপ্রমাণ করিতে পারিব না। ইহার প্রতিবাদ মণিনাথ বিবাদী বলে যে তাহার একশত বর্ষের উর্দ্ধকালের ৪ পুরুষের আমলের বাদীর জ্ঞাতসারে তাহার নিরাপত্য নির্ব্বিরোধ দখল। বাদী অতি নিকটে থাকা সত্বেও কখন তাহার দখলের কোন আপত্য করে নাই এমতাবস্থায় সে অলোকীক প্রমাণে সম্মত নহে। বিবাদী আরো বলে যে যদি এ অবস্থায় অলোকীক প্রমাণের উপর নির্ভর করা সম্ভব হয় তাহা হইলে যেখানে সহস্র বৎসরের দখল এবং বাচনিক কিম্বা দলীলাত প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব সে ক্ষেত্রেই বা এইরূপ অলোকিক প্রমান প্রযুজ্য হইবে না কেন। বিবাদীর এই উত্তর সপর্ষদ প্রাড়্বিবাকের সম্পূর্ণ অনুমোদিত যেহেতু কাত্যায়নের বচন এই যে—

অনুমানাদ গুরুঃ সাক্ষী সাক্ষিভ্যো লিখিতং গুরু।
অব্যাহতা ত্রিপুরুষী ভুক্তিরেভ্যো গরীয়সী ॥

এই যুক্তি এবং বচনের সহিত "সত্বাভাব" যে বচন আছে তাহার কোন ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না কারণ সেই বচন কেবল সেই স্থলেই প্রযুজ্য যেখানে সম্পূর্ণ স্বত্বাভাব। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কাল ভোগ দখল করা হেতু ভোগকর্ত্তার সত্ব নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে "চৌরেত্যাদি"—শাস্ত্র বচন সেই স্থলেই প্রযুজ্য হইবে যে স্থলে ভোগ কর্ত্তার ন্যূনকাল ভোগ দখল নিবন্ধন তাহার স্বত্বাভাব নিশ্চিত হইয়াছে এবং এই নিষ্পত্তির পরে গোপনে কিংবা বলপূর্ব্বক শতবর্ষাধিক দখল দাবী করে। ইহার কি অন্যথা হইতে পারে ? কারণ মুণিগণ এবং নিবন্ধকারগণ উভয়েই দখলের প্রমাণ (possession-evidence) এবং "সাগমমত্র ভোগ প্রামাণ্যে প্রমাণ"—(evidence-possession with title) ইহার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। এমত স্থলে স্থাবরাদি বিষয়ে যে স্থলে ভোগ দখলের প্রমাণ উৎকর্ষশালী, সেখানে লৌকিক প্রমাণাভাবে অলৌকিক অর্থাৎ দিব্য প্রমাণ (canonical or extraordinary proof, i, e, ordeal) সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ইহা সাক্ষী দ্বারা দলীল দ্বারা অথবা ভোগ দখল দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।

স্থাবরেষু বিবাদেষু দিব্যানি পরিবর্জয়েৎ।
সাক্ষি ভি র্লিখিতে নাম ভুক্ত্যাচৈতান্ প্রসাধয়েৎ॥

এই যে পিতামহের বচন ইহা হরিনাথ উপাধ্যায় মিশ্র মিশ্র প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে এইরূপ স্থলে অলৌকিক প্রমাণ প্রয়োগের কোনও সুযোগ নাই, উহা বিচারকের এলাকা বহির্ভূত। সুতরাং আমরা বাদী তুলারাম শর্ম্মণ ও তাহার শরীক বাদীগণকে "হীন প্রতিজ্ঞ" পরাজিত পক্ষ সাব্যস্ত করিলাম। তাহারা তাহাদের দাবী সপ্রমাণ করিতে পারিল না। এবং প্রত্যর্থী জয়ীপক্ষ যে আইনতঃ শত বর্ষের অধিক কালের তাহার মালিকী সত্বে ভোগ দখল প্রমাণ করিয়াছে তাহার অনুকূলে এই জয়পত্র প্রদান করিলাম। মম শ্রীসচল মিশ্রস্য গত মৎসরান্ ধর্ম্মাধ্যক্ষান্ পণ্ডিতান্ (Spiritual judge) সমুদিশ্য বিজ্ঞাপনমিদং শাকে ১৭১৬ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশ্যাং কুজে। আমি শ্রীসচল মিশ্র নিরপেক্ষ মাৎসর্য্য দোষ শূন্য ধর্ম্মাধ্যক্ষ পণ্ডিতগণের উদ্দেশ্যে ইহা বিজ্ঞাপন করিলাম। ইতি ১৭১৬ শক, জ্যৈষ্ঠমাস, শুক্ল ত্রয়োদশী, মঙ্গলবার।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

পল্লী বন্দনা।

(দ্বাদশ বর্ষীয় বালক কর্ত্তৃক লিখিত)

আজিকে তোমার বিশ্বপ্লাবিত
মূরতি হেরিনু জননী;
তোমার আলোকে আলোকিতা দেবী,
মুগ্ধা বিপুলা ধরণী!
অবারিত মাঠ, অসীম আকাশ,
মুক্ত মধুর স্নিগ্ধ বাতাস,
হেরি করুণার নিয়ত বিকাশ
ধারা বহে যায় চক্ষে;
কত রূপ কত কাকলী-ছন্দঃ
কত শোভা, কত কুসুম-গন্ধ
দিকে দিকে জাগে কত আনন্দ
তোমার শ্যামল বক্ষে—
কাঞ্চন ঝলে ঝলকে ঝলকে,
শ্যামল আঁচল শোভিছে আলোকে,
বহিছে পুলক দ্যুলোকে ভূলোকে,
হেরি রূপ নব নব;
নত শিরে আমি বন্দনা করি
শান্ত মূরতি তব!

শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

খারমিডিস্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বলিলাম, "কিন্তু ক্রিটিয়াস্ তুমি যেন এই ভাবেই আমার নিকট উপস্থিত হচ্ছ, যে, যে সব বিষয়ে আমি প্রশ্ন করছি সেগুলি যেন আমি জানি এবং ইচ্ছা করিলেই যেন আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারি। বাস্তবিক কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং আমি নিজে জানি না বলেই তোমার সঙ্গে উপস্থিত মত প্রশ্নের বিচার করতে চাই। আর বিচার করে তবে বলতে চাই, তোমার সঙ্গে আমি একমত কি না। কাজেই যে পর্য্যন্ত বিচার না করেছি সে পর্য্যন্ত সবুর কর।"

সে বলিল, "বিচার কর তবে।"

আমি বলিলাম, বিচার করছি। আচ্ছা, সংযম অর্থ যদি 'জানা' হয়, তবে এটা স্পষ্ট যে, ইহা একটী জ্ঞান * এবং কোন কিছুর জ্ঞান; নয় কি?

সে বলিল, "তা ত বটেই, আত্মার জ্ঞান।"

আমি বলিলাম, "চিকিৎসা বিদ্যা কি স্বাস্থ্যের জ্ঞান নয়?"

"অবশ্যই।"

আমি বল্লাম, "আচ্ছা, তুমি যদি আমায় জিজ্ঞাসা করতে,—'চিকিৎসা বিদ্যা স্বাস্থ্যের জ্ঞান হয়ে আমাদের কিরূপ উপকারী এবং কি করে'—তা হলে অবশ্যই বলতে হত যে, উপকারটা সামান্য নয়; স্বাস্থ্যবিধান করে আমাদের একটী ভাল কাজই করে—অবশ্যই যদি তুমি এটা স্বীকার কর।"

"স্বীকার করছি।"

"আর যদি তুমি আমায় স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন কর, গৃহনির্ম্মাণের জ্ঞান হয়ে উহা, আমার মতে, কি সম্পাদন করে, তা হলে আমাকে বলতে হবে, গৃহ সমূহ। অন্যান্য শিল্প † সম্বন্ধেও এই প্রকার। কাজেই সংযম সম্বন্ধে—ওটাকে যখন তুমি আত্মার জ্ঞান বলছ, তখন—তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ক্রিটিয়াস্, সংযম, আত্মার জ্ঞান হয়ে, নাম করার মত এবং হিতকর এমন কি আমাদের সম্পাদন করে', তা'হলে নিশ্চয়ই তোমার জবাব দিবার আছে। এস এখন তবে,—বল।"

সে বলিল, "কিন্তু সোক্রেটিস্, তুমি ত ঠিক মত জিজ্ঞাসা করছ না। এ বিদ্যা ত অন্যান্য বিদ্যার সমান নয়, এবং অন্যান্য বিদ্যাও পরস্পরের সমান নয়। অথচ তুমি কিন্তু তা'দিগকে একরূপ মনে করেই প্রশ্ন উত্থাপন করছ।" সে আবার বলিল, "তারপর তুমিই আমায় বল দেখি, গণনা বিদ্যার অথবা জ্যামিতি-বিদ্যার এমন কি কাজ রয়েছে, যেমন স্থাপত্য বিদ্যার গৃহ কিংবা বয়নবিদ্যার বস্ত্র কিংবা অন্যান্য বহুবিধ কার্য্য যাহা বহুবিধ বিদ্যা সম্বন্ধে যে কেহ দেখতে পারে? এ সকলের (গণনা ও জ্যামিতি বিদ্যার) এপ্রকার কোন কার্য্য কি তুমি আমার দেখাতে পার? নিশ্চয়ই পারবে না।"

আমি বল্লাম কি যে, "ঠিকই বলেছ; কিন্তু এইটী আমি তোমায় দেখাতে পারি যে, এই সকল বিদ্যার প্রত্যেকটীই কোনও একটী বিষয়ের বিদ্যা, যে বিষয়টী সেই বিদ্যা হইতে পৃথক। গণনাবিদ্যা, তেমনই সম (even) ও বিষম (odd) সংখ্যার—এবং সেগুলির নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্যের সহিত পরিমাণতঃ কিরূপ সম্বন্ধ—তার বিদ্যা। নয় কি?"

সে বলিল, "তাত বটেই।"

"বিষম ও সম সংখ্যা কি গণনা বিদ্যা হতে পৃথক্ নয়?"

"না হবে কেন?"

"আর পরিমাপ বিদ্যা ভারী ও হাল্কা ওজনের পরি-

---

* Episteme=Knowledge (জ্ঞান), (কখনও কখনও) Science (বিজ্ঞান)।

† Techne=Art (শিল্প) বলা বাহুল্য, প্লেটো শিল্প ও বিজ্ঞানকে পৃথক মনে করিতেছেন না।

ব্যাপক। আর ভারী এবং হাল্কা জিনিসটা থাস পরিমাপ বিদ্যাটী হইতে ভিন্ন। স্বীকার কর ত ?"

"স্বীকার করি।"

"এখন বল দেখি, সংযম এমন কোন জিনিসটীর বিদ্যা, যেটী আসলে সংযম * হইতে পৃথক বটে ?"

সে বলিল, "এ ত সেই কথা হ'লো, সোক্রেটিস্; তুমি জিজ্ঞাসা করে আসছ, প্রাজ্ঞতা অন্য সব জ্ঞান হতে কিসে পৃথক্; আবার তুমি অন্য সব বিদ্যার সঙ্গে এর সাম্যও অনুসন্ধান করছ। তা ত নয়; কারণ, অন্য সব বিদ্যা বিষয়ান্তরের জ্ঞান, নিজেদের জ্ঞান নয়; আর এইটীই শুধু অন্য সব বিদ্যারও জ্ঞান এবং তার নিজেরও জ্ঞান বটে। একথাটা নিশ্চয়ই তত সহজে তোমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না, কিন্তু আমার মনে হয়, একটু আগে তুমি যা করছ না বল্‌ছিলে, ঠিক তাই তুমি করছ; যে বিষয়ে বিচার হচ্ছিল তা ছেড়ে দিয়ে শুধু আমাকে জব্দ করতে চেষ্টা করছ।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি মনে করে বসেছ যে, আমি যে কারণে নিজে কি বলছি সে সম্বন্ধে নিজের ভিতরেই হয়ত অনুসন্ধান করতাম, পাছে কিছুই না জেনে মনে করে বসি কিছু একটা জানি,—তা ছাড়া অন্য কোন একটা হেতুতে তোমায় জেরা করছি ? এখন বরং আমি এই করছি বলব যে, বিষয়টী আমার নিজের জন্যেই বিচার করছি—এবং হয় ত বা আমার অন্যান্য বন্ধুদের জন্যেও; অথবা পদার্থ সমূহের প্রত্যেকটীই কি প্রকার তা স্পষ্ট করে জানা কি সমস্ত মানব মণ্ডলীরই একটী সাধারণ হিত বলে তুমি মনে কর না ?"

সে বলিল, "নিশ্চয়ই মনে করি, সোক্রেটিস্।"

আমি বলিলাম, "তা হ'লে এখন, ভাই, যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সেইটী তোমার নিকট যেরূপ মনে হয় তাই সাহস করে জবাব দাও—এবং তাতে ক্রিটিয়াসের মতই খণ্ডিত হউক অথবা সোক্রেটিসের মতই খণ্ডিত হউক সে দিকে দৃষ্টি দিও না। এবং বিচার্য্য বিষয়টীতে মন নিহিত রেখে শুধু দেখ, কোন একটা মত খণ্ডিত হওয়ার ফলে কি সিদ্ধান্ত এসে উপস্থিত হবে"।

সে বলিল, "আচ্ছা, তাই করব; মনে হয়, তুমি ঠিকই বলছ।

আমি বল্লাম, "তবে এখন বল দেখি, সংযম সম্বন্ধে তুমি কি বল্‌তে চাও ?"

সে বলিল, "আমি এই বল্‌ব যে, অন্য সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শুধু সংযম-বিদ্যাই নিজের এবং অন্যান্য সমস্ত বিদ্যার জ্ঞান।"

আমি বলিলাম, "বিদ্যার যদি বিদ্যা থাকে, তবে অ-বিদ্যারও একটা বিদ্যা থাক্‌বে না কি ?"

সে বলিল, "থাক্‌বে বই কি ?"

"তা হ'লে, সংযমী ব্যক্তিই শুধু নিজে নিজেকে জান্‌বে এবং কি সে জানে আর কি জানে না, তা পরীক্ষা করতে সমর্থ হবে, এবং এই প্রকারে সে অন্যদের মধ্যেও যদি কেহ কিছু জানে তবে সে কি জানে এবং জানে বলে মনে করে, তাও বুঝতে সমর্থ হবে, এবং কেউ যদি না জেনেও জানে বলে মনে করে, তবে তাও সে বুঝ্‌তে পারবে—এবং অন্য কেউ তা পারবে না; আর সংযমী হওয়া এবং সংযম মানে নিজেকে জানা—নিজে যা জানে এবং যা জানে না, তাই জানা। বাস্তবিক, যা তুমি বলছ, তা কি এই ?"

"হাঁ, এই ত।"

আমি বল্লাম, "জগৎপিতার প্রতি তৃতীয় আহুতি † স্বরূপ আবার এখন চল গোড়া থেকে বিচার করে

(*) =প্রাজ্ঞতা। মূল Sophrosyne কথাটীর= wisdom & Temperence.

† গ্রীকদের মধ্যে মদ্যাদি পেয়বস্তু দেবতাকে তিন বার দেওয়ার বিধান ছিল। 'তিন' এই সংখ্যাটী পবিত্র। হিন্দু পূজা পদ্ধতিতেও মন্ত্রাদি তিনবার উচ্চারণ করিবার বিধান আছে। তৃতীয় বারের দানটী পবিত্রতম এবং বিশেষ ফলপ্রদ।

দেখি, প্রথমতঃ, এটা হতে পারে কি না—একজন যা জানে এবং যা জানে না, তা যে সে জানে এবং জানে না, এই জানটা হ'তে পারে কিনা—আর, তার পর, যদিই ইহা সম্ভবপর হয়, এটা জান্‌লে আমাদের কি লাভ হতে পারে।"

সে বল্লে, "হাঁ, এটা দেখা দরকার বটে।"

আমি বল্লাম, "এস, ক্রিটিয়াস্, দেখ দেখি, এসব বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে একটু বেশী চতুর কিনা; আমি ত দিশে হারা হয়ে পড়েছি। কিসে হতবুদ্ধি হয়েছি, তোমায় বলব কি?"

সে বলিল, "অবশ্যই।"

আমি বল্লাম, "তুমি এই মাত্র যা বলছিলে তা যদি সেইরূপই হয়, তবে এই সমস্ত বিষয়টা এ ছাড়া আর কি হবে, যে, এমন একটা বিজ্ঞান আছে যা অন্য কোন বিষয়ের নহে, পরন্তু নিজের এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের বিজ্ঞান—এবং অ-বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞান উহাই?"

"অবশ্যই"।

"দেখ দেখি, ভাই, আমরা কেমন একটা অসম্ভব কথা বলতে যাইতেছি; অন্য কোন বিষয়ে যদি তুমি এইটা দেখ্‌তে চাইতে, তবে, আমার মনে হয়, এটা তোমার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হ'তো।"

"কেমন করে এবং কোথায়?"

'এই সব বিষয়ে।—ভেবে দেখ দেখি, তোমার কি মনে হয় এমন কোন দৃষ্টি আছে, যা, অন্য সব দৃষ্টি যে সব বিষয়ের সে সব বিষয়ের দৃষ্টি নহে, কিন্তু নিজের এবং অন্য সব দৃষ্টির দৃষ্টি—এবং অ-দৃষ্টিরও তথা—এবং দৃষ্টি হয়েও কোন বর্ণ দেখে না, নিজেকে এবং অন্যান্য দৃষ্টিকে দেখে; এই প্রকার একটা দৃষ্টি আছে বলে তোমার মনে হয় কি?"

"দোহাই দেবতার, আমার ত নয়।"

"শ্রুতি শক্তি এপ্রকার আছে কি, যা শব্দ শোনে না কিছুই, পরন্তু নিজেকে এবং অন্যান্য শ্রবণ-কে শ্রবণ করে এবং অ-শ্রবণকেও?"

"এমনটী ত নাই।"

"সমষ্টি ভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই দেখ দেখি, এমন কি কোন ইন্দ্রিয় আছে বলে তোমার মনে হয়, যা ইন্দ্রিয়-সমূহের এবং নিজের ইন্দ্রিয়—অন্যান্য ইন্দ্রিয় যা যা অনুভব করে তার একটীও যে অনুভব করে না?"

"এমন ত মনে হয় না।"

"কিন্তু বাসনা বোধ হয় এমন কোন একটী আছে বলে তোমার মনে হয়, যা কোন প্রকার সুখের বাসনা নয়? পরন্তু নিজের এবং অন্য সব বাসনার বাসনা?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তা হ'লে, আমার মনে হয়, ইচ্ছাও এমন একটী নাই, যা কোন প্রকার হিত ইচ্ছা করে না—নিজেকে এবং অন্য সব ইচ্ছাকে শুধু ইচ্ছা করে।"

"না, তা নাই।"

"তবে কি বল্‌বে প্রেম এই প্রকার একটী আছে, যা সৌন্দর্য্যের প্রেম নহে—নিজের এবং অন্য সব প্রেমের প্রেম?"

সে বলিল, "আমি ত তা বল্‌ব না।"

"এমন কি ভয়ের কথা তুমি কখনও শুনেছ যা নিজেকে এবং অন্য সব ভয়কে ভয় করে, ভয়ের বস্তু কিছুকে ভয় করে না?"

সে বলিল, "না, এমন ত শুনি নাই।"

"এমন কি কোন মত তুমি জান, যা অন্য সব মতের এবং নিজের মত—অন্য সব মত যে সব বিষয়ক হয়, তার একটীর সম্বন্ধেও নহে?"

"কখনই না।"

"কিন্তু বিজ্ঞান, বোধ হয়, এমন একটী আছে বলব, যা বিজ্ঞেয় কোন বস্তুর বিজ্ঞান নয়,—নিজের এবং অন্য সব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান?"

"বলব বই কি।"

"তাই যদি হয়, তবে সেটা কি বিস্ময়কর নহে? তবু, এ যে নাই, তা আমরা জোর করে বলব না; বরং আছে কিনা আবার বিচার করে দেখি।"

"ঠিক বলেছ।"

"তবে এস এখন ; সেই যে বিজ্ঞান, তা কোন একটা বিষয়ের বিজ্ঞান এবং কোন একটা বিষয়ের (বিজ্ঞান) হওয়ার শক্তি তার রয়েছে। নয় কি ?

"অবশ্যই ?"

"আর, যা বৃহত্তর, তার এমন একটা শক্তি আছে বলব, যা দ্বারা সে কোন একটা কিছু হতে বৃহত্তর হতে পারে ?"

"আছে বই কি।"

"ক্ষুদ্রতরটীর সম্বন্ধেও তাই, যদি তার চেয়ে বৃহত্তর একটী থাকে ?"

"অবশ্যই ."

"যদি আমরা বৃহত্তর এমন কিছু খুঁজে পাই,—যাহা বৃহত্তরদের চেয়েও বৃহত্তর এবং নিজের চেয়েও,—অথচ বৃহত্তরগুলি যাদের চেয়ে বৃহত্তর তাদের কারুর চেয়ে বৃহত্তর নয়—তা হ'লে নিজের সম্বন্ধে সেটীর সর্ব্বথা এই অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াবে, যে, যদিও তাহা নিজের চেয়ে বৃহত্তর, তথাপি তাকে নিজের চেয়ে ক্ষুদ্রতরও হতে হবে ; নয় কি ?"

সে বলিল, "অতি অবশ্য, সোক্রেটিস্।"

"আর, যদি এমন কোন একটী জিনিস থাকে, যাহা অন্ত দ্বিগুণের এবং নিজের দ্বিগুণ, তবে সেটা তার (নিজের) অর্দ্ধেকের এবং অন্যান্য অর্দ্ধেকেরই দ্বিগুণ হইবে ; দ্বিগুণ ত অর্দ্ধেক ভিন্ন আর কিছুর হতে পারে না।"

"ঠিক।"

"তা হ'লে (একই জিনিস) নিজের চেয়ে বড় হয়েও ছোট, অধিক গুরু হয়েও লঘু এবং প্রাচীনতর হয়েও নূতনতর এবং অন্যত্র সর্ব্বত্রই এই প্রকার হবে নাকি ?—যাতে করে, নিজের প্রতি ওর নিজের যা শক্তি, সেই শক্তি ওর যার সম্বন্ধে, সেই সত্তা ওর থাকবে না কি ? আমি যা বলতে চাচ্ছি, তাহা এই ;—যেমন, শ্রবণশক্তি,—(এর সম্বন্ধে) আমরা বলব, যে, শ্রবণশক্তি শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুর সম্বন্ধে নহে ; নয় কি ?"

"হাঁ"।

"তা হ'লে, যদি ইহা (শ্রবণশক্তি) নিজেকেই শ্রবণ করে, তবে শব্দকে আশ্রয় করেই নিজেকে শোনবে ; আর কোন প্রকারে শোনতে পারে না।

"অতি নিশ্চয়।"

"আর, ভাই, দৃষ্টিশক্তি যদি নিজে নিজেকেই দেখে, তবে কোন একটী বর্ণ তার থাকা প্রয়োজন ; বর্ণহীন কোন জিনিসকে দৃষ্টি কদাপি দেখতে পারে না।"

"তা ত পারেই না।"

"তা হ'লে ক্রিটিয়াস্, দেখতে পাচ্ছ ত যে, যে সকল দৃষ্টান্ত আমরা গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বথা অসম্ভব বলেই আমাদের কাছে মনে হয়, আর কতকগুলির সম্বন্ধে এটা স্পষ্টতর বিশ্বাসের অযোগ্য যে তাদের শক্তি তাদের নিজেদের সম্বন্ধেই রয়েছে ? আয়তন, এবং সংখ্যা এবং ইত্যাকার বিষয় সমূহের দৃষ্টান্তগুলি সর্ব্বথা অসম্ভব ; না, তা নয় ?"

"অবশ্যই :"

"শ্রুতিশক্তি, এবং দৃষ্টিশক্তি, তথা, গতিশক্তি নিজেকে গতিমান্ করার বিষয়, কারও কারও কাছে অবশ্যই অবিশ্বাস্য মনে হবে, কারও কাছে হয় ত বা নয় এবং হে প্রিয়, এমন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রয়োজন, যিনি এটা সকলের জন্য উপযুক্তরূপে মীমাংসা করে দিবেন, যে, অস্তিত্ববান্ পদার্থ সমূহের* কোনটীরই নিজের শক্তি নিজের সম্বন্ধে থাকতে সৃষ্ট হয় নাই, অথবা পক্ষান্তরে, কতকগুলির বা তদ্রূপ হয়েছে, আর কতকগুলির নয় ; আর, যদিই বা এমন কিছু থাকে যাদের নিজেরা নিজেদের সম্বন্ধেই, তবে তাদের ভিতর বিজ্ঞান রয়েছে কিনা, যাকে আমরা সংযম বলে মনে করছি। এ সব মীমাংসা করতে আমি সমর্থ, এমন

* Ton onton, = of existing things.

প্রকার আমার নিজেতে আমার নাই। কারণ, ইহা সম্ভবপর কিনা,—বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হতে পারে কিনা—তাহা আমি জোর করে বল্‌তে পারি না; আর, যদিই বা ইহা সর্ব্বথা সম্ভবপর হয়, তা হ'লেও সংযমকে আমি তা বলে গ্রহণ করবো না, যে পর্য্যন্ত না আমি বিচার করে বুঝেছি, (সংযম) এ প্রকার হওয়াতে আমাদের কোন ফায়দা আছে কি না। আমার যেন ধারণা, সংযম একটী উপকারী এবং উত্তম জিনিস হবে। হে কালায়েস্ক্রমের পুত্র,—সংযমকে এ প্রকার মনে করতে হলে—বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং অ-বিজ্ঞানেরও (বিজ্ঞান মনে করতে হলে)—তোমাকেই তবে প্রথমতঃ এইটী দেখাতে হবে যে, এখন আমি যা বলেছি তা সম্ভবপর—এবং, সম্ভব হ'লে পর, (দেখাতে হবে যে, তা) উপকারী; এবং তা হলে সহজেই তুমি আমাকে সমঝিয়ে দিতে পারবে, সংযম কি সে সম্বন্ধে তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিকই বল্‌ছ।"

ক্রিটিয়াস্ এখন এই সব কথা শুনে এবং আমাকে হতবুদ্ধি হতে দেখে,—যেমন নাকি হাই তুল্‌ছে যারা তাদের দেখে তাদের সাম্‌নে উপস্থিত ব্যক্তিদেরও ঐ অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে,—তেমনই সেও আমি কিছু ঠিক পাচ্ছি না দেখে নিজেও যেন বাধ্য হয়ে (একেবারে) বেকুব বনে গেল। আর যেহেতু তার বরাবরই একটা সুনাম ছিল, সেই জন্য উপস্থিত আমাদের নিকট তার খুবই লজ্জা হচ্ছিল এবং আমার কাছে স্বীকার করতেও তার ইচ্ছা ছিল না যে, আমি তাকে যা মীমাংসা করতে আহ্বান করেছিলাম তা সে মীমাংসা করতে অসমর্থ, অথচ নিজের হতবুদ্ধি গোপন করতে গিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বল্‌ছিলও না। আমাদের সে আলোচনাটা যাতে অগ্রসর হতে পারে সেই জন্যে আমি আবার বল্লুম:—"আচ্ছা, ক্রিটিয়াস্, তুমি যদি চাও তবে এখন না হয় ধরেই নিচ্ছি যে, বিজ্ঞানের একটা বিজ্ঞান থাকা সম্ভবপর হ'তে পারে; ইহা যথার্থ কি না ক্রমে দেখা যাবে। এখন এস, ভেবে দেখা যাক্ যদি ইহা যথার্থই সম্ভবপর হয় তবে, ইহা কি প্রকারে জান্‌তে সমর্থ হয় একজন কি জানে কিংবা কি জানে না? সংযমী হওয়া এবং নিজেকে জানার অর্থ আমরা ত এই বলেছি, নয়, কি?"

সে বলিল, "নিশ্চয়ই, এত বটেই, সোক্রেটিস্। যে জ্ঞান * নিজে নিজেকে জানে তা যার রয়েছে সে তার যে জিনিষটী রয়েছে তার মত হবেই; যেমন নাকি, যার ক্ষিপ্রতা রয়েছে সে ক্ষিপ্র, এবং যদি সৌন্দর্য্য থাকে ত সুন্দর এবং জ্ঞান থাকলে বিজ্ঞ, সেই প্রকার যখন কারও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান থাকে তখন সে নিজে নিজের জ্ঞাতা হবেই।"

আমি বলিলাম, "এটা আমি আপত্তি করছি না যে, যখন কেহ নিজের জ্ঞাতা বিজ্ঞানের অধিকারী হবে তখন সে নিজে নিজেকে জান্‌বে না, কিন্তু তা যার রয়েছে তার বেলাও এমন কি নিয়ম রয়েছে যে, সে কি জানে এবং কি জানে না তাও তাকে জান্‌তে হবে?"

"এই জন্যে, সোক্রেটিস্, যে এটা তার কাছে একই জিনিষ।"

আমি বলিলাম, "হয়ত হবে, কিন্তু আমি যে চিরকালই একপ্রকারই থেকে যাচ্ছি; একজন যা জানে তা জানা এবং যা জানে না তা জানা যে একই জিনিষ, এতো আমি এখনও বুঝতেই পাচ্ছি না।"

সে বলিল, "তুমি কি বল্‌ছ?"

আমি বলিলাম, "এই বলছি যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান থাক্‌লেও সেটা তাদের মধ্যে এটা বিজ্ঞান এবং এটা বিজ্ঞান নয়—এর বেশী কিছু মীমাংসা করতে সমর্থ হবে কি?"

* এখানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতি কথা মোটামুটি একই শব্দের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করা হইতেছে, কারণ মূল কথাটির ভিতর এই সকল অর্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"না, এই মাত্র।"

"স্বাস্থ্যের জ্ঞান এবং অজ্ঞান, আর ন্যায়ের জ্ঞান এবং অজ্ঞানের বেলায় জিনিষটা একই?"

"নিশ্চয়ই না।"

"প্রথমটা চিকিৎসা বিদ্যা এবং দ্বিতীয়টা রাষ্ট্রবিদ্যা, ওটা কিন্তু শুধু বিদ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।"

"তা বই কি?"

"কেউ যদি স্বাস্থ্য কাকে বলে এবং ন্যায়-ধর্ম কি না জানে অথচ শুধু জ্ঞান যদি সে জানে, তাহ'লে, যেহেতু ঐটারই জ্ঞান কেবল তার রয়েছে, যে, সে একটা কিছু জানে এবং জ্ঞান তার আছে, সেই জন্যে হয়ত বা সে নিজের এবং অন্যেরও সম্বন্ধে কিছু জানবে; নয় কি?"

"হাঁ।"

"সে যে জানে, এই জ্ঞান হতে সে কি জানবে? স্বাস্থ্যকে লোকে চিকিৎসাবিদ্যা হ'তেই জানে, কিন্তু সংযম হতে নয়,—তান-লয় * সঙ্গীত বিদ্যা হ'তেই শিখে, সংযম হ'তে নয়—স্থাপত্য স্থপতি-বিদ্যা হ'তেই শিখে, সংযম হতে নয়—এবং এই প্রকার সর্ব্বত্র। কেমন?"

"তাইত মনে হয়।"

"সংযমদ্বারা—সেটা যদি কেবল বিজ্ঞান সকলের বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে (তদ্বারা) কি করে কেহ জানবে যে সে স্বাস্থ্য কিংবা স্থাপত্য জানে কিনা?"

"কিছুতেই না।"

"আর, তা যে জানে না সে কি জানে তাও জানবে না,—কিন্তু জানবে শুধু যে সে জানে।"

"তাই ত বোধ হয়।"

"সংযমী হওয়া এবং সংযমও অবশ্যই একজন নিজে কি জানে এবং কি জানে না—তাই জানা নয়, বরং, যেমন মনে হয়, সংযমের অর্থ শুধু এই জানা যে, সে জানে অথবা জানে না।"

"তাই ত উপপত্তি হয়।"

"আর অন্য কেউ যদি কিছু জানে বলে ভাণ করে, তবে, এই (সংযমী) ব্যক্তি পরীক্ষা করতে সমর্থ হবে না যে, সে যা জানে ব'লে বলে, তা সে বাস্তবিকই জানে, না জানে না; কিন্তু যেমন মনে হয়,—এই টুকুই শুধু সে জানবে যে তার একটা জ্ঞান আছে, কিন্তু কিসের জ্ঞান, সংযম তা তাকে জানতে সমর্থ করে তুলবে না।"

"মনে হয় না ত।"

"আর কেউ যদি নিজেকে চিকিৎসক বলে প্রচার করে—অথচ তা না হয় কিংবা সত্য সত্যই তা হয়, তবে তাহাও এই (সংযমী) ব্যক্তি বিচার করিতে সমর্থ হবে না—এবং অন্যবিধ জ্ঞানের বেলায়ও জ্ঞাতা কিংবা অজ্ঞাতাকে সে চিনতে পারবে না। বিষয়টা আমরা আবার এইখান থেকেই বিচার করে দেখি।—সংযত ব্যক্তি অথবা তদ্বৎ অন্য কেহ যদি প্রকৃত চিকিৎসককে অপ্রকৃত চিকিৎসক হইতে পৃথক্ করে জানতে চায়, তবে তাকে কি এইরূপ করতে হবে না—চিকিৎসা সম্বন্ধে সে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না?—অথচ, আমরা কিন্তু বলে এসেছি চিকিৎসক স্বাস্থ্য এবং রোগ ভিন্ন আর কিছু বুঝে না—নয় কি?"

"হাঁ, তাই ত।"

"জ্ঞান সম্বন্ধে আবার সে (চিকিৎসক) কিছু জানে না, সেটা কিন্তু আমরা সংযমকেই দিয়ে দিয়েছি।"

"হাঁ।

"আর চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধেও চিকিৎসক কিছু জানে না, কেন না, চিকিৎসা বিদ্যাও একটা বিদ্যা বটে।"

"সত্য।"

"সংযত ব্যক্তি চিকিৎসক সম্বন্ধে এটা অবশ্যই জানবে যে, তার একটা কিছু জ্ঞান আছে; কি সে জ্ঞানটা যদি জানতে চেষ্টা করা তার উচিত হয়, তবে 'কিসের জ্ঞান' ভিন্ন আর কি সে জিজ্ঞাসা করবে? অথবা প্রত্যেক বিদ্যাকেই এই প্রকার শুধু বিদ্যা বলেই পৃথক করা হয় না

* মূল, To harmonikon = harmony.

পরন্তু কি বিদ্যা এবং কিসের বিদ্যা বলেই পৃথক করা হয়?

"এই প্রকারেই ত বটে।"

"আর, চিকিৎসা বিদ্যাকে যে অন্য সকল বিদ্যা হইতে পৃথক করা হয় তাহাও (উহা) স্বাস্থ্য এবং রোগের বিদ্যা বলে।"

"হাঁ।"

"আর, যে নাকি চিকিৎসা বিদ্যা কি জানতে ইচ্ছা করে, তাকে উহা যে বিষয়ের বিদ্যা সেই সকল বিষয়েতেই অনুসন্ধান করতে হবে, বাইরের যে সকল বিষয় যে সকলের (উহা বিদ্যা) নয়, তাতে নয়।"

"নিশ্চয়ই না।"

"যে সম্যক্ বিচার করে, সে চিকিৎসকের বিচার করবে স্বাস্থ্য এবং রোগেতে, যাতে করে সে চিকিৎসক।"

"উচিত।"

"যে বুঝতে চাইবে চিকিৎসক যা বলে তা সত্য বলে কি না এবং যা করে তা ভাল করে কি না, সে এই সম্বন্ধে উক্ত এবং কৃত বিষয়েতেই তা দেখবে?"

"অবশ্যই।"

"আর চিকিৎসা বিদ্যার সাহায্য ছাড়া কেউ কি এ উভয়ের কোন একটীর উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে?"

"নিশ্চয়ই না।"

"আর চিকিৎসক ভিন্ন আর কেহও মনে হয় উহা পারবে না—সংযমী ব্যক্তিও না; (তা হ'লে তাকে) সংযমের উপর চিকিৎসকও হতে হবে।"

"তাই ত বটে।"

"মোটের উপর তা হলে, সংযম যদি জ্ঞানের এবং অজ্ঞানেরও জ্ঞান মাত্র হয়, তবে, উহা বিচার করতে সমর্থ হবে না, কোন চিকিৎসক তার বিদ্যা জানে, অথবা না জেনেও, ভাণ করে এবং মনে করে (যে জানে), এবং এই প্রকার অন্য কোন বিদ্যার অধিকারীকেও (সে বিচার করতে পারবে) না, অবশ্যই নিজের সমশিল্পী ছাড়া,—যেমন অন্য সব শিল্পীরা (করে থাকে)।"

সে বলিল, "তাই তো মনে হয়।"

আমি বলিলাম, "সংযম যদি এই প্রকারই হয়, তা হলে, ক্রিটিয়াস্ উহা হ'তে আমাদের আর কি উপকার হবে? কিংবা গোড়াতে আমরা যা বলেছিলাম, সংযমী ব্যক্তি যদি যা জানে এবং যা জানে না তাদের সম্বন্ধে জানতে পারত যে প্রথমোক্তগুলিকে সে জানে দ্বিতীয়গুলিকে জানে না, এবং এইরূপ অবস্থাগত অন্যকেও যদি সে চিনতে সমর্থ হতো, তা হ'লে বলবই যে, সংযমী হলে আমাদের খুবই লাভ হতো; (তা হলে) যারা সংযম আরম্ভ করেছিলাম তারা নিজেরা ত ভ্রমশূন্য * জীবন যাপন করতে পারতামই, অন্য সকলেও যারা আমাদের কথা মত চলতো, তারাও (সেইরূপ পারত)। আর যা আমরা জানতাম না এমন কিছু করতে আমরা চেষ্টা করতাম না, পরন্তু যারা জানে তাদিগকে খুঁজে নিয়ে তাদের (হাতে নিজেদিগকে) সমর্পণ করে দিতাম এবং অন্য যারা আমাদের অধীনস্থ থাকতো, তাদিগকেও যা করলে ভাল করে করতে পারবে তা ছাড়া অন্য কিছু করতে দিতাম না—এ অবশ্যই সেইটী যার সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান রয়েছে—এবং এই প্রকারে সংযম দ্বারা পরিচালিত গৃহ সুপরিচালিত সুগৃহ হতে পারবে, রাষ্ট্র সুরাষ্ট্র হবে, এবং অন্য যা কিছু সংযম দ্বারা (পরিচালিত হবে তাহাই ভাল হয়ে উঠবে); ভ্রম দূরীভূত হলে এবং পরিচালক হলে, এই প্রকারে যারা জীবন যাপন করবে তাদের সকল কাজই সুন্দর ও ভাল হতে বাধ্য এবং যারা ভাল কাজ করে তারা সুখী হয়ে থাকে। আমি বলিলাম, ক্রিটিয়াস্, সংযম সম্বন্ধে কি আমরা এই কথাই বলি নাই, যখন আমরা বলেছিলাম কেহ যা জানে এবং যা জানে না, তা জানা কত উপকারী?"

সে বলিল, "এই কথাই ত বটে।"

---

* মূল anamartetoe; amartea অর্থ ভ্রম, এবং পাপ দুই-ই হয়। প্রথম অর্থটীই প্রাচীনতর, এবং দ্বিতীয়টী তা হইতেই উদ্ভূত। cf. "Virtue is knowledge."

আমি বল্লাম, "এখন তবে দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, যা কিছুরই বিদ্যা নয় সেটা কোন বিদ্যাই নয় বোধ হচ্ছে।"

সে বল্লে, "দেখছি তো।"

আমি বল্লাম, "তা হ'লে এখন সংযমকে আমরা যে ভাবে দেখছি তাতে ওর এই একটা সুবিধা রয়েছে যে, উহা জ্ঞানকে এবং অজ্ঞানকেও জানে, যাতে করে, যার উহা আছে, সে অন্য যা কিছু শিখবে তা অতি সহজেই শিখবে এবং সমস্ত জিনিসই তার কাছে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কেন না, সে যা জানে তার উপর আবার জ্ঞানকেও জানে এবং যে সকল বিষয় সে নিজে জানে সে সকলের সম্বন্ধে সে অন্যকেও বিশেষ করে পরীক্ষা করতে পারবে, কিন্তু যাদের উহা নাই, তারা পরীক্ষা করতে গেলে সেটা ক্ষীণতর এবং হীনতর করে ফেলবে? তা হ'লে তাই, সংযম হতে আমাদের যা লাভ তা এই,—অথচ আমরা কিন্তু বড় একটা কিছুর প্রতীক্ষা করছি এবং ইহা যা বটে তার চেয়ে একে বড় একটা কিছু দেখতে চাচ্ছি।"

সে বলিল, "এ তো যেন তাই বটে।"

আমি বলিলাম, "হতে পারে; হয় ত আমরা লাভজনক কিছুর অনুসন্ধান করছিলাম না। আমার অনুমান হচ্ছে, এ যদি তাই হয়, তবে সংযম সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা কিছুর অনুবৃত্তি ঘটবে। সুতরাং তোমার যদি মত হয়, তবে আমরা আবার বিচার করে দেখব—জ্ঞানকে জানা সম্ভবপর এটা স্বীকার করে নেব—এবং প্রথমেই যাকে সংযম বলেছিলাম, অর্থাৎ কেহ কি জানে এবং কি জানে না তাহা (তার পক্ষে) জানা সম্ভব, এটাও আমরা অস্বীকার করব না, বরং মেনেই নিব। এবং এ সমস্ত মেনে নিয়েও আরও ভাল করে দেখব, এই প্রকার সংযম দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় কি না। আমরা যে এই মাত্র বলছিলাম যে, সংযম যদি এই প্রকার হয় এবং সে যদি গৃহ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তবে তাতে খুবই মঙ্গল হবে, সেটা,—ক্রিটিয়াস্,—আমার মনে হয়—আমরা ঠিক বলি নাই।"

সে বলিল, "সে কেমন?"

আমি বলিলাম "আমরা যে অত সহজেই মেনে নিলাম যে, মানুষের পক্ষে এটা খুবই মঙ্গলজনক হ'তো যদি আমাদের প্রত্যেকেই যে যা জানে তাই করতে চাইতো এবং যা জানে না তা যারা জানে তাদিগকে (করতে) দিত।"

সে বলিল, "সেটা কি আমরা ভাল বলি নাই?"

আমি বলিলাম "আমার ত মনে হয় না।"

সে বলিল' "সত্য, সোক্রেটিস্, অদ্ভুত কথা বলছ।"

আমি বল্লাম, "কুকুরটার নামে (*) বলছি, আমারও তাই মনে হয় এবং এইমাত্র এখানে আমি দেখছিলাম যে যা আমি বলছিলাম সেটা আমারই কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল এবং আমার ভয় হচ্ছিল যে আমরা ঠিক মত অনুসন্ধান করছিলাম না। সত্য সত্যই, সংযম যদি এই প্রকারই হয়, তবে এ যে আমাদের কোন উপকার করবে তাতো আমার কাছে মোটেই স্পষ্ট বলে বোধ হচ্ছে না।"

সে বলিল, "সে কেমন? স্পষ্ট করেই বল যাতে আমরা বুঝতে পারি তুমি কি বলছ।"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় আমি যা তা বলছি; কিন্তু তথাপি নিজের প্রতি কারও যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তবে তার মনে যা উপস্থিত হয় তাই বিচার করে দেখা উচিত, অমনি চলে যেতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।"

সে বলিল, "ঠিকই বলেছ।"

আমি বলিলাম, "তা হ'লে এখন আমার স্বপ্নটা শোন—সেটা এখন শৃঙ্গ-তোরণ † দিয়াই এসে থাকুক অথবা গজদন্তের † তোরণ দিয়াই এসে থাকুক।—যদি সত্যসত্যই সংযম আমাদের পরিচালক

* মূল Ne ton kyna ; একপ্রকার শপথ।

† অর্থাৎ সত্যই হউক কিংবা মিথ্যাই হউক।

হয় এবং এইমাত্র আমরা যা বলেছি সংযম যদি সেই প্রকারই হয়, তা হলে আর কি—লোকে সব কাজই বিজ্ঞান অনুসারে করবে, এবং কেউ যদি (নিজেকে) নাবিক বলে প্রকাশ করে অথচ বাস্তবিক তা না হয়, তবে সে আমাদিগকে ঠকাতে পার্‌বে না—অথবা কোন চিকিৎসক কিংবা সেনানায়ক কিংবা অন্য কেহ, যা জানে না তাই জানে বলে ভাণ করলে আমাদিগকে এড়াতে পার্‌বে না ; আর, এ সব তাই হলে, আমাদের আর কি—দেহ এখনের চেয়ে ঢের বেশী সুস্থ হবে, এবং সমুদ্রে যাত্রা করূলে কিংবা যুদ্ধে আমরা নিরাপদ্ হব—এবং আমাদের পোষাক, পরিচ্ছদ এবং জুতা এবং সব জিনিস পত্র আমাদের সু-নির্ম্মিত হবে—এবং প্রকৃত শিল্পীরা করবে বলে অন্য বহু বিষয়ও আমাদের ভাল হবে ? আর, তোমার যদি মত হয়, দৈব বিদ্যাকে আমরা ভবিষ্যতের জ্ঞান বলূব এবং সংযম উহার অধিষ্ঠাতা হ'লে ভণ্ডেরা বিতাড়িত হবে এবং প্রকৃত দৈবজ্ঞেরা ভবিষ্যতের প্রবক্তা বলে আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হবে। আর, মানব জাতি এই প্রকারে সংস্থিত হ'লে, তারা যে জ্ঞানবান্ হয়ে কাজ করবে এবং জীবনযাপন করূবে, তা আমি বুঝতে পারি—সংযম আমাদিগকে রক্ষা করবে এবং অজ্ঞান যে এসে পড়ে আমাদের সহচর হবে, তা হ'তে দিবে না,—কিন্তু, প্রিয় ক্রিটিয়াস্, জ্ঞানবান্ হয়ে কাজ করলেই যে আমরা ভাল কাজ করব এবং সুখী হব, এইটি আমি কিছুতেই বুঝতে পারতেছি না।

সে বলিল, "কিন্তু, বাস্তবিকই, জ্ঞানবান্ হয়ে কাজ করাটাকে যদি তুমি অনাদর কর, তবে ভাল করার আর কোন উদ্দেশ্য তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।"

আমি বলিলাম, "একটী ক্ষুদ্র বিষয়ে আমায় তবে উপদেশ দাও ;—জ্ঞানবান্ হয়ে যে বলূছ, কিসের জ্ঞান ? না, চামড়া কাটার ?"

"হা ভগবান্, আমি তো তা বলি না।"

"তবে কি পিতলের কাজের ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তবে কি পশমের, না কাঠের, না এই প্রকার অন্য কিছুর কাজের ?"

"না, তা নয়।"

আমি বলিলাম, "তা হ'লে এখন আর আমরা এটা মানূছি না যে, বিদ্যাবান্ হয়ে জীবনযাপন করলেই লোকে সুখী হয়। এরা বিদ্যাবান্ হয়ে জীবনযাপন করলেও তুমিতো তাদিগকে সুখী বলে স্বীকার করছ না, কিন্তু আমার বোধ হয়, কোন একটা বিশিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানবান্ হয়ে জীবন যাপন করলেই তাকে তুমি সুখী বলে পৃথক্ করে রাখছ এবং হয় ত তাকেই সুখী বলছ যার কথা আমিও এই মাত্র বলছিলাম—যে ভবিতব্য সমস্ত বিষয় জানে—অর্থাৎ দৈবজ্ঞ। এরই কথা বলছ, না, আর কারও ?"

সে বল্লে, "এর কথাও আমি বলছি এবং অন্যও।"

আমি বল্লাম, "কে ? যদি কেহ ভবিতব্য বিষয় ছাড়া অতীত বিষয়ও সব জানে এবং বর্ত্তমানও, এবং কিছুই যদি তার অজানা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি নয় ত ? ধরে নিলাম, এমন কেহ আছে। তা হ'লে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানবান্ হয়ে জীবন যাপন করছে, এমন কেহ আছে—এ বোধ হয় আর তুমি বল্‌বে না।"

"নিশ্চয়ই না।"

"এখনও এই আর একটী বিষয় আমি জান্‌তে চাই, বিভিন্ন জ্ঞানসকলের মধ্যে কোন্‌টী তাকে সুখী করে ? না, সকলেই সমানে ?"

সে বলিল, "সমানে নিশ্চয়ই নয়।"

"তবে কোন্‌টী সবচেয়ে বেশী ? যেটীতে—কি জানে—বর্ত্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিষয় সকল ? অথবা যাতে সতরঞ্চ খেলা জানে ?

সে বলিল, "সতরঞ্চ খেলা কি প্রকারে ?"

"তবে কি, যাতে গণনা জানে ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তবে কি, যাতে স্বাস্থ্যের জ্ঞান হয়?"

সে বলিল, "বরং কতকটা।"

আমি বলিলাম, "যেটাতে সব চেয়ে বেশী, সেটী কোন্‌টী—যাতে কি শিখে?"

সে বলিল, "যাতে ভালর এবং মন্দের জ্ঞান হয়।"

আমি বলিলাম, "হে অদ্ভুত জীব, জ্ঞানবান্ হয়ে জীবন ধারণ করাটাই যে (মানুষকে) সৎ কার্য্য করায় না এবং সুখী করে না—অন্য সমস্ত বিদ্যা থাক্‌লেও না—কিন্তু কেবলমাত্র সেই একটী বিদ্যা থাক্‌লে যাতে ভালর এবং মন্দের জ্ঞান হয়—এই কথাটী গোপন রেখে এতক্ষণ তুমি আমাকে এক বৃত্তের চারিদিকে ঘুরাইতেছিলে। কারণ, হে ক্রিটিয়াস্, যদি তুমি এই একটী বিদ্যাকে অন্য সকল বিদ্যা হইতে পৃথক্ করে নিতেও চাও, তবে কি চিকিৎসাবিদ্যা স্বাস্থ্যবিধান কম কর্‌বে, না চর্ম্মকারের বিদ্যা জুতা তৈয়ার কম কর্‌বে, কিম্বা তন্তুবয়নবিদ্যা দেহাচ্ছাদন এবং নৌবিদ্যা সমুদ্রে অথবা সৈনিকবিদ্যা সমরে মৃত্যু নিবারণ কম করবে?"

সে বলিল, "একটুও কম নয়।"

"কিন্তু, প্রিয় ক্রিটিয়াস্, এই বিদ্যাটী যদি অন্তর্হিত হয়, তবে অন্য বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকটীরই ভাল হওয়া এবং উপকারী হওয়ার সম্ভাবনাও আমাদিগকে ত্যাগ কর্‌বে।"

"ঠিক বলেছ।"

"কিন্তু এই বিদ্যাটী অবশ্যই—যেমন মনে হচ্ছে—সংযম নয়, কিন্তু (এটী) তাই যার ক্রিয়া আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এটী বিদ্যাসমূহের এবং অ-বিদ্যাসমূহের বিদ্যা নহে, পরন্তু ভাল-র এবং মন্দের বিদ্যা; যাতে করে, এইটী যদি প্রয়োজন-সাধক হয়, তবে সংযম আমাদের পক্ষে তদতিরিক্ত কিছু একটা হবে।"

সে বল্লে, "কিন্তু কেন উহা (সংযম) প্রয়োজন-সাধক হবে না? যদি সংযম সত্যসত্যই অন্য সকল বিদ্যার বিদ্যা হয়, তবে উহা অন্য সমুদয় বিদ্যার নায়ক হইবে, এবং ভাল-র যে জ্ঞান তাহারও অধিনায়ক হবে বলেই আমাদের উপকারী হবে।"

আমি বলিলাম, "উহাই কি সুস্থ হতে শিখাবে, চিকিৎসা এবং অন্য সব বিদ্যার কাজও কি উহাই করবে, এবং তারা কি যার তার কাজ করবে না? অথবা, আমরা কি পূর্ব্বে হলপ করি নাই যে উহা শুধু জ্ঞানের এবং অজ্ঞানেরই জ্ঞান, অন্য কিছুর নয়? তাই নয় কি?"

"তাই তো বোধ হচ্ছে।"

"উহা অবশ্যই স্বাস্থ্যের কর্ত্তা (কথায় ২ শিল্পী) নয়?"

"অবশ্যই না।"

"স্বাস্থ্য অবশ্যই অন্য একটী বিদ্যার (শিল্পের) বিধেয়? নয় কি?"

"অন্য একটীর।"

"তবে ভাই, উহা আবার উপকারেরও কর্ত্তা নয়; সে কার্য্যটী এইমাত্র আমরা অন্য বিদ্যার উপর পৃথক ভাবে ন্যস্ত করেছি; না কি?"

"অবশ্য।"

"কোন উপকারের যখন মালীক (কর্ত্তা) নয়, তখন সংযম আর উপকারী হবে কি প্রকারে।"

"কিন্তু সোক্রেটিস্, এতো কিছুতেই সম্ভবপর মনে হয় না।"

"এখন তবে দেখতে পাচ্ছ, ক্রিটিয়াস, যে পূর্ব্বে আমি সঙ্গতরূপেই ভয় করেছিলাম এবং ন্যায়তঃই নিজেকে অভিযুক্ত করেছিলাম যে, সংযম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কিছু আমি দেখ্‌তে পাই না? ঠিকমত অনুসন্ধান করা সম্বন্ধে যদি আমার কিছু মাত্র যোগ্যতা থেকে থাকে, তা হ'লে, যে বস্তুটী অন্য সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্বীকৃত হয়, সেটাই আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হ'তো না। এখন তো আমরা সব রকমেই

পরাভূত হয়ে যাইতেছি এবং আবিষ্কার করতে পারছি না যে, পদার্থ সমূহের কোনটীতে বিধাতা * 'সংযম' এই নামটী স্থাপন করেছিলেন। অথচ আলোচনার সময় অনুপপন্ন অনেক কথাই ধরে নিয়াছিলাম; এবং তর্কেতে সেটা স্পষ্ট না হ'লেও এবং অসিদ্ধ হলেও আমরা মেনে নিয়াছিলাম যে বিদ্যার আবার একটা বিদ্যা আছে; এবং সেই বিদ্যার বলেতে অন্য সব বিদ্যার কার্য্য জানতে পারা যায়, এটাও স্বীকার করেছিলাম, অথচ এটাও তর্কেতে অসিদ্ধ ছিল;—এই জন্যে (স্বীকার করেছিলাম) যে, যা তিনি জানেন তা যে জানেন এবং যা জানেন না তা যে জানেন না, এইটী যাতে আমাদের সংযমী ব্যক্তি জানতে পারেন।" এটা আমরা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিতই স্বীকার করেছিলাম, অথচ একবার ভেবেও দেখি নাই যে কোন ব্যক্তি যা কোন প্রকারেই জানেনা, সেটাই আবার তার পক্ষে এক রকমে জানা অসম্ভব; একজন যা জানে না তাই আবার সে জানে,— আমাদের স্বাকৃতির অর্থ তো এই ছিল। অথচ, আমার মনে হয়, এমন কিছুই নাই যার চেয়ে এটা অধিক যুক্তি-বিরুদ্ধ প্রতীত না হবে। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে এমন শিষ্টশান্ত—এবং মোটেই দুরন্ত নয়—পেয়েও এই অনুসন্ধান কিছুতেই সত্যের আবিষ্কার করতে সমর্থ হ'লো না, বরং এমনি করে আমাদিগকে উপহাস করলে, যে, যেটাকে আমরা পূর্ব্বে একমনাঃ এবং এককল্মা হয়ে সংযম বলে মনে করেছিলাম, সেটাকেই অবশেষে অতি নিদ্দয় ভাবে আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন করে দিলে। আমার নিজের জন্য এতে আমি দুঃখ করছি না; কিন্তু—আমি বলিলাম—তোমার জন্য, খারামাডিস্, বড়ই দুঃখ হচ্ছে, যে, তুমি আকৃতিতে এমন (সুন্দর) হয়েও এবং তার উপর চেয়ে সব চেয়ে বেশী সংযত হয়েও—এই সংযম হতে কোন প্রকারে লাভবান্ হ'তে পারবে না এবং সংযম তোমার জীবনে বর্ত্তমান থেকেও তোমার কোন উপকার করবে না। আরও দুঃখ হচ্ছে সেই মন্ত্রটীর জন্য যা আমি থ্রেসীয় লোকটীর নিকট শিখেছিলাম, যদি সত্যসত্যই এই একটা অকর্ম্মণ্য এই বস্তুটীকে এত যত্নের সহিত শিখে থাকি। কিন্তু বাস্তবিকই ইহা তাই, এরূপ মনে হয়না, বরং আমিই একটী বোকা অনুসন্ধানকারী; কেননা, সংযম প্রকৃতই একটী পরম উপকারী বস্তু, এবং তোমার উহা রয়েছে তাতে বাস্তবিকই তুমি ভাগ্যবান্। কিন্তু ভেবে দেখ, সত্যই উহা তোমার আছে কি এবং মন্ত্রটী না হলে তোমার চলে কিনা; যদি সত্যই উহা তোমার থেকে থাকে, তাহলে বরং আমি তোমায় এই মনে করতেই পরামর্শ দিব যে, আমি একটী বোকা এবং তর্ক দ্বারা কোন বিষয় মীমাংসা করতে অক্ষম, আর, তোমার নিজের বেলায়, (এই মনে করতে বলব যে), যতই তুমি সংযত হবে, ততই সুখীও হবে।"

খারমিডিস্ তখন জবাব দিলে—সে বল্লে, "কিন্তু ভগবানের নামে, সোক্রেটিস, আমি তো জানি না আমার উহা আছে, না, নাই, আমি উহা কি প্রকারে জানবো, যে জিনিসটী সম্বন্ধে যেমন আপনি বলছেন—উহা কি প্রকার তা আপনারাই খুঁজে বের করতে সমর্থ হলেন না,—তা আমি কি প্রকারে জানবো? আমি কিন্তু আপনার কথা বিশ্বাস করি না; আর আমার সম্বন্ধে, সোক্রেটিস, মনে হয়, আমার ঐ মন্ত্রটীর প্রয়োজন রয়েছে, এবং যে পর্য্যন্ত না আপনি বলবেন যে যথেষ্ট হয়েছে, সে পর্য্যন্ত যতদিন দরকার আপনাকর্ত্তৃক এই মন্ত্রে মন্ত্রিত হতে আমার কোনই বাধা নাই।"

ক্রিটিয়াস বল্লে, "বেশ, আর, খারমিডিস্ যদি তুমি তাই কর, যদি তুমি মন্ত্রিত হওয়ার জন্যে সোক্রেটিসের বশ্যতা অবলম্বন কর এবং ছোট বড় কিছুতেই ইঁহাকে পরিত্যাগ না কর, তবে আমার কাছে প্রমাণিত হবে যে তুমি সংযমী হইতেছ।"

* মূলে—Nomothetes = Law-giver.

খারমিডিস্ বল্লে, "ধরে নিতে পারেন যে, আমি ওঁকে অনুসরণ করবো এবং পরিত্যাগ করবো না; অভিভাবক আপনার কথা যদি না শুনি এবং আপনি যা আদেশ করেন তা যদি না করি, তবে আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে।"

ক্রিটিয়াস্ বল্লে, "আমি কিন্তু তাই আদেশ করছি।"

সে বল্লে, "আমিও পালন করব—আজ থেকেই আরম্ভ করে।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়রা কি করবার পরামর্শ করছেন ?"

খারমিডিস্ বল্লে, "করছি না কিছুই, পরামর্শ করাটা হয়ে গেছে।

আমি বল্লাম, "বলপ্রয়োগ করবে না কি এবং একটু বিচার ও কি আমার জন্যে করবে না ?"

সে বল্লে, "বলপ্রয়োগই হচ্ছে, জানবেন ; কেন না উনি আমায় আদেশ করছেন। এ সম্বন্ধে যা করেন, ভেবে চিন্তে করবেন।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু ভাববার যে আর কোন অবকাশ রইল না ; তুমি একটা কিছু করতে কৃতসংকল্প হলে এবং বলপ্রয়োগে উদ্যত হ'লে, মানবকুলে এমন কেউ নাই যে প্রতিকূল আচরণ করতে পারে।"

সে বলিল, "নাই-ই তো, আপনিও তবে প্রতিকূল হবেন না।"

আমি বলিলাম, "আর এখন আমি প্রতিকূল হব না।"

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বুদ্ধগয়া-মহিমা।

গয়া জেলার বুদ্ধগয়া প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ। এখানে রাজা অশোকের রাজধানী ছিল। গয়ার বিষ্ণুপাদ অথবা গয়া জেলার সদর হইতে ইহা প্রায় দশ মাইল। পাকা বাঁধা রাস্তায় একাতে যাইতে হয়। আমি গয়ায় কয়েকবার গিয়াছি। দুই তিনবার বুদ্ধগয়ায় গিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে আমি অন্য একজনকে পথ প্রদর্শক লইয়া গিয়াছিলাম। তার-পর আমিও অপরের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলাম। একবারে রোগী আরবারে ওঝা সাজিয়াছিলাম। গয়া হইতে কয় বারই একাযানে, গয়া হইতে মধ্যাহ্নাহার করিয়া গিয়াছি। যাইবার সময় একখানি গ্রামের সমৃদ্ধশালী লোকদের বাড়ী দেখাইয়া একাওয়ালা কহিল "শীঘ্র শীঘ্র দিনমানে এই গ্রাম ছাড়াইতে হইবে। এ গ্রামের এই সকল লোকেরা ডাকাত। সে দিনও এই পথে একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।" আমি কিন্তু আদপেই বিশ্বাস করিলাম না। মনে করিলাম একা-ওয়ালা শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার জন্যই একথা বলিতেছে। সময়-মত সেখানে পঁহুছিয়া দেখি একজন বাঙ্গালী বাবু দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি সেখানকার প্রাচীন দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য বুদ্ধগয়ায় ওভারশিয়ার। কিছু-কাল পরে একখানা টম্‌টমে করিয়া তাঁহার পুত্রেরা গয়ার স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল। নিত্য তাহারা গয়ার স্কুলে যাতায়াত করে। বুদ্ধগয়ায় মোহন্তের বাড়ী, সিংহলী মঠের, বুদ্ধগয়ার মন্দির, থানা, ডাকঘর, সামান্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ একটী বাজার ব্যতীত অপর নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের বাড়ী।

সর্ব্ব প্রথমেই বৃহৎ বুদ্ধ মন্দির দেখিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেব। চতুর্দ্দিকে বাঁধান গৃহ। তাহারই সংলগ্ন অশোকের স্মৃতিচিহ্ন—রাজা অশোকের স্তম্ভাদি ও পাকা বাড়ী। এ সকল বাড়ী বহুকালের, অনেকগুলি মাটীর নীচে গিয়া পড়িয়াছে। কোন কোনটীতে সংস্কৃতাক্ষরে কি কি লিখা আছে। এখানকার মাটী খুঁড়িয়া বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল সরকারী তরফ হইতে একটা গৃহে রক্ষা করা হইতেছে। সে সকলগুলিতে নম্বর দিয়া যত্নে রাখা হইয়াছে। সকলেই তা দেখিতে পারে, কিন্তু কেহ তাহা উঠাইয়া লইতে পারে না। ওভারশিয়ার বাবু সেই সকলেরই

তত্ত্বাবধান করেন। এই স্থানের পাশ দিয়া একটু তেঁতুল বন। বুদ্ধগয়া স্থানটী উচ্চনীচ বন্ধুর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাগাড় সমষ্টি বলিলেই চলে। ওখানে বৌদ্ধ মন্দিরের পাশেই বুদ্ধদেবের ধ্যান মন্দির। বুদ্ধদেব বা তাঁহার ভক্তগণ কেমন করিয়া ধ্যান করিতেন সে স্থানটী কেমন ছিল ইহা তাহারই নমুনা। যদিও সেখানকার লোক বুদ্ধদেবেরই এই আসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিল তাহা বিশ্বাস করিলাম না। বুদ্ধদেব কবে এখানে আসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন সে তত্ত্ব আমরা রাখি না। তবে বুদ্ধাস্থি ওখানে পতিত হইয়াছিল বা তাহা এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছিল তাহাতে আর ভুল কি আছে? যেমন সতীর দেহাংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে তাহাই তীর্থপীঠ হইয়াছে তদ্রূপ বুদ্ধদেবের দেহাংশ যেখানে পতিত হইয়াছে বা রাখা হইয়াছে তাহাই বুদ্ধতীর্থ হইয়াছে। তাই এখানে দুই একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (পুঙ্গি) আছেন।

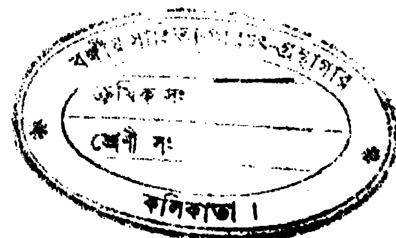
বুদ্ধগয়ায় মোটেই বৌদ্ধ অধিবাসী নাই। এখানে একজন বহুবিত্তশালী মোহান্ত আছেন। ইঁহাকে যদিও অনেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এই মোহান্ত যে কি প্রকারে হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র অনুমান করা যায় যে এখানে বৌদ্ধাধিকারে লুপ্ত হইলে হিন্দু সন্ন্যাসী ইহা দখল করিয়া লন ও এযাবত হিন্দুদের অধিকারেই আছে। ইঁহার জমিদারীর আয় বার্ষিক চারিলক্ষ টাকা। মোহান্ত সন্ন্যাসী বেশেই থাকেন। ইঁহার বহুতর চেলা আশ্রমে বাস করেন। ইঁহার কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি সকলেই সন্ন্যাসী। প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী ও বাগান। জমিদারী হইতে নিত্য ধান, চাউল আসিয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা কেহই বিবাহ করিবার অধিকারী নহে। নিত্য বহু সন্ন্যাসীর রন্ধনাদি এখানে হইয়া থাকে। তাহারা অতিথিসৎকার ও দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরাই রন্ধনাদি করেন। মোহান্তের বড় মানুষী দ্রব্যও আছে। হাতী, গাড়ী, ঘোড়া কিছুরই অভাব নাই। মোহান্তের ম্যানেজার, দেওয়ান, কর্ম্মচারী, পাইক সকলই সন্ন্যাসী। আমি প্রথমবারে যে মোহান্তকে দেখিয়াছিলাম পরে তাহাকে দেখিতে পাই নাই। তাঁহার পরলোক গমনে তাঁহারই প্রধান চেলা বা সেবাইত গদী দখল করিয়া মোহান্ত হইয়াছেন। দুই জনেরই আবার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া ভাল লাগিল। আমি তাঁহাদের নিকট ফল ও লাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করিয়াছিলাম। বোধ হয় ভদ্রলোক দর্শনার্থী গেলে জলযোগ করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। মোহান্তের বাগানে বহুতর কলাগাছ আছে, ঐ সকলকে মাঝে মাঝে জল দিয়া গরমের দিনে তাজা রাখা হয় বড় কড়ামাটী কি না? মোহান্তের বাড়ীতে ঢেঁকিতে চাউল, জাতায় দাইল প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। স্থানীয় স্ত্রীলোকেরাই ঐ সকল কার্য্য করিতেছে। চাউল, দাইল ভাণ্ডারে রক্ষিত হইতেছে। দু'একটী জাতায় ময়দা বা আটা প্রস্তুত হইতেছে। রন্ধনশালার চুল্লী প্রত্যহ পরিস্কার করা হইয়া থাকে। মোহান্তের সেরেস্তায় অনেকটী আমলা, তাহারা খাজানা জমা, কর্জ্জ টাকার জমা এবং খরচাদির হিসাব লিখিতেছেন। আমলারা সকলেই সন্ন্যাসী। রোগ হইলে চিকিৎসা করেন সন্ন্যাসীরাই। একজন বাঙ্গালী বাবু দেখিলাম তিনি সেখানে বাস করেন। তাহার দেহাবরণে কোন প্রকার সন্ন্যাসী ভাব নাই, তিনি এখানে কেন আছেন তাহার পরিস্কার উত্তর তাহার নিকট পাইলাম না। কয়েকজন বাঙ্গালী ছাত্র এখানে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। মোহান্ত স্বয়ং তাদিগকে পড়াইয়া থাকেন। কোন মোহান্ত অপারগ হইলে পণ্ডিত রাখিয়া সে কার্য্য চালান হয়। মোহান্ত বিনা মূল্যে নানাবিধ রোগের ঔষধ দিয়া থাকেন। এখানকার মোহান্তকে সাধারণতঃ "মোহান্ত মহারাজ" বলিয়া সকলে কহিয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহার ব্যাহিক চালচলন "মহারাজেরই" মত কিন্তু পরিধানে কৌপিণ ও ত্রিকচ্ছ, বস্ত্রাদি সামান্য মাত্র গেরুয়া ভাবাপন্ন। প্রতিদিন বহু লোকের নালিশ ফরিয়াদ শুনিয়া ডিক্রী, ডিসমিস করিতেছেন, কিন্তু কখন যে তিনি ঈশ্বরাধনা বা তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা জানিতে পারি নাই। দিনরাত সর্ব্বদাই গণ্ডগোল ও হৈ রৈ। সর্ব্বদা যে যাহার অর্পিত কার্য্য করিয়া যাইতেছে, যে সকল বাঙ্গালী ও অপর ছাত্র আছে তাহারাও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্রে আহার করে।

বৌদ্ধ নীতি "অহিংসা পরম ধর্ম্মঃ।" বৌদ্ধ এখানে একজন আছেন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাঙ্গলা জানেন না। ইংরেজী জানেন না বলিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে অসুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার বাড়ী সিংহলে। সিংহল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সমাজের একটি মন্দির এখানে আছে তিনি তাহারই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি এখানকার ব্যয়ের টাকা সিংহল হইতে প্রাপ্ত হন। ইনি সর্ব্বদাই পালী পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করেন। এখানে তাঁহার তত্ত্বাবধানে একটী পালি লাইব্রেরী আছে। তিনি এখানে অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধ। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাঁহার আশ্রম। এখানে তাঁহার ভৃত্যাদি আছে, উহারা সে দেশীয় লোক, তিনি ব্যতীত সিংহলের অপর লোক কেহ নাই। তিনি পালী ব্যতীত অপর ভাষা জানেন না। এখানে আসিয়া সামান্য রকম হিন্দি অভ্যাস করিয়াছেন। আমাদিগকে চা ও জলযোগের অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমরা তাহা সাদরে উপেক্ষা করিয়াছিলাম যেহেতু মোহান্ত মহারাজের নিকট আমাদের এক পালা ঐরূপ হইয়াছিল। তাঁহার নিকটই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তারপর মন্দির চত্বরে বটবৃক্ষতলে আসিলাম। আসিয়া দেখি কয়েকজন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধতীর্থ আসিয়াছেন তন্মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত একজন ব্রহ্মদেশীয় লোক। ইনি কলিকাতা থাকিয়া বি, এ পড়েন। ইহার সঙ্গে দেখা হইলে ইংরেজী ভাষায় অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি কলিকাতা আছেন বলিয়া তাহার দেশ হইতে যাত্রীগণ আসিয়া তাহাকে এ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন। বটবৃক্ষতলে নাকি বুদ্ধের দন্তাস্থি রক্ষিত হইয়াছে। তাহারা বৃক্ষতলে আমাকে পাদুকা লইয়া যাইতে দিলেন না। আমি তাহাদের প্রদীপ সাহায্যে তাহাদের সঙ্গে বৃক্ষতলে গিয়া বসিলাম। ইংরাজী শিক্ষিত যুবক ব্যতীত তাহারা সকলেই ধ্যানস্থ হইয়া বৃক্ষতলে ভগবানের নাম জপ করিতেছেন। এই তীর্থে মাসে মাসে ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি হইতে যাত্রীগণ আসিয়া থাকেন। রাত্র অধিক হইতেছে তদুপরি একাওয়ালার তাগাদা আমাদিগকে অতীষ্ঠ করিয়াছিল বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

সেস্থান হইতে আসিয়া বাঙ্গালী ওভারশিয়ার বাবুর গৃহে আসিলাম। পথিমধ্যে একাওয়ালা গোলযোগ করিয়াছিল আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালী বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। গিয়া দেখি, তিনি আমাদের অপেক্ষায় বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহার ওখানে আমাদের চা ও জলযোগ চলিল। অনিচ্ছা স্বত্বেও তাঁহার অতি আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। একাওয়ালা দু'একবার তাগাদা দেওয়ায় তিনি ধমক দিয়া বলিলেন "তুই চলিয়া যা, বাবুরা আমার বাড়ীর গাড়ীতে যাইবেন অথবা এখানেই থাকিবেন, কাল তাহাদিগকে দিয়া আসিবে।" ইহার পর একাওয়ালা চুপ করিল। আমরা ডাকাতের ভয়ের কথা কহিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাঁহার গৃহ হইতেই আমরা চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় তাঁহার নিকট হইতে বুদ্ধগয়ার একখানি ইংরাজী ইতিহাস লইয়া আসিলাম। উহা একজন ইংরেজ লেখকের লিখা পুস্তক। আমাদের বুদ্ধি বিগড়াইয়াছে তাহা না হইলে আমরা কেন ইংরেজের লিখিত ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রামাণ্য স্থাপন করি।

গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যাইতে পথে ফল্গুর তীরে মাঝে মাঝে শ্বেত মন্দির দেখিলাম, উহারা নাকি বৌদ্ধদের সমাধি মন্দির। সে সকলে লোক নাই, মাঠের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হইল ঐ সকল মাঝে মাঝে সংস্কৃত হইয়া থাকে, অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল অল্পদিন হয় চুণ কাম করা হইয়াছে। একাওয়ালা কহিল মোহান্ত মহারাজ ইহার সংস্কার করেন। বুদ্ধগয়ার ইতিবৃত্ত লিখিলাম, বুদ্ধের জীবনী দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।



পল্লী।

ছায়া-সুনিবিড় শ্যাম পল্লির
শান্ত কুসুম-কুঞ্জে,
কাহার বাঁশরী বাজে মর্ম্মরি
তরু-পল্লব-পুঞ্জে ?
বাহু পসারিয়া কে যেন ডাকিয়া
আবরে কোমল বক্ষে,
কে জানে কোথায় ডাক শোনা যায়,
ধারা বহে যায় চক্ষে !
ওগো মা আমার ! এসেছি আবার,
অতিথি দাড়ায়ে ক্ষুণ্ণ,
কণ্ঠে তিয়াস, পূরাবে কি আশ ?
করিবে কি সাধ পূর্ণ ?
প্রণমি তোমায় ও চরণ ছায়
ভুলে যাই ব্যথা দৈন্য,
মুছে দাও মোর নয়নের লোর
কর স্নেহে আজ ধন্য।

শ্রীআশুতোষ রায়।

কধুরখীলে সাহিত্যচর্চ্চা।

(কধুরখীল সাহিত্যসভায় পঠিত)

কধুরখীলে সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়িলেই সর্ব্বাগ্রে মনে হয়, সাহিত্যের বিরাট ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র পল্লী এমন কি দান করিয়াছে, যাহার বলে আজ বার বৎসর ধরিয়া এই সাহিত্য সভার অধিবেশনের আয়োজন হইতে পারে। বাংলা দেশের সুধী মনস্বীগণের সমবেত চেষ্টায় মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি মহানগরী কলিকাতায় যে সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা, তথা সাহিত্যকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, ঠিক তেমন একটা চিন্তার ধারা মনো বিজ্ঞানের কোন সূক্ষ্মতম বিধি অনুসারে সুদূর চট্টল প্রদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামের শিক্ষিত সমাজের প্রাণেও প্রভাব বিস্তার করিয়া এই সাহিত্য সভা স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল। ইহার মধ্যে এক নিগূঢ় কার্য্যকারণ শক্তি নিশ্চিতই নিহিত আছে, এবং ইহার ইতিহাসের উদ্ধার করিতে না পারিলে এই সভার সাফল্য সম্যক্ লাভ হইবে না বলিয়া মনে হওয়াতেই আজ তাহারই সঙ্কলন করিয়া এবং আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। সুধীবৃন্দ ! বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সাহিত্য অর্থে আমরা বঙ্গসাহিত্যের কথাই মনে করিব। সংস্কৃত-ভাণ্ডারে এই গ্রাম কোনও সম্পদ দান করিয়াছে কিনা, তাহার সংবাদ আমরা অবগত নাহ। এই দেশের ভৌগলিক অবস্থান, ভূস্তর-পরীক্ষা, এবং ইহার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক বংশের বিবরণ ইত্যাদি এই গ্রামের বয়স সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা বিশাল কায়া দেবনদী কর্ণফুলির গর্ভে নিহিত ছিল; এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনের গতি মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনও প্রকার অনুসন্ধান করিবারও সুযোগও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে অপ্রাসঙ্গীক হইলেও এ ক্ষেত্রে ইহা বলিতে পারি যে সংস্কৃত সাহিত্য এ গ্রামের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। এই গ্রামের মুকুট মণি চট্টল সমাজের বরেণ্য সন্তান ৺ রায় অভয়া চরণ চৌধুরী মহোদয়ের বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই বিপুল অর্থব্যয়ে এবং অদম্য চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আনীত পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা সহস্রাধিক লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রামের জন্য এত বিরাট গ্রন্থশালা স্থাপিত হয়। তৎসম্বন্ধে বহুবার বহু স্থানে আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসীর পূজামণ্ডলে এই গ্রামের কোন ভক্ত পূজারী কি কি অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহার ইতিবৃত্তের উদ্ধার করিয়া আজ আমরা বুঝিতে চাহিব, মূলতঃ কোন্ অধিকার বহন করিয়া এতদ্দেশীয়েরা এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে অধুনা লুপ্ত সেন বংশীয় ৺ মুরারী সেনই প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করেন। তদীয় রচনা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তদ্রচিত "পদ্ম পুরাণের" পদ্যানুবাদ এবং অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থ শ্রদ্ধেয় মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইবার পরে স্থানীয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক পুনরাণীত হইয়া সম্প্রতি তাঁহার নিকটেই আছে। তৎকালীন সাহিত্যের আদর্শ তাঁহার মধ্যে কি ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল, উক্ত কাব্যাবলী পাঠে সহজেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের দ্বন্দের যুগে শাক্তপক্ষ অবলম্বন করিয়া শক্তি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাই বোধ হয়, তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

উক্ত মুরারী সেনের সমসাময়িক যুগে কিম্বা তাহার—অত্যল্পকাল পরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৺ রায় শ্রীমন্তরাম চৌধুরী সাহিত্য সাধনায় আত্ম নিয়োগ করেন। চট্টল প্রদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার মূলে যে সকল অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষের কর্ম্মতৎপরতার কথা ইতিহাসে সংকলিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন। চট্টগ্রামে "মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয় কাল হইতে যে সকল কায়স্থ পরিবার স্বকীয় বিশিষ্টতার গুণে উচ্চ রাজমর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছেন" তাহাদেরই একটীতে মহা প্রাণ ৺ রায় কীর্ত্তিনারায়ণের ঔরসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামা সঙ্গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলী অদ্যাপি নানাস্থানে নানা ভাবে প্রচলিত আছে।

সম্ভবতঃ এই যুগেই কধুরখীলের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ৺ নরোত্তম দাস কেরাণী জন্মগ্রহণ করিয়া সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহার রচিত একটী এবং সঙ্কলিত একটী, মোট দুইটী পুস্তকের সম্বন্ধে মূল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত, এবং সাহিত্য বিশারদ মুন্সী সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "প্রাচীন পুঁথির বিবরণে"; এবং তদ্রচিত "বাত্যাবর্ত্ত বিবরণ" নামক অন্য একটী গ্রন্থ সম্বন্ধে সাহিত্য বিশারদের লেখনী প্রসূত এবং "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত "প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রাম" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার একটী পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় মুন্সী সাহেব যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লাভ করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকও গৌরবানুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, "তৎকালে একই ব্যক্তির ভাণ্ডারে যে বিবিধ বিষয়ে এত জ্ঞান সঞ্চিত থাকিতে পারে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তদীয় পুস্তকের শেষে লিখিত আছে, "শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শ্রীনরোত্তম দেবদাসস্য" সাং কধুরখীল, থানে পটীয়া, জিলে চট্টগ্রাম। বোধ হয়, তিনি শাণ্ডিল্য দেব কায়স্থ বংশের স্থানীয় শাখার একতম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভাষা জননীর সেবায় ইঁহাদের কৃতকার্য্যতা লাভে এদেশে সাহিত্য সেবাব্রত সাধারণের লোভনীয় হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তৎসময় হইতেই এদেশে বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা বহুল ভাবে প্রসারতা লাভ করে। এই সময় হইতে যে সমুদায় সাহিত্যসেবী স্বকীয় প্রতিভা বলে সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সন্তোষ বিধান করিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমরা একে একে তাঁহাদের পরিচয় জানিতে চেষ্টা করিব।

(৪) রায় কালিদাস চৌধুরী :—পূর্ব্বোক্ত রায় শ্রীমন্তরাম চৌধুরী মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ রায় কালিদাস চৌধুরী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনে গভর্ণমেণ্টের অধীনে Salt Inspector এর কার্য্য গ্রহণ করেন। ইনি আদর্শ চরিত্রের সাধু পুরুষ ছিলেন। স্বীয় অভীষ্ট দেবতার স্তুতি, বন্দনা, কীর্ত্তন ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন।

(৫) ৺ মাগনদাস চৌধুরী—পূর্ব্বোক্ত ৺ রায় শ্রীমন্তরাম চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ মাগনদাস চৌধুরী ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমায় ওকালতী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং তাহার অধিকাংশই পরহিতার্থে দান করেন। তিনি ভগবদ্ভক্তিমূলক কতিপয় সঙ্গীত রচনা করেন।

(৬) ৺ কৃষ্ণকান্ত দত্ত—স্থানীয় কাশ্যপ দত্ত বংশজ ৺ কৃষ্ণকান্ত দত্ত মহাশয়ও এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষার সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সম্প্রতি তাহার স্বহস্ত লিখিত এবং তদীয় নামের ভনিতা সম্বলিত "লক্ষ্মণ বিজয়" নামক একটী কাব্যগ্রন্থ কীটদষ্ট অবস্থায় কাব্যকর্ত্তার পৌত্র প্রীতিভাজন বন্ধু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে। স্থান বিশেষে তাহার পাঠোদ্ধার করিতে না পারিলেও অবশিষ্টাংশ হইতে গ্রন্থকারের সহৃদয়তা, ভাবুকতা, এবং রচনা নৈপুণ্য স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হয়। সমাজে জাতীয়ভাবের প্রবাহ অবাধ করিতে তদীয় সাহিত্য চর্চ্চা প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল।

(৭) ৺ তারিনী চরণ চৌধুরী :—৺ রায় শ্রীমন্তরাম চৌধুরীর দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺ রামহরি চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ তারিনী চরণ চৌধুরী যৌবনে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টারের কার্য্য করিয়া স্বকীয় সাধুতায় এবং চরিত্র মাধুর্য্যে সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই বলেন যে এরূপ সাধু প্রকৃতির লোক তৎকালেও সচরাচর দৃষ্ট হইত না। ভাবমূলক এবং দেবদেবী বিষয়ক কতিপয় সঙ্গীত রচনা দ্বারা তিনি স্বকীয় ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করেন। প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

(৮) ৺ পীতাম্বর চৌধুরী—উক্ত ৺ রামহরি চৌধুরীর মধ্যম পুত্র ৺ পীতাম্বর চৌধুরী চট্টগ্রামের তৎকালীন উকিল সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ব্যবসাবুদ্ধি এবং পরোপকার প্রবৃত্তি এই দুই বিভিন্ন গুণ তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করে বলিয়া জনসমাজের হৃদয়ে তিনি গভীর শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। জানা যায়, তাঁহার খুল্লতাত পুত্র ৺ রায় অভয়াচরণ চৌধুরী রচিত দক্ষযজ্ঞ নাটকের অংশ বিশেষ তাঁহারই রচিত। বলা বাহুল্য, এই বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারই চট্টগ্রামে সর্ব্বপ্রথম যাত্রাভিনয় প্রচলিত করেন। তৎপূর্ব্বে ঈদৃশ অনুষ্ঠান এতদ্দেশবাসী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, জানা নাই। ৺ পীতাম্বর চৌধুরী মহোদয় বহুবিধ সঙ্গীত রচনা দ্বারা ও সাহিত্যের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, উহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও বোধ হয়, চেষ্টা করিলে উহাদের উদ্ধার সম্ভবপর হইবে।

(৯) ৺রায় অভয়াচরণ চৌধুরী :—পূর্ব্বোক্ত রায় শ্রীমন্তরাম চৌধুরীর সর্ব্বকনিষ্ঠভ্রাতা ৺ মহাত্মা দেবীদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রায় অভয়াচরণ চৌধুরী খৃঃ ১৮২৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কমপ্রভাবে বঙ্গীয় সমাজে কধুরখীলের জন্য একটী স্থায়ী আসন রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কধুরখীলে, তথা সমগ্র চট্টগ্রামের সর্ব্ববিষয়িনী উন্নতি ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্য ইহার নিকট যে পরিমাণে ঋণী, বঙ্গসাহিত্য ততোধিক। বিগত শতাব্দীর মধ্যযুগের চটুল সাহিত্যের অনিয়ন্ত্রিত শিথিল গতিকে সংযত করিয়া নূতন নূতন ভাবসম্পদে পরিপুষ্ট সঙ্গীত, অভিনয় পুস্তকাদি রচনার দ্বারা তিনি স্বকীয় মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তৎরচিত "দ্বারিকা মিলন" "আগমনী" "ব্রজবিহার" এবং "দক্ষযজ্ঞ" নাটকের বহুবিধ সঙ্গীত বিভিন্ন সংগ্রহকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া, নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবকবিতার মাধুরীমণ্ডিত এমন সুসংযত ভাবপুষ্ট কবিতা ও গান ইদানীং বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। লোকসাহিত্য সংঘটনে ইনিই এদেশের প্রথম পথ প্রদর্শক। বঙ্গবাসীর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক রাজকার্য্য জেলা জজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সাহিত্যসেবা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি সর্ব্ববিধ লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি স্বীয় কর্ম্মশক্তি ব্যয়িত করেন। দানে আত্মীয়, জ্ঞানে অজেয়, প্রতিভায় অমর, তেজস্বিতায় জ্যোতিষ্মান্ এই দেবপুত্র কক্ষভ্রষ্ট জ্যোতিষ্কের মত এই দেশে আবির্ভূত হইয়া মাত্র ৪১ বৎসর কাল স্বীয় তেজে আমাদের সমাজ, আমাদের সংসার আলোকিত করিয়া আবার স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন। চট্টগ্রামের গৌরব, কধুরখীলের তেজ, চৌধুরী পরিবারের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ করিয়া ১৮৭১ অব্দে তিনি মর্গ্য প্রস্থান করেন।

(১০) ৺ রাজচন্দ্র চৌধুরী :—এই বংশেরই অন্যতম শাখায় ৺তারিণীচরণ চৌধুরী এবং তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দের অভ্যুদয় কালে ৺ রাজচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশের সাহিত্যকে সমধিক পুষ্ট করেন। রাউজানে বহু বৎসর ধরিয়া ওকালতী ব্যবসায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াও তিনি সাহিত্য সেবা হইতে বিরত হন নাই। "মঙ্গল চণ্ডিকা"র গুণ কীর্ত্তন মানসে তিনি তদভিধের একটী উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ এবং সাময়িক সঙ্গীতাদি রচনা দ্বারা স্বকীয় রসভাবের পরিচয় প্রদান করেন। উক্ত পুস্তিকা এবং সঙ্গীতাদি এ যাবৎ প্রকাশিত না হইলেও চট্টগ্রামের বহুস্থানে হস্তলিখিত অবস্থায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে. এক্ষেত্রে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এই চৌধুরী বংশের অন্যান্য বহুবিধ বিশিষ্টতার ইহাও একতম নিদর্শন যে ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই নামের শেষে "দাস" শব্দের পরিবর্ত্তে দ্বিজ শব্দের ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের অনেকেরই ভনিতায় "দ্বিজ" শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

১১। ৺ নবীনচন্দ্র চৌধুরী :—পূর্ব্বোক্ত তারিণীচরণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র ৺ নবীনচন্দ্র চৌধুরী রাউজান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। সঙ্কীর্ত্তনে ইহার ভাবপ্রবণতা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ভাবের গভীরতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিভক্তি মূলক কতিপয় সঙ্গীত এবং চৌধুরী বংশের গৌরবাত্মক কতিপয় রচনা দ্বারা তিনি সমাজকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন।

কধুরখীলের পরলোকগত সাহিত্যসেবীদের কথা, তাঁহাদের সাহিত্য রচনার নমুনা ইত্যাদি নানাস্থানের নানা-পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও বারান্তরে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষেত্রে ইহাও প্রকাশ করা বিধেয় যে, আমার তালিকা হয়ত সম্পূর্ণ নহে। আমার অজ্ঞাত দুই চারিজন সাহিত্য সেবীর আলোচনা বাদ পড়িলেও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে আমার অজ্ঞতাই তজ্জন্য দায়ী। বর্ত্তমান প্রবন্ধকার সম্প্রতি কয়েকখানা হস্তলিখিত পুঁথি অত্রত্য "বরুজ পাড়া"র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথের নিকট হইতে খণ্ডিত অবস্থায় উদ্ধার করিয়া স্থানীয় সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে পরমশ্রদ্ধেয় মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহোদয়ের নিকট আলোচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। এখনো তাহার কোনও পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

সহৃদয় সাহিত্যিক সমাজ, পরলোকগত সাহিত্যিকদের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশের সাহিত্যের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে, এখন আমরা জীবিত সাহিত্যিকদের বিষয়ে আলোচনা করিয়া সাহিত্যের নূতন অধ্যায়ের পরিচয় প্রদান করিব।

১২। এই গ্রামের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবিওয়ালা নবীন ঠাকুরের নাম এতদ্দেশের ভদ্র ইতর কাহারও নিকট অপরিচিত নহে, সমগ্র চট্টল প্রদেশে কবিগণের তিনিই সর্ব্ববাদীসম্মত একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। সুদূর রেঙ্গুণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরা, নওয়াখালী পর্য্যন্ত তিনি বহুবার বিজয় যাত্রা করিয়াছেন। জীবনের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেও অদ্যাপি কবিগানের আসরে তাঁহার তরুণোচিত উৎসাহ, অপূর্ব্ব শব্দ চয়ন ক্ষমতা, ভাব এবং রচনার অবাধ প্রবাহ শ্রোতৃ মাত্রকেই মুগ্ধ করে। দুঃখের বিষয়, কয়েকটী গান ব্যতীত তাঁহার আর কোনও রচনা এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। স্থানীয় সাহিত্য পরিষদ হইতেও ইঁহাদের এই দান স্থায়ী করিবার কোন চেষ্টাও এ যাবৎ পরিলক্ষিত হইতেছে না, পশ্চিম বঙ্গের ভোলা ময়রা, নীলুপাটনী, ফিরিঙ্গী আন্টুনী ইত্যাদির নাম আজ বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতার অপরিচিত নহে; অথচ, একইবিধ প্রতিভার অধিকারী নবীন ঠাকুরের নাম চট্টগ্রামের বাহিরে স্বল্পসংখ্যক লোকেই অবগত আছেন। মূলতঃ কবিগানের প্রতি সভ্য সমাজের অনাদরই ইহার কারণ বলিয়া মনে করি।

(ক্রমশঃ)

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা

গৃহস্থ হিন্দুমহিলার শিক্ষার আবশ্যকতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপরি উদ্ধৃত মহাবাক্যটীর সরল বিবরণ করিলে স্থূলতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শরীরবল, জ্ঞানবল ও অর্থবল, এই ত্রিবিধ বলের সাহায্যে আমরা নিত্য সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। পুরুষ জ্ঞানসহ কৃত কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের মুখ্য সহায়। অর্থবলহীন নারীকুল পুরুষের কষ্টোপার্জ্জিত বিত্ত জ্ঞানসহকারে ব্যয় ও শারীর শ্রমের দ্বারা সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনে প্রধান অবলম্বন। পুরুষ উদয়াস্ত খাটিয়া মাথার ঘামে পাদযুগল আর্দ্র করিয়া অর্থ অর্জ্জন করেন। বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা নারীও তদ্রূপ সূর্য্যোদয়ে শয্যাত্যাগ করিয়া পুনরায় শয্যাগ্রহণকাল পর্য্যন্ত সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত গৃহস্থলীর যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। শ্রমক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণি-কুলের আরামদায়িনী রূপে যেমন কল্যাণী রজনীর সৃষ্টি; সংসারের কঠোর কর্ম্মযন্ত্রের গুরুভার যন্ত্রাপিষ্ট মানবের অশেষ শান্তিদায়িনীরূপে ঠিক তেমনি মূর্ত্তিমতী প্রীতি নারীজাতির মঙ্গলময়ী উৎপত্তি। বিধাতা রাত্রির পরিবর্ত্তে যদি কেবল দিনের বিধান করিতেন, তাহা হইলে এই সুখধাম সংসারের যেরূপ অকথ্য বিশৃঙ্খলা ঘটিত নারীহীন জগৎ তদপেক্ষা অনন্তগুণে শোচনীয়তার আকর হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ কি গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে, কি সন্তান সন্ততির লালন পালনে, কি আত্মীয় স্বজনের আদর আপ্যায়নে, কি সামাজিক রীতিনীতির অভিজ্ঞানে, কি আয় ব্যয়ের সাম্য রক্ষণে, কি গুরুজনবর্গের প্রতি সেবা সম্মান প্রদর্শনে ও আপনার সকল সুখ দুঃখের সমভাগী প্রিয়তমের মনোরঞ্জনে গৃহস্থ হিন্দুমহিলার জীবনের সকল অংশেই অল্লাধিক পরিমাণে শিক্ষার পূর্ণ আবশ্যকতা অনুভূত হয়। যথা রীতি শিক্ষিতা হিন্দুমহিলা আদর্শ গৃহিণী হইয়া থাকেন। হিন্দুর গৃহস্থলী সুদক্ষ গৃহিণীর হাতে পড়িলে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। সুশিক্ষিতা হিন্দুমহিলার পুত্রকন্যা ক্ষীরধারা মাতৃস্তন্য পানের সহিত জননীর নির্ম্মল স্বভাব ও জনকল্যাণবিধায় মধুময় চরিত্রের অধিকারী হয়। এইরূপে জননীর দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ পদ্ধতি মানচিত্রের মত শিশুর শৈশব জীবনের পরতে পরতে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়। মাতাই মানবের আদিম ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী। মাতার সুখ শীতল ক্রোড়রূপ পাঠশালায় বসিয়া তাঁহার সরল মুখের উন্মুক্ত প্রকৃতির বিচিত্র পুস্তক পাঠ করিয়া শিশু যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করে, উত্তর কালে মহামহাবিশ্ববিদ্যালয়ের দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া তাহার কণামাত্র লাভ হয় কিনা সন্দেহ। কারণ আদর্শ মানবই অশিক্ষিত মানবের যথার্থ শিক্ষক হইতে পারেন। জড়পুস্তক বা পুস্তকের প্রাণস্পন্দহীন বাক্যাবলী কখনও প্রকৃত শিক্ষকের আসন দাবী করিতে পারে না। সকল দেশেই মানবের উত্তর পুরুষগণ দেশের, দশের ও স্বপরিবারবর্গের উন্নতির বীজরূপে গৃহীত হইয়া থাকেন। আমরা যদি আমাদের কন্যা, ভগ্নী, পত্নী প্রভৃতিকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বীর ও ধার্ম্মিক পুত্রের জননীরূপে দেখিবার আশা করি, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে গৃহস্থ হিন্দুমহিলার গার্হস্থ্য জীবন গঠনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলঙ্ক-মলিন (Rusty) ও অতীক্ষ্ণ (Blunt) অস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সমাজের মহোপকারসাধিকা হিন্দুললনাগণকে কোণ ঠাসা করিয়া রাখিবার প্রয়াস সর্ব্বদা বিগর্হিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পারদর্শী ভারতের অন্যতম দেশীয় রাজ্যের সুদক্ষ কর্ণধার বরোদাধীশ্বরের অভিমত "Our only weapon is education, education of women because it is their part to influence the home life and to fashion future generations." অর্থাৎ, আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা। কারণ এই স্ত্রী শিক্ষাই গার্হস্থ্য জীবন ও উত্তরপুরুষগণের চরিত্র সংগঠনের প্রকৃষ্ট পন্থা। অশিক্ষিত মাতার সন্তান সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইবে, ইহা অসম্ভব। যে মাতার দৈনিক কার্য্যকলাপ যথেচ্ছাচার প্রসূত,

যে মাতা স্বাস্থ্যের নিয়ম বিধি পালনে অনভ্যস্ত, যে মাতার হৃদয়ে জ্ঞান, বিবেক, ধর্ম্ম বলিয়া কোন সদ্ভাবের বীজ উপ্ত হইবার সুযোগ বা অবসর লাভ করে নাই, তাঁহার গর্ভজাত সন্তান যে একজন "মহাজ্ঞানী মহাজন" রূপে গণ্যমান্য হইবেন, ইহা নিতান্ত দুরাশা। নিম্বের বীজে রসালের উৎপত্তি প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আমরা হরপার্ব্বতী সংবাদের ন্যায় বরোদাধিপতির সুশিক্ষিতা মহিষীর মহীয়সী উক্তিটীও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, "It is by the character of the women that the standard of a nation's civilization is judged." The position of women in India. অর্থাৎ, নারী জাতির চরিত্রের মানদণ্ডে সকল জাতির সভ্যতার পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আর একজন মনস্বী মার্কিন কবি (হুইটম্যান্) স্থানান্তরে বলিয়াছেন; "I say there is nothing greater than the mother of man." জগতে মা হওয়া অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই। এই সকল নবীন ভাষা যে আর্য্য ভাবার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায়, "মাতৃদেবো-ভব" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। "মাতরং পিতরশ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং। মত্বাগৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ। মহানির্ব্বাণতন্ত্র। সাধক নীলকণ্ঠ মাতৃভক্তি বিহ্বল চিত্তে গাহিয়াছেন,—

"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
সর্ব্বলীলা প্রকাশিলা প্রসবিলা ত্রিসংসার॥"

বস্তুতঃ যিনি পুত্র কন্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় হৃৎপিণ্ড মৃৎপিণ্ডের ন্যায় তুচ্ছবোধে প্রসন্নবদনে দেবদেবী পাদপদ্মে সর্ব্বদা উপহার দিতে বদ্ধ পরিকর, তিনি যদি প্রত্যক্ষ দেবতা না হন; তাহা হইলে নানা স্থলে তুল্য নাম মাত্র সার দেবতা থাকা না থাকা সমান। ফলতঃ মর্ত্ত্য ভূমিতে মাতাদি দেবত্বের চরম ও পরম অভিব্যক্তি। এজন্য মনু মহারাজ "মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিঃ" বলিয়া মাতাকে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর অবতার-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা প্রহ্লাদ মাতা কয়াধু, ধ্রুব মাতা সুনীতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা, সার্ গুরু দাসের জননী, প্রাতঃস্মরণীয়া ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, উইলিয়াম্ জোন্স্ জর্জ হার্ব্বার্ট, জন ওয়েলেস্লি প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রসবিত্রী প্রভৃতির শুভ আবির্ভাব বঙ্গের ঘরে ঘরে দেখিতে বাসনা করি। সেই শুভ দিনের সুপ্রভাতের জন্য বঙ্গমাতার প্রত্যেক সুসন্তানের বঙ্গীয় গৃহস্থ হিন্দু মহিলার মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থা করা একান্ত বিধেয়। গৃহস্থ হিন্দু মহিলার শিক্ষার আবশ্যকতা প্রথমে বর্ত্তমান কালে উহাদের শিক্ষার প্রকৃতি ও উপায় সম্পর্কেও যথাযথ আলোচনা করা উচিত। এজন্য তৎসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বিবরণ করা যাইতেছে। যাহার সাহায্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, মন সংযত ও উন্নত, চরিত্র সুগঠিত ও দৃঢ়, আত্মা বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বাধীন হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। জীব জগতে যাঁহাদের মনোবৃত্তি যত অনুশীলিত, উৎকর্ষ প্রাপ্ত ও সুবিকাশিত (Educed) হইয়াছে তাহারাই তত উচ্চে সম্মানের আসনে সমারূঢ় হইয়াছেন। অভিব্যক্তি বাদের নিয়মে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অথবা অচিন্ত্য-শক্তি ভগবানের কৃপায় মানব জাতি জীব জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের এই দুর্লভ অধিকার লাভের সনন্দ Magnacharta জন্ম পরম্পরাগত সংস্কার ও শিক্ষার ফল আমাদের অন্তঃস্থ মনোবৃত্তি গুলির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি ও স্ফুর্ত্তি। যাহার প্রভাবে আমরা এই সুফল লাভ করিতে পারি, তাহাই আমাদের একমাত্র শিক্ষনীয়। আবহমানকাল বিদ্যাই মানবের শিক্ষার প্রথম প্রধানতম বিষয়। অবশ্য দেশকাল পাত্রভেদে শিক্ষনীয় বিদ্যারও কিছু কিছু প্রকারভেদ হইয়া থাকে। জাতি ও সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, আদিম বৈদিকযুগে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ত্রিবর্গ সাধনী অপরা ও কৈবল্যদায়িনী পরা বা ব্রহ্মবিদ্যা নামে দ্বিবিধবিদ্যার পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। তৎপরবর্ত্তিকালে ঐগুলি কালসহকৃত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যাত্রয়ী বা যজ্ঞ-বিদ্যা, দণ্ডনীতি বা রাজনীতি, বার্ত্তা বা কৃষি বাণিজ্যাদি নামে

পরি চত ও প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমে মাত্র দুইটী, অপরা ও পরা। অনন্তর সমাজের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনানুরোধে ঐ দুইটী দ্বিগুণিত হইয়া তর্কবিপর্যাদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎপরে প্রজাবৃদ্ধির অপরিহার্য্যকালে ঐ চারিবিদ্যা একেবারে চারিবেদ, ছয় বেদান্ত, পূর্ব্ব ও উত্তর, কর্ম্ম ও ব্রহ্মভেদে দুই মীমাংসা, ন্যায়, আয়ুর্ব্বেদ (চিকিৎসাবিজ্ঞান) ধনুর্ব্বেদ (যুদ্ধবিজ্ঞান) গন্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীতবিজ্ঞান) অর্থশাস্ত্র (ধনবিজ্ঞান) এবং পুরাণ (ইতিবৃত্ত) এই অষ্টাদশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহু বিস্তৃত সমাজের শিক্ষার অঙ্গীভূত হইল। ক্রমে এই সকল পুঁথিগত বিদ্যায় বিশাল সমাজের অভাব মোচন ও উদরান্নের সংস্থান হয় না দেখিয়া বিরাট হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ হইতে একেবারে ৬৪ বিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ তালিকায় "ইস্তক চণ্ডীপাঠ লাগাত গরুচুরি" ভালমন্দ প্রায় কোন বিদ্যাই বাদ পড়ে নাই। আমরা পরে প্রয়োজন মত এই তালিকা হইতে কয়েকটী বিষয় গ্রহণ করিব। প্রয়োজন ও প্রজাবাহুল্যের গুরুতর চাপে শিক্ষনীয় বিষয়ের যে সাময়িক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন হয় তাহা আমরা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আদিম ও বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে বীজাকারে স্থাপিত হইয়া এখন কাণ্ড প্রকাণ্ড সমন্বিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। মহামান্য বঙ্গের লাটসাহেব ছাত্রদের উপাধি বিতরণের সভায় বলিয়াছিলেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বৃহৎ।" উচ্চতম রাজপ্রতিনিধির মূল্যবান বক্তব্য অবশ্যই শিরোধার্য্য। তবে এই অঙ্গস্ফীতি প্রকৃত স্বাস্থ্যের লক্ষণ কি আন্তর ব্যাধির বহিঃস্ফুরণ তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কারণ, ছাত্রবাহুল্য, কর্ম্মবাহুল্য ও অযথা ব্যয়বাহুল্যের ভারে ইহার ভাগ্যবিধাতৃগণ কিরূপ বিচলিত হইয়াছেন, ঘন ঘন কমিশন, ঘন ঘন আইনকানুনের নাগপাশবন্ধন, ঘন ঘন পাঠ্যতালিকা পরিবর্ত্তন ও সংযোজন প্রভৃতি বহুবিধ রহস্যপূর্ণ নিত্য নূতন ব্যাপারে সকলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। এখন আবার তোতাপাখীর কেতাবীবিদ্যার পঠন পাঠন কমাইয়া কারিগরী শিক্ষাদিবার বন্দোবস্ত হইবে শুনিতেছি। কবি যথার্থই বলিয়াছেন; "ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জনঃ।" আজকাল শিক্ষা বলিলে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ী বা স্কুল কলেজী বিষয়ের কথা সম্বন্ধে মনে হয় বলিয়া আমরা উহার তাত্ত্বিক মতে আলোচনা করিলাম। উদ্দেশ্য, আমরা এরূপ শিক্ষা গৃহস্থমহিলার উপযোগী বলিয়া মনে করি না। গৃহস্থ হিন্দুমহিলার শিক্ষার স্বরূপ বিচার করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের শিক্ষাকাল বা বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত। প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রকারদের মতে শিক্ষার কালাকাল নাই। তাঁহারা অজরামরণশূন্যের ন্যায় আমৃত্যু শিক্ষার অধীন থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামার্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" এই শ্লোকস্থ "প্রাজ্ঞ" শব্দে বুদ্ধিমতী মহিলাদেরও উপলক্ষণ Synecdoche। এই উপলক্ষণের উপদেষ্টা পূর্ব্বপাদ মহানির্ব্বাণতন্ত্রপ্রণেতা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন; "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।" "কন্যাকেও এইরূপে অর্থাৎ পুত্রের ন্যায় পালন করিবে ও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে।" তবে অর্থচিন্তার কথাটা পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি তুল্য প্রযোজ্য নহে। বালকের পঞ্চম বর্ষে বিদ্যা আরম্ভের ন্যায় সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বালিকার বিদ্যারম্ভের প্রশস্তকাল বলিয়া মনে হয়। অষ্টমবর্ষের পূর্ব্বে বালকদের ন্যায় বালিকারাও বাড়ীতে মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনীর নিকট বর্ণ পরিচয়, বর্ণ যোজনা প্রভৃতি কিছু২ শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টমবর্ষের পর তাহাদের শিক্ষা কতকটা বাধ্যতা মূলক হওয়া দরকার। অষ্টমবর্ষ হইতে অনধিক ত্রয়োদশবর্ষ পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। এই শিক্ষালয়ের স্থান প্রাচীন প্রথামত জনহিতৈষী ধর্ম্মভাবাপন্ন সদ্গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ কিংবা বৈঠকখানা হইবে। এইরূপ স্থানের নিতান্ত অভাব ঘটিলে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্যগোচর কোনও বারওয়ারি মণ্ডপ গৃহে এরূপ শিক্ষালয় স্থাপিত হইতে পারে। বয়স্থা প্রবীণা খ্যাতিমতী শিক্ষয়িত্রীর

স্বহস্তে এইরূপ শিক্ষালয়ের ভার ন্যস্ত থাকা বিধেয়। সর্ব্বত্র এইরূপ শিক্ষয়িত্রী দুর্লভ হইলে প্রাচীনকালের "গুরুমশায়" সদৃশ নিরীহ, সচ্চরিত্র, বয়স্থ শিক্ষক, কিংবা যিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগে সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবসর লইয়াছেন, এরূপ স্বগ্রাম বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী পরিচিত বিশ্বস্ত শিক্ষকের উপর ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করি। তৎপরে অর্থাৎ বিবাহিত গার্হস্থ জীবনে যেরূপ ব্যবস্থার আবশ্যক, মুখ্যরূপে সেইটীই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে বালিকা অবস্থায় শিক্ষার কিঞ্চিৎ "গোড়াপত্তন" না হইলে গৃহিণীর পক্ষে একেবারে "হাতে-খড়ি" হইতে আরম্ভ করা দুরূহ ব্যাপার। গৃহস্থ হিন্দু-মহিলার কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে বিবরণ দিতে হইলে প্রাচীন মহিলা সমাজের শিক্ষা প্রণালীর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তপস্বিনী, বল্কল পরিধারিণী, ফল মূলাশিনী ব্রহ্মবাদিনী কামিনীর দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে উপকথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া আদিম বৈদিক যুগের স্ত্রী শিক্ষার কথা বড় একটা তুলিব না। তবে যেটুকু এ কালের "ধাৎসই" হইবে ইহাতে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব। স্মৃতি, পুরাণ, সামাজিক শাস্ত্র ও সমাজের জীবন্তচিত্র কাব্যসাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিবরণটী পরিস্ফুট করিতে হইবে। স্বনামধন্য মহাভারত, মধুময় রামায়ণ, প্রবীন দণ্ডীকবির দশকুমার চরিত, কবিবর কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, কি মহাকাব্যগুলির পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাইবে, সেকালের স্ত্রীলোকেরা বিবিধভাষা, চিত্রবিদ্যা, নৃত্যকলা, গীতিবিদ্যা, নাট্যাভিনয়, গণিতবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, বিজ্ঞান, সমস্যা পূরণ, পুষ্পবিদ্যা, গন্ধদ্রব্য ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। এ সকল গ্রন্থে চিত্রশালা, নাট্যশালা, সঙ্গীতশালার, বিস্তারিত বিবরণও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুন প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট রাজের সঙ্গীতশালায় রাজকুমারীগণকে নৃত্য, গীত, বাদ্যশিক্ষা দিতেন এবং তদীয় সাধ্বী মহিষী দ্রুপদ রাজনন্দিনী বিরাট রাজের দৈনিক ব্যবহার্য্য গন্ধদ্রব্য (Essence) স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে সীতাহরণ কালে দুষ্ট রাক্ষস রাবণের অসৎ প্রস্তাবের উত্তরদান প্রসঙ্গে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মূর্ত্ত অবতার সীতা দেবীর মুখ হইতে যে সকল প্রাঞ্জল, তেজোগম্ভীর, সুযুক্তিপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, অঙ্গদেশের বহুকাব্যে উহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায় কিনা বিশেষ সন্দেহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

প্রেমের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ। (২)

(শ্রীগৌরাঙ্গের কাঙ্গাল বেশ।)

আমরা মনুষ্য; আমরাও ইতর জীবের ন্যায়ই জড় দেহ, জড় সুখ লইয়া বিব্রত। ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রাবল্যে ব্যাকুল বিভ্রান্ত, জড় সুখের সন্ধানে প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছি ফিরিতেছি, লালসায় লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এই বিষয়-সুখ-মগ্ন মানব-সমাজের কে দেশের কল্যাণের জন্য বিশ্বমানবের জন্য কাঙ্গাল সাজিতে চায়? চারিদিকে এত সুখের সামগ্রী থাকিতে কাহার ইচ্ছা হয় দুঃখের বেড়ী পায় পড়িয়া সংসারে বিচরণ করিতে? এত ভোগবিলাসের আয়োজন থাকিতে সন্ন্যাসীরূপ ধরিয়া ত্যাগব্রতের উদ্‌যাপন করিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মে? প্রেমেরগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ ছিল দেহের সুখও ছিল; কিন্তু সকলই তীব্র উপেক্ষায় উপেক্ষা করিয়া কাঙ্গাল বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া আকুল

প্রাণে গলদশ্রুলোচনে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন, সংসারী লোকে যে সুখকে সকল সুখের সার মনে করে জীবের জন্ম কাঙ্গাল শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সকল সুখে একেবারেই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। দেখ, গৌরসুন্দর কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া ঘরের বাহির হইলেন, তাঁহার কমনীয় দেহ চীর বসন দ্বারা আচ্ছাদিত হইল, সোনার অঙ্গে তিনি ছাই মাখিলেন, কমল নয়নে অবারিত জলধারা, সেই দীনমূর্ত্তি দেখিয়া সহস্র সহস্র চক্ষে জলধারা বহিল, সহস্র সহস্র প্রাণে বেদনার সৃষ্টি হইল; সহস্র সহস্র বদনে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। জীবের রোদন করা একটা স্বভাব, তাই জীব কাঁদিল, ব্যথিত হইল, উচ্চকণ্ঠে হাহাকার করিল। গৌর বিশ্বহিত সঙ্কল্পে দৃঢ় সঙ্কল্পিত প্রাণ কিন্তু কাঁদিলেন না, তারও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, হাহাকার করিলেন না। বলি তিনি প্রত নির্ম্মম হইয়াই আপনাকে কাঙ্গাল করিলেন কেন? আর কি নিমিত্তইবা তিনি এত দীন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন? আমরা জানি প্রেমের ঠাকুর অনন্ত কোটি জীবের নয়নে ত্রিতাপের অশ্রুপাত দেখিয়াছেন, অনন্ত কোটি জীবের প্রাণে ত্রিতাপের নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছেন, অনন্ত কোটি জীবের ত্রিতাপজনিত হাহাকার ধ্বনি তাঁহার কাছে পঁহুছিতেছিল। জীবের অসহনীয় দুঃখ দেখিয়া গৌরসুন্দরের প্রাণ কাঁদিতেছে। তিনি আর জীবের দুঃখ সহিতে পারেন না। তাই জীবের জন্য এমনই করিয়া কাঙ্গাল সাজিলেন, স্নেহময়ী করুণাময়ী জননী ও সহধর্ম্মিণীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ঘরের বাহির হইলেন। সংসার সুখমগ্ন জীব তাঁহাকে তাহাদের মত সংসার সুখে মগ্ন দেখিলে তাঁহার প্রেমধর্ম্ম লইবে কেন? তাঁহার প্রেমের আহ্বান জীবের ভাল লাগিবে কেন? তাই তিনি সকল সুখ অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিলেন; ক্ষণভঙ্গুর জড় সুখ ত্যাগ না করিলে দুঃখ দূর হয় না, জীব ইহা সহজে বুঝে না, তিনি সেই জড় সুখ ত্যাগ করিয়া তাহাও বুঝাইলেন। জড় সুখের লালসায় মত্ত হইয়াই জীব সংসারে যত দুঃখ ভোগ করিতেছে, যত তাপে তাপে দগ্ধ হইতেছে; গৌরচন্দ্র সকল সুখে সুখী হইয়াও সেই সমাগত সুখকে অতি অকিঞ্চিৎ বোধে বর্জ্জন করিলেন। জীবের জন্য তিনি সবই বর্জ্জন করিতে পারেন; তাই সকল সুখ সম্পদ্ ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিলেন; করিয়া জীবকে মহান ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু আবার সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বহিতব্রত গ্রহণ করিলেন। এইবার তিনি আপনি আচরণ করিয়া জীবকে প্রেম ধর্ম্ম ত্যাগ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। গৌরচন্দ্র বিশ্বহিতরূপ পরম প্রেমধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া তীরবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পরার্থে আত্মোৎসর্গ মানুষমাত্রেই পরম পবিত্র ব্রত। এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে সকল ভোগ প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া লইতে হয়; নহিলে পরার্থ ব্রতের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি হয় না। তাই মহাপ্রভু জীবশিক্ষার নিমিত্ত সকল ভোগপ্রবৃত্তিকে মহান্ ত্যাগধর্ম্মের মহিমা জগৎকে দেখাইবার জন্য সংযত করিয়া কাঙ্গাল বেশে সজ্জিত হইলেন। আমরা ভোগী আমরা কিন্তু কাঙ্গাল ভাল বাসি না; কাঙ্গাল বেশকেও প্রীতির চক্ষে দেখি না। ইহার কারণ এই, আমাদের অন্তরে অভ্যন্তরে অহঙ্কারের একটা মৃদুমন্দ তরঙ্গ সর্ব্বদাই বহিতেছে। আমাদের বিদ্যা আছে, বিদ্যার অহঙ্কারও আছে, কুল আছে, কুলের অহঙ্কারও আছে, ধন ও পদমর্য্যাদা আছে, তাহার গর্ব্বও আছে; তাই আমরা কাঙ্গালকে ভালবাসিতে পারি না, কাঙ্গাল বেশ প্রীতিকর বলিয়া বোধ করি না, তারপর কোন কালেও পরার্থে কাঙ্গাল সাজিতেও পারি না। কাঙ্গাল সাজিতে হইলে বিদ্যাকুলের দায় অতিক্রম করিতে হয়; কিন্তু বিদ্যাকুলের দায় অতিক্রম করা ত সহজ কথা নহে। মহাপ্রভু বিদ্যাকুলের নিরর্থকতা দেখাইলেন। বিদ্যকুলে তাঁহার মহান্ ব্রতের অন্তরায় হইল না; বিদ্যাকুলের অভিমান ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল সাজিলেন। যে কাঙ্গাল সাজে তার আবার অভিমান কি? মহাপ্রভু মহাযজ্ঞের সমাপন করিবার জন্য নিরভিমান হইল না। ফলতঃ যে কাঙ্গাল সাজে তাহার তিলমাত্রও অভিমান থাকেনা; আর অভিমান রাহলে, যার বিদ্যার অভিমান, কুলের অভিমান, ধন মানের অভিমান রহিলে তাহার কাঙ্গালে বেশ বিড়ম্বনা মাত্র; সে যথার্থ কাঙ্গাল হইতে

পারিল মহাপ্রভু এমনই কাঙ্গাল সাজিলেন, এমনই দীন হইলেন যে তাহার সকল অভিমান চলিয়া গেল। তিনি বিনয়ের অবতার হইলেন; কেবল কোমল ভব কার্য্যে বিন্দু বিসর্গও রহিল না। কথাটী বলেন অতি মধুমাখা কণ্ঠ; হৃদয় কোমল ভব না আসিলে কণ্ঠ কাহারও মধুর হয় না, বাক্য সরল হয় না; মানের রুক্ষতা দূর হয় না, আর ইহারই নাম কাঙ্গাল হওয়া। এমনি কাঙ্গাল যিনি হইতে পারেন, তিনি সে কাঙ্গাল? যিনি সকলের হৃদয়ের রাজা।

প্রভু এমনই কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাঙ্গাল বেশ দেখিয়া বনের পশুপক্ষীও কান্দিয়াছিল। কোলের ছেলে ঘরের কুলবধূও অশ্রুপাত করিয়াছিল। এমন প্রেমের কাঙ্গাল দেখিলে কে না কান্দে? কে না পাগল হয়?

ভোগ আর ত্যাগ দুইটা কথা আছে। ভোগী ভোগীর কথা শুনিতে পাইলে তুষ্টি হয়; কিন্তু ত্যাগের দৃশ্য দেখিয়া সেই ভোগাতুরের নয়নেও জল আইসে। দেশশুদ্ধ লোক ভোগ লইয়া ব্যস্ত ছিল, ভোগের আহ্লাদে পরিতৃপ্ত ছিল, কিন্তু যেই দেখিল, প্রভু ভোগ ছাড়িয়া ত্যাগী হইলেন, তখন তাহাদের মনে প্রভুর মহিমা উপলব্ধি হইল; তাই লোকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। দেশে প্রেম আসিয়াছে, দেখিয়া সকলের হৃদয় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দলে দলে লোক আসিয়া প্রভুর চরণ তলে পতিত হইতে লাগিল। পরার্থে যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য যিনি কাঙ্গালের কাঙ্গাল সাজিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র পদধূলি মস্তকে না লইলে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা না করিলে তাঁহাকে জীবনের ইষ্টদেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইতে না পারিলে সে জীবন যে একেবারেই নিরর্থক; তাই দয়াল প্রভুকে দেশশুদ্ধ লোকে প্রাণের বান্ধব জানিয়া বরণ করিয়া লইল, তাঁহার পদারবিন্দে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ করিল; তাঁহার নামে সর্ব্বত্র প্রেমের সহিত জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। হাজার হাজার লোক,—কত মহামহা সার্ব্বভৌম, মহা মহা সরস্বতী বিদ্যানিধি, রাজা মহারাজা তাঁহার কৃপাকটাক্ষে প্রেমধনে ধনী হইল, জন্ম জন্মের আত্মার মলিনতা, মানবতার ভিতরের পাশবতা দূর করিয়া চিত্ত চরিতার্থ হইল। প্রভু যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থানই লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। দুঃস্থ দুর্ভাগ্য জীবের জন্য যিনি আকুল হইয়া কান্দিয়া বেড়ান তাঁহার শ্রীমুখ দেখিতে, দেখিয়া বুক জুড়াইতে চক্ষু জুড়াইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? জগতের সকলেই আপনারে লইয়া বিব্রত, সকলে আপনার কান্নাই কান্দিতেছে; আপনার ভাবনাই ভাবিতেছে; যদি পরের জন্য দেশের জন্য রোদন-কারী দেবতা দেখিতে পায়, তাহা হইলে লোক যত কেন মন্দ না হউক, তাঁহার পদে বিকাইয়া যান। এখনও এ দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া না যায় এমন নহে।

প্রভুর এই কাঙ্গাল বেশের কি সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছিল, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বুঝিয়াছেন। সেই সৌন্দর্য্য বুঝাইবার বা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।

প্রভু তাঁহার চিরপ্রেমাধীন জীবকে দেখাইলেন যে, জীবের সকলকেই বিশ্বের জন্য ত্যাগী হইতে হইবে। শুদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। দেশের জন্য, বিশ্বমঙ্গলের জন্য, আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখকে সংযত করিতে হইবে। ভোগবিলাস ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে। তাহা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনরূপ যে জীবের পরমধর্ম্ম তাহা করিতে হইবে। যদি না জীবনে কখনও একটুকুও বিশ্বহিত সাধন করিতে পারিলাম, তবে এ মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া, কেবল খাইয়া পড়িয়া কি ফল হইল? কেবল মর্ত্ত্যে আসিলাম, আর আসিয়া কাকের ন্যায় কেবল কোলাহল করিয়া, কেবল মার মার কাট কাট রব করিয়া ধরা হইতে সরিয়া পড়িলাম। এই কি মানবজন্মের উদ্দেশ্য! মানুষ কি জগতে কেবল নিজের উদরটী লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে আসে?

চাই—ত্যাগ চাই। যার প্রাণ আছে সেই ত্যাগী। মৃতের আবার ত্যাগ কি? প্রাণশূন্য জীবের ত্যাগ সম্ভবে কি? সে যে ত্যাগের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবে, তাহার যে হৃদয়শূল উপস্থিত হইবে। ত্যাগ চাই। ত্যাগ করিতে শিখ; পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হও। ত্যাগী না

হইলে যে জীব ভোগীই হইতে পারিবে না। ত্যাগী না হইলে জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে কেন? বিশ্বেশ্বরের বিশ্বের জন্য যদি একটুকুও স্বার্থ সুখ ত্যাগ করিতে না পারিলাম তবে তাঁহাকে কি মুখে মুখেই ভালবাসা দেখাইব? মহাপ্রভু সন্ন্যাস ব্রতের ইহাই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা যে জীবমাত্র ত্যাগী হও। স্ত্রী পুত্রের জন্যই শুদ্ধ ত্যাগী হইবে তা নয়। তোমার স্ত্রী পুত্র পরিজনের পর আরও তোমার নিজ জন আছে। অন্ধ আতুর কানা খোঁড়া তোমার নিজ জন; স্বজাতি স্বদেশবাসী বিদেশবাসী তোমার নিজ জন। স্বদেশ বিদেশ সকলই তোমার মাতৃভূমি; সকলেই তোমার নির্ম্মল অনুরাগের ভাগী। তুমি যদি স্বদেশের জন্য বিদেশের জন্য স্বজাতি পর জাতির জন্য ত্যাগী হইতে না পারিলে তাহা হইলে তোমার মুখের বড় গ্রাসটা দেখিয়া কি তোমাকে রাক্ষসাবতার বলিয়া আমার বোধ হইবে না? তুমি কি মনেকর, তুমি শুধুই তোমার? তুমি ঈশ্বরের জীব, সুতরাং ঈশ্বরের সকল জীবের তুমি। তুমি সকলের সকল তোমার। হে বিশ্বমানব, এবার প্রস্তুত হও। এইবার মহান্ প্রেমের ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে; প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য তোমাদের জন্য সুরসাল প্রেমের ধর্ম্ম যাহা মিলিতে ছিল না তাহা আনিয়াছেন; গ্রহণ কর, পরিতৃপ্ত হইবে। সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিবে। যিনি মাত্র প্রেমধর্ম্ম লইবেন, তিনিই বিশ্বের হইয়া যাইবেন। বিশ্ব তাহার নিজগৃহ হইবে, বিশ্বমানব তাঁহার প্রেমেরপত্র প্রিয় পরিজন হইবে। বিশ্বের হিত তাহার স্বধর্ম্ম হইবে। আর প্রেম যে তাহার স্বধর্ম্ম তাহা সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। প্রেম ব্যতীত আর সকল ধর্ম্ম তাহার পরধর্ম্ম ভয়াবহ হইবে।

তখন তিনি

"সর্ব্বজীবে দিবে মান, নাহি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান
তরুসম সহিষ্ণু হইবে।"

এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিবেন।

যিনি সর্ব্বজীবে মান দিবেন, সর্ব্বভূতময় হরি দর্শন করিবেন; তাহার কোথায় থাকিবে অহঙ্কার কোথায় থাকিবে দ্বেষ হিংসা, আর কোথায় থাকিবে দাম্ভিকতা নিষ্ঠুরতা কপটতা; তখন সে সকলের সুহৃৎ, শত্রুরও হিতার্থে তৎপর।

শ্রীশরৎচন্দ্র ধর।

জীবন।

(১)

একটা সময় ছিল যখন ভাব্‌তাম আমার জীবনখানি,
সারা জীবন হাস্‌বে চাঁদের মত;
নয় তো স্রোতস্বিনীর মত আকুল-করা মনের সুখে,
কুলু কুলু গাইবে অবিরত!
এখন বাপু দেখে শুনে ভেবে চিন্তে ঠেকে ঠুকে,
চোখের জলে শিখ্‌তে হোলো এই—
সংসার একটা বিভীষিকা, জীবন একটা কাড়াকাড়ি,
একটানা সুখ এই জগতে নেই!

(২)

ছিলাম যখন কুঁড়ির মত ভাব্‌তাম তখন ফুট্‌তে পেলে,
না জানি রে কত মজাই হবে!
ভোম্‌রাগুলো আস্‌বে ছুটে টাট্‌কা ফুলের মধুর লোভে,
গাইবে গীতি প্রাণ-মাতানো রবে।
এখন ভাবি—তাই তো, একি, নিঠুর সত্য বাস্তবতা!
কল্পনাটি খাঁটি সত্য নয়!
কাজেই দুঃখে বল্‌তে হোলো, সংসার তুমি দোষ ধোরো না,
নাইকো আমার চক্ষুলজ্জা ভয়!

(৩)

তুমি যেমন শিক্ষা দিলে ফলটি তাহার পেতেই হবে,
বুড়ো আঙুল দেখাই তবে আগে;
ভাব্‌ছো বুঝি ফেল্‌বে পিষে, সেটি বাপু হচ্ছে নাকো,
প্রাণ মেতেছে অসীম অনুরাগে!
তোমার কৃপায় এই জেনেছি, বিবাহটাই বিলাসিতা,
বল্‌বো কি আর, থাচ্ছি থতমত!
আথর মাত্র-পরিচিতা নোলক-পরা বৌ-গুলো সব,
সোনার রঙীন্ চশমাখানির মত।

(৪)

সৃষ্টি-স্রোতে পুরুষ নারী ঠিক যেন রে স্রোতের কুসুম,
নিমেষ লাগি মিলন পরস্পরে;

জীবন-ভরা মিলন ভালো বোলে যারা ডঙ্কা মারে,
জান্‌ছি তারাই মরছে ঘরে ঘরে।
নিজের দুঃখ না জানিয়ে আর সবারে ফেল্‌তে ফাঁদে,
তারাই বেশী চেষ্টা কোরে থাকে!
কেমন, কিনা, তুমিই বলো—ভণ্ড তাপস হে সংসার,
দিনে তারা ক'বার 'বাবা' ডাকে?

(৫)

যেমন ছিলাম বেশ তো ছিলাম, দুঃখে তখন বিষাদ কোথায়?
সবকে তখন যেতাম আপন মেনে;
আজও হৃদয় ছড়িয়ে আছে কত পুণ্য হৃদয় মাঝে,
কাজ কি সে সব পুরোনো জের্ টেনে!
যাক্ না সমাজ ধ্বংস হোয়ে, আমার ভারী গেল বোয়ে,
যা হবার তা হবেই হবে জানি!
কাঙালগুলার পুত্রকন্যা ঠিক কচুরি পানার মত,
ছেয়ে ফেল্‌ছে স্বচ্ছ জীবনখানি।

(৬)

হায় রে লোকের কাণ্ড দেখে ইচ্ছা করে 'সুসঙ্গ' পালাই,
কাজ নাই এমন ভুয়ো ভবাতায়!
এদের চাইতে হাজং গারো হাজার গুণে দেখ্‌ছি ভালো,
নয়কো হৃদয় ভরা বঞ্চনায়।
পরের স্ত্রীতে জ্বোলে পুড়ে এমন কোরে হাত পা ছুঁড়ে,
মিছামিছি দাফায় নাকো তারা;
জামা কাপড় মোজা জুতায় সেজেগুজে সভ্য মানুষ,
হাটের মাঝে হয় না মামা-হারা।

(৭)

চোর মিথ্যুক লম্পটে আজ সংসারটাকে ফেললো ছেয়ে,
'জো-হুজুরে' কর্‌ছে সর্ব্বনাশ;
বক-ধার্ম্মিক পা-চাটারা গণ্য মান্য মানুষগুলোর,
ক্রমে ক্রমে গলায় দিচ্ছে ফাঁস।
এক এক জনের আশে পাশে হাজার হাজার ধাপ্পাবাজ,
দল পাকিয়ে হচ্ছে এসে জড়ো;
নানান্ ফিকির ফন্দি এঁটে উস্কে দিয়ে রাগ হিংসা,
বাহার কোরে মার্‌ছে মজা বড়।

(৮)

হস্তী যদি ঘাড় বাঁকিয়ে দেখ্‌তে পেতো নিজের শরীর,
মাহুতটাকে সত্যি মার্‌তো চেপে;
শেষে লোষ্ট্রখণ্ড সম লাস্‌টাকে ফের্ মার্‌তো ছুঁড়ে,
গর্জ্জনে তার উঠ্‌তো ধরা কেঁপে।
হায় কি লজ্জা, হায় কি ঘৃণা, হস্তী নিজেই সেরা মূর্খ!
দেখ্‌তে, নচেৎ কেমন জানোয়ার!
আর কি তবে, ভাব্‌না কিসের! দিন পেয়েছো, মজা মারো!
মালিক কিন্তু দেখ্‌ছে দুনিয়ার।

(৯)

দুখের কথা বোল্‌বো কাকে! দুখ কি কেবল একটা দিকেই?
সংসারে আর সুখ কি খুঁজে পাবো!
মাঝ্-দরিয়ায় হয় বা বুঝি জীবন-তরীর ভরাডুবি!
ভয় করি না, খুব চুবানিই খাবো।
বড্ড ভালোবাসি মানুষ, তাইতো তাদের বিকৃতিতে,
অহর্নিশি দুঃখে নয়ন ঝরে!
উর্দ্ধে ছুঁড়ে মার্‌লে থুতু এক পলকের মধ্যে আবার,
সেই যে থুতু নিজের মুখেই পড়ে!

(১০)

খুব নিশুতি জ্যোস্না রাতি, ঘড়ির ঘণ্টাগুলি ক্রমে
বেজে বেজে এই তো হোলো শেষ;
শঙ্খ-ধবল শয্যাতে বেশ গিন্নী তাহার পুত্র নিয়ে,
ঘুমিয়ে আছে এলিয়ে দিয়ে কেশ।
জান্‌লা দিয়ে চাঁদের কিরণ পড়্‌ছে এসে তাদের মুখে;
দুখের মাঝে দৃশ্য মনোরম!
মুসড়ে-পড়া হৃদয় আমার আজ্‌কে আবার জান্‌তে চাহে—
দুঃখটা কি সত্যি মনের ভ্রম?

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন ভারতের মনুষ্যজীবন।

বিহঙ্গের কলকুজন, পুষ্পের মধুর হাস্য, মৃদুপবনোন্দোলিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে অভিনন্দিত হইয়া প্রভাত যখন আসে, তখন তাহা কি সুন্দর! কি স্নিগ্ধ! কি আনন্দপ্রদ! তারপর মধ্যাহ্নে তীব্র আলোক, প্রচণ্ড উত্তাপ ও জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া কি নির্ম্মল গম্ভীর হইয়া উঠে। স্নিগ্ধ রৌদ্রে, শ্রান্ত বাতাসে ক্লান্ত অপরাহ্ন কি শান্তভাব ধারণ করে! সর্ব্বশেষে শিথিল সন্ধ্যায়, নির্ব্বাপিত আলোকে, পাখীর কলগীতি শুনিতে শুনিতে যখন অবসানের মধ্যে মিশিয়া যায় তখনও তাহা কি শান্তিপ্রদ! কি মহান্!

দিন যেমন প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা এই চারি অংশে বিভক্ত; প্রাচীন ভারতে মনুষ্যজীবন ছিল সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে বিভক্ত।

প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সংযম ও জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষা, দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রমে কর্ম্মদ্বারা ভোগ, তৃতীয় বাণপ্রস্থাশ্রমে অভ্যাসদ্বারা সংসারের বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, চতুর্থ সন্ন্যাস আশ্রমে সংসারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মুক্তির মধ্যে প্রবেশ করা।

এই চারি আশ্রম আপাতত পৃথক প্রতীয়মান হইলেও বস্তুত ইহা স্বতন্ত্র ছিল না। সঙ্গীতে নানা বিভিন্ন তানের বিচিত্রতা থাকিলেও তাহার আগাগোড়া যেমন একই রাগিনী ধ্বনিত হইতে থাকে, প্রাচীন ভারতের মনুষ্যজীবনে সকল আশ্রমের মধ্যদিয়া সেইরূপ একই লক্ষ্য ছিল। সমস্ত জীবন এক সুরেই বাঁধা ছিল। বাল্যে সংযমের দ্বারা চিত্তকে বাঁধিতেন বলিয়াই গার্হস্থ্যাশ্রমে ভোগ ও কর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল হইত না। যৌবনে সংযত ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেন বলিয়াই প্রৌঢ়ে ভোগেচ্ছা তাঁহাদের বৈরাগ্য বাধা দিত না। প্রৌঢ়ে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন বলিয়াই বার্দ্ধক্যে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইতে কোন ক্লেশ হইত না। তখন মৃত্যু তাঁহাদের বিভীষিকা না হইয়া মুক্তি হইত।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পর্য্যায়ক্রমে অভ্যাস না করিলে মৃত্যুর সার্থকতা মুক্তি হইবে না। বীণার সমস্ত সুর যথা নিয়মে বাঁধিয়া না লইলে তাহা বেসুরা বাজিবেই।

সেই জন্য ভারতের নীতি বলে—

"প্রথমে পার্জ্জিতং বিদ্যা দ্বিতীয়ে পার্জ্জিতং ধনম্।
তৃতীয়ে পার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥"

ভারতের কর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্যই ছিল। লক্ষ্যহীন অবিশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাহার তান ভঙ্গ করিয়া দিত না।

আমরা যদি চিরকালই সংসারকে ধরিয়া বসিতে চাই তবে তাহা কখনই পারিব না।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তং বিহীনং জাতং তুণ্ডং, করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং—

হইলেও আশাভাণ্ড ত্যাগ করিতে চাই না। কিন্তু আমরা রঞ্জিত কেশে, কৃত্রিম দন্তে মৃত্যুকে যতই কেন ভ্রুকুটী করি না সে কিছুতেই ছাড়িবে না। মধ্যাহ্নকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিব না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সন্ধ্যা আসিবেই আসিবে। পাশ্চাত্য মদিরায় মত্ত হইয়া এখন আমরা যতই কেন অস্বীকার করি না, শেষে একদিন যযাতির মত বলিতে হইবে,—

"ন যাতু কাম কামানা; উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভি বর্দ্ধতে॥"

ভোগের ইন্ধন যতই কেন জোগাই না। সে অগ্নি কিছুতেই শমিত হইবে না। ঘৃত নিষেকে অগ্নি নির্ব্বাপনের চেষ্টার ন্যায় তাহা বাড়িয়াই চলিবে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ছিল,—

"শৈশবেইভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিনাম্।
বার্দ্ধক্যে মুণিবৃত্তিনাং যোগেনান্তেতনুত্যজাম্॥"

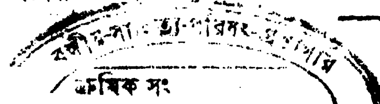
সমুদ্র হইতে মেঘ উত্থিত হইয়া পর্ব্বতের গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হয়, নানাবাধা অতিক্রম করিয়া আবার সমুদ্রেই মিশে। সেইরূপ আমরা যাঁহা হইতে চ্যুত হইয়াছি সমস্ত জীবনের নানা কর্ম্মের মধ্যদিয়া সেই অনন্তের সহিত মিলনই আমাদের চরম চরিতার্থতা। বিলাতি বাদ্যের আড়ম্বরে ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইলেও যখন তাহা থামিয়া যাইবে, তখন আমাদের হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে সেই চিরন্তন মৃদঙ্গের বৈরাগ্য তানই বাজিতে থাকিবে।

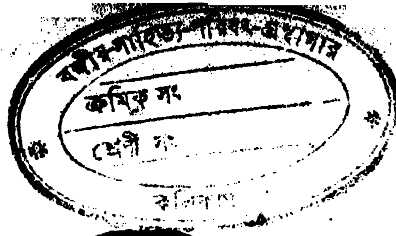
আমরা যদি পাশ্চাত্য ইন্দ্রজালের কুহকে ভ্রান্ত হইয়া সেই চিরন্তনকে বিস্মৃত হই তবে সংসারের তীরে দাঁড়াইয়া, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে একদিন চিৎকার করিয়া বলিতে হইবে,—

"শিশোনাসিং বাক্যং জননী তব মন্ত্রংপ্রজ্ঞাপিতুং।
কিশোরে বিদ্যায়াং তদনু বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ॥
ইদানিং ভীতোইহং মহিষগলঘণ্টা ঘনরবাৎ
নিরালম্ব্য লম্বোদর জননি কং যাম শরণম্॥"

মাগো শৈশবে বাক্য ছিল না, সেইজন্য তোমার নাম উচ্চারণ করিতে পারি নাই। কিশোর বয়সে বিদ্যা উপার্জ্জনে এবং যৌবনে তোমাকে ভুলিয়া বিষয়সুখে মত্ত ছিলাম। এখন বার্দ্ধক্যে যমের বাহন মহিষের ঘণ্টার শব্দ শুনিতে যাইতেছি, কার স্মরন লইব।

শ্রীসুরজিত কবিরাজ।





প্রতিভা

১১শ বর্ষ শ্রাবণ ১৩২৮ ৪র্থ সংখ্যা

শব্দ শক্তি বিকাশ।

ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে মদ্যপান অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া কোনও ব্যক্তি মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বলিলেন—

দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন ?

শ্রোতা দ্বিজরাজ শব্দের 'চন্দ্র' ও বারুণী শব্দের 'পশ্চিম দিক' অর্থ করিয়া উত্তর দিলেন—

রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

ফাঁপরে পড়িয়া বক্তা স্পষ্টতর ভাষায় মদ্যপায়ীকে তিরস্কার করিবার নিমিত্ত বলিলেন :—

বলি, এত সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

শ্রোতা সুরাসক্ত শব্দের 'দেবভক্ত' অর্থ করিয়া বলিলেন :—

সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয় ?

বক্তা পুনরায় ভাষান্তর অবলম্বন করিয়া বলিলেন :—

মধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর ?

শ্রোতা এবারেও মধু শব্দের 'বসন্ত ঋতু' অর্থ করিয়া বলিলেন :—

বসন্তকে হেয় করে সে কোন্ পামর ?

অতঃপর বক্তা অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে মৌন অবলম্বন করিলেন।

কবির ভাষায় এপ্রকার উক্তি প্রত্যুক্তির যথেষ্ট চমৎকারিত্ব আছে সন্দেহ নাই। এজন্য এপ্রকার কাব্য উত্তম কাব্যনামে অভিহিত হয়। কিন্তু সাধারণ কথোপকথনে যদি ভাষায় এই প্রকারে অবিরত দ্ব্যর্থ প্রকাশ করিয়াই চলে তাহা হইলে সে ভাষা দ্বারা সংসার চলে না। বক্তার অভিপ্রায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ করাই যদি ভাষার কার্য্য হয়, তাহা হইলে এপ্রকার নানার্থ প্রকাশক শব্দের পরিবর্জ্জন আবশ্যক। নতুবা ব্যাবিলনবাসিগণের পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্বর্গ-বিজয় প্রয়াসের ব্যর্থতা আমাদিগকে পদে পদে অনুভব করিতে হইবে। অবশ্য যেখানে ভাষার দ্ব্যর্থরক্ষা বক্তার অভিপ্রেত সেস্থানে দ্ব্যর্থযুক্ত বাক্য বা পদের চমৎকারিতা লোভনীয় এবং সেপ্রকার ভাষায় প্রকৃতই উত্তমকাব্যের সৃষ্টি হয়। যেমন অন্নদা মঙ্গলে অন্নদার আত্মপরিচয়।

* গোত্রের (১) প্রধান পিতা মুখবংশজাত (২)।
পরম কুলীন (৩) স্বামী বন্দ্য (৪) বংশখ্যাত ॥
পিতামহ (৫) দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি (৬) তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ (৭) পতি সিদ্ধিতে নিপুণ (৮)।
কোন গুণ নাই (৯) তার কপালে আগুন ॥
কু-কথায় (১০) পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ (১১)।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব (১২) অহর্নিশ ॥
গঙ্গানামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা (১৩) সে স্বামীর শিরোমণি (১৪) ॥

ভাষার ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ভাষাতেই ভাষার আদিকাল হইতে যেমন শব্দসমূহের ধ্বনিগত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ ভাষার শব্দ সম্পদেরও অবিরত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য সমাজে যেমন মনুষ্যগণের মধ্যে শরীর ও মনের পরিবর্ত্তন আবহমান কাল হইতে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, ভাষার মধ্যেও সেইরূপ শব্দ সমূহের ধ্বনি ও অর্থগত পরিবর্ত্তন। প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্যঋষিগণ অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শরীরের দিক দিয়া যেমন দীর্ঘকায় ও সৌম্যদর্শন ছিলেন, মনের দিক দিয়াও তেমনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ও অকুতোভয় উদার প্রকৃতির প্রভাবে দীর্ঘজীবী ছিলেন। কিন্তু একালে উভয় বিষয়েই আমাদের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে আমরা তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারি না। কেবল তাহাই নহে। আমরা কে কাহার বংশধর তাহাও জানি না এবং সেই প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের মধ্যে কে কে নির্ব্বংশ হইয়াছে ও কাহার কাহার বংশ এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। ভাষার রাজ্যেও ঠিক একই কথা। আমাদের দেশের প্রাচীনভাষা ঋগ্বেদের ভাষা; এ যুগের শিক্ষিত সমাজেও এ ভাষা বুঝেন না। আর ইহা যদি সত্য হয় যে ইউরোপীয়গণ ও আমরা এককালে এক-ভাষা-ভাষী জাতি ছিলাম, তাহা হইলে আমাদের যে-সকল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহার ফলে সবিশেষ বিবেচনা ব্যতীত আমরা পরস্পরের ভাষার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি না। আজ দুই শতাব্দী ধরিয়া চেষ্টার ফলে ইউরোপে যে ভাষা-বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছে সেই বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সংস্কৃত '**গর্ভ**' ও ইংরাজী '**Calf**' মূলতঃ এক শব্দ। কিন্তু আধুনিক যুগে না আকৃতি না প্রকৃতি কোনও বিষয়েই ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না! এক উচ্চারণের দিকেই আমরা যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি তাহাতেই আমাদের চক্ষু স্থির হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষার পদাদি '**গ**' ইংরাজীতে '**c**' হইয়াছে, পদমধ্যস্থ '**র**' ইংরাজীতে '**l**', এবং '**ভ**' স্থানে '**f**' হইয়াছে। স্বরদ্বয়ের অন্ত্যটীর লোপ হইয়াছে এবং প্রথমটীর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে এ পরিবর্ত্তন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন বটে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনকে একটী মাত্র সূত্রে ব্যক্ত করা যায়। সংস্কৃতে যে স্থলে ঘোষ বর্ণের উচ্চারণ হইত ঠিক সেই স্থলে অঘোষ বর্ণের উচ্চারণ হইয়াছে, এবং পদান্ত স্বরের লোপ হইয়াছে। অন্য উদাহরণেও ইহা পরিস্ফুট। যেমন সংস্কৃত গম্ ধাতু স্থানে ইংরাজী come, সংস্কৃত দৎ (দন্ত) স্থানে

* (১) গোত্র = পর্ব্বত, বংশ। (২) মুখ = শ্রেষ্ঠ, মুখোপাধ্যায়। (৩) কুলীন = সদ্বংশজাত, পৃথিবীময়। (৪) বন্দ্য = পূজ্য, বন্দ্যোপাধ্যায়। (৫) পিতামহ = ব্রহ্মা, পিতার পিতা। (৬) কুলীন ব্রাহ্মণের অনুরূপ বহু বিবাহ যাঁহার, বহুলোকে পতি অর্থাৎ প্রভু। (৭) অতি-বড়-বৃদ্ধ = সকলের অপেক্ষা অধিক বয়স্ক, অনাদিত্ব হেতু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। (৮) সিদ্ধি = কার্য্যসিদ্ধি প্রদানে দক্ষ, নেশাখোর। (৯) সর্ব্বগুণাতীত, গুণহীন। (১০) কু = পৃথিবী, কদর্য্য; পৃথিবীর আদিকাল হইতে সকল ইতিহাস তিনি পঞ্চমুখে বলেন; খারাপ কথা বলিবার সময় যেন তাঁহার পাঁচটা মুখ হয়। (১১) মুখে মিষ্ট কথা নাই, সমুদ্রমন্থন লব্ধ বিষ তাঁহার কণ্ঠে স্থান পাইয়াছে। (১২) দ্বন্দ্ব = কলহ, মিলন। (১৩) সলিলস্বরূপা, প্রাণতুল্যা প্রিয়া। (১৪) অতি প্রিয়া, শিরঃস্থিতা।

ইংরাজী tooth; দ্বি বা দ্বা স্থানে two, ইত্যাদি। ভাষা বিজ্ঞানে উচ্চারণের পরিবর্ত্তনের জন্য বাঁধা-ধরা নিয়ম হইয়াছে বলিয়া অতি বিচিত্র হইলেও আমরা এই পরিবর্ত্তনের ক্রম বুঝিতে পারি। কিন্তু অর্থ পরিবর্ত্তনের সেরূপ কোনও নিয়ম গড়িয়া উঠে নাই, কোনও কালে তাহা সম্ভবপর হইবে কি না তাহা কে জানে? এইজন্য গর্ভ শব্দের কিপ্রকারে calf শব্দের অর্থ পরিণত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষাকৃত আয়াস-সাধ্য।

শব্দশক্তি বিকাশের ক্রম অতি জটিল। মানবজাতির মনোবিজ্ঞানের নিয়ম সমূহ এত বিচিত্র যে আমারা কখন্ কি ভাবে চিন্তা করি তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার। আবার মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত; সমষ্টিগত ভাবে মানবের মন কিরূপে প্রভাবান্বিত হয়, তাহার কোনও আইন-কানুন নাই। সমষ্টিগত মানবের মনের প্রকৃতির সহিত ভাষার প্রকৃতির সবিশেষ সম্পর্ক দেখিয়া এককালে ভাষাতত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতগণ লৌকিক মনোবিজ্ঞান, Voker psychologie, বা popular psychology নামক এক বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। লজরস (Lazarus) ও ষ্টেইন্থলের (Steinthal) নাম এ বিষয়ে উদ্যোগী পণ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বলেন "লৌকিক মনোবিজ্ঞান সমগ্র মানব সমাজের মনের আলোচনামূলক বিজ্ঞান; এই সমষ্টিগত মন ব্যষ্টিগত যাবতীয় মন হইতে স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য তাহাদের উপর ইহার অপরিহার্য্য প্রভাব।" হরমন পল (Hermann paul) বলেন, তাহা হইতে পারে না। মন যদি কোথাও থাকে তবে সে ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে নহে। অবশ্য সমষ্টির প্রভাব-বিহীন ব্যষ্টির সত্ত্বা স্বীকার করা সম্ভবপর হইলেও সমষ্টি-নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা কোনওরূপ সভ্যতা বা কোনও বিজ্ঞানের সৃষ্টি বা পুষ্টি অসম্ভব। কারণ অন্য কোনও লোকের সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক নাই এমন কোনও নির্জ্জন মানব যদি নির্জ্জন স্থানে জন্মগ্রহণ ও জীবন যাপন করে তাহা হইলে সে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবে জীবনযাপন করিবে এবং নিজের জীবনের মধ্যে নিজের অভাব পূরণের জন্য একপ্রকার সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি করিবে বটে, কিন্তু সেরূপ সভ্যতাকে সভ্যতা আখ্যা দেওয়া কেবল তর্কের খাতিরে। বাস্তবিক পক্ষে তাহা সভ্যতাই নহে এবং ঐ একটী মাত্র জীবনের সঙ্গে যে সভ্যতার সম্পর্ক তাহার বিকাশ সম্ভাবনা কোথায়? বিকাশ না হইলে বিজ্ঞান গড়ে না—পশু-পক্ষীর সংস্কারের ন্যায় পুষ্টির সম্ভাবনা বিহীন জ্ঞানকে জ্ঞান আখ্যা দেওয়া বৃথা। আবার ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টির সত্ত্বা নাই এবং সমষ্টি ছাড়া ব্যষ্টির বিকাশ নাই। বিংশ শতাব্দীতে যাহার জন্ম সে পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের সৃষ্ট সভ্যতা জন্মমাত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং সেই পরম্পরাগত সভ্যতার যথাশক্তি বিকাশ সাধন করে। এই ভাবেই সভ্যতার বৃদ্ধি হয়। এ বৃদ্ধি বা পুষ্টির কর্ত্তা ব্যষ্টিকেই বলিতে হইবে; সমষ্টি এ ক্ষেত্রে সহায়তা করে ও প্রভাব বিস্তার করে মাত্র। সমষ্টির মানসিকতা কেবলমাত্র ভাষার অলঙ্কারে। মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র যে প্রকার মনের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে তাহা ব্যষ্টিগত হইলেও সমষ্টির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সুতরাং লৌকিক মনোবিজ্ঞান নামক শাস্ত্রের কল্পনা "সোনার পাথর-বাটি" বা "পক্ষিরাজ অশ্বের" ন্যায় অমূলক।

লৌকিক মনোবিজ্ঞানের সত্ত্বা স্বীকার করা অসম্ভব হইলেও ব্যষ্টিগত মনের স্বাভাবিক প্রকৃতিও তাহার উপরে সমষ্টির প্রভাবের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা সুসম্ভব। 'লোকে কি বলিবে?'—এ চিন্তা যদি আমাদের না থাকে তাহা হইলে রুচির বিভিন্নতা অনুসারে আমরা সকলেই বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া উঠিব, এবং সমষ্টির মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য থাকিবে না। তাহার ফলে সমাজ বা জাতীয়তা সংগঠিত হইবে না। চিন্তা প্রণালীর ঐক্য না থাকায় ভাষারও ঐক্য অসম্ভব হইবে। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক একটী পৃথক পৃথক ভাষা হইবে। ব্যষ্টির উপর সমষ্টির প্রভাব না থাকিলে জাতীয়তা, রাষ্ট্রীয়তা, সামাজিকতা বা ভাষা কোনও কিছুই আমাদের থাকিত না এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ব্যক্তিগত

স্বার্থের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি হইয়া মানবজাতির সর্ব্ববিধ সভ্যতার মূল নষ্ট করিয়া দিত, এবং আরণ্য পশুর ন্যায় মানবগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র স্বোদর পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মানবপ্রকৃতি সেরূপ নহে। আমাদের মধ্যে সমষ্টির প্রভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং আমাদের সেই সমষ্টি-গতপ্রাণতার ফলেই নশ্বর মানব অমর। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম বা আমাদের বংশধরগণ কেহই অমর না হইলেও পৃথিবীতে মানবজাতি চিরস্থায়ী; এবং একযুগে মানবজাতি যে সভ্যতার সৃষ্টি করে পরবর্ত্তীযুগে মানবজাতি সেই সভ্যতার পরিপুষ্টি বা বিকাশ সাধন করে। ইতরপ্রাণীর মধ্যে তাহা সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাহাদের অমরত্ব নাই; তাহাদের কালিদাস—সেক্সপিয়র বা নিউটন—শঙ্করাচার্য্য নাই।

এই জাতীয়তা বা সমষ্টির প্রভাবে আমরা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছি। পৃথক পৃথক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের একটা ব্যবস্থা করিয়াছি। আবার এই অতি প্রাচীনকালের নামগুলিই উত্তরকালে নানাবিধ অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যে ভাবে চিন্তাশক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেই ভাবেই মনোমধ্যে ভাবস্রোতের প্রবাহ ছুটিয়াছে। ভাব যত বাড়িয়াছে ততই নূতন নূতন নামের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন উপকরণ হইতেই নানা উপায়ে নূতনের সৃষ্টি হয়। সর্ব্বতোভাবে নূতনের সৃষ্টি নরসমাজে একরূপ অবিদিত। তাই এককালে যে অর্থে যে নামের সৃষ্টি হয়, উত্তরকালে নূতন ভাব প্রকাশের আবশ্যকতা হইলে নূতন অর্থে সেই নাম বা তাহার বৈয়াকরণ জাতির প্রয়োগ হয়। অথবা তাহার স্থান পূরণের জন্য নূতন শব্দের ব্যবহার হইলে পুরাতন শব্দের অর্থের সঙ্কীর্ণতা, অতিব্যাপ্তি বা বিষয়ান্তর প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু এক শব্দার্থ পরিবর্ত্তনের ক্রম এরূপ জটিল যে অবিমিশ্র একমাত্র প্রক্রিয়ার অর্থবিকাশের উদাহরণ ভাষায় অতি বিরল।

শব্দার্থের সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্তির একটী সুন্দর উদাহরণ সংস্কৃত মৃগ শব্দ। এই শব্দের সাধারণ অর্থ 'পশু' বা 'জন্তু'। এই জন্যই সিংহের নাম 'মৃগরাজ', 'মৃগেন্দ্র', 'মৃগাধিপ', 'মৃগাধিরাজ', 'মৃগেশ্বর', 'মৃগপতি', 'মৃগরাট্', 'মৃগশ্রেষ্ঠ', 'মৃগরিপু' প্রভৃতি। * মৃগাঙ্ক, বা 'মৃগলাঞ্ছন' শব্দে মৃগশব্দের সাধারণ অর্থ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্তি হওয়ায় শব্দটী 'শশাঙ্ক' বা 'শশলাঞ্ছনের' সমার্থক হইয়াছে। চন্দ্রদেবের কলঙ্কের সহিত 'শশ' বা খরগোসের যে অভ্রান্ত সাদৃশ্য আছে, তাহাও নহে। একটী শয়ান বা উপবিষ্ট চতুষ্পদ মাত্রের সহিত চন্দ্রদেবের কলঙ্কের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মৃগাঙ্ক শব্দ ও শশাঙ্ক শব্দ সমার্থক বলিয়া মৃগশব্দের 'শশক' অর্থ বা 'শশ' শব্দের 'মৃগ' অর্থের অনুমান যুক্তিসিদ্ধ হয় না। 'হরিণাঙ্ক' শব্দও এরূপ যুক্তির অন্তরায়। আবার চন্দ্রদেব আমাদের নিকট হইতে যেরূপ দূরে অবস্থিত, তাহাতে তাঁহার কলেবরে একটী চতুষ্পদমাত্রের চিত্র অঙ্কিত করিলেই তাহাকে মৃগ, শশক, গো, মহিষাদি যে কোনও চতুষ্পদের চিত্র বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু চন্দ্রদেবের কলঙ্কের সমালোচনা লইয়া আমাদের দেশের প্রাচীন কালের কবিগণ এবং আলঙ্কারিকগণ এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ঐ এক চন্দ্রের কলঙ্ক লইয়া কত কাব্য ও কত পৌরাণিক উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যানাদির প্রভাবে মৃগাঙ্ক বা হরিণাঙ্ক অপেক্ষা 'শশাঙ্ক' নামটীর অধিকতর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। † আবার যে কালে ভারতীয় রাজন্যগণ মাংসার্থে এই নিরীহ ও পলায়ন-মাত্র-প্রহরণ নিরামিষাশী চতুষ্পদের হত্যাকাণ্ডকে রাজসিক ক্রীড়ায় পরিগণিত করিলেন, ব্যুৎপত্তির সার্থকতা রক্ষার জন্য সেইকাল হইতে চতুষ্পদ মাত্র বোধক মৃগশব্দ মৃগয়ালব্ধ পশুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাদি বধ্য হইলেও, যে কারণেই হউক, সকলের পক্ষে ওরূপ হিংস্রপশু

* নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে মৃগৈঃ।
বিক্রমার্জ্জিত রাজ্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা ॥

মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য—রঘু ২।৪১। ততো মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্রগামী। রঘু ২।৩০

† অঙ্কাধিরোপিত মৃগশ্চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ—শিশুপাল বধ, ২।৫৩ মৃগশোভামুষগীব চন্দ্রমাঃ—রঘু ৮।৪২

লইয়া মৃগয়া করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং মাংসার্থ মৃগহত্যাই নিরাপদ বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। মৃগশব্দ যেরূপভাবে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই ইংরাজীতে deer শব্দও সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কুকুর অর্থে গ্রাম্য মৃগ শব্দ একাল পর্য্যন্ত মৃগশব্দের সাধারণ পশুত্ববাচী অর্থের সাক্ষ্য দিতেছে।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ টাকার (T. G. Tucker) বলেন যে অর্থ পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই প্রক্রিয়ায় শব্দার্থের ত্রিবিধ পরিণতি সঙ্ঘটিত হয় —(১) সঙ্কীর্ণতা, (২) উদারতা বা অতিব্যাপ্তি, ও (৩) স্থানান্তর প্রাপ্তি বা সম্পূর্ণ বিভিন্নার্থতা। যে কারণেই হউক আমরা শব্দ শক্তির এই ত্রিবিধ মাত্র বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিকাশের কারণ নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়। টাকার এই পরিণতির সপ্তবিধ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মৌলিক অর্থের অনির্দ্দিষ্টরূপ উদারতা বা ব্যাপ্তিবশতঃ প্রয়োগের সন্দিগ্ধার্থতা নিবারণ চেষ্টায় নির্দ্দিষ্টার্থ প্রাপ্তি। (২) মৌলিক অর্থের বিবিধ উপাদানের মধ্যে কোনও একটীর প্রাধান্য প্রাপ্তি; (৩) মৌলিক অর্থের সহিত লক্ষণালব্ধ কোনও অর্থের ভাব সাহচর্য্যে সমাবেশ বশতঃ অন্যার্থ প্রাপ্তি বা এই লাক্ষণিক দ্বিতীয়ার্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় উদারতা প্রাপ্তি। (৪) ভাবাধিক্য বশতঃ স্পষ্টার্থ প্রকাশের ব্যগ্রতা নিবন্ধনরূপক অর্থের ব্যবহার ও তন্নিবন্ধন মৌলিক অর্থের ব্যাপ্তি। (৫) রাগানুপ্রাণিত বর্ণনায় অত্যুক্তি বশতঃ মৌলিক অর্থের সঙ্কীর্ণতা বা অতিব্যাপ্তি। (৬) উপহাসাদিতে অভিপ্রেত শব্দের মৌলিক অর্থের স্থানান্তর প্রাপ্তি। অশ্লীল ভাব গুপ্তির চেষ্টাও এই স্থলে উল্লেখ যোগ্য। (৭) অজ্ঞতা নিবন্ধন অথবা প্রয়োগে মৌলিক অর্থের রূপান্তর প্রাপ্তি।

অতি প্রাচীনকালে, যথন মানবজাতির সভ্যতা ফুটিয়া উঠে নাই, তথন হইতেই মানবজাতির ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। কল্পনার চক্ষে দেখিলে বুঝা যায় যে তাহাদের ভাষায় সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ প্রভৃতি কতিপয় অদ্বিতীয় বস্তুর নাম ছিল; বৃক্ষ, বৃষ, তারকা, দন্ত প্রভৃতি জাতি বাচক বস্তুর নাম ছিল; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি কতিপয় জ্ঞাতিত্ববাচক শব্দ ছিল; আমি, তুমি, আমরা প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বনাম শব্দ ছিল; দুই, তিন, দশ প্রভৃতি কতিপয় সংখ্যার নাম ছিল এবং শয়ন, ভোজন, গমন প্রভৃতি কতিপয় ক্রিয়ার নাম ছিল। সাধারণভাবে চিন্তা করিলে মনে হইতে পারে যে এই সকল মৌলিক শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এই অবস্থাতেই শব্দ-শক্তির নানাভাবে বিকাশ আবশ্যক হইয়াছে। যে ভাষার বিকাশ হইয়াছে, নানারূপ ভাবপ্রকাশে যে ভাষা সমর্থ, সে ভাষার পক্ষে শব্দার্থের সঙ্কীর্ণতা, উদারতা বা স্থানান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, যে ভাষার শব্দ সম্পদ অল্প তাহাকে পদে পদে নূতন নূতন ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়। সুতরাং সে তাহার অল্পসংখ্যক শব্দসম্ভারের নানারূপ ব্যবহার না করিয়া পারে না। ইংরেজী ভাষার অভিধানে যত শব্দ পাওয়া যাইবে, সাধারণ সাহিত্যে তাহার দশমাংশেরও ব্যবহার হয় না। কারণ সাধারণ শব্দ মাত্র লইয়াই সাধারণ সাহিত্যের অভাব মোচন হয়। তোমার দশ বাক্স পরিচ্ছদ থাকিলে তাহার অধিকাংশই অব্যবহৃত থাকিবে; কিন্তু যে দরিদ্রের একখানি মাত্র বস্ত্র, তাহাকে তাহা দ্বারাই লজ্জা নিবারণ, শীত নিবারণ, আতপ নিবারণ প্রভৃতি নানারূপ কার্য্য করাইয়া লইতে হয়। ভাষার বিষয়েও একই কথা। মানব চরণ বাচক পদ বা পা শব্দ খাট-চৌকি প্রভৃতির চরণাকৃতি বস্তু বিশেষের বাচক হইয়া পড়া অতি স্বাভাবিক। এখানে প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যমূলক বিষয়ান্তরে মৌলিক অর্থের অপসারণ বা বিষয়ান্তর প্রাপ্তি হইল। রূপক বা metaphor তাহার সহায়তা করিল। আবার 'ছেলের পা হয় নাই' বলিলে ইহা বুঝায় যে ছেলের পা গজায় নাই। 'পা' শব্দের মৌলিক অর্থের অংশমাত্র চলৎশক্তির অভাব বুঝায়। সংসার যাত্রার সহায়ভূত অবলম্বনকেও 'পদ' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়, যেমন 'রাজপদ', 'প্রাড়্‌বিবাকপদ', 'শ্রেষ্ঠিপদ' 'মন্ত্রিপদ' ইত্যাদি। এই অতিমৌলিক পদ শব্দের

অন্যত্র নানা অর্থের ব্যবহারের উদাহরণ—"জনপদে ন গদঃ পদমাদধৌ" (=দেশে ব্যাধির আবির্ভাব হয় নাই), "তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা" (=কয়েক পা চলিয়াই তন্বী দাঁড়াইয়া রহিলেন), "পদমনুবিধেয়ং—(চ মহতাম্" (মহান্ ব্যক্তির পদপংক্তির অনুসরণ বিধেয়) "রতি-বলয় পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে" (রতির বলয়-চিহ্নযুক্ত কণ্ঠে ধনুশ্চাপ অর্পণ করিয়া), "অপদে শঙ্কিতোঽস্মি" (অস্থানে বা অকারণে চিন্তিত হইয়াছি), "যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ঃ" (এইরূপেই যুবতীগণ গৃহিনীপদে উন্নীত হয়েন), "সতাংহি সন্দেহ পদেষু বস্তুষু" ([সাধুগণের] সন্দেহজনক বস্তুতে), "অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্" (অবিবেক পরম আপদের কারণ), "সুললিত পদংগীতম্" (পদ পদ্যের পঙ্ক্তি), "সুপ্‌তিঙন্তং পদম্" (বাক্যে প্রয়োগই শব্দ), ইত্যাদি। অমর লিখিয়াছেন—"পদং ব্যবসিত-ত্রান-স্থান-লক্ষ্মা-ঙিঘ্র' বস্তুষু।" অজয় লিখিয়াছেন—"পদং স্থানে পরিত্রাণে ব্যবসায়াপদেশয়োঃ। বাক্যে বস্তুনি শব্দে চ পাদ-তচ্চিহ্নয়োরপি॥"- মেদিনী লিখিয়াছেন—"পদং বাক্যে চ শব্দে চ ব্যবসায়-অপদেশয়োঃ। পাদ-তচ্চিহ্নয়োঃ স্থান-ত্রাণয়োর্-অঙ্ক-বস্তুনোঃ। শ্লোক পাদেঽপি চ ক্লীবং পুংলিঙ্গ কিরণে পুনঃ॥" বঙ্গভাষায়ও এইরূপ, পা-দেওয়া, পা-বাড়ান, পায়ে-ঠেলা, পায়ে-পায়ে, পা-ভারি প্রভৃতি নানারূপ প্রয়োগে পা শব্দের নানারূপ অর্থ জুটিয়াছে। হাত শব্দেরও এই প্রকার নানা অর্থ হইয়াছে। যেমন, আমার কোনও হাত নাই, পঁচিশ হাত লম্বা, ডাক্তার বাবু আমার হাতটা দেখুন ত, জ্যোতিষী হাত দেখিয়া পরমায়ু গণনা করেন, তার হাত দারাজ, হাত-নাগাইদ (আজ পর্য্যন্ত), গিরিধরী অনেক হাত ফিরিয়াছে, ছোটছেলের গায়ে হাত তুলিও না; হাতে হাতে ধরা পড়া; হাতে ধরা, হাতভারি লোক, বেশ ছবিএঁকেছ তোমার হাত আছে; রাস্তার বাঁ হাতেই আমাদের ঘর; আমার হাত খাটো হয়েছে; চেয়ারের হাত ভাঙ্‌লে কে? এ কাজে হাত দিও না; হাত রেখে কাজ করা ভাল; এ ত তোমার হাতের কাজ। এইরূপ দাঁত শব্দ। যেমন, রাস্তার দাঁত উঠেছে, শীতকালে জলের দাঁত হয়, দাঁতে দাঁতে থাকা, দেঁতো হাসি, দাঁত বাহির করা, ছুরির দাঁত পড়া, দাঁত কামড়ান, ইত্যাদি। ভাল ও মন্দ শব্দও এই প্রকার অসংখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,— ভাল থাকা, ভাল লোক, ঘা ভাল হওয়া; ভাল কথা, তুমি যাচ্ছ কবে? ভাল আপদ! ভাল খাওয়া, ভাল পরা; তার এখন সময় ভাল; ভাল দিন নাই; তাঁর ভাল হোক; ভালর ভাল সর্ব্বকাল; ভাল-খাগী; ভাল চাও, ত টাকা দাও; ভাল সুযোগ; ভাল রাস্তা; ভাল জমি; কাজে ভাল; দেখ্‌তে ভাল; ইত্যাদি; এবং মন্দ কথা; মন্দ নয়; মন্দ বায়ু; মন্দ গতি; মন্দ কপাল; বাজার মন্দ (মন্দা); মন্দ লোক; ইত্যাদি। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। প্রয়োজন অনুসারে অতি প্রাচীন শব্দ সমূহের বিচিত্ররূপ অর্থবিকাশ ঘটিয়াছে।

প্রত্যেক শব্দই মৌলিক অর্থের একটী উপাদানের বা অংশবিশেষের বর্জ্জন বা অভিনব কোনও অতিরিক্ত উপাদানের গ্রহণ দ্বারা অর্থসঙ্কীর্ণতা বা অতিব্যাপ্তি বা বিষয়ান্তর প্রাপ্তির বিষয়ীভূত হইতে পারে। অতিব্যাপ্তি সাধারণতঃ বিরল হইলেও ইহার উদাহরণের অভাব নাই। তবে অধিকাংশ স্থলেই যখন শব্দার্থ মৌলিক উপাদানের সকলগুলিই ত্যাগ করিয়া কোনও অভিনব উপাদান গ্রহণ করে তখনও তাহাকে অতিব্যাপ্তার্থ শব্দ বলা হয়। সেটা ভুল। যেমন "চাঁদ আমার, সোনা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার" বলিয়া শিশুর সম্বোধন। Speech is **silveren,** but silence is **golden.** এ সকল স্থলে মৌলিক অর্থের উদারতা বা অতিব্যাপ্তি ঘটে নাই, রূপকাত্মক অভিনব অর্থে পর্য্যবসান সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে অর্থের অতিব্যাপ্তি হয় নাই; বিষয়ান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। 'পয়সা' শব্দের মৌলিক অর্থ 'তাম্রমুদ্রা'। যখন সাধারণ 'ধন' অর্থে ব্যবহার হয়, তখন ইহার অর্থের অতিব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ যে যে উপাদান লইয়া পয়সা শব্দের অর্থ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী উপাদান ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার অর্থের অতিব্যাপ্তি হইল। যেমন—লোকটার পয়সা আছে; সে দুপয়সা করেছে। এইরূপ 'দেখা' বা

'দর্শন' শব্দে যখন 'জ্ঞান' মাত্রকে বুঝায় তখন তাহার অতি-ব্যাপ্তি হয়। 'প্রত্যক্ষ' শব্দেরও অতিব্যাপ্তি হয়, যখন ইহার অর্থ ইংরাজী perception শব্দের তুল্য হয়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ও পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত ইংরাজী lady ও gentleman অতিব্যাপ্তির উদাহরণ। domina শব্দের মৌলিক অর্থ 'গৃহপত্নী' হইলেও এই শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন ইটালীয় donna শব্দ স্ত্রীলোক-মাত্র-বাচী, অতএব অতিব্যাপ্ত। 'কুরূপা রমণী'র রমণী অতিব্যাপ্তির উদাহরণ। কিন্তু শান্ত-শিষ্ট ছেলেকে 'লক্ষ্মীছেলে' বলিলে 'লক্ষ্মী' শব্দের অতিব্যাপ্তি হয় না; স্থানান্তর প্রাপ্তি হয়। সঙ্কীর্ণতার উদাহরণ অবিরল। যেমন—চরণ, নয়ন, শ্রবণ, পঙ্কজ, গ্রন্থ, জলাশয়, দীপ, অন্ন, হিন্দী পানী (জল), মৃগ, অসিত, অচল, চঞ্চলা চপলা, ইত্যাদি।

হরমন পল (Hermann paul) ভাষার শব্দ সমূহকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন;—(১) ভাববাচক বা ধারণাগম্য শব্দ (abstract) ও (২) বস্তুবাচক বা নির্দ্দিষ্ট শব্দ (concrete words)। তিনি বলেন শব্দ সমূহের অর্থও দ্বিবিধ; একটী সাধারণ বা ধারণাগ্রাহ্য অর্থ, যাহা শব্দটীর নাম মাত্র শ্রবণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আর একটী প্রয়োগ গ্রাহ্য বা নির্দ্দিষ্ট অর্থ, যাহা শব্দটীর বাক্যমধ্যে প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে অন্বয়াদির সাহায্যে উপলব্ধ হয়, অন্বয়াদির বশে মৌলিক বা সাধারণ অর্থের পরিবর্ত্তন হয়, দুইটী পৃথক পৃথক বাক্যে ব্যবহৃত একটী অভিন্ন শব্দের অর্থ সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে। আবার শব্দটী বক্তার নিকট যে যে অর্থ প্রকাশ করে শ্রোতার নিকট অবিকল সেই সেই অর্থ প্রকাশ করে না। স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য ভেদে অর্থেরও কিছু-না-কিছু বিভিন্নতা ঘটে। এবং এই ভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কোনও দুইটী বাক্যের অর্থ এক হইতে পারে না এবং দুইবারে ব্যবহৃত অভিন্ন শব্দের অর্থও হইতে পারে না। তবে সাধারণতঃ আমরা অত খুঁটি-নাটি করিয়া শব্দার্থ পরিগ্রহ করি না বলিয়া শব্দ সমূহের এক একটী সাধারণ বা ধারণাগ্রাহ্য অর্থ আছে। বাক্যে প্রয়োগ হইলে স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য অনুসারে ঐ সাধারণ অর্থের কিঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্তি হয়। সাধারণ অর্থ ধারণা-মাত্র-গ্রাহ্য বা abstract, এবং উপলক্ষিত অর্থ নির্দ্দিষ্ট বা concrete, কেবলমাত্র 'আমি' শব্দ ধারণা-মাত্র-গ্রাহ্য ভাববাচক (abstract); কিন্তু 'আমি লিখিতেছি' এই বাক্যে ব্যবহৃত 'আমি' শব্দ নির্দ্দিষ্ট (concrete) এবং একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। এই কারণে শব্দ সমূহ (এবং বাক্য সমূহও) ভাববাচক ও পদার্থ-বাচক ভেদে দ্বিবিধ। অনন্বিত 'মনুষ্য' শব্দ ধারণা মাত্র গ্রাহ্য, কারণ এই শব্দের দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় না; কিন্তু 'এই মনুষ্য' নির্দ্দিষ্ট, কারণ ইহা দ্বারা একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। এই 'মনুষ্য নশ্বর' বাক্যটী কোনও নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যকে বুঝায় না বলিয়া ইহার অর্থ ধারণা মাত্র গ্রাহ্য (abstract), কিন্তু "ঐ মনুষ্যটীকে চিনি" বাক্যটী একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বিষয়ক একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া এটী নির্দ্দিষ্ট বা concrete বাক্য। এইরূপে কতিপয় সর্ব্বনাম শব্দ ও কতিপয় সর্ব্বনাম-মূলক বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ শব্দ নির্দ্দিষ্টার্থক। যথা—অত্র, অধুনা, অদ্য, গতকল্য, আমি, তুমি, তিনি প্রভৃতি। ইহাদিগকেও সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দিষ্টার্থক বলা যায় না, তবে উপালক্ষ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলেই ইহাদের অর্থ নির্দ্দিষ্ট বা concrete হয়। এক একটী নির্দ্দিষ্ট অদ্বিতীয় বস্তুর বাচক যে সকল শব্দ, তাহাদের অর্থ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দিষ্ট। যেমন—চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ, পরমেশ্বর, বরুণ, যম, ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিলে ইহারা ও abstract হইয়া পড়ে। রামচন্দ্র, যদুপতি, খগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক নামও এই শ্রেণীর। কিন্তু কতিপয় শব্দ এ প্রকারের যে তাহাদের অর্থ কখনও নির্দ্দিষ্ট হয় না, এই সকল শব্দ স্বভাবতঃই ধারণা-গ্রাহ্য বা ভাববাচক যেমন—কোনও-না-কোনও, কিছু-না-কিছু, কেহ-কেহ, কদাচিৎ, কতিপয় প্রভৃতি। নির্দ্দিষ্ট শব্দের অর্থ একটী মাত্র, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট ভাববাচক শব্দের অর্থ বহু।

উপলক্ষ্য ও প্রয়োগ অনুসারে যে প্রকারে অনির্দ্দিষ্ট বা

ধারণামাত্র গ্রাহ্য (abstract) শব্দ নির্দ্দিষ্ট (concrete) অর্থ প্রকাশ করে, সেই ভাবেই শব্দসমূহের প্রয়োগ অনুসারে সাধারণ বা স্বাভাবিক অর্থের উপাদান বিশেষের ধ্বংস বশতঃ শব্দশক্তির রূপান্তর প্রাপ্তি বা সঙ্কীর্ণতা সাধিত হয়। এই কারণে যে সকল স্থলে গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীজাতীয় সেই সকল স্থলে মূলতঃ পুংস্তবাচক বা উভয়-লিঙ্গক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পর্য্যবসান হয়। গো শব্দ প্রথমে পুংলিঙ্গ, পরে উভয়লিঙ্গ এবং সর্ব্বশেষে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। বৃষ শব্দ পুংলিঙ্গের স্থান পূরণ করিয়াছে। ইংরাজীতেও এই প্রণালীতে cow, sow (m. boar) ও ewe শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। সর্ব্বদাই স্ত্রীজাতীয় পশু দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতসারে গো-শব্দের সহিত স্ত্রী জাতীয়ত্বের ভাব বিজড়িত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে শব্দটীর পুংবাচকতার অপচয় হইয়া গো-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। ইংরাজী maid ও girl শব্দ প্রথমে উভয় লিঙ্গ, ও বালক এবং বালিকা উভয়েরই বাচক ছিল। কালক্রমে এই দুই শব্দও স্ত্রীত্ববাচক হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত হংস (*ঘংস) শব্দের জর্ম্মণ ভাষায় gans ও ইংরাজী ভাষায় goose রূপে পরিণতি ও পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অভিনব পুংলিঙ্গ শব্দ gander সত্ত্বা লাভ করিয়াছে। যদি ভাষায় এমন শব্দ না থাকে যাহাতে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত শব্দের মৌলিক অর্থ প্রকাশ পায়, অথবা যদি ঐ মৌলিক অর্থ প্রকাশের জন্য নূতন শব্দের আবির্ভাব না হয়, তবে শব্দ বিশেষের অর্থের সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। অথবা শব্দ বিশেষের অর্থের সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ শব্দের প্রাচীন সাধারণ অর্থ প্রকাশের জন্য অভিনব শব্দের আবির্ভাব হয়।

শব্দশক্তি বিশারদ পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রেআল (Breal) বলেন যে আবহমান কাল হইতে মানবজাতি ভাষায় অপ্রিয় ভাবের গোপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। যাহা কিছু অশ্লীল বা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ তাহাই নরসমাজে পরিত্যাজ্য; যাহা কিছু ঘৃণা, লজ্জা বা জুগুপ্সাবাচক তাহাই গোপনীয়। এই প্রবৃত্তির ফলে অশ্লীল বা গোপনীয় ভাবসমূহের প্রকাশক শব্দ ভাষায় টিকিয়া থাকিতে পায় না; রূপকাদি অলঙ্কারের সাহায্যে মার্জ্জিত ভাষায় তাহার প্রকাশ হয়। তোষামোদের ভাষায় অসম্ভব বর্ণনাকে সম্ভাবনার সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তিও শব্দার্থ বিকাশের হিসাবে একই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন। ইহার ফলে ভাষায় শব্দশক্তির দ্বিবিধ পরিবর্ত্তন হয়—অর্থোৎকর্ষ বা অর্থাপকর্ষ। শত্রুর কার্য্যের ছিদ্রান্বেষণ ও মিত্রের কার্য্যের গুণান্বেষণের ফলে এবং উপহাস ও অবজ্ঞাদির ফলেও ঐ একই প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। এই অপ্রিয়-ভাব-গুপ্তি-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের আলঙ্কারিকগণ কাব্যে অশ্লীলতা বর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশে ত্রিবিধ অশ্লীলতার উদাহরণ:—

সাধনং সুমহদ্ যস্য যন্ নান্যস্য বিলোক্যতে।
তস্য ধী-শালিনঃ কোঽন্যঃ সহেতারালিতাং ভ্রুবম্॥
লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতা নিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
কশ্চিৎ কেসরদূষিতেক্ষণ ইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ।
মুগ্ধা কুড্মলিতাননেন দধতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্ত্ততয়াঽথ বা নতিম্ ঋতে তেনানিশং চুম্বিতা॥
মৃদুপবনবিভিন্নো মৎপ্রিয়ায়া বিনাশাৎ
ঘনরুচিরকলাপো নিঃসপত্নোঽস্য জাতঃ।
রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে সুকেশ্যাঃ
সতি কুসুমসনাথে কং হরেদেষ বর্হঃ॥

এই সকল স্থলে সাধন, বায়ু ও বিনাশ শব্দ ব্রীড়া, জুগুপ্সা ও অমঙ্গলের বাচক বলিয়া ইহাদের কাব্যে ব্যবহার গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদ্যত্রয়ও বাক্যগত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট:—

নৃপতে স্বপস্থপস্থা কম্পনা বামলোচনা।
তত্তৎ প্রহরণোৎসাহবতী মোহনমাদধৌ॥
তেঽন্যৈর্বান্তং সমশ্নন্তি পরোৎসর্গঞ্চ ভুঞ্জতে।
ইতরার্থগ্রহে যেষাং কবীনাং স্যাৎ প্রবর্ত্তনম্॥
পিতৃবসতিমহং ব্রজামি তাং সহ পরিবার-
জনেন, যত্র মে।
ভবতি সপদি পাবকান্বয়ে হৃদয়মশেষিত শোক-
শল্যকম্॥

এই তিনটী পদেও যথাক্রমে ব্রীড়া, জুগুপ্সা ও অমঙ্গল-সূচক অশ্লীলতা আছে। এখানে টীকাকার বলিলেন যে 'শিবলিঙ্গ', ভগিনী, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি যে সকল শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ আছে তাহাদের প্রয়োগে দোষ নাই। কিন্তু অশ্লীল ভাবের আভাস দিতে পারে এরূপ সন্ধিও পরিহার্য্য :—

বেগাচ্চড্ডীয় গগণে চলণ্ডাম্মণ্ড চেষ্টিতঃ।
অয়মুৎপততে পত্রী ততোঽত্রৈব রুচিং কুরু॥

সুরতাদি বর্ণনায় দ্ব্যর্থ পদের প্রয়োগ থাকিলে সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে অশ্লীলতা দোষাবহ হয় না। [দ্ব্যর্থৈঃ পদৈঃ পিশুনয়েচ্চ রহস্য বস্তু।] সেই জন্য

"করিহস্তেন সংবাধে প্রবিশ্যান্ত র্বিলোড়িতে।
উপসর্পন্ ধ্বজঃ পুংসঃ সাধনান্ত র্বিরাজতে॥"

এ স্থলে অশ্লীলতা গুণাবহ।

ফল কথা শিষ্টাচারের বশে ভাষায় মধু, মদন, ভগবতী, রামা, রমনী, প্রভৃতি বহু অশ্লীল শব্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অবজ্ঞা ও উপহাস প্রবৃত্তির প্রভাবে জ্যেঠামি, ছেলেমি, বুড়োমি, ভাল্-মানুষ, নবাবী, গন্নীবীয়ানা, বাথান, অন্ন প্রভৃতি বহু শব্দের অর্থাপকর্ষ ঘটিয়াছে। 'আমি' না বলিয়া যেখানে "অকিঞ্চন" "অধম" "অধীন" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় সেখানেও শিষ্টাচার পরিস্ফুট।

শব্দ বিশেষের দ্বারা প্রকাশ্য অর্থের উপাদানের আধিক্য হইলে উদারতা বা অতিব্যাপ্তি ঘটে। মনে কর একটী শব্দের অর্থ ক+খ; ইহার সহিত অতিরিক্ত গ যোগ হইয়া যদি ক+খ+গ হয়, তাহা হইলেই উদারতা বা অতিব্যাপ্তি হয়। অতিব্যাপ্তির উদাহরণ সাধারণতঃ বিরল। 'কালিদাস' বলিলে উত্তম কবিধর্ম্মবিশিষ্ট একজন নির্দ্দিষ্ট লোককে বুঝায়; কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট ছাড়াইয়া যখন অন্যত্রও 'কালিদাস' শব্দের প্রয়োগ হয়, তখন অতিব্যাপ্তি হয়। সেইরূপে 'তুমি দৈত্য-কুলে প্রহ্লাদ' বলিলে 'প্রহ্লাদ' শব্দের অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু এসকল স্থলে অর্থের স্থানান্তরপ্রাপ্তি বা অতিদেশও ঘটে। 'দর্শন' ও 'প্রত্যক্ষ' যখন 'জ্ঞান' বা 'প্রত্যক্ষমাত্রের বাচক হয় তখন ইহারা অতিব্যাপ্ত।

উপমা ও উপমেয়ের অভিন্নতা কল্পনা হইলে সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রের রূপকালঙ্কার হয়। এই রূপক অলঙ্কারের প্রভাবে শব্দশক্তির বিষয়ান্তরপ্রাপ্তি বা অতিদেশ ঘটে। কাব্য-সাহিত্য হইতে রূপকের একটী উদাহরণ :—

সৌন্দর্য্যস্য তরঙ্গিনী, তরুণিমোৎকর্ষস্য হর্ষোদ্গমঃ,
কান্তেঃ কার্ম্মণকর্ম্ম, কাম্মনমরহস্যামুল্লাসনাবাসভূঃ।
বিদ্যা বক্রগিরাং, বিধেরনবধি প্রাবীন্য সাক্ষাৎক্রিয়া,
বাণাঃ পঞ্চশিলীমুখস্য, ললনাচূড়ামণিঃ সা প্রিয়া॥

মাতা যখন শিশুকে আদর করিয়া বলেন, 'চাঁদ আমার', 'সোনা আমার', 'ধন আমার', 'মাণিক আমার', তখন তিনি অজ্ঞাতসারে 'চাঁদ', 'সোনা' প্রভৃতি শব্দের অতিদেশ সাধন করেন। 'মলয়' পর্ব্বত বিশেষের নাম। কিন্তু প্রয়োগবশে একণে 'মলয়' শব্দ 'চন্দন' বা 'দক্ষিণ পবন' অর্থে ব্যবহৃত। দ্বিতীয় অর্থে কবির ভাষায় শব্দটী আকারস্তও হইয়াছে। 'চাষা' বলিলে এক্ষণে 'কৃষক' বুঝায় না, বুঝায় 'অশিক্ষিত শিষ্টাচারশূন্য লোক।' গালাগালির ভাষায় 'ছুঁচো' বলিলে 'হীন প্রবৃত্তির লোক' বুঝায়। এসকল স্থলে যৌগিক অর্থটীকে 'ক' ধরিলেও প্রয়োগাত্মক অবান্তর অর্থটীকে 'খ' ধরিলে শব্দের মৌলিক অর্থটী বক্র হইয়া প্রথমে 'ক+খ' ও পরে কেবলমাত্র 'খ' হইয়া পড়ে। তখন আর শব্দটীর মৌলিক অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'ধুরন্ধর', 'পারীণ', 'পারগ', 'কুশল', 'ধন্য', 'আর্য্য', 'অনার্য্য', 'মনোজ্ঞ', 'পঙ্কজ', 'জলৌকা', প্রভৃতি বহুশব্দের মৌলিক অর্থ এই প্রকারে লোপ পাইয়াছে।

ভাবাধিক্যবশতঃও শব্দার্থের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই উপায়ে ইংরাজী ভাষায় 'awfully pleasant', 'miserably poor', 'immediately preceding', 'presently following', 'He is enjoying a very poor health' প্রভৃতি চলিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে পুরুষসিংহ, নরবৃষভ, নরদেব, নরপিশাচ প্রভৃতি চলিয়াছে।

অজ্ঞতাবশতঃ শব্দার্থের নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আরবী 'ফিক্‌র' শব্দের অর্থ 'বিপদ।' কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার

অর্থ হইয়াছে 'উপায়'; যেমন,—'যে কোনও ফিকিরে কাজ হাসিল করতে হবে।' 'গুজরাটী' শব্দের অর্থ 'ছোট' 'ক্ষুদ্রকায়।' 'ফিরিঙ্গী', 'খুন', 'দরিয়া', 'বরাবর', 'আলু (—বদর)', 'ক্যাংটা গোরা', 'গোধূলি', 'খরগোস' প্রভৃতি এই শ্রেণীর শব্দ।

বস্তুবিশেষের বা ভাববিশেষের নামকরণে কয়েকটী নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। কোনও একটী বিশিষ্ট লক্ষণ হইতে জীব বা বস্তুবিশেষের নামকরণ হয়; যেমন, সিংহ, কেশরী, হস্তী, চেয়ারের হাত, চৌকির পা ইত্যাদি। উপকরণের নাম হইতে সেই উপকরণ দ্বারা গঠিত বস্তুর নাম হয়; যেমন, গ্লাস, তার, পাথর (পাথরের থালা), পত্র (লিপি), চাঁদি (টাকা), প্রভৃতি। এক শ্রেণীর বস্তুর নাম হইতে অন্য শ্রেণীর বস্তুর নাম হয়; যেমন পার্সী 'গুল' শব্দ মূলতঃ গোলাপ ফুলের বাচক হইয়া অবশেষে পুষ্পমাত্রের নাম হইয়াছে; 'কুল' অর্থ-বিশিষ্ট 'আলু' শব্দ আমেরিকা হইতে আগত potatoর বাচক হইয়াছে। দেশ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির নামও মূলতঃ কোনও লক্ষণবিশেষ হইতে উৎপন্ন, পরে সে লক্ষণ বা সে অর্থ থাকে না; যেমন, কলিকাতা, কালিন্দী (কালজল বিশিষ্টা), গ্রাম কোয়াড় (গো-পালক), পাটলীপুত্র, কুসুমপুর, কালী-ঘাট ইত্যাদি। যে সমাজে যে বস্তুর অধিক ব্যবহার সেই সমাজে সেই বস্তুর অসংখ্য নাম, প্রত্যেকটী পৃথক পৃথক লক্ষণ হইতে উৎপন্ন। আরবদিগের উষ্ট্রের শতাধিক নাম আছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এই শ্রেণীর। সিংহের নাম—সিংহ, মৃগেন্দ্র, কেশরী, পঞ্চাস্য, হরি, হর্যাক্ষ প্রভৃতি। আবার প্রত্যেক লক্ষণ লইয়াও নানা নাম। যেমন, মৃগরাজ, মৃগচন্দ্র, মৃগপতি, পশুরাজ ইত্যাদি। বাস্তব বা কাল্পনিক সাদৃশ্য হইতে বস্তু বিশেষের নাম হইতে অন্য বস্তুর নাম হয়; যেমন, আনারসের চোখ, ছুরির দাঁত, চেয়ারের হাত ইত্যাদি। এই উপায়েই 'দশহাত', 'পাঁচ আঙ্গুল', 'সাত ফুট' প্রভৃতি পরিমাপের নাম হইয়াছে। দেশবাচক শব্দ কালবাচকরূপে ও কালবাচক শব্দ দেশবাচকরূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন পূর্ব্বে, অগ্রে, পশ্চাতে। ইন্দ্রিয় বিশেষের গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর গ্রাহ্য প্রত্যক্ষের নামকরণ হয়; যেমন, কটুসম্ভাষণ, মিষ্টকথা, উচ্চশব্দ; বস্তুবাচক শব্দ হইতে ভাববাচক শব্দ সৃষ্ট হয়; যেমন, প্রাণ, অসু, আত্মা।

আর দু'একটী কথা বলিলেও বক্তব্যের শেষ হয়। আমরা সাধারণ কথোপকথনে যে সকল শব্দের ব্যবহার করি, প্রসঙ্গ বা উপলক্ষ্য অনুসারে তাহার সাধারণ বা মৌলিক অর্থের সহিত নানা উপাদান মিশিয়া যায়। এই সকল উপাদানই ক্রমে ক্রমে শব্দের মৌলিক অর্থের পরিবর্ত্তন সাধন করে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে চারিটী কারণ উপস্থিত থাকিলে পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়া পড়ে। (১) বক্তার আভপ্রায়ের অবিকল অনুরূপ মানসিক চিত্র শ্রোতার মনে সমুদিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা অর্থবোধে বাধা ঘটিবে। (২) শ্রোতার মানসিক অবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তিনি বক্তার অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। (৩) আনুসঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহ পরিবর্ত্তিত অর্থ গ্রহণের অনুকূল হওয়া চাই। (৪) বক্তা শ্রোতার সভ্যতার মাত্রা অভিন্নরূপ হওয়া চাই। এই শেষোক্ত কারণটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। সভ্যতা অভিন্ন না হইলে ভাষায় পরিবর্ত্তনের সমাদর হইতে পারে না, এমন কি অর্থ গ্রহই অসম্ভব হয়। তাই হরমন পল (Hermann Paul) দুই প্যারাগ্রাফে লিখিয়াছেন যে (১) বক্তার সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে শব্দার্থের বিকাশ সীমাবদ্ধ, এবং (২) সমাজ বা জাতীয় সভ্যতার সীমানার মধ্যে শব্দ শক্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ। সভ্যতার পরিমাণ অনুসারে ভাবের সম্পদ যেমন বাড়িতে থাকে শব্দ সম্পদও সেই প্রকার বাড়িতে থাকে।

আর একটী কথা। শব্দ শক্তির বিকাশ প্রায় একভাবে হয় না। একই শব্দের বিকাশে নানারূপ হেতু ও প্রক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। 'মেলা' শব্দের মৌলিক অর্থ 'মিলনমাত্র' হইলেও ইহার বর্ত্তমান অর্থ 'কোনও পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে ক্রয়-বিক্রয় বা অভিনব বস্তুর দর্শনেচ্ছায় মনুষ্যগণের একত্র সমাবেশ'। 'মৃগ' শব্দের সাধারণ 'পশু' অর্থ হইতে নির্দ্দিষ্ট 'পশুর' অর্থ যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে এখানেও সে প্রক্রিয়া

লক্ষিত হয়। কারণ সাধারণতঃ একমাত্র মিলনের উদাহরণ 'মেলা'। কিন্তু আর একভাবে দেখিলে 'মিলন', 'সঙ্গম' জনতা প্রভৃতির অর্থ হইতে বিভিন্ন অর্থের আবশ্যকতা হওয়ায় এই শব্দের অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। এইভাবে আমাদের ভাষায় বিভিন্নার্থক প্রতি-শব্দসমূহের সৃষ্টি হয়; যেমন, মন, মনন, মনু, মানব, মনুষ্য; বেষ (-শ), ভেক; আঁচল, অঞ্চল, আঁচলা; মানুষ, মুনিষ, মিনসে।

ভাষায় শব্দ শক্তি বিকাশের বিচিত্র প্রণালী, বিচিত্র নিয়ম। সবটাই অনিয়ম। মানবজাতির ইতিহাস যেমন জটিল, ভাষার বিকাশও সেইরূপ। আবার ভাষার বিকাশ অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপার, সুতরাং বর্ত্তমান যুগের মানবের চিন্তাশক্তির পক্ষে শব্দ শক্তি বিকাশের বিচিত্র প্রণালীর ধারণা ও আবিষ্কার একপ্রকার অসম্ভব। আমাদের দেশে নৈয়ায়িকগণ প্রাচীন ন্যায়ের শব্দখণ্ডে ইহার সমাধান চেষ্টা করিয়াছেন, ঋষি যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থেও এ বিষয়ে অল্প পরিশ্রম করেন নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রও এ বিষয়ের চর্চ্চা অবান্তরভাবে করিয়াছেন। ইউরোপে পল, হুইট্‌লি, ব্রেআল্ প্রভৃতি ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া কোনও কূল-কিনারা পান নাই। একটী নির্দ্দিষ্ট মানবজাতির সহিত কত বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ ও মিলন ঐতিহাসিক যুগে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে অনৈতিহাসিক যুগের শব্দ শক্তির আলোচনা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এখানে নৈয়ায়িক পরাস্ত হইয়াছেন, মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐতিহাসিক ভাষার ইতিহাসের সমাদর করেন নাই, বোধ হয় করিতেও পারেন নাই। অথচ ইতিহাস, বিজ্ঞান, রসায়ন, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব সর্ব্বত্রই শব্দশক্তির ইতিহাস আংশিকভাবে প্রক্ষিপ্ত, ইউরোপ ও ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় করিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা বঙ্গ-ভাষার বিষয়ের উপক্রমণিকা মাত্র লিখিলাম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মীনচেতনের টীকা। *

আয়ুর্ব্বেদে প্রাণ অপানাদি পঞ্চ বা-ত স্বীকৃত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে উন-পঞ্চাশৎ বা-ত। তন্মধ্যে দশটি প্রধান। প্রাণ-অপানাদি পাঁচ ও অন্য পাঁচ। এই দশের দ্বারা দেহে প্রাণ থাকে। নলের মধ্য দিয়া যেমন জল যাতায়াত করে, দেহের নলের মধ্য দিয়া রসরক্তাদি গমনাগমন করে। দেহের নলগুলি সরু। এ কারণ নাম, নালা বা নাড়ী (tube)। নাড়ীর অপর নাম ধমনী ও শিরা। আয়ুর্ব্বেদে নাড়ী ধমনী ও শিরা, তিন নামই আছে। বিশেষ করিতে রস-বহা, রক্ত-বহা, অন্ন-বহা, এইরূপ বলিতে হয়। বাতও নলাকার পথে সঞ্চরণ করিতেছে। এই নলগুলি বাত-বহা নাড়ী (nerves)। যোগশাস্ত্রে নাড়ী বলিলে এই বাত-বহা নাড়ী বুঝায়। বৃত্তিভেদে নাড়ী আজ্ঞা-বহা (motor), মনো-বহা (sensory), প্রাণ-বহা ("automatic" or animal), ইত্যাদি। এইরূপ, দ্বিসপ্ততি সহস্র (মতান্তরে সাড়ে তিন লক্ষ) নাড়ী মৃণালতন্তুস্বরূপ হইয়া দেহে ওতপ্রোত বিন্যস্ত আছে। এক এক নাড়ীই বহু তন্তুর সমষ্টি; সুতরাং কে গণিতে পারিবে। সহস্র লক্ষ দ্বারা বহুত্বসূচীত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের মতে এই সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি নাভি-কন্দে (পরে দেখ)। তন্মধ্যে দশটি বাতের দশটি নাড়ী প্রধান। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান। অপর সমুদায় নাড়ী এই তিনের শাখা-প্রশাখা। অস্থিময় পৃষ্ঠবংশের (আমার ভাষায়, মেরুদণ্ডে, ব্রহ্মদণ্ডে) (spinal column) ভিতরে সুষুম্না নাড়ী (spinal cord), বামে ইড়া এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী (the two sympathetic)। সুষুম্না হাতখানেক লম্বা; নাভিমূলে (পশ্চাতে মেরুদণ্ডে) আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠবংশে রজ্জুবৎ থাকিয়া মস্তকে বৃহৎ হইয়াছে। সুষুম্নার ভিতরে এক রন্ধ্র (central canal) আছে, তাহা মস্তকে বড় বিবর হইয়াছে। এই বিবর, ব্রহ্মরন্ধ্র (the

* এই টীকার প্রথম অংশ ১৩২৪ সনের প্রতিভার মাঘ সংখ্যায় ৪১১ হইতে ৪১৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ventricles of the brain)। এই তিন নাড়ী কেবল স্নায়ু বা তন্তু (fibres) নহে। ইহাদের স্থানে স্থানে গ্রন্থি (ganglion) আছে। ইড়া পিঙ্গলা এইরূপ দুই বহু-গ্রন্থি স্নায়ু। গ্রন্থি-স্থানে তিন নাড়ীর শাখাদ্বারা যুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থিগুলি প্রায় অণ্ডাকার। এ কারণ নাম কন্দ, ও কন্দ। কন্দ (যেমন পুষ্ট কচু) হইতে শিকা (জটাকার মূল) বহির্গত হয়। এই সাদৃশ্য নাভি কন্দেও শিকড় বহির্গত হয়। এই সাদৃশ্য নাভি কন্দেও আছে। ইহার শিকা, শাখা-নাড়ী। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে থাকিয়া যেমন দলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, নাড়ী কমলেও মধ্যে কর্ণিকা, চারিদিকে শাখা-নাড়ী। ইহার এক নাম, চক্র আছে। চাকার নাভী হইতে যেমন অর বহির্গত হইয়া পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, দেহেও সেইরূপ নাড়ীচক্র (systems of nerve-centres with branches) আছে। নাড়ী চক্রের নাভীতে কন্দ বা কমল; তাহার অরগুলি নাড়ী, দেহের পরিধি (periphory) পর্য্যন্ত গিয়াছে। দেহে অনেক নাড়ীচক্র আছে। তন্মধ্যে ছয়টি প্রধান। এক এক চক্রে একের অধিক কমল থাকিতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান কমল যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ছয় চক্রের দল সংখ্যা ৪৯। অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ (symbols) দ্বারা এই ৪৯ দলের নাম (যেমন বং রং হং ইত্যাদি)। এই ঊনপঞ্চাশ দল দিয়া ঊনপঞ্চাশ 'বায়ু' বা 'স্রোত' (nervous current) গমনাগমন করে। পায়ু-মূলে প্রথম চক্র, মূলাধার চক্র (sacral ganglia)। ইহার দল চারিটি। এখানে ক্ষিতিমণ্ডল; দেবতা ব্রহ্মা। ক্ষিতি যেমন অনন্ত সর্পের উপরে অধিষ্ঠিত, সেইরূপ আধার-চক্রে কুণ্ডলিনী মহাশক্তি সার্দ্ধত্রিবৃত্ত (সাড়েতিনফের) হইয়া সুষুম্নার দ্বার রোধ করিয়া, নিজের পুচ্ছ নিজের মুখে প্রবিষ্ট করিয়া শুইয়া আছেন। পাশ্চাত্য শারীরবিদ্যায় সার্দ্ধত্রিবৃত্ত কুণ্ডলীভূত কিছু পাওয়া যায় না। বোধ হয়, রূপকমাত্র। কুণ্ডলিনী, মহাশক্তি, life force সুতরাং আকার থাকিতে পারে না। সুষুম্নার নিম্ন প্রান্ত নাভি কন্দে। সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি (যোগশাস্ত্রের মতে) অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।) দ্বিতীয়চক্র লিঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠানচক্র (lumbar ganglia)। ইহা ষট্‌দল, জল মণ্ডল। এখানে বিষ্ণু দেবতা। তৃতীয়, দশদল মণিপুর চক্র নাভিমূলে (অর্থাৎ যেখানে নাভি তাহার পশ্চাৎ মেরুদণ্ডে) এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে)। মণিপুর চক্রের (similunar ganglia) বিশেষ নাম কন্দ, নাভিকন্দ (bulb at end of spinal cord)। কারণ এখানে সুষুম্না কন্দাকার ধরিয়াছে। এখানে তেজো-মণ্ডল (অগ্নি); দেবতা রুদ্র। চতুর্থ, হৃদয় স্থানে দ্বাদশ দল অনাহতচক্র (thorasic ganglia)। এখানে বায়ুমণ্ডল, দেবতা ঈশ্বর। পঞ্চম, কণ্ঠস্থানে বিশুদ্ধ চক্র (cervical ganglia)। ইহা ষোড়শদল। এখানে আকাশমণ্ডল। এই আকাশে সদাশিব পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ষষ্ঠ, ভ্রূমধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র (the medulla oblongata with the cerebellum)। ইহার অপর নাম আজ্ঞাপদ্ম, আজ্ঞাপুর চক্র। এখান হইতে ইড়া পিঙ্গলার উৎপত্তি। নদীর সহিত উপমিত হইয়া বরণা ও আস, কিংবা গঙ্গা ও যমুনা নাম পাইয়াছে। বরণা ও অসির মধ্যে বারাণসী, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে প্রয়াগ। সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহা অপরাবৃত্তি দ্বারা বাম হইতে দক্ষিণে, এবং দক্ষিণ হইতে বামে গিয়া (by decussation) নিশ্বাসরূপে বাম নাসায় গঙ্গা এবং দক্ষিণ নাসায় যমুনা বহিতেছে। আজ্ঞাচক্রে মনের স্থান। এই ছয় চক্রের ঊর্দ্ধে সহস্রদল কমল বা সহস্র-অর চক্র (the cerebrum)। এখানে ব্রহ্মরন্ধ্র এবং এখানে চিদানন্দ-স্বরূপ পরমশিব অধিষ্ঠিত। জীবের বিশেষ স্থান এই। এখান হইতে ইড়াপথে সুধা (cerebro-spinal fluid) নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে। এই কারণ ইড়ার দেবতা চন্দ্র। মূলাধারে পিঙ্গলার মুখে বিষ ক্ষরিত হইতেছে। অতি তাপন বিষ বলিয়া পিঙ্গলার দেবতা সূর্য্য। নাভিকন্দে অগ্নি থাকিয়া ভুক্ত অন্নাদি পাক করিতেছেন। এ কারণ সুষুম্নার দেবতা অগ্নি। এইরূপ ক্ষিতি অপাদি পঞ্চমণ্ডলের কল্পনার মূল আছে। এখানে সে সব অনাবশ্যক। আশ্চর্য্য এই, আয়ুর্ব্বেদ

যোগীর আবিষ্কৃত তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই, সহস্রদল কমলে বুদ্ধি বা চৈতন্য স্থান না বলিয়া হৃদয়ে বলেন। সংক্ষেপে (যোগশাস্ত্রের মতে) প্রাণ ও অপান বাত দ্বারা জীবন রহিয়াছে। জীব এই দুইএর (repair & waste) বশে কোথাও স্থির হইতে পারে না। ভূমিতে আক্ষিপ্ত কন্দুকের (ball) ন্যায় উচ্ছলিত (reflected) হইতেছে। যোগশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার এই যে, সাধন (practice) দ্বারা নাড়ী বিশেষে বাত (nervous energy) চালিত করিতে পারা যায়, কোন নাড়ীকে জাগ্রত (active) কোন নাড়ীকে নিদ্রিত করিতে পারা যায়। আসন, বিশেষতঃ মুদ্রা (আসন ভেদ) এবং প্রাণায়াম, এই তিন সাধন প্রধান। বলা বাহুল্য, সাধন মাত্রেই গুরু-উপদেশ চাই। প্রাণ লইয়া সাধনে গুরু ঈশ্বরতুল্য বই আর কি। এখন মীনচেতন অনুসরণ করি।

২৬।১॥ ইঙ্গুলা পিঙ্গুলা—ইড়া স্থানে ইঙ্গলা নাম পিঙ্গলা নামের সাদৃশ্যে আসিয়া থাকিবে। কিন্তু এইরূপ বিকৃত নাম হইতে বুঝিতেছি, কবি শিক্ষিত ছিলেন না। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী বা নালী বলিয়া তাহা দিয়া বাত-প্রবাহ (nervous current) গমনাগমন করে বলিয়া, নদীর সহিত তুলিত হইয়াছে। ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, সুষুম্না সরস্বতী (অন্য নাম বালরণ্ডা)। এই তিনের সঙ্গম, ত্রিবেণী। মীন চেতনে অপভ্রংশ ত্রি-পি-নী। বাত-প্রবাহের উজান-ভাটা সম্পাদন যোগসাধনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু প-ব-ন নামে উক্ত হইয়াছে। প-ব-ন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা বাতপ্রবাহ ইচ্ছা মতন সংযত করিতে পারা যায়। মধ্যরাত্রে প্রাণায়ামের পূরক করিবার সময় হাত দিয়া কান বন্ধ করিলে নানাবিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নির্জ্জনে নিঃশব্দ স্থানে এই সকল ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। উজানের সেরে মাপি—? বোধ হয় পাঠ অশুদ্ধ। অমনাগমনা গমনা-গমনা। আনা-গনা। বিরোগ—বিশেষরূপে রোগগ্রস্ত। বি উপসর্গের অদ্ভুত প্রয়োগ। ব্রহ্মযোগে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। জ্ঞাননাথ—কোন যোগাচার্য্যের নাম। বোধ হয়, আদিনাথ শিব। দশমী দ্বার—এই দেহ একস্তম্ভ নবদ্বার গৃহ। নবদ্বার প্রসিদ্ধ। ভুলে দশদ্বারা বোধ হয় দশ প্রধান নাড়ী গণ্য হওয়াতে দ্বারও দশ মনে হইয়াছে। শুক্রবারে বহে বারি—দিবারাত্রিভেদে, কোন কোন মতে তিথিভেদে, বাম ও দক্ষিণ নাসা দিয়া নিশ্বাস বহির্গত হয়। কিন্তু রবি-সোমাদি বারভেদেও যে হয়, তাহা স্বরোদয় শাস্ত্রের মত। যোগশাস্ত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রমান্বয় (periodicity) স্বীকৃত হইয়াছে। বার অনুসারে ক্রমান্বয় ফল জ্যোতিষের প্রভাব। ইহা প্রাচীন মত নহে। এখানে বলা হইয়াছে, শুক্রবারে বাম ও দক্ষিণ নাসা দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া নির্গমের সময় মিশিয়া যায়। ষোল কমল—বিশুদ্ধ চক্র। বিশুদ্ধ চক্রে মন-চোরকে বন্দী কর। শনিবারে—শূন্যে, আকাশ মণ্ডলে। পূর্ব্ব পার্শ্বে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া বাম নাসায় শেষ হয়।

২৬।২। য়াজ্জিতে—(য়াজ্জি=য়াজ্জ=আজ্ঞা=শক্তি—শ্রীক্ষিতি মোহন সেন) আর্দ্য মুল—আদি বা মূলাধার চক্র। য়াপে য়াপনা—আপে আপনা, আপনাকে আপনি। সাম করি—সাম্যভাব ধারণ করিয়া আপনাকে রক্ষা কর। কারণ দেহান্তে আগুনে দেহ দগ্ধ হইলে কেবল ছার ভস্ম মাত্র পড়িয়া থাকিবে॥ সসম্বিত স চৈতন্য হইয়া। শ্রীগোল্লা—শ্রী-শূন্যের? শূন্য নিরঞ্জনের? গোল্লা শব্দ নূতন। ক্ষেমাই—বোধ হয় ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা+আই মোতা)। কুল কুণ্ডলিনী যে ক্ষেমঙ্করী বা অভয়াশক্তি আছেন, তাঁহাকে অঙ্কুশ দিয়া (বোধ হয় যোগে আসন ও মুদ্রা এবং প্রাণায়ামের কুম্ভক দ্বারা) প্রবুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। ভূমণ্ডল আধার-চক্রে হস্তীর উপরে আরূঢ়। ইহা হইতে অঙ্কুশ মনে হইয়া থাকিবে। কুণ্ডলিনীকে জাগাইলে শক্তিলাভ হয়॥ উজানে রঙ্গ খেলে নৌকার বাইচ খেলে? যেন নহে কালি? পুথী এত অশুদ্ধ যে টীকা করা অসম্ভব। নাপিতের সিঙ্গায়—শৃঙ্গে যেমন রক্ত শুষিয়া লইতে পারা যায়, ইন্দ্রনাল—অন্ত্রনালী (intstinve) পথে জল শুষিয়া লইতে পারা যায়। ইহা যোগশাস্ত্রে অন্ত্রধৌতি, বস্তি ধৌতি নামে খ্যাত।

২৭।১॥ ফিরে জমকাল—ফিরে জম কাল, কালরূপ, মৃত্যু-
রূপ যম। অমৃতের ভাণ্ড—ব্রহ্মরন্ধ্রের সুধা, কুণ্ডলিনীর অভয়া শক্তিকে জাগ্রত করিয়া। বাউ ভর করি—প্রাণায়াম দ্বারা॥ কেনে কর সাজি—যোগভাব গ্রহণ কর? শুকুনাতে—দেহ শুকাইয়া ক্ষীণ করিয়া মন্ত্র ফাসা, মন্ত্র। কালকোট কালকূট, কালরূপ বিষ। রাগ বাইর—আহিরী মিনের আউতি—মীনের আয়ত্তি—সীমার নিকটে। ডুব ওড়িয়া আ-ড়-রে নিকটে।

২৭।২॥ দৈখহ বিদিত—দেখ বিদ্যমানে। তিনদিনে মৃত্যু দিত—গোরক্ষ কিন্তু এ সংবাদ পূর্ব্বে দেন নাই।

২৮।১। তোমাগ—তোমাগো, তোমাদের। গো বহুবচনে পূর্ব্বদক্ষিণবঙ্গে চলিত আছে! তোমরায়ে—নিতান্ত গ্রাম্য প্রয়োগ। (১৭) পোসার—উ-প-হা-র, পো-হা-র পো-সা-র।

২৮।২॥ সেত নেত—শ্বেতবস্ত্র, নেতবস্ত্র ও চামর, ইত্যাদি। কিন্তু সেত চামরে—নেতের চামর কখনও ছিল না। চামর অর্থে পাখা ধরিলে হইতে পারে?

২৯।১॥ হাড়িপা বাখান—এখানেও হাড়িপা সিদ্ধার উল্লেখ হইবার কথা। কৃষ্ণের নারী সত্যভামা ভেদি নিজ বাড়ি—হিন্দু কবির লেখা বোধ হয় না॥

২৯।২॥ কচুর সাগ—সুধা অন্নের যোগ্য ব্যঞ্জনই বটে! নিতান্ত গ্রাম্য। চকি—চৌকি। গায় দুখাএ—গা-কে দুঃখ দেয়। ফাড়া দোলা—ছেঁড়া ঝোলা। উলুস—উড়ুষ, ছারপোকা। ডুব—ওড়িয়া ও-ড়-শ। স, উ-দ্দংশ।

৩০।১॥ চাটে—চা-ট স,—প্রতারক যে পরকে ভুলাইয়া বিশ্বাস স্থাপন করায়। এ অর্থ এখানে হইতে পারে না। বোধ হয়, চাটু—মনোহর বাক্য যাহারা বলে। নদীয়ায় চে-টা-চেটী—প্রগল্ভ যুবতী। বোধ হয় চেটী—দাসী অর্থ॥ বইলে ডাকিয়া—মৃদঙ্গের ডাক না। কদলি রানিতে—কদলী বনেতে আসিতে। যুবতী দেখিয়া বেটা—গুরুকে পুত্র সম্বোধন! তাহাও তত দোষের হইত না, যদি উপহাস না থাকিত। এই 'রাগ আহীর' পয়ারটি মুসলমান কবির হইতে পারে॥

(৬৭) কুমিল্লার গ্রাম্য ভাষা। বাঃ সঃ

৩০।২॥ তেমনত—তেন মৃত॥

৩১।১॥ মন ঘোড়া পোবন জিন—মনরূপ অশ্ব ও 'পবন' প্রাণবায়ু জয় কর। পানিকুট—জলের ফোঁট থাকিতে যে নৌকা খোলে।

৩১।২॥ ঝর-ঝর—জর-জর॥ পাথালিয়া আন—সমস্তটা কুকবির করিত্বের আনা॥ ঝুলি নিকলিল—ভুঁড়ি বাহির করিল! সমুদ্র হিন্দুল—সমুদ্র হিন্দোল। গড়াগড়ি বাহে—যদিও পথ ব-হা বলা যায়, মাটিতে বাহা অদ্ভুত প্রয়োগ। যা-হে হইলে ঠিক। ত ২০।২॥ পুত্রবধু—কোলের শিশু, তাহার বধু হইয়াছিল! আ হু-তি-আ—আবৃত্তি করিয়া। স;—আ-বৃৎ ধাতু হইতে আ বৃ-তি-আ আ-অ-ত্তি-আ আ-হ-তি-আ। ই পরে থাকাতে গ্রাম্য উচ্চারণে আ-হু-তি-আ অর্থাৎ আ-ও-ড়ি-য়া॥ মনে নাহি স্বরে—স্মরে॥

৩২।২॥ গুণত সতি—শ্রেষ্ঠ ও সৎ। পুরি কৈল দারি—বোধ হয়, চুরি (বা)+দারি ফল, চোরের কর্ম্ম, ডাকাতি॥ মুখে বর্চ্চে—মুখে বর্ষ, প্রস্রাব কর॥ না ঝরিল—না জরিল, জরাপ্রাপ্ত হইল। রবি শশী—ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ীর তেজ; বাম ও দক্ষিণ নাসার প্রাণ বায়ু। ইড়া দিয়া ক্ষরিত অমৃত পিঙ্গলার রবির তাপে শুখাইয়া যায়। ইহাতেই দেহে জরা আসে। যোগীরা ইহা প্রতিরোধ করেন, চির যৌবন ভোগ করেন। এখানে গোরক্ষ প্রশ্নচ্ছলে মীননাথকে যোগতত্ত্ব শিখাইতেছেন। মনুরায়—মুন্সী আবদুল করিম বলেন ইহা আর্বী ম-ন্-ব-রা শব্দ হইতে। কিন্তু কটক কলেজের আর্বীর প্রফেসার (মৌলবি কাদীর, এম, এ) বলিলেন আর্বীতে এরূপ শব্দই নাই। এরূপ শব্দ হইতেও পারে না। ম-ন-ব্‌-ব্-র শব্দ আছে, তাহার অর্থ, যাহা আলোক পাইয়াছে। এই শব্দ বাঙ্গালায় আসিলে ম-নু-রা হইতে পারে। লাক্ষণিক অর্থে আত্মাব (বিশেষতঃ সিদ্ধ যোগীর) দ্যোতক হইতে পারে। (যদিও প্রফেসার সাহেব স্বীকার করেন না)। তবে কেনে মনুরায় উড়িয়া জে জাএ—এখানে মনুরা কর্ত্তাপদে এ বা য় যুক্ত হইয়াছে। এই শব্দ যে জীবাত্মা অর্থে বসিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ছত্রে 'মনপোবন',

মন ও প্রাণবায়ু—থাকাতে স্পষ্ট হইয়াছে। মন ও প্রাণ মেলা বিস্তৃত তুলায় তুলা হইয়াছে বলিয়া রাজহংস যে জীবাত্মা তাহা উড়িয়া গেল। এই কারণে তোমার মৃত্যু হইতেছে। তখন মীননাথ উত্তর করিলেন, পরমহংস দূরে যায় না, নিরঞ্জনপুর যে সদাশিবের অধিষ্ঠানভূমি সেখানে ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে। শব্দার্থ বোঝা গেল, কিন্তু উত্তর-প্রত্যুত্তর গেল না। কারণ এখানে কবি নিজেই অস্পষ্ট॥

৩৩।১॥ এই দ্বিতীয় 'রাগ আহিরি'ও অস্পষ্ট। বাঘিণীর দুগ্ধ—ইত্যাদি হেয়ালীর ভাষায় রচিত। কবির যোগশাস্ত্র না বুঝিলে হেয়ালী ভেদ হইতে পারে না। হরনি—ধরনী? এখানে বোধ হয় অমৃতস্রাব উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা নাড়ী রূপ কাঠীতেই শুষিয়া লইল॥ মুড়ার উপরে—আমাদের দেহ গৃহ একস্তম্ভ নবদ্বার। এই স্তম্ভ-মুড়া-র উপরে ছেএ গাছি? (১৮) অন্য অন্য রূপক ভেদ করিতে অশক্ত হইলাম॥

৩৩।২॥ রাগ ও পালি—ভূপালী। এই পয়ারে কবি নিজের বিদ্যা-প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। তবে, 'তত্ত্ব জানিবা যদি গুরু মুখ' চিনিয়া লইতেও বলিয়াছেন। প্রধান উপদেশ, ব্রহ্মচারী থাকা, কদাচিৎ 'নিজ চন্দ্র' যে 'বিন্দু' বা রেতঃ বায় করিহ না॥ হইষ্ঠা-ভূয়িষ্ঠ, প্রধান। ভ লোপে অ,অ স্থানে হ॥ সাহাল,সয়াল—স-ক-ল—স-গ-ল—স-য়া-ল॥ (হিন্দি সহল=সহজ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন) নাল-নাড়ী॥ জলকুন্ডে বাসুকী—বোধ হয়, এখানে জলতত্ত্বে কুণ্ডলিনীর কার্য্য লক্ষ্য হইয়াছে॥ কায়া রহিয়া আছে—ইহার উত্তর কুণ্ডলিনী শক্তি॥ নিদ্রাতে চেতাএ—নিদ্রাকালে জী-ব

(১৮) মূলে যে অক্ষরটি ছে-র পরে আছে তাহা অস্পষ্ট, আমি এ বলিয়া পাঠ করিয়াছিলাম, মুদ্রাকর ভূত তাহা ত্র করিয়াছে। ছে এ অর্থ ছেও। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় ইহার অর্থ বৃহৎ খণ্ড। এখানে অর্থ বোধ হয় শরীরাংশ। মুড়া= মুন্ড তাহার নীচেই শরীরাংশের স্বাভাবিক স্থান। মুড়ার উপরে শরীরের স্থান বলিয়া বিরোধভাব কল্পিত হইয়াছে। শ্রীঃ সঃ।

মনকে কাম করায়, স্বপ্ন দেখায়॥ মন ও পবন কোথায় থাকে —যোগশাস্ত্রে মনের স্থান আজ্ঞা-চক্রে (centre of command)। যোগশাস্ত্রে দেহে উনপঞ্চাশৎ বা-ত আছে। দশটি প্রধান, তন্মধ্যে প্রাণঅপানাদি পাঁচটি আয়ুর্ব্বেদে আছে। অন্য পাঁচটির মধ্যে এক না-গ পবনের উল্লেখ মীনচেতনে আছে। ইহার কার্য্য উদ্গার॥

৩৪।১॥ এহি পঞ্চ প্র-কৃ-ত্তির স্থান—প্র-কৃ-ত্তি— প্র-খ্র-ত্তি—প্র-কৃতি। ক লোপে খ, হ আগম। যোগশাস্ত্রে দেহেই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-এই পঞ্চতত্ত্ব (principles) আছে। পূর্ব্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ কানের ভিতরে—অনাহত চক্রে সর্ব্বদা শব্দ উত্থিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, হৃৎপিণ্ডের শব্দ। বাম পার্শ্বে শুইলে সে শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এই নিত্য শব্দ ব্যতীত ঘণ্টাদির শব্দ যোগীর প্রত্যক্ষ হয়। দেহের বায়ু আকাশ মণ্ডলে উপস্থিত হইলে ঘণ্টাদি সিদ্ধি হয়। হাসিয়া যে গোর্ক্ষনাথে—এখানে আবার নূতন যোজনা। কারণ গোর্ক্ষনাথই এতক্ষণ প্রশ্ন করিতেছিলেন। তাঁর শিষ্য— পঞ্চতত্ত্ব সিদ্ধ, যিনি ইচ্ছামতন এক এক তত্ত্বের উদয় ঘটাইতে পারেন। শ্বাসের গতি, পথ ও বেগ লক্ষ্য করিলে কখন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্বরোদয় শাস্ত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। হাসিয়া ফেলিল গোর্ক্ষে—পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশে মীন-নাথ অসমর্থ হইলে গোর্ক্ষনাথ গুরুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন, "গুরু, তুমি যে সদাশিবের অংশ, তাহা কি ভুলিয়া গেলে?" কেবল মীননাথই যে শিবের অংশ, তাহা নহে; জীবমাত্রেই তাঁহার বিকাশ॥ অজপা—যে মন্ত্র জপ করে না, জানে না, সে অ-জপ। অ-জপ হইলেও সকলেই, জীবমাত্রেই হংস মন্ত্র সর্ব্বদা জপিতেছে। প্রাণবায়ু বহির্গমনে 'হ' এবং অন্তর্গমনে 'স' দুই মিলিয়া হংস=মন্ত্র। এই হংস মন্ত্রই অজপা গায়ত্রী নামে খ্যাত। এই গায়ত্রী যোগীর মোক্ষদায়িণী। দিবারাত্রির মধ্যে ৬০ দণ্ডে ২১৬০০ বার হংস মন্ত্র জপ করা হইতেছে। অতএব প্রতিদণ্ডে ৩৬০ বার,"মিনিট"

কালে ১৫ বার। একবার শ্বাস প্রশ্বাসের কালকে জ্যোতিষে এই কারণে প্রা-ণ বলে। পঞ্চম শব্দ—পঞ্চ শব্দ। (তু দশ স্থানে দশমী দ্বার)॥ ঘণ্টা-কাংস-তুরী-ভেরী-মৃদঙ্গ। * কিন্তু এই পাঁচের নির্ণয় নাই। যোগীর সাধনাভেদে বংশীধ্বনি, ভ্রমরগুঞ্জন প্রভৃতি নানা শব্দ শ্রবণগোচর হয়। অষ্টমেত… অনল—অশক্য। জল আর আকাশ সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন হইয়াছে। নবমেত-ন-ব-ম-ন-অ-ম।

৩৪।২।। দশমে, নিদ্রায় বুদ্ধি। প্রতি-প্রতিনিধি; জীব। জাহার ভুবন—ভবন। জমিলা—জন্মিলা বা জমিলা। খোদশিলা—"খোদা" সিলো? খোন্দা ও স্ব-য়-ম্ভু, অর্থে একই। বোধ হয়, শি-ব অর্থ। (খোদশিলা=মূলধাতু। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন) বিংশে কহ—ম-মু-রা-র হইবে। (১৯) ময়ূরা—আত্মা। সাধন বিশেষে চন্দনাদির গন্ধ অনুভূত হয়। এক—ব্রহ্ম, এয়োবিংশে। আ-চি-ন— চিহ্নিত জন, আত্মা বা পরম শিব। (অ অনাবশ্যক স্বার্থে। তু ২৩।১)। আখার—আ-কা-র; আদ্যাশক্তিই সাকার হইয়া ঘরে ঘরে জায়া মাতা ও পুত্র হইয়া আছেন। পরের উত্তরে ইহা ভা-ব নামে উক্ত হইয়াছে।

৩৫।১॥ অমাবস্যার চন্দ্র—অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্য মিলিত হইয়ামাত্র পৃথক হয়, স্বরোদয় শাস্ত্র মতে সে তিথিতে বাম নাসায় চন্দ্রনাড়ীর ও দক্ষিণনাসায় সূর্য্যনাড়ীর প্রবাহ হইয়াই প্রতিপদ্ তিথিতে চন্দ্রনাড়ীর অর্থাৎ বামনাসায় শ্বাস আরম্ভ হয়। প-ব-নের নাম এই শাস্ত্রে স্ব-র। স্বরোদয় শাস্ত্রে জ্যোতিষ ফল গণনা প্রবেশ করিয়াছিল। পঞ্চতত্ত্বের পাঁচ অধিপতি কল্পিত হইয়াছিল। দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহের সময় অনিলতত্ত্বের অধিপতি রাহু হয়েন। শনি মঙ্গল সূর্য্যের ন্যায় রাহু পাপগ্রহ। কোথাএ বৈসএ শিব কোথাএ শকতি—ইহার চারি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। (১) ইড়াতে শক্তিরূপ চন্দ্র, পিঙ্গলাতে শিবরূপ সূর্য্য প্রবাহিত হইতেছেন। (২) শ্বাস নির্গমে যে 'হং' তাহা শিব এবং শ্বাস প্রবেশে যে 'স', তাহা শক্তি। (৩) ইড়াতে চন্দ্র, পিঙ্গলায় সূর্য্য, এবং সুষুম্নায় হংসরূপী শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। (৪) সহস্রদল কমলে হংসরূপী শিব, এবং চতুর্দ্দল কমলে (মূলাধার চক্রে) কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। এই শেষোক্ত উত্তর এখানে লক্ষ্য হইয়াছে। কল্পনা করে—ম-না-রা—অ-না-রাগ, কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি। (কুল-দেহের যে শক্তি-যাহা হেতু দেহের স্থিতি গতি, সেই শক্তি অনাত্মা)। ক-রে ক্রিয়ার কর্ত্তা তুমি উহ্য। তুব (তুমি) 'না জানে দেশের ব্যবহার'। (১২।২)। ছায়ার কারণ—দেহরূপ ছায়া, শক্তি বা মায়া বা প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। কিংবা শিব শক্তির আবির্ভাব। আজপা— অজপা, হংস গায়ত্রী। পঞ্চজীব—প্রশ্নে এবং পরে উত্তরে পঞ্চবাদ্য লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, জীব পাঠ ভুল। তিনকোটি টঙ্গী—উচ্চস্থান বা দ্বীপের সহিত দেহের নাড়ীর উপমা। কিন্তু যোগশাস্ত্রে প্রায়ই ৭২ হাজার গণিত হইয়া থাকে)। খেমাই—পূর্ব্বে (২৬।২) ক্ষেমাই বানানে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষেমঙ্করী কুল-কুণ্ডলিনী। সুষুম্নার মুখ ইনি রোধ করিয়া আছেন। এই দ্বার উন্মুক্ত করিতে না পারিলে যোগ বৃথা। অতএব এই প্রহরীকে দ্বার-ত্যাগ করাইতে হয়। রবির ঘরে শশী—পিঙ্গলা স্থানে ইড়ার প্রবাহ, দক্ষিণ নাসার শ্বাসের সময়ে বামনাসায় সকল প্রবর্ত্তন, করিতে পারিলে যোগসাধন সার্থক। স্বর্ণপুরী যোগী—মূলাধারচক্রের মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকার কামাখ্যা পীঠ আছে। ইহাতে সুষুম্নাদ্বারের সম্মুখে স্বয়ম্ভু মহালিঙ্গ আছেন। পঞ্চমে নিত্য তাল, নাদ। তখন নিজ ঘরে চু-লি—চলি (?) যাইবে, ব্রহ্ম ধ্যানে বসিবে।

৩৫।২॥ রূপ রেখ নাহি তার আকার উকার। দেখিতে না পারে—কর্ত্তা তুমি উহ্য। তিনগুণ—ত্রিগুণাত্মক শিবতুল্য

(১৯) আমি শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম মহাশয়ের উত্তরে নানাবিধ যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছি যে শব্দটি মমুরা নহে, ময়ূরার। বোধ হইতেছে যোগেশবাবু আমার বক্তব্য প্রণিধান করেন নাই। এখানে যদি মমুরা শব্দের সম্বন্ধে ষষ্ঠী করিয়া ময়ূরার হয় তবে ইহার পাঁচ ছত্র পরেই যে ময়ূরার আছে তাহার ব্যাখ্যা কি? শ্রীঃ সঃ।

গুরু জানিবে। গুরুর সেবা মাথে—গুরুর চরণ মাথায় রাখিলে। সেবা—যাহার পদের সেবা করা হয়। চমক পাথরে—চকমকী পাথরে প-লা-ক (ফা পৌ-লা-দ) ইস্পাত ঠুকিলে যেমন অগ্নি নিকলে, তেমন। অষ্টমে, যাবৎকাল দেহে বায়ু স্থির থাকে, তাবৎকাল দেহকে জীব ত্যাগ করে না। ইহা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইল না। নবমে, সমাধিকালে সুগন্ধি বায়ু বহিতে থাকে। জিবন—বিজন ব্যজন। দশমে,শরীর স্থিতকারক যে প্রাণ, তাহা মনেতে মিশায়। শরীর ধ্বংস হয়, অনলে অনল, জলে জল মিশায়, কিন্তু ধন যে জীব তাহা তৎ-বিকার থাকে। থাকেতে মাটিতে দেহ-মৃত্তিকা মিশিয়া যায়।পঞ্চভূতদেহ পঞ্চভূতে মিশায়। এখানে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-এই তিনের মাত্র উল্লেখ আছে। খাক ফার্সী, বাঙ্গালাতে ভস্ম অর্থে প্রচলিত। সেই কথা ভস্ম-ছা-লি—ভস্ম-ছার—ভস্ম-ক্ষার শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। মনরূপ অশ্বের বল্গা দৃঢ় ধরিয়া দেহ-রথ সারিবে, রথবেগ সংযত করিবে, যে রথে জীবরূপ হংস বিচরণ করিতেছেন। প্র-ব-ন, রথের নিঠুর সারথি, সর্ব্বদা বহিতে থাকে ; ফুরাইয়া গেলে পরমহংস জীব ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান। শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। চিত্ত স্থির হইলে প্রণবমন্ত্র শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশে যাহার ঘটে-দেহে যেমন নারায়ণ তাহার তেমন বুদ্ধি তেমন মতি। এখানে কিন্তু যোগের ভাব। ছাড়িয়া না-রা-য়-ণ আসিয়াছেন। শিবসংহিতায় নারায়ণ আছে।

৩৬।১ ॥ ত্রয়োদশে—এখানে বোধ হয় ব্র-হ্মা শব্দ ঠিক বসে নাই। অথবা, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী (যেমন ইচ্ছাশক্তি রৌদ্রী, জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী, প্রণবের ত্রিধাশক্তি) দেহের ক্রিয়াশক্তি প-ব-ন ভর করিয়া ঊর্দ্ধদিকে সুষুম্না-নাড়ী দিয়া ভিতরে চ-ল-এ (ব-ল-এ, ভুল)। (২০) তখন (নাকি) চর্ম্মের চলন-বৎ, চর্ম্মের কম্পনবৎ অনুভব হয়, অশ্বথপত্রের ন্যায় নাড়ীর কম্পন হয় (Like a wave the impulse travels upwards.)। কুণ্ডলিনী-শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে গিয়া শিবের সাক্ষাৎ পায়, উভয়ে মিলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে রত হয়, সমাধি হয়। ম-না-র—মন্দুরা-র প্রহরী মন থাকে (?), যেমন নাগ-পবন (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত) প্রধান হয়। (অর্থ বুঝিলাম না)। সমাধির পর নাগ-বায়ু ? চৈতন্য করায়। চতুর্দ্দশে, জল লোহু শরীর—লৌহ হইতে পারে না, (২১) লো-হ (রিং-শোণিত) হইবে। রেতঃ—জল,ও রজঃ মিশিয়া শরীর। যোগশাস্ত্রে রেতঃ বিন্দুসংজ্ঞা পাইয়াছে। যে যোগিনী, তাঁহার রজঃ নাশ হয় না ; এইরূপ যে যোগী, তিনি বিন্দুকে দেহমধ্যে রক্ষা করেন। করিলে দেহে নাদ উৎপন্ন হয়। চন্দ্ররূপ বিন্দু এবং সূর্য্যরূপ রজঃ-সংযোগে গর্ভ হয়। সে সময় ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না ভেদ করিয়া জী-ব গর্ভে প্রবেশ করেন। পঞ্চদশে, অগ্নি রাহু পৃথিবী—রাহু শব্দ (২২) অন্য পরিভাষা বোধ হয়। বোধ হয় জল হইবে। স্বরোদয়ে আছে, দিবারাত্রির মধ্যে পিঙ্গলার দক্ষিণ নাসার বহন কালে ক্ষিতি জল ও অগ্নি-তত্ত্ব উদিত হইলে স্ত্রী পুরুষের সংযোগে পুত্র জন্মে। জলেত জন্মিল কায়া—জলতত্ত্বের উদয়ে কায়া ? বোধ হয়, জরায়ুর জলে জন্মিয়া মূলে নাভিমূলে গর্ভ স্থির হয়। আ-উ-ট—আণ্ট। "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে"ও আ-উ-ট, "শূন্য পুরাণে" আ-ই-ট আছে। আট রাত্রিতে আট দিনে চন্দ্রনাড়ীর ক্রিয়াতে শরীর। স-ষা-ন—স-য়া-ল সকল। সু-জন—সু-ঝ-ন, শু-ধ-ন। য স্থানে ঝ, ঝ স্থানে জ। ষট্দশে, উত্তর নাই।

৩৬।২ ॥ সপ্তদশে, বোধ হয় 'খোদাসিলা' প্রশ্নের উত্তর,—দিগম্বর, শিব। কিন্তু সি-বে না হইয়া সি-ব, এবং সর্ব্ব-জ-নে হইবার কথা। অষ্টাদশে প্রশ্ন নাই।

(২০) ঠিক। মূলে চলএ ই আছে। ছাপার ভুলে ব হইয়াছিল। মীঃ সঃ।

(২১) লোহ ছাপার ভুল। মূলে শব্দটী লোধ বা নোধ পড়া যায়। মীঃ সঃ।

(২২) মূলে বাহু আছে। বায়ুর রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। মীঃ সঃ।

অর্থে—পূর্ব্বে অনেক প-ক্ষ পাওয়া গিয়াছে। কোন্ পাক? বিনন্দ—বি-নো-দ। না ভা-বি-য় মাগ। ঘরের ঘরণী ম-ন—ম-নু-রা, আত্মা বা জীব। বিকাশ উপরে —বিকাশ শব্দের অনেক অর্থ আছে। এখানে দুইটা অর্থ সঙ্গত। (১) পথ—সুষুম্নার উপরে। (২) আকাশ, স্বর্গ—ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরি স্থানে। একতন্ত্রমতে সুষুম্নার মধ্যে চি-ত্রি-নী নাড়ী আছে। ইহার ঊর্দ্ধদেশে চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের স্থান। এখানেও ম-ন—ম-নু-রা অর্থে। একবিংশে, ব্রহ্মস্থান বৈকুণ্ঠ। সেখানে সুগন্ধি চন্দনগন্ধ পাওয়া যায় (সমাধিকালে), আত্মাচৈতন্য ম-ন বা ম-নু-রা সুখে বিচরণ করেন। দ্বাবিংশে, ম-নু-রা 'কাজল কোঠায়' যায়, কারণ মন তখন নিশ্চল থাকে। ত্রিবিংশে, গর্ভ-ভ্রূণ মধ্যেই দেহী যে আত্মা, তিনি থাকেন। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—তিনদেব, বোধ হয় পর-মাত্মা, জীবাত্মা ও শক্তি। ভাল বুঝিতে পারিলাম না। রজ পূজ জল মিন—রজঃ ও রেতঃ, রজঃ জলস্বরূপ, তাহাতে শুক্রবীজ মীন। আঁখির পলকে কৈল রাত্রি দি-ন।

৩৭।১। সহস্রদলেত—সহস্রদল কমলে কুণ্ডলিনী মহাশক্তির বিকাশ হইলে তাঁহার সহিত জী-বাত্মার মিলন হয়, বৈষ্ণবীভাষায় রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যোগ হয়। ভ্রমররূপী জীব শক্তিরূপী পুষ্পের মধু পান করেন। মিলনের ফলে পুত্রের জন্ম হয়, তখন অনাদিনী জগৎজননী পুত্রকে দুগ্ধ পান করান। (এখানে পুথী অশুদ্ধ বোধ হয়। দে-খি—দেন, বু-লি—বো-লে-ন্ত হইতে পারে।) কিন্তু সহস্রদল কমলে নূতন জীবের আবির্ভাব হইলেও কায়াদি অন্যস্থানে উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া যোগীরা বলেন, সহস্রার হইতে ইড়াপথে নিয়ত অমৃতস্রাব হইতেছে, যাহার ফলে দেহ জীবিত থাকে। (পঞ্চবিংশ প্রশ্নের উত্তর নাই।) ষষ্ঠবিংশ, রাহুভেদ। রাহু পারিভাষিক বুঝিলাম না, পূর্ব্বেও (২৩) বুঝিতে পারি নাই। সপ্তবিংশে, মন ও প্রাণের উৎপত্তি আকাশে। যোগ-শাস্ত্রের মতে কণ্ঠস্থানে বিশুদ্ধচক্রে আকাশ মণ্ডল। এখানে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। এইখানে প্রাণ। ভ্রূমধ্যে যে আজ্ঞাচক্র আছে, সেখানে মনের স্থান। অর্থাৎ আকাশ মণ্ডলের প্রাণের ঊর্দ্ধে মনের স্থান। মীনচেতনে দুই স্থান এক বলা হইয়াছে। জলমণ্ডলে কায়ার উৎপত্তি বটে, কিন্তু মনের উৎপত্তি আকাশমণ্ডলে। আকাশমণ্ডলের চন্দ্রই মন, বলা হইয়াছে। সে মন সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত। অষ্টবিংশে, মন উন্মত্ত হইয়া,বিষয়ভোগ বাসনায় মুগ্ধ হইয়া পাপ করে; সে পাপ কিন্তু দেহী যে জীব তাহাকে স্পর্শ করে না। নববিংশে, ব্রহ্মাণ্ডে বা ব্রহ্মপুরে সহস্রদল কমলে সদাশিব, জীবাত্মা বাস করেন; আর দেহের যে শক্তি যাহার দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়, তাহা মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনীরূপে থাকেন। ব্রহ্মপুর ঊর্দ্ধে যেন স্বর্গে, আর মূলাধার নিম্নে যেন পাতালে। ইহার পরে পুথী পুনঃ পুনঃ প্রক্ষেপ-পূর্ণ হইয়াছে। প্রশ্ন অনুসরণ না করিয়া উত্তর বোঝা যাউক। ত্রিবিংশে, দেহ দেবের দুর্ল্লভ, কারণ শিব ও শক্তির কিঞ্চিৎ ভেদ নইলে দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না। উৎপত্তির পর প-ব-ন যে বা-ত প্রবাহ, তাহা দ্বারা রক্ষিত হয়। নব-বিংশের উত্তরের প্রশ্ন পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। এই উত্তর পূর্ব্বের পরে আছে. পূর্ব্বেও (২১।২) একবার গিয়াছে। চারি চন্দ্র কি, এবং কোথায়, এই প্রশ্ন যেন ঠকানিয়া হেঁয়ালী হইয়াছে। যোগশাস্ত্র হইতে এই চারি চন্দ্র খুজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। রূপকে এত চন্দ্র আসিয়াছে যে বর্ণিত চারি চন্দ্র অনায়াসে বলিতে পারা যায়। কিন্তু আদিচন্দ্র, নিজচন্দ্র, উন্মত্ত চন্দ্র ও গ-ড়-ল চন্দ্র, এই এই বিশেষণ পাওয়া যায় না। অতএব ব্যাখ্যা কতকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন হইতেছে। "আদিচন্দ্র গুরুমুখে জানিতে হইবে। ইহা জল বিম্ব-প্রায়। ইহা মৃত্যুকালে শেষে ঊর্দ্ধপথে বহির্গত হইয়া যায়।" অতএব আদিচন্দ্র জীবাত্মা। যোগ শাস্ত্রে বলে

(২৩) এখানে 'কন্ত রাহুই মূলে আছে। মীঃ সঃ।

স্বযুম্নার উর্দ্ধদেশে এই চক্রের স্থান। নিজ চন্দ্র আগে চলে তার পাছে মন, "নিজ চন্দ্র জা-নি-য় যে রহিছে পরান।" অতএব নিজচন্দ্র, প্রাণ। বোধ হয়, কণ্ঠস্থানের বিশুদ্ধ চক্রের চন্দ্র লক্ষ্য হইয়াছে। "উন্মত্ত চন্দ্র দেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছে। আগে নিজচন্দ্র প্রাণ, পরে উন্মত্ত চন্দ্র-মন।" অতএব উন্মত্ত চন্দ্র, মন। গ-ড়-ল, না গ-র-ল ? (২৪) বোধ হয়, গ-র-ল ; কারণ, "গ-ড়-ল চন্দ্র পাণ করিয়া" যোগীরা যোগ সিদ্ধ হয়েন (২২।১), "গোরক্ষ নাথ গ-ড়-ল চন্দ্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন," উন্মত্ত চন্দ্রের সহিত গ-ড়-ল চন্দ্রও চলে।" অতএব গ-ড়-ল নহে, গ-র-ল। অনেকে গ-র-ল উচ্চারণ করে গ-ড়-ল। গরল চন্দ্র, কম। অতএব চারি চন্দ্রে জীবাত্মা, প্রাণ, মন, ও কাম ব্যক্ত হইয়াছে। জীবাত্মা গুরুমুখে জ্ঞাতব্য, গরল চন্দ্র যোগীর ভক্ষ্য। নিজচন্দ্র প্রাণ (প-ব-ন) সমাহিত করিয়া উন্মত্ত চন্দ্র মনকে বশীভূত করিতে হইবে। বিকাশ উৎপন্ন যেন মুদিত সন্ধান—নিজচন্দ্র বা প্রাণ বিকাশে আকাশে স্থিতি করে, কিন্তু সন্ধান মিলন মুদিত মুদ্রিত, বিকশিত নহে। বিকাশ শব্দের বিপরীত্যে মুদ্রিত আসিয়া অসম্পত্তি অলঙ্কার হইয়াছে। ব্যোমমণ্ডলে প্রাণ থাকে বটে, কিন্তু দেহের সহিত যুক্ত। পলাইবার ঠাঁই—প্রাণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে, তথাপি জীবন থাকে।

৩৭।২॥ প্রাণ কানাইর বাঁশী রব কানে শুনিতেছে ; মনে করিতেছে, "কি জানি কি কৈল মোরে কানাইর মু-র-লী, হেন বুঝি জাতিকুল লৈয়া গেল হরি।" শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া গোপী যেমন 'ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর' করিত, প্রাণ ও শ্বাস প্রশ্বাসও তেমন করিতেছে যেন সহস্রার কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণের ওঙ্কার বংশীধ্বনি শুনিয়াছে (উৎপ্রেক্ষা)। বিংশে ম-স্থ-রায় স্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা হইয়াছিল। অতএব নি-দ্রার কারণ বায়ু আহার হইতে পারে না। পুথীতে ভুল। জীব, বায়ু ও জল আহরণ করিয়া স্থিত হয় ; [illegible] হয়, ইহা অভিপ্রায়। একবিংশে, দেহের কারণ পিণ্ডের শরীরের প্রাণ। চতুর্বিংশে, পঞ্চের পঞ্চভূতের সহিত মিশিলে দেহের বিনাশ হয়। তখন পঞ্চবায়ু প্রাণ-অপানাদি দেহ ত্যাগ করে ; তখন ধর্ম্ম ও অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি বিষয়ে ভাবনা থাকে না। মনের পরিচয় পাইলে মায়া-মোহ টুটিয়া যায় ; আত্মার পরিচয় পাইলে সংসার ঝুটা মিথ্যা বুঝিতে পাওয়া যায়। যাহার কায়াতে পরমাত্মার পরিচয় হয় নাই, সে অন্ধ। কিন্তু পরিচয়ও সোজা নহে, এক বিষম ধান্দা। পঞ্চবিংশে, শরীরের সার কথা কেহ বর্ণিয়া পা-র-স্তি পায় না। তবে, নাসায় বায়ুর বল, এবং ধর্ম্মে জ্ঞান বৈসে। (এখানে এবং আরও বহু স্থলে অধিকরণে এ, প্রতে)। হে গুরু তুমি বুঝিয়াও বু-ঝে (মধ্যম পুরুষ এ) না যে কর্ম্মসূত্র অখণ্ড, এই সূত্র ছেদনার্থে যোগে ভর কর, অন্য কোনো উপায়ে জন্মান্তর নিবারিত হয় না। সপ্তবিংশে, মনের বিচার ম-না-র, ম-স্থ-রা-র বিচার। অসার সংসার মধ্যে আত্মাই মাত্র সার। তিনি পূর্ব্বদিন নিরাকার আসমান আকাশের মতন ছিলেন, আধা জমিনের মতন কায়া ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু হায় নিঠুর প-ব-ন প্রাণ গমনাগমন করিয়া অস্থিমাংস ভক্ষণ করিতেছে, দেহের স্থিতিকাল অল্প করিয়া ফেলিতেছে। অতএব যদি বাঁচিতে চাহ, তবে নদীর পূর্ব্বকূল ত্যাগ করিয়া পশ্চিম কূলে ঘর বাঁধ, সেখানে শ্বাস স্থির করিতে পারিলে জীবন দীর্ঘ হইবে। যদি যম চিনিবে, তবে উর্দ্ধমুখ হইয়া বিপরীতকরী মুদ্রা দ্বারা দৃষ্টি ভারী করিয়া যমকে যোগের যম সংযমকে দৃঢ়রূপে ধর। নিরঞ্জনদেব কা-ন-খা মূলে, কর্ণকূপ (কান-কোআ) মূলে আছেন। ভিন্ন অন্য, কুণ্ডলিনী শক্তিকে আদেশ কর যেন নিরঞ্জন স্বামীর পার্শ্বে উপস্থিত হয়েন। এখানে সংক্ষেপে যোগ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দেহে যাবৎকাল বা-য়ু স্থিত হয়, জীব তাবৎকাল দেহে

(২৪) মূলে 'ড়' ই আছে। মীঃ সঃ।

করেন না। অতএব দেহে বায়ু নিরোধ করা যোগের প্রাণায়াম অঙ্গের প্রধান ব্যাপার। বায়ু বদ্ধ হইলে চিত্ত নিরাময় ও বিষয় বাসনা মুক্ত হয়, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা চক্রে আত্মাকে ধ্যান সম্ভবপর হয়। যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু কোথায়। যোগ শাস্ত্রে ও আয়ুর্ব্বেদে বায়ু, বা-ত, প-ব-ন মরুৎ প্রভৃতি শব্দের বিবিধ অর্থ আছে। বা-ত নাড়ীতে যে বায়ু প্রবাহ সঞ্চরণ করিতেছে, তাহা বাহ্য বায়ু প্রবাহের তুল্য বলিয়া উভয়েরই সংজ্ঞা এক হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রা-ণ বায়ু বলিলে কোথাও শ্বাস প্রশ্বাসের বাহ্য বায়ু, কোথাও এই বায়ুর চালক আন্তর বা-ত বুঝিতে হয়। কার্য্য কারণের অভেদ হেতু একটি দ্বারা অপরটিও সূচিত হয়। প্রাণায়ামে পশ্চিম কূলের বামনাসার বায়ু (air) শুভ, শিবপ্রদ। তেমনই ইড়া দিয়া যে বাত প্রবাহ (nerve current) চলে, তাহা অমৃত স্বরূপ। পিঙ্গলার সূর্য্য যেন ইড়ার চন্দ্রকে সর্ব্বদা অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, ইহাতেই আয়ু ক্ষয় হইতেছে। পিঙ্গলার প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া ইড়াতে প্রবাহ রাখিয়া কুল-দেহের স্নায়ুশক্তি (nervous energy) ঊর্দ্ধে নিরঞ্জনের ধ্যানে নিয়োগ করিতে পারিলে যমের ভয় কোথায় থাকে। দেখা যাইবে, মীন-চেতনে যোগের অষ্ট অঙ্গের,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এবং অপর মতে ছয় অঙ্গের, যথা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—সম্বন্ধে কিছু না কিছু উক্ত হইলেও পবন-বিজয়ই প্রধান পণ্য হইয়াছে। যমের মধ্যে একটি ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অহিংসা সত্য অস্তেয় (চুরি না করা) অপরিগ্রহও (দেহরক্ষার অতিরিক্ত ভোগ সাধন পরিত্যাগ) হইয়াছে, এই তিন বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। নিয়মের মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধান উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শৌচ সন্তোষ তপস্যা ও স্বাধ্যায় (প্রণবাদি মন্ত্রজপ) হয় নাই। বরং স্বাধ্যায়ের আবশ্যকতা বলা হইয়াছে, অন্যগুলির বলা হয় নাই। গোরক্ষ সংহিতা মতে যোগ ষড়ঙ্গ। মীনচেতনেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। আসনে ভর করিতে, এবং একস্থানে মুদ্রা (ঊর্দ্ধাসন) করিতে বলা হইয়াছে। প্রত্যাহার, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিমুখ করিতে উন্মত্ত চন্দ্রকে বশীভূত করিতে বলায় ইঙ্গিতে সারা হইয়াছে। ধ্যান, ধারণা, সমাধি যৎসামান্য কথিত হইয়াছে। যোগীজন, বিশেষতঃ হঠযোগী আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা প্রত্যাহার মানসবিকার নিবারণ করেন। প্রাণায়ামের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে ক্ষেমাই ও শক্তি এই দুই নামে উক্ত হইয়াছে। ক্ষেমাই, বোধ হয় ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা+আই, ক্ষেমা-মা। অতএব এক ম-ভু-রা, ম-না সংজ্ঞা ব্যতীত হিন্দুযোগ ও তন্ত্রের পরিভাষার অন্যথা পাই না। অন্যদিকে দেহে নবদ্বার পরিবর্ত্তে দশদ্বার, এবং নাগ-বায়ুর ক্রিয়া বিশেষ স্বীকার করাতে বোধ হইতেছে, লেখক যোগশাস্ত্র সমুচিত জানিতেন না। বিশেষতঃ ধারণা ধ্যান ও সমাধি উপেক্ষা করিয়া অণিমা-লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভকেই কাম্য করা হইয়াছে।

৩৮।১॥ এখন কালান্ত-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। যোগ-তত্ত্ব অপেক্ষা এখানে অনেক লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না। (১) নাভিতে জালিয়া দীয়া—? একমন হইয়া ছায়া—যদি নিদ্রাকালে স্বপ্নে দেখা যায় যেন কেহ দেহটা শূন্যে তুলিয়াছে, কিন্তু ছায়াতে মুণ্ড দেখা যাইতেছে না, তাহা হইলে মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। (২) কানে আঙ্গুল দিয়া কান বন্ধ করিলে শব্দ শুনা না গেলে সাতদিনে মৃত্যু। (৩) শব্দ ঘরে চিত্ত দিয়া চি-নে—শু-নে? শব্দ স্থির হইলে মৃত্যু। (৪) যে নিজের হাত দেখিতে পায় না, একাদশ দিবসে তাহার মৃত্যু। (৫) নানাযন্ত্র দেখে কিন্তু সূর্য্যের ছায়া দেখিতে পায় না, তাহা হইলে সেইক্ষণে মৃত্যু। (৬) বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা যদি দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তৃতীয়

দিবসে মৃত্যু। (৭) এঁককালে দুইপদ খঞ্জ বোধ হইলে। (৮) নাসিকার পার্শ্বের চক্ষু টিপিলে. জ্যোতির্ব্বিন্দু দৃষ্ট না হইলে। (৯) গ্রীষ্মে দেহশূন্য শূন্য বোধ হইলে। (১০) শূন্যে না থাকিয়াও শূন্যে থাকা বোধ হইলে। (১১) ক্রোধের কারণ না থাকিতেও ক্রোধ জন্মিলে। (১২) নিত্য ভ্রম হইলে। (১৩) স্বপ্নে গৃধিণী শকুনী মাংস খাইতে দেখিলে। (১৪) স্বপ্নে উট সারস পাখা সর্প দেখিলে। (১৫) কেহ সঙ্গে সঙ্গে আছে বোধ হইলে। (১৬) ব্রহ্মজ্যোতিঃ অদৃশ্য এবং রসনা শুষ্ক হইলে, অশুভ।

৩৮।২॥ আপনার মনে যদি—মৃত্যুলক্ষণে একপা কেন আসে? পুথী ভুল। (১৭) তা-ড়-ক মণ্ডলে—তা-র-ক মণ্ডলে (তুং প-র-ল—প-ড়-ল), চক্ষুর তারা দেখিতে না পাইলে; (কিংবা মৃত্তিকা তারা) (১৮) চন্দ্ররেখা কিংবা মহাপথ (ছায়া-পথ) দেখিতে না পাইলে। (১৯) দুই আঙ্গুলি চাপিলে? (২০) আদিচন্দ্রের আ-হ-লি—(আ-দ-র্শ? আ-কৃ-তি)? ভূমি মধ্যে (মূলাধারে)? না দেখিতে পাইলে। (২১) নাসাগ্র দেখিতে না পাইলে। (২২) শৃঙ্গারকালে ঘণ্টাধ্বনি শুনিলে। (২৩) দিবাতে উল্কাপাত দেখিলে। (২৪) ঘুমাইয়া কেহ গায়ে পড়িলে। (২৫) দিবাতে শীত রাত্রে উষ্ণ বোধ হইলে, একমাস পরে মৃত্যু। (২৬) নাভিদেশ সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকিলে। (২৭) কানের লতি (পাতা) কম্পিত হইলে, মৃত্যু। (২৮) এককালে দুইপদ অবশ হইলে, এক দিনে মৃত্যু। (২৯) মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে দুই চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। (৩০) এগার মাস পূর্ব্বে চোখে ঘোলা পড়ে। (৩১) দশমাস থাকিতে যম-রাজ কমল মাপেন? (৩২) নয়মাস থাকিতে শতদল কমল লয় করেন। (৩৩) আটমাস থাকিতে অনাদি-শিব ত্যাগ করেন। (৩৪) সাতমাস থাকিতে পা পিছলিয়া পড়ে, গতি স্থির হয় না। (৩৫) পাঁচমাস থাকিতে পা-ঙ-ব (পঞ্চতত্ত্ব)? প্রকাশিত হয় না। (৩৬) চারিমাস থাকিতে গগনে অগ্নি দৃষ্ট হয়। (৩৭) দশদিন থাকিতে শরীরের টানাটানি। (৩৮) নয়দিন থাকিতে নবদ্বার (এখানে দশ দ্বার নহে) ক্রিয়াহীন হয়। (৩৯) ছয়দিন থাকিতে এককালে ছয়ঋতু অনুভূত হয়। (৪০) পাঁচদিন থাকিতে দাঁতের পাটি পড়িয়া যায়? দাঁত কড়মড় করে, (৪১) চারিদিন থাকিতে নাসিকায় স্থ-র, (ফা) আলো থাকে না, নাসাগ্র দৃষ্ট হয় না। (৪২) তিনদিন থাকিতে শ্বাস কষ্ট হয়?

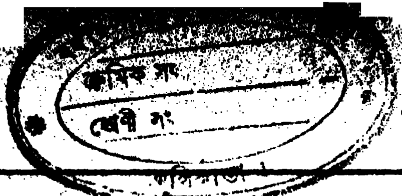
৩৯।১॥ (৪৩) দুই দিন থাকিতে 'চারিচন্দ্র' কা-জা-পে বৈসে সজাগ হয় (?); (৪৪) মৃত্যুর একদিন থাকিতে শমন নিকটে আসিয়া বসে। কালান্ত-লক্ষণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নোত্তর প্রক্ষিপ্ত। (২৫) কারণ 'উড়িল কদলি সব' বলিতে বলিতে এসব কথার সঙ্গতি নাই। এখানে যে সব মৃত্যু-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার কয়েকটা যোগ ও স্বরোদয়ে, আয়ুর্ব্বেদে মহাভারতে, ও শিব পুরাণাদিতে আছে, কিন্তু সব পাই না, বিশেষতঃ শেষেরগুলি পাই না। মুন্সী আবদুল করিম সাহেব বলেন, এসব কা-ল-ন্দ-রী যোগের অনুকৃতি। তাহা আমার অজ্ঞাত। আমাদের কলেজের আরবীর প্রফেসর বলেন, ক-ল-ন্দ-র (উপ-নাম) নামে এক মুসলমান মাত্র চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মিরাটে ছিলেন। তাঁহার আদি বাস পারস্য দেশে। সে দেশে মুসলমান স্থফি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইঁহারা অনেকটা বেদান্তীর তুল্য ছিলেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র হইতে স্থ-ফী সম্প্রদায়ের মত উৎপন্ন কিনা, সে বিষয়ে স্থিরতা হয়

(২৫) কালান্ত লক্ষণ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রশ্নোত্তর প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট ভিত্তি নাই। মীননাথকে সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ করিতে প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন ছিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যোগতত্ত্ব প্রচার ও প্রশ্নোত্তরের এক বড় কাজ। এই সকল পালা গ্রাম্যজনের আসরে গাওয়া হইত, গ্রাম্য কবি গ্রাম্যজনের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক পুঁথি বহির্ভূত বিষয়ও পালার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে বাধ্য হইতেন। বর্ত্তমান মাপ কাটিতে মাপিয়া এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা সর্ব্বদা নিরাপদ নহে। মীঃ সঃ

নাই। বোধ হয়, গ্রীস ও মিশর দেশ হইতেও অনেক মত জুটিয়াছিল। ইঁহাদের নানাভেদ ছিল; একদিকে সোহহং, ও ঈশ্বরে প্রেমভাব, অন্যদিকে নির্ব্বাণ। বিন্দুনাথের কৈল মন্ত্র আউতন—আ-উ-ত-ন = আ-ব-র্ত-ন —আ-ও-ড়-ন। এখানে অর্থ, মন্ত্রে দীক্ষা। মন্ত্রের ফলে বিশ্বাস, কিংবা মন্ত্র-জপ দ্বারা মোক্ষলাভের আশা তন্ত্রের মত, বেদের কর্ম্মকাণ্ডেরও মত। এমন হিন্দু নাই, যিনি মন্ত্রতত্ব অস্বীকার করেন। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম্মের (মহাযান) বিকারে তন্ত্রের উৎপত্তি, এবং তন্ত্র সেদিনকার যেন মাত্র সহস্র বৎসরের পুরাতন। ইহা অ-বিচারে, অ-প্রমাণে, বোধ হয় অজ্ঞ ইংরেজ লেখকদিগের কল্পিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সন ১৩১৭ সাল আশ্বিন মাসের সা-হি-ত্য-সং-হি-তা পত্রে ত-ন্ত্রে-র প্রা-চী-ন-ত্ব প্রবন্ধে সে কল্পনা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রুতি (বেদ)-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র, এই চারি শাস্ত্র দ্বারা হিন্দু-সমাজ শাসিত হইতেছে। এই চারি আ-গ-ম ও নি-গ-ম এই দুই নামে ব্যক্ত হইয়া থাকে। আ-গ-ম বেদ হইতে একদিকে স্মৃতি ও পুরাণ, অন্যদিকে নি-গ-ম তন্ত্র। তন্ত্র অর্থে system। আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র, জ্যোতিষ তন্ত্র, এমন কি সাংখ্য দর্শনও তন্ত্র আছে। তেমনই তন্ত্র অর্থে a system of worship and rituals-এক পূজার কাণ্ড, শিব শক্তির উপাসনা। এই অর্থ রূঢ় হইয়াছে। পূজা ও পূজকের সমীপ্য ও সাযুজ্য ঈশ্বরের উপাসনা। প্রকৃতি পুরুষের, মায়া-ব্রহ্মের, রাধা-কৃষ্ণের, কিংবা শক্তি-শিবের অভেদ জ্ঞান হিন্দুর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য। হংস-রূপী জীব জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই বিবিধ যোগদ্বারা ক্রমে সো-হং বলিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান না হইলে এই সামর্থ্য জন্মে না। এই উদ্দেশ্যে, স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিচারে সর্ব্ববিধ অধিকারীর যোগ্য করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি। ইহার এক অঙ্গ যোগ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। নাড়ীসোধন এই যোগের বিকাশ, সমাচার, দক্ষিণাচার, এই দুই নামে তন্ত্রের আচার বা যোগাভ্যাস (practice) বর্ণিত হইলেও সাধকভেদে পঞ্চ ম-কারের দ্বিবিধ অর্থ আছে। সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ত্রিবিধ সাধকভেদে ত্রিবিধ উপাসনা হইয়াছে। বস্তুতঃ তান্ত্রিক উপাসনা বলিলেই নিন্দিত উপাসনা বুঝায় না। সকল উপাসকের গন্তব্য এক; তবে সাধকভেদে কেহ সেখানে উপস্থিত হয়, কেহ সাধনের অর্দ্ধপথে পর্য্যন্ত যায়। আদি-নাথ শিব মুখ প্রসাদাৎ মীননাথ গোরক্ষনাথ বিন্দুনাথ প্রভৃতি যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন। মীন-চেতনে গোরক্ষনাথের সিদ্ধি ঘোষিত হইয়াছে এই নাথ নাম হইতে না-থ সম্প্রদায় বা যো-গী বা জুগী জাতির উৎপত্তি। কদলি ত্যজিয়া গেল বিজয়ানগর—এই বি-জ-য়া = নগর কোথায়, কে জানে।

৩৯১২। অঙ্গে ভ-ঙ্গে—ভ-ঙ্গে তালি দিয়া—করতল দ্বারা আঘাত করিয়া। বোধ হয়, ভূত-শুদ্ধি করিয়া। হৃদয়স্থ দীপ কলিকাকারে জীবাত্মাকে মূলাধার স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সুষুম্নাপথে দেহের ষট্-চক্র ভেদ পূর্ব্বক শিরোস্থিত সহস্রদল কমলের কর্ণিকান্তর্গত পরম আত্মাতে সংযোগ, এবং ক্ষিতি-আদি পঞ্চভূত, রূপাদি পঞ্চ বিষয়, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রকৃতি-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্বকে লীন ভাবনা করা। এ নিমিত্ত এক এক অঙ্গে হাত দিয়া স্পর্শ করিলে ভাবনা দৃঢ় হয়। ভাবিতে চিন্তিতে প-দ সব উদ্দেশিলা মহাজ্ঞান পাইয়া মীন দূর কৈল মায়া—ইহাই মীনচেতনের চরম লক্ষ্য। শ্যামদাস সেন ঠিক বলিয়াছেন, যে দিকে মন করিবে সে দিকেই আনন্দরস পাইবে। নতুবা এই মীন-চেতনের টীকা করিতে পারা যাইত না। টীকা অসম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ হইল। তথাপি পাঠকের কিছু সাহায্য হইতে পারে, এই বিবেচনায় লেখা হইল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।



কধুরখীলে সাহিত্য চর্চ্চা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৩) শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী—পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে ৺ রায় কালিদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী মহোদয় তৎকালীন বঙ্গ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ঢাকা নগরীতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার পরও অবসর কালে সঙ্গীতাদি রচনা দ্বারা মনোবৃত্তির চর্চ্চা করিতেন। ইঁহার রচনা অনেক স্থলেই অনুপ্রাস বহুল। যৌবনে তৎকর্ত্তৃক ‘ তরণীসেন বধ” নামক অভিনয় পুস্তক রচিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺রায় অভয়াচরণ চৌধুরীর সহায়তায় একাধিকবার অভিনীত হয়। তদ্রচিত "আছে অসুখে অশোকবনে সে রমা" ইত্যাদি গান এবং ভাবময় সঙ্গীতাবলী ভাবান্বেষী ব্যক্তিবর্গের নিকট বহুল প্রশংসিত। বর্ত্তমানে জীবনের সর্ব্বশেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াও তিনি সঙ্গীত রচনায় নিবৃত্ত নহেন। আদর্শ চরিত্র, এবং ভক্তিমান পুরুষ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্রই সম্মানিত এবং আদৃত।

(১৪) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী :—পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় ৺ রাজচন্দ্র চৌধুরীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী যৌবনে প্রথম বয়সে মোক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, উহাতে উন্নতির সর্ব্ববিধ সুবিধা বর্ত্তমানেও সঙ্গীতের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতার পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত ব্যবসায় ত্যাগ করেন। ফলতঃ সঙ্গীতে এবম্বিধ অনুরাগই তদীয় জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায়। গীতিবাদ্যে এবং সঙ্গীত রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য সত্যই প্রশংসার্হ। তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধ কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াও মনে পড়িতেছে।

(১৫) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চৌধুরী কবিরঞ্জন :—পূর্ব্বোক্ত চৌধুরী বংশেরই অন্যতম শাখায় শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জন্মলাভ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এবং কবিরাজী শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের পর্ব্বতাধিপতি "চাকমা রাজ" বাহাদুরের পারিবারিক চিকিৎসকরূপে উক্ত রাজবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। "আয়ুষ রত্ন" নামক এক অতি উপাদেয় এবং মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

(১৬) শ্রীমদ্ ত্রিলোকানন্দ পরমহংস :—পূর্ব্বোল্লিখিত চৌধুরী বংশীয় অন্যতম বিখ্যাত পুরুষ ৺ রায় বসন্তনারায়ণ চৌধুরীর যোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় চৌধুরী কাশী, নবদ্বীপ, কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে বহু বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া উক্ত সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অনন্তর কলিকাতার উপকণ্ঠ খিদিরপুরে সুখ্যাতির সহিত কয়েক বৎসর কবিরাজী করিবার পর সংসারে বীতরাগ হইয়া হিমালয় ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, সম্প্রতি উক্ত খিদিরপুরে "শঙ্কর আশ্রম" নামক একটী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ত্রিলোকানন্দ পরম-হংস উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি লোক-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারাশ্রমে অবস্থান কালীন তিনি "কায়স্থ দীপিকা," "কুলপরিচয়" "পত্তনপ্রভু কায়স্থ বংশের ইতিহাস" ইত্যাদি জাতিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক রচনা দ্বারা সমাজকে প্রবুদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য চট্টল কায়স্থ সমাজে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উপবীত গ্রহণ করেন। সম্প্রতি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা পুস্তক রচনা দ্বারা তিনি সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চট্টগ্রাম তাঁহার পরিচয় অবগত নহে।

(১৭) শ্রীযুক্ত বরদাকিঙ্কর চৌধুরী :—৺রাজচন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র বরদা কিঙ্কর সহজাত কবি প্রতিভার অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুন্দর সুললিত সাময়িক কবিতা গান ইত্যাদি রচনায় ইঁহার সমকক্ষ আর কেহ আছেন কিনা জানি না। চলিতে চলিতেও তিনি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী গান রচনা করিয়া দিতে পারেন। কাব্যরসে তিনি দিনরাত তন্ময় থাকেন ; ভাবের উত্তেজনায় তিনি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া আছেন। তাঁহার স্তুপাকার রচনাবলী দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। বঙ্গভঙ্গের যুগে তদ্রচিত কয়েকটী সঙ্গীত জন সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইলেও দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার কোনও পুস্তকাদি এ যাবৎ ছাপা হয় নাই।

দেশের উদাসীনতা, এবং সাধারণের চক্ষে তাঁহার উন্মাদ প্রকৃতিই তজ্জন্য দায়ী।

(১৮) শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী—চৌধুরী পরিবারের স্বাভাবসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগ লইয়াই শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী উক্ত পরিবারে জন্মলাভ করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন কালে উক্ত কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁহার বহু কবিতা এবং প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া তৎপ্রতি আমাদের সংগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্য সভার বিগত অধিবেশনে তদীয় "দুর্গা পূজা তত্ত্ব" নামক গভীর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ সভাপতি কবিতাকর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহোদয়ের এবং সমাগত সাহিত্যিক মাত্রেরই উচ্চ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়। বর্ত্তমানে নওয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নানা প্রকারে বাগ্দেবতার অর্চনা করিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এই গ্রামের সাহিত্যসেবী মাত্রকেই আশ্বাসিত করিতেছে।

(১৯) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী :—উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ ৺ দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরীর সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী অতি অল্প বয়স হইতেই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া এবং তদ্ভাব ভাবিত হইয়া স্বীয় জীবন যাত্রার প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন; এবং এই একমাত্র কারণেই মোক্তারী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পুস্তকালয়ের সংশ্রবে জীবনাতিবাহিত করিতে মনন করিয়াছেন। "সাধনা" পত্রিকায় তিনি প্রায়শঃই সারগর্ভ কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন। উহারা অধিকাংশ স্থলেই সুখপাঠ্য এবং সমাদৃত হইয়া এদেশের সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

(২০) শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসাদ চৌধুরী :—প্রাগুক্ত বিখ্যাত চৌধুরী বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয়পুত্র, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের অগ্রজ চৌধুরী শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ দেববর্ম্মা সাহিত্যের প্রতি আশৈশব প্রবল অনুরাগ বশতঃ এবং পূর্ব্ব পুরুষের সাহিত্য প্রতিভার উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করিয়া সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। চট্টগ্রাম পোর্টের দায়ীত্বপূর্ণ উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যানুশীলনে পশ্চাৎপদ নহেন। প্রধানতঃ ধর্ম্ম, সমাজ, এবং পারিবারিক ইতিহাসই তাঁহার রচনার বিষয়ীভূত। তাঁহার প্রবন্ধাদি সাধারণতঃ সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। বিভিন্ন পত্রিকায় মাঝে মাঝে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে। তাঁহার কবিতাও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

(২১) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র সেন—আবাল্য পূর্ব্বোক্ত চৌধুরী পরিবারে প্রতিপালিত হইয়া মাতামহ পরিবারের মানসিক বৃত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। বর্ত্তমানে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া গত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক গুজরাট ভূমে যোগাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। সম্প্রতি জগৎপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যোগীবর শ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামীজি মহারাজের নিকট হইতে উক্ত রসিকচন্দ্র সেনের কয়েকটী গান তদীয় মাতুল পুত্র মদাগ্রজ শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসাদ দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত গানগুলি প্রধানতঃ দেহতত্ত্ব বিষয়ক এবং ভাবমূলক। সাহিত্য জগতে উহারা পরম উপাদেয় বস্তু হইবে, সন্দেহ নাই।

(২২, ২৩)—ডাঃ নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চৌধুরী, পূর্ব্বোক্ত চৌধুরী পরিবারের ৺ রায় শ্রীমন্তরাম চৌধুরীর কনিষ্ঠপুত্র ৺ নিমাইচরণ চৌধুরীর ঔরসজাত ডাঃ নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চৌধুরী গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান এবং কবিতাদি রচনা দ্বারা শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

(২৪) শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী—উক্ত চৌধুরী বংশেরই একতম শাখায় জন্মলাভ করিয়া সম্প্রতি শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিগত ১০।১২ বৎসর ধরিয়া ইঁহার কবিতা প্রবন্ধাদি, সুপ্রভাত, অবসর, আলোচনা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। উহারা অধিকাংশ স্থলেই সুখপাঠ্য এবং সরল ভাবপূর্ণ।

(২৫) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যারত্ন :—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন, তত্ত্বনিধি মহাশয় চট্টগ্রাম সহরে কবিরাজী ব্যবসায়ে নিযুক্ত

থাকিয়া অবসর কালে বঙ্গ ভাষার সেবা করিতেছেন। চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য সভা, সম্মিলন ইত্যাদিতে ইঁহার গবেষণা মূলক প্রবন্ধাদি প্রায়শঃই পঠিত হইয়া জন সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে।

(২৬, ২৭, ২৮) উপরি উক্ত প্রবন্ধাদি-লেখক ভিন্ন আরও কয়েকজন সাহিত্য রচনার দ্বারা স্বদেশকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু বিধুভূষণ চৌধুরী, বি, এ; লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বিমলচন্দ্র চৌধুরী, বি, এল, এবং উত্তরপাড়ার বি, এ, ক্লাশের ছাত্র শ্রীমান্ নীরেন্দ্র লাল চৌধুরীর নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। এই গ্রামে সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তির অভাব নাই, এই গ্রাম তাঁহাদের নিকটেও কিছু কিছু আশা করেন।

(২৯) এ ক্ষেত্রে আর একজন নব্য সাহিত্যিকের পরিচয় প্রদান না করিলে রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল হক্ সাহেব কৃষি বিষয়ক রচনা দ্বারা আমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছেন। সরল অথচ সুমার্জ্জিত ভাষায় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে তিনি সম্পূর্ণ পারগতা লাভ করিয়াছেন। কোন কোনও পত্রিকায় তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সাহিত্য রচনাকে সাদর অভিনন্দন প্রদান করিতেছি। তিনি আমাদের সাহিত্যসভারই অন্যতম উৎসাহী সদস্য, এবং দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী সন্তান।

(৩০) এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকও আবাল্য সাহিত্য সেবাব্রতে নিয়োজিত থাকিয়া ভাষাজননীর পূজা-মন্দিরে এ যাবৎ বহু অর্ঘ প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। কধুরখীলে, বিশেষতঃ এই চৌধুরী পরিবারে জন্মলাভ করিয়া তিনি ইহার মর্য্যাদা হানি করিতে পারেন না। অতীত যুগ হইতে যে পরিবারের কর্ণধারগণ লোকসাহিত্য গঠনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, সেই পরিবারের বিশিষ্ট গৌরব মনে প্রাণে অনুভব করিয়া আপনাদেরই চিত্ত বিনোদন করিবার জন্য তাঁহার বহু কবিতা প্রবন্ধাদি বঙ্গের বহু মাসিকে প্রকাশ করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, তদুপরি আপনাদের সেবা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং অকৃতী হইলেও ভবিষ্যৎ সফলতার জন্য আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

বন্ধুগণ, উপরিউক্ত তালিকাপাঠে আপনারা জানিতে পারিতেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগ হইতে এদেশে সাহিত্য পূজার বিরাট আয়োজন চলিতেছে; এবং তাহারই ফলে সাহিত্যের বিরাট দরবারে এই গ্রামে অভিজাত্যের মহিমা লাভ করিয়াছে, তাহারই কোলে এই সাহিত্যিক সম্মিলনের চেষ্টা নূতন নহে।

সুধী সাহিত্যিক সমাজ, দেশের সাহিত্যিকদের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া আপনাদের চিত্তবিনোদন করিবারই প্রয়াস পাইয়াছি। কৃত কার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি কিনা জানি না; সফলকাম হইলে নিজকে ধন্য মনে করিব অন্যথা, আপনাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেবশর্ম্মা।

লাঙ্গল।

আদিম নরের প্রথম যেদিন লাঙ্গুল গেল ঝরে,
সে দিন থেকেই পুন্য লাঙ্গল উঠলো তাহার করে।
তরুর শাখা পারলে না আর পুরতে আশা তার
তাই সে খাঁটী মাটীর উপর স্থাপলে অধিকার।
যেদিন প্রথম চষ্‌লে মাটী যত্নে-গড়া হলে,
নূতন প্রভাত জানিয়ে দিলে পাখীর কলকলে
সে দিন থেকে প্রথম প্রণয় উদ্ভিদেরি সাথ,
বিশ্বসাথে কুটুম্বিতার সূত্র হ'ল পাত।

২

লাঙ্গল দেখে লজ্জানত তীব্র ধনু শর,
বুদ্ধ যেন এলেন নেমে হিংস্র ধরা পর।

যে দিন প্রথম গৃহে এলো ধান্য যব ও ব্রীহি
সে দিন থেকে দানব মানব, সে দিন থেকে গৃহী।
তখন থেকে মেঘের সাথে নূতন পরিচয়,
দূত করে তায় পাঠানোটা অনেক পরে হয়।
ফুটলো সে দিন প্রথম কুসুম চিন্‌লে তারে প্রাণ
বিশ্বনাথের বিপুল প্রেমের মধুর অভিজ্ঞান।

৩

হর্ষে তখন হল চালাতেন নিত্য রাজা প্রজা
স্মৃতির বিধি হয়নি, ছিল বিধির বিধি তাজা।
রাখাল হতেন, মান বাড়াতেন, স্বয়ং ভগবান
গোপাল লয়ে গোপাল কভু হন নি হতমান।
হল্ ফলকে উঠতো তখন পুণ্যভূমির সীতা,
মূর্ত্তিমতী ধরার স্নেহ, শুদ্ধ শুচিস্মিতা।
ভদ্র মোদের পড়লে যে হায়, ধরতে তারে লাজ,
হল ছাড়িয়া হাল্লা করি সভ্য মোরা আজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ।

নির্ব্বাসিত যক্ষের বিচ্ছেদ দুঃখে ব্যথিত-হৃদয় মহাকবি যে দিন আষাঢ়ের নবীন মেঘকে দৌত্যে বরণ করিয়া বিশ্বেরই বিরহ-বেদনাকে আপনার অমরকাব্যের শ্লোকে শ্লোকে মন্দাক্রান্তার মধুর ছন্দে গাঁথিয়া তুলিলেন, সে দিন হইতেই বুঝি ঋতুপর্য্যায়ে বর্ষার স্থান অনেক উচ্চে উঠিয়া গেল। তারপর বিদ্যাপতি জয়দেব হইতে সত্যেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক কবি বর্ষার বন্দনা গাহিয়াছেন, কিন্তু বর্ষার সুগভীর মৌন মহিমাকে রাজমুকুটে সুশোভিত করার গৌরব একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। গদ্যে পদ্যে, কাব্যে সঙ্গীতে, গল্পে প্রবন্ধে বর্ষার মোহনচিত্র রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও কবি এমন করিয়া অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। আর বর্ষার সৌন্দর্য্যের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়া এমন নিবিড় এবং পরিপূর্ণভাবে তাহার রসভোগও আর কোনও কবির কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না।

জয়দেবের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" আমাদিগকে আবিষ্ট করিয়া ফেলে। বিদ্যাপতির "ভরা বাদর, মাহ ভাদর" আমাদের নিকটে শূন্য মন্দিরের বিজন ব্যথাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তোলে, এবং "মত্ত দাদুরী ডাহক ডাহুকীর" অবিরাম চীৎকারে আমাদের ছাতি ফাটিয়া যায়। কিন্তু বড়ই সংক্ষিপ্ত। এখানে সেখানে দুই একটি রেখাপাত মাত্র—পূর্ণচিত্র পাই না।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কি অন্নদামঙ্গলে বৃষ্টি বাদলটা প্রায়ই মর্ত্ত্যলোকে পূজালোলুপ দেবদেবীগণের কোপের ফল, আর বর্ষার কথা নায়িকা বিশেষের 'বারমাস্যার' গানের মাসিক সুখ দুঃখ বর্ণনার মধ্যে দুচার ছত্রে পর্য্যবসিত। কুপিতা চণ্ডীর আদেশে কলিঙ্গ দেশে ভয়ঙ্কর বর্ষা আরম্ভ হইল :—

"ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর্।
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারিমেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
* * * *
করি কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা॥
ঘন বজ্রাঘাত পড়ে মেঘ বরিষণ।
কার কথা শুনিতে না পায় কোনজন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী॥
হুর্ হুর্ দুর্ দুর্ শুনি ঝন্‌ঝন্।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ॥
গর্ত্ত ছাড়ে ভুজঙ্গম ভাসে যায় জলে।
নাহিক নির্জ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে॥
সাতদিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের কার্য্য হাজিলেক ঘর॥

মাথার পড়িল শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্র পদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥"

ইহার সহিত অন্নদামঙ্গলের "মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি" তুলনা করুন। মানসিংহের নিকটে আপনার মহিমা প্রকটিত করিবার জন্য "অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি কৈলা বিজয়া লইয়া"; তারপর মেঘগণকে আদেশ দিলেন, "ঝড়বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে।"

"দশদিক্ আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুন্ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝন্‌ঝনার ঝন্‌ঝনি বিদ্যুৎ চক্‌মকি।
হড়্‌মড়ি মেঘের ভেকের মক্‌মকি॥
ঝড়্‌ঝড়ি ঝড়ির জলের ঝর্‌ঝরি।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তর্‌তরি॥
থর্‌থরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট্ ঘুট্ আন্ধার শিলার তড়্‌তড়ি॥

* * * *

সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মাল মাত্তা উরুদ্ বাজার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝার বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাষে॥

* * * *

ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥

* * * *

এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥"

ইহাতে শব্দাড়ম্বর এবং অতিশয়োক্তি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু নাই।

ফুল্লরা চণ্ডীর নিকট 'বারমাসী দুঃখ নিবেদন' করিতেছে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের কথা হইলে তারপর বর্ষায় কয়েকমাসের কথা—

"আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পূরে॥
বড় ভাগ্য মনে গণি, বড় ভাগ্য মনে গণি,
কত শত খায় জোক নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায় স্নান বৃষ্টি নীরে॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়েতে আইসে বাণ॥
ভাদ্র পদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥
কত নিবেদিব দুখ, কত নিবেদিব দুখ,
দরিদ্র হইল পতি বিধাতা বৈমুখ॥

খুল্লনার বারমাস্যাতেও তদ্রূপ—

"আষাঢ়ে গগনে মেঘ উড়িল প্রচণ্ড।
বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে একদণ্ড॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার॥
ছাগল চড়াই গিয়া পুকুরের পাড়ে।
দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে॥
পরোক্ষেতে যায় ছেলি, পরোক্ষেতে যায় ছেলি।
নাগরিয়া লোকে মোরে দেয় গালাগালি॥
প্রচণ্ড বাদল বড় ভাদ্রপদ মাসে।
নদী নালা একাকার কত ঢেউ আইসে॥

ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাকালে তুলিয়া বাধি থুইয়া দুতি ধনি।
বৃষ্টি বাজে যেন শেল, বৃষ্টি বাজে যেন শেল।
তিনদিন ব্যতীত লহনা দেয় তেল॥

বর্ষাকালে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রের জীবনে কত দুঃখ, তাহার আভাস আমরা এই সংক্ষিপ্ত বারমাস্যাতে পাই। কবিকঙ্কণের সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাঁহার চণ্ডীগীতির অধিকাংশই সাধারণ ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথাতে পূর্ণ; ভারত চন্দ্রের মতো বড় ঘরের কথা লইয়া তিনি নাড়া চাড়া করেন নাই।

এই প্রাচীন কবিরা বর্ষাকে যে ভোগের দিক দিয়া একেবারেই দেখেন নাই, তাহা নহে। সিংহল-রাজকন্যা সুশীলা স্বামী শ্রীমন্তকে তদ্দেশে চিরনিবাসী করিবার অভিপ্রায়ে বার মাসে 'সিংহলের ভোগ যত' তাহা বিবৃত করিতেছে। তাহার মধ্যে বর্ষার কথা এই টুকু—

"আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নব রসে মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
আমার মন্দিরে থাক না ভাবিহ পর।
শালি অন্ন দধি খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর॥
আষাঢ় সুখের হেতু আষাঢ় সুখের হেতু,
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু॥
শকট সময় বড় ধারার শ্রাবণ।
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে বারির কিরণ॥"
জল ধারা বরিষয়ে আট দিকে ধায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ নায়॥

তার পর ভাদ্রপদ মাসে যখন বাদল দুরন্ত হইয়া উঠিবে তখন, রাজকন্যা লোভ দেখাইতেছে—

"মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি"

ভোগের দৌড়ও এই পর্য্যন্ত। জানিনা ঢাকা সহরে কবিকঙ্কণের কখনো শুভাগমন হইয়াছিল কি না। হইয়া থাকিলে, বারমাস্যার গানের মধ্যে উক্ত গার্হস্থ্য দ্রব্যটির একটা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ অনুমান করা ভুক্ত ভোগী আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হয়।

ভারতচন্দ্র রাজকবি—রাজপরিষদ। সুতরাং তাঁহার নজরটা একটু উঁচু। বিদ্যা ও সুন্দরকে নিজবেশে আটকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যথারীতি বারমাস্যায় সুখের চিত্র আঁকিয়া দেখাইতেছে—

"আষাঢ়ে নবীনমেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিরাগীর মন সংযোগীর প্রাণ ধন॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠদিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥
শ্রাবণে রজনীদিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
* * * *
ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটি।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥
ঝর্ ঝরি জলের বায়ুর থর্ থরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥"

এই সব কবিতাতে কোন উচ্চ চিন্তার—কোন গভীর ভাবের, পরিচয় নাই।

আধুনিক কালে নামিয়া আসিয়া গুপ্তকবির কবিতা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা তাহাতে বর্ষার দুই একটি বিশদ বর্ণনা প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেগুলিতেও কোন উচ্চ পরিকল্পনা নাই।

"ঘরদ্বার পথঘাট মহাসিন্ধুময়।
নীরাকারে নিরাকার দৃশ্য সব হয়॥
গৃহস্থের কান্নাহাটি রান্নাঘরে এসে।
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে॥
জোড়া পায়ে ঘোড়া নাচে চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে॥
বালক পুলক পায় ভাসাইয়া ভেলা।
কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা॥

পথিকের দশা দেখে নেত্রে জল বয়ে।
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে॥"

পড়িয়াই কলিকাতা সহরের বর্ষার দিনের দৃশ্য মনে পড়ে। অন্যত্র—

"হইল সুধার বৃষ্টি শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ প্রতাপ হইল শেষ।
স্নিগ্ধকর বরিষণে মৃদুমন্দ সমীরণে
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ॥
নীলরুচি নীলধর শোভাকর মনোহর
নয়ন প্রফুল্লকর অতি।
হায়রে কালীর ঘটা হেরি তোর শোভাছটা
সাধে মজে ব্রজের যুবতী॥
* * * *
মরালমোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয়গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম।
করি রব কুক্ কুক্ প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম॥
শুনিয়া মেঘের নাদ মত্তমতি মেঘনাদ
পাদপুট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্যকরে পালে পাল
কাল পেয়ে প্রফুল্ল শরীর॥
* * * *
স্নান করি ধারা জলে, শ্যামল বিমল দলে
তরুলতা নবশোভা ধরে।
বিরহ-বিশ্রামে যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন
যুবাজন আস্য শশধরে॥"

বর্তমান যুগের প্রধান কবিত্রয়—মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য ও কবিতাবলীতে বর্ষার প্রতি কোন বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পায় নাই। মধু মধুমাসেরই পক্ষপাতী এবং "আসিল বসন্ত যদি আসিবে মাধব"—এই তাঁহার ভরসা। বর্ষার কোন কবিতা আমি মধুসূদনের গ্রন্থাবলীতে খুঁজিয়া পাই নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও তথৈবচ। হেমবাবুর একটি কবিতাতে মোটে এই ছয়ছত্র পাওয়া যায়।

"অই পুনঃ জলধরে বারি ধারা ঝরিল!
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসী জলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা শোভা দিল মনোহরা
শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল।
মরাল আনন্দ মনে, ছুটিল কমল বনে
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল।
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর
কেলিহেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বসন খোলে
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল।"

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন কবিগণের বর্ষা বর্ণনার সহিত ইহা একই ছাঁচে ঢালা—প্রাণ স্পর্শ করে না।

কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকরের অনুকরণে নবীনবাবু তাঁহার "রঙ্গমতীতে" দাঁড়ীমাঝিগণের মুখে একটি 'বারমাস্যা গীত' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।—

"আইল আষাঢ় মাস, নবঘন পরকাশ,
নব বারি ধারা বরিষণ;
নবীন নীরদ অঙ্গে, নবীন বিজলী রঙ্গে,
চমকে, চমকে নারী মন।
শ্রাবণ মাসেতে ঘন, ঘন দেব গরজন,
ডাহুক ডাহুকী করে গান;
শ্রাবণের ধারাসনে, কাঁদে ধনী মনে মনে,
বিরহেতে আকুল পরাণ।
ভাদ্র মাসে নদী যত, বিরহ প্রবাহ মত
উথলিয়া উছলিয়া যায়,
কিবা শোভা পাকা তাল, হৃদয় হইল কাল
পড়ে বামা ঢলিয়া ধরায়।"

প্রথা-মাফিক রচনা—কোন বিশেষত্ব নাই।

আকস্মিক বৃষ্টিপাতের পর একটি উপভোগ্য বর্ণনা আমরা রৈবতকে পাই। কৃষ্ণ পার্থকে আপনার বাল্য-জীবনের কাহিনী শুনাইতেছেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে একদিন তিনি অপরাপর বালকবালিকাসহ বনে গোচারণ করিতেছিলেন—

"অকস্মাৎ ছাইল গগন
নিবিড় জলদ জাল, হইল পতিত
ঘোর সন্ধ্যাছায়া যেন কানন শোভায়।
তট-বিঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে
আসিতেছে বারি ধারা; দুই চারি দশ—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা; ছুটিল গোপাল
হাম্বারবে উচ্চ পুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালক বালিকা—
কেহ গিরি কোটরেতে, কেহ তরুতলে—
প্রশস্ত পল্লব ছত্রে—লইনু আশ্রয়।
কেহ বন কদলীর, কচুর পাতায়
নিবারিছে বৃষ্টি ধারা; মেঘ প্রস্রবণ
অবিরল জলধারা করিছে বর্ষণ।
সেই ঘন বরিষণ; ঘন গরজন;
প্রতিধ্বনি শৃঙ্গে শৃঙ্গে; শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘ;
মেঘেতে বিজলী খেলা; সজল সে হাসি;
গিরিবাহী প্রপাতের আনন্দ উচ্ছ্বাস;
সম্ভস্নাত কাননের পরিমল ময়
সুশীতল মন্দ শ্বাস;—করিল হৃদয়
উচ্ছ্বসিত, সুবাসিত, প্লাবিত পূর্ণিত।"

এতদ্ভিন্ন নবীন বাবুর কাব্যেও বর্ষা সম্বন্ধে আর কিছু দেখা যায় না।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অপরাপর কবিগণ বর্ষাসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যাহা কিছু বলিয়াছেন, উপরে তাহার আলোচনা করা হইল। রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কবিগণ সকলেই ন্যূনাধিক রবি-প্রভাতে প্রভাবান্বিত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে বা অনুসরণে তাহাদের কেহ কেহ সুন্দর বর্ষার কবিতা লিখিয়াছেন; সে গুলির সবিস্তার আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

অতঃপর আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিব। রবীন্দ্র সাহিত্য বর্ষাস্তোত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার। চৈত্র ও বৈশাখের আকস্মিক বারিবর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া "ভরা ভাদরে" যখন "নদী ভরা কূলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান" তখন পর্য্যন্ত যে কোন দিনের, যে কোন অবস্থার বর্ষাচিত্র হীরা মণি জহরতের টুক্‌রার মতো এ ভাণ্ডারে যত্র তত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—কুড়াইয়া লইলেই হয়।

ঋতুর শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ, শীতকে বৈশ্য, এবং বর্ষাকে রজোগুণান্বিত ক্ষত্রিয়ের পদবীতে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ষাই ঋতুর রাজা, এবং সেই রাজার আগমনাভিযানের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা রাজ কবিরই উপযুক্ত। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তাহার (বর্ষার) নকীব আগে আগে গুরু গুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ী পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিকচক্রবর্ত্তী হইয়া বসে। তমাল-তালীবনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যায়, তাঁহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণবাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এ দিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লব শ্যামল চন্দ্রাতপে সোণার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্ব্ব দিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে

কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাগীতি, বর্ষাস্তব মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় তাগিদে কষ্টকল্পিত ফরমায়েসী ঋতুবর্ণনা নহে; কিংবা প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বর্ষার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হয় বলিয়া লেখা নহে। ইহা গভীর অন্তর প্রবাহ হইতে আপনার আবেগে উচ্ছ্বসিত কবি হৃদয়ের অমৃত উৎস। রবি বাবুর এই সব গান ও কবিতা সর্ব্বত্র সুপরিচিত, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত—একরূপ classic এ দাঁড়াইয়াছে। আমি তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

বর্ষা যেই তার মেঘময় বেণী আকাশে এলাইয়া দিল অমনি—"সজল মেঘের নীল অঞ্জন" নয়নে লাগিবা মাত্র—পুলক বিহ্বল কবির চিত্ত নৃত্য করিয়া উঠিল,

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।"

বৈশাখ যখন "শুষ্ক জল নদী তীরে, শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে" আপনার "ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল" মেলিয়া, রক্তনেত্র ললাটে তুলিয়া তপস্যায় বসিয়াছে, গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে প্রকৃতি যখন ক্লান্ত, মূর্চ্ছিতপ্রায়, তখন নিখিল চিত্তের দুর্নিবার পিপাসা লইয়া কবি "গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়াসঞ্চারী" ঈশানের পুঞ্জ মেঘকে বরণ করিয়া লইতেছেন। সো সো করিয়া বৃষ্টি আসিতেছে—কবি যেন কান পাতিয়া সেই "নব বারি বর্ষণের শ্যামল সংবাদ" শুনিতেছেন, এবং মনের আনন্দে বলিতেছেন—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা!"

নবীন মেঘকে অনুরোধ জানাইতেছেন—

"ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
দাঁড়াও তোমায় হেরি!"

স্নিগ্ধ মেঘচ্ছায়ে প্রকৃতি আবার সরস হইয়া উঠিয়াছে। তাহার "অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল" আবার মাঠে মাঠে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। "আষাঢ় মাস চাষার আশ"—'নবীনা বরষা গগন ভরিয়া ভুবন ভরসা' লইয়া আসিয়াছে—

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে' আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।"

মেঘের জন্য নিদাঘ-তপ্ত প্রকৃতির ব্যাকুলতা এবং প্রথম ধারা বর্ষণের সরস আনন্দ সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায়ও বেশ ফুটিয়াছে—

"নীল মেঘপুঞ্জ হ'তে শৈত্যের বারতা
আসিছে, তাপার্ত্ত, ক্লিষ্ট ধরণীর' পরে;
আচম্বিতে জলে, স্থলে, কাননে, অম্বরে,
বর্ষণে ধ্বনিয়া উঠে চর্চ্চরিকা গাথা।

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা;
বৃষ্টি ধারা উঠে নাচি' বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সুযৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য গৌরতা।"

(২)

কালো মেঘের প্রতি পুষ্পের নিবেদন—

"গভীর তোমার কাজল নয়নে
ছলছলি জল পড়িছে এসে,

তপ্ত বনানী ডাকিছে তোমায়,—
দাঁড়াও ক্ষণেক স্থূলের দেশে।”

(৩)

নব মেঘোদয়ে—
নয়ন জুড়ায়ে দেবে নব নীলাঞ্জন
পাওয়া যাবে সারা দেহে চকিত পরশ ;
শিহরি' বাদল হাওয়া দেবি আলিঙ্গন
অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিয়া অমৃতের রস!”

কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভেদটুকু বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। নব বর্ষাগমে কিংবা “ঘন ঘোর বরিষায়” নিসর্গের ও বিশ্ববাসীগণের যে স্নিগ্ধ ভাববিপর্য্যয় ঘটে, দূর হইতে দেখিয়া একজন তাহার মনোজ্ঞ ও সরস চিত্র আপনার নিপুণ তুলিকাস্পর্শে যথাযথ অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে উপহার দিতেছেন ; আর একজন একেবারে প্রকৃতির সহিত তন্ময় হইয়া নিখিল জনগণের প্রতিনিধি-স্বরূপে আপনারই হৃদয়ে সে ভাব পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছেন। বর্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের এই যে নিবিড় যোগ, তাহা বহু কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বলিতেছে—

ওই দেখ বৃষ্টি ধারা আসিয়াছে নেমে
পর্ব্বতের পরে ; অরণ্যেতে ঘন ঘোর
ছায়া ; নির্ঝরিনী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব্ব উপহাসে তটের গর্জ্জন
করিতেছে অবহেলা ; * * *
“ * * * গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয় ; ঝরঝর
বৃষ্টি জলে, মুখর নির্ঝর কল্লোলাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেতনা
মৃগ। ....কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। ...মোরা সন্তরণে
হইতাম পার বর্ষার সৌভাগ্য গর্ব্বে
স্ফীততরঙ্গিনী।”

তারপর চিত্রাঙ্গদার প্রত্যুত্তর—

“ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে—শ্যাম বর্ষা হাসিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ু পৃষ্ঠপরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়,—তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেই মত খেলা আজি বরষার দিনে
* * * *
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টি বরিষণ, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা;
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।”

ইহাতেও আমরা কবির মনোভাবেরই পরিচয় পাই। কবি সর্ব্বদাই অনুভব করেন, “কাজল মেঘে ঘনিয়ে উঠে সজল ব্যাকুলতা”—বর্ষার ধারা বরিষণের সঙ্গে সঙ্গে কাহার তরে হৃদয় যেন ব্যাকুল হইয়া উধাও হইয়া ছুটিতে চায় :—

“ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলী হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণ পুটে—
কোনখানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোণে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।”

‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে’ আসে।’ কবি প্রিয় সমাগমের প্রত্যাশায় দ্বারের পাশে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেই অনাগত প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন—

“তুমি যদি না দেখা দেও কর আমায় হেলা,
কেমন করে’ কাটে আমার এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥”

আবার যখন শ্রাবণের নিবিড় মেঘ 'নিলাজ নীল আকাশ ঢাকিয়া' ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং "অফুরান নাক্তায় বাদলের ধারাপাত" চলিতেছে, তখনও কবির সেই ব্যাকুল প্রতীক্ষা লক্ষ্য করি—

শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ॥"

*　　*　　*　　*

কুঞ্জহীন কাননভূমি দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে ॥"

তারপর ভাদ্রে 'নিবিড় কুন্তল সম' 'বর্ষা গাঢ়তম' হইয়া উঠিয়াছে, এবং 'হৃদয় যমুনার' দুই তীরে মেঘ নামিয়াছে। কবি গাহিতেছেন—

"বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে এই ঝরে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে!
অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল পাগল
আজি ভাদরে,
আজ এমন করে' কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে!"

আর উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ভাবিতেছেন তাঁহার সেই প্রিয়তমের কথা—

সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার!"

এমন দিনে যখন—

সঘন বরষা গগন আঁধার
(আর) বারিধারে কাঁদে চারিধার!"

তখন 'অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া' মেঘদূত পড়িতে পড়িতে সহৃদয় কবির মন আপনা হইতেই সেই চিরন্তন মহাকবির উদ্দেশে সসম্ভ্রমে ধাবিত হইতেছে এবং শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে:—

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! *　　*　　*

*　　*　　*　　*

সে দিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরু গুরু রব!
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন
একদিনে। *　　*　　*

*　　*　　*　　*

সে দিনের পরে গেছে কত শত বার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের' পরে, করি বরিষণ
নববৃষ্টি বারি ধারা; করিয়া বিস্তার
নব ঘন স্নিগ্ধ ছায়া; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদ মন্দ্রের
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা তরঙ্গিনী সম!"

বর্ষার রাতে গৃহদ্বার রুদ্ধ থাকিলেও কবির কল্পনার যদৃচ্ছা বিচরণের বাধা নাই। বরং দৈহিক অবরোধ বুঝি কল্পনাকে আরও উদ্দাম করিয়া তোলে। তাই—

"কালকে রাতে মেঘের গরজনে,
রিমি ঝিমি বাদল বরিষণে,
ভাব্‌ছেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায়রে দেখা

আসে যদি তাহার মূর্ত্তি ধরে'
বাদ্‌লা রাতে আধেক ঘুম ঘোরে।

"কাল্‌কে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারি পাত,
মিথ্যা যদি মধুর রূপে
আস্‌ত কাছে চুপে চুপে
তাহা হ'লে কাহার হ'ত ক্ষতি ?
স্বপ্ন যদি ধর্‌ত সে মূরতি ?"

কখনো মনে হয়—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারি ধার।"

কখনো কবি উন্মনা হইয়া ভাবিতেছেন, কি গান গাহিবেন—

"কেতকী জলের ধারে ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুল ভারে বকুল বাগান
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।
"ঝিলি মিলি করে পাতা, ঝিকি মিকি আলো,
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো!
কদম্ব গাছের সার ; চিকণ পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার হয়েছে ঘোরালো!
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো!"

আবার যখন—

"বেলা যায় বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিশার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজ পথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি ঘেরা চারি ধার, ঘন শ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দ আর ঝর্‌ ঝর্‌ পাতা।
তখন, থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ,
শ্যামল তমাল তল নীল যমুনার জল
আর, দুটি ছল ছল মলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে' মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।"

আর কবির সর্ব্বজন সুপরিচিত "সোণার তরী" শীর্ষক কবিতার উল্লেখ না-ই করিলাম। যদিও তাহার অর্থ লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ রহিয়াছে তবুও একথা অস্বীকার করার যো নাই যে,—"গগন গরজে মেঘ ঘন বরষা" এই ছত্রটি পাঠ মাত্রই আমাদের মনের মধ্যে কেমন একটা আলোড়ন পড়িয়া যায়। মোহিত বাবুর কথায় "এই নির্ব্বাক্‌ সঙ্গীতকে ভাষায় যিনি ব্যক্ত করিতে পারেন, তাঁহাকেই প্রকৃত কবি বলিয়া স্বীকার করি। এবং 'সোণার তরী' প্রভৃতি কবিতার যদি কোন অর্থ বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে তাহা এই যে, ঘনবর্ষা, ভরা নদী, সঞ্চিত ধান, দ্রুত বহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে তাহার সহিত মানবহৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব রাগিনী সৃজন করিয়াছে, যে রাগিনীকে একটি চিত্রে অথবা অবস্থা-বিন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

সুধা ও ক্ষুধা।

ক্ষুধা আর সুধা একই জনে কেন দাওনাক ভগবান
যারে দাও সুধা ক্ষুধার অভাবে করেনা সে তাহা পান।
একটী মুষ্টি তণ্ডুলো যার মধুময় সুধা ঢালা
তারে শুধু দেছ আনির্ব্বাপ্য ক্ষুধার অনল জ্বালা।
তুঙ্গভূধরে গভীর সাগরে সুসমঞ্জস তবু
জীবলোক আর ভূলোকে একই বিধান প্রভু।

শ্রীকালিদাস রায়।

——()——

পল্লীব্যথা (সমালোচনা)।

পল্লীব্যথা। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক্ ক্লাব, কলেজ-ষ্ট্রীট্ মারকেট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন বঙ্গের শক্তিমান নবীন কবিগণের অন্যতম। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম রচনা-সংগ্রহ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সুদীর্ঘ ভূমিকায় কবির প্রতিভার পরিচয়-প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, এই ভূমিকার প্রথা অন্ততঃ কাব্য-গ্রন্থ সম্বন্ধে নিতান্তই অনাবশ্যক ও অশোভন। ইহা কাব্যের নিজস্ব গৌরবকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। এ যেন ফুলের প্রদর্শনীতে গোলাপের গায়ে আল্‌পিন্ ফুটাইয়া প্রকাণ্ড নাম-ওয়ালা কার্ড ঝুলানোর মত। কালিদাসের "ব্রজবেণু" ও দুর্গামোহনের "পল্লী" এই অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতায় ম্লান হইয়া আছে।

"পল্লীব্যথার" প্রচ্ছদপটে পল্লীর পুঞ্জীভূত ব্যথার ব্যঞ্জনা ধূমায়মান জীর্ণ কুটীরের পরিকল্পনায় সুন্দররূপে প্রকট হইয়াছে। এই ব্যথাই গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নানা বিচিত্র ছন্দে বাজিয়া গিয়াছে। যে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় আজ সারা বিশ্ব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যে নিরুদ্ধ হাহাকার আজ ভাষাহীনকে মুখর ও অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিয়া তুলিয়াছে, দরদী কবির অন্তর-বীণার তারে তারে বিশ্বের এই মর্ম্ম বেদনা পল্লীর করুণ ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

পল্লী-কবিতা, পল্লী-গীতি, বাংলার কাব্য-সাহিত্যে নূতন নহে। অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির কীর্ত্তন, বাউল ভাটিয়াল গানে আজো বাংলার কোমল প্রাণের স্পন্দ শুনিতে পাই। বঙ্গের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যও পল্লী-বন্দনায় মুখরিত। দেশ মাতৃকার রূপ-কল্পনায় জাতীয় সঙ্গীতে পল্লীর স্নেহ মূর্ত্তির অভিব্যক্তিই দেখিতে পাই। বঙ্গের সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, দীক্ষা পল্লীগ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। পল্লীর স্তন্যধারাই এ দেশের প্রাণধারার উৎস।

কিন্তু আজ এ দেশের সকল উন্নতি-প্রচেষ্টা বহির্ম্মুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির অন্তরতম অন্তরের সহিত দেশের বন্ধনসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিল্প ও সাহিত্য তাই প্রাণহীন, শিক্ষা ও সাধনা তাই জাতীয় বিশেষত্ব বিবর্জ্জিত। একটা অনির্দ্দেশ্য অভাবের অনুভূতি আজ দেশের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এই চাঞ্চল্য আজ দেশ বিশেষে আবদ্ধ নহে। সমগ্র বিশ্বে এই অনুভূতির স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে। Back to the country! Back to nature! ইহারই প্রকাশ মাত্র।

বঙ্গ-সাহিত্যের রবীন্দ্রীয় যুগ পর্য্যন্ত পল্লী-কবিতার যে পরিণতি দেখিতে পাই, তাহাতে পল্লীর শোভা সৌন্দর্য্য ও অনাবিল আনন্দের বিচিত্র পরিচয় কলা-কুশলীর তুলিকা-সম্পাতে রমণীয় হইয়া আছে, কিন্তু তাহাতে কল্পনা আছে, বাস্তবতা নাই,—অনাদৃত পল্লী-জীবনের দৈন্যের ইতিহাস নাই, অনশনাক্লিষ্ট হতভাগ্যের জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস নাই। বর্ত্তমানে যে নবযুগের সূচনা সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা সাহিত্যকে শিল্প-চাতুর্য্যে ও কাব্য-মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ না করিলেও তাহাকে নবীন গতিবেগ প্রদান করিয়াছে। বঙ্গের বিকাশোন্মুখ নবীন সাহিত্য দেশের নিগূঢ়তম আত্মবোধের বাণী মূর্ত্তি!

কবি সাবিত্রী প্রসন্নের "পল্লীব্যথা" এই পরিবর্ত্তনেরই অন্যতম পরিচয়। পল্লীর অশ্রুসজল কাহিনী ছন্দে গ্রথিত

করিয়া যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন, তন্মধ্যে কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস সাবিত্রী প্রসন্নের পথ প্রদর্শক। ভূমিকায় অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহাদের অনেকেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনাদৃত কবি গোবিন্দ দাসকে তিনি বিস্মৃত হন নাই এজন্ত তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সুবিখ্যাত কবি প্রমথনাথের পল্লী কবিতার তিনি কোনই উল্লেখ করেন নাই। প্রমথ নাথের আলাময়ী রচনায় পল্লীর মর্ম্মভেদী হাহাকার বহু পূর্ব্বে বাজিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গের পল্লী-কবিতার ইতিহাসে প্রমথ নাথের নাম অমর হইয়া রহিবে।

গোবিন্দ দাস, প্রমথনাথ ও দুর্গামোহন বঙ্গের পল্লী-কবিতায় নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গ পল্লীমাতৃক ভূমি। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি পল্লীর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত, পল্লীর সুখ দুঃখের সহিত তাঁহার সুখ দুঃখ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। কিন্তু বঙ্গভারতীর সুবিশাল স্বর্ণমন্দিরতলে দীনহীন পল্লী-কবির স্থান কোথায়? পূর্ব্ববঙ্গের অভিশপ্ত পল্লী-কবি গোবিন্দ দাসের বুকফাটা হাহাকারে দেশবাসীর চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দেয় নাই। অর্দ্ধাশনে, অনশনে, উপেক্ষায়, অত্যাচারে বিড়ম্বিত জীবন কাটাইয়াও মরণের পারে দাঁড়াইয়া দুর্ভাগ্য কবি আশার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার চিতাভস্মের উপর অনুতপ্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধার মঠ আজো উঠে নাই, তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্ত আজ লুপ্ত হইতে বসি-য়াছে! কবি দুর্গামোহনের "পল্লী" আজ বিস্মৃতপ্রায়, অনাদৃত রোগজীর্ণ কবির নাম কয়জন জানে? পূর্ব্ব-বঙ্গের আর একজন অজ্ঞাতনামা কবি কুলচন্দ্র দে যে অপরিমেয় পল্লী-প্রীতির পরিচয় তাঁহার সুমধুর গীতি-কবিতায় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পরে কয়জন কাব্য-রসিক তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন?

পদ্মা, মেঘনা, বুড়ীগঙ্গার কূলে কূলে যে ব্যথা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, যে ব্যথা জাহ্নবী ও অজয়ের কূলে করুণ হইয়া বাজিয়াছে, "পল্লীব্যথা" তাহারই অপরূপ প্রতিধ্বনি। এ ব্যথা কল্পনা-জীবির সৌখীন ব্যথা নয়, ইহা দরদীর অশ্রুজল। কবি গভীর দুঃখে পল্লীকে সম্বোধন করিয়াছেন:—

"আমার পল্লী-রাণী,
লুপ্ত তোমার দীপ্ত গরিমা, কণ্ঠে নাহিক বাণী।
গৌরবময়ী, গৌরবহীনা
দাঁড়াইয়া অয়ি ভিখারিনী দীনা,
উজ্জ্বল-শ্যাম-সুন্দর দেহে আজি কজ্জল-ছায়া;
নয়নে উথলে অশ্রু-সিন্ধু
জলদ-মলিন-বদন-ইন্দু
চরণ-নলিন আর না বিতরে মধুভরা দয়ামায়া!"

"গাঁয়ের কায়ায়" কবি পল্লীর সুখদুঃখময় জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন, "প্রেতের ছায়ায়" অবিচার, অত্যা-চার, নিষ্ঠুরতার বেদনাপ্লুত কাহিনী প্রাণ দিয়া লিখিয়া-ছেন, "ঘরের মায়ায়" পল্লীর নিভৃততম মর্ম্মে সমগ্র জাতির যে প্রাণের উৎস অলক্ষিতে ক্ষীণ হইয়া আসি-তেছে তাহাই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। নবীন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রবীণের প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে, স্থানে স্থানে ভাব ও ছন্দের ত্রুটী ঘটিতে পারে, কিন্তু যে গভীর সহানুভূতি এ গ্রন্থের জন্মদান করিয়াছে তাহা অকৃত্রিম কবি-হৃদয়ের পরিচায়ক। গ্রন্থের প্রারম্ভে কয়টি ছত্রে কবি পল্লীর যে হৃদয়স্পর্শী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিয়া এ ক্ষুদ্র আলোচনার উপসংহার করিতেছি:—

"উষার অরুণ-রাগে ছিলে চারু সজীব তরুণ
শ্যাম-শোভা-মহোৎসবা আঁখিযুগ মমতা করুণ!
ছিল ধৈর্য্য অপ্রমেয় ছিল শৌর্য্য সাহস দুর্জ্জয়,
স্নেহ-শান্ত-নীড়ে তব আর্ত্তপ্রাণ লভিত অভয়।
রূপ ছিল, রস ছিল ছিল গন্ধ সুষমা অতুল
তব গুল্ম-বন্যা মাঝে হারাইত হৃদয়ের কূল।
আজি তুমি প্রেতছায়া প্রাণহীন স্তিমিত-নয়ন
কণ্ঠমালা গাঁথিবারে কর নর-কঙ্কাল চয়ন।"

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

কামনা।

(১)

ছোট করে গড়বে যদি
এমন যেন হই ;
ধূলায় মিশে নিরবধি
চরণ ছুঁয়ে রই।

(২)

অশ্রু যদি বহা'তে চাও
আমার দু'নয়নে ;
তোমার তরে কাঁদ্‌তে দিও
সদা আপন মনে।

(৩)

আগুণ যদি জ্বালাও কভু
আমার কুটীরেতে ;
সুরের আগুণ জিহ্বা মেলি'
জ্বলুক হৃদয়েতে।

(৪)

গুরু বোঝা বুকের' পরে
চাও হে দিতে যদি ;
নিজেই তবে বোঝার ঘরে
থাকবে নিরবধি !

শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

ব্রহ্মদেশে স্বাধীন পর্ত্তুগীজ রাজ্য।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারতভূমির লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া আপন আপন শূন্যগর্ভ পূর্ণ করতঃ যে সমস্ত ইউরোপীয় জাতি সবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আগমন করে। স্থলে তাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও জলপথে বাণিজ্য ও দস্যুতা করিয়া তাহারা প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠে—তাহাদের এই উন্নতি দেখিয়া বহুসংখ্যক ভাগ্যান্বেষী পর্ত্তুগীজের সহিত ফিলিপ দিব্রুতো (Philip De Brito) নামক একজন অসম সাহসী যুবক এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। ঠিক কোন্ সময় এবং কি ভাবে ফিলিপ ভারতবর্ষে আইসেন তাহা জানা যায় নাই কিন্তু এ দেশে আসিবার কিছুদিন পরে তিনি যে আরাকান রাজের অধীন সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাস সে কথা বলিতে নীরব নহে।

আরাকান রাজের বর্ম্মান সৈনিকগণ যুদ্ধের কিছুই জানিত না বলিলেই চলে—তাহারা সে কালের ঢাল, তরোয়াল লইয়াই যুদ্ধ করিত সুতরাং ফিলিপ উন্নত ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে রাজা প্রজা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেনাদলে উচ্চপদ লাভ করিলেন।

এই সময় আভা, পেগু ও তঙ্গুর রাজাদিগের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। আরাকান রাজা এই গৃহ বিবাদের সুযোগে ব্রহ্মের তদানীন্তন রাজধানী সিরিয়াম জয় করিবার অভিপ্রায়ে ফিলিপের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ফিলিপ অসম সাহসী ছিলেন। তাহার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল—তাই স্যালভেডো ও লেরিয়া নামক বন্ধুদ্বয়ের সহকারীতায় অতি অল্প আয়াসেই তিনি সিরিয়াম অধিকার করিয়াছিলেন।

সিরিয়াম জয় করিবার সময়ে ফিলিপ বুঝিলেন যে তাঁহার সুশিক্ষিত সেনাদলের কাছে বর্ম্মান সৈন্যেরা কিছুই নয়—অতি অল্প আয়াসেই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দেশ অধিকার করিতে পারা যায়। এই সুযোগ দেখিয়া তিনি ব্রহ্মদেশের কতক অংশ জয় করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিবার গুপ্ত অভিসন্ধি মনে পোষণ করিয়া তদুদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন—ভগবানের কৃপায় ফিলিপ ইহার এক উপযুক্ত সুযোগও পাইলেন। সিরিয়াম অধিকার করিবার সংবাদ আরাকান রাজের নিকট পৌঁছিলে তিনি অতি মাত্র সন্তুষ্ট হইয়া ফিলিপের

কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকেই বিজিত দেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

সিরিয়ামের শাসনকর্ত্তা হইয়াই ফিলিপ প্রথমতঃ এক শুল্কালয় (custom house) ও পরে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। লোকে বুঝিল, আরাকান রাজের প্রতিনিধি স্বরূপই ফিলিপ এই সব করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুর্গের মধ্যে তিনি তাহার বন্ধু লেবিয়ার নেতৃত্বাধীনে নিজের অভিসন্ধি অনুরূপ একদল সেনা গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। লেবিয়া একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহার শিক্ষাধীনে অতি অল্পদিনের মধ্যে, সেনাদল সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেই ফিলিপ বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া সিরিয়ামের স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন।

এই সংবাদ আরাকানে পৌছিলে রাজা অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক পর্ত্তুগীজকে সমুচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাহার বিরুদ্ধে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আরাকান সৈন্য যুদ্ধ বিদ্যায় নিতান্ত অপটু ছিল, সুতরাং ফিলিপের সুশিক্ষিত সেনার সহিত যুদ্ধে রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল।

এই জয়ে উৎফুল্ল হইয়াও বুদ্ধিমান ফিলিপ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সৈন্য সুশিক্ষিত হইলেও সংখ্যায় মুষ্টিমেয় সুতরাং আরাকান রাজের অসংখ্য সেনার সহিত অধিক দিন যুদ্ধ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। দেশ রক্ষা করিতে হইলে আরো সৈন্যের প্রয়োজন কিন্তু এ দেশে কে তাঁহাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে? কাজেই বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে নিজ দেশবাসীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে—এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় পর্ত্তুগীজ রাজধানী গোয়ায় যাত্রা করিলেন—তাহার অনুপস্থিতি সময়ের জন্য সিরিয়ামের শাসন ভার লেবিয়ার হস্তে থাকিল।

গোয়ায় পৌছিয়া ফিলিপ তথাকার প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার যোগে পর্ত্তুগাল রাজার নিকট যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। পর্ত্তুগাল রাজ অবিলম্বে তাহা মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে ফিলিপের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইল—তিনি মনে করিলেন যে এই সৈন্য লইয়া তিনি দেশ জয় করিয়া রাজ্যে বদ্ধমূল হইলেই পর্ত্তুগাল রাজা ব্রহ্মদেশ দাবী করিয়া বসিবেন—আর তাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতে হইবে। ফিলিপ এ কল্পনায় ভীত হইলেন কারণ পর্ত্তুগাল রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ মাত্র মাসিক ৪৬৲ টাকা ভাতা পাইবার অধিকারী ছিলেন—তাই তিনি তাড়াতাড়ি রাজপ্রদত্ত সাহায্যের বিনিময়ে বার্ষিক কিছু কর দিবার অঙ্গীকার করিয়াই ৬ খানা যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য লইয়া নিজ রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন।

এদিকে ফিলিপের অনুপস্থিতির সুযোগে আরাকান রাজ ও পেগুরাজের মিলিত সৈন্য আসিয়া সিরিয়াম অবরোধ করিয়া বসিল—লেবিয়া প্রাণপণ বলে তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্য সংখ্যায় কম ছিল বলিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ঠিক এই সময়েই রাজদত্ত সাহায্যে বলীয়ান ফিলিপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিপুল বেগে অবরোধকারী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। বর্ম্মান সৈন্য এ বেগ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অবরোধ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। বিজয়ী ফিলিপ এই পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া দেশের পর দেশ জয় করিয়া যাইতে লাগিলেন অবশেষে তাঁহারা পেগু অধিকার করিয়া লইলেন—পেগুরাজ প্রাণ ভয়ে পেগু ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

পেগু অধিকার করিবার পর কিছুদিন বিশ্রাম লইয়া ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভু আরাকান রাজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। আরাকান রাজও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের সমস্ত বল লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন—বিষম যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্যের নিকট

বর্ম্মান সৈন্য তিষ্ঠিতেও পারিল না। আরাকান-রাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন—ফিলিপ রাজকুমারকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। রাজকুমার বন্দী হওয়ায় নিতান্ত উপায়হীন হইয়াই আরাকান রাজ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উভয় পক্ষে সন্ধি হইল—আরাকান-রাজ ফিলিপকে পেগুর স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। ফিলিপও ৫০,০০০, ক্রাউন মূল্য স্বরূপ লইয়া রাজকুমারকে ছাড়িয়া দিলেন।

আরাকান-রাজার সহিত সন্ধি হইবার পর ফিলিপ নিজ রাজ্য স্বাধীন ভাবে শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। সিরিয়ামই তাঁহার রাজ্যের রাজধানী হইল এবং তথায় উপাসনার জন্য গির্জ্জা ও নিজের ও নিজের বর্ম্মান স্ত্রীবর্গের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু উষ্ণরক্ত সৈনিক পুরুষ ফিলিপের এ শান্তির জীবন ভাল লাগিল না। তিনি সামান্য কারণে তঙ্গু রাজার সহিত বিবাদ বাধাইলেন। তঙ্গু-রাজ আভার তদানীন্তন রাজা বর্ম্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী 'মধা-দামার' অধীন ছিলেন। সুতরাং ফিলিপের এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া আভা-রাজ তঙ্গু-রাজের সহিত একযোগে একেবারেই জলপথে ও স্থলপথে সিরিয়াম আক্রমণ করিলেন। এ ১৬১২ খৃষ্টাব্দের কথা। ফিলিপ কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই সম্মিলিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজ রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবানের 'যে দরে নেওয়া সে দরে দেওয়া' বিচারেই এক রাত্রিতে জনৈক বিশ্বাস ঘাতক দুর্গের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলে —দলে দলে বর্ম্মান সৈন্য দুর্গে ঢুকিয়া উহা অধিকার করিল—বহু সৈন্য হত হইল। ফিলিপও তাঁহার বন্ধু লেবিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। ফিলিপ বর্ম্মানদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন তাই তাঁহাকে হাতে পাইয়া প্রতিশোধ স্বরূপ তাহারা রাজধানীর সম্মুখে খোলা যায়গায়ই জীবিত অবস্থায় তাহার দেহ হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লইল—সহনাতীত কষ্ট ভোগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দুই দিন পরে ফিলিপ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ফিলিপের বন্ধু লেভিয়াকে হত্যা করা হইল। অবশিষ্ট বন্দীদিগের মধ্যে কতককে হত ও কতককে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাসিত করা হইল।

এই নির্ব্বাসিত পর্ত্তুগীজদিগের সন্তান সন্ততিদিগকে এখনও উত্তর ব্রহ্মদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্ম্মের মিশ্রনোদ্ভূত এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের উপাসক। তাহারা পর্ত্তুগীজ ভাষা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। এবং সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশবাসীর সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিতে করিতে বর্ত্তমানে তাহারা একেবারে বর্ম্মান বনিয়া গিয়াছে।

ফিলিপের পতনের পর কিঞ্চিন্যূন দেড়শত বৎসর পর্য্যন্তও তাঁহার রাজধানী সিরিয়াম সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে আলোম্প্র নামক একজন ক্ষমতাশালী বর্ম্মান রাজা ইহার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া 'রেঙ্গুন' স্থাপন করেন।

এখন অতীতেরচিহ্ন স্বরূপ, রেঙ্গুন নদীর তিন ক্রোশ ভাটিতে 'সিরিয়াম' নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বুকে ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথিকের মনে অতীতের কত কথা জাগাইয়া দিতেছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

চিত্রকূট-যাত্রা।

এলাহাবাদ থেকে করুই রেলে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। আমরা রাত্রি দশটায় এলাহাবাদ হ'তে রওনা হ'য়ে প্রায় সাড়ে বারটায় মাণিকপুরে এসে পৌঁছ্‌লাম। মাণিকপুর জব্বলপুর লাইনে একটী জংশন। এখান থেকে G. I. P. রেলে করুই যেতে হয়।

বান্দা জেলায় করুই একটী মহকুমা। এখান থেকে চিত্রকূট ছয় মাইল। সেদিন রাত্রিতে মাণিকপুরে কোন ট্রেণ না পাওয়ায় আমরা পরদিন বেলা পৌণে পাঁচটায় করুই এসে পৌঁছলাম এবং বাজারের ভিতর দিয়ে চিত্রকূটের পথে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মাঠে এসে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণ বামপার্শ্বে সুড়কীর রাজার ভগ্ন দুর্গ। সুড়কী চিত্রকূটের পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে।

এবার আমরা ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে লাগলাম। আজ কোজাগর পূর্ণিমা। সন্ধ্যা হয় হয়। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দশদিক প্রমোদিত। সবই সুন্দর! আকাশ—চাঁদ—পাহাড়—গাছপালা! সুন্দরে সুন্দরে গাঢ় আলিঙ্গন! সম্মুখে গঙ্গা; জলে অনেকক্ষণ চাঁদের আলো খেলা ক'র্‌ছে। আমরা গঙ্গার ধার দিয়ে একটী সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। অবশেষে গঙ্গা পার হ'য়ে চিত্রকূটে আমাদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। খুব পরিশ্রান্ত হওয়া গিয়েছিল; সুতরাং সে রাত্রির মত বিশ্রামে মন দেওয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'রে আমরা দর্শন ক'র্‌তে বেরিয়ে পড়লাম। মন্দাকিনী বামপার্শ্বে রেখে আমরা তীর দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে বড় বড় দেবালয়, পাণ্ডাদের বাড়ী ও দু'চার-খানি খাবারের দোকান। এখানে বহু বানর জটলা পাকিয়ে ব'সে ছিল।

প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আমরা কামদানাথ পর্ব্বতে এসে উপস্থিত হ'লাম। ভগবান রামচন্দ্র জনকতনয়ার সহিত এই পর্ব্বতটীতেই বাস ক'রেছিলেন; এজন্য চিত্রকূটবাসীরা পর্ব্বতটীকে শালগ্রাম শিলার ন্যায় জ্ঞান করে এবং কেহ তাতে আরোহণ করে না। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন তিন শ' বাটটী। এই মন্দির-গুলি পান্নার মহারাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আমরা পর্ব্বত প্রদক্ষিণে ও বিভিন্ন মন্দিরে নানা দেবদেবী দর্শনে নিযুক্ত হ'লাম। ভক্তজন এখানে আকুল হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে অচিরে বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন; এ জন্যই নাকি এ পর্ব্বতের নাম কামদানাথ হয়েছে। পরিক্রমণের পথে কামদানাথ দর্শন ক'রে আমরা ধন্য হ'লাম। এই স্থানে একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শিলা পর্ব্বত ভেদ ক'রে বহির্গত হ'য়েছে। আমরা প্রতিপদে নব নব মন্দির ও অসংখ্য দেবদেবী দর্শন ক'র্‌তে ক'র্‌তে অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

সম্মুখে পান্নার মহারাজ আমানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী দেবালয়। এখানে ভরতমিলন হয়। দুটী ছোট মন্দিরের একটীতে জনকতনয়া ও অপরটীতে লক্ষ্মণের এবং একটী বৃহৎ মন্দিরে ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের পদচিহ্ন পরি-রক্ষিত হ'য়েছে। এখানে ভক্তরাজ তুলসীদাসের একটী মূর্ত্তি আছে।

আমাদের বাম পার্শ্বে লক্ষ্মণ পাহাড়। লক্ষ্মণ পাহাড়ের পথ পরিক্রমণ-পথের বাইরে হ'লেও আমরা তা দেখবার লোভ সম্বরণ ক'র্‌তে পারলাম না। পাহাড়ে সুমিত্রা নন্দনকে দর্শনান্তর পুরোহিতের নিকট অবগত হওয়া গেল,—প্রায় তিনশ'বৎসর পূর্ব্বে বীরবর লক্ষ্মণের উপস্থিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিটী এখানে পাওয়া যায় এবং তদুপলক্ষে রেওয়ার মহারাজ লছমনসিংহ এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করেন।

কামদানাথ পরিক্রমণ ক'রতে প্রায় চার পাঁচ মাইল হাট্‌তে হয়। আমরা কিছু দূরে একটী পাঠশালায় এসে উপস্থিত হ'লাম। গুরু মহাশয়ের সহিত অনেক কথা বার্ত্তার পর পাণ্ডাদের সম্বন্ধে আলাপ হ'ল। এই সকল পাণ্ডাদের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মণগণের খাওয়া দাওয়া, বিবাহাদি কোনপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই; যেহেতু পাণ্ডারা সর্ব্বসাধারণের দান গ্রহণ ক'রে পতিত হ'য়েছে। কামাখ্যা প্রভৃতি আরও কতকগুলি তীর্থে পাণ্ডাগণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা দেখেছি।

সীতাপুর, জানকীকুণ্ড, কটকশিলা প্রভৃতি আটটী * স্থান ল'য়ে চিত্রকূট। ইহার আয়তন প্রায় পাঁচ ক্রোশ; এ জন্য অপর নাম পঞ্চক্রোশী। পঞ্চক্রোশীর লোক সংখ্যা প্রায় চার হাজার। চিত্রকূট হ'তে পাঁচ মাইল দূরে ভরতকূপ। মহানুভব ভরত ভগবান রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক মানসে যে তীর্থসলিল সঙ্গে এনেছিলেন তা এই কূপে নিক্ষেপ করেন। চিত্রকূট হ'তে কিছু দূরে মত্ত গজেন্দ্রনাথ নামক একটী আশ্রম আছে। মত্ত গজেন্দ্রনাথ পূর্ব্বকালের এক রাজার নাম। তিনি পরম রাম ভক্ত ছিলেন এবং ভগবান রামচন্দ্র তাঁর সঙ্গে এই আশ্রমে কিছুদিন বাস ক'রেছিলেন। চিত্রকূট-মাহাত্ম্যে মত্ত গজেন্দ্রনাথের বিষয় বর্ণিত হ'য়েছে। আমরা মাষ্টার মহাশয়ের প্রণীত তুলসীদাসের একখানি জীবনী কিনে ল'য়ে তাঁর নিকট হ'তে বিদায় নিলাম।

আমরা রামশয্যায় যাব; সুতরাং পরিক্রমণের পথ পরিত্যাগ করে একটী ভিন্ন রাস্তায় অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম ক'রে রামশয্যায় উপস্থিত হওয়া গেল। একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরের নামই রামশয্যা। ভগবান রামচন্দ্র ও জনকতনয়া অনেক সময় এই প্রস্তরোপরি শয়ন ক'রে থাক্‌তেন। অদূরে একটী বিল্বমূলে লক্ষ্মণের ব'সবার জায়গা। সুভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ধনুহস্তে এই স্থানে বিরাজ ক'র্‌তেন। এ স্থানটী অতি নির্জ্জন ও প্রশান্ত! অধিক বেলা হওয়ায় আমরা আর বেশী বিলম্ব ক'রতে পারলাম না। পিপাসা লাগায় নিকটস্থ বৃক্ষ হ'তে কএকটী আমলকী সংগ্রহ ক'রে খেতে খেতে পরিক্রমণের পথে ফিরে এলাম। পরিক্রমণ শেষ ক'রে বাসায় ফিরতে প্রায় একটা বেজে গেল।

পরদিন সকালে উঠে আমরা হনুমানধারা দর্শনে বহির্গত হ'লাম। আমরা একটী সঙ্কীর্ণ বন্যপথে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। হনুমানধারা এখানকার উচ্চতম পাহাড় এবং আমরা তাতে আরোহণ ক'রতে বেশ একটু পরিশ্রান্তও হ'লাম। এখানে একটী অনতিবৃহৎ ধারা ও মহাবীরের একটী মূর্ত্তি আছে। আমরা পাহাড়ের উচ্চতম প্রদেশে উঠে বিশ্রাম ক'রতে লাগলাম। সেখানে একটী ছোট মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখান হ'তে দেবাঙ্গনা, কর্কী প্রভৃতি তীর্থে যেতে হয়। আমাদের ভাগ্যে আর সে সুযোগ ঘটে উঠ্‌ল' না। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তর আমরা চিত্রকূটে ফিরে এলাম এবং বৈকালে এলাহাবাদ-উদ্দেশে ষ্টেশনে রওনা হওয়া গেল।—

শ্রীকাঞ্চনকিশোর ধর।

* অন্য পাচটীর নাম যথা,—নয়াগাঁও, প্রমোদবন, জনস্থানী, গুপ্ত গোদাবরী ও খহি।

ভরা ভাদরে।

আকাশ ভরা কাল মেঘের বসন নিবিড় মেলা রে!
ঝরঝরিয়ে ঝরছে বারি সন্ধ্যা সকাল বেলা রে!
কোথায় রবি কোথায় শশী কোথায় তারার পাঁতি রে!
মেঘের কোলে ঘুমায় সবে আজকে দিবস রাতি রে!
কদম্ব-কেয়া চম্‌কে উঠে বিলায় পরাগ সমীরে!
শীর্ণা-নদী যৌবন লভি' ছুট্‌ছে কোথায় আঁধারে!
মত্ত বায়ু মাতাল সম কর্‌ছে আঘাত দুয়ারে!
সকল হৃদি পাগল হয়ে খুঁজ্‌ছে কেবল কাহারে?
একটু যার মুখের হাসি করত আকুল পরাণে!
পরাণ-প্রিয়া মোর সে জনা কোথায় রে আজ কে জানে!
যুগল বাহু কাঁদ্‌ছে মোর বাঁধতে হিয়ায় তাহারে!
কাঁদ্‌ছে হিয়া পরশ-মধু পেতেগো বক্ষ মাঝারে!
ভরা-ভাদর বৃথাই আজ কুটীর মোর শূন্য রে!
আবার তারে পাব কি ফিরে আছে কি হেন পুণ্য রে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পুস্তক পরিচয়।

মহাজন সখা—ব্যবসা শিখিবার করিবার ও জানিবার চুড়ান্ত পুস্তক। চন্দননগর হইতে শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সন্তোষবাবু দীর্ঘকাল ব্যবসা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার তত্ত্বগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। আজকাল দেশের লোকের যেরূপ ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ পুস্তকের যে যথেষ্ট প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে তাহাতে ইহা সাধারণে যে কিরূপ সাদর গৃহীত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা নূতন ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা এই পুস্তকে অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। বাংলা ভাষায় এই সকল পুস্তক যতই মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

চয়ন।

(কাগজের উপাদান)

বাঙ্গালার বৎসরে কত টাকার কাগজ লাগে? অমৃত বাজার পত্রিকা বলিতেছেন, ১৯২০ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তিনমাসে বাঙ্গালার জন্য প্যাক করিবার কাগজ ৬৪৯৮৩০ টাকার, ছাপিবার কাগজ ৩৫৬৮০৫৩ টাকার, লিখিবার ও [illegible]লেপ তৈয়ারী করিবার কাগজ ৩১৪৮৪৪৪ টাকার, এবং অন্যান্য প্রকারের কাগজ ২৬৯৮৯০০ টাকার আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া পেষ্ট বোর্ড, মিল বোর্ড, কার্ড বোর্ড প্রভৃতিও কিছু আমদানী হইয়াছিল। ঐ তিনমাসে একমাত্র বাঙ্গলাদেশেই মোট ১১৬৫৪৯২৮ টাকার কাগজ আমদানী হয়। প্রত্যেক তিন মাসেই কি একই পরিমাণ কাগজ আমদানী হয়? সে কথা ঠিক বলা যায় না। তবে এইরূপ অনুমান করিয়া হিসাব করিলে বলিতে হয়, বাঙ্গলাদেশে এক বৎসরে উহার ৪ গুণ অর্থাৎ ৪৬৬১৯৭১২ টাকার কাগজ আমদানী হয়। একমাত্র বাঙ্গলাদেশে যদি এই পরিমাণ কাগজ প্রতি বৎসর দরকার হয় তাহা হইলে সমগ্র ভারতে কত টাকার কাগজ লাগিতে পারে? সেটা আমরা এখন অনুমান করিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ যে খুব বেশী সেটা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায়। অথচ কাগজ প্রস্তুত করিবার উপকরণ—কাঁচা মাল প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে, এবং কতক এই বাঙ্গালা দেশেই পাওয়া যাইতে পারে। এবং বিশেষ আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। উপাদানের কোন অভাব নাই; কেবল মাত্র উদ্যোগী লোকের অভাবে—আমাদেরই অবহেলায় এত টাকা অনর্থক আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তেমন চেষ্টা থাকিলে একটু অবহিত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে আমরা উহার কিয়দংশ নিশ্চয়ই এদেশে রাখিতে পারি। যুদ্ধের আগে কাগজের মূল্য খুব সস্তা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে কাগজের আমদানী যুদ্ধের নিয়মানুসারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; এবং সুইডেন, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যে কাগজ আসিতে পারিত জার্ম্মাণ সবম্যারিণ বাণিজ্য জাহাজ ডুবাইয়া দিতে আরম্ভ করায় তাহার পরিমাণও খুব কমিয়া গেল। তখন কাগজের উপাদানের অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হইল। এবং নানা আলোচনায়

পর স্থির হইল যে বাঁশ হইতে খুব উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। অমনি বড় বড় কোম্পানীরা ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাঁশের জঙ্গল জমা লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে কি না, কিম্বা হইয়া থাকিলে, কি পরিমাণ হইতেছে, সে খবর এখনও পাই নাই।

বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইলেও, বাঁশ আরও অনেক কাজে লাগে। এদেশে গরীবদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বাঁশই সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। সেই বাঁশ হইতে যদি কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা হইলে বাঁশের মূল্য বাড়িয়া গিয়া গরীব লোকদের অত্যন্ত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বাঁশ ছাড়া, এমন অনেক জিনিস এদেশে আছে যাহা এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে; কিন্তু চেষ্টা করিলে সেগুলাকে কাজে লাগাইতে পারা যায়—তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার একটা প্রমাণ সম্প্রতি লাটসাহেবের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর গত ১লা আগষ্ট তারিখে ঢাকায় কৃষি বিভাগের বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠকের উদ্বোধন উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, ঢাকায় কৃষি বিভাগীয় পরীক্ষাগারে সুপারির খোসা হইতে অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

সুপারি বাঙ্গলা দেশে, ভারতে সমুদ্রোপকূলে এবং আরও নানাস্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এই সুপারি খোসা এতদিন জঞ্জাল স্বরূপ বিবেচিত হইতেছিল। ইহাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা বড় জোর উনুনে পোড়ানোয় পর্য্যবসিত হইত। আজ সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রে ইহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইল। দুই দিন পরে কলকারখানায় ইহা কাগজের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে; তখন ইহার একটা বাজার দরও দাঁড়াইয়া যাইবে। কিন্তু এত দিন ইহাত নষ্টই হইতেছিল বলিতে হইবে। এইরূপ নষ্ট হওয়া জিনিসকে কাজে লাগানোই ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির প্রধান লক্ষণ। সুপারি যে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে সেইখানকার স্থানীয় লোকেরা ইহার সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু কতকটা শিক্ষার অভাবে, কতকটা উদ্যমশীলতার অভাবে এই জিনিসটি এতদিন নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কেবল সুপারির খোসা কেন, আরও এমন অনেক জিনিস এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, যাহা কাগজের বা অন্য কোন প্রকার শিল্প দ্রব্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চা-পান উপলক্ষে চিনি যেমন সর্ব্বসাধারণের নিত্য দুই বেলা ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, চিনির মূল্যাধিক্যবশতঃ উহা তেমনি একটা বিরাট সমস্যাও হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে নানাস্থানে ইক্ষু যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। কিন্তু যাবা, মরিসনের চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া না উঠায় এদেশের চিনির কারখানাগুলি উঠিয়া গিয়াছে। এখন ইক্ষু হইতে কেবলমাত্র গুড় উৎপন্ন হয়।

ইক্ষুক্ষেত্রের কাছেই প্রায় গুড় প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। আখমারা কলে ইক্ষু হইতে রস বাহির করিয়া লইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ছিবরেটা কি হয়? উহা শুকাইয়া ইক্ষু রস জ্বাল দিবার ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। অথচ, ইক্ষুর ছিবড়া হইতে অতি উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। যদি হয়, তাহা হইলে চিনি সমস্যারও একটা সমাধান হওয়া অসম্ভব নয়। এক একটা বড় কারখানায় যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু ব্যবহৃত হয়। এই সকল কারখানার সঙ্গে আকের ছিবড়া হইতে paper pulp প্রস্তুত করিবার জন্যও যদি একটা কারখানা খোলা হয়, তাহা হইলে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার পড়তা কিছু কম হইবার সম্ভাবনা। আর গুড়ের কারখানার সঙ্গে যদি paper pulp এর কারখানা স্থাপন করিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে paper pulp এর জন্য স্বতন্ত্র একটা

শি দুইটা কারখানাও খোলা যাইতে পারে ; এবং গুড়ের কারখানা হইতে আখের ছিবড়ে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা হইতে paper pulp প্রস্তুতও করা যাইতে পারে। আকের ছিবড়া হইতে কাগজ এবং চিনি প্রস্তুত করিবার পর মাৎগুড় হইতে স্পিরিট প্রস্তুত করিলে মোটের উপর চিনির পড়তা অনেকটা কমিয়া যাইবেই।

শুনিলাম, কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্যাকাটি (পাটকাটি) হইতে paper pulp প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। ইহা অতি সুখের, অত্যন্ত আনন্দের কথা। এই পাটকাটি জিনিসটাও এতদিন পোড়াইয়া নষ্ট করা যাইতেছিল। ইহা হইতে যদি paper pulp হয় তাহা হইলেও untilization of waste product হিসাবে ইহাও আমাদের economic লাভ—খুব মোটা রকমের একটা লাভ। কারণ, পাট এদেশে খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; এবং পাটকাটিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।

তার পর, আমাদের দেশে এমন অনেক লতাপাতা, ঘাস পাতা, তৃণ জন্মে ; যাহার মধ্য হইতে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে, কাগজ ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের উপাদান পাওয়া কঠিন নয়।

আমরা তিন প্রকার ডেঙ্গো ডাটা খাই। সেই ডেঙ্গো ডাটা চিবাইয়া যে ছিবড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতেও কাগজের উপাদান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আরও, আমাদের বিবেচনায়, খেজুর গাছের পাতা হইতেও কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শাক আলুর উপরের শক্ত খোসাটাতেও কাগজের উপাদান থাকা সম্ভব। উদ্যোগী রাসায়নিকেরা এই সকল জিনিস লইয়া পরীক্ষা করিলে, সকল ক্ষেত্রে না হউক, কোন কোন ক্ষেত্রে যে কৃতকার্য্য হইবে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এখন ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক ছাত্র বি-এস সি, এম-এসসি পাশ হইয়া বাহির হইতেছেন, অথচ জীবিকা অর্জ্জনের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহারা লাগুন না? আর দেশের ধনীরা তাঁহাদের ল্যাবরেটরী করিয়া দিয়া সাহায্য করুন না?

(নায়ক)

প্রতিভা

১২শ বর্ষ | ভাদ্র ১৩২৮ | ৫ম সংখ্যা

সমাজ সংস্কারক উদয়ানাচার্য্য।

মহারাজা আদিশূর এ দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বহুকাল পরে বল্লাল সেন তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। এবং পরে সমাজপতি উদয়ানাচার্য্য ভাদুড়ী তাঁহাদিগের সমাজ সংস্কার করেন।

অনুমান খৃঃ ১৩১৯ বা তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে সোনারগঞ্জের মুসলমান নবাব বাহাদুর খাঁর আমলে বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী (বাল্যাটি) গ্রামে মহাত্মা উদয়ানাচার্য্যের জন্ম হয়।

বিশ্বকোষ অভিধানে উদয়ানাচার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনু-সংহিতার সুবিখ্যাত টীকাকার কল্লুক ভট্টের সমসাময়িক এবং এই উদয়ানাচার্য্যই কুসুমাঞ্জলী প্রণয়ন করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[illegible] বংশাবলী নামক গ্রন্থে উদয়ানাচার্য্যকে বল্লালের সমসাময়িক ও লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক প্রকারে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, উদয়ানাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক নহেন এবং লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাঁহার অস্তিত্বই ছিল না।

বারেন্দ্র শ্রেণীয় কুলাচার্য্যগণ মধ্যে উ[illegible] কুসুমাঞ্জলী প্রণয়ন করেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলি[illegible] এবং তিনি তর্কযুদ্ধে অনেকানেক বৌদ্ধ ও জৈন [illegible] দলকে পরাজিত করেন। একদা তর্কে পরা[illegible] ব্রাহ্মণ জাতীয় শ্রবণ উদয়ানাচার্য্য দ্বারা নি[illegible] ব্রহ্মহত্যা পাপের স্খলন মানসে উদয়ানাচার্য্য তীর্থশ্রেষ্ঠ জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন কিন্তু পুরীর বিখ্যাত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া উদয়ানাচার্য্য জগন্নাথের দর্শন লাভে বঞ্চিত হন।

"সংক্ষেপে শঙ্কর জয়" নামক উপাখ্যান [illegible] দশতম অধ্যায়ে উদয়ানাচার্য্যের উল্লেখ [illegible] ইহাতে, উদয়ানাচার্য্য কুমারিলভট্ট, ময়ূরভ[illegible] দণ্ডী আচার্য্য, বিষ্ণুশর্ম্মা, ব্রহ্মগুপ্ত, অভিনব গুপ্ত, শ্রীহর্ষ, মুরারী

মিশ্র, নীলকণ্ঠ ও হরবন্তের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে এই উদয়নাচার্য্য ও ন্যায় কুসুমাঞ্জলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা এক নহেন। কুসুমাঞ্জলী প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের জন্ম মিথিলায় ছিল। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশ্বকোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকেই কুসুমাঞ্জলী প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমাজ সংস্কারক বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি আছে।

কুলশাস্ত্রদীপিকায় উদয়নাচার্য্যের বিদ্যাবত্তার ও ধীশক্তির পরিচয় আছে। ঐ গ্রন্থে তিনি যে সমাজ সংস্কার করেন তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশাবলী।

আদিশূর রাজার কান্যকুব্জের কুলাঞ্চ গ্রাম হইতে আনিত কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের বংশাবলী।

বীতরাগ কাশ্যপগোত্র কান্যকুব্জ)।

(১) সুষেণ (আনিত)

(২) ব্রহ্মাওঝা

(৩) দক্ষ

(৪) পিতাম্বর

(৫) শান্তনু

(কাহারও মতে শান্তনু পিতা ও পিতাম্বর পুত্র)।

(৬) হিরণ্যগর্ভ

(৭) ভূগর্ভ

(৮) বেদগর্ভ

(৯) পিপনি মহামুনি

(১০) সর্ব্বরেখ (বারেন্দ্র) ভবদেব (রাঢ়ী)

(এই সময় বল্লাল সেনের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগানুসারে)

(১১) সিন্ধুওঝা

(১২) ক্রতু ওরফে কেতাই ভাদুরী কুলীন; মধু ওরফে মেতাই মৈত্র কুলীন; গরুড় (দবক)।

(এই সময় বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপিত হয়)

(১৩) শর্ব্বাণ

(১৪) ভল্লুকাচার্য্য

(১৫) যোগেশ্বর (ভাদুড়ী গাঞি) ঢাকা জেলা; দিবাকর (করঞ্জ গাঞি) পাবনা জেলা।

(১৬) যোগেশ্বর

(১৭) পুণ্ডরিকাক্ষ

(১৮) বিশ্বম্ভরাচার্য্য

(১৯) লক্ষ্মীপতি

(২০) বৃহস্পতি আচার্য্য

(২১) উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী
ভাদুড়ী বংশ আরম্ভ।

বৃহস্পতি আচার্য্য সমাজ সংস্কারক ও সমাজের অনেক নেতা ছিলেন। এবং ব্রাহ্মণ সমাজের আচার্য্য ছিলেন। ইনি একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিজের জীবনদণ্ড পণ রাখিয়া কাশীরাজ-সভায় বৌদ্ধাচার্য্য গিরির সহিত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন অবশেষে পরাস্ত হইয়া রাজ আজ্ঞায় বনে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

বর্ত্তমান ঢাকা জেলায় বালিহাটী বা বালিয়াটি অথবা বাল্যাটি গ্রামে উদয়নাচার্য্যের জন্ম হয়। ইনি শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। কাহারও কাহারও মতে

১৩২৮ খৃঃ ইনি বিখ্যাত হন। উদয়নাচার্য্য একজন কৃতবিদ্য ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গলাদেশে এ পর্য্যন্ত আর কেহ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার তীর্থপর্য্যটন সময়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে শঙ্করাচার্য্য সহ সপ্তাহকাল ব্যাপি যে তর্ক বিতর্ক হয় তাহাই দিগ্দেশ বিখ্যাত। ইনি একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার কৃত ন্যায়গ্রন্থ কুসুমাঞ্জলী একাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত সমাজে আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। এতৎব্যতীত "তীর্থ মাহাত্ম্য" প্রভৃতি আরো অনেক গ্রন্থ ইহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে। ইনি বাঙ্গলাদেশের এমন কি বরেন্দ্র ও রাঢ় দেশের ব্রাহ্মণ সমাজের সমাজপতি ছিলেন, এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

বল্লাল সেন যৎকালে বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন, তখন কান্যাকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশ বহুসংখ্যক হইয়াছিল। এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে স্থানে স্থানে বাস ও ব্যাভিচার দোষে দূষিত হইতেছিলেন, সে জন্য বল্লাল সেন ঐ সকল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি বারেন্দ্র দেশবাসী ১০০ শত ঘর ব্রাহ্মণকে বারেন্দ্র এবং গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ী আখ্যা প্রদান করেন। তিনি বারেন্দ্র দেশস্থ ১০০ শত ঘর ব্রাহ্মণের সম্মানরক্ষার্থ এবং তাঁহারা ক্রমে সদাচারী হইবেন উদ্দেশ্যে ইহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনায়, কুলীন, সিদ্ধ ও কষ্টশ্রোত্রীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কুলীন হইবেন।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥"

উল্লিখিত নয়টী গুণ কুলীনের বর্ত্তমান থাকিবে। ইহাপেক্ষা একগুণ ন্যূনগুণবিশিষ্টদিগকে সিদ্ধশ্রোত্রীয় আখ্যা দেন এবং তদপেক্ষা ন্যূনগুণবানদিগকে কষ্টশ্রোত্রীয় বলিয়া স্থির করেন।

বঙ্গদেশীয় ১০০ শত ঘর ব্রাহ্মণমধ্যে ৮ ঘর কুলীন এবং ৮ ঘর সিদ্ধশ্রোত্রীয় এতদ্ব্যতীত ৮৪ ঘর ব্রাহ্মণকে কষ্টশ্রোত্রীয় করিয়াছিলেন।

১১৩৭ খৃঃ বল্লাল সেন এইরূপে কুলমর্য্যাদা স্থাপন করিয়া ইহার ৩৬ বৎসর পর দ্বিতীয়বার বাছনী হইবার নিয়ম করেন। ১১৭৩ খৃঃ বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন এই কুলমর্য্যাদা দ্বিতীয়বার বাছনী করেন। এই বাছনীর সময় সমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। এমন কি তাহাতে গালাগালি মারামারি পর্য্যন্তও হয়। এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া লক্ষ্মণসেন ভবিষ্যতে নির্ব্বাচণ প্রথা উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করেন যে, সেই অবধি কৌলিন্য মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইবে। এবং পুত্রকন্যার বিবাহ দ্বারা সেই মর্য্যাদা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারিবে। পুনরায় আর নির্ব্বাচণ করিয়া মর্য্যাদা প্রদান করা হইবে না। এই নিয়ম দ্বারা সমাজের একটী গোলযোগের শান্তি হইল বটে কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানাধিকার কালে, নানা প্রকার অনাচার আরম্ভ হইল। এবং তাহার ফলে সামাজিক গোলযোগ উদ্ভব হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমান নবাবের অনুগ্রহে জমিদার হইয়া নিজ নিজ আধিপত্য প্রকাশ পূর্ব্বক আপন আপন মতানুসারে কার্য্য করিতেছিলেন। কুলীনের বংশধরগণ শত সহস্র বিগর্হিতাচরণ করিলেও তাহারা কুলীন এবং শ্রোত্রীয়ের সন্তানগণ শ্রোত্রীয় থাকিতে লাগিলেন।

ইহার বহু বৎসর পর (বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গলা জয়ের প্রায় ১২৫ বৎসর পর) উদয়নাচার্য্যের সমাজে প্রতিপত্তি জন্মে। উদয়নাচার্য্য একজন কৃতবিদ্য ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আপন ক্ষমতা বলে নিজ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমে তাঁহার ব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে সমাজে গৃহীত হইতে থাকে। তিনি এই সময় ব্যবস্থা করেন যে, কুলীনগণের সন্তান কুলীন এবং শ্রোত্রীয়ের সন্তান শ্রোত্রীয়ই থাকিবে।

[illegible]গণের বিবাহ কালে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা অর্থাৎ "করণ" এবং শ্রোত্রীয়ের ফোটার ব্যবস্থা হইবে। কুলীনের কন্যা কুলীনে এবং শ্রোত্রিয়ের কন্যা শ্রোত্রীয়ে এবং কুলীনে বিবাহ হইতে পারিবে। কুলীনদিগের ভগ্নি ও কন্যা না থাকিলেও কুশময় কল্পণ করিতে হইবে। অর্থাৎ কুশ দ্বারা কন্যা অথবা ভগ্নি প্রস্তুত করতঃ মন্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর বিবাহ করার নাম "করণ" এই প্রথা একাল পর্য্যন্ত কুলীন ও কাপদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

[illegible] উদয়নাচার্য্য তাহার লীলাবতী নাম্নী আপন দুহিতাকে বল্লভাচার্য্য লাহিড়ীর সহিত বিবাহ দেওয়া কালীন "করণ" ও পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। পরে বিভিন্ন স্থানের কুলীনগণও উদয়নাচার্য্যের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এবং একাল পর্য্যন্ত বারেন্দ্র সমাজে তাহা দৃঢ়তার সহিত চলিয়া আসিতেছে।

এই করণ করিবার নিয়ম এই যে; কন্যা-কর্ত্তা ও বর কর্ত্তা অথবা বর বিবাহ দিবসে কোন পুষ্করিণীর জলে দাঁড়াইয়া কুশময়ী কন্যা পরস্পর ভগ্নি বা কন্যারূপে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও সমাজস্থ সকলে পরিবৃত হইয়া বাদ্যোদ্যম দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বিবাহ করিয়া পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করতঃ ঐ কুশময়ী বিবাহিতা কন্যাকে জলমজ্জন করেন। ইহাই কুল ডুবাইয়া পরস্পর সমান জ্ঞানে আপন পুত্র কন্যাদের বিবাহ প্রদান করেন।

উদয়নাচার্য্য শ্রোত্রীয়দিগের যে ফোটা দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা এই যে, সিদ্ধ শ্রোত্রীয়েরা কুলীনে কন্যা সম্প্রদান কালে ফোটা প্রদান করিলে, তাহাদিগের আপন পদ মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে এবং কষ্ট শ্রোত্রীয়গণ ফোটা দ্বারা কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিলে, তাহারা সিদ্ধ শ্রোত্রীয় পদ লাভ করিবে। কুলীনের কন্যা শ্রোত্রীয় গ্রহণ করিলে, উক্ত কুলীন শ্রোত্রীয় হইবে।

উদয়নাচার্য্যের এই বিধি ব্যবস্থা বর্ত্তমান কালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কুলীনদিগের মধ্যে কাল স্বরূপ হইয়াছে। সেকালে এই বিবাহ প্রথা দ্বারা মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। কোন দিন যাহা সমাজে গৌরবের বিষয় ছিল, কাল প্রভাবে, শিক্ষার বিপর্য্যয়ে চির পরিবর্ত্তনে তাহারই অনাদর উপস্থিত হইয়াছে। কুল মর্য্যাদার পরিবর্ত্তে, দালান পুষ্করিণী জোহার সিন্দুক টিনের ঘর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি কুলমর্য্যাদা হইয়াছে।

এই সকল দ্বারা পুত্রগণের মর্য্যাদা স্থিরিকরণ হইয়া পুত্র মর্য্যাদা রক্ষার পরিবর্ত্তে পুত্র বিক্রয় ব্যবসা হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান সময়ে এই ব্যবসা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কন্যাদায়গ্রস্থের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। কত কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, কত পুত্রবান সম্পত্তিশালী হইতেছেন। ফলে অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানে আর "গৌড়ী" দানের ফল লাভ করিতে কেহই সক্ষম হইতেছেন না। কত কন্যা, পিতার এই দুরবস্থার কালস্বরূপিনি হইয়া অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন দিতেছেন, তথাপি সমাজের এই নিয়ম ও উদয়নাচার্য্যের বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে কেহই সাহসী হইতেছেন না। সর্ব্বস্ব পণ দিয়াও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সকলেই প্রয়াসী তথাপি কুলান্তরে বা সমাজান্তরে কেহই যাইতে রাজি নহেন, এত শিক্ষা এত জ্ঞান তথাপি পূর্ব্বতন সমাজসংস্কারে কেহই সাহসী নহেন বা মেল ও দাবি ছাড়া বিবাহ দিতে স্বীকৃত নহেন। ধন্য সমাজ! ধন্য শিক্ষা!

যাহাহউক কালক্রমে ঐ "করণ" তিন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম কুলজ করণ:—পিতার মৃত্যু হইলে সন্তান বা ভগ্নি দ্বারা যে পরিবর্ত্ত "করণ" হয় তাহা কুলজ করণ বলিয়া অভিহিত।

দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন করণ:—যে যে কুলীন পুত্র কন্যার আদান প্রদান করিবেন তাঁহারা বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, কুলজ্ঞ ব্যক্তির সমক্ষে কুশময়ী কন্যা বা ভগ্নি আদান প্রদানের মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা জলমগ্ন করিবেন। ইহাই আদান প্রদান সম্বন্ধীয় "পরিবর্ত্ত করণ"।

তৃতীয় উপকারে করণ ঃ—উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী শ্রোত্রীয় কন্যা বিবাহ করা প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন নাই। ক্রমাগত ছয়টী শ্রোত্রীয় কন্যা গ্রহণ করা হইলে উদয়নাচার্য্যের মতে ছয় শ্রোত্রীয় দোষ বলিয়া গণ্য হইত। এজন্য কোন কুলীন কোন শ্রোত্রীয় কন্যা বিবাহ করিলে, তাহার বা তৎপুত্রের সামাজিক দোষ হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য এই করণ করিতে হইত। ইহাকেই উপকারে করণ বলিয়া থাকে।

জনশ্রুতি যে উদয়নাচার্য্যের প্রথম পক্ষের স্ত্রী একদা নিত্যাহ্নিক সমাপনান্তে নির্ম্মাল্য ধারণোপলক্ষে একটী চাঁপা ফুল মস্তকে ধারণ করেন। (কাহারও কাহারও মতে চাঁপা ফুলের মালা গলদেশে ধারণ করেন) তাহাতে বর্ষীয়সী হইয়াও বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া উদয়নাচার্য্য এই স্ত্রীকে বর্জ্জন করেন। কেহ কেহ বলেন উদয়নাচার্য্যের দুই স্ত্রী ছিল এবং তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতিই সমধিক অনুরাগী ছিলেন; সেই জন্য উভয় স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্বদা কলহ হইত। উদয়নাচার্য্য দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পক্ষ হইয়া প্রথমাকে তিরস্কার করিতেন। একদিন ১মা স্ত্রী সে জন্য উদয়নাচার্য্যকে শাসন করেন, সেই অপরাধে তিনি প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে বর্জ্জন করেন। সামান্য একটী নির্ম্মাল্য পুষ্প মস্তকে ধারণ করায় স্ত্রী পরিত্যাগ করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সে কারণ দ্বিতীয় প্রকার মতের পোষকতাই করা উচিত।

যাহা হউক তিনি প্রথমা পত্নীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বর্জ্জন করিলেও তাঁহার উক্ত পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ মাতাকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায়, উদয়নাচার্য্য পুত্রগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কুলভ্রষ্ট করেন। কিন্তু ভূপতি, ভবানীপতি প্রভৃতি ছয় ভ্রাতা পিতার ব্যবস্থা অমান্য করতঃ আপনাদিগকে প্রকৃত কুলীন বলিয়া "পরিবর্ত্ত ও করণ" করিতে লাগিলেন এবং ইহাদের দলও ক্রমে পুষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু প্রধান প্রধান শ্রোত্রীয়েরা উদয়নাচার্য্যের পক্ষে থাকায় কালক্রমে ইহারা সকলেই কুলভ্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ছয় ভ্রাতার দল বলিয়া প্রথমতঃ ইহাদিগকে "ছয়ভিয়ার দল" আখ্যা দেওয়া হয়। ইহারা কুলীন বলিয়া কপটতা করিতেন এই কারণ ইহাদিগকে "কাপ" বলা হয়। "কাপ" শব্দ "কপট" শব্দের অপভ্রংশ। কুলীন ও শ্রোত্রীয়দিগের মধ্যে এই সময় ও ইহার পরে, "ভট্টাঘাত" ও "ভরতাঘাত" ইত্যাদি কয়েকটী আঘাত জন্মে। এই সকল আঘাতপ্রাপ্ত কুলীনগণ এবং দীর্ঘকাল পরে কুলীন শ্রেষ্ঠ মধুমৈত্রের পরিত্যক্ত পুত্রদ্বয় সদলে কাপের সহিত যোগ দেওয়ায় কাপের দল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাপের দল ক্রমশঃ প্রবল হওয়ায় তাহাদের অত্যাচারে কুলীনেরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। কুলীনেরা কাপদিগকে সমাজে কোনরূপ সম্মান করিতেন না। তাহাদিগকে এরূপ পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করিতেন যে, তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার সংস্পর্শেও কুলপাত হইত। এমন কি একঘাটে স্নানের সময় কাপের জল কুলীনের গায় লাগিলেও কুলপাত হইত। এই সুযোগ পাইয়া কাপগণ কুলীনদিগকে জল ছিটা দিয়া, বলপূর্ব্বক তাহাদের সহিত পংক্তি ভোজন করিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার সংস্পর্শে আনাইয়া তাহাদের দলভুক্ত করিতে লাগিলেন। উদয়নাচার্য্য পরিশেষে পুত্রগণের প্রতি সদয় হইয়া দয়া প্রকাশ করতঃ এইমাত্র উপকার করিতে সক্ষম হইলেন যে, তাহাদের মধ্যেও "করণ" ব্যবস্থাপিত হইল। কিন্তু হিন্দুসমাজের কঠিন রীতি কিছুতেই বিতাড়িত হইল না। প্রচলিত রীতি-নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে হিন্দুসমাজে যে কলঙ্ক হয়, বহুকাল পরে তাহার শিথিলতা ঘটিলেও তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। উদয়নাচার্য্য প্রধান সমাজপতি হইলেও ক্রোধবশতঃ একবার যাহা করিলেন পরিশেষে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা আর নিবারিত করিতে পারিলেন না। এইরূপে

"...রের" সৃষ্টি হইল। কালক্রমে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রীয়ের উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূর হইয়াছে, সম্মান সমান হইয়াছে। অর্থের মধ্যে সম্মান প্রবেশ করিয়াছে, কেবল-মাত্র পুত্র কন্যার বিবাহ লইয়া সমাজ বর্ত্তমান আছে। এককালে যাহা সমাজের কঠিন নিগড়াবদ্ধ ছিল এক্ষণে তাহা বিবাহ কালে ব্যবস্থাপিত হইতেছে মাত্র। সে কালের একটী বিবাহ বিবরণ বোধ হয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনায় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কুলশাস্ত্রদীপিকায় লিখিত আছে :—

কোন একজন ব্রাহ্মণের বাড়ী ভোজন উপলক্ষে শান্তিপুর নিবাসী নরসিংহ লাউড়িয়ানের নিমন্ত্রণ ছিল। তখনকার হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে সমাজস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণ উপস্থিত না হইলে, তাহাদিগের উপস্থিত হওয়ার জন্য ভোজনে অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ নামে থাকিলেও কার্য্যতায় কিছুই নাই। এখন আর সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না; কাহারও অসুখ, কাহারও কাচারী, কাহারও স্কুল, কাহারও বাড়ীতে কাজ আছে ইত্যাদি বা ছলনায় নিমন্ত্রণকারীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, অনেক স্থলে সমুদয় ভোজ্য প্রস্তুত না হইতেই ভোজনে বসাইতে হয়। সুদূর পল্লীসমাজে যদিও সমাজের অনেকটা বিধি-ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে তথাপি সেকাল অপেক্ষা অনেক নিয়মেই শিথিল হইয়াছে। তখনকার কালে নববধূর পাকস্পর্শে একটা বিরাট সামাজিক ভোজের ব্যবস্থা ছিল এখন অনেক স্থলে তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পুত্রের পিতা কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে টাকা লইয়া সিন্দুক পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত থাকেন, সমাজের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না। এইরূপে ক্রমেই সমাজের বিধিব্যবস্থা শিথিল হইয়াছে ও হই-তেছে। যাহা হউক সেই দিবস সেই ভোজে তবিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইল। নরসিংহ লাউড়িয়ানের জন্য কেহই অপেক্ষা না করিয়া সকলেই আহারার্থে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমত সময় তিনি উপস্থিত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা না করার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, সকলেই সুমিষ্ট ভৎসনা বাক্যে বলিলেন যে, আপনি স্বয়ং উচ্চ-পদস্থ বা সম্ভ্রমশালী কোন কুলীনের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন নাই যে, আপনার জন্য উপস্থিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা করিতে পারেন। এই ব্যবহারে নরসিংহ লাউড়িয়ান আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে করিতে লাগিলেন। এই অপমানের উপযুক্ত দণ্ডবিধান অথবা উচ্চপদাভিষিক্ত হওয়ার চিন্তায় তিনি জর্জ্জরিত হইলেন। তিনি অতি সামান্য লোক সুতরাং তাহার এই দুরাকাঙ্ক্ষা সুসিদ্ধ হওয়ার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া পরিশেষে তৎকালীক অতি সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশোদ্ভব মধুমৈত্র অথবা ধেঁই বাগচির সহিত আপন দুহিতার পরিণয় সম্পাদন করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া আপন স্ত্রীপুত্রসহ নৌকা পথে যাত্রা করিলেন। রাজ-সাহী জেলার অন্তর্গত মাজগ্রামে মধুমৈত্রের বসতী ছিল, তিনি প্রাতঃস্নানান্তে সন্ধ্যোপাসনা এবং তর্পন করিতেছিলেন, এমন সময়ে নরসিংহ সপরিবারে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিয়া করণ করার জন্য অনুরোধ করিলেন। মধুমৈত্র কুলীন সুতরাং শ্রোত্রীয়ের সহিত করণ করিতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারেন না বলিলেন। নরসিংহ আপন স্ত্রীপুত্র কন্যাকে হত্যা করিয়া পরিশেষে তাঁহার সমক্ষে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মধুমৈত্র ধর্ম্মভীরু সুতরাং ব্রাহ্মণবধের ভয়ে অগত্যা সম্মত হইয়া নর-সিংহের কন্যাকে বিবাহ করতঃ তাহার সহিত করণসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। একালে সেরূপ হইলে, ব্রহ্মহত্যাত দূরের কথা—স্ত্রীহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি সমাজে যে সকল পাপের উল্লেখ আছে সমস্তগুলি হইলেও এরূপ বিবাহে কেহ রাজী হইতেন না।

মধুমৈত্রের এই বিবাহই সমাজে মহা অনর্থের মূল হইল, এই বিবাহ হইতেই রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত "কাপ" অভিধার উদ্ভব হইল। মধুমৈত্রের পুত্রগণ তাঁহার সহিত আহারাদি পরিত্যাগ করিলেন, পিতা পুত্রে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। পুত্রগণ স্বতন্ত্ররূপে এক বাড়ীর মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মধুমৈত্রের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধেঁই বাগচি এবং কুলীন ও শ্রোত্রীয় সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিসকল নিমন্ত্রিত হইলেন। ধেঁই বাগচি উক্ত মধুমৈত্রের ভগ্নিপতি। উভয়েই একতাবদ্ধ হইলেন সুতরাং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মতে ঐক্য হইলেন। এই সময় মধুমৈত্রের পুত্রগণের সহিত বিবাদের বিষয় মিমাংসা হইল। পুত্রগণের অপরাধ সিদ্ধান্ত হইল। তাঁহারা আপন পিতার সহিত কুটীল ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কুলীন সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইলেন। তাঁহাদিগের এই "কুটীল" ব্যবহারকে সচরাচর সকলে "কাপ করা" বলিতে লাগিল। তদনুসারে ইঁহারা "কাপ" নামে অভিহিত হইলেন। ইহারা কুলীনের সহিত আচার ব্যবহারাদি করিতে পারিলেন না। ইহারাই ক্রমে এক দলবদ্ধ হইয়া কাপ সমাজভুক্ত হইতে লাগিলেন।

কুলীন ও কাপদিগের মধ্যে এই সময় ও ইহার পরে কয়েকটী "আঘাত" জন্মে। এই সকল আঘাতপ্রাপ্ত কুলীনগণ কাপদিগের সহিত মিলিত হওয়ায় তাহাদের দল পুষ্ট হইতে থাকে। কিজন্য বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মধ্যে আঘাতে "কাপ" ও অবসাদে পঠির উদ্ভব হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, অথবা ঐ সকল কার্য্য করার সন্দেহ প্রযুক্ত যে সকল দোষারোপ এবং সমাজের অনৈক্যতা বশতঃ যে ঘটনা উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐ কার্য্যের দণ্ডবিধান "আঘাত" ও অবসাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সময়ে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে ভাবের দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে ঐ সকল ঘটনায় সুখ্যাতি ও অপবাদের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। ইহাই কুলজ্ঞ গ্রন্থে আঘাতে-কাপ ও অবসাদে-পঠি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ভট্টাঘাত, ভরতাঘাত, বউ নেওয়া ঘাত এই তিন আঘাতে কাপের সৃষ্টি বলিয়া কুলজ্ঞ গ্রন্থে লিখিত আছে।

"নিতাই ত্যাগ করিল পুত্র কেশাই ছাড়িল ভাই"
ভরতাঘাতে কুলীন টোটে লেখা জোখা নাই।

উদয়নাচার্য্য কুলীন ও কাপের করণ এবং শ্রোত্রীয়ের ফোটার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাই মূল ব্যবস্থা স্বরূপ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে ঐ সকল মূল ব্যবস্থার সূত্র হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা কি ভাবে হইয়াছে তাহার যথাযথ বিবরণ কোন পৌরাণিক গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না অথবা তাহা লেখকের অজ্ঞাত আছে। ঐ সকল ব্যবস্থাও উদয়নাচার্য্যের ব্যবস্থার সহিত মিশ্রিত হইয়া বারেন্দ্র সমাজে একাল পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং তাহা কুলশাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি কার্য্য এরূপভাবে নিশিদ্ধ আছে যে, ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহার ফল "করণ" এবং "ফোটা"র ন্যায় হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্য্যকৃত ব্যবস্থা ও পরবর্ত্তী ব্যবস্থা সকল এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, ঠিক কোন্গুলি উদয়নাচার্য্যের তাহা সম্যকরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই, যাহা হউক নিম্নে সে সকল ব্যবস্থা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। স গোত্রে করণ হইবে না।

২। যে গ্রামীন কুলীনের সহিত একবার করণ করা হয়, অন্য গ্রামীন কুলীনের সহিত করণ না করিলে, পুনরায় সেই গ্রামীন কুলীনের সহিত করণ হইতে

পারে না। ঐ প্রকার "করণ" করা হইলে "কুশে কুশে" দেখা হওয়া বলে। তজ্জন্য কুলভঙ্গ হইবে না বটে কিন্তু সে কুলীন দোষ দুষ্ট হইবে। পরে বিশুদ্ধ করণ দ্বারা দোষ স্খলন হইতে পারে।

৩। পিতা বর্ত্তমানে কুলীন পুত্রের করণ করিবার অধিকার নাই।

৪। অনুপবীত ব্যক্তি করণ করিতে পারিবে না। কারণ বিবাহ মন্ত্র বেদ। " অসংস্কৃত সুত শ্রেষ্ঠো না পারো বেদ পারগঃ। "

৫। স্ত্রীলোকে করণ করিতে পারেন না। কারণ, " করণ " দান গ্রহণ ও প্রদানের অন্যতর নাম। করণের নিয়মে, যেরূপ কন্যা দানের নিয়ম হইয়াছে তদ্রূপ উভয় পক্ষের কন্যা গ্রহণেরও নিয়ম হইয়াছে। শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকের এজন্য দান গ্রহণের কোন নিয়ম না থাকায় স্ত্রীলোকের করণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৬। কুলীনের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার পুত্রগণকে পিতার " কুশে " থাকা বলে। পিতা বর্ত্তমানে কুলীন ভ্রাতাগণের মধ্যে যদি কেহ কাপের সহিত করণ করেন, তাহা হইলে উক্ত কুলীন ও কাপ এবং তাহার ভ্রাতা ও পিতা দোষগ্রস্ত হইয়া "পোকরা" দোষ যুক্ত হন। তাহারা কুলীনের মধ্যে করণ করিতে পারে না। তাহাদিগকে "স্থগিদ" কুলীন বলে। কিন্তু তাহারা কাপ সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইতে পারেন।

৭। পিতার মৃত্যুর পর কুশ পৃথক না হইলে, কুলীন ভ্রাতাগণের মধ্যে যদি কেহ কাপের সহিত করণ করেন, তাহা হইলে, অন্যান্য ভ্রাতাগণ দোষযুক্ত হন, এবং তাহাদিগকে "ভাইকরা" কুলীন বলে।

৮। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ আপন আপন কুশ পৃথক করার জন্য সকলই পৃথক পৃথক করণ করিতে বাধ্য। এই সকল করণ কুশময় হইয়া থাকে। এই করণের নাম "কুলজ" করণ। পিতা বর্ত্তমানে এরূপ করণ হয় না।

৯। কুলীনের পিতা স্বয়ং অথবা তাঁহার অনুমতি অনুসারে পুত্রগণ যদি কাপের সহিত করণ করেন তাহা হইলে, তাঁহারা কুলীন সমাজে ব্যবহৃত নহেন। কিন্তু পিতার অনভিমতে যদি কোন পুত্র ঐরূপ করণ করেন এবং পিতা যদি ঐ পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন কুলীনগণ কুলীনের মধ্যে পরিগণিত হইতে দেখা যায় না।

১০। উক্ত অপবাদ নিষ্কৃতির জন্য কুলীনের মধ্যে যে করণ হয় তাহাকে "উপকার" করণ বলে।

১১। কোন কুলীন অথবা কাপের অজ্ঞাতে এবং অনভিমতে তাহাদের পুত্র অথবা অন্য কোন বন্ধু কর্তৃক কুলীনের কন্যা কাপে অথবা শ্রোত্রীয়ে এবং কাপের কন্যা শ্রোত্রীয়ে বিবাহ দেওয়া হইলে, উক্ত কুলীন প্রথমোক্ত কারণে কাপ এবং শেষোক্ত করণে কুলীন ও কাপ উভয়েই শ্রোত্রীয় হন। ইহার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা সমাজে নাই।

১২। কাপ ইচ্ছা করিলে, জীবিতাবস্থায় সন্তানগণকে কুশ পৃথক করিয়া দিতে পারেন, এরূপ কুশ পৃথক করায় পিতা বর্ত্তমানে সন্তানগণের করণ করার অধিকার জন্মে। কিন্তু পিতার আর করণ করার অধিকার থাকে না। এই কুশ পৃথক করিয়া দেওয়ার পর পিতার কোন সন্তান জন্মিলে, উক্ত সন্তানের "গর্ভশূড়া" অপবাদ হয়। এবং তাহার করণ করিবার অধিকার থাকে না। কিন্তু পূর্ব্ব কুশ পৃথক করা পুত্রগণ কোন দোষযুক্ত হয় না। কুলীনের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ আছে।

১৩। করণ ব্যতীত স্ব শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ কুলীন এবং কাপ উভয়েরই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কুলীনত্বং পরিবর্ত্তং কল্পিতং কুলপঞ্জিকাং।
কন্যায়াঃ প্রতি দানেন শ্রোত্রিয়ত্বং বিধিয়তে॥

(কুলশাস্ত্র)

১৭। কুলীন অথবা কাপের বস্ত্রহীনা কন্যা কাপে করণ ব্যতীত গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু শ্রোত্রীয়ে দান করিলে, তিনি শ্রোত্রীয় হইবেন।

এতদ্ব্যতীত কুলশাস্ত্রদীপিকা, কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থে আরো কতকগুলি নিয়ম আছে তাহা বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত হয় না বলিয়া সেগুলি এস্থলে উল্লেখ করা হইল না।

উদয়নাচার্য্যের সময়ে সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল নিম্নে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

কুলীন অথবা কাপ স্বীয় কুল হইতে কোন কারণে বিচ্যুত হইলে, সপত্নী সহোদর ভ্রাতাও তাহার "বরাত" বা অনুমতি অনুসারে শ্রাদ্ধ এবং বিবাহের সময় কন্যাদান করিতে পারেন না।

কুলীনগণ কাপ অথবা শ্রোত্রীয় সমাজে বিবাহোপলক্ষে উপস্থিত হইলে এবং তদুপলক্ষে ভোজন করিলে, সম্মান অর্থাৎ লৌকিকতা অর্থ এবং বস্ত্র উভয় দ্বারা অথবা স্থান বিশেষে কেবল অর্থ দ্বারা সম্মানিত হইতেন। বিবাহ ব্যতীত কুলীন অন্য শ্রেণীর বাড়ীতে ভোজন করিলে, কেবল প্রথম বারের জন্য তদ্রূপ সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন। কাপও শ্রোত্রীয়ের নিকট তদ্রূপ পাইবার অধিকারী। কুল-সম্মানের চিহ্নস্বরূপ এ নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সিদ্ধ শ্রোত্রীয়গণও এরূপস্থলে সম্মানপ্রাপ্ত হন তবে কাপও কুলীন অপেক্ষা কম পাইবেন।

কুলীনদিগের যে "কুলজ করণ" করার নিয়ম আছে তাহা সচরাচর সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের ঘাটে হইয়া থাকে। তাহাতেই শ্রোত্রীয়ের "ঘাটে করণ" করা বলে। যে শ্রোত্রীয়ের ঘাটে করণ হয় তিনি সিদ্ধ শ্রোত্রীয় এবং সম্মানিত। এইরূপ করণের সময় কুলীনগণ সম্মান পাইয়া থাকেন।

ঘাট শব্দ পুষ্করণী, নদী অথবা কোন জলাশয়ে যে শ্রোত্রীয়ের ঘাটে করণ হয় তাহার কোন জলাশয় থাকিলে, তাহাতেই করণ হইয়া থাকে। যে শ্রোত্রীয়ের ঘাটে ঐরূপ করণ হয় তিনি কষ্ট শ্রোত্রীয় হইলেও সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।

কুলীনগণ দোষগ্রস্ত হইলে কোন শ্রোত্রীয়ের সহায়তায় করণ করতঃ কুলীন মধ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিলে উক্ত শ্রোত্রীয় সিদ্ধ এবং নায়ক শ্রোত্রীয় উপাধি প্রাপ্ত হন।

পঠীবদ্ধ শ্রোত্রীয়ের পঠী বিভাগানুসারে আপন আপন পঠীতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। উচ্চ পঠীতে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইলে প্রথমতঃ কাপে কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। ইহাকেই "কাপ ব্যবধান" দেওয়া বলিত। কৌলিন্য মর্য্যাদার শিথিল হওয়ায় এই নিয়ম এক্ষণে প্রায় রহিত হইয়াছে। যাহারা পঠী বদ্ধ নহেন তাহারা যদেচ্ছা কন্যাদান করিতে পারেন। ফলতঃ শ্রোত্রীয়েরা কাপ ও কুলীন উভয় শ্রেণীতেই কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন।

পঠীবদ্ধ কুলীনগণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কুলীনের নিম্ন শ্রেণীর কুলীনের সহিত বিবাহ হয় না। এক পঠীর মধ্যে যাহারা উচ্চ শ্রেণীর তাহারা নিম্ন শ্রেণীর সহিত করণ করা অপমান জনক বোধ করেন। কাপের সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

এক মতের কুলীন অন্য মতের কন্যা গ্রহণ অপমানজনক বোধ করেন। ঐরূপ কন্যা গ্রহণ করিলে তিনি ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

যে কাপ কুলীনের সহিত করণ এবং সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করেন তাহাকেই "আঢ্য" কাপ বলে। আঢ্য কাপ অন্য কাপের সহিত করণ করিতে স্বীকার করেন না। তাহা করিলে তাহাদের আঢ্যত্ব বজায় থাকে না।

কাপ, কুলীনের সহিত করণ করিলে তাহাকে কুলীনের ভাবে এবং অন্য কাপের সহিত করণ করিলে,

তাহাকে সেই কাপের ভাবে থাকা বলে এবং তাহাকে ঐ কুলীনেরা কাপের পাছে যাওয়া বলে।

"অপুত্রে নৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্র প্রতিনিধি সদা।
পিণ্ডোদক ক্রিয়া হেতোঃ নাম সংকীর্ত্তনায়॥"

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্র দ্বাদশ প্রকার তন্মধ্যে কলিযুগে ঔরষ এবং দত্তক পুত্রের বিধান আছে। পুত্রের সহিত জন্মদাতা পিতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ থাকে না। জাতিভেদ সম্বন্ধে হিন্দুর যে জাতি কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে। কুলশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি নিম্ন পদগামী হইতে পারেন কিন্তু নীচ পদস্থ ব্যক্তি কখনও উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণগণ সদাচারানুষ্ঠানে বিরত হইয়া অধর্ম্মাচরণ দ্বারা শূদ্র হইতে পারেন কিন্তু শূদ্র জাতী বিশেষ সদাচারী হইলেও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। হিন্দু শাস্ত্রের এই মূল নিয়ম অনুসারে কুলশাস্ত্রের এই ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কুলীন কর্ত্তৃক কাপ অথবা শ্রোত্রীয়ের পুত্র দত্তক গৃহীত হইলে, উক্ত পুত্র তাহার জনক পিতার কুলমর্য্যাদানুসারে কাপ অথবা শ্রোত্রীয় হইবেন। ঐরূপে কাপও শ্রোত্রীয় হইবেন। কুলীনের পুত্র কাপ দ্বারা শ্রোত্রীয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, দত্তক দাতা কুলীন কাপ অথবা শ্রোত্রীয়ের দোষে দোষী হইবেন। ঐরূপে কাপও শ্রোত্রীয়ান্তর দোষে দোষী হইবেন।

কৌলিন্য মর্য্যাদা আরম্ভ হইতে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণের অসাধারণ ক্ষমতাও প্রভূত ছিল। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র আর্য্য জাতিগণ যেরূপ বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে বাধ্য, কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণের মত গ্রহণ করিতে বারেন্দ্র সমাজের সকলেই তদ্রূপ বাধ্য ছিলেন। কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচারের ভার কুলজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। সমাজ ধর্ম্মে অতি ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যাধিকারী এবং কুলীন কাপও শ্রোত্রীয়গণও দরিদ্র কুলজ্ঞের নিকট অবনত মস্তকে থাকিতেন। কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচারের ভার কুলজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। বিবাহ সম্বন্ধ তাঁহারা স্থির করিয়া দিতেন। বিবাহ কালে কন্যা কর্ত্তা বরকে যে পণ বা কুল মর্য্যাদা দিতে বাধ্য তাহাও কুলজ্ঞগণ স্থির করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন নিলামের ডাক হইত না। কেহ দুই হাজার কেহ পাঁচ হাজার এরূপ ডাকা ডাকির নিয়ম ছিল না। বর কর্ত্তার কন্যা পছন্দ হইলে এবং কুল ও পঠী সমভাবপন্ন হইলে অথবা উচ্চ নীচ হইলেও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইত, পরে কুলজ্ঞ যাহা মর্য্যাদা বা "পণ" স্থির করিয়া দিতেন কন্যা কর্ত্তা বরকে তাহাই দিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ পণ ২১৲টাকা হইতে ১০১৲টাকার বেশী ছিল না। এবং কন্যাকর্ত্তা সালঙ্কারা পট্টবস্ত্র পরিহিতা কন্যা সম্প্রদান করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন হাজার হাজার টাকার গহনার ফর্দ্দ হইত না। তখন এত গহনাও প্রচলিত ছিল না। রৌপ্য নির্ম্মিত গহনাই অধিক ছিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত গহনা অতি অল্পই ছিল। শাঁখা ও সাড়ি পিতা কন্যাকে দিতেন এবং বর লোহার "খাড়ু" বধুকে পড়াইতেন। সিঁথিতে সিন্দুর বিবাহের বা সধবার চিহ্ন ছিল। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যারই সমধিক বিবাহ হইত। বরের বয়সও ২১ বৎসরের প্রায় অধিক হইত না। ঋতুবতী কন্যার বিবাহ দেওয়া মহাপাপ বলিয়া গন্য ছিল। উভয় পক্ষে আনন্দের সহিত কুটাম্বতায় আবদ্ধ হইতেন। এবং আত্মীয় স্বজন, বন্ধু—বান্ধব ও প্রতিবাসীদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেন। সেদিন কি সুখের ছিল। আর এখন অষ্টম স্থলে ষোড়ষ বর্ষীয়া ঋতুবতী কন্যা ৩০।৩২ বৎসরের বরের সহিত বিবাহের নিয়ম হইয়াছে। এবং নিলাম ডাকে পণ নিরূপণ হওয়ার প্রথা হওয়ায় ফলে কন্যা ও পুত্র উভয়েরই উপযুক্ত সময় বিবাহ হইতেছে না। এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবাহ হেতু সমাজ ও জাতীর পক্ষে সমধিক ক্ষতি হইতেছে তাহা কেহই অনুধাবন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। বর্ত্তমান সময়ে এই পণ প্রথা নিবারণের জন্য বহু স্থানে সভা সমিতি হইতেছে বটে;

ফলে পণের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। যতদিন হিন্দু সমাজের যুবকগণ এই পণ লইয়া বিবাহ করা অন্যায় জ্ঞানে তাহার পিতার এইরূপ অন্যায় আয়ের পথ রুদ্ধ না করিতেছেন এবং যতদিন কন্যাগণ এইরূপ পণ দিয়া বিবাহ দেওয়ার স্বীকৃত না হইয়া আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণপূর্ব্বক অবিবাহিতা থাকিতে স্বীকার না করিতেছেন ততদিন এ পাপ প্রথা সমাজ হইতে কিছুতেই দূরীভূত হইবে না।

রাজসাহী জেলার খাজগ্রাম (মধ্যগ্রাম) ও পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামের কুলজ্ঞগণ বারেন্দ্র সমাজে বিখ্যাত ছিলেন। সমাজের বিধি ব্যবস্থা কার্য্যতঃ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এখন আর কুলজ্ঞদিগের ব্যবস্থা ও বিচার কেহ গ্রহণ করেন না। এবং পণপ্রথা নিলাম ডাকের বন্দোবস্ত হওয়ায় কুলজ্ঞদিগের দ্বারা আর কেহ সম্বন্ধ স্থির করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না। পতিকেই কুলজ্ঞগণ ব্যবসান্তর গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের কুলশাস্ত্র এখনও তাঁহাদের পৈত্রিক দপ্তরে কীট দষ্ট হইতেছে।

উদয়নাচার্য্য সমাজের যে সকল বিধি ব্যবস্থা ও সংস্কার করিয়া গিয়াছেন একাল পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে কেবল বিবাহ কালেই তাহার মূল ভিত্তি চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরিবর্ত্তন বা সংস্কার এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে সক্ষম হইলেন না। উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে রাজসাহী জেলান্তর্গত তাহের পুরের রাজা কংশনারায়ণ কিছু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়াছিলেন। রাজা কংশ নারায়ণ প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিব।

উদয়নাচার্য্য বহুকাল জীবিত ছিলেন। তৎপর তিনি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া কোথায় কোন সময় স্বর্গারোহণ করেন তাহার কোন উল্লেখ কোন গ্রন্থে বা জনশ্রুতিতে আমরা অবগত হইতে পারি নাই। উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব বহু জমিদার, তালুকদার, কাপ কুলীন ও শ্রোত্রীয় বহু শাখা প্রশাখায় বঙ্গদেশে এখনও উদয়নাচার্য্যের বংশোধর বলিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

পথের তৃণ।

এই যে ছোট পথের তৃণ
ধূলায় যে ঐ পায়ের নীচে,
ভাব্‌ছ তারে বড়ই হীন,
রইছে বলে-ই রইছে বেঁচে।
যতই তারে ভাব্‌ছ খাটো,
অধম যতই লওগো মানি'
হোক্ সে ধরায় সবার ছোট
চিত্ত যে তার বিশ্বখানি।
ফুল যে ফুটে ভোরের বনে—
নয়কো বনে, তাহার বুকে,
গানটী নাচে তারই প্রাণে
গাইতে পাখী মনের সুখে।
নিত্য ধরার রূপের গাঙে
যেই হাসি-গান আনন্দ-সুর,
সকল শোভা গানের রঙে
রঙিন সারা চেতন ওর।
সমীর ভরা নাচনা তার
ভাষায় গো যেই হর্ষ-সুখ
ক্ষুদ্রের সেই আনন্দ-ভার
ধরবে না তো আমার বুক।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

সাংখ্যদর্শন।

ভূমিকা।

ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম প্রসিদ্ধ দর্শন-সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করা সম্ভবপর কিনা তাহা এতদ্বিষয়ে লব্ধপ্রবেশ সুধীব্যক্তিদিগের নিকটই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে; নতুবা শুধু "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" কেবলই কৃতশ্রমের অনুতাপ। হইতে পারে এ সকল তত্ত্ব কাহারও নিকট পুরাতন তথ্য কাহারওবা নিকট নূতন পথ্য। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে কোন বিষয়েরই উপসংহারে পৌছান যায় না, অথচ সেই বিষয়ে নীরব থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করাও সমীচীন নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অদ্য এই যৎকিঞ্চিৎ সন্দর্ভ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছি। জানিনা ইহাকে কোন্‌ভাবে গ্রহণ করিবেন।

সাংখ্যদর্শনের অন্বর্থ ও অভিব্যক্তি।

নিরীশ্বর ও সেশ্বর ভেদে সাংখ্যদর্শন দুই প্রকার। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর এবং মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগদর্শন সেশ্বর। কাহারও মতে যোগশাস্ত্রের আদি বক্তা হিরণ্যগর্ভ। পতঞ্জলি মুনি তাহার অনুশাসক মাত্র। এই উভয় দর্শনই সাংখ্যনামে অভিহিত। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে সাংখ্য বলিতে একমাত্র কপিল কৃত দর্শনকেই বুঝায়। ভারতীয় ছয় দর্শনের গণনাকালে পাতঞ্জল দর্শনকে স্বতন্ত্র ভাবেই ধরা হয়। যথা (১) সাংখ্য (২) পাতঞ্জল (৩) মীমাংসা (৪) বেদান্ত (৫) ন্যায় ও (৬) বৈশেষিক।

শব্দ ও বর্ণগত সাদৃশ্য দ্বারা সাংখ্য ও সংখ্যা এই দুইটী শব্দ অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। সংখ্যা শব্দে সম্যক্ গণনা বা সম্যক্ কথন অর্থ বুঝায়। কেহ কেহ বলেন "সংখ্যা" হইতেই "সাংখ্য" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা—

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতেচৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রবক্ষতে।
তত্ত্বানিচ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থাৎ এই সাংখ্য দর্শন, প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ এবং তদাতিরিক্ত পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা বা গণনা করে। প্রকৃত পক্ষে সংখ্যা শব্দের অর্থ "সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে অনেন ইতি সাংখ্যঃ অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান। যাহাদ্বারা সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ লাভ করা যায় তাহাই কপিল কৃত সাংখ্য। "সম্যক্ জ্ঞান" এই পদের উল্লেখ আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত ৭১ কারিকার প্রথম ভাগে দেখিতে পাই। যথা "সম্যক্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদী নাম কারণতা প্রাপ্তো ইত্যাদি"। "সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্"। ৭১। এই সম্যক্ জ্ঞান পদের সঙ্গে সাংখ্য শব্দের অর্থ-সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমনও হইতে পারে যে সাংখ্য শব্দে সংখ্যা বুঝায় বা সম্যক্ জ্ঞান বুঝায় এই যে যুক্তি ইহা আমাদেরই স্বকপোলকল্পিত বা নিজের গড়া। এতদ্ভিন্ন অপর কোনও নিঃসন্দিগ্ধ বা নিশ্চয়াত্মক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে যাহাদ্বারা আমরা এই শাস্ত্রকে সাংখ্য শব্দের সমন্বয়ী বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি।

উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও অপর কতিপয় প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে জানা যায়—এক সময়ে নানাবিধ ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মব্যাখ্যা একত্র একই সম্প্রদায়ে এলো মেলো ভাবে প্রচারিত হইতে থাকে এবং কালক্রমে সেইগুলি সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অথচ উহাদের মধ্যে ভূরি ভূরি মতপার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত উহাদেরই অন্তর্গত ধর্ম্মব্যাখ্যা বিশেষ।

সাংখ্যদর্শনের কতিপয় প্রচলিত গ্রন্থ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মূল গ্রন্থ এবং টীকা ও ভাষ্যাদির মধ্যে বর্ত্তমান সময় যে কয়খানি বিশেষ প্রচলিত তন্মধ্যে :—

১। কপিল কৃত—তত্ত্বসমাস বা দ্বাবিংশ সূত্র।

২। যতি কৃত—তত্ত্ব সমাস ব্যাখ্যা।

৩। কপিল কৃত—ষড়ধ্যায়ী সূত্র বা সাংখ্য প্রবচন।
৪। ঐ বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত প্রবচন ভাষ্য।
৫। ঐ অনিরুদ্ধভট্ট কৃত বৃত্তি।
৬। ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্যসপ্ততি বা সাংখ্যকারিকা।
৭। ঐ বাচস্পতি মিশ্র কৃত তত্ত্বকৌমুদী।
৮। ঐ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত পূর্ণিমা।
৯। ঐ গৌড়পাদ ভাষ্য।
১০। বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত সাংখ্যসার।
১১। ঐ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রণীত সাংখ্যসার বিবেক প্রদীপঃ।
১২। পতঞ্জলি প্রণীত (অথবা অনুশাসিত) যোগসূত্র বা পাতঞ্জল দর্শন।
১৩। ঐ ভোজরাজ কৃত বৃত্তি।
১৪। ঐ বেদব্যাস রচিত ব্যাস ভাষ্য।
১৫। ঐ বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ব বৈশারদী (টীকা)
১৬। ঐ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত যোগ বর্ত্তিক।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদয়ের মধ্যে ১, ৩, ৬, ১০, ১২ এই কয়খানাই মূল গ্রন্থ। অপরগুলি ভাষ্য, টীকা ও টীকার টীকা।

ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্র কপিলের রচিত কি না?

তৃতীয় সংখ্যায় উক্ত, ষড়ধ্যায়ী সূত্র বা সাংখ্য প্রবচন গ্রন্থখানা আদ্যন্ত কপিলের রচিত কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ঐ পুস্তকের কিয়দংশ নহে, সমগ্র ভাগই কৃত্রিম, অর্থাৎ মহর্ষি কপিল প্রণীত নহে। সেই অনুমানের প্রতি হেতু এই যে শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র বা তাহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রামাণিক গ্রন্থকার ষড়ধ্যায়ী সূত্রের মতবাদ কুত্রাপি উল্লেখিত বা উদ্ধৃত করিয়া যান নাই। পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ভারতীয় ছয়টী দর্শনেরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এজন্য তাহাকে ষড়্দর্শনের টীকাকার বলা হয়। পরন্তু তিনি নিজেও তত্ত্বকৌমুদীর সমাপ্তি সময়ে আপনাকে "ষড়্দর্শন টীকাকৃৎ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তদ্যথা "ইতি ষড়্দর্শন টীকা কৃদ্বাচস্পতিমিশ্র বিরচিতা সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী সমাপ্তা।" ইনি ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্য সপ্ততিকেই সাংখ্য দর্শনরূপে ধরিয়াছেন এবং ইহারই টীকা করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধীয় অপর কোনও পুস্তকের টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন নাই। অতএব প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সাংখ্যসপ্ততি বা সাংখ্য কারিকাই প্রকৃত সাংখ্যদর্শন। ষড়ধ্যায়ী সূত্র কৃত্রিম,প্রামাণিক নহে অতএব কপিল কৃতও নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে ষড়ধ্যায়ী সূত্রের সমুদয় অংশকেই কৃত্রিম বলিয়া অবহেলা করা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত ও হেতু প্রভৃতির প্রদর্শনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণের প্রামাণ্যমাত্র নহে। বাচস্পতি মিশ্র বা অপর কোনও প্রামাণিক গ্রন্থকার কুত্রাপি ষড়ধ্যায়ী সূত্রের উল্লেখ করেন নাই, এই হেতুতে ষড়ধ্যায়ী সূত্র কপিলকৃত নহে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে "তত্ত্বসমাস" গ্রন্থে অব্যাপ্তি দোষ পতিত হয়, অর্থাৎ তত্ত্বসমাসও তাহা হইলে কপিলের রচিত নহে এমন কথা বলা যায়। যেহেতু "বৃত্তি" ভিন্ন শঙ্করাচার্য্য বা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অপর কোনও প্রামাণিক গ্রন্থকার উহার কোনরূপ টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন নাই। এই স্থানে আরও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে প্রামাণিক গ্রন্থকারের সংজ্ঞা কি? কোন্ কোন্ গুন থাকিলে কেমন ব্যক্তি প্রামাণিক গ্রন্থকার আখ্যা ধারণ করিতে পারেন? একের ধারনায় যিনি প্রামাণিক অপরের ধারণায় হয় ত তিনিই অপ্রামাণিক। সুতরাং এই সমস্ত স্থলে কোনও "সংজ্ঞায়" না পৌছিলে কে প্রামাণিক কে অপ্রমাণিক তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের ত মনে হয় শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বিজ্ঞানভিক্ষুরও যথেষ্ট প্রামাণিকতা আছে। অতএব যেহেতু স্বয়ং বিজ্ঞানভিক্ষু ষড়ধ্যায়ী সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন সেই হেতু ইহা প্রামাণিক এবং কপিলের রচিত।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ কপিলের রচিত না হইলেও কিয়দংশ যে কপিলের রচিত তাহাতে কোনও ভুল নাই। প্রবচন ভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষু একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন,

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"

অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র কাল কবলিত প্রায়, অতএব আমি নিজের রচনা দ্বারা সেই বিনষ্ট প্রায় সাংখ্যকে পূর্ণ করিব। অনেকানেক সমালোচক শুধু ঐ শ্লোকটীমাত্র উদ্ধৃত করিয়াই মোটা গলায় বলিতে চান যে ষড়ধ্যায়ী সূত্রের সকলই কৃত্রিম। তাহারা এতদতিরিক্ত কোনরূপ অনুসন্ধান দ্বারা পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রয়াসী নহেন। আমরা এই স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব ষড়ধ্যায়ী সূত্রের সকল অংশই কৃত্রিম নহে। কতক অংশ কপিলের রচিত বা কপিলের স্বীয় মতের অভিব্যক্তি, কতক অপরের রচিত বা প্রক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশই বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত। প্রাচীনকালে তেমন মহানুভব লোকের অসদ্ভাব ছিল না। যাঁহারা আত্মগোপন করিয়া নিজের রচনা প্রণালীও অনেক সময় "বেনামী" প্রকাশ করিতেন। অহংজ্ঞানের পরিচায়ক "অহন্তা" বা "মমতা" তাঁহাদের ছিল না। ষড়ধ্যায়ী সূত্রের মধ্যেও যে তেমন কয়েকজন পণ্ডিতের রচনা প্রক্ষিপ্ত নাই সেই কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য সূত্রে প্রক্ষিপ্ত রচনা এবং পুনরুক্তি।

এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।" গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে "অথ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সেই অথ শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইল সেই কৈফিয়ৎ নিজেই আবার অপর স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন—"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফল দর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি। ৫।১" এমন ধারা কৈফিয়ৎ অন্যত্র কোথাও বড় দেখা যায় না। বিশেষতঃ অথ শব্দের প্রয়োগ করিলেন প্রথমাধ্যায়ে, আর তার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন পঞ্চমাধ্যায়ে অতএব একটু সন্দেহ আসে না কি? সূত্রকার কোন্ অর্থে কোন্ সূত্র রচনা করিলেন তাহার ভাষ্য বা টীকা করেন অপর ব্যক্তি। অথবা তিনি নিজেই যদি সেই সূত্রের বা সূত্রান্তর্গত শব্দ বিশেষের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা একই অধিকরণে সন্নিবেশিত করেন, কখনও চারি পাঁচ অধ্যায় পরে নহে। আরও দেখুন প্রথম অধ্যায়ের ২৫ সূত্রে "ন বয়ং ষট পদার্থ বাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" এই সূত্র বলিয়া পুনরায় পঞ্চমাধ্যায়ে সূত্র করিলেন "ন ষট্পদার্থ নিয়ম স্তদ্বোধান্মুক্তিঃ" ৮৫। এই একই প্রকারের সূত্র রচনার কোনওগূঢ় অভিপ্রায় দেখা যায় না। হয় ইহাকে পুনরুক্তি, না হয় প্রাক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে "নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ।২০। বস্তুত্বে সিদ্ধান্ত হানিঃ ২১। বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২। বিরুদ্ধোভয়রূপাচেৎ। ২৩। ন তাদৃক্ পদার্থ প্রতীতেঃ। ২৪। ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অবিদ্যার বন্ধ কারণত্ব নিরাকৃত করিয়া পুনরায় পঞ্চমাধ্যায়ে নাবিদ্যা-শক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য। ১৩। তদ্যোগে তৎ সিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। ১৪। ইত্যাদি একই প্রকারের সূত্র রচনা পরিদৃষ্ট হয়। এক বিষয়ের বিচার একই অধিকরণে সমাপ্ত না করিয়া উপষ্টম্ভ ব্যতিরেকে ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে আলোচনা করিলে "স্বল্পাক্ষর মসন্দিগ্ধং সারবৎ গূঢ় নির্ণয়ম" ইত্যাদি সূত্রের লক্ষণ উহাতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। "না বিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য" এই সূত্রের তাৎপর্য্য কালে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন "না বিদ্যাতো বন্ধ ইতি যৎ সিদ্ধান্তিতম্ প্রথম পাদে তত্র পরমতং বিস্তরতঃ প্রঘট্টকেন দূষয়তি।" এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই প্রঘট্টক কাহার রচিত? বিজ্ঞান ভিক্ষু যে, গ্রন্থের আদিতে লিখিয়া গিয়াছেন "ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ। আমাদের বিশ্বাস এই সমস্ত স্থানেই তাঁহার স্বকৃত পূরণ অর্থাৎ নিজের রচনা।

অপরাপর স্থলে হয়ত অন্যের রচনাও থাকিতে পারে, ইনি শুধু তার টীকা করিয়াছেন মাত্র। মোটকথা পঞ্চাধ্যায়ের অধিকাংশ সূত্রই মূল গ্রন্থকার ভিন্ন অপরাপর গ্রন্থকারেরও রচনা। বাহুল্য বিধায় পঞ্চমাধ্যায়ের অপরাপর পুনরুক্তিগুলি উল্লিখিত হইল না। এখন হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া যাউক। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভণিতা টুকু পাঠ করিলেই স্পষ্ট ধারণা হয় যে এই অধ্যায়টী নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত অথবা পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। তথাহি (তাই দেখুন) "অধ্যায় চতুষ্কেণ সমস্ত শাস্ত্রার্থং প্রতিজ্ঞায় পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষ নিরাকরণেন প্রপাদ্য ইদানীং তমেব সারভূত শাস্ত্রার্থং ষষ্ঠাধ্যায়েন সংক্ষিপ্য উপসংহরতি। উক্তার্থানাং হি পুনস্তন্ত্রাখ্যে বিস্তারে কৃতে শিষ্যানো মসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তো দৃঢ়তরো বোধ উৎপদ্যতে, ইত্যতঃ স্থূনানিখননন্যায়া দমুক্তযুক্ত্যাদ্যাপন্যাসাচ্চ নাত্র পৌনরুক্ত্যং দোষায়।" অর্থাৎ প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ করতঃ পঞ্চমাধ্যায়ে বিপক্ষ দলকে দলন করিয়া সম্প্রতি সেই সেই বিষয়ের সারভূত অর্থ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সঙ্কলন পূর্ব্বক গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। কথিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিলে (অর্থাৎ বলা কথা আবারও ছোট খাট করিয়া ফিরাইয়া বলিলে) ছাত্রদের সন্দেহ ভঞ্জন হয়, মিথ্যা জ্ঞান দূর হয় অথচ প্রতিপাদ্য বিষয়ে দৃঢ়তর ধারণা জন্মে। এই হেতু পুনরুক্তি দোষগুলি দোষ স্বরূপ হইতে পারে না।

ইংরেজীতে এতাদৃশ অজুহাতকে "লেম এক্সকিউজ" (Lame Excuse) বা ব্যর্থ ওজর বলা হয়। কণ্ঠক্কুরালয় ইতি প্রশ্নস্যোত্তরণং কথা। ময়ান ভুক্তা রম্ভেতি" "ঠাকুর ঘরে কে হে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যেমন "আজ্ঞে আমি কলা খাই না" এইরূপ উত্তর প্রবাদ বাক্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এই স্থলেও প্রায় তদ্রূপ। ষষ্ঠ অধ্যায়টী যে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর অবিদিত নহে তথাপি তিনি গোড়াতেই সাফাই দিতেছেন "নাত্র পৌনরুক্ত্যং দোষায়।" বিশেষ বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। বুঝ লোক যে জান সন্ধান। স্বকীয় উক্তি সমর্থনের নিমিত্ত পুনরুক্তির স্থলগুলি উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইলে আমাকে হয়ত অনুযোগভাগী বা অভিযোগভাগী হইতে হইবে অতএব আমি এইস্থলে বস্তু সংক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া অতি অল্পই কয়েকটী মোটা মোটা পুনরুক্তির উল্লেখ করিতেছি।

"জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষ বহুত্বম্" ১ম অধ্যায় ১৪৯ সূত্র।
"পুরুষ বহুত্বং ব্যবস্থাতঃ" ৬ষ্ঠ অঃ ৪৫ ,,
গতিশ্রুতিরপ্যুপাধি যোগদাকাশবৎ। ১৫১।
গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপি উপাধিযোগাদ্—
ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ। ৬।৫৯
অধিকারি প্রভেদান্ন নিয়ম। ৩।৭৬।
অধিকারি ত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ৬।২২
স্থির সুখ মাসনম্। ৩।৩৪
স্থির সুখ মাসনম্ ইতি ন নিয়মঃ। ৬।২৪
প্রধান সৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বা দুষ্ট্র কুঙ্কুমবহনবৎ ৩।৫৮
অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্য উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ ৬।৪০

এই প্রকার আরও ভুরি ভুরি সূত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহা প্রায় একার্থক বা সমার্থক। অতএব সন্দেহ হয় উহা বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিতও হইতে পারে, কপিলের রচিতও হইতে পারে এবং অপরাপর বিভিন্ন লেখকের রচিতও হইতে পারে। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ষড়ধ্যায়ীর সমুদয় সূত্র একই লেখকের লেখনী সম্ভূত নহে। কপিলের সূত্র যে ইহার মধ্যে একেবারেই নাই তাহাও শপথ করিয়া বলা যায় না, যেহেতু কপিলের কৃত তত্ত্ব সমাসের তাৎপর্য্য অনুসারে এই গ্রন্থে উহারই বিবৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই স্থানে

তত্ত্বসমাসের সূত্রগুলি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম মূল তত্ত্বসমাস দ্রষ্টব্য, উহাতে মোটেই দ্বাবিংশতি সূত্র। আমাদের মনে হয় এই তত্ত্বসমাস (সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ, অতএব তত্ত্বসমাস অর্থে তত্ত্বসংক্ষেপ) অবলম্বনেই ঈশ্বরকৃষ্ণ তদীয় সাংখ্যকারিকায় সংক্ষেপের বিস্তার করিয়াছেন (১) এবং বিজ্ঞান ভিক্ষু তত্ত্বসমাস অবলম্বনে গ্রথিত কপিলের বিস্তৃত গ্রন্থবরকে ষড়ধ্যায়ী সূত্রনামে সংজ্ঞিত করিয়া স্বয়ং শাখা পল্লবিত করিয়াছেন। (২) অথচ সংশয় হয় অপরাপর দার্শনিকের প্রক্ষিপ্ত সূত্র ও উহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সাংখ্যকারিকায় অধ্যাহর্ত্তব্যস্থল।

এইরূপ সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্য সপ্ততি বিষয়ক দুই একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। এই গ্রন্থের পঞ্চম কারিকায় ব্যক্ত হইয়াছে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। অনুমান পুনরায় ত্রিবিধ। কিন্তু এই ত্রিবিধ অনুমানের স্বরূপ যে কি তাহা না বলিয়াই ইনি ষষ্ঠ কারিকায় বলিলেন "সামান্যত স্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে "সামান্যতো দৃষ্ট" এক প্রকার অনুমান। তথাপি অপর দুই প্রকার অনুমানের বিবরণ উহ্যই রহিয়া গেল। টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু মূল পাঠে এই অধ্যাহর্ত্তব্য বিষয়ের উদ্ধার হইতে পারেনা। ৫০ কারিকায় বলা হইয়াছে আধ্যাত্মিকী তুষ্টি চারি প্রকার। প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য নামধেয়। বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। অতএব সমুদয় নয় প্রকার তুষ্টি। আধ্যাত্মিকী তুষ্টি চারি প্রকার উল্লেখ করিয়া উহাদের নাম করিলেন, কিন্তু বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার বলিয়া উহাদের নাম উল্লেখ করিলেন না। টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে মূল গ্রন্থে আমরা ঐ সকল নাম প্রাপ্ত হইনা। নয় প্রকার তুষ্টি বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা টীকার সাহায্যে অতি সরল ভাবায় যাহা বুঝিয়াছি, নিম্নে তাহা চিত্রাঙ্কনে (in table from) প্রদর্শিত হইল।

আধ্যাত্মিকী তুষ্টি
- (১) প্রকৃতি = অম্ভঃ
- (২) উপাদান = সলিলম্
- (৩) কাল = মেঘঃ (অথবা ওঘঃ)
- (৪) ভাগ্য = বৃষ্টি

বাহ্য তুষ্টি
- (১) অর্জ্জন = পার
- (২) রক্ষণ = সুপার
- (৩) ক্ষয় = পারাপার
- (৪) ভোগ = রম্যক
- (৫) হিংসাদি দোষ নিমিত্তক = সদামুদিত

৯ মোট

৪৬ কারিকায় "এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি তুষ্টি সিদ্ধ্যাখ্যঃ। এবং ৪৭ কারিকায় "পঞ্চ বিপর্য্যয় ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণ বৈকল্যাৎ।" ইত্যাদিতে বিপর্য্যয় শব্দের উল্লেখ আছে এবং বিপর্য্যয়ের ভেদ যে পাঁচ প্রকার তাহাও উক্ত হইয়াছে কিন্তু সেই পাঁচ প্রকার যে কি কি তাহা কষ্ট কল্পনা ব্যতিরেকে অধ্যাহার করা যায় না। বিপর্য্যয়ের মূল সংজ্ঞা না করিয়াই গ্রন্থকার বিপর্য্যয়ের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন "ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ—" ইত্যাদি খুজিতে খুজিতে আমরা এই সমস্ত অবান্তর ভেদের মধ্যে বিপর্য্যয়ের অনুসন্ধান পাই। যথা (১) তমঃ (২) মোহ (৩) মহামোহ (৪) তামিস্র (৫) অন্ধতামিস্র। ইহারাই অন্যত্র যথা ক্রমে (১) অবিদ্যা (২) অস্মিতা (৩) রাগ (৪) দ্বেষ ও (৫) অভিনিবেশ নামে সংজ্ঞিত।

বিজ্ঞান ভিক্ষু ও বাচস্পতি মিশ্রের মত বিরোধ।

বাচস্পতি মিশ্রের টীকা ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য এই দুইটী সম্যক্ আলোচনা করিলে এতদুভয়ের মধ্যে বহু

(১) তথাপি আখ্যায়িকা ভাগ এবং পরমত খণ্ডন বাদ দিয়া তিনিও সংক্ষেপেই ইহা বিবৃত করিয়াছেন।

(২) ষড়ধ্যায়ী সূত্রে আখ্যায়িকা এবং পরমতখণ্ডন উভয়ই আছে।

স্থলেই মতবৈধ পরিলক্ষিত হয়। শুধু যে সাংখ্যদর্শনেই এই দুই প্রকার গ্রন্থকারের মতপার্থক্য তাহা নহে, পাতঞ্জল দর্শনের বহু বহু স্থানে তাহাদের মধ্যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। অপ্রাসঙ্গিক বিধায় যোগদর্শনের ঐক্য অনৈক্য বর্জন করিয়া আমরা এই স্থানে সংক্ষেপতঃ সাংখ্য দর্শনের কতিপয় বিরোধী স্থলের উল্লেখ করিতেছি। বুদ্ধি ধর্ম্ম বা প্রত্যয় সর্গ চারিপ্রকার, (১) বিপর্য্যয় (২) অশক্তি (৩) তুষ্টি (৪) সিদ্ধি। এই সিদ্ধি আবার অষ্টবিধ। তদ্ যথা—

"ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ, সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশ
স্ত্রিবিধঃ॥ ৫১।"

স্থূল মুদ্রাঙ্কিত পদের ব্যাখ্যা এই যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী, সিদ্ধির অঙ্কুশ স্বরূপ অর্থাৎ নিবারক। পূর্ব্বোক্ত তিনটী যে কোন্ তিনটী এবং অঙ্কুশ শব্দেরই বা অর্থ কি ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মত পার্থক্য দেখা যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 'পূর্ব্বোল্লেখিত ঊহ, শব্দ ও অধ্যয়ন এই তিনটী সিদ্ধির অঙ্কুশ (অর্থাৎ আকর্ষক=আকড়া)। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, না তাহা নহে, সিদ্ধিলাভের প্রতি বিপর্য্যয় অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটী অঙ্কুশ (অর্থাৎ বিঘাতক=নিবারক)। আমাদের ত মনে হয় এই স্থানে বাচস্পতি মিশ্রের অভিমতই সমীচীন।

প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের বিবেক বা ভেদজ্ঞানে আত্মার মোক্ষ ইহাই সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতি অচেতনা জড়া পরিণামশালিনী, সত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণধারিণী। প্রকৃতির সংজ্ঞান্তর প্রধান। প্রধানের পর্য্যায় শব্দ যথা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, রসগন্ধবর্জ্জিত, অব্যয়, নিত্য, অনাদি, ধ্রুব, সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, অনাদিনিধন, প্রসবধর্ম্মি, নিরবয়ব, এক ইত্যাদি। পুরুষ, চেতন, অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, নির্গুণ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত; স্বভাব, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিৎ অপ্রসবধর্ম্মা। ইহার পর্য্যায় শব্দ যথা—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, জন্তু, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণী, দেহী ইত্যাদি।

আপত্তি হইতে পারে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই যখন অপ্রসবধর্ম্মা, তখন অপর কোনও তৃতীয় কারণান্তরের প্রয়োজন ব্যতীত বা ঈশ্বর প্রেরণা ব্যতীত অচেতনা প্রকৃতির সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণোদ্দেশ্যে সাংখ্যাচার্য্য বলিতেছেন "বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য" ইত্যাদি ৫৭। বৎস বিবৃদ্ধির নিমিত্ত (অর্থাৎ বাছুরের পরিপুষ্টির জন্য) অচেতন দুগ্ধ যেমন আপনা হইতেই ক্ষরিত হয় তদ্রূপ বদ্ধ পুরুষের মোচনের নিমিত্ত অচেতনা প্রকৃতি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বেদান্ত দর্শনেও "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।" ২।১।২৪ সূত্রে কারণান্তর নিরপেক্ষ ক্ষীরের ন্যায় কারণকূট—বিহীন অদ্বয় ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপর "পয়োহম্বুবচ্চেত্তত্রাপি।" ২।২।৩ সূত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমুদয় কার্য্যই ঈশ্বর সাপেক্ষ। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরসাপেক্ষ বলিতে চান না; যেহেতু কর্ম্ম-সাপেক্ষ বলিলেই সঙ্গত হয়। কর্ম্মের অনাদিত্ব সকল দর্শনেই অবিসংবাদিত। "কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"

সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রতিপন্ন করেন, পুরুষ নির্ম্মল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ এবং প্রকৃতি জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতগুণাত্মিকা। উভয়ের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ব নির্ম্মল স্ফটিকে নিপতিত হয় এবং তজ্জন্য পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অভিমান সম্পন্ন হন। তাদৃশ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের ছায়া আবার সেই অচেতনা প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, তখন প্রকৃতি অচেতনা হইলেও চেতন পুরুষের সাহচর্য্যে নিজকেও চেতায়মানা মনে করেন। এই প্রকার পরস্পর বিম্ব প্রতিবিম্বপাতবশতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের অভাবনীয় সংযোগ ঘটে এবং অবশেষে ক্ষুভ্যমানা প্রকৃতি হইতে অনুলোমক্রমে মহদাদি ত্রয়োবিংশতত্ব কার্য্যরূপে

পরিণত হয়। বাচস্পতি মিশ্র সৃষ্টির এবম্বিধ প্রক্রিয়ায় অন্যোন্য প্রতিবিম্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পুরুষের চেতনাই প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয় কিন্তু প্রকৃতির ছায়া পুরুষে নিপতিত হয় না। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে তাহা নহে উভয়ের উপরেই উভয়ের কর্ত্তক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যটী অন্যোন্য প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্যোন্য প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে পূর্ব্ব বর্ণিত বহু বিশেষণে বিশেষিত পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনই হইতে পারে না। এই স্থলে বিজ্ঞানভিক্ষুর যুক্তিই আমাদের নিকট সমাদৃত। সাংখ্য সপ্ততির ২০ এবং ২১ কারিকা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই সাহচর্য্য প্রতিপন্ন করিতেছে। বলা বাহুল্য যে বাচস্পতি মিশ্র এতদুভয় কারিকার তত্ত্বকৌমুদী তত বিস্তৃত করেন নাই, অথচ প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগও বর্ণন করেন নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহাযাত্রী।

(১)

অতি ধীরে মুদে আসে আঁখি,
ডুবে যায় সোনার ধরণী ;
বল নাথ, কত আর বাকী
ঘাটে কবে আসিবে তরণী ?

(২)

শন্ শন্ বহে সমীরণ,
কোথা দূরে গাহে পাখী গান,
ভেসে আসে কার আবাহন,
পলে পলে আকুল পরাণ !

(৩)

এ পারের বেচা-কেনা সারি'
রিক্ত-করে রাখি' শ্রান্ত-শির,
ভাবিতেছি হৃদয়বিহারী,
কোথা মোর আশ্রয়-কুটীর !

(৪)

টুটে গেছে সকল বাঁধন,
ঘুচে গেছে স্বপন মায়ার,
আজ শুধু হতেছে স্মরণ
সব চেয়ে তুমি আপনার।

(৫)

তটিনীর 'কুলু' 'কুলু' তান
পশে কানে বুঝি ঘুম-ঘোরে,
মনে হয় জুড়াবে পরাণ
এ দারুণ কাল-নিশি-ভোরে।

(৬)

দয়াময় ! এস তরী বেয়ে,
হাত ধরি' উঠাইয়ে লও,
অন্ধকার নামে বিশ্ব ছেয়ে
ধ্রুবতারা তুমি জেগে রও।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথের উপর মেঘ ও বর্ষার এই প্রভাব তাঁহার পরিণত বয়সের শিক্ষালব্ধ ফল নহে—এ যেন তাঁহার সহজাত—তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে অতি শৈশব হইতেই বর্ষাপ্রীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিশু তাহার মাকে বলিতেছে—

"ঐ দেখ মা বর্ষা এল
ঘন ঘটায় ঘিরে,
বিজুলী ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।
দেবতা যখন ডেকে ওঠে,—
থর থরিয়ে কেঁপে।
ভয় করতেই ভালবাসি
তোমার বুকে চেপে।
ঝুপ্ ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুন্তে ভালবাসি
বসে কোণের ঘরে।

ঐ দেখ মা জান্‌লা দিয়ে
আসে জলের ছাট,
বল্‌গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।"

ইহার মধ্যে আমরা কবির শৈশবানুভূতিকেই কাব্যরূপে পাই নাই কি? এই অনুভূতি একটি গল্পেতেও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"বেশ মনে আছে সে দিন সন্ধ্যাবেলা বড় বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে এক হাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। যদি বৃষ্টি একটু বরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা, আর একটুখানি, কোন মতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোন আবশ্যক নাই, কেবল একটি মাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোন একটি নির্ব্বাসিত যক্ষও ত মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড় একটা কোন কাজ নাই, অতএব রামগিরি শিখরের একটি মাত্র বিরহীর দুঃখ কথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নে কোন একটি বিরহিনীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছু মাত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয় বেদনা এমন দুঃসহ।

"বালকের প্রার্থনা মতে না হৌক, ধূম-জ্যোতিঃ সলিল মারুতের বিশেষ কোন নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায়, মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা গেল!"

তারপর আপনারা সকলেই জানেন কিরূপে মাষ্টারকে তখনই বিদায় দেওয়া হইল এবং মনের আনন্দ অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া গল্পপ্রিয় নাতি তাহার দিদিমাকে গল্প বলিতে ফরমাইস করিল। দিদিমা মৃদু স্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা। তখন—

"বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে
একেবারে চুপ্‌।"

ইহা যে তাহার নিজেরই কাহিনী—গল্প নহে—কবি তাঁহার 'জীবন স্মৃতিতে' সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃষ্টির দিনে শিশুদের নানা খেলার মধ্যে একটি হচ্ছে রাস্তার পাশের নালায় যখন 'ঘোলা জলের স্রোতের ধারা' 'পাগল পারা' ছুটিয়া যায়, তখন তাহাতে পাতার ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া। নিজ নিজ শৈশবের আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতিকে একটু উস্কাইয়া তুলিলে সকলেরই তাহা মনে পড়িবে। এই সামান্য খেলাটিকে কবি ভুলিতে পারেন নাই, বরং আগ্রহের রঙে তাহা কেমন রাঙাইয়া তুলিয়াছেন—

"মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলে বেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পরে দিবস রাতি,
ছিলনা কেউ খেলার সাথী,
একলা বসে পেতেছিলেম
সাধের খেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।"

তার পর সেই অমর কবিতায় গ্রথিত ছেলে বেলার গান—"বিষ্টি পরে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ"—বঙ্গদেশের কত শিশুচিত্তকেই না অজ্ঞাত আনন্দের দোলাতে আন্দোলিত করিয়াছে এবং আরো করিবে। "আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে", "মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ্‌", "ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সে গাছ পালা, এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা"—কি সুন্দর শব্দ চিত্র! আমাদের মনশ্চক্ষুর উপর কবির কোমল তুলিকা যেন একটি স্নিগ্ধ শ্যাম প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছে, এবং কেবল তাই নয়, হৃদয়েরও এক কোণে একটু দোলা দিয়া যাইতেছে।

কেউ কেউ হয়ত বলিবেন, বর্ষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা রাজধানীর দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকার অধিবাসী ধনীর দুলালের পক্ষেই সম্ভব, এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ কেবল বর্ষার সৌন্দর্য্যের দিক্‌টাই দেখিয়াছেন, আর তাহার চিত্রই আঁকিয়াছেন ; কিন্তু তাহার দুঃখের দিকটা অনুভব করিবার অবসর পান নাই। কর্দ্দম-পিচ্ছিল পল্লীপথ, পচাপাটের পূতিগন্ধে পূর্ণগ্রাম, জীর্ণ-ছাউনী, দীর্ণভিত্তি পর্ণকুটীরের আর্দ্র গৃহতল—বর্ষার এই নিতান্ত পার্থিব এবং অত্যন্ত অশোভন দিক্‌টায় কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। স্বীকার করি, বর্ষার মাধুর্য্যে আত্মহারা হইতে হইলে "চাল ও চুলো" বজায় থাকাটা—অর্থাৎ আহার্য্য ও বাসস্থান সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারাটা—নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা "শ্রাবণ গগন ঘিরে, ভরা মেঘ ঘোরে ফিরে" দেখিয়া কবির লেখনী হয়ত "সোনার তরীর" মায়াচিত্র না আঁকিয়া কেবল 'বারমাস্যার' অশ্রু-সজল বর্ণনাতেই আমাদের দীর্ঘ বাদল-বেলাকে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, কেবল পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া তাহার শত অভাব বিড়ম্বনার মধ্যে মানুষ হইলেই যে কেহ পল্লীর নিগূঢ় মর্ম্মকথাটি সহজে বুঝিতে ও বুঝাইয়া দিতে পারে না। যদি তাহা পারিত তবে ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত বাংলাদেশের দরিদ্র গ্রামবাসীমাত্রই গ্রাম্যজীবনের সহৃদয় কবি হইয়া উঠিত। একটি চিত্রের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে খানিকটা দূর হইতে তাহা দেখিতে হয়। তেমনি আমার মনে হয়, পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা আকাজ্ক্ষা ব্যথা-বেদনা এবং সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা নাগরিক কবির নিকটে যেমন সহজে ধরা পড়ে, একান্ত সন্নিহিত চিরপল্লীবাসীর নিকটে তেমন হয় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইবে।

বর্ষার পল্লীজীবনের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নাই, একথা বলিলে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তার অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। তাঁহার ছোট গল্প এবং গ্রাম্য সাহিত্য, লোকসাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন গ্রাম্য-জীবনের সুখ দুঃখের সহিত তাঁহার কতদূর সহানুভূতি এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার কি আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। শুধু চক্ষু থাকিলেই যে দেখা যায় তাহা নহে। অন্তর্দৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অহরহ কত ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার কয়টা আমরা বাস্তবিক মন দিয়া দেখি? বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব, সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব, তুচ্ছতার মধ্যে বিশেষত্ব, বস্তুবাহুল্যের মধ্যে আসল প্রাণটির সন্ধান পাইতে হইলে সহানুভূতিশীল, অন্তঃশক্তিসম্পন্ন বিশিষ্ট দৃষ্টি চাই। সে শক্তি, সে দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের যেমন আছে, তেমন আর কাহার? তাহার ছোটগল্পে তিনি কৃষক, ধীবর, কেরানী, পোষ্ট-মাষ্টার, মহাজন, ষ্টীমারের স্টেশনবাবু প্রভৃতির যে নিখুঁত চিত্র দুই একটি রেখাপাতে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এই সব গল্পে বর্ষার দুঃখময় দিকটারও যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

"শাস্তি" গল্পটিতে দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই নামক দিনমজুর ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনীকে উপলক্ষ করিয়া বর্ষা-দিনের দরিদ্রগৃহের একটি করুণ ও মর্ম্মান্তিক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"দুই প্রহরের সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দ্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্ত্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে, এবং ঝিল্লি রবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

"অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড় স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভাঙনের ধারে দুই চারিটা আম কাটাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

"দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমীদারের কাছারী ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে, বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহবা নিজের ক্ষেতে, কেহবা জন খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারী হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারী ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল, তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটা কতক ঝাঁপ নির্ম্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ী আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিত মত পাওনা মজুরী পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।"

এ চিত্র যে কতদূর বাস্তব, গ্রাম্যজীবনের সহিত যাহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাহাদিগকে তাহা বলা বাহুল্য।

"পোষ্টমাষ্টারের" সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অনাথা গ্রাম্য বালিকার অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে এই কথা-টাই বেশী মনে পড়িত যে "বহু পূর্ব্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে সে আর তার ছোট ভাই মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছ ধরা খেলা করিয়াছিল।"

দারুণ বর্ষণে "যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ" (মেয়ের বিয়ের) কিরূপ পণ্ড হইতে চলিয়াছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি।

"এমন সময়ে দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুইদিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদিবা থামে ত বৃষ্টি থামে না; কিছুক্ষণের জন্য যদি মন্দা পড়িয়া আসে, আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

"গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতীর পা বসিয়া যায়, গাড়ীর চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধি বিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্ত্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাব-দিহি করিতে হইবে।"

'খোকা বাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' গল্পটি যে দুর্ঘটনার কালো পটপৃষ্ঠের উপর অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা এক বর্ষাদিনেই সংঘটিত হইয়াছিল।—"বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ এবং জলের গর্জ্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতি প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়া তুলিল।"

"শিশুর মন......জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল জল খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া একলক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানব শিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে নামিয়া আস্তে আস্তে জলের ধারে গেল—একটি দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ্ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলা ঘরে আহ্বান করিল।

"একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়।"

'সমাপ্তি' গল্পটি 'অশ্রুজল ধারায় সমাপ্ত হইলেও' তাহার অবতারণাটা একটি বর্ষাকাল সুলভ কৌতুককর ব্যাপারের মধ্যে। বর্ষার অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও যে কবির চক্ষুকে এড়াইতে পারে নাই,ইহাই তাহার প্রমাণ।

"অপূর্ব্বকৃষ্ণ বি—এ পাশ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।"

"নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।"

"বহুদিনের ঘনবর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।"

* * * *

"নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। * * মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।"

"নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল্। ব্যাগসমেত অপূর্ব্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অম্নি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থগাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

* * * *

"আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখীর গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়াছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ মাত্রেই যে, সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয়। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে।"

আর 'মেঘ ও রৌদ্র' শীর্ষক অপেক্ষাকৃত বড় গল্পটির ধূপছায়া জমি ত আগাগোড়া মেঘ ও রৌদ্রের টানা পড়েনেই বুনিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার মেঘ ও রৌদ্রের খেলা লইয়াই এই নিতান্ত বাস্তবিক চিত্রের গোড়া পত্তন; আবার মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনেই ইহার পরিসমাপ্তি।

"পূর্ব্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র এবং খণ্ডমেঘে মিলিয়া পরিপক্ক প্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তীর্ণ শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল, আবার পরক্ষণেই ছায়া প্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।"

"যখন সমস্ত আকাশ রঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র দুইটি মাত্র অভিনেতা আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল, তখন নিম্নে সংসার রঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় হইতেছিল।"—তাহারই একটি লইয়া এই আখ্যায়িকা।

এই গল্পের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ষার পল্লীর এমন একটি নিখুঁত চিত্র আমরা পাই যাহা নিজের অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন ধার করা জ্ঞানের সাহায্যে আঁকা সম্ভব নহে।

"তখন পূর্ণ বর্ষায় বাংলা দেশের চারিদিকেই ছোট বড় আঁকা বাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপ ঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্যে যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

"......জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন, শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাংলা দেশের তরুমূলবর্ত্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

"যাত্রার আরম্ভকালে মানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতি বিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে বৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠ প্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণ নেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারা বর্ষণে ভিজিতে থাকে,বাংলা দেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ণ মুখে সেইরূপ পীড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্য্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিচ্ছিল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্ত বস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতাহস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্র দগ্ধ বর্ষা প্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।"

গল্পের শেষ ও এক বর্ষারই দিনে। "সে দিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। পথের প্রান্তবর্ত্তী বর্ষায় জল প্লাবিত গাঢ় শ্যাম শস্যক্ষেত্রে চঞ্চল ছায়া লোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়াছিল এবং তাহার অদূরবর্ত্তী মুদীর দোকানে এক দল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল করতাল যোগে গান গাইতেছিল—

"এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস।"

বর্ষার সুরের সহিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-বীণার সুর যে এমন আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গিয়াছে, তার মূলে হচ্চে প্রকৃতির প্রতি তাঁহার সুগভীর অনুরাগ। কেবল বর্ষায় নহে, সকল ঋতুতে সর্ব্বাবস্থায় তিনি প্রকৃতিকে প্রাণে প্রাণে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন—অসংখ্য কবিতায় তাহার বিচিত্র বিকাশ পাঠকবর্গকে সর্ব্বদা মুগ্ধ করে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

"এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়া লোকের আবর্ত্তন; এই ঋতু চক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়, এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত চলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো। এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে, সেখানে ঝঙ্কার উঠছে, সেই খানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতির সমস্ত অণু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হ'ত........ তা হ'লে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না।...... আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই।........ আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি।"

কবির "বসুন্ধরা" শীর্ষক কবিতায়ও আমরা এই ভাবের পরিচয় পাই :—

"————তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিলায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃ মণ্ডল,অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি'; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তরু, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরু রাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু। * *

* * * * *

তাই আজি কোন দিন,—শরৎ কিরণ
পড়ে যবে পূর্ণ শীর্ষ স্বর্ণ ক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ু ভরে
আলোকে ঝিকিয়া,—জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হয়ে
জলে, স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।"

কল্পনার রঙীন চশমায় কবির চক্ষে সর্ব্বঋতুর বর্ণবিভব ধরা পড়িলেও বর্ষার প্রতি তাঁহার যে একটা বিশেষ পক্ষপাত, আশা করি উপরি উদ্ধৃত কবিতা ও গদ্যাংশগুলি হইতে তাহা এখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিজের কথায়—"বর্ষা ঋতুটা বিশেষ ভাবে কবির ঋতু। কেন না কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহার কর্ম্মেও অধিকার নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে;—কর্ম্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি। * * * বর্ষাঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সঙ্গীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্য্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি—কেন না ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝা পড়া ছিল। * * বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মের প্রতিকূল। এই জন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। * * * বাদলার কর্ম্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্ত্য হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের বর্ষা সাহিত্যের উদ্যান ভ্রমণ আমাদের শেষ হইল। কখনো—

"রোদের পরে বৃষ্টিভরা থম্‌কে যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরাণ জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।"

কখনো দেখিলাম, কবি বীণা বাজাইতেছেন, আর

"মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে,"

কখনো বা আষাঢ় শ্রাবণ ভাসিয়া যাইতেছে—

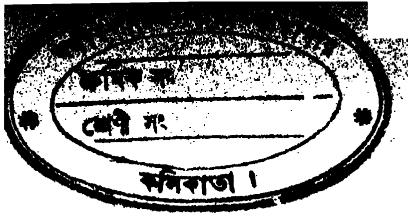
"ছিন্ন মেঘের পালে,
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে
(কবির) গানের তালে।"

আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। আপনারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন, আমার এ প্রবন্ধে কোন তত্ত্ব বা তথ্য নাই। তত্ত্বালোচনার শক্তিও আমার নাই, অবসরেরও অত্যন্তাভাব। হায় সেই দিন, যখন বর্ষায় ভারতবর্ষে ছুটি ছিল। এখন বর্ষায় ধারা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সফর দরবার, পার্টি পরিদর্শন, রিটার্ণ ও রিপোর্টের তাগিদ অজস্র হইয়া উঠে এবং জীবনসংগ্রাম-ক্লিষ্ট দুর্ভাগ্য জনের "নাকের জল মিশে যায় চোখের জলের সঙ্গে"—অবশ্য এই জল এবং কবির অশ্রুধারায় পাগল ঝোরা ঠিক এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। তাই আমি শুধু "কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্"—এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ করিয়া কাব্যামোদী ভাবুক বৃন্দের ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছি। আমার নিজের কথা ইহাতে অল্পই। কবির কাব্যোদ্যান হইতে কুসম সম্ভার আহরণ করিয়া তদ্বারা মালা গাঁথিয়াছি তাহার পারিশ্রমিক মাত্র আমার প্রাপ্য। সে মাল্যও সুগ্রথিত এবং ভাবুকজনের মনোহারী হইয়াছে কি না তাহা আপনাদের মত সুধীগণের বিচার সাপেক্ষ। তবে সুগন্ধি পুষ্পরাশি যেন তেন প্রকারেণ একত্রিত হইলেও, যদিচ তাহা সুদৃশ্য না হয়, তাহার সৌরভে মন মুগ্ধ করেই এই যা ভরসা। তবুও যদি কেহ কেহ মনে করেন আজ সময়টার নিতান্তই বাজে খরচ হইয়া গেল, তাঁহাদের নিকট আমার কৈফিয়ৎ "এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণমঞ্জীরমুখর ঋতুটিই সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য" এবং এরূপ সম্ভার কেজো লোককে আমরা মোটেই আশা করিতে পারি না। বর্ষার শ্রেষ্ঠ কবি অকর্ম্মণ্য দলেরই অগ্রণী হইয়া বলিতেছেন—

"সকল কাজের বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোলকুন্তলে নব মালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভায় নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নব ঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্ম্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এস সমস্ত ক্ষ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহ-বেদনার অশ্রু উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসগো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্প সুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসের আহ্বান আসিল কোন্ ছায়ার বিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!" *

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।



কবি আব্দুল স্কুর মহম্মদের গোপিচান্দের গীত।*

মুখবন্ধ।

গোবিন্দচন্দ্র।

উপস্থিত পুথীর আবিষ্কারক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আমায় এক দুরূহ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি দেশের কিম্বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা নই, জানিয়াও তিনি মুখবন্ধ লিখিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। যাঁহার সারাজীবন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের খুটি-নাটিতে কাটিয়াছে, তাঁহার নিকট সাহিত্যরসিকের ঈপ্সিত রসের আশা দুরাশা হইবে। কল্পনাভঙ্গহেতু হয় ত মনে মনে কষ্ট হইবে, অনধিকারীর ধৃষ্টতায় ধিকার শুনিতে পাওয়া যাইবে।

বঙ্গের লোক বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্রকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ওড়িষ্যায় গোবিন্দচন্দ্রের গীত যোগী-গীত নামে বিখ্যাত আছে। উত্তরভারতে সে গীত মারোয়াড়ী ও হিন্দী জানা লোকের নিকট অজানা নাই। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে মহারাষ্ট্রদেশে মরাঠী-ভাষায় প্রচলিত আছে। সে দেশের প্রচলিত অনেক গীত এখনও লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। পুনার চিত্রশালায় গোবিন্দচন্দ্রের চিত্র বিক্রয় হইতেছে। দ্রাবিড়-দেশে গোবিন্দচন্দ্রের আখ্যান প্রবেশ করিয়াছিল কি না, সে সংবাদ এখনও পাই নাই। বঙ্গের বাহিরে গোবিন্দ-চন্দ্র গীত সম্বন্ধে পরে পৃথক প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিব। এখানে বঙ্গের ভিতরে গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

উত্তরবঙ্গে যোগী (জোগী)-দিগের মুখে মুখে গোবিন্দ-চন্দ্রের আখ্যান প্রচলিত আছে। এ বিষয়ের কয়েক-খানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

(১) গ্রিয়র্সন সাহেবের সঙ্কলিত "মানিকচন্দ্রের গান।" খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৮। (J. A. S. B. 1878)

(২) শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সঙ্কলিত "ময়নামতীর গান।" ইহা গান নহে, গানের বিষয়টি বিশ্বেশ্বর বাবু নিজের ভাষায় বলিয়াছেন। (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫ সাল)।

(৩) দুর্লভমল্লিক-কৃত "গোবিন্দচন্দ্র গীত।" শ্রীশিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক স্বীয় টীকা সহিত প্রকাশিত। ১৩০৮ সাল।

(৪) ভবানীদাসের "ময়নামতীর গান।" শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

(৫) স্কুর মহম্মদের "গোপিচান্দের গীত।" (বর্ত্তমান গ্রন্থ)।

(৬) শ্যামদাস সেনের "মীনচেতন।" শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তক গোবিন্দচন্দ্রের তুল্য শ্রেণীর। প্রথম পাঁচখানি পুস্তক পড়িলে জানা যায়,—

(১) পূর্ব্বকালে মানিকচন্দ্র, বঙ্গের এক রাজা ছিলেন।

(২) তাঁহার রাণীর নাম ময়নামতী বা ময়নামন্তী। তিনি তিলকচাঁদ রাজার কন্যা এবং কন্যাকালে গোরক্ষনাথ নামক এক যোগসিদ্ধের নিকট যোগ ও "মহাজ্ঞান" শিখিয়াছিলেন।

(৩) তাঁহার পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র। সংক্ষেপে গোবিচন্দ বা গোপিচন্দ। আদরে গোবিন্দাই। শিশুকালে গোপিচাঁদ পিতৃহীন হন।

(৪) অল্প বয়সে (৯-১২ বৎসর) গোপিচাঁদের বিবাহ হইয়াছিল। দুই রাণী একই রাজার কন্যা। নাম

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৪, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উদুনা বা অদুনা, এবং পদুনা। পদুনা বিবাহিতা হয় নাই। উদুনার বিবাহকালে যৌতুকে আসিয়া গোপিচাঁদের রাণী হইয়াছিলেন।

(৫) মাতার উপদেশে রাজা গোপিচাঁদ আঠার বৎসর বয়সে রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া হাড়িপা নামক এক যোগীর শিষ্য হইয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে এক বৎসর পরে রাজার মৃত্যু হইত। কেহ কেহ বলেন, বার বৎসর পরে গোপিচাঁদ গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান ছিল না।

(৬) রাজবাড়ীতে খেতুয়া নামে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল।

(৭) সেকালে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, হাড়িপা, ও কানুপা, এই চারি যোগী প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যুবাবয়সে রাজপুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ যেমন-তেমন ব্যাপার নহে। একদিন শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আর একদিন নিমাই হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমাই রাজকুমার ছিলেন না, রাজ ভোগেও ছিলেন না। গোপিচাঁদ-রাজার করুণ আখ্যানে কবিকুলের চিত্ত দ্রব হইয়াছিল। যোগী (জোগী-) কুলও রাজা যোগী হওয়াতে গৌরব বোধ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে জোগীরাই গোপিচাঁদের গীত জানে, এবং ওড়িষ্যায় তাহারাই দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়ায়।

কিন্তু সব কবির শিক্ষা, সংসর্গ, রুচি সমান হয় না, আর, জোগী না হইলে যোগী গীত রচনা করিতে পারিবে না, এমন বিধানও নাই। উল্লিখিত পুস্তকের মধ্যে "মীনচেতন" ছাড়া অপর চারিখানির নাম যাহাই হউক, বিষয়ে গোপিচাঁদ। "মানিকচাঁদের গান," কিম্বা "ময়নামতীর গান" নাম রাখা ঠিক হয় নাই। পিতামাতার নামে গোপিচাঁদ প্রসিদ্ধ হন নাই। সে যাহা হউক, দুর্লভমল্লিক ছাড়া অপর কবি, সবাই, প্রত্যক্ষে কিম্বা পরোক্ষে মুসলমান। ভিন্নধর্মী কবির খেয়ালে গোপিচাঁদের গীতের স্থানে স্থানে অদ্ভুত ও বীভৎস রসের সমাবেশ হইয়াছে। তথাপি সকল গানেই রাণীদ্বয়ের করুণায় প্রচুর করুণরস আছে। আদি কবি হিন্দু, কি জোগী ছিলেন, তিনি কোন্ সালে প্রথম গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এখন যাহা পাইতেছি, তাহার ভাষা তেমন পুরানা নহে। কোনও পুথী শতবর্ষের অধিক পুরানা নহে, এবং বোধ হয় কোনও কবি দুই তিন শত বৎসরের সেদিকে ছিলেন না।

সংক্ষেপে প্রমাণ দিতেছি। শেষ হইতেই ধরি।

(৬) "মীনচেতনে" শ্যামদাস সেনের ভণিতা থাকিলেও তাহাতে মুসলমান কবির হাত পড়িয়াছে। এ বিষয় ১৩২৪ সালের ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (প্রতিভায়) আলোচনা করা গিয়াছে।

(৫) সুকুর মহম্মদের নামেই প্রকাশ, কবি কে।

(৪) ভবানীদাসের "ময়নামতীর গানে" মুসলমান কবি বিলক্ষণ হাত চালাইয়াছেন। এমনও হইতে পারে, মূল গান মুসলমানের রচিত। তাহাতে ভবানীদাস নিজের নাম জুড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রমাণ, যথা,—

/০ ভবানীদাসের ভণিতা চারিস্থানে আছে। কিন্তু কোনও স্থানে গ্রন্থের ছন্দের সহিত মেশে নাই। চৌদ্দ অক্ষরী পয়ার বটে, কিন্তু যতিতে নূতন ঠেকে। কবির ভণিতা তুলিয়া দিয়া লিপিকর কিম্বা গায়ক যে নিজের ভণিতা বসাইত, তাহা সুকুর মহম্মদ জানিতেন, এবং নিজের গানে শপথ দিয়া গিয়াছেন।*

৶০ পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, ও হস্তিনী, এই চারি জাতি নারীর লক্ষণ পরে পরে দুইবার বর্ণিত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই দুই কবির লেখা। (এই চারি জাতির

---

* দেখিয়া লিখিতে জে দেএ নিজের ভণিতা।
নরকেত পড়িবে তাহার মাতাপিতা॥
সপ্তপুরুস তার নরকত বাস।
আবদুল শুকুরে কহে রাজার সন্ন্যাস॥

মঙ্গলে কবির অজ্ঞতাও প্রকাশ পাইয়াছে, পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে চিত্রিনী পতিব্রতা হইয়াছে।)

৶০ গ্রন্থের আদ্যে গোপিচাঁদকে ময়নামতী ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলিবার সময় "মীনচেতনে" লিখিত অমাবস্যা পূর্ণিমা ছাড়া সেই প্রতিপদও নিষিদ্ধ তিথি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য তিথিতে ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দেওয়া হয় নাই।

।০ বিশেষতঃ এত যাবনিক শব্দ, হিন্দুর অজ্ঞাত যাবনিক শব্দ, বাহির হইত না। যথা, উল্লা, আলিম, মিরাশ, রজু, (বাটায়) গেলাপ, দিন-দুনিয়া, মহিম, দখলে (বসিয়া), ইত্যাদি।*

---

* ভবানীদাস এক নূতন সংবাদ দিয়াছেন। গোপিচাঁদ এক উড়িয়া রাজাকে মহিমে (যুদ্ধে) জয় করিয়া সে রাজার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপিচাঁদ শিশুকালেই আরও দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ভবানীদাস মেদিনীপুর জেলার "নয়ানগড়," এবং ওড়িষ্যার "কণিকা" (এক রাজ্য) নামও করিয়াছেন। গোপিচাঁদ দক্ষিণ দেশে, সমুদ্র নিকটে কলিঙ্গনগরে এক বেশ্যার বাড়ীতে বাঁধা ছিলেন। ভবানীদাস সে স্থানের নাম "সুরিপুর" করিয়াছেন। গোপিচাঁদের ওড়িয়া গীতে জোগীরা (ওড়িষ্যাতে 'জুগী' নহে 'জোগী' বা 'যোগী') ওড়িষ্যার দুইএক রাজকন্যার সহিত গোপিচাঁদের বিবাহ বর্ণনা করে। ওড়িয়া গীতে রাজা কেবল বেশ্যালয়ে নহে, শুঁড়ীর বাড়ীতেও বাঁধা ছিলেন। ওড়িয়া 'শুণ্ডীপুর' বা 'শুঁড়ীপুর' ভবানীদাসের 'সুরিপুর' বোধ হয়। এইরূপ লক্ষণ হইতে মনে হয়, ভবানীদাসের পুথীর মূল প্রাচীন, এবং সেইরূপ প্রাচীন পুথী হইতে ওড়িয়া গীত রচিত হইয়াছিল। মূল কবি হয়ত পুরীতীর্থ করিতে আসিয়া, "নয়ানগড়" ও "কণিকা" নগরের নাম শুনিয়াছিলেন, কিম্বা কবির নিবাস পশ্চিম রাঢ়ে ছিল।

(৩) দুর্লভ মল্লিকের "গোবিন্দচন্দ্র" হিন্দুর রচিত, লিপিকরের বিদ্যার দোষে দুষ্ট হইয়াছে। যে কবি নিজ নারীকে গোলামের ভোগ্যা হইতে বলেন, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে পারি না।

(২) বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্কলিত আখ্যান গ্রিয়ার্সন সাহেবের সঙ্কলিত গীতের বড় পালা।

(১) গ্রিয়ার্সন সাহেবের "মাণিকচাঁদের গান" সম্বন্ধে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" দীনেশবাবু অনেক কথা লিখিয়াছেন। কারণ যুক্তির কাঁটা পথে না গিয়া কল্পনার সুগম পথে গেলে অনেক দূর যাইতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন (৩য় সংস্করণে,) (১) "মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তৎসম্বন্ধীয় গীতি রচিত হইবার কথা";

(২) "তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ [খ্রিষ্টাব্দ] পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন।"

কিন্তু এই দুই হেতু হইতে এমন অনুমান আসে কি যে (১) পরাজিত গোবিন্দচন্দ্র ও গীতের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি, এবং (২) গ্রিয়ার্সন সাহেবের লিখিত গানটি একাদশশত খ্রিষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল? প্রথম অনুমান সম্বন্ধে পরে দেখা যাইবে। যদি সেটা সত্যও হয়, তাহা হইলেও দ্বিতীয় অনুমানের নিমিত্ত অন্য প্রমাণ চাই। দীনেশবাবু একটু সতর্ক হইয়া লিখিয়াছেন, "অবশ্য একথা বলা সঙ্গত নহে যে, মাণিকচন্দ্রের বর্ত্তমান গানটি কিম্বা পরবর্তী [দুর্লভ মল্লিকের] গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধীয় গীতির আদ্যন্ত খৃষ্টীয় দশম [?] বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। দুর্ল্লভমল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গানটি স্পষ্টতই [?] একটি প্রাচীন গীতি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে,—উহার ভাবগুলি শুধু বজায় আছে, ভাষা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মাণিকচন্দ্র

রাজার গানটি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু উহারও যে অনেকস্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়া গানটি কতক পরিমাণে আধুনিক করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে" আরও কিছু চাই। প্রাচীন জনসমাজে গান ছিল; সে গানের ভাব কি ছিল, তাহা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে লেখা চলে, কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে" তাহার স্থান অল্প। শাব্দিক পণ্ডিতেরা বলেন, ইতি+হ+আস—এই (নিশ্চয়) ছিল,—এই অর্থ বুঝাইতে ই-তি-হা-স শব্দের উৎপত্তি। দীনেশবাবু লেখেন নাই, কোন্ কোন্ অংশ নয়শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। "যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে। তখন কেন ধর্ম্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসী হইয়ে॥" ইত্যাকার ভাষা নয়শত বৎসরের পুরাতন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ে (মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে) খাজানা, বদলী, বদলায়, বান্দি, মুলুক, রায়ত, বরাবর, কাহিলা, হুকুম,হাওলা,হাজির, জোয়াব,মহল,খবর,জুয়ান, দরিয়া, দিকিরা বাজ,—ইত্যাদি ইত্যাদি যাবনিক শব্দ বঙ্গভাষার দাখিল হইবার সম্ভাবনা মাত্রও ছিল না। দীনেশবাবুর আলোচনা পড়িয়া সেই পুরানা হুকার দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে; হুকার খোল ও নলিচা, দুই-ই বদলান হইয়াছে, কিন্তু যে হুকা সে হুকাই আছে! অথবা যে-হেতু বঙ্গসাহিত্যে একটা "বৌদ্ধযুগ" না থাকিলে শাক্ত-যুগ, বৈষ্ণবযুগ প্রভৃতি যুগবিভাগ মানায় না; অতএব এমন যুগ ছিল যে যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মাণিকচাঁদের গানটি সেই যুগে রচিত; অতএব সে গানে বৌদ্ধযুগের সাহিত্য, ধর্ম্মমত, আচার-ব্যবহার, প্রভৃতি সবই পাওয়া যাইবে!

কবি কিন্তু প্রথমে রামের বন্দনা করিয়া পালা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের গুণ গাইতে দাঁড়ান নাই, "সিদ্ধার" (যোগসিদ্ধ পুরুষের; মাগ্নে বহুবচন) গুণ গাইয়াছেন। গোপিচাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় "পাঁচ বৈষ্ণব" তাঁহাকে কৌপীন পরাইয়া দিলেন। নূতন সন্ন্যাসীও "শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অধিক রাখে সিতা। শ্রীগুরু বৈষ্ণব বন্দল [বন্দিল] ভাবগত সিতা॥" ময়নামতী মা-ও বলিয়া দিলেন, "অতিত বৈষ্ণব দেখিয়া না করিও হেলা। গড় হয়া পরনাম করেন [করিও] যার গলাতে মালা॥" রাজা ভোজনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণনাম স্মরণ, এবং উৎসবের সময় "সঙ্কীর্ত্তন" করিতেন।

বোধ হয়, দীনেশ বাবুর মতে বৈষ্ণব ভাবের অংশ গুলি প্রক্ষিপ্ত। অতএব আর একটু বিচার করিতে হইতেছে। তিনি গানটিতে "যে সব অপ্রচলিত শব্দ" পাইয়াছেন, তাহার এক তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকায় ৭৩টি শব্দ আছে। দেখিতেছি, তন্মধ্যে আচম্বিতে (আচম্বিতে), আউ-চাউ (আই-চাই), আগু, আসা-নড়ি (ফকীরের), খোচা (খোঁচা), জীউ, ডাক, ডাবিয়া (=দাবিয়া), দোনো (হিন্দী), বারুণ (=বাড়ুন), সাধ (ধাতু, সংগ্রহে), সান (ইঙ্গিত), অত্তাপি প্রচলিত আছে। দীনেশবাবুও লিখিয়াছেন, গাভুর, কৈতর, মধুকর (নৌকা), এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে চলিত আছে। তাহা হইলে "অপ্রচলিতের" তালিকায় ফেলিয়া প্রাচীন-তার ব্যপদেশ করা হইয়াছে। *

সে যাহা হউক, উপরের উদ্ধৃত কিম্বা অন্য অন্য যাবনিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইতে অল্পকাল লাগে নাই। যথা, গরদান, কমর, বগল, জমিন্, সামিল হুকুম, তালুক, বিলাত, দরজা ('দরওয়াজা' বানানও আছে), নাবালক, দরবার, তৈয়ার, মরদ, খেতখানা, বালাখানা, তালিমখানা, তোসাখানা, ডাক্‌টর (doctor) খানা, গোলাম, ওজন, সিকারী, হাজামৎ, তল্লাস, সহর, জাগা (জায়গা), কদু, কমণ্ডা, দোকান, দোয়াত, সন,

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কয়েকটা শব্দ ভুল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথী হইতে আরও অনেক শব্দ তুলিতে পারা যায়। যেমন, নিয়া, পসার, ওড়া, দিয়া (দিক), হাপান বাপান, হাত কোনা (খানা), বাজার, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারিখ, দস্তখৎ, খুসি, খাপা, গোস্তা, আদমি, কমি, মাজু, রাওদা, গুনা, খাম (পত্রের) দোহাই, বন্দর, হজুর, পোসাক, খয়বাৎ, ছোকরাণ, সাইবানি (বিবী) প্রভৃতি শব্দ প্রক্ষিপ্ত মনে করিলে সমস্ত গানটাই প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত গান দ্বারা নয়শত বৎসরের পুরানা বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয়টাও প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গানটি রঙ্গপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল। ভাষা দেখিলেও রঙ্গপুরের উত্তরাংশের বোধ হয়। কবিও লিখিয়াছেন, "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল"—ভাটি নিম্নদেশ হইতে, সমতট হইতে। রঙ্গপুরের গ্রাম্য ভাষায় রাজবংশী ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। তাহার উপর, গানটি অ-শিক্ষিত মুসলমানের লেখা বলিয়া বোধ হইতেছে। মুসলমান না হইলে 'পাপ গুনা' 'কমবক্তা' 'হাজামৎ', 'জাগা', বিশেষতঃ 'ছোকরাণ' (ছোকরা সকল), 'সাইবানী' (সাহেব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে), প্রভৃতি শব্দ হিন্দুর রচিত গানে বাহির হইত না। কবি বা-ন্দী ভিন্ন দাসী কিম্বা চে-টী শব্দ জানিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, দেবীর (দুর্গার) ভাই শনি, চিত্রগুপ্তের নাম চিত্রগোবিন্দ, শুকসারীর সাবী পাখীর ভাই সুয়া, ক্ষীরোদ সাগরের নাম সরাদ সাগর, খেতুয়া গোলামের নাম খেতুয়া লঙ্কেশ্বর, হাড়িপার নামও হাড়ি লঙ্কেশ্বর। কবির মতে মানিকচাঁদ জাতিতে 'বানিয়া' এবং চাঁদ সদাগর রাজার এক জাতি ছিলেন। মনসার গানের চাঁদ সদাগরের হিন্তালের লাঠীও আসিয়া জুটিয়াছে। কবির কলমে, ময়নামতী রাণী যমের, এমন কি পোষা সুয়া পাখীরও শালী বাচ্যা হইয়াছেন। এমন কবি নইলে পুত্র গোপিচাঁদ মাকে গামছায় বাঁধিয়া উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিতে বলিতে পারিতেন না। * দুর্ল্ভ মল্লিকও ময়নামতীকে দিয়া অগ্নি পরীক্ষা করাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় নৃশংসতা নাই। সীতা ও কবিকঙ্কণের খুল্লনা অগ্নি

* ছাপা পুথী অশুদ্ধ। অনেক শব্দের এবং কারক ও ক্রিয়া বিভক্তির দুই রূপ আছে। যথা, জাতি জাত্তা, কুলি কোলদা, বামন বাবন, পসান পাসান, লাগাল নাগাল, লড় লহড়, কাঁথা কেঁথা, হাড়ি হারি, পরাইল পড়াইল, অথীত অতিত, রাঁড়ী রাড়ী, ভিড়িয়া ভিঁড়িয়া, রাও আও, মোকে মোক, মহলের মহলর, গলায় গলাও গলে, পালঙ্গে পালঙ্গত, তেজিমু তেজিম, ইত্যাদি। বোধ হয়, এক পুরাতন পুথী ভাঙ্গিয়া এই গান লেখা হইয়াছিল। সে পুথী কত কালের পুরাতন, তাহা বলা দুষ্কর। তবে বর্ত্তমান পুথী যে নূতন, তাহা 'ডাক টরখানা' দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আসামী ও উড়িয়া ভাষার মধ্যে দুই এক বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। "মানিক চাঁদের গানের" কয়েকটা শব্দ প্রায় অবিকল উড়িয়া। যথা, যেত্‌কে ও যেত্তিকি, তেত্‌কে ও তেত্তিকি, এলায় ও এলাগে (এখন), তখনা ও তখিনা, অরগুটিক, ঘড়িকর (এক ঘড়ীর , চিড়া-বেচি ইত্যাদি। সুকুর মহম্মদের "গোবিন্দচন্দ্রেও" কয়েকটি শব্দ আছে। যথা, ময়া (মায়া), আরিবল (আয়ুর্ব্বল—আইবুবল—আরিবল), ভুসঙ্গী (ভস্মস্—ভসম্—ভসং—ভুসঙ্গ), কালি (গালি), শ্রীকলা, এলুয়া খেড় সুকুরে এলায় (উলুখড়) অকারণে ও-কারণে। তুং সুকুরে তকারণে (তেকারণে)। গাবুরালি (মানিকচাঁদের গানে ভুলে গাবুরানি) সুকুর মহম্মদ ছাড়া মীনচেতনে, ভবানীদাসেও আছে। ঘোড়ার পইখর পাঁচখানি পুথীতে আছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব গানটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। বোধ হয় রাজবংশীভাষা জানা লোকের সাহায্য ব্যতীত অনুবাদ করিতে পারিতেন না। তথাপি দুই এক স্থানে ভুল করিয়াছেন। রাজার সন্ন্যাসদর্শনে 'গোকুল কান্দে'। এই 'গোকুল' শব্দের অর্থ তাঁহাকে কেহ বলিতে পারে নাই। কারণ, অপভ্রষ্ট শব্দের পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া সংস্কৃত শব্দটি জাতিচ্যুত হইয়াছে। আর একটা অনুমান করি। দীনেশবাবু পুথীখানাকে প্রাচীন মনে করিয়াছেন কেন?

পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ পরীক্ষা ভারত ভূমিতে নূতন ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাহাকারও শোনা যাইত না কি ?

পাঁচখানি পুথী পড়িলেই মনে হইবে, কোনও কবি গোপিচাঁদের জীবন চরিত লিখিতে বসেন নাই। চমৎকার কথা দ্বারা শ্রোতার চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিম্বদন্তিতে কিম্বা পুরাতন পুথীতে তাঁহারা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা সব রাখিয়াছেন, কি নূতন মন-গড়া কথা জুড়িয়াছেন, কে জানে। লোক অনুসারে কিম্বদন্তির নানারূপ হয়, স্থানভেদে ও কালভেদে ও হয়। তবে সত্য বলিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক বলিয়া কিম্বদন্তিতে কিছু কিছু সত্যও পাওয়া যায়। কিন্তু অল্প সত্যে, পুরাকালের সত্যে, দূরদেশান্তরের সত্যে, অ-সত্যের ঘন আবরণ পড়ে, তখন সত্য লুক্কায়িত হয়। বল্লালসেনের আবাস কত স্থানে আবিষ্কৃত হইতেছে, জয়দেব বীরভূম ছেড়ে খণ্ডড়াতেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাস বীরভূম ছাড়া বাঁকুড়াতেও বাশুলীদেবীর পূজা করিতেন।* অত কথার কাজ কি, কবি কালিদাস নদীয়া জেলায় আসিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে, "দুর্গেশনন্দিনীর" বীরেন্দ্র সিংহের শিলালিপি গড়মান্দারণ গ্রামে অচিরে আবিষ্কৃত হইবে। কারণ মান্দারণ গ্রাম, তাহার গড় ও উচ্চপ্রাকার, আমোদর নদ, এবং নদপার্শ্বে অট্টালিকার স্তূপ, এমন কি অদূরে আম্রকানন ও শিবের মন্দির সবই আছে। বঙ্কিমবাবুকে মিথ্যাবাদী বলিতেও পারা যায় না। তিনি যখন হুগলী জেলার আরামবাগ (পূর্ব্ব নাম জাহানাবাদ) সবডিভিসনের কর্ত্তা ছিলেন, তখন সে সব স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে বোধ হয়, গোবিন্দচন্দ্র বা গোপিচন্দ্র নামে এক রাজা সত্য সত্য বঙ্গদেশে ছিলেন, যিনি যৌবনে যোগী হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজা ছিলেন না; ছিলেন বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের)। "মানিকচন্দ্রের গানে" আছে, তিনি বাইশ দণ্ডের রাজা ছিলেন। অর্থাৎ ২২ দণ্ডে, ৮৷৯ ঘণ্টায় যত পথ চলিতে পারা যায়, তাঁহার রাজ্যের বিস্তার তত ছিল। অর্থাৎ ১০-১২ ক্রোশ।

দুর্লভ মল্লিক কমাইয়া ষোল দণ্ডের রাজা করিয়াছেন।* শুকুর মহম্মদ ইঁহাকে "ষোল বঙ্গের" করিয়াছেন। কিন্তু 'ষোল বঙ্গের' অর্থ হয় না। ভবানীদাস লিখিয়াছেন, গোপিচাঁদকে "চল্লিশ রাজা" কর দিতেন। ইহা হয় অত্যুক্তি, কিম্বা রাজাগুলি ছোট ছোট। অদ্যাপি প্রজার সম্বন্ধে ছোট জমিদারও রাজা। অতএব অনুমান হয়, গোপিচাঁদের রাজ্য ছোট ছিল, রঙ্গপুর জেলার অষ্টমাংশ।

দুর্লভ মল্লিকের মতে গোপিচাঁদের রাজধানীর নাম 'পাটিকা' ছিল। কিন্তু আর এক স্থানে আছে, তিনি

ইহার কারণ কেবল কামনা হইতে পারে না। বোধ হয়, ভাষার শব্দ বুঝিতে না পারিয়া প্রাচীন মনে করিয়াছেন। আমি সব যে বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নহে। যদি রঙ্গপুরের বর্ত্তমান ভাষা জানা লোক পুথীর শব্দ বুঝিতে না পারে, অর্থাৎ তাহারও কাছে নূতন ঠেকে, তাহা হইলে মূল প্রাচীন হইতেও পারে। পুথী দুই হাত ঘুরিয়াছে; কোন্ ভাষার কোন্ শব্দ পশিয়াছে, কে জানে। গানটা এখন এত মূল্যবান্ নয় যে ইহার নিমিত্ত অধিক কাল ক্ষেপণ করিতে পারা যায়।

* History of Bengali Language and Literature নামক পুস্তকে দীনেশবাবু আরও এক নূতন কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, Chandidas was born in the village of Chhatna in the District of Birbhum, but in early life settled at the neighbouring village of Nannura, ten miles to the south-east of Bolpur. (page 119) কিন্তু ছাতনা যে বাঁকুড়া জেলায়, এবং নান্নুর বীরভূম জেলায়! দুই গ্রাম পাশে পাশেও নাই!

* মুদ্রিত পুস্তকে "ষোল দণ্ডের" পাঠ আছে। বোধ হয় 'দণ্ড' স্থানে 'দন্ত' হইয়াছে।

'কলিঙ্গভূপতি' ছিলেন। অন্যান্য কবির গানে রাজধানীর নাম মিহিরকুল। (অপভ্রংশে মেহারকুল, ম্রিকুল)। গোপিচাঁদের বাড়ী কোথায় ছিল?

(১) প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বুকনন হেমিল্টন সাহেব শুনিয়াছিলেন, রঙ্গপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে ব্রহ্মপুত্রনদের নিকটে উলীপুরের পূর্ব্বদিকে "ওয়ারী" নামক স্থানে গোপিচাঁদের আওয়াস ছিল।

(২) গ্রিয়ার্সন সাহেব ও বিশ্বেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন, রঙ্গপুর জেলার উত্তর পশ্চিমভাগে ডিমলা নামক থানায় 'ময়নামতীর কোট' নামে এক দুর্গ লোকে দেখাইয়া থাকে।

(৩) অল্পদিন হইল ভবানীদাসের ভূমিকায় নলিনীকান্ত বাবু লিখিয়াছেন, কুমিল্লার নিকটে ময়নামতীর পাহাড় ও গোপিচাঁদের বাড়ীর অবশেষ আছে।

এ সবই কিম্বদন্তি। এই তিন স্থানের একটা সত্য হইতে পারে, নাও পারে। গোপিচাঁদ কতকাল পূর্ব্বে ছিলেন?

(১) বাঙ্গালার ইতিহাসে যোগীগীতের গোবিন্দচন্দ্র এখনও স্বীকৃত হয় নাই। তবে, দক্ষিণদেশের রাজেন্দ্র চোল একাদশ শত খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে "বঙ্গাল" দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়া শিলালিপিতে নামটি চুরি করিয়া গিয়াছেন। নামে ঐক্য, দেশেও ঐক্য হইতেছে। তথাপি আরও কিছু চাই, নইলে একত্ব প্রমাণিত হয় না।

(২) বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। এই বংশের "চন্দ্র"যুক্ত তিন রাজার নাম জানা গিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র নাম অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে। এই বংশের রাজগণ পাল-রাজগণের অধীনে "বঙ্গ" দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রাচীন নাম হরিকেল ছিল। গানের গোবিন্দচন্দ্র মিহির কুলের রাজা ছিলেন। হরিকেল নামের 'কেল' পরে 'কুল' হইতে পারে। আর 'হরি' ও 'মিহির' শব্দের অর্থে সূর্য্য বুঝায়, চন্দ্রও বুঝায়। টানিয়া অর্থ করিলে হরিকেল বা হরিকুল এবং মিহিরকুল এক হয়, চন্দ্রবংশীয় রাজা থাকাও সিদ্ধ হয়। গানের গোবিন্দচন্দ্র [illegible] ছিলেন। হয়ত তিনি চন্দ্রবংশের শেষ রাজা ছিলেন। এ সব স্বীকার করিলেও রাজেন্দ্র চোলের পরাজিত গোবিন্দচন্দ্র এবং চন্দ্রবংশের গোবিন্দচন্দ্রের ঐক্য প্রমাণ করিতে আরও কিছু জানা চাই। সেই "কিছু" না পাইলে কেবল উৎমাত্র সার।

(৩) প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন, সে কালে লোকে মহীপাল, যোগীপাল, গোপীপালের গীত, মঙ্গল চণ্ডীর গীত, বিষহরীর কথা শুনিতে ভাল বাসিত। বাঙ্গালার ইতিহাসে মহীপাল রাজার নাম প্রসিদ্ধ। কিন্তু যোগীপাল, কিম্বা গোপী-পালের নাম অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে। গোপী-পাল এবং গোপিচন্দ্র এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কোনও পুথীতে গোপিচন্দ্র নামের পরিবর্ত্তে গোপী-পাল নাম পাওয়া যায় নাই। গোবিন্দচন্দ্র পাল, কিম্বা গোপীচন্দ্র পাল, এরূপ নাম আধুনিক। সেকালে ধান ভানিতে শিবের গীতও ছিল।*

কবি, কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই। ইতিহাস মনে করিয়া গোপিচাঁদের তিনকুলের

* দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, We have an old Bengali saying "For the husking of rice in the mortar, the songs of Mahipal!" Later, when Saivite ideas become fashionable, the name of Siva was substituted for that of Mahipal. কিন্তু প্রমাণ দেন নাই। তিনি মানিকচন্দ্রের নাম "মানিকচন্দ্র পাল" লিখিয়াছেন! এই রকমেই উধোর পিণ্ডী বুধোর ঘারে পড়ে। 'ধান ভানিতে' ইহার অর্থ ধান ভানিতে ভানিতে। ধান ভানিবার সময় ভাননী শিবের গীত গাইত, এইরূপ অর্থ।

সময় নির্ণয় মন্দ নহে, কিন্তু সেটা আর এক কাহিনী হইবে। গোপিচাঁদের বিদেশে প্রচার, বঙ্গে স্মৃতি, আখ্যানে প্রভেদ হইতে মনে হয়, তিনি বহু পূর্ব্বকালে ছিলেন। সহস্র বৎসর হওয়া আশ্চর্য্যের নহে। কালা-ন্তরে কালের ব্যবধান হ্রস্ব হয়, প্রাচীনের সহিত নূতন যুক্ত হয়, এক স্মৃতির সহিত অপর স্মৃতি মিশ্রিত হয়। গোপিচাঁদের পিতামাতার নাম মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতী ছিল কি না তাহাই সন্দেহের বিষয়। কারণ মারোয়াড়ী গানে মাতার নাম ময়নামন্তী বটে কিন্তু মাতুলের নাম ভর্তৃহরি। হিন্দীগানে ভর্তৃহরি যোগী হইয়াছিলেন, এবং ভর্তৃহরির মাতার নাম ময়নামন্তী। এদিকে ওড়িয়া গীতে গোবিন্দচন্দ্রের মাতার নাম মুক্তাদেবী, মাতামহীর নাম ময়নামতী। *

গোপিচাঁদের দুই রাণীর নাম অ-দু-না বা উ-দু-না, এবং প-দু-না। সুকুর মহম্মদ লিখিয়াছেন, প-দু-না, ভাল কথায় প-দ্মি-নী। ওড়িয়াতে নাম, পো-দ-মা, অর্থাৎ প-দ্মা। প-দ্মা হইতে প-দু-মা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে। ওড়িয়াতে অন্য রাণীর নাম রো-ক-মা, কেহ কেহ বলে রো-দ-মা। রু-ক্মা হইতে রো-ক-মা। কিম্বা প-দ্মি-নী নামের সহিত মিলাইতে রু-ক্মি-নী। রো-দ-মা, ভাল কথায় রো-চ-না, কিম্বা রো-দ-না। যে নামই হউক, আদ্যে র ছিল। উত্তর বঙ্গের ভাষায় শব্দের আদ্য র লুপ্ত হয়। ইহার বহু দৃষ্টান্ত গোপিচাঁদের গানেও আছে। রো-দ-না হইতে ও-দ-না—অ-দু-না—উ-দু-না হইয়াছে। এই লক্ষণ হইতে মনে হয় গোপিচাঁদের বাঙ্গালা গীতগুলির উৎপত্তি উত্তরবঙ্গে হইয়াছিল।

এই দুই রাণীর মধ্যে একজন (ওদুনা) বিবাহিতা, অন্য জন (পদুনা) যৌতুক স্বরূপ আসিয়া গোপিচাঁদের রাণী হইয়াছিলেন। সেকালে এরূপ রীতি ছিল; বিবাহের যৌতুকে দাসদাসী প্রদত্ত হইত। দুর্লভ মল্লিকের টীকায় শ্রীশিবচন্দ্র শীল লিখিয়াছেন, নিত্যানন্দ প্রভু জাহ্নবী স্ত্রীকে যৌতুকে পাইয়াছিলেন। বোধ হয় পদুনা গোপিচাঁদের শ্বশুরের দাসী কন্যা ছিলেন। ওড়িয়ায় অদ্যাপি রাজগৃহে এইরূপ কন্যা আছে। ওড়িয়াতে ইহারা পো-ই-লী নামে খ্যাত। * ইহারা অবিবাহিতা দাসী বটে, রাজ-ভোগ্যা হইতে বাধা ছিল না।

খেতু বা খেতুয়া রাজবাড়ীর গোলাম ছিল। বোধ হয়, ক্ষে-ত্র নাম ডাকে খেতু হইয়াছিল। বোধ হয়, সে মানিকচাঁদের এক দাসীর গর্ভজাত। গোপিচাঁদের একপ্রকার ভাই বলিয়া রাজসংসারে খেতু নইলে বিশ্বা-সের কাজ হইত না। বিবাহিতা রাণীর (পাটরাণীর বা পাটদেবীর) পুত্র না থাকিলে উড়িষ্যায় এইরূপ দাসী পুত্র রাজা হইতে পারিত। এই কারণে গোপিচাঁদ যোগী হইয়া গেলে, কোন কোন কবি বলিয়াছেন, রাজার অবিবাহিতা রাণী (দাসী) গুলি খেতুয়া লইয়াছিল। ভবানীদাস খেতু স্থানে ঘর বাড়ী সমর্পণ করিয়াছেন।

গোপিচাঁদের গীতে বৌদ্ধমত আছে কি? জোগী-জাতি বৌদ্ধ কি? কেহ কেহ সে গীতে ধর্ম্ম ও নিরঞ্জন নাম পাইয়া গীতকে বৌদ্ধ অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ কোনও লেখায় 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই টুকু পাইয়া বৌদ্ধ অনুমান করিয়াছেন। এই প্রকার যুক্তি

* বাঙ্গলা গানই সত্য? ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" হরিচন্দ্র রাজার রাণীর নাম মদনাবতী। বলাবাহুল্য মদনাবতী, অপভ্রংশে ময়নামতী, ময়নামন্তী, ময়নামন্ত্রী। "শূন্য পুরাণে" মদনা-যুবতী। হরিচন্দ্ররাজা অপুত্রক ছিলেন, ধর্ম্ম ঠাকুরের কৃপায় এক পুত্র লাভ করেন। ঘনরাম বলেন, এই পুত্রের নাম লুহিচন্দ্র। "শূন্য পুরাণে" ও রামাই [?] পণ্ডিতের "ধর্ম্মপূজা বিধানে" হরিচন্দ্র রাজার মানসিক শোধ বর্ণিত হইয়াছে।

* দাস,—পো-ই-লা। পুত্র হইতে যেমন পো-লা। পো-ই-লা স্ত্রীলিঙ্গে পো-ই-লী। পোইলীর পুত্র পো-ই-লী-পু-অ।

এক কথায় মুক্তি। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় হইতে বেদপন্থী ও বুদ্ধপন্থীর আচার-ব্যবহার অনেকটা এক ছিল। * ইহাঁদের দর্শনে বা মুক্তিতত্বে প্রভেদ ছিল। কিন্তু জনসাধারণ এত তত্ত্ব জানিত না, বুঝিত না। যখন বেদপন্থী বৌদ্ধ হইতে লাগিলেন, তখন তিনি নানাবিষয়ে বৈদিক থাকিয়া গেলেন। এইরূপ, যখন বুদ্ধপন্থী পরে ব্রাহ্মণপন্থী হইলেন, তখন তিনিও নানা বিষয়ে বুদ্ধপন্থী থাকিয়া গেলেন। কোনও হিন্দু, মুসলমান-মত কিম্বা খ্রীষ্টান-মত গ্রহণ করিয়া হিন্দুদ্বারা বেষ্টিত থাকিলে, সে নূতন মুসলমান কখনও আরবীয় মুসলমান, কিম্বা সে নূতন খ্রীষ্টান ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টান হইতে পারেন না। পাত্র যতই স্বাধীনচেতা হউন, দেশ ও কালের অধীনতা ত্যাগ করিতে পারেন না। যোগী নাম হইতেই বুঝি, যোগ করিয়া যোগী। যোগের আরম্ভ কোন্‌কালে হইয়াছিল কে জানে। পাতঞ্জল দর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগ বর্ণিত আছে। অষ্টাঙ্গের মধ্যে 'যম' একটা অঙ্গ। এই অঙ্গের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ আছে। পতঞ্জলি ঈশ্বর অস্বীকার করেন নাই। লিখিয়াছেন ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। প্রণব, ঈশ্বরের বাচক। প্রণবের জপ ও তাহার অর্থধ্যান যোগীর উপাসনা। যোগ সাধনদ্বারা বিভূতি অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিলাভ হয়।

গোরক্ষ সাহিতা বা গোরক্ষ পদ্ধতি, শিব সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যোগের অঙ্গ ছয়টি। কিন্তু সংখ্যায় ছয় হইলেও ফলে পতঞ্জলির আটটি অঙ্গই আছে। নাই ঈশ্বর প্রণিধান। কিন্তু শেষ ফল সমান। ওঙ্কারস্বরূপ অক্ষর গোরক্ষের মন্ত্র। এই ওঙ্কারেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ও ক্রিয়াশক্তি আছে। ইনিই পরমজ্যোতিঃ, ইনিই ব্রহ্ম। যোগাভ্যাসদ্বারা জীবভাব ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া যায়, তখন "আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং" এবং "অহং শিবঃ", এই জ্ঞান হয়। কিন্তু ইহা ত বেদপন্থীর বেদান্তের মত।

শিবসংহিতায় দেখা যায়, সে কালের লোকে মুক্তির বহুবিধ উপায় গ্রহণ করিত। কেহ শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রকে, কেহবা শূন্যকে, কেহবা প্রকৃতি পুরুষকে মান্য করিত। কেহ নিরীশ্বর, কেহ সেশ্বর বাদী ছিলেন। এইরূপ বহুবিধ মত অগ্রাহ্য করিয়া শিব সংহিতায় ঈশ্বর শিব যোগানুশাসক বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, "আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ইত্যাদি মুক্তি ও মুক্তি প্রদায়িনী শ্রুতিই যোগীদিগের সেব্যা।" শেষে ফলে লিখিয়াছেন, "যখন যোগীর চিত্তবৃত্তি সহস্রদল কমলে (ঊর্দ্ধ মস্তিকে) বিলীন হয়, তখন তিনি অনন্ত জ্ঞান-রূপী 'নিরঞ্জন'কে জানিতে পারেন। তখন তিনি অবিরোধে মহৎশূন্যকে চিন্তা করিবেন। আদি-অন্ত-শূন্য শূন্যকে আরাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।" ইত্যাদি। ইহা যদি বৌদ্ধতন্ত্র হয়, হউক; সাধারণতঃ ইহা শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের অন্তর্গত বিবেচিত হইয়া থাকে। *

জোগী সম্প্রদায় বাস্তবিক যোগী। ইহাঁরা শিবযোগী। এই এক কথাতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহাঁরা শৈবযোগী; কিন্তু যোগ হউক, অন্য কর্ম্ম হউক, গুরু ভিন্ন কিছুই শিখা যাইতে পারে না। বেদপন্থীর আচার্য্য ছিলেন, যোগপন্থীর গুরু ছিলেন। দ্বিজ বালকের উপনয়ন ও গুরু সেবা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে। যোগীদিগের গুরুর নাম 'নাথ'। যিনি আদি গুরু, তিনি আদিনাথ। জোগীরা বলেন, এই আদিনাথ শিব। মীননাথ, শিবের

* সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁহার সংশোধিত "প্রাতিমোক্ষ" নামক গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

* যোগের নানাবিধ মুদ্রা আছে। তন্মধ্যে 'বজ্রোলি' একটি। এই মুদ্রা সাধন করিতে বশবর্ত্তিনী নারী আবশ্যক। এই মুদ্রার এক ভেদের নাম 'সহজোলি'। বোধ হয়, 'সহজিয়া মত' সহজোলি মুদ্রার কিম্বা এক ভেদ। 'বজ্রোলি' ও 'সহজোলি' "গোরক্ষ পদ্ধতিতে" আছে। বস্তুতঃ কোথায় যোগশাস্ত্র এবং কোথায় শৈব ও শাক্ততন্ত্র, ইহার সীমা নির্দেশ অসম্ভব বোধ হয়।

মুখ হইতে যোগতত্ত্ব শুনিয়াছিলেন। ইহা "মীনচেতনেও" আছে। 'নাথ' হইতে জোগী জাতির উপাধি 'নাথ' আছে। গোপিচাঁদের গীতে গোরক্ষনাথ, মীননাথের শিষ্য, ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা। ইঁহাদিগের শিষ্য অনুশিষ্য অনেক ছিলেন। কয়েকজনের নাম গোপিচাঁদের গীতে ও "মীনচেতনে" আছে। হাড়িপা, বাস্তবিক হাড়িপাদ। কানুপা বাস্তবিক কাহ্নুপাদ।* হাড়িপা যে বাস্তবিক হাড়ি জাতীয় ছিলেন না, গোপিচাঁদের গানে তাহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। তবে দেখা যায়, বেদপন্থীর নিকট দ্বিজ ব্যতীত অন্য জাতির বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক মুক্তি সাধন নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধদেব নারী ও শূদ্রের নিকট মুক্তিপথ খুলিয়া দিলেন; শিব ও শক্তিউপাসকও তাহাই করিলেন। যোগীদিগের নিকট জাতিভেদ, নর-নারীভেদ ছিল না। চৈতন্যদেবও সে ভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই, বেদপন্থী সমাজে বুদ্ধদেব ও যোগী জন্মিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও হিন্দুআনির দিনে জন্মিয়াছিলেন। এই সব চিন্তা করিলে মনে হয়, মানুষের চিত্তবৃত্তির লীলা[illegible] অসম্ভব। অথর্ব্ববেদে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস আছে, মীমাংসা দর্শনেও আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রের শক্তি না থাকিলে, বোধ হয়, উহা শূদ্রের পাঠ্য হইতে নিষেধ থাকিত না।

গোপিচাঁদের গীতে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস আছে। 'গুরুভজ', 'গুরুভজ', পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ওকারই "আড়াই অক্ষর জ্ঞান" "মহাজ্ঞান।" যোগশাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ, অর্থাৎ অতিশয় সামর্থ্য লাভ হয়। গোপিচাঁদের গীতেও ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়াম, এই দুই অঙ্গের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। বিভূতি লাভ, গোপিচাঁদের গীতে প্রধান কাম্য। বিভূতি লাভ হইলে সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত হয়, জরা-মরণ নিবারণ ত ছার। সাধারণের নিকট জরা-মরণের তুল্য ভয়ঙ্কর আর কিছু নাই। কেহ যোগসাধন দ্বারা, কেহবা আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রের রসায়ণ দ্বারা জরা-মরণের হাত হইতে এড়াইতে চায়।

গোপিচাঁদের গীতে বৌদ্ধধর্ম্ম মত কিম্বা ধর্ম্মঠাকুরে ভক্তি আছে, নাইও। 'ধর্ম্ম দিউক বর', একথা যেমন আছে, 'নাথে দিউক বর' সে কথাও তেমন আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,* আটশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আটশত ঘর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, ও প্রায় শতঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ্য মত অনুসরণ করিতেন। বাকির কতক বৌদ্ধ, কতক নাথ, কতক সহজিয়া, কতক তান্ত্রিক (শাক্ত) ছিলেন। তিনি নাথদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন. ইঁহারা যোগী ছিলেন। অনেক বৌদ্ধ, যোগী হইয়াছিলেন।" এ সকল বিষয়ের ইতিহাস-জ্ঞান আমার কিছুই নাই। তবে গোপিচাঁদের গীতগুলি পড়িয়া ইহাই মনে হইয়াছে।

আর এক কথা তুলিয়া মুখবন্ধ শেষ করি। যোগীগীত যোগীজাতীয় কবি না লিখিয়া মুসলমান কবি লিখিলেন কেন? বোধ হয়, প্রথমে জোগী কবি গীত রচনা করিয়াছিলেন। সুকুর মহম্মদ ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। মুসলমান কবি অনেক জন্মিয়াছিলেন, হিন্দুর পুরাণ শুনিয়া অনেক গীত লিখিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময়ে নানাজাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই নিম্নশ্রেণীর অনেক জোগী ও বৌদ্ধ মুসলমান হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে তত বাধা ছিল না। মুসলমানদিগের মধ্যে সুফী-সম্প্রদায়ও ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি আরবে, প্রসার পারস্যদেশে হইয়াছিল। মত সম্বন্ধে নানা মত আছে, চিরকাল থাকিবে। কিন্তু এমন সুফীও ছিলেন যাঁহাকে বেদান্তী বলিলে দোষ হইবে না। এক নিরঞ্জন দেবের ভজনা করিতে কোরানে তত বাধা দেয় না। "মীনচেতনে"ও সুকুর মহম্মদের গীতে "যোগান্ত"ও "বেদান্ত" প্রচুর আছে।

কটক, কার্ত্তিক, ১৩২৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

*এক কাহ্নুপাদ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনিই কানুপা কি না, কে জানে। এক চলিত তন্ত্রমন্ত্রে "হাড়ি-ঝী চণ্ডীর আজ্ঞা" বলা হয়। এই হাড়ি-ঝী কে, কে জানে।

* Introduction to Babu Nagendra Nath Basu's **Modern Buddhism.**

সূক্ষ্ম বস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রত্নতত্ত্ব।

আজকাল বস্ত্র সমস্যা আমাদের দেশে এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "প্রতিভা"র স্তম্ভে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরিষদ্ কর্ত্তৃপক্ষগণের ভীতি উৎপাদন করা আমার আদৌ ইচ্ছা নয়। তবে যে কোন বিষয়ই হউক "প্রত্নতত্ত্ব" আলোচনায় প্রতিভার বিশেষ দাবী। প্রতিভা কয়েক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত ভাবে দেশের নানারূপ প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতেছে, কাজেই আমার আজকার সময়োপযোগী সূক্ষ্ম বস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি না হওয়াই সম্ভব।

সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন যে আমাদের দেশে জানা ছিল না তাহা নয়। যে ঢাকার বিখ্যাত মসলিন এককালে সভ্যজগতের কত বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে এবং এখনও যেখানে অতি সুন্দর সরু সূতার মসলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে সেখানের লোককে আর ইহা বলিয়া বুঝাইতে হয় না, যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে কত সূক্ষ্ম সূতার কাজ হইত। তবে তাহা সাধারণের জন্য ছিল না। সাধারণের জন্য মোটা কাপড়েরই ব্যবস্থা এবং প্রচলন ছিল। আমাদের বাপ খুড়াদের মুখে শুনিতে পাই যে তাঁহারা ছেলে বেলায় দেশী তাঁতের তৈরী মোটা কাপড় পরিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে আমাদের চোখ যতই পাশ্চাত্য আদর্শে আকৃষ্ট হইতে লাগিল ততই আমরা আমাদের নিজস্ব মোটা কাপড় পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে কলকারখানার তৈয়ারী সূক্ষ্ম বস্ত্র সভ্যতাজ্ঞানে অবলম্বন করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের যুগে দেশের ২।৪ জন ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন ভবিষ্যতদর্শী লোকের মনে যে আঘাত না লাগিয়াছিল তাহা নহে। আজ আমরা বিলাতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবার সাবেক মোটার দিকে যাইতে যেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ও সংস্কারের আঘাত বোধ করিতেছি, সে পরিবর্ত্তনের যুগে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরাও তেমনি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান ভাবিতে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য এবং শীলতার অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। এ খুব বেশী দিনের কথা নয়, সেদিন আমাদের বাড়ীতে একখানা পুরাণ সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে একটী প্রবন্ধ চোখে পড়িল তাহার কিয়দংশ আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রবন্ধটী ১২৬৭ সনের ৩০ শে আশ্বিনের ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে লিখিত। ইহাতে তৎকালের রুচি এবং বাঙ্গলাভাষারও কতকটা নমুনা পাইবেন ঃ—

"বাঙ্গলাদেশের হিন্দুজাতীয়দিগের অনেক উৎসব দিবস আছে; কিন্তু দুর্গোৎসবের তুল্য একটীও নহে। এ সময়ে কি দরিদ্র কি মধ্যবীত্ত, কি ধনবান প্রায় সকল লোকেই আমোদে পরিপূর্ণ। যাঁহার বাটীতে পূজা তাঁহার পরিজনগণ যেরূপ, যাঁহার বাটীতে পূজা নাই তাঁহার পরিবারও সেইরূপ আনন্দিত। দুর্গোৎসবের সময় হিন্দুদিগের ব্যবহার দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয় এ সময়ে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে বিশ্বজনীন স্নেহ বিশ্বজনীন দয়া ও বিশ্বজনীন আনন্দ সঞ্চার হইয়া থাকে। পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসদেশীয়েরা ওলিম্পিয়ার উৎসবকালে যেরূপ পরস্পর বৈরাচরণে বিরত হইতেন, হিন্দুজাতীয়েরাও এই সময় সেইরূপ শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শত্রুও এসময়ে শত্রুর প্রতি স্নেহপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয় না।

"পরের অধীনতা অসুখের একটী প্রধান কারণ। সে কারণও এ সময়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সমুদায় কর্ম্মস্থল বন্ধ। সকল আফিস জনশূন্য। এ সময়ে আফিস গৃহে বা আদালতের দ্বারে উপস্থিত হইলে খোদাবন্দ এই শব্দটী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। প্রভু ভৃত্যতা সম্বন্ধ দূরে প্রস্থিত হয়। যাবতীয় সুখের মূল যে স্বাধীনতা, তাহাকেই সর্ব্বত্র বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়দিগের কষ্টকর ভৃত্যভাব হইতে মুক্তিলাভই একমাত্র সুখের হেতু এরূপ নহে। তাঁহাদিগের অনেকে সম্বৎসরান্তে পরিবার সন্দর্শনসুখ লাভ করিয়া চরিতার্থ

হয়। অন্য কথা কি, এই এক উৎসব প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও মুসলমানেরাও বিষয় কর্ম্মক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

"হিন্দু জাতীয়েরা কেবল মানসিক উৎসব সুখ অনুভব করেন না, তাঁহারা কার্য্যদ্বারাও আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ সঙ্গতি তিনি এই সময়ে বেশ ভূষাদি দ্বারা তৎপ্রকাশে বিমুখ হন না। যিনি সম্বৎসর কাল ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া কাল হরণ করিয়াছেন, তিনিও এ সময়ে নবাম্বর ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। এ সময়ে বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের বিপণি মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। সকল লোকের আলয়ই প্রায় নৃত্যগীতাদির আমোদে উৎসবময় হয়।............এদেশে স্ত্রী পুং সাধারণ প্রায় সকল লোকেই সূক্ষ্ম বস্ত্রপরিধানের একটী গর্হিত রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই জঘন্য রীতির সমূলে উন্মূলন দর্শন দূরে থাকুক, ইহা উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইতেছে। কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত। সুশিক্ষিত দলে বরং এ রোগ অধিকতর প্রবল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে যিনি দশটাকা অধিক আনিতে পারেন, তিনি আপন স্ত্রীকে দশগুণে অধিক সূক্ষ্ম বস্ত্র পরাইয়া থাকেন। সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন, শুনিতে পাই, সুশিক্ষিত দলের কেহ কেহ আপন পত্নীকে নেটের কাপড় পরিবার অনুমতি-দানেও অলস নহেন। নেটের বস্ত্র ব্যবহারবার্ত্তা যদি বাস্তবিক মিথ্যা হয়, তাহাতেই বা কি। সচরাচর স্ত্রীলোকে যে প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, নেটের অপেক্ষা তাহার বড় অধিক অঙ্গআবরণ করিবার ক্ষমতা নাই। আপন আপন শরীরের শোভা সম্পাদন কিছু বস্ত্র পরিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অঙ্গ আবরণই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। বস্ত্র পরিধান করিয়াও যদি সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখান হইল, কাপড় পরিয়া ইষ্ট লাভ কি?

"সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের কদর্য্য রীতি প্রথম কলিকাতায় আবির্ভূত হয়, এক্ষণে অনেক দেশে ইহার একাধিপত্য হইয়াছে। কলিকাতায় বরং পার আছে। অত্রত্য স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নান অথবা কুটুম্বগৃহ গমন ব্যতিরেকে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতে পান না। ইঁহারা সরু কাপড় পরিয়া থাকিলে শ্বশুর, ভাশুর, পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনেরা যা কিছু দেখিতে পান, অন্যে বড় দেখিতে পায় না। তবে এক গঙ্গাস্নান আছে, তাহার স্বতন্ত্র কথাও আছে। গঙ্গা পূণ্য তীর্থ। তথায় স্নানকালে সূক্ষ্ম বসনধারিণীদিগের যে নিম্নোন্নত স্থান সকল অদৃশ্য থাকে না, তীর্থস্থান বলিয়া সে দোষ মার্জ্জনা হইয়া যায়। স্নান-কামিনী স্ত্রীলোকেরাও মনে করেন, গঙ্গা পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া তথায় তাঁহাদিগের অবয়ব দর্শনার্থী পাপীলোক থাকা সম্ভাবিত নহে। এই ভাবিয়া নিঃশঙ্কমনে তাঁহারা সেই সূক্ষ্মবস্ত্রও সমুদায় অবয়বে রাখেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামবাসিনীদিগের সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান রীতি আরও মন্দ। তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা নিয়তকাল অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন না। গৃহকার্য্যার্থে তাঁহাদিগের বাহিরে গমন সচরাচর আবশ্যক হয়।"

"বাঙ্গালাদেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত নহেন। আপনারাও পথপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে ইঁহাদিগের গুণে ঘাটি নাই। যাঁহারা চাকরি করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শন অধিকতর কৌতুকাবহ। সাহেবেরা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিলে আফিসে যাইতে দেন না। অতএব ইঁহারা চাকরি স্থল হইতে গৃহে আসিয়া সেই ক্ষোভ মিটাইয়া লন। পূর্ব্বে সূক্ষ্মবস্ত্রের অধিক মূল্য ছিল। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক ও ইতর লোকদিগের তৎপরিধান সম্ভবপর হইয়া উঠিত না, অগত্যা তাঁহারা স্থূলবসন পরিধান করিতেন। এক্ষণে ইয়োরোপ খণ্ডের সহিত এদেশের বাণিজ্যসম্পর্ক হওয়াতে এখন আর সূক্ষ্ম বসন পরিধান কাহারও দুর্ঘট নহে। ইংরাজ-দিগের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা আছে। অতএব তাঁহারা এতজ্জন্য শুভফলের অংশলাভে অধিকারী নহেন।

"বাঙ্গলাদেশীয় রমণীগণের অলঙ্কার পরিধানের আর একটী কদর্য্য রীতি আছে। তাহাও বহু অনর্থের মূল। এ রীতিও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান উন্মূলনের বিষম অন্তরায় হইয়াছে। অলঙ্কার ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য এই আত্ম-শরীরের শোভা সম্পাদন এবং অন্যের নিকটে সেই শোভা প্রদর্শন। স্থূল বস্ত্র পরিধান করিলে এ উভয় উদ্দেশ্যের অন্যতর একটীও সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত থাকিলে অন্যের অলঙ্কার শোভা সন্দর্শনের সম্ভাবনা কি? এ অনুরোধেও অনেককে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

"এক্ষণে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট আমাদিগের বক্তব্য এই তাঁহারা স্থূলবস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করুন এবং রমণীগণের অলঙ্কার ধারণ প্রবৃত্তি দূরীভূত করিবার চেষ্টা করুন। আমরা নিশ্চয় কহিতেছি তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে অনেকেই তদনুসরণে যত্নবান হইবেন সন্দেহ নাই। ইহা অসৎ দৃষ্টান্ত নহে। বঙ্গদেশীয় রমণীগণ বাল্যাবধি অপর স্ত্রীগণের সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণ-দৃষ্টান্ত দর্শন ও তদনুকরণ চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠেন। অনেককে গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও অনন্যচিত্তে এতদ্বিষয়ে সতত ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। অলঙ্কার ধারণ-প্রিয়তা অনেকের চরিত্রদোষের কারণও হইয়া থাকে।

"পরিশেষে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। ইঁহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানের রীতি কোথায় শিখিলেন? কোন্ সভ্যজাতির নিকট শিখিয়াছেন? আমরা যদি পরিচ্ছন্ন স্থূল বসন পরিধান করি, বিদেশীয়েরা কি আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া উপহাস করিবেন? সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানই কি সভ্যতার লক্ষণ? জগদীশ্বর সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানের উপরেই কি সভ্যতা সংস্থাপন করিয়াছেন? এই বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বকার লোকেরা মোটা কাপড় পরিতেন, এই বলিয়াই কি ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তৎপরিত্যাগ করিয়াছেন।"

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

পঙ্গু শব্দ (চয়ন)।

মানুষের পা না থাকিলে তাহার স্থানে কাষ্ঠখণ্ড বা clutchএর ব্যবহার প্রচলিত পদ্ধতি। এক মাত্র পদযষ্টির অভাবে, দুই দুইটি কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিয়াও স্বাভাবিকত্ব রক্ষা হয় না। তাই বিজ্ঞান হাত দিয়া চালাইবার গাড়ি আবিষ্কার করিয়া দিয়া চরণহীন ব্যক্তি-গণের চলিবার অসুবিধা প্রায় দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি স্বাভাবিকত্ব রক্ষা হয় নাই—এ যেন দন্ত-হীনের স্বর্ণদন্ত। কিছুকাল পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, একটা বাগানের বেড়ায় একটা জিয়োল গাছের গায়ে লোহার তার পেরেক দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই তারের উপর গাছের এমন অঙ্গবৃদ্ধি হইয়াছে যে, আধ হাত আন্দাজ তার সেই গাছের গায়ে ঢাকিয়া গিয়াছে। গাছ সেই তার-টাকে আপন অঙ্গের অংশের ন্যায় করিয়া লইয়া তাহার সহিত অতি স্বাভাবিকভাবে মিশিয়া গিয়াছে। গাছটা প্রকৃতির নিয়মে পরকে আপন করিয়া লইয়াছে। সে-খানে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই। তবে কৃত্রিমতা আছে বটে। এক গাছের শাখা অন্য গাছের গুঁড়ির সঙ্গে জুড়িয়া যে কলম প্রস্তুত করা হয়, তাহাও কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক জীবন্ত বস্তুর পরিপুষ্টির উদাহরণ। শুনিয়াছি মানুষের অঙ্গেও এই প্রকার কৃত্রিম পুষ্টি আংশিক ভাবে হইতে পারে। একজনের গাত্রত্বক অন্য জনের গাত্রে ক্ষতস্থানে বসিয়া জুড়িয়া যায়। একবার বসিয়া গেলে আর কৃত্রিমতা বলিয়া ধরা যায় না। কলমের গাছকেও বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে কলমের গাছ বলিয়া হঠাৎ ঠাওরান যায় না।

গাছ ও মানুষের ন্যায় ভাষারও একটা জীবন আছে। সেখানেও গাছের কলমের প্রণালীতে কৃত্রিম উপায়ে জোড়া দিয়া শব্দের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি বজায় রাখা হয়; এবং বহুকালের পরে ঐ পরিপুষ্ট শব্দের

অভিন্নতা ধরা কঠিন হয়। গ্রীক ভাষার হোরা শব্দ (Eng. hour) সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভাষায় এরূপভাবে ভারতীয় পরিচ্ছদে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া আছেন যে, তাঁহাকে যবন বলিয়া চেনে কে? ঐরূপ মুক্তাবোধক হেলি শব্দ জাতিতে যবন হইলেও, হিন্দুর সংসারে আত্মগোপন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। কর্পূর শব্দও মালয়-দেশজ কাপুর শব্দ-জাত। অতসী পুষ্পবর্ণাভা যে ভগবতী, সেই অতসী আর্য্য-পার্শী আতস বা অগ্নি হইতে উদ্ভূত। অতসীপুষ্প=অগ্নিবর্ণ পুষ্প। এই সকল শব্দকে এখন চেনা যায় না। এইরূপ বহু অন্-আর্য্য ভাষার শব্দ আমাদের সংস্কৃত অভিধানে ও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের বিষয়ে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সকল ভাষাতেই কতিপয় পঙ্গু শব্দ থাকে। সংস্কৃত, প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষাতেও আছে। সর্ব্বতোভাবে তাহাদের ব্যবহার চলে না। তাহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। সীমার বাহিরে যাইবার শক্তি তাহাদের নাই। কিন্তু শব্দান্তরের সহিত মিশিয়া গিয়া স্ব স্ব অঙ্গহানির অভাব তাহারা এরূপ ভাবে দূর করে যে তাহাদিগকে অভিন্ন শব্দ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। এ যেন অন্ধের স্কন্ধে খঞ্জের আরোহণ। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া পরস্পরের নয়নহানি ও চরণহানির অসুবিধা বেমালুম দূর করে। কতিপয় শব্দে এই প্রকার পঙ্গুত্বের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় 'বটে' এই প্রকার একটি পঙ্গু বা অসম্পূর্ণ শব্দ। সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাদি বাচক বাক্যে বা উত্তরে এই পদের প্রয়োগ হয়। যেমন "লোকটা ভাল বটে?"—"হাঁ বটে।" "এখানে একটু সাবধানে থাকিবে তোমার বাড়ীওয়ালা একটু কলহ প্রিয় লোক।"—"বটে নাকি?"—"হাঁ।" "কলিকাতা সহরে ট্রাম বন্ধ—conductor এরা সব strike করেছে।" "বটে?" "হাঁ।" এই সকল প্রয়োগ হইতে দেখা যায় যে 'বটে' পদটা ক্রিয়াপদ নহে। এটা একটা অব্যয় পদ। ইহার অর্থ প্রয়োগ অনুসারে 'নিশ্চয়,' 'সংশয়', বা 'বিস্ময়'। কিন্তু বঙ্গভাষা শব্দটাকে এরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছে যে, অজ্ঞাতসারে ইহার ক্রিয়াতে পরিণতি হইয়াছে। "আমি মন্দ নই, ভালই বটি, পরে টের পাবে।" "তুমি ভাল বট, কিন্তু তোমার ভাই খারাপ।" কবিকঙ্কণে 'বটিস্' 'বটেন' আছে। সুতরাং ক্রমশঃ শব্দটার অব্যয়ত্ব নাশ পাইয়া পঙ্গু ক্রিয়াত্বে পরিণতি হইয়াছে। অথচ বটিতেছি, বটিয়াছি প্রভৃতির অনুমোদন করিলেই সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, পঙ্গুত্বের চিকিৎসা হয়; কিন্তু তাহা হইবে না। "বটে" শব্দটার একটু ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মূলতঃ 'বটে' শব্দ ক্রিয়াপদ এবং সংস্কৃত বৃত ধাতু ও প্রাকৃত বট ধাতুর সহিত সম্পৃক্ত। ইংরাজী ভাষায় যেমন Granted, provided, considering, to be short, uuderstanding, add to these প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সমুদ্ভূত অব্যয় পদ আছে, সংস্কৃত ভাষাতেও সেই প্রকার যুজ্যতে, গম্যতে, কৃতম্, পর্য্যাপ্তম্, প্রসহ্য, প্রেত্য এবংকারং, কথংকারং, উদরপুরং, সমূলঘাতং, পাণিগ্রাহং, বিদ্যুৎপ্রণাশং প্রভৃতি অব্যয় পদ ক্রিয়ার বংশ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই প্রকার একটি পদ 'বর্ত্ততে', প্রাকৃত 'বট্টই', পালি 'বট্টতি', অর্থ 'যুজ্যতে' অর্থাৎ 'ঠিক'। বাঙ্গালা ভাষাতে কিন্তু 'বটে' ক্রিয়া কি অব্যয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেননা সাহিত্যে ইহার অসম্পূর্ণ ক্রিয়াত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, অথচ বংশমর্য্যাদায় ইহা অব্যয়।

"নহে" বা "নয়" এই প্রকারের একটি অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ। ইহারও "নহিতেছি" "নহিয়াছিলাম" রূপ হয় না। ইহা একটি negative copula মাত্র। সংস্কৃত "নাস্তি" বা "নহি শব্দকে ইহার প্রতিশব্দ বলা যায়। অস্ ধাতু কেবলমাত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপক, কোনও অর্থ ইহার নাই। অবশ্য "নহিলে" পদটাও অভিন্ন প্রকারেই

উৎপন্ন এবং প্রয়োগ অনুসারে অব্যয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় "নহিব", "নহিবোঁ" "নহোঁ" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে 'নহে','নহ' "নহি"। ভবিষ্যতে হব না, অতীতে "হই নাই"। অর্থাৎ ভবিষ্যতে বা অতীতে নহ ধাতু দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে। অতীতে কিন্তু ইহার ব্যবহার আছে, রূপ—"নাই"। "না করিয়াছিল" অর্থে আমরা বলি "করে নাই", কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলেন "করিয়াছিল না"। "পারি না" অর্থে "নারি" শব্দও এই প্রকার অসম্পূর্ণ। ইহার প্রয়োগ কেবল নারে, নার, নারি; এবং নারিবে, নারিবো, নারিব এবং নারিস্, নারিবি। "পার" ধাতুও সম্পূর্ণ নহে। "পারিতেছি", "পারিতেছ", "পারিয়া থাক" প্রভৃতি রূপ প্রচলিত নাই। তাহার কারণ এই যে পার ধাতুর অর্থ "সমাপ্তি" জ্ঞাপক সুতরাং continuative বা durative action পার ধাতুর নহে। "পারিতে আরম্ভ করিলাম, পারিতে লাগিলাম, অবশেষে পারিলাম" —হয় না। হয় 'পারা' না হয় 'না পারা', মাঝামাঝি কিছুই নাই। পার ধাতু তীরার্থক পার শব্দ হইতে নামধাতু। অর্থ, এক পার হইতে পারান্তরে যাওয়া, সংপারয়ামি, বাঙ্গালা পারি। তীরভূমিতে পদার্পণ হইলেই 'পারা' হইল, না হইলে হইল না। ইহার মাঝামাঝি কিছু নাই। তাই continuative tense নাই।

কতিপয় সংস্কৃত ধাতুর কথা বলিব। অদ ধাতু ও ঘস ধাতু। উভয়ের অর্থ "ভোজন"। কিন্তু ব্যাকরণ অদ ধাতু স্থানে ঘস ধাতুর আদেশ করিয়া দিয়া বহুস্থলে নিশ্চিন্ত হয়েন, কিন্তু আমরা হই না। কারণ ধ্বনি পরিবর্ত্তনের প্রণালী অনুসারে অদ স্থানে ঘস হয় না। ইহারা বিভিন্ন ধাতু, অর্থও যে অবিভিন্ন তাহাও মনে করিতে সাহসে কুলায় না—ভোজন কার্য্য যে নানা-প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। লাঠিভোজন, কিল চড় ভোজন ত হয়ই। আবার সে সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেহ ভোজন বা আহার করে, কেহ খায়, কেহ গিলে, কেহ গাদে—আর আমরা রজনী সেনের ভাষায় "পরস্মৈপদী লুচি সন্দেশ এই উদর মধ্যে ঠাসি।" সুতরাং অদ ধাতু ও ঘস ধাতু অভিন্ন কিছুতেই বলিতে পারি না। তাহার অন্য কারণ এই যে অদ ধাতু হইতে বিশেষ্য পদ হয় "অন্ন", আর ঘস ধাতু হইতে হয় "ঘাস"। এমন অবস্থায় যদি উভয় ধাতুকে অভিন্ন মনে করিতে পারি তবে ত অন্ন মনে করিয়া ঘাস মুখে দিতেও পারি। কিন্তু "আত্মনেপদী" মুখে বোধ হয় তাহাও পারি না। "পরস্মৈপদী" মুখে বরং রকম—সকম করিয়া চলে। ধাতুদ্বয়ের অসম্পূর্ণতাও অতি সামান্য—অদ ধাতু সনন্ত হয় না। ঘস ধাতু ণিজন্ত হয় না এবং কর্ম্মবাচ্যে ইহার প্রয়োগ হয় না।

সত্তামাত্র বোধক অস ধাতুর পরোক্ষ বা ভবিষ্যদাদি কালে প্রয়োগ নাই। সে সকল স্থানে ভূ ধাতুর অধিকার, ঠিক যেন 'is' এর past participle 'been'। গ্রীক logicএর ভাষায় 'অস্' বা 'is' copula মাত্র, কিন্তু ভূধাতু উৎপত্তিবোধক। ক্রিয়া-সমাপ্তি বা ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে অস ধাতুর যোগ্যতা নাই, পরিবর্ত্তনের বাচক ভূ ধাতু সে স্থলে officiating; 'আছে'—'ছিল' হয়। 'আছিব' 'আছিতেছি' হয় না। সে স্থলে ভূ ধাতু কার্য্য করেন বলিয়া হয়—(থাকিব) হইব, হইতেছি।

ই ধাতু, যা ধাতু, গম ধাতু, গচ্ছ ধাতু পরস্পর পরিপূরক। বাঙ্গালাতে "যাই", "যাচ্ছি", হয়, কিন্তু "গেছি" "গেলুম"; আবার ভবিষ্যতে "যাব"; "গেছব" হয় না। সংস্কৃতে এতি, যাতি, গচ্ছতি হয়; কিন্তু পরোক্ষাদিতে ই ধাতুর প্রয়োগ নাই। সেখানে জগাম, যযৌ। লুঙ্ বিভক্তি অগাৎ অগমৎ। সংস্কৃতে 'গমতি', 'গমৎ', হয় না, হয় 'গচ্ছতি', 'গচ্ছৎ'। বেদে কিন্তু 'গমতি', 'গমৎ', 'গহি' হইত। সুতরাং যা ধাতু চারিটি—ই, যা, গম, গচ্ছ। কতিপয় রূপের লোপ হওয়াতে ইহারা

অসম্পূর্ণ হইয়াছে। অর্থের যদি কোনও বিভিন্নতা ছিল, তাহা এক্ষণে ধরিবার উপায় নাই। তবে ই ধাতু এক্ষণে এসেছে,ও গচ্ছ ধাতু গচ্ছ আকারে সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত। যা ও গম্ বা 'গম' লইয়া এক্ষণে অনুপূরকতা বা পরিপূরকতা।

যচ্ছ, দা দদ ধাতু পরস্পর অসম্পূর্ণ। দা ধাতু ছেদনার্থক দো ধাতুর নিকট আপনার রূপ হারাইয়াছে। যচ্ছতির পরোক্ষা বা নিজস্ব সমস্ত ভাববাচ্য নাই। শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তবতু প্রভৃতি প্রত্যয় যচ্ছ ধাতু গ্রহণ করে না। কিন্তু—"উপাদ্ যমঃ স্বকরণে" বোধ হয় যচ্ছ ধাতু। পাণিগ্রহণ অর্থে "সীতামুপযচ্ছতে রামভদ্রঃ" হয়। বাঙ্গালায় দেওয়া আছে, দাদন আছে, যচ্ছ নাই। দান ও দাদনে হয়। ত্যাগও দান।

এই প্রকার দৃশ্, পশ্য; বচ, ব্রূ, আহ; স্থা, তিষ্ঠ; পা, পিব; হন্, বধ; প্রভৃতি পরস্পর অনুপূরক বা পরিপূরক ধাতু।

মৃ ধাতুর একটু বিশেষত্ব আছে। ইংরাজি die ক্রিয়ার perfect বা continuous tense নাই। আত্মনেপদের যদি কোনও অর্থ থাকে তবে মৃ ধাতুতে তাহা সুস্পষ্ট। ধাতু অকর্ম্মক অণ্যন্তক মৃ ধাতু, পরস্মৈপদী হয় কি প্রকারে? যে মরিল তাহার সব ফুরাইল, আর সে আত্মনেপদী মরিল। তাই সংস্কৃত ব্যাকরণ চতুর্লকারে (লট্ লোট্ বিধিলিঙ্এ) মৃ ধাতুকে আত্মনেপদী রাখিয়া পরোক্ষাদিতে মৃ ধাতুকে পরস্মৈপদী করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অতিপূর্ব্বকালে মৃ ধাতু এই সকল কালে প্রযুক্ত হইত না। পরে প্রয়োগ অনুমোদিত হইয়াছে। ম্রিয়মান মৃ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হয় না। এটা মূলতঃ আত্মনেপদী ধাতু।

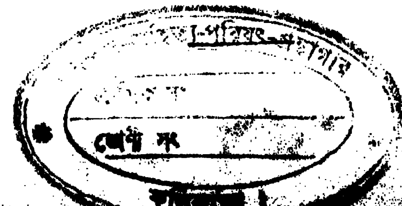
অতঃপর কতিপয় বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের উল্লেখ করিব। বহুবচন মাত্রে প্রচলিত জলবাচক অপ্ রূপ হইল—আপঃ অপঃ [অদ্ভিঃ, অদ্ভ্যঃ অদ্ভ্যঃ শব্দ] অপাম্ অপ্সু। পকারের দকারে পরিণতির হেতু কি? এরূপ পরিবর্ত্তন, ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের আইনসাপেক্ষও নহে সুতরাং শব্দ রূপের [ ] চিহ্নিত অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক্। উভয়ে মিলিয়া পরস্পর অনুপূরক। বেদের যুগে পা (to drink) হইতে নিষ্পন্ন পিতু শব্দের অর্থ ছিল "ভোজ্য"। জেন্দ্ আবেস্তার ভাষায় ইহার ভূরি প্রয়োগ আছে। সুতরাং অদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন অদ্ শব্দের (অদ্+ক্বিপ্) অর্থ drink বা জল হইবে না কেন? উদক বা উদ, অদ্ শব্দেরই অনুরূপ। তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমীতে অপ্ শব্দ অদ্ শব্দ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আজকাল বাঙ্গলাতে আমরা জল 'খাই'।

এই প্রকার পদ্, পাদ্; দৎ, দন্ত; মাস্, মাস, নির্জ্জর, নির্জ্জরস; যূষ, যূষন; দোষ্ট্, দোষ্ট্র; জরা, জরস্; নাসিকা, নস্; নিশা, নিশ্; পৃতনা, পৃৎ; হৃদয়, হৃদ্; উদক, উদ্; আস্য, আসন্; সানু, স্নু; ক্ষুধা, ক্ষুধ্; দোষ, দোষন্; দ্রুহ্, ধ্রুগ্; অসৃজ্ অসন্; যকৃৎ যকন্; এই সকল শব্দ পরস্পর অনুপূরক বা পরিপূরক।

আতিশয্যার্থক (comparative & superlative) জ্যায়ান্, জ্যেষ্ঠ; শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠ; নেদীয়ান্, নেদিষ্ঠ; কনীয়ান্ কনিষ্ঠ; স্থবীয়ান, স্থবিষ্ঠ; দবিয়ান্, দবিষ্ঠ; ক্ষেপীয়ান্ ক্ষেপিষ্ঠ; বংহীয়ান্, বংহিষ্ঠ; স্থেয়ান্, স্থেষ্ঠ প্রভৃতি শব্দের positive degreeতে ব্যবহার নাই। মতুবা ব্যাকরণের মতে 'বৃদ্ধ' স্থানে 'জ্য' বা 'প্রশস্য' স্থানে 'শ্র' এরূপ আদেশে আমরা সায় দিতে পারি না। ইহাদের সকলেই গুরু অথচ সকলেই পঙ্গু। এঁরা বোধ হয় পাল্কিবাহী।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।



ভোরের স্বপ্ন।

পেয়ে' একটা অট্টালিকা প্রাচীন এবং শক্ত,
বিদেশী এক বণিক্ তাতে হলো অনুরক্ত।
বিত্তটি যার, তাড়িয়ে তাকে দোকান করলো জারি,
সেদিন হ'তে হলো সে তার আপনার ঘরবাড়ী!
দোকানদার সেই ছিল আগেই দম্ভ লোভে ভরা,
পরের বিত্ত পেয়ে আরো মেজাজ হলো কড়া।
দালানটাতে করতো তখন, যখন যা' তার খুসি!
বেঁধে' খেতো শোবার ঘরে, দোরে ফেল্‌তো ভুষি!
শ্বেত পাথরের বাঁধা মেঝে, কাট্‌তো তাতে চেলা,
চিত্র করা দেয়াল পানে ছুড়্‌তো সখে ঢেলা!
অশন বসন সাজ সরঞ্জাম দেখ্‌তো যাহা দুয়ারে,
পাঠিয়ে দিতো সাত সমুদ্র তের নদীর সে পারে!
বাড়ীর সাবেক মালিক কভু আস্‌তো যদি অজ্ঞাতে,
দোকানী সেই কুত্তা দিতো লেলিয়ে তার পশ্চাতে!
একদা এক গুণী ফকির যাচ্ছে সেথা দিয়ে,
নজর করে বাড়ীটা, তার ক্ষুব্ধ হলো হিয়ে!
অট্টালিকা চেয়ে' ফকির দিলেন একটী ফুঁ,
কেঁপে যেন উঠ্‌লো তাতে দালান শুদ্ধ ভূঁ!
চৈতন্যহীন ইট পাথরে জেগে' উঠ্‌লো প্রাণ,
নীরস কাঠে বাজ্‌লো যেন বীণার সরস তান!
ইটকে কয়, "ও দাদা চূণ! কচ্ছ কি আর কসে'?
দেখ্‌ছো না কি, দোকানদার কি কচ্ছে মাথায় বসে'?"
সাতির বর্গা বলে তখন, "তাইতোরে ভাই ইট!
কার তরে আর মিলে সবাই জুড়ে' আছি ভিট্!"—
মুক্তি হেতু যুক্তি তাদের হয়ে গেলো ঠিক,
মর্ম্মে এমন মরে' থাকা মান্‌লো সবাই ধিক!
আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, তড়িৎ জ্বলে তায়,
বজ্রসনে করকাপাত, ঝঞ্ঝা বয়ে' যায়!
এমন দিনে ছাড়্‌লো তারা আপন আপন টান্,
চূণ খসে' যায়, ইট্ ঝরে হায়, রাখ্‌তে স্বীয় মান!
সাতির বর্গা দোর জানালা পড়্‌লো ঝুপা ঝুপ্!
মুহূর্ত্তে সে অট্টালিকা হলো ইটের স্তূপ!
খানিক পরে ফকির তথায় এসে পূর্ব্ববৎ,
সেই ইটে আর চূণে গড়্‌লো নূতন ইমারৎ!

শ্রীযশোদালাল বণিক্।

অভিনয়।*

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা অভিনয়াদি কলা বিদ্যাকে নিতান্ত বিলাসিতা ও একান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। আর এক শ্রেণীর লোক আধিব্যাধি পূর্ণ মনুষ্য জীবনে আনন্দপ্রদ নৃত্য গীতাদিকে শ্রেষ্ঠস্থান দেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যা'ক—অভিনয়ের স্থান কোথায়।

চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে মোক্ষই হিন্দুর জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। সেই মোক্ষ সাধনের উপায় প্রথমে বেদ অধ্যয়নেই পর্য্যবসিত ছিল। সেই বেদ পাঠ দ্বিজাতির জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে মহর্ষি বেদব্যাস সেই বেদ বিভাগ করিয়া বিবিধ চরিত্র ও নানা উপাখ্যান অবলম্বনে সাধারণের এমন কি শূদ্র অর্থাৎ অল্পজ্ঞানীর বোধ সৌকর্য্যার্থে পুরাণ রচনা করেন।

পরবর্ত্তীকালে লোকের রুচি ভিন্ন হওয়ায় কালিদাসাদি কবিগণ সহজে সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্য সেই পুরাণোক্ত বিষয় সরস করিয়া কাব্য রচনা করেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"

অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। সেই কাব্য আবার—

"দৃশ্যশ্রব্যত্ব ভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতম্।"

দৃশ্য এবং শ্রব্য ভেদে সেই কাব্য দুই প্রকার।

"দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্।"

যাহা অভিনয় করা যায় তাহাই দৃশ্য কাব্য অর্থাৎ নাটক।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—যদি পুরাণ অবলম্বনেই কাব্য নাটক রচিত হইয়া থাকে তবে পুরাণ পাঠের

* গৌরিপুর হরিসভায় পঠিত।

পরিবর্ত্তে নাটক অভিনয়ের প্রয়োজন কি? যে প্রয়োজনে বেদ বর্ত্তমানে পুরাণ রচিত হইয়াছিল, সেই প্রয়োজনেই পুরাণ থাকিতে কাব্য রচিত হইয়াছে। সে প্রয়োজন এই;—

"চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হি বেদশাস্ত্রেভ্যো নীরস তয়া দুঃখাদেব পরিণত বুদ্ধিনামেব জায়তে।"

অর্থাৎ বেদশাস্ত্র নীরস, তাহা হইতে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি বিজ্ঞান ব্যক্তিরই অতিকষ্টে হইয়া থাকে, কিন্তু একান্ত সরস কাব্য নাটক হইতে সাধারণ লোকেও অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারে। কাব্য নাটকাদির কি কেবল সাধারণ লোকের জন্যই প্রয়োজন? বিজ্ঞান ব্যক্তির কি ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই? তদুত্তরে সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ বিশ্বনাথ বলেন,—

"কটু কৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য মিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগীনঃ মিতশর্করা প্রবৃত্তিঃ সাধীয়সীন স্যাৎ?"

অর্থাৎ কটু তিক্ত ঔষধে যে রোগ আরোগ্য হয় তাহা যদি চিনি, মিশ্রি খাইয়া আরোগ্য হয়—তবে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কটু তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহেন? তাহা হইলে এক্ষণে প্রমাণ হইল বেদপুরাণাদি অপেক্ষা কাব্য নাটকাদি হইতে অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই অভিনয় আমাদের দেশে নূতন নহে ইহা অহিন্দুকর বা অনার্য্যোচিত নহে। ইহা এ দেশে আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আবহমান কাল বর্ত্তমান আছে। দেখিতে পাই, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়-সংহিতায় লিখিত আছে—

"নৃত্যায় সুতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং।" (৩০।৬৫)

"শৈলূষং" শব্দের মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"শৈলূষং নটং।"

পাণিনির ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পাদের ১১০ ও ১১১ সূত্রে লিখিত আছে—

"পারাশর্য্য শিলালিখ্যাং ভিক্ষু নট সূত্রয়োঃ।
৪।৩।১১০

"কর্ম্মন্দ কৃশাশ্চাদিভিঃ।" ৪।৩।১১

পাণিনি মুনি "শিলালিন" ও "কৃশাশ্ব" নামক দুইজন নটের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনি প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নাটকাভিনয় বৈদিক সময় হইতেই প্রচলিত আছে।

রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে দেখিতে পাই রামের রাজ্যাভিষেকে—

"বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাময়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্ত পরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ॥"

তাঁহার শান্তির উদ্দেশ্যে কেহ মনোহর পদ্য, কেহ নৃত্য কেহ বা বিবিধ প্রহসন নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন। মহাভারতে অর্জ্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষা করিতে ইন্দ্রালয়ে গিয়াছিলেন তখন ইন্দ্র কর্ত্তৃক—

"এতাশ্চান্যশ্চ ননৃতুস্তত্রতত্র সহস্রশঃ।
চিত্তপ্রমাদেন যুক্তাঃ সিদ্ধানাং পদ্মলোচনাঃ॥"
(মহাভারত বনপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায়)।

হরিবংশে আছে—

রামায়ণং মহাশধম্মুদ্দেশং নাটকীকৃতম্।

পরে একদিন যে দিন ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান শৌর্য্য বীর্য্য সভ্যতায় জগতের আদর্শ ছিল, এক কথায় বলিতে গেলে যে দিন ভারত ভারত ছিল; সে দিন ভারতের শীর্ষস্থান উজ্জয়িনী "সেই উজ্জয়িনী নিলে যার নাম ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে।" যে উজ্জয়িনীর স্মরণে সাহিত্যামোদী মাত্রেরই প্রাণ নাচিয়া উঠে, যাহা কবিদিগের চির পীঠস্থান, সেই উজ্জয়িনীর অধিপতি বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায় মহা কবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক অভিনীত হইয়াছিল। ভবভূতির মালতি-মাধব নাটকে দেখিতে পাই কেবল রাজ সভায় নহে—উজ্জয়িনীর পবিত্র দেবালয় কাল-

প্রিয়নাথের মন্দিরে—নাটক অভিনয় হইতেছে। নাটকারম্ভে সূত্রধার বলিতেছেন—

"অদ্যহহ ভগবত কাল প্রিয়নাথস্য যাত্রায়াং—আর্য্য মিশ্রান বিজ্ঞাপয়ামি।"

অর্থাৎ আজ কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের উৎসবে নাটক দর্শনার্থ আগত শ্রোতাদিগকে নিবেদন করি।

কেবলমাত্র উজ্জয়িনীরাজ নহেন আর্য্য ক্ষেমেশ্বর বিরচিত চণ্ডকৌশিক নাটকে সূত্রধার বলিতেছেন—

"আদিষ্টোঽস্মি মহীপাল দেবেন।"

রাজা মহীপালদেব চণ্ডকৌশিক নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। আজকাল যেমন দুর্গোৎসব হয়, এক কালে ভারতে সেইরূপ সমারোহে ইন্দ্রোৎসব হইত। তাহাতে শ্রীহর্ষ দেবের রাজধানীতে নাগানন্দ নাটক অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যারম্ভে—

"অদ্যাহং ইন্দ্রোৎসবে নানা দিগদেশ গতেন রাজ শ্রীহর্ষ দেবস্য পাদপদ্ম জীবিন। রাজ সমূহেন উক্তঃ।"

ইহাতে দেখিতে পাই রাজ চক্রবর্ত্তী শ্রীহর্ষ দেব তাঁহার অধিনস্থ সামন্ত রাজগণকে লইয়া নাগানন্দ নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। এই শ্রীহর্ষ দেব কেবল রঙ্গালয় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাকবি ধাবক দ্বারা নাগানন্দ ও রত্নাবলী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে দোল উৎসবের পরিবর্ত্তে বসন্তোৎসব হইত। তাহাতে শ্রীহর্ষ দেব নিজকৃত রত্নাবলী নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন।

"অদ্যাহং বসন্তোৎসবে রাজ সমূহেন উক্তঃ।"

কালিদাস কৃত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকও বসন্তোৎসবে অভিনীত হইয়াছিল—

"কালিদাস প্রথিত মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকং অস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যং।

তখনকার রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ংও নাটক রচনা করিতেন।—

বেদজ্ঞ গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ কলাবিদ্যা বিশারদ মহারাজ শূদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন—সামন্ত রাজ কবি বিশাখ দত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটক রচনা করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময়ে—কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের একতম ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণ কৃত বেণীসংহার নাটক এক সময় বাংলা দেশে অভিনীত হইত।

অধিক কি স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় বিদ্যাধরীদিগের দ্বারা নাটক অভিনয় হইত। তাহাতে পৃথিবী হইতে ঋষিরা নিমন্ত্রিত হইয়া দর্শন করিতে যাইতেন—পুরাণে দেখিতে পাই ইন্দ্র সভায় ভরত মুনি প্রণীত লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকের অভিনয়ে উর্ব্বশীর তাল ভঙ্গ হওয়ায় দুর্ব্বাশার শাপে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।—

মহাভারতে অর্জ্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষা করিতে ইন্দ্রালয়ে যান তখন ইন্দ্র তাহার চিত্ত বিনোদন জন্য নৃত্যগীতাদি করিতে উর্ব্বশীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন—

অতএব নৃত্য গীত অভিনয় দুষনীয় নহে। কলাবিদ্যাও মনুষ্যের একটী অতি শিক্ষনীয় বিষয়। নৃত্য গীত অভিনয়াদি চতুষষ্ঠী কলার একতম প্রধান অঙ্গ।

তবে বিলাসিতা বলিয়া যদি ইহা বর্জ্জন করিতে হয়, তবে জগতের অর্দ্ধেক আনন্দ অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। পুরাণ পাঠ যদি দুষনীয় না হয় তবে নাটক অভিনয়ও দুষনীয় নহে। পুরাণ পাঠও এক প্রকার অভিনয় মাত্র। ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"অভিনয় চতুর্ব্বিধ ঃ—

আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্য্য সাত্বিক স্তথা।"

আঙ্গিক অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী, বাচিক অর্থাৎ বক্তৃতা ও সঙ্গীত, আহার্য্য অর্থাৎ সাজশয্যা। সাত্বিক অর্থাৎ হর্ষ দুঃখাদি অভিনয় ভঙ্গী। পুরাণ পাঠক কেবল সাজশয্যা গ্রহণ করেন না নতুবা আঙ্গিক বাচি ও সাত্বিক সমস্তই অভিনয় করেন। এরূপ অভিনয় ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়াই পুরাণ পাঠ অর্থাৎ কথকতার সৃষ্টি হইয়াছে। কথকতার উৎকৃষ্ট সংস্করণ রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান; ইত্যাদি তাহার উৎকৃষ্টতর সংস্করণ পাঁচালি। পাঁচালির

উৎকৃষ্টতম সংস্করণ নাটকাভিনয়। এই অভিনয়ই কাল-ধর্ম্মে ও রুচিভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান থিয়েটারে দাঁড়াইয়াছে। কালক্রমে এরূপ পরিবর্ত্তন কোন্ বিষয়ে না হইয়াছে? আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই যে কেবল বংশ পেটিকা পরিত্যাগ করিয়া আলমারিতে উঠিয়াছে এবং "ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ স্থলে ষ্টপারফাইলে-প্রবেশয়েৎ হইয়াছে তাহা নয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নস্যও সনাতন শম্বুকাধার পরিত্যাগ করিয়া জার্ম্মান শিল-ভারের কৌটায় আশ্রয় লইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীরূপ গোস্বামী সংসারত্যাগী সাধু হইয়াও কর্পূর-মঞ্জরী নাটক করিয়াছিলেন। যুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব 'শ্রী'রামের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন এবং রুক্মিনীর ভূমিকা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"তবে আচার্য্যের ঘরে কৈলা কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীর রূপ প্রভু আপনে হইলা।"
(চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ)।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকান্তখিলানিচ।
শব্দ মূর্ত্তি ধর স্যৈতে বিষ্ণোরংশ মহাত্মন॥"

যাহা কিছু কাব্য যাহা কিছু গীতবাদ্য সমস্তই বিষ্ণুর অংশ। আর এক কাব্য হইতেই—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্য নিবেধনাৎ॥"

শ্রোত্য কাব্যই হউক আর দৃশ্যকাব্য নাটকই হউক সাধুকাব্য হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করা যায়।—

এই অভিনয় বিদ্যা এক সময় এত দূর উন্নত হইয়াছিল যে তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইত। "সঙ্গীত দামোদরে" দেখিতে পাই।—

"হস্তবিংশতি বিস্তারা রঙ্গভূমির্মনোহরা।
পূর্ব্বাভিমুখ এবাত্র নায়কঃ শোভতেপরম্॥
দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।
তন্মধ্যে মণ্ডল স্থানং নেপথ্যং তচ্চ গীয়তে॥"
ইত্যাদি।

বিশ হস্ত বিস্তার রঙ্গভূমি হইবে। নায়ক পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিবে। দক্ষিণ পার্শ্বে বাদ্যযন্ত্র এবং পশ্চাতে যবনিকা থাকিবে ইত্যাদি।

নটের কার্য্য ঘৃণনীয় নহে। আমাদেরই ভগবানের নাম নটরাজ, নটবর। নাটকাভিনয়ের ভিতর দিয়াও ভগবানের উপাসনা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে বিষলিপ্ত স্তন পান করাইতে গিয়া পুতনার মৃত্যু হয়। তাহাতেই তাহার মুক্তি হয়। তথা—হিরণ্যকশিপু ইত্যাদির ন্যায় তাহার এমন কোন শাপ ছিল না যে বৈরীভাবে ভজনা করিলে মুক্তি হইবে। ভাগবতের টীকাকার তাহার হেতু লিখিয়া গেলে "বাৎসল্যরসস্য অভিনয়ত্বাৎ।"—বাৎসল্য ভাবের কৃত্রিম অভিনয় করিতে গিয়া ক্ষণকালের জন্য তাহার তন্ময়তা আসিয়াছিল, তাহাতে বাৎসল্য ভাবে ভজনা করা হইল তাহাতেই তাহার মুক্তি হইল। ভক্তি-রসের ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিতে করিতে অভিনেতার মনে কোন না কোন সময়ে তন্ময়তা আসে তাহাতে ভগবানের ভজনার কাজ হয়। আর এই সংসার রঙ্গ-মধ্যে আমরা প্রত্যেকেইত অভিনয় করিতেছি।—

"ক্ষণং বালোভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈহীনং ক্ষণমপিচ সম্পূর্ণ বিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলিমণ্ডিত তনুঃ
নটঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানী যবনিকাম্॥"

কখন বালক, কখন যুবক, কখন বৃদ্ধ, কখন দরিদ্র, কখন ধনী এইরূপ নানা রূপে আমরা সংসার রঙ্গমধ্যে যমালয়রূপ যবনিকার অন্তরাল হইতে আসিয়া অভিনয় করিতেছি। এ বিষয় সবিস্তার কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে। সুতরাং এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম— আমাদের এত কথার পরও যদি অভিনয় সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ থাকে তবে—

"সুভাষিতেন গীতেন যুবতীনাঞ্চলীলয়া।
যস্য ন দ্রবতে চিত্তং সোমুক্তোঽথবা পশুঃ॥"

সুন্দর গীতবাদ্যে এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যগীতাদিতে যাঁহার চিত্ত মুগ্ধ না হয়—তিনি হয় মুক্তপুরুষ, নতুবা পশু। মুক্তপুরুষদিগকে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে দ্বিতীয়টীকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি। *

শ্রীসুরজিৎ কবিরাজ।

* এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।—সাহিত্য দর্পন, যজুর্ব্বেদ, পাণিনি, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্র, চৈতন্যচরিতামৃত, বিষ্ণুপুরাণ, সঙ্গীতদামোদর ইত্যাদি।

প্রতিভা

১১শ বর্ষ আশ্বিন ১৩২৮ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কবি আব্দুল সুকুর মহম্মদের গোপিচান্দের গীত।

ভূমিকা।

গ্রন্থের বিষয়।

মাণিকচন্দ্র "ষোল বঙ্গের" রাজা ছিলেন। মিহিরকুল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বৃদ্ধবয়সে (৮৪ বর্ষ বয়সে) সানন্দ নগরের তিলকচন্দ্র রাজার পাঁচ বৎসর বয়সের তারাই নামে এক সুন্দরী কন্যা বিবাহ করেন। পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে তারাই যোগী গোরক্ষনাথের কৃপায় "মহাজ্ঞান" লাভ করেন, অলোকিক শক্তিসম্পন্না হন। গুরু তাঁহার নাম ময়নামতী রাখেন। বিবাহের পর ময়নামতী গণিয়া দেখিলেন, রাজার আয়ু আর ষোল বৎসর আছে। তিনি রাজাকে "মহাজ্ঞান" দিতে চাহিলেন। কিন্তু রাজা নিজনারীর সেবক অর্থাৎ শিষ্য হইতে পারিলেন না।

কিছুকাল পরে ময়নামতীর এক পুত্র হইল। নাম গোবিন্দচন্দ্র, সংক্ষেপে গোপিচন্দ্র বা গোপিচন্দ। পুত্র হওয়াতে রাণীর আঁটকুড়া অপবাদ ঘুচিল বটে, কিন্তু তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। গুরু বলিয়াছিলেন, রাজার শেষবয়সে পুত্র হইবে বটে, কিন্তু সে পুত্রের আয়ু উনিশ বৎসর মাত্র হইবে। রাণী একথা রাজাকে জানান নাই। সর্ব্বদা যোগে ও ধ্যানে রত থাকিতেন। এ কারণ লোকে তাঁহাকে 'মুনি' বলিত।

গোবিন্দচন্দ্রের বয়স বার বৎসর হইলে ধ্যানরতা রাণীকে না জানাইয়া রাজা পুত্রের চারি নারী করিয়া দিলেন। নেহালচন্দ্র রাজার কন্যা কন্দনা, মহিচন্দ্র রাজার কন্যা চন্দনা, এবং হরিচন্দ্র রাজার দুই কন্যা রোদনী বা রোদনা (ডাকনামে অদুনা) এবং পদ্মিনী (ডাকনামে পদুনা)। পদ্মিনীর সহিত গোপিচান্দের বিবাহ হয় নাই; রোদনীর বিবাহে পদ্মিনী যৌতুকে গোপিচাঁদের রাণী হইয়াছিলেন। বিবাহের কিছু পরে তিনদিনের জ্বরে মাণিকচাঁদ রাজার মৃত্যু হইল। গোপিচাঁদ "ষোল বঙ্গের" রাজা হইলেন।

কিন্তু ময়নামতী মা গোপিচাঁদের অকাল মৃত্যুর আশঙ্কায় চিন্তিত থাকিতেন। একদিন গুরু গোরক্ষ-

নাথও সে কথা ময়নামতীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ময়নামতী বালক পুত্রকে বুঝাইয়া হাড়িপা নামক এক সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষিত করাইলেন। কিন্তু মন্ত্র রাজার মনে থাকিল না, মন্ত্রগুণে শুষ্ক পুষ্করিণী জলপূর্ণ হইল না। ক্রোধে গোপিচাঁদ হাড়িপাকে অশ্বশালায় পুতিয়া রাখিলেন। মা জানিলেন না।

যোগসিদ্ধের এই দুর্গতির কারণ ছিল। পূর্ব্বকালে পার্ব্বতী এক যজ্ঞ করিয়া নবলক্ষ চৌরাশি সিদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের যম-নিয়ম পরীক্ষার অভিপ্রায়ে পার্বতী ভুবনমোহন-বেশে নিজে অন্নব্যঞ্জন পরিশিতে লাগিলেন। সকলেরই মন চঞ্চল হইল। সকলকেই পার্ব্বতীর শাপে পড়িতে হইল। অন্য কথা কি, যোগীশ্রেষ্ঠ মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কাহ্নাঞি বা কানুপা, এবং হাড়িপা, ইহাঁদিগকেও শাপ-গ্রস্ত হইতে হইল। কদলীসহরে নটীগৃহে মীননাথ থাকিবেন, গোরক্ষনাথ এক ব্রাহ্মণের গরু চরাইবেন, ডাহুকার গড়ে যুদ্ধ করিতে করিতে কাহ্নাঞির মাথা কাটা যাইবে, এবং মিহিরকুলে হাড়িপা ঘোড়াশালায় গর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবেন।

হাড়িপা সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। ইহাঁর শিষ্য কানুপা বহুকাল গুরুর দর্শন না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি রাজহংস রথে পবনকে সারথি (যোগের ভাষা) করিয়া দেশে দেশে গুরু অন্বেষিতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন বুলতলী নামক এক গ্রামে গোরক্ষনাথ জনার্দ্দন নামক এক ব্রাহ্মণের গরু চরাইতে চরাইতে গাছে ঝুলখেলা করিতেছেন। রথের ছায়া দেখাতে গোরক্ষনাথ রথসহ কানুপাকে নীচে নামাইলেন। দুই ব্রতির সাক্ষাৎ হইল, দুইজনে দুই গুরুর সংবাদ পাইলেন। গোরক্ষনাথ স্বীয়গুরু মীননাথের, এবং কানুপা স্বীয়গুরু হাড়িপার উদ্ধারে বাহির হইলেন। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা। যাহাতে হাড়িপার ক্রোধে শিষ্যা-পুত্র গোপিচাঁদের অনিষ্ট না হয়, তাহা দেখিতে কানুপা প্রতিশ্রুত হইলেন।

কানুপা ময়নামতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোপিচাঁদের ব্যবহার জানাইলেন। ময়নামতী পুত্রের নিমিত্ত হায় হায় করিতে লাগিলেন। পরে যুক্তি হইল। গোপিচাঁদের এক স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তি হাড়িপার গর্ত্তের সম্মুখে রাখা হইল। গর্ত্তের মাটি সরাইয়া হারিপার ধ্যান ভাঙ্গা হইল। তাঁহাকে সকলেই প্রণাম করিল; করিল না সোনার পুত্তলী। হাড়িপার হুঙ্কারে পুত্তলী ভস্ম হইয়া গেল। ময়নামতী সুযোগ বুঝিয়া সিদ্ধির ঝুলী নিকটে ধরিলেন। হাড়িপা পাঁচ বৎসর সমাধিস্থ ছিলেন। তিনি সওয়া মণ সিদ্ধি, সওয়া মণ কুচিলা, সওয়া মণ ধুতুরাফল হাতে মিশাইয়া মুখে ফেলিয়া জল খাইলেন। কোপ উপশান্ত হইল। কিন্তু হাড়িপা শিষ্যের প্রতারণা বুঝিতে পারিলেন, শাপ দিলেন, ডাহুকার গড়ে শিষ্যের স্কন্ধ কাটা যাইবে। (পূর্ব্বে পার্ব্বতীও এই শাপ দিয়াছিলেন।) কানুপা সে গড়ে যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন।

ময়নামতী হাড়িপাকে ধরিয়া বসিলেন, পুত্রকে বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু নারী লইয়া যে বাস করে, তাহার সাধ্য কি যে অমর হয়। অতএব ময়নামতী গোপিচাঁদকে নানা উপদেশ দিলেন; বলিলেন,—

রাজ্যপাট ছাড় বাছা মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যোগী হৈয়া চারিযুগ বেড়াই।

কিন্তু যৌবনে এত সহজে রাজভোগ ছাড়িতে পারা যায় না। মাও ছাড়িলেন না; সংসার অনিত্য, মায়ার প্রপঞ্চমাত্র। শুনিতে শুনিতে গোপিচাঁদের বৈরাগ্য জন্মিল। বিশেষতঃ তিনি শুনিলেন, তাঁহার আয়ু আর এক বৎসর মাত্র আছে। কিন্তু গুরু কই? ময়নামতী অবশ্য হাড়িপার নাম করিলেন। হাড়ি শুনিয়া রাজা কানে আঙ্গুল দিলেন, মুখের পান ফেলিয়া দিয়া 'রাম রাম' জপিতে লাগিলেন। মা বুঝাইলেন, হাড়িপা জাতিতে হাড়ি নহেন, তিনি জলন্ধর হাড়িপা। আদ্যকালে মহেশ্বরের মুণ্ড হইতে গোরক্ষনাথ, কান হইতে কানুপা, হাড় হইতে হাড়িপা, এবং নাভি হইতে মীননাথের

জন্ম হইয়াছিল। একা যোগী মহেশ্বর পাঁচ হইয়াছিলেন। *

রাজা যোগী হইবেন, মায়ের মন প্রসন্ন। কিন্তু চারি রাণীর ক্রন্দন-রোল উঠিল। পরে একটু স্থির হইলে তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহারা বিবাহিতা হইয়া এখন বার বৎসরের হইয়াছেন। অতএব যৌবনে গর্ব্বিতা হইয়া মোহন বেশে রাজাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাজা অটল। শাশুরীর নিকট সাহায্যের আশা নাই; কারণ তিনিই রাজাকে দেশান্তরী করিতেছেন। অতএব হাড়িপাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলেই সব আপদ যায়। রাজবাড়ীর খেতুয়া নফর বাজার হইতে শত তঙ্কায় দুইঘড়া বিষ আনিয়া দিল। হাড়িপাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করা হইল। অন্নব্যঞ্জনে বিষ, আচমনের ভৃঙ্গারে বিষ, জলের পরিবর্ত্তে বিষ, এমনকি বসিবার পীড়িতেও বিষ দেওয়া হইল। কিন্তু যোগসিদ্ধকে বিষে কি করিতে পারে? হাড়িপা সব জানিতেন, ভোজনের পর একটু ঢলিয়া পড়িলেন যেন মরিয়া গিয়াছেন। খেতুয়া নফর তালাইতে জড়াইয়া বাঁধিয়া হাড়িপাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসিল। আপদ গিয়াছে; রাণীরা স্বস্তি বোধ করিতেছেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে ফুলবাড়ীতে ফুল তুলিতে গিয়া দেখেন, হাড়ি আপন গুহায় বসিয়া আছেন; এই গুহায় তাঁহার আসন ছিল।

ইতিমধ্যে পদুনারাণীর আর এক চিন্তা জুটিল। তিনি রাজার বিবাহিতা ছিলেন না, তাঁহার কোলে ছেলেও ছিল না। অতএব তিনি রাজ্যের অংশ পাইবেন না, অন্য তিনরাণী পাইবেন। রাজা পদুনার করুণায় বিচলিত হইলেন, রাজ্যের ছয়আনা অংশ তাঁহাকে, এবং দশআনা তিন রাণীকে, পত্র লিখিয়া দিলেন।

এখন নাপিত আসিল, রাজার মাথা মুড়াইল। মুখে ভস্ম; কপালে রক্তচন্দনের ফোটা; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ও কাঁথা, ও শিঙ্গা; স্কন্ধে ঝুলী, ও চকমকি পাথর (আগুনের জন্য) দিয়া "বটুয়া"; কটিতে একজোড়া মেখলাবদ্ধ চর্ম্ম, হাতে "বোঙাসের" খাপরা, এবং "দ্বাদশ" দেওয়া হইল। প্রজাগণ হায় হায় করিতে লাগিল। রাজপথ ছাড়িয়া সিদ্ধা বনপথ ধরিলেন; গোপিচাঁদের দেহ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। কতক দূর গিয়া রাত্রি হইলে হাড়িপার আজ্ঞায় বনমধ্যে পবননন্দন এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিল। অপ্সরা আসিয়া নৃত্যগীত করিল। পরদিন আবার বনপথ। বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক নাগ প্রভৃতি শ্বাপদ হাড়িপার আজ্ঞাকারী। দুইজনে ভ্রমণ করিতে করিতে কলিঙ্গনগরে উপস্থিত হইলেন। গুরু সেখানে সিদ্ধিজল খাইয়া নকুল কিনিতে রাজার নিকট বার কড়া কড়ি চাহিলেন। ময়নামতী রাজার ঝুলীতে একুশ বুড়ি কড়ি দিয়াছিলেন; কিন্তু হাড়িপা সে কড়ি শূন্যে উড়াইয়া দিলেন রাজা জানিতে পারিলেন না, কড়ি না পাইয়া ফাঁপরে পড়িলেন। কিন্তু নকুলের কড়ি নইলে নয়। সুলোচনা নাম্নী এক বেশ্যা কড়িদিয়া রাজাকে বাঁধা রাখিল। হাড়িপা চলিয়া গেলেন। বেশ্যার বাড়ীতে রাজার অশেষ ক্লেশ হইতে লাগিল।

(এখানে পুথী খণ্ডিত। অন্য গীতে আছে দ্বাদশ বৎসর বিষম পরীক্ষার পর হাড়িপা আসিয়া রাজাকে উদ্ধার করেন।) তখন রাজা যোগান্ত বেদান্ত ও শরীরের ভেদ শিখিলেন, এবং

ভঙ্গ দিল জন্মমৃত্যু দুই কাল যমে।

কবি।

কবির পিতৃদত্ত নাম আব্দুল সুকুর, কবি নাম মহম্মদ সুকুর। পিতার নাম সেখ আনার ফকীর। নিবাস সিন্দুরকুসুমী গ্রাম। কবি জানাইয়াছেন, তিনি হিন্দুর পুরাণ শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র রাজার সন্ন্যাস রচনা করিয়াছেন।

---

* গোপিচাঁদ বার বৎসর বয়সে হাড়িপার একবার শিষ্য হইয়াছিলেন। বোধ হয়, বাল্যকালের কথা স্মরণ ছিল না।

করিয়া তাহা প্রাঞ্জল। কিন্তু নারীর বেশ-ভূষা ও রূপ বর্ণনা করিবার সময় তিনি সংস্কৃত শব্দের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। অনেক শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন, বর্ণনাও ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় সংযম আছে; অন্যান্য কবির ন্যায় গ্রাম্যজনসুলভ অশ্লীলতা নাই। ভাষা দেখিলে কবিকে দুই এক শত বৎসরের অধিক পুরাতন বোধ হয় না।

পুথী।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দিনাজপুর জেলার বালুঘাট মহকুমার এক মুসলমানের বাড়ীতে এই পুথী পাইয়াছিলেন। ইহার সহিত আরও অনেক পুথী ছিল। একখানার নাম "কান্তনামা"। ইহার কবি সাহেলা মণ্ডল ১২৫০ সালে "কান্তনামা" সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ভট্টশালী মহাশয় দেখিয়াছেন "কান্তনামা" যে হাতের লেখা, গোবিন্দচন্দ্রের পুথীও সেই হাতের লেখা। অতএব উপস্থিত পুথীর লিপিকালও ১২৫০ সাল।

পুথীখানি ১১॥০×৪॥০ ইঞ্চি আকারের তুলাট কাগজ ভাঁজ করিয়া দুই পিঠে ১০+১০ ছত্র করিয়া লেখা। আদ্য ও অন্ত খণ্ডিত। শেষের দিকে দুই তিন পাতাও নাই। বোধ হয় প্রথমে ৭৫।৭৬ পাতা ছিল, এখন প্রায় ৭০ পাতা আছে। অক্ষর গোটা গোটা, যেন যত্নে ও ভয়ে ভয়ে লেখা। বড় বড় শব্দ ভাগ ভাগ করিয়া লেখা। মধ্যে মধ্যে আর একজনের হাতের লেখা আছে।

কতকগুলি অক্ষরের আকার ৭৫ বৎসর অপেক্ষা পুরানা বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথীতে পুরাতন অক্ষর দেখা গিয়াছে। তথাপি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সময়ের বাঙ্গালা অক্ষরের আকৃতি একত্র করিয়া সাজাইয়া প্রকাশ করিলে অজানা পুথীর দেশ ও কাল কতকটা নির্ণীত হইতে পারে। এখন অনেক পুথী সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু পুথীর কাল নিরূপিত হইতেছে না। বাঙ্গালা লিপি-কলা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশিত হইলে অনেক কাজে লাগিবে। এই বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে ভাবিয়া এই পুথী হইতে বিশেষ বিশেষ অক্ষরের যথাযথ চিত্র দেওয়া গেল।

আজ্ঞাত্র, ইন্দ্র, গুপাত্র, সত্তা, হইয়া, কাহাচক্র, অখন, উঁারায়া, দুগগর্ভ‌াত, ত্তাম, পুত্র, খামক, খামক্তা, খীর, আনাঙ, কর্ত্তা, সোবণ্ড, ঊওক, বৃক্ষ, জ্রাজল, কাত্র।

পুথীর নাম।

আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথীতে কোথাও নাম পাওয়া গেল না। কবি বহু স্থানে ভণিতা করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টতঃ গ্রন্থের নাম করেন নাই। কোথাও "জোগান্ত" কোথাও "রাজার সন্ন্যাস", এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বোধ হয়, "গোবিন্দচন্দ্র", কিম্বা "গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস" এইরূপ নাম রাখিলে গ্রন্থের বিষয় বুঝিতে সহজ হইবে। জোগীরা কিংবা সাধারণ লোকে যাহাই বলুক, "ময়নামতীর গান" এই নাম ঠিক বোধ হয় না।

শব্দ ও শব্দের বানান।

পুথীখানি অশুদ্ধ। দুই প্রকারে অশুদ্ধ। শব্দে অশুদ্ধ, বানানেও অশুদ্ধ। দিনাজপুরের ভাষায় অকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হয়। যথা,—সে-বো-ক, অ-পো-রা-দ, ডো-ব, গো-গ্র-না। ইহার বিপরীত অবশ্য আছে। যথা, ছ-ট, ক-থা (কোথা)' নি-ম-চ-ন, ম-হ-ন। বোধ হয় মুসলমানের মুখে ও-কার বেশী হয়। প স্থানে ফ হইয়া হা-ড়ি ফা। এইরূপ, ক স্থানে খ হইয়া খে (কে)। উত্তর বঙ্গের ভাষায় শব্দের আদ্যস্বরে র আগম, এবং আদ্য র লোপ হয়। র আগমে আ-ই (মাতা) স্থানে রা-ই, উ-পা-য় স্থানে রু-পা-এ। র লোপে রূ-প-সী স্থানে উ-প-সি, রু-দ্রা-ক্ষ স্থানে উ-দ্রা-ক্ষ। এইরূপে, রো-দু-না স্থানে ও-দু-না। ও-কার পরে উকার থাকাতে উ-দু-না। উপরে থাকিলে আদ্য অ-কার ও-কার তুল্য উচ্চারিত হয় বলিয়া অ-দু-না। র লোপে উ-দু না বা অদুনা নামের উৎপত্তি দেখিয়া বোধ হয়, গোপিচন্দ্রের গীতের আদিস্থান উত্তর বঙ্গে। শব্দের আদ্য ল প্রায়ই ন হইয়াছে। যথা, নো-ত,

ম্যা-গ্য (মাগ), বৈ-ঞ্য। ন-ল-র, এই তিন বর্ণের বিপর্য্যয়ও হইয়াছে। যথা, কা-ন-ল (কানন), কুন্তন (কুন্তল), মু-ণ্ড-ল (মুণ্ডন), জ-না-র্দ্দ-ন (জনার্দ্দন), চি-র-রি (চিরণী), না-গি-ণি (রাগিণী)। ঘ স্থানে হ হইয়া ঘর-হর, ঘাম-হাম- হাউম।

এইরূপ শব্দকে ভাষার মনে করিলে অশুদ্ধ বলিতে পারা যায় না। কিন্তু সর্ব্বত্র ধ্বনিসংবাদী বানান দেখিতে পাই না। পুথীতে ঈ কিংবা ী কোথাও নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র শ্রী। এক স্থানে ঞী আছে, অন্য কোন স্থানে নাই। দ্বিত্ব হইলেই ণ্ণ, অন্যত্র ন। জ সর্ব্বত্র, অথচ যু-গি, যু-গ-তি, যু-ড়ি আছে। পদান্তে য় আছে। অথচ বি-দা-এ, নি-শ্চ-এ। উকার যোগ করিতে হইলেই সু, নতুবা একজনের লেখায় অন্যত্র শ, অপরের লেখায় শ স দুই-ই আছে। র ভ উকার যুক্ত করিতে হইলেই রূ, ভু। ত্র লিখিতে হইলেই ত্তৃ। ইকার ও ঋ-ফলা যুক্ত করিতে হইলে ইকার ও ঋকার। যথা, মৃ, ত্রৃ। মীনচেতনেও এইরূপ; যথা, গৃহ। রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জন মাত্রেই দ্বিত্ব। ইহা সেকালের রীতি ছিল। যেমন, দু-গর্গা। কিন্তু ক-র্ম্ম, অ-র্ম্ম, রা-র্জ্জ্য ইত্যাদিও আছে। অর্থাৎ দ্বিত্ব করিয়াও বানানে সন্দেহ রহিয়াছে, দু-গর্গা-তি, ত-র্ব্বা-স ইত্যাদি আসিয়াছে। কবি নিজের নাম এক রকম বানান করিতে জানেন নাই মনে হয় না। অথচ আবদুল বহুস্থানে থাকিলেও এক স্থানে আ-ব-দু-ল্য আছে, ম-হ-ম্য-দ, মো-হ-ম্য-দ, মো-হা-ম্য-দ আছে।

উত্তরবঙ্গের (আসামের দিকের) ভাষায় অধিকরণ কারকে এ-তে না হইয়া ত হয়। যেমন, পু-রী-ত। কিন্তু এ-তে ও তে আছে। এইরূপ, কর্ম্মকারকে কে স্থানে ক হয়। যেমন, মু-নি-ক। কিন্তু কে ও আছে, অনেক স্থানে তাহা খে হইয়াছে। একটি আশ্চর্য্য ড় বানানে একটী স্থান ব্যতীত কোথাও ভুল নাই। অথচ কোথাও চন্দ্রবিন্দু নাই। যে পুথীতে একই শব্দের দুই তিন রূপ দেখি, তাহা অশুদ্ধ। সে-ব-ক, শে-ব-ক, শে-বো-ক, সে-ব্-ক্য, শে-বৈ-ক; মারা, ম-ম্না; মু-ক্ষ্য, রা-র্জ্জ্য; গ্যা-ম, জ্ঞা-ন, ক-র্ম্ম, ক-র্ম্ম; বা-খো-ক, বা-খো-ক; শ-র-ব-র, শ-রো-ব-র; ইত্যাদি আছে। শিং-হে, মাং-শ, ত্রি-প-দি, মৃ-কু-ল, শ্রী (স্ত্রী, শৃ) প্রভৃতি বানান দ্বারা পাঠকের নিকট বিভীষিকা প্রদর্শিত হয়। তথাপি পুরানা পুথীর বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিতে অনেকের হাত কাঁপিয়া উঠে, যেন আমরা লিপিকর হইবারও যোগ্য নই! অ-শিক্ষিত লিপিকরের কলমের টানে, অভ্যাসের গুণে, কিম্বা ধ্বনি সংবাদী বানানের চেষ্টায় বানানের যে দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা বুঝিবার শক্তিও আমাদের নাই?

গোবিন্দচন্দ্রের গীতগুলি লিপিকরের বানানেই ছাপা হইয়াছে। স্পষ্ট ভুলগুলি ঠিক মনে হইয়া প্রামাণিক গ্রন্থে উঠিয়াছে, শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া গবেষণা হইয়াছে। যখন এত হইয়াছে, তখন এ খানিও বোঝার উপর শাগের আটি হউক। পুথীর অক্ষরে ছাপাইবার জো নাই। সুতরাং দুই এক স্থানে যে ভুল ছাপা না ঘটিবে, এমন আশা নাই।

কটক কার্ত্তিক ১৩২৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"সাংখ্যসার।"

মহর্ষি কপিলোক্ত সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বসমূহ বিজ্ঞান-ভিক্ষুরচিত ক্ষুদ্র সাংখ্যসার নামক পুস্তিকা পাঠেই বিশেষ অবগত হওয়া যায়। এই সাংখ্যসার গদ্য ও পদ্য দুইভাগে বিভক্ত। গদ্যভাগ পরিচ্ছেদত্রয়ে সঙ্কলিত এবং পদ্যভাগে সাতটী পরিচ্ছেদ। গদ্যভাগে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানে মোক্ষ হয় ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ বিবেকজ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃত্যাদি জড়বর্গের বিবরণ

প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চভাগে প্রকৃতির ব্যাখ্যা অচেতনা প্রকৃতি ও চেতন পুরুষের পার্থক্য; মনের ইন্দ্রিয়াগ্রাহীত্ব এবং বিদেহলয় প্রকৃতি প্রকৃতিলয় প্রভৃতি বর্ণিত আছে। সাংখ্যসারের বক্তব্য বিষয় গ্রন্থের আদিভাগে কয়েকটী পঙ্‌ক্তিতেই অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে এবং অবশিষ্টগ্রন্থ ঐ কয়েক পঙক্তিরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। এইস্থানে সেই কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"আত্মনাত্মবিবেকসাক্ষাৎকারাৎ কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলাভিমান্ নিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যরাগদ্বেষধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যনুৎপাদাৎ, পূর্ব্বোৎপন্ন কর্ম্মণাং চা বিদ্যারাগাদিসহকার্য্যুচ্ছেদরূপদাহেন বিপাকানারম্ভকত্বাৎ প্রারব্ধসমাপ্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাবেন ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরূপো মোক্ষো ভবতীতি শ্রুতি স্মৃতিডিণ্ডিমঃ।"

"সাংখ্যসার" পুস্তক প্রণয়ন করিবার হেতু কি তাহা বুঝিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন, ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রোক্ত সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি পুস্তক বালকদের সুখ বোধের নিমিত্ত। উহাতে অতি সংক্ষেপে আত্মতত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে। অতএব এই সাংখ্যসার পুস্তকে সেই সমস্ত বিষয়েরই প্রপঞ্চ বা বিস্তার বলা হইতেছে। * ইহা দ্বারা এমন মনে করিলে চলিবে না যে "সাংখ্যকারিকা" পুস্তকে সাংখ্যদর্শনের মূল বিষয়েরই অভাব আছে। তেমন মনে করা ভ্রম। সাংখ্যকারিকাতে সাংখ্যদর্শনের যাহা অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া তৎসমস্তই প্রায় সঙ্কলিত হইয়াছে। পরপক্ষখণ্ডন, স্বপক্ষখণ্ডন এবং আখ্যায়িকাভাগ সাংখ্যসপ্ততিতেও ধৃত হয় নাই, সাংখ্যসারেও বর্ণিত হয় নাই। এতদংশে উভয়েরই সারত্ব বা সংক্ষেপত্ব (Sum and substance) অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

কপিল কে?

মহর্ষি কপিলই যে সাংখ্যদর্শনের আদিবক্তা সেই সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। * কিন্তু কে এই কপিল, কোথায় নিবাস সে সমস্ত পরিচয় অদ্যাপি কালের গহ্বরে সংশয়তিমিরে সমাচ্ছাদিত। অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা মহর্ষি ব্যাসের ন্যায় সাংখ্যদর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলেরও বহু বহু জন্ম ও বহু বহু নামের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রুতিতে উল্লেখিত একটী শ্লোকপাঠে জানা যায় কপিল ব্রহ্মার মানস পুত্র, যথা—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিবর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।" কেহ বলেন ইনি বিষ্ণুর মূর্ত্তিরূপে নারায়ণের অবতার। অপর একটী বৃত্তান্তে জানা যায় কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে কপিলের জন্ম। অথচ অন্যস্থলে উল্লেখ আছে ইনি ধর্ম্মের ঔরসে হিংসার গর্ভজাত সন্তান। পুনশ্চ ইনি অগ্নির অবতাররূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপরও একজন কপিল ছিলেন, গোতমবংশীয়। ইনি তত প্রাচীন নহেন, অতএব সাংখ্য বক্তা হইতেই পারেন না। বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায় এই কপিলের নামেই নাকি কপিলাবস্তু নগরের নামাকরণ হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় আমরা এইস্থলে উহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি
জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ............শ্রুতি।
আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্ জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্ ॥ স্মৃতি।
কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহু র্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্য যোগ প্রবর্ত্তকঃ ॥ মহাভারত
এতস্তে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষুনাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনম্ ॥ ভাগবত।
ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলোনাম, তদ্ যথা—

* সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্মতত্ত্বং বিবেচিতম্।
সাংখ্যসার বিবেকোঽতঃ বিজ্ঞানেন প্রপঞ্চ্যতে ॥
প্রায়ঃ সঙ্কলিতা সাংখ্য প্রক্রিয়া কারিকাগণে।
সাংখ্যোঽত্র বর্ণ্যতে লেশাৎ তদসুক্তাংশমাত্রতঃ ॥

* গোতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েবহি ॥

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্তপ্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥"

গৌড়পাদ স্বামী (প্রাচীনতম সাংখ্যদার্শনিক)

এই শ্লোকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটী অপরস্থলে নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়—

"সপ্তৈতে মানসাঃ পুত্রাঃ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥"

সাংখ্যকারিকার টীকা তত্ত্বকৌমুদীর প্রারম্ভে নমস্কার প্রকরণে বাচস্পতি মিশ্র লিখিতেছেন—

কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে।
পঞ্চশিখায় তথেশ্বর কৃষ্ণায়ৈতে নমস্যামঃ ॥

সাংখ্যসপ্ততি গ্রন্থকার স্বয়ং ঈশ্বরকৃষ্ণ ৬৯ ও ৭০ কারিকায় কপিলের উল্লেখ করিতেছেন—

পুরুষার্থ জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিনা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তি প্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্ ॥
এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনি *রাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্ ॥

তত্ত্বসমাস বা দ্বাবিংশসূত্রকে আদিসাংখ্য বলা হয়। এই আদি সাংখ্যের সর্ব্বোপকারিণী নাম্নী টীকায় যাহা যাহা লিখিত আছে তাহারই প্রয়োজনীয় অংশমাত্র বাছিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

"অথাত্রানাদিক্লেশ কর্ম্ম বাসনা সমুদ্র পতিতান অনাথান্ উদ্দিধীর্ষুঃ পরম কৃপালুঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো মহর্ষি র্ভগবান্ কপিলো ব্রহ্মাসুতো দ্বাবিংশসূত্রানি (তত্ত্বসমাসস্থ) উপাদিক্ষৎ। .... । সূত্রষড়ধ্যায়ীতু বৈশ্বানরাবতার ভগবৎ কপিল প্রণীতা। .... । তস্যা অপি বীজভূতা ব্রহ্মসুত মহর্ষি ভগবৎ কপিল প্রণীতেতি বৃদ্ধা বদন্তি। অত্র নারায়ণাবতার ভগবৎ প্রণীতেতি কেচিৎ। তন্ন রমণীয়ম্।"

আমাদের অনুসন্ধানে প্রতীত হয় শ্রুতিতে বর্ণিত সেই প্রাচীনতম কপিলই কল্পভেদে বিভিন্ন শরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র, কর্দ্দমের পুত্র, নারায়ণের অবতার, অগ্নি অবতাররূপে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, এবং যোগবলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়া একই কপিল নামে যুগে যুগে সাংখ্য দর্শনের প্রচার ও ক্রমোন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইনিই একদা যোগবলে বলীয়ান্ হইয়া ব্রহ্মতেজে ষষ্টি-সহস্র ক্ষাত্রশক্তিকে পরাভূত করিয়া ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে জগৎকে স্তব্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিলেন। অথচ ইনিই এককালে জন্মান্তরীণ অনাদিবাসনা বশতঃ সাধারণ মানবের ন্যায় যোনিভ্রমণচ্ছলে দেবহূতির উদরে জন্মক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। অথচ ইঁহারাই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বদর্শিতায় ভীত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও অতি সন্তর্পণে বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদ প্রথমসূত্রের ভাসতীতে পক্ষাপক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মোট কথা ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বিশ্ববিশ্রুত এই ঋষি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহমেঘ চিত্তাকাশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। কপিল সম্বন্ধে আমরা যথার্থতঃ কিছুই জানি না বা বলিতে পারি না। যে যাহাই বলুন না কেন সকলই অনুমানাত্মক, অথচ বিবিধ বিসদৃশ কাহিনীতে বিজড়িত বিধায় নিতান্তই অমূলক। তথাপি একথা বিশ্বাস করিতেই হইবে—অথচ ইহাতে দ্বিধা করিবারও কোন কারণ নাই যে—মহর্ষি কপিল উপকথা বা রূপকথায় বর্ণিত সাধারণ মানব অপেক্ষা অবশ্যই একজন অতিমানুষ ছিলেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তান আমরা, তাদৃশ মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্যের ভিতরে উল্লিখিত মহাত্মা এবং অপরাপর কতিপয় মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহাদের সমাধির উপর দুগ্ধধবল কোনরূপ শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরের সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, বহু সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী (সত্যমিথ্যা ঘটনায় পরিপূর্ণ) তাঁহাদের কোন জীবনচরিতও কেহ রচনা করিয়া রাখিয়া যান নাই, অথবা আধুনিক রীতি অনুসারে

* মুনি=কপিলঃ।

উঁহাদের কোনরূপ ছায়াচিত্র বা তৈলচিত্র তুলিয়া রাখা হয় নাই কিংবা উঁহাদের স্মারক তিথি (memorial day) উপলক্ষ্য করিয়া বৎসরের মধ্যে একটা বা দুইটা দিন কোনরূপ উৎসবেরও সূচনা নাই, তথাপি আমরা প্রত্যহ ভোরের বেলায় তাঁহাদের উদ্দেশে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভক্তিচিত্তে কয়েক গণ্ডুষ জল অর্পণ করিয়া থাকি। প্রাতঃস্মরণীয় বা চিরস্মরণীয় আর কাহাকে বলে? ধর্ম্মের সঙ্গে সংবদ্ধ থাকিয়া যাঁহারা আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের ভিতর দিয়া কর্ম্মকার্য্যে ও মর্ম্মরাজ্যে আধিপত্য ও অনুরাগ লাভ করিয়াছেন তাহারাই প্রাতঃস্মরণীয়, তাহারাই চিরস্মরণীয়।

দর্শন ও দার্শনিকদের সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের সম্বন্ধ।

আমাদের মন্ত্রগাথা কি বলিতেছে শুনুন—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখা তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সমস্ত দার্শনিকগণ মৎপ্রদত্ত জলধারা তৃপ্তিলাভ করুন। এই জল প্রদানের ব্যবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের আস্থা বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নিহিত রহিয়াছে কিনা তাহা অবৈজ্ঞানিক আমরা কেমন করিয়া বলিব? আমাদের বিজ্ঞান নাই, জ্ঞান নাই, মান নাই, আছে শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধর্ম্মের ভান, এবং তৎসঙ্গে আছে কিঞ্চিৎ অন্নদান ও ভগবানের ধ্যান। অথচ এই গুলিকেই আমরা মহাদান বলিয়া মনে করি। জড়বিজ্ঞানের প্রতি ঝোক বা প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস এখনও অপেক্ষাকৃত কম—যদিও তাহা হাতে কলমে সকল বিজ্ঞান দেখাইয়া দেয় বা শিখাইয়া দেয়। শ্রদ্ধা হইতেই শ্রাদ্ধ। আমরা পরলোকগত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করি তাহা শুধু আন্তরিক শ্রদ্ধা হইতেই। পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য এই মনে করিয়াই আমরা শ্রাদ্ধাদি করি; তাঁহারা মরিয়াও আমাদের প্রদত্ত তিল জল গ্রহণ করিবেন কি না করিবেন সেই বিচার করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। হইতে পারে তাঁহারা মৃত্যুর পরক্ষণেই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহশূন্য হইয়া ভোগাতীত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইতে পারে তাহারা স্বকীয় উত্তম কর্ম্মের ফলে নশ্বরত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম বিহীন মোক্ষপদ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা না-ও হইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীরের সেই সূক্ষ্ম সংবাদ জানিবার শক্তি যখন আমাদের নাই, এতদবস্থায় আমরা আমাদের স্বকর্ত্তব্য কেন করিব না? তাঁহারা যদি আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত ও নিরাশ্রয় হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ তাহাদেরই বংশধরগণ হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্যের প্রার্থী থাকেন তবে আমরা কেন "এই জল নিন্" "এই দুধ নিন্" বলিয়া উহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দুধ জল নিবেদন করিয়া দিব না? অবশ্যই দিব। মৃত্যুর পরও যখন তাহারা কতককাল পর্য্যন্ত আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের পানে তাকাইয়া থাকিতে পারেন তবে আমরা কেন তাঁহাদের প্রীত্যর্থে এক গণ্ডুষ জল বা দুধ এবং কয়েকটা স্নেহময় পদার্থ (তিল) দান করিতে পারিব না? কতকাল পর্য্যন্ত যে আকাশমার্গে তাঁহাদের গতিবিধি থাকিবে বা থাকিতে পারে সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা জানি ভক্তি, আমরা জানি শ্রদ্ধা; এবং উহাই আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। কেহ আপত্তি করিতে পারেন কৈ, সেই জল বা তিল যেমন ভাবে দেওয়া হয় ঠিক তেমন ভাবেইত পড়িয়া থাকে; উহা খায় কে এবং কি প্রকারেই বা দেহশূন্য যেই সূক্ষ্ম শরীরে বা লিঙ্গ শরীর ভূতলের তিল ও জল গ্রহণ করিবে? উহাদের ত এখন হাত পা নাই, মুখ নাই, উদর নাই, ক্ষুধা নাই? আমরা বলি, আছে। স্থূল দেহ নাই বটে কিন্তু একাদশ ইন্দ্রিয় আছে, পঞ্চতন্মাত্রা আছে, সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিবিধ অন্তঃকরণ—মনঃ,

বুদ্ধি ও অহঙ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে।* অতএব অন্তঃকরণ থাকিলেই অনুভূতি থাকিবে, অনুভূতি থাকিলেই কামনা বাসনা ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে। আমাদের প্রদত্ত নীর ও ক্ষীর সূক্ষ্ম সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করে। যাবৎ না পরদেহ-প্রাপ্তি ঘটে তাবৎ তাহারা আমাদের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকেন। কবে যে পরদেহপ্রাপ্তি ঘটিবে তাহাত আমরা জানি না; পরদেহপ্রাপ্তি ঘটিবে কি না, পুনর্জ্জন্মনাশ হইবে কি না, ব্রহ্মলোকে বা চন্দ্রলোকে গতি হইবে কি না তাহাও আমরা অধিক অবগত নহি। অতএব আমাদের স্বস্ব কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই বিধেয়, নতুবা যে আমাদের কর্ত্তব্যচ্যুতি হয়, পিতৃপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়, পক্ষান্তরে হয় ত, তাঁহাদের সূক্ষ্ম-শরীরও তৃষ্ণি চাতকের ন্যায় 'জল' 'জল' বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। অতএব দাও বৎস! পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে একগণ্ডূষ জল দাও। কোনও আড়ম্বর নাই, কোনও ব্যয় বাহুল্য নাই; কেবলমাত্র একগণ্ডূষ জল ও একাগ্রচিত্তের শ্রদ্ধা। ইহাই আমাদের জাতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব। বিপক্ষে যে যাহা বলে বলুক।

আর্য্যধর্ম্মের উদারতা।

আমরা যে শুধু নিজের পরমাত্মীয় পিতৃপুরুষদিগকে তর্পিত করিয়াই বিরত হই তাহা নহে; সংসারে যাহাদের বন্ধু বান্ধব নাই, পুত্র পৌত্র দৌহিত্র নাই, এমন কি বংশধর বলিতে কেহই নাই, পরলোকগত (প্রেতলোক নিবাসী) তাদৃশ ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধনার্থও আমরা দুই গণ্ডূষ জল ও সভক্তি তিল প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নাহ।

"যেঽবান্ধবা বান্ধবাশ্চ যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি মাখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয় কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

*পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈ রাধিবাসিতং লিঙ্গম্॥

আরও দেখুন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষেও ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কোন বাধা নাই। ব্রাহ্মণ হইয়াও আমরা চন্দ্রবংশাবতংস ভীষ্মদেবের তর্পণ করি, সূর্য্যবংশ গৌরব রাম লক্ষ্মণের তর্পণ করি। এমন কি পরাৎপর পরম ব্রহ্ম অবধি কীটানুকীট তৃণ গুল্মকে পর্য্যন্ত তৃপ্ত রাখিতে যত্নবান হই। "আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র ও মন্ত্রগত অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মের উদারতার লক্ষণ নহে কি? আর্য্যগণ সমগ্র বসুধাকেই আপন কুটুম্বের ন্যায় মনে করেন; ইহা অনুদারতার লক্ষণ কে বলে? কে বলে হিন্দুধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, কে বলে ইহা আত্মপক্ষপোষণকারী স্বার্থপর ও অনুদার? ধর্ম্মোদ্দেশে হিন্দুর প্রাণ সমগ্র জগৎকেই মুক্ত দেখিলে তৃপ্ত হয়। অধঃপতিত নিগৃহীত ও উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে উন্নত সমাধিস্থ ও স্বাধীন দেখিলেই সুখী হয়। সেই উচ্ছৃঙ্খলা নিবারণের নিমিত্তই শাস্ত্র ও শাসন। শাস্ত্ররক্ষার নিমিত্তই আইন কানুন ও ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা গুলিও আবার চক্ষু-বিহীন (অ-ঋষি) অমানুষের গড়া নহে; ত্রিকাল-দর্শী ঋষি মানুষের গড়া।

কপিলের সমসাময়িক এবং তৎপরবর্ত্তী অপর কতিপয় দার্শনিক।

কপিলের সমসাময়িক প্রাচীনতম অপরাপর যে সকল দার্শনিকের নাম আমরা জানি তন্মধ্যে (১) আসুরি (২) পঞ্চশিখ (৩) সনাতন ও (৪) সনন্দন প্রভৃতি কতিপয় মনীষীর নাম উল্লেখ যোগ্য। উহাদের মাতা পিতার বিবরণ দুই এক জায়গায় পাওয়া যায় সত্য কিন্তু এগুলি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ব্রহ্মার মানসপুত্র হিসাবে উঁহারা সকলেই পরস্পর ভ্রাতা একথা অঙ্গীকারে কোনও আপাত্তর কারণ দেখা যায় না। অপরে বলেন উঁহারা ধর্ম্ম ও হিংসার সন্তান।

(১) আসুরি স্বয়ং কপিলের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার রচিত মোটেই দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়। উভয়ই সাংখ্যদর্শন বিষয়ক।

(২) পঞ্চশিখ, আসুরির শিষ্য বলিয়া কথিত অথচ কপিল হইতেও শিক্ষা এবং উপদেশ লাভ করিয়াছেন। ইনি যে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ অতি সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অতি অল্পই প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তবে ইহা অবিসংবাদিত যে ইনি সাংখ্য-দর্শনেরই প্রবর্ত্তক ছিলেন, অথচ পাতঞ্জল দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৩) সনাতন শুধু যোগ নিয়াই ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু ইঁহার কোন রচণা প্রণালী বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে কি না জানা যায় না।

(৪) সনন্দনকে কিংবদন্তীর অনুরোধেই খ্যাতনামা দার্শনিক রূপে জানা যায়। স্বকীয় শাস্ত্রালোচনার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন যদিইবা ইনি কিছু রাখিয়া গিয়া থাকেন আমরা কিন্তু সেই সকলের কিছুই পাইতেছি না।

(৫) ঈশ্বরকৃষ্ণ ও কপিলের মধ্যে ব্যবধান কতদুর তাহা অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া যথার্থতঃ কিছুই বলা যায় না। অন্ততঃপক্ষে ইনি যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নির্ব্বিবাদেই স্বীকার করা যাইতে পারে। যাদৃশ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ইনি সাংখ্যকারিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা-দ্বারা এবং গ্রন্থের অন্তর্গত লিখনভঙ্গী দ্বারা ইঁহাকে অতি প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হয়। ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গ্রন্থারম্ভে ইনি কোনও দেবতার স্মরণ না করিয়াই অথবা কোনও পূজনীয় গুরুকে অভি-বাদন না করিয়াই একেবারে স্বকীয় বক্তব্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন "দুঃখত্রয়া ভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা—" ইত্যাদি। কোনরূপ শিষ্টাচারের লক্ষণ নাই বা কোন-রূপ বিনয়বাক্য ব্যবহার নাই। ইনি যে কে ছিলেন, অথচ বসতি কোথায় এই প্রশ্ন চিরকালই বোধ হয় অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। ইহার নিজের প্রদত্ত বিবরণ দ্বারা এবং বাচস্পতিমিশ্রের নমস্কার প্রাণালীর দ্বারা ইঁহাকে পঞ্চশিখের শিষ্যরূপে গণ্য করা যায়। * । বস্তুতঃ সুদৃঢ় প্রমাণব্যতিরেকে ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন তথ্যই সত্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

(৬) অতঃপর যাঁহার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হইবে তিনি বহু বহু বিচক্ষণ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম; অতএব সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ইঁহার নাম বিজ্ঞানভিক্ষু। কপিলের মতানুযায়ী প্রচলিত-সাংখ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্যসমূহ অতীব মূল্যবান্। সাংখ্যের মূল বিবরণগুলি সম্পূর্ণাঙ্গে প্রকাশ করিবার কালে ইনি কোথাও এমন কিছু বাদ রাখিয়া যান নাই যে অংশের আবারও টীকা টিপ্পনী বা ভাষ্যের দরকার হইতে পারে। ভাষ্যকার হিসাবে কোথাও গ্রন্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কোথাও বা অতি অল্প কথায় গ্রন্থের সার বস্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইঁহার ছিল। বিজ্ঞানভিক্ষুর সমকালে এতদ্দেশবাসী পণ্ডিতদের মধ্যে কেহও তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বৈধভাব গ্রহণ করেন নাই, অথচ তাঁহার মত-প্রণালী ভ্রমপ্রমাদশূন্য কিনা এই বিষয়ে বাদী হন নাই। অতএব উঁহার মতধারা যে সর্ব্বসাধারণেরই অনুমোদন যোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী কালে বাচস্পতি মিশ্রের মতবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ অনেক স্থলেই বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। বিস্তার ভয়ে এইস্থলে তৎসমুদয়ের উল্লেখ স্থগিত রাখাই সঙ্গত মনে করিলাম। বিজ্ঞানভিক্ষুর কীর্ত্তিকলাপ পাঁচটী গ্রন্থের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তৎসমুদয়ই দর্শনাত্মক। রচনার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে উহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। ব্রহ্মসূত্র ঋজুব্যাখ্যা বা বিজ্ঞানামৃত। ইহা বাদরায়ণকৃত বেদান্ত সূত্রের টীকা বিশেষ।

২য়। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য বা ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যভাষ্য। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৩য়। পাতঞ্জল ভাষ্যবার্ত্তিক বা যোগবার্ত্তিক। ইহা পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যের বিবৃতি।

৪র্থ। সাংখ্যসার। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* শিষ্যপরম্পরয়াগত মীশ্বর কৃষ্ণেণ চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্ত মার্য্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥

৫ম। যোগসারসংগ্রহ বা জ্ঞান প্রদীপ। ইহা যোগের প্রক্রিয়াঙ্ক পরিপূর্ণ।

পঞ্চম অবধি দ্বিতীয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রন্থেই তত্তৎ পর্ব্ব পূর্ব্ব আভাস রহিয়াছে; কিন্তু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য ও যোগ বার্ত্তিক এই দুই গ্রন্থে পরস্পর উভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব এতদুভয়ের গ্রন্থকার হয়ত একই সময়ে উভয় গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন নয়ত বা ইনি (বিজ্ঞান ভিক্ষু) কিংবা অপর কেহ এতদুভয়ের একখানা পুস্তক অপর পুস্তকের সাহায্যে রচনা করিয়াছেন। যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিক্ষুকে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হয়। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক অথবা তাঁহার জাতিগত উপাধি কি ইহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে যে বিজ্ঞানভিক্ষু নামের সঙ্গে "ভিক্ষু" শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপাসক বিশেষের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা মাত্র। তাঁহার বহু বহু শিষ্যের মধ্যে দার্শনিক জগতে আমরা শুধু তিন জনের নাম দেখিতে পাই। (১) ভাবগণেশ দীক্ষিত (২) প্রসাদ মাধব যোগী (৩) দিব্য সিংহ মিশ্র।

সাংখ্যদর্শন সম্পর্কীয় কতিপয় গ্রন্থ ও টীকা।

সাংখ্যদর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা আজ পর্য্যন্ত যতগুলির সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। সাংখ্যকারিকা। ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত।

২। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য। গৌড়পাদ কৃত। গৌড় পাদের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই; শঙ্করাচার্য্যের গুরুর নাম গোবিন্দ। গৌড়পাদ এই গোবিন্দের ও যিনি গুরু তাঁহার শিষ্য।

৩। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। বাচস্পতি মিশ্র কৃত। ইনি মার্ত্তণ্ডতিলক স্বামীর শিষ্য। এই সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী নিম্নলিখিত ছয়টী গ্রন্থে বিশদীকৃত হইয়াছে।

৪। তত্ত্ব কৌমুদী ব্যাখ্যা। বোধারণ্য যতির শিষ্য ভারতী যতিকৃত।

৫। তত্ত্বার্ণব বা তত্ত্বামৃতপ্রকাশিনী। শ্রীমদ্ রাঘবানন্দ সরস্বতী কৃত। ইনি বিশ্বেশ্বরের অন্তেবাসী শ্রীমদ্ অদ্বয়ানন্দের শিষ্য।

৬। তত্ত্ব চন্দ্র। নারায়ণতীর্থ কৃত। ইনি বাসুদেব তীর্থ ও রামগোবিন্দ তীর্থ উভয়েরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন।

৭। কৌমুদীপ্রভা। বাহিনীশ-তনয় স্বপ্নেশ্বরের রচিত।

৮। সাংখ্য তত্ত্ব বিলাস, সাংখ্যবৃত্তি প্রকাশ অথবা সাংখ্যার্থ সংখ্যায়িকা ইহা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত। ইঁহার পিতা শিবরাম চক্রবর্ত্তী; তস্য পিতা চন্দ্রবন্দ্য, তস্য পিতা কাশীনাথ, তস্য পিতা বলভদ্র, তস্য পিতা সর্ব্বানন্দ মিশ্র। এই গ্রন্থে সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর ব্যাখ্যা এবং তত্ত্ব সমাসের ব্যাখ্যা উভয়ই লিপিবদ্ধ আছে।

৯। সাংখ্যতত্ত্ববিভাকর। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশ।

১০। সাংখ্যচন্দ্রিকা। নারায়ণ তীর্থ প্রণীত। ইহা তত্ত্ব কৌমুদীর ব্যাখ্যা নহে।

১১। সাংখ্যকৌমুদী। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৃত। ইনি পূর্ব্বোক্ত নারায়ণতীর্থের গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

১২। তত্ত্ব সমাস। (অপর একটী মূল গ্রন্থ) কপিলকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার নিম্নলিখিত কতিপয় ভাষ্য, ব্যাখ্যা, বা বিবৃতি পাওয়া যায়।

১৩। সর্ব্বোপকারিণী। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশ।

১৪। সাংখ্যসূত্রবিবৃতিঃ। " "

১৫। সাংখ্যক্রম দীপিকা
১৬। সাংখ্যালঙ্কার
১৭। সাংখ্যসূত্র প্রক্ষেপিকা
} এই তিনটী গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচিত।

১৮। তত্ত্বযাথার্থ্যদীপন। ভাবগণেশ দীক্ষিত কৃত কৃত; পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভাবগণেশ, বিজ্ঞান

ভিক্ষুর শিষ্য। অথচ ভাবগণেশের পিতার নাম ভাব বিশ্বনাথ দীক্ষিত।

১৯। সাংখ্য তত্ত্ব। বস্তুতঃপক্ষে এই গ্রন্থের কোনরূপ আত্মাকরণ হয় নাই। ইহা ক্ষেমানন্দ দীক্ষিতের রচনা। এই ক্ষেমানন্দ রঘুনন্দ দীক্ষিতের নন্দন।

২০। সাংখ্যপ্রবচন বা ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্র। ইহা কপিলের রচিত বলিয়া প্রকাশ। ইহার একটী বৃত্তি ও একটী ভাষ্য বিদ্যমান।

২১। অনিরুদ্ধ কৃত "অনিরুদ্ধ-বৃত্তি। এবং

২২। বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত "সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য।"

২৩। সাংখ্যবৃত্তি সার। মহাদেব সরস্বতী কৃত। ইনি সাধারণতঃ বেদান্তী মহাদেব বলিয়া কথিত এবং স্বয়ং প্রকাশ তীর্থের শিষ্য। এই পুস্তকখানা অনিরুদ্ধ বৃত্তিরই সার বস্তু নিয়া সঙ্কলিত বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজস্ব কথাও অনেক আছে।

২৪। সাংখ্যদীপিকা। নাগোজী ভট্ট বা নাগেশ চট্টোপাধ্যায় কৃত। ইহা সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যের দীপিকা।

২৫। লঘু সাংখ্য বৃত্তি। নাগোজী ভট্ট।

২৬। সাংখ্য তরঙ্গ। বিশ্বেশ্বর দত্ত অথবা দেবতীর্থ স্বামী বিরচিত। ইনি সাধারণতঃ কাষ্ঠজিহ্ব আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। সাংখ্যপ্রবচনের অংশ বিশেষ নিয়া স্বকীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তত প্রচলিতও নহে প্রামাণ্যও নহে।

২৭। রাজ বার্ত্তিক। ইহা ধারা নগরীর অধিপতি ভোজরাজ কৃত বলিয়াই প্রকাশ। ইহা সাংখ্যবাদেরই সম্পূর্ণ বিবৃত্তি।

২৮। সাংখ্যসার। বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

২৯। সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ। কবিরাজ যতির কৃত। ইহার গুরু বৈকুণ্ঠ। এই পুস্তক পূর্ব্বোল্লিখিত সাংখ্য-সারেরই অনুরূপ, কিন্তু তত আদরনীয় নহে।

৩০। সাংখ্যার্থতত্ত্ব প্রদীপিকা। ভট্টকেশব প্রণীত। পিতার নাম সদানন্দ। সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপের অনুরূপ; পরন্তু প্রতিষ্ঠাপন্ন নহে।

৩১। সাংখ্যসার বিবেক প্রদীপ। শ্রীমদ্ রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা কৃত। ইহা বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত সাংখ্যসারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার বঙ্গদেশীয়।

৩২। পূর্ণিমা। শ্রীমৎ পঞ্চানন তর্করত্ন বিরচিত। ইহা বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর বিশদ ব্যাখ্যা। গ্রন্থকারের নিবাস বঙ্গদেশ।

এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় সাংখ্যদর্শনে টীকা ও ভাষ্য রহিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ আধুনিক অথচ পণ্ডিত মণ্ডলীতে প্রামাণ্য নহে। নীরস দর্শনের কথাগুলিকে রসপূর্ণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে পরিবেশন করিবার ক্ষমতা মাদৃশ রসবিহীন অরসিক জনে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। মদীয় পার্থিব শরীরে রস তন্মাত্রার ছিটা ফোটা কিয়ৎ পরিমাণেও আছে কিনা জানি না, থাকিলেও হয়ত তাহা কার্য্য-কারণের বহির্ভূত, কার্য্যও নহে কারণও নহে। অতএবই বোধহয় কারনীভূত তাদৃশ রসতন্মাত্রা হইতে কার্য্যভূত রস যক্কার সম্ভবপর নহে। সুধীগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অদ্য এই স্থানেই বিরত হইতেছি। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

——()——

সাগর বন্দনা।*

(১)

আজি এ মিলনক্ষেত্রে, সাগর-স্মৃতির পূজা,
হবে ওগো সুধী বন্ধুগণ!
ভুলিয়া সকল চিন্তা, ক্ষান্ত করি অন্য কথা,
শান্ত কর সবাকার মন!
আমার আশিস বোধে, আজি যারে পূজিবারে,
মিলিয়াছি আমরা সবাই;
সে ছিল পুরুষ-সিংহ, কর্ত্তব্যে অটল প্রাণ,
কর্ম্মে তার সমকক্ষ নাই।

* বিদ্যাসাগর স্মৃতি সভায় পঠিত।

বজ্রসম প্রাণখানি, পুষ্পসম হতে পারে,
সাক্ষী তার করুণা-সাগর ;
বাল-বিধবার শোকে, দরিদ্রের আঁখি-জলে,
জানিত সে গলিতে পাথর।
সোনার ঝিনুকে কভু, দুগ্ধ সে খায়নি—তাই,
কাঙালের বুঝিত বেদন ;
আজি এ স্মৃতির তীর্থে, প্রথম মিলন দিনে,
এস ভাই করিগো তর্পণ।

(২)

জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে, কোল দিত কে সবারে,
কার এত ছিল আত্মবোধ ?
কে ভাঙিল চিত্ত-বলে, জ্ঞান-পথে ছিল যত,
উচ্চ নীচ সমাজ-বিরোধ ?
বেথুনেরে সঙ্গী করে', চলিতে যুগের সঙ্গে,
কে খুলিল নারী-শিক্ষালয় ?
শোনিত-সিঞ্চনে কার, অনাদৃতা মাতৃভাষা,
ফলে ফুলে মুঞ্জরিত হয় ?
বঙ্গের দুরন্ত ছেলে, ভারতীর সে' দুলাল,
মহাকবি শ্রীমধুসূদন,
অনাহারে অভিমানে, বিদেশে কাহার স্নেহে,
লভেনিকো সমাধি-শয়ন ?
সাগর চিনিত রত্ন, তাইতো তাহার বুকে,
কত রত্ন পেয়েছিল ঠাঁই।
এ বিরাট বিশ্ব মাঝে, একটি সাগর ছিল,
আর তার দ্বিতীয়টি নাই।

(৩)

মনে ভেবে দেখো সেই, দামোদরে ঝাঁপ দেওয়া,
কি ভীষণ অবস্থা তখন !
কুম্ভীর-সঙ্কুল সেই, কল্লোলিত নদী-জলে,
সাঁতারিয়া ওপারে গমন !
সে আদর্শ মাতৃভক্তি, কে আর দেখেছে কবে,
সে যে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।
সাঁওতাল জাতির কথা, তাও তো ছিল না ভুলে,
সবখানে জ্ঞানের প্রচার।
বাছুরের প্রাপ্য দুধ, কেড়ে খেতে হয় দেখে,
কে করিল ভয়ানক পণ ;
পতিতার দুঃখে কার, বুক ফেটে কান্না আসে,
কে করিত মাতৃসম্বোধন।
খাঁটি তার চটি জুতা, সে জানেনি বিলাসিতা,
ও-সব যে ধুলা মাটি তুষ।
বাহিরে ভিতরে খাঁটি, আগাগোড়া সব খাঁটি,
খাঁটি ছিল মাটির মানুষ।

(৪)

মর্ম্মে বড় দাগা পেয়ে, বড় দুঃখে বলেছিল—
"মানুষ তো কেহ হেথা নাই।
এ দেশের মাটি খুঁড়ে, ভাল করে' দেখে শুনে,
মানুষের চাষ করা চাই।"
তার সেই মনুষ্যত্ব, মর্ম্মে মর্ম্মে ঠাঁই পেলে,
ভারতের বাড়িবে সম্মান ;
দেবতা-দুর্লভ তার, সে অতুল্য হৃদিখানি,
কার কেহ পাবে নাকি দান ?
কত বর্ষ চলে যায়, সেই স্থান শূন্য আজো,
কভু কি গো হবে না পূরণ ?
ধরিয়া নূতন দেহ, হে দাতা, আবার এস,
কাঙালের মুছাতে নয়ন।
ভাতের কাঙাল হতে, প্রাণের কাঙাল বেশী,
এর চেয়ে দুর্দ্দশা কোথায়।
হে দেবতা, এস এস, লক্ষ লক্ষ কাঙালীরা,
কেঁদে কেঁদে ডাকিছে তোমায়।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গৃহস্থ হিন্দুমহিলার শিক্ষার আবশ্যকতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যায় এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে অদ্যাপি তাঁহার বচনগুলি "খনার বচন" নামে প্রবাদবাক্যরূপে মান্য হইয়া আসিতেছে। আচার্য্য ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী সুপ্রসিদ্ধ পাটী-গণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লিখিয়া জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। সরস্বতীর বরপুত্র কবি কালিদাস কর্ণাট রাজমহিষীর সহিত শাস্ত্রীয়বাদে পরাভূত হইয়া চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় তাঁহার বিমল যশো-মণ্ডিত কাব্যজীবনে কলঙ্কের রেখা পাত করিয়া গিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্যের সহিত যখন মীমাংসক বাচস্পতি মণ্ডন মিশ্রের বিতণ্ডা হয়, তখন মিশ্রপত্নী উভয় ভারতী ঐ দুরূহ শাস্ত্রীয় বিবাদের মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। পরকায় প্রবিষ্ট যোগিবর শঙ্করের সহিত জনৈক বিধবা সম্রাট পত্নীর কামশাস্ত্র সম্পর্কে ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। মহাভারতে সুলভা নাম্নী আবাল্য ব্রহ্মচারিণী কামিনীর রাজর্ষি জনকের সহিত মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ কথোপকথন শ্রুত হওয়া যায়। অমর কবি ভবভূতির করুণ রসের উন্মুক্ত প্রস্রবণ উত্তরচরিত নাটকের তাপসী আত্রেয়ীর রামায়ণের ঋষি বাল্মীকির নিকট বেদান্ত পাঠের জন্য আগমনের কথাও শুনিতে পাই। এ সকল পুঁথিগত "সেকেলে" শিক্ষিত মহিলার কথা বাদ দিলেও, ঐতিহাসিক কালের গণনায় সে দিনও ইতিহাসবিশ্রুত মীরাবাই কবিরাজ জয়দেবের মত সুমিষ্ট কবিতাবলী রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিযশে যশস্বিনী হইয়াছেন। রংপুর জেলার অন্তর্গত ডিমলা রাজবংশের প্রাচীনা রাণী মীনাবতী শিশুপুত্র লইয়া বিধবা হওয়ায় তদীয় বিস্তৃত রাজ্য অসহায় হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা রাণী নিজ শিক্ষা ও প্রতিভার বলে জটিল রাজকার্য্য সমূহ অতি সুন্দরভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল কাশীধাম হইতে প্রকাশিত "মিত্রগোষ্ঠী" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় কবিরত্ন উপাধিভূষিতা জ্ঞানসুন্দরী নাম্নী একটী মাদ্রাজী বিদুষী সুললিত সংস্কৃত পদ্য লিখিয়া ঐ পত্রিকার গৌরব বর্দ্ধন করিতেন। অধুনা লোকান্তরিত উড়িষ্যা প্রদেশের অষ্টদুর্গাধিপতির লিখিত "রুক্মিনী পরিণয়ং" নামক সংস্কৃত কাব্যের "রাধাপ্রিয়া" নাম্নী টীকা তদীয় বিদুষী শ্রীমতী রাধাপ্রিয়া দেবীর সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করিতেছে। ইদানীং চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রম হইতে বহু বালিকা সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে আগ্রা নগরীতে যে সংস্কৃত সাহিত্যসম্মিলন সভায় অধিবেশন হইয়াছিল, উহাতে জনৈক বিচক্ষণ মহিলা "সংস্কৃত শিক্ষা কিরূপে ধনাগমের উপায় হইতে পারে" এই দুরূহ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া একটী সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার অবনতির যুগেও স্ত্রী-পুরুষ অভেদে জ্ঞানচর্চ্চার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে স্ত্রী জাতির এই বিজয় পুরস্কার লাভ ভারতীয় আর্য্যমহিলা সমাজের পাণ্ডিত্য প্রতিভার জলন্ত নিদর্শন। বঙ্গসাহিত্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সীতা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি অন্তঃপুর মহিলা গ্রন্থ রচয়িত্রীদিগের নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহা অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে, তাহা ভবিষ্যতেও থাকিবে এরূপ অনুমান একান্ত অসঙ্গত নহে। যে জাতির অতীত সমুজ্জ্বল, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় নহে; ইহা "বন্দে মাতরং" মন্ত্রের মহর্ষি বঙ্কিম চন্দ্রের মহতী ভবিষ্যদ্‌বাণী (prophecy)। সুতরাং বর্ত্তমান হিন্দু গৃহস্থ রমনীকুলের শিক্ষার পথ প্রসারের নিমিত্ত সমাজহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তির যত্নশীল হওয়া উচিত। ইঁহাদের শিক্ষার বিষয় সুকুমার সাহিত্য, গৃহশিল্প,

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, স্বদেশের ভূগোল, ইতিহাস, হিন্দু দর্শনের স্থূল স্থূল তত্ত্বনিচয়, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, গৃহপালিত গবাদি পশুপালন রীতি ও গৃহজাত কৃষিজ দ্রব্য শাক সব্‌জী প্রভৃতির উৎপাদন পদ্ধতি। স্ত্রীপাঠ্য সাহিত্য শ্রেণীতে কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ সকলের উপরে। ভারতে মহাভারত কর্ম্মনীতি ধর্ম্মনীতি, রণনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি সর্ব্ব বিষয়েই কল্পতরু। বর্ষীয়া রমনী সমাজে এই দুই মহা গ্রন্থের পঠন পাঠনা ও আলোচনা যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, সহৃদয় মানব মাত্রেরই তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া বিধেয়। বিজ্ঞপ্রবীন গ্রন্থকার ও শক্তিশালিনী গ্রন্থকর্ত্রীদের দ্বারা এই দুই মহাগ্রন্থ হইতে স্ত্রীপাঠ্য চরিতাখ্যানগুলি প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সঙ্কলিত করাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। আমরা আলস্য ও বিলাস বুদ্ধির বৃদ্ধির সহায় বর্ত্তমান কালের শত শত নবন্যাস ও উপন্যাসগুলি হিন্দু রমনীর সুপাঠ্য বলিয়া মনে করি না। স্বর্ণলতা, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বেণের মেয়ে, অনুপমা, অভাগী, বেহুলা, সীতা পর্য্যায়ের গ্রন্থ গুলি বর্জ্জন করিতেও উপদেশ দেই না। দ্বিতীয় গৃহশিল্পের কথা। শিল্পশিক্ষায় জ্ঞান, অর্থ ও আনন্দ যুগপৎ এ তিনেরই লাভ হইয়া থাকে। সম্পন্ন ঘরের গৃহস্থ রমনীগণের শ্রমসাধ্য শিল্প দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের তাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলেও শরীর কর্ম্মঠ ও সুস্থ এবং মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য শিল্প চর্চ্চার অভ্যাস বিশেষ দরকার। সূচীশিল্প, বস্ত্রশিল্প, মাল্যগ্রন্থনাদি পুষ্পশিল্প চিত্রশিল্প, ভূষণযোজনাদি শিল্প, রন্ধনশিল্প, গন্ধশিল্প, বেশবিন্যাস শিল্প প্রভৃতি গৃহস্থ হিন্দু রমনীর অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় রূপে গণ্য হওয়া উচিত। হিন্দু গৃহস্থ রমনীর স্নানীয় পানীয় জল, বিশুদ্ধ বায়ু, গৃহের ও পরিচ্ছদাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিমিত শ্রম, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পথ্যাপথ্য আদি স্বাস্থ্যরক্ষার স্থূল স্থূল নিয়ম গুলির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকার নিতান্ত দরকার। রমনীদের ব্যায়ামের কথা শুনিয়া কেহ যেন নাসিকা কুঞ্চিত না করেন। আমরা প্রাচীন মৎস্য পুরাণের গর্ভিনীকৃত্য প্রকরণে "ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ" এই প্রমাণাংশ দেখিতে পাই। অন্তঃসত্বাবস্থায় ব্যায়াম করিবে না, এই নিষেধ স্ত্রী জাতীর সময়ান্তরে ব্যায়াম বিধির পরিপোষক। যাহার বিধান থাকে তাহারই অবস্থাবিশেষে নিষেধ হইতে পারে। অবিহিত বিষয়ের নিষেধ করা আর "আকাশ কুসুমের আঘ্রাণ লইও না" বলা তুল্য কথা। তবে বলা ভাল যে, অন্তঃপুরসংলগ্ন বহির্বাটী, পুষ্পবাটিকা, অথবা প্রমোদ উদ্যানের একাংশে এরূপ ব্যায়াম প্রাঙ্গণ gymnasium রূপে রক্ষিত থাকিবে। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের সহিত উৎসবে, বিপদে ও অবস্থাভেদে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এ সকল সাধারণ সমাজতত্ব বিষয়েও হিন্দু রমনীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ মানুষ পূরাপূরি সামাজিক জীব। সে কখনও একা থাকিতে পারে না বা ভালবাসে না। দশ জনকে লইয়াই তাহার জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে হয়। সমাজের রীতি নীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকিলে সমাজ মধ্যে বাস করা কঠিন হইয়া উঠে। আমি ধনে, মানে, পদে, বিভবে খুব বড় হইয়া সমাজে যদি একঘরে হই আর আমার সুখের এক তিলার্দ্ধও যদি অপরকে অনুভব করিতে না দেই, তাহা হইলে আমার জীবন বিজন অরণ্যজাত গোলাপের ন্যায় নিতান্ত বিফলে যাইবে। এই বন্য গোলাপের অতুল সৌন্দর্য্যসৌরভ যেমন কেহই উপভোগ করিয়া সুখী হইতে পারে না; সে আপনার সুখে আপনি ফুটে, আবার আপনি শুকাইয়া যায়, অসামাজিক মানবও তেমনি আপনার সুখ দুঃখের ষোল আনা মালিক থাকিয়া আজীবন অনল দুঃখের দাবদাহে পুড়িয়া পুড়িয়া অবশেষে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। একটী তরঙ্গ হইতে তরঙ্গমালার উৎপত্তির ন্যায়, একটী সুখী জীবন দশটী পারিপার্শ্বিক

জীবনের সহানুভূতির মধুর সংস্পর্শে শত শত সুখী জীবনের অমিতসুখের আস্বাদ লাভ করে। এইরূপ গণিত শাস্ত্রে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান না থাকিলে গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। স্বামীর আয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যেস্ত্রী কেবল দুই হাতে ব্যয় করিয়া যায়, তাহার গৃহে কখনও কোনও দ্রব্যের প্রতুলতা হয় না। মাসের শেষে গৃহস্বামী বেতনের একশত টাকা গৃহিণীর হাতে অক্ষত রাখিলেন, কিন্তু গৃহীণী তৎপূর্ব্বে দেড়শত বা পৌনে দুই শত টাকা খরচ করিয়া বসিয়া আছেন। এরূপ অমিতব্যয়িতা-ঘটিত দারিদ্র্যদোষেই আজ বঙ্গীয় গৃহস্থ কুল অন্নহীন, শ্রীহীন ও জীবন্মৃত। গণিত শিক্ষা বঙ্গললনাকে এই সকল মারাত্মক দোষ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গেও ইঁহাদের কতকটা পরিচয় থাকার একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেহ ও মন বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবেই সর্ব্বদা অনুভাবিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কোন্ অংশে কখন কোন্ ভাবের তরঙ্গ উঠে, সেটী ঠিক বুঝিতে পারিলে আমরা তদনুগত হইয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে পারি। প্রকৃতির সঙ্গে বাস করিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইতে না পারিলে আমাদিগকে পদে পদে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেই সকল প্রবল বাধা নিরাকরণের জন্যই গৃহস্থ নারীগণের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করা কর্ত্তব্য। তারপর যে দেশে আমাদের বসতি, সে দেশের ভূসন্নিবেশ, জলভাগ, স্থলভাগ, পর্ব্বত, নদ, নদী, পথ, ঘাট, যাতায়াতের সুবিধা, অসুবিধা, বাণিজ্য ব্যবসায়, খনিজ দ্রব্য ও কৃষিজ শস্য সম্পদ প্রভৃতির যথাযথ পরিচয়ের জন্য নারীমাত্রেরই ভূগোল শিক্ষা অপরিহার্য্য। জাতির উৎপত্তি, স্থিতি, [illegible], উন্নতি, অবদান পরম্পরা, উত্থান পতনের ধারা, পুরাতন শাস্ত্র ও সমাজ, আচার ব্যবহার, যুদ্ধ বিগ্রহ, জয় পরাজয় সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হিন্দু ললনার ইতিহাস চর্চ্চা অবশ্য পাঠ্য বিষয় মধ্যে গণ্য হওয়া বিধেয়। বঙ্গ ভাষায় লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিও স্ত্রী পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত তীর্থযাত্রাদি কার্য্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিশেষ উপকারপ্রদ। ইহলোকে কর্ম্মপ্রাণ সভ্যজাতির নিকট মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপায় স্বরূপ ঐ সকল শিক্ষা ছাড়া, পারলৌকিক কল্যাণের জন্য গৃহস্থ হিন্দু নারীর যথোচিত প্রস্তুত হওয়া উচিত। তজ্জন্য জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার অভিপ্রায়ে সহজ বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যাত কিংবা বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনের সারমর্ম্ম গৃহস্থ হিন্দুনারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বৈচিত্র্যই সংসারের প্রকৃতি। অসংখ্য বিচিত্র ঘটনার ধারাবাহিক সম্মিলন লইয়াই এক একটি মানব জীবনের পূর্ণতা। সাংসারিক বিচিত্রতার জন্যই নরনারীকে প্রত্যহ বিভিন্ন কর্ম্ম কাণ্ড সম্পাদনের ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি সম্যক আয়ত্তীকরণের চেষ্টার নাম বিভিন্ন শিক্ষা। সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে হইলে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও যথাশক্তি পরিশ্রম করিতে হয়। সজীব প্রাণীর প্রাণপ্রবাহের ন্যায় পরিশ্রমই জাতীয় জীবনের মূল গ্রন্থি। যে জাতি যত পরিশ্রমী সে জাতি তত উন্নতিশীল, যে জাতিতে কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ও ছোট বড় প্রভেদ নাই, বর্ত্তমান সভ্য জগতে সেই জাতি তত দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে শ্রমকাতর জাতির দেহ, মন, উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, অবসন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে টেকচাঁদের "রামারঞ্জিকা" এই গুরুতর বিষয়ে বাঙ্গালী নারী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন; "কেবল আড়াগড়া দিয়া, পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলতা পরিয়া, চুল বাঁধিয়া, তাস খেলিয়া কাল কাটান শ্রেয় নহে। ইহাতে অলস স্বভাব হয়। আলস্যে নিজের কুমতি ও সন্তান আদির

কু-উপদেশ হইবার সম্ভাবনা।" স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম, পড়াশুনা ও শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ক্রমাগত একপ্রকার কর্ম্ম ভাল লাগে না। কিছুকাল বা গৃহকর্ম্ম করিলে, কিছুকাল বা পড়াশুনা করিলে, কিছুকাল বা শিল্পকর্ম্ম করিলে। * * * পল্লীগ্রামের ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা পুষ্করিণী হইতে কলসী করিয়া জল আনে, রন্ধন করে, ঢেঁকির ধান ভানে, চাউল করে, যাবতীয় গৃহকর্ম্ম করে এবং অবকাশ পাইলে কাপড়ের বুটা তুলে ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম করে, এইজন্য তাহাদের ঔষধের ব্যয় অধিক লাগে না এবং লজ্জা ও ধর্ম্ম বিলক্ষণ থাকে। সহরের বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমকে বাঘ দেখেন, সুতরাং ডাক্তার ও কবিরাজ ক্রমাগত লাগিয়া থাকে, আর ব্যর্থ কথা লইয়া কাল কাটাইতে হয়। আমরা গৃহস্থ হিন্দুরমণীর উপযোগী শিক্ষার বিষয়গুলির মোটামুটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। একণে কবিবর কালিদাসের মধুময় কাব্য মেঘদূত হইতে বিরহিণী যক্ষ পত্নীর দৈনিক কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়া তৎকালের স্ত্রী শিক্ষার একটু নিদর্শন দেখাইব। কাব্য ও সাহিত্য সমাজের সজীব আলেখ্য। সুতরাং কালিদাসের অঙ্কিতচিত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণবাহুল্য থাকিলেও উহার মূল আদর্শ বা Sketch টুকু যে বাস্তব তাহাতে বোধ হয় বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। বিরহমথিত যক্ষ মনোবেদনায় বিচেতন হইয়া কল্পিত বার্ত্তাবহ নবীন জলধরকে তাহার পত্নীর বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পূর্ব্বস্মৃতির সাহায্যে বুঝাইয়া বলিতেছেন। সখে জলধর! তুমি যখন আমার বাসস্থলী অলকা নগরীতে উপস্থিত হইবে, তখন দেখিবে, হয়ত, আমার প্রিয়তমা আমার কল্যাণকামনায় দেব আরাধনায় ব্যাপৃত আছেন; কিংবা কল্পনার সাহায্যে আমার বিরহশীর্ণ, কলেবরের একখানি সুন্দর ছবি আঁকিতেছেন, অথবা পিঞ্জরবাসিনী মঞ্জুভাষিণী সারিকাকে প্রিয় সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অয়ি সারিকে! আমার জীবনবল্লভ তোমাকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাঁহার সেই ভালবাসার কথা এখন তোমার মনে পড়ে কি? কিংবা দেখিবে মলিনবসনা প্রিয়তমা কোলে বীণা রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার নামাবলী গান করিতেছেন। প্রেয়সী বিরহের প্রথম দিন হইতে দিন গণনা করিবার জন্য প্রত্যহ একটি করিয়া ফুল দেহলীর (চৌকাঠ বা উপরের তক্তা, Threshold of a door) উপর রাখিতেন। হয় ত বা দেখিতে পাইবে তিনি সেই ফুলগুলি পাড়িয়া একটি একটি করিয়া গণিয়া দেখিতেছেন বর্ষব্যাপী বিরহের কতদিন গত হইয়াছে। দিনের বেলায় প্রেয়সী নানা গৃহকর্ম্মে রত থাকেন বলিয়া তখন তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় না। (উত্তর মেঘদূতের, ২২।২৩।২৪।২৫ সংখ্যক শ্লোকের ভাবানুবাদ।) কবি কালিদাস নিতান্ত আর্বাচীন কালের লোক কিংবা তাঁহার কথাগুলি একেবারে উপেক্ষা বুদ্ধির গ্রাহ্য নহে। তিনি আনুমানিক অন্ততঃ দেড়হাজার বৎসরের পূর্ব্বে শিক্ষিতা (Accomplished) ভারত রমণীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে তৎকালের রমণীগণ স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিতেন, দৈনিক দেবার্চ্চনা করিতেন। চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পটু ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় অভ্যস্ত ও বীণাবাদনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গৃহপালিত পক্ষী শুক ও সারিকাদিগকে মানুষের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে শিখাইতেন। কলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যার স্থান অতি উচ্চ। কি অবকাশ কাল বিনোদনে, কি ব্যথিত প্রাণে শান্তিধারাবর্ষণে, কি ভগবৎভজনে সর্ব্বত্রই সঙ্গীতের অবাধ আধিপত্য। আমরা বৈদিক সাহিত্যের সামগান হইতে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য, নাটক, কথা, উপাখ্যান সর্ব্বত্র বীণাযন্ত্রের সাদর ব্যবহার ও সঙ্গীতের সমধিক চর্চ্চা দেখিতে পাই। নাটক মাত্রেরই প্রস্তাবনায় নট নটীর আলাপে প্রাচীন রমণীদের সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় অভিজ্ঞতার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ বিদ্যমান। বিখ্যাত প্রাচীন মুদ্রারাক্ষস নাটক

নাটকের লেখক বলিয়া মহারাজ বিশাখদত্তের কবিত্ব—খ্যাতি লোকবিশ্রুত। তিনি নটের মুখে নটীর সম্বোধন-চ্ছলে স্ত্রী জাতীর প্রতি কিরূপ সম্মান সম্বলিত প্রীতিভাব পোষণ করিতেন দেখুন।—

"গুণবতি উপায় নিলয়ে সাধিকে ত্রিবর্গস্থ।
মদ্ভবন নীতিবিষ্ঠে কার্য্যাদার্য্যে দ্রুতমুপৈহি॥"

কবি মহারাজের অবলা জাতির প্রতি প্রযুক্ত সম্বোধন পদ "আর্য্যে" হইতে তৎকালে নারীর প্রতি পুরুষের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তৎপর তিনি গুণশালিনী গৃহকর্ম নির্ব্বাহে প্রধান সহায়, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের অদ্বিতীয় উপায়, গৃহস্থের গৃহে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বিশেষণে নারী জাতির অনন্য সুলভ গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়াছেন। উহা শিক্ষিত নারী সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যত্র সুদুর্লভ।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

কবিবর গোবিন্দদাসের কাব্যে স্বদেশ প্রেম।

অমর কবি মধুসূদনের "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে" হইতেই বঙ্গদেশের কাব্যে স্বদেশ প্রেমের সৃষ্টি। মধুর মেঘনাথবধে স্বদেশ প্রীতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" ইত্যাদি কবিতা সেই সময়ের কাব্যে স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক। তারপর আমাদের সমালোচক মহোদয়গণ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্বদেশি-কতার উল্লেখ করিয়াছেন। "কাব্যে স্বদেশপ্রীতি আলোচনা করিতে হইলেই সমালোচকগণ হেম নবীন রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কথা উল্লেখ করেন। জানি না কোন্ ভাগ্যদোষে আমাদের 'ভাওয়ালের কবি' আজন্ম দুঃখের কোলে প্রতিপালিত স্বদেশপ্রাণ গোবিন্দ-চন্দ্র দাসের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষাদৃষ্টি? বড় রকমের অবস্থা কিম্বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইলে হয়ত গোবিন্দ-চন্দ্রের নাম এ সকল তালিকায় উচ্চস্থানেই শোভা পাইত। ভাওয়ালের জঙ্গলে জাত, ময়মনসিংহের 'আবুহাওয়ায়' পরিপোষিত এই 'শোভা সৌরভ আগার' কুসুমটী কত রাজরাজেশ্বর মাথার মুকুটে তুলিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতে পারিতেন। কিন্তু হায়, গোবিন্দ দাসের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নির্জ্জন কারাবাসে চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাই তাঁহার কর্ম্মফল।

আমরা যখনই গোবিন্দ দাসের কবিতা পাঠ করি, তখনই তাঁহার অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম দর্শনে পুলকিত হই। দেশের জন্য তাঁহার মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে অধীর হইয়া উঠি, তাঁহার অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়া, দেশ-মাতৃকার চিত্র স্মরণে পবিত্র হই! গোবিন্দদাস প্রতি-ক্ষণে, প্রতিকার্য্যে দেশের মঙ্গল চাহিয়াছেন! কি সে ভাব! কি সে জ্বালাময়ী ভাষা! দেশের কথা কহিতে কহিতে কবি আপনার হৃদপিণ্ড যেন নখাঘাতে ছিন্ন করিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছেন! সে করুণ বিলাপে পাষাণ গলিয়া জাহ্নবী যমুনা প্রবাহিত হয়! কি সে গভীর আর্ত্তনাদ! কুতূহলী পাঠক মনোযোগপূর্ব্বক গোবিন্দ দাসের কবিতা পাঠ করুন; আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে কবির স্বদেশপ্রেমের কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

১২৮৬ সালে কবি যখন প্রথম "পরশুরামের শোণিত তর্পণ" কবিতা প্রকাশ করেন, তখনই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন,

"যে কোন জাতির পরাধীনতার
হৃদয় অনন্ত প্রেত অত্যাচার,
হইলে দর্শন মহাতীর্থ তার
সমস্ত পঙ্কক হ্রদ,

সপ্তম স্বর্গের উপরি সংস্থিত
গন্ধর্ব্ব চারণ সুর নিষেবিত,
সেই পুণ্যস্থান লভিবে নিশ্চিত
স্বাধীনতা মুক্তি পদ।"

প্রেম ও ফুল।

কবি গোবিন্দচন্দ্র পূর্ণশশধর দর্শন করিয়া... ... ...
বসন্ত পূর্ণিমার দিনে তিরস্কার করিতেছেন—

"দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখ না কি বসুন্ধরা
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর।
... ...
দুয়ারে দরিদ্র মার ক্ষুধা কাতর।
আহা হা ভারত ভূমি, কি ক'রে দেখিয়া তুমি,
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর?
যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরা ভরা
বহিছে কনকরেণু পর্ব্বত নির্ঝর!
যে দেশে তোমার মত, ওঠে শশী শত শত
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর!
যে দেশে শ্মশান ভস্মে, সুন্দর সবুজ শস্যে
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর!
সেই দেশে হায় হায়, সন্তানে চিবায়ে খায়,
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর!

পড়িলে কি হৃদয় মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটিয়া আসে না?

"অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখনো কি হে,
এক বিন্দু অশ্রুজল কর নি প্রদান?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখ নি সজল নেত্রে
আপনার বংশ ধ্বংস—সন্তান শ্মশান!
যে দেশের বীর নারী বর্ম্ম চর্ম্ম অসি ধরি
রণরঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে সেই দেশে শোভা করে
তাল পত্র তরবারী!... ... ...
শৃগাল শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান।

তার পর কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"যে সুধায় ওহে সোম, বাঁচিল গিরীশ রোম
সেই সুধা আছে না কি ওহে শশধর?

কিন্তু তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। যদি—

"তোমার কৌমুদী হাসি, সঞ্জীবনী সুধা রাশি,
স্পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন,
প্রাণ ভরা যে দুর্ভোগ, অধীনতা মহারোগ
তব ও কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন?

তা'হলে কি আর?—

"সোনার ভারত এত হ'ত ছারখার?
নিত্য হাস এত হাসি, ছড়াও কৌমুদী রাশি
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কান্তার!
কোথা সে কোমল দেশ, ইন্দ্র প্রস্থ ভস্ম শেষ,
জাগিল না এ জনমে জাঠ মারবার!
এই যে ভারত ভরা, শশধর এত মরা,
এত চিতা ভস্ম রাশি এত পোড়া হাড়,
কে বাঁচিল?—জাগিল কি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার?
মৃত কি বাঁচিল কেহ অমৃতে তোমার?

দেশ প্রাণ কবি তখন আশার বাণী শুনাইয়াছেন,—

"যাও তুমি—
ভারত আকাশে এসে উঠিও না আর,
মিলি সব ভাই ভাই, সিন্ধু বঙ্গ এক ঠাঁই
উত্তোলিব নব শশী মথি পারাবার!
যে সুধায় বাঁচে মরা, সে বিধু সে সুধা ভরা,
সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হাসিবে আবার।

এমন কবিতার জোড়া মিলাইতে বঙ্গসাহিত্য সমর্থ হইবেন কি? "উত্তোলিব নবশশী মথি পারাবার" কি আশার কথা! কি সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। আমরা যখন কবির "চন্দন" লইয়া বসি;—প্রথমেই তাঁহার চির সৌন্দর্য্যের আধার "ভাওয়াল" কবিতা পাঠ করিয়া তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি।

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ" কি মধুর প্রীতি নিদর্শন! কথাটীতে প্রাণের কতখানি আবেগ?

জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
সে আমার যাগ যজ্ঞ সে আমার ধ্যান!
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোনিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান।

পড়িলে কি কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের—
"দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ" মনে পড়ে না?

"তার সে পিকের ডাকে, জোছনা জমিয়া থাকে
যামিনী মূরছা যায় শ্যামা ধরে তান।"
তার সে মলয় বায়, হরিনী চমকি চায়,
অচলে উছলে পড়ে গলিয়া পাষাণ!
তাহারি মধুর শ্বাসে সুধা সোমরসে বাসে
দেবতা ছাড়িয়ে আসে নন্দন উদ্যান!
... ...
ছয় ঋতু মালাকার চরণে চাকর তার,
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে
যদি তার দুঃখনিশি হয় অবসান
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পূরি
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান॥
... ...
তাহার মঙ্গল হিতে যদি আসে বাধা দিতে
লইয়া ভীষণ অস্ত্র বাসব ঈশান,
গদাঘাতে পদাঘাতে, দেই তারে অধঃপাতে
চরণ ধূলির সম নাহি করি জ্ঞান॥
... ...
... করেছি পণ এই রক্ত এ জীবন
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ
... ...
একদিন অবশ্যই করিবে উত্থান!
একদিন ভবিষ্যতে,
স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী,—
শস্যের কনকহাস্যে চির শোভমান,
পরিয়া স্বর্গীয় বেশ, উজলিবে দিক্ দেশ
আমার মায়ের পূজা হবে সমাধান।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ
"চন্দন"।

এই স্বদেশপ্রীতির কবিতাটী পাঠ করিলে হৃদয় জুড়িয়া একটা ছাপ উঠে না? এমন মধুর স্বদেশপ্রীতিতে হৃদয় পবিত্র হয় না কি? "বাসন্তি পূজায়" কবি দেখিয়াছেন—

"দৈত্য দাসত্বের পদক উজ্জল দেবের গলে,"

তাই কহিতেছেন,—

ভারত!
ভাই ভাই তুমি মিলিয়ে তেমন,
পার না কি কভু করিলে যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন পার না তুমি?
পার না কি তুমি আর্য্য কুলাঙ্গার,
নিবারিতে হায় দৈত্য অত্যাচার,
পার না কি তুমি করিতে উদ্ধার ত্রিদিব ভূমি?

ইহাই কবি গোবিন্দ দাসের বাসন্তী পূজার মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রের উপাসক হেম নবীন আজ পূর্ব্ব পশ্চিমবঙ্গে পূজিত—আর গোবিন্দ দাস—? যাক্।

কবি গোবিন্দ দাস মহা মিলনের কবি। তাঁহার—কবিতায় হিন্দু মোসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ানের ভেদ নাই। যখন ভাই ডাকিয়াছেন—প্রাণের ভিতর হইতেই তাহার সাড়া উঠিয়াছে,—যখন গালি দিয়াছেন—একই নিক্তিতে একই ওজনে একই ভাষায় বলিয়াছেন।

এস এই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহা পাপে, জননীর অভিশাপে
নয়নের জলধারা ঘোচেনা কাহার।
শুধু এই ভ্রাতৃ ভেদে, দুখিনি জননী খেদে
জীবনে পড়িয়া আছে মৃতের আকার।
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য
বীর জাতি বীর ভূমি রাজপুতনার—

শুধু এ পাপের জন্য দুর্দ্দশা সবার।"

"চন্দন।"

কবি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছেন,—

এক হস্তে মুছিবে না এত অশ্রু জল
এক হস্তে ছিঁড়িবে না এ পাপ শৃঙ্খল।

কবি ১২৯২ সালে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—আজ দেশনেতৃবর্গ সেই কথাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কবি গোবিন্দ দাস যখন কুচক্রীর পরামর্শে স্থানীয় রাজশক্তির পীড়নে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন,—তখনও তিনি তাঁহার ভাওয়ালের জন্য কাঁদিয়া দেশবাসীর নিকট নিবেদন জানাইতেছেন—। সে নিবেদন কাহার হৃদয়ে না শোক ধারা প্রবাহিত করে? তিনি বিচার প্রার্থী হইয়া বলিয়াছেন,—

"আমি যদি হই দোষী, যাহা ইচ্ছা যাহা খুসী
যে শাস্তি করিবে ভাই, সহিব নীরবে।"

তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

করিনি ডাকাতি চুরি, মারিনি ত বুকে ছুরি
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই
শুধু তার হিতকামী, তারে ভালবাসি আমি,
বুকের শোণিত দিয়া তার শুভ চাই!
কেন সে মায়ের বুকে মরিতে দিবে না সুখে
ছুঁইতে দিবে না মোরে ধূলা মাটী তার?

কবি দেশের মাটীর তুলনা দিয়াছেন—

শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার।
শত গঙ্গা হতে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণি কর্ণিকার।

"চন্দন"

কবি এ হেন জন্মভূমি চ্যুত হইয়া কি যাতনা ভোগ করিয়াছেন।

"এ নহে সামান্য শাস্তি
ফাঁসীর পরেই এই চির নির্ব্বাসন।"

কবি গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়ালবাসী হওয়ার জন্য আট কোটী বঙ্গবাসীর দুয়ারেই নালিশ রুজু করিয়াছিলেন। তাঁহার পণ

"মুছাইব অশ্রুজল অভাগিনী মা'র।

এই উপলক্ষে কবি তাঁহার স্বদেশবাসী "বাঙ্গালীকে" বড় রুক্ষ ও কঠোর সত্য ভাষায় গালি দিয়াছেন।

না আছে মানব ধর্ম্ম, না করে মানব কর্ম্ম—
... ...
নাহি ধর্ম্ম এক বিন্দু অতি নীচাশয়।
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী, অনুগ্রহ অভিলাষী
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়।
এমন সাহস হীন, ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
... ...
মোদের শিক্ষাভিমানী, নব্য বাবু সভ্যজ্ঞানী
থাক্ তার পর দুঃখে গলিবে হৃদয়;
রেলে কি জাহাজে গেলে, কেহ তারে ঠেলে ফেলে
নিলে তার মা বোনেরে চুপ ক'রে রয়!
জুতা,লাথি,ঝাঁটা খেতে এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?—

"চন্দন"।

দেশের এই যে দুরবস্থা, ইহা কবির কলমে কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি দেশের কথা কহিতে গিয়া কাহারো মুখাপেক্ষায় রহেন নাই। কোন খাতির নাই, নির্জ্জলা সত্য কথা গুলি ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "কালীয় দমন" কবিতাটীও দেশের অবস্থার এক প্রাণস্পর্শী চিত্র।

"কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন?
তোমার স্বভাব শোভা,
জগতের মনোলোভা,
কেন সে মলিন আজ শ্যামল কানন?

এত কি গভীর শোকে সবে নিমগণ ?
কুসুম ফোটেনা ডরে
আতঙ্কে ঝরিয়া পড়ে
মরিয়া রয়েছে যেন মলয় পবন !
আনন্দ উল্লাসহীন
... ...
ঘরে ঘরে শুনি কেন কেবলি ক্রন্দন ?
বলিতে যে প্রাণ ফাটে,
জননী যাইতে ঘাটে,
দুষ্ট ইন্দ্র ঐরাবতে করে আগমন !
বিদেশীরা নানা স্থলে
ভীরু কাপুরুষ বলে !

কবি এই দুঃখ কাহিনী বলিতে বলিতে আলোকের সন্ধান পাইয়া সকলকে ডাকিতেছেন,—

অই যে উদয়াচলে উঠেছে তপন !
দিগন্ত আলোকে ভাসে
মহোৎসাহে মহোল্লাসে
কি মহত্ত্ব কি দেবত্ব কি নব জীবন,
জড়তা ঠেলিয়া পায়
সকলেই আগে যায়
উদ্দাম উদ্যমে যেন পূর্ণ প্রতিজন !
এস হই অগ্রসর
আমরাও পরস্পর
করিয়া নীচতা স্বার্থ চরণে মর্দ্দন।

কবি আমাদের তথা কথিত নেতৃবৃন্দের মত "তোমরা কর' বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন—

"এস আমি যাই আগে,
প্রাণ রক্ত যদি লাগে,
আমিই তা কণ্ঠ হ'তে করিব অর্পণ,
তোমরা আমার শবে
দাঁড়া'য়ে উঠিও তবে
স্বর্গের আরেক্ সিঁড়ি উপরে তখন।

আর কোন কবি এতখানি করিয়াছেন কি ? তার পর কবি বলিতেছেন,—

কেন গো মা ব্রজভূমি
মলিন ব্যথিত তুমি
থাকিতে তোমার আমি নন্দের নন্দন ?
গৃহদাহ নারীচুরি
নির্ব্বাসন বুকে ছুরি
ঘুচাইব অসুরের যত উৎপীড়ন !
আমার জীবন-আয়ু,
তোমারি মা জল বায়ু,
... ...
তোমারি মা শস্য ফল
আমার বাহুর বল,
হৃদয়ে শোনিত রূপে করে সঞ্চরণ !
এ দেহ নিশ্চিত খাঁটী
তোমারি মা ধূলা মাটী
... ...
পুণ্যদা যশোদা তুমি
মা আমার জন্মভূমি
আবার তোমার যশে ভরিবে ভুবন।
ছার ইন্দ্র দেবরাজে
কি ভয় তাহার বাজে
ধরিব গোবিন্দ আমি গিরি গোবর্দ্ধন।

কবি তখন সদর্পে বলিতে পারিয়াছেন—

"আবার হাসিবে তুমি,
হে আমার জন্মভূমি,
সোণা মুখে করিবে মা সুধা বরষণ।"
"চন্দন"।

এই দেশপ্রাণ কবি সত্য সত্যই দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে বুকের রক্ত দিয়া দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এমন দেশ প্রাণ, এমন মহান হৃদয় বঙ্গ কবির আসন

নির্ণয় করিবার আগে আমরা আমাদের সমালোচক বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিব,—এতদিন তাঁহারা এই কবিকে শুধু 'স্বভাব কবি' বলিয়াই নীরব ছিলেন কেন? কবি গোবিন্দ দাসে যে ভাষা, ভাব ও দেশহিতৈষনা দেখিতে পাই—কাহার কবিতা এর চেয়ে সমধিক ভাব-ব্যঞ্জক? হায় পূর্ব্ব বঙ্গবাসী দরিদ্র কবি! তুমি যদি লক্ষপতির সন্তান হইতে?—আর হতভাগ্য পূর্ব্ববঙ্গ যদি তোমার উচিত মর্য্যাদা করিত,—তবে তুমি অনাহারে মরিতে না!

কবি তাঁহার "ধর্ম্মান্দোলন" কবিতায় বলিতেছেন,—

"মরা কি বাঁচিল ফিরা, নাচিল ধমনী শিরা—
বহিল জোয়ারে রক্ত সংযত শীতল?
... ...
বুঝিল কি সুপ্ত সিংহ শক্তি আপনার!
ইজার চাপকানে হয়, মোক্ষ নাহি পাওয়া যায়,
শুধু বিড়ম্বনা ভোগ কোট পেণ্টুলান,
সেই যজ্ঞ সেই যাগ, তপস্যায় অনুরাগ—
সেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন............
অন্ধ খঞ্জ দীন জনে, করুণা কাঙ্গালগণে
ক্ষুধিতেরে অন্ন দান নিত্য সদা ব্রত!
কর তবে জয়ধ্বনি মিলে আর্য্যদল,
উড়ুক হিমাদ্রি শিরে দেখাইয়া পৃথিবীরে
আর্য্যের ধর্ম্মের কেতু "কাঞ্চন" "ধবল"।
"চন্দন"

বঙ্গের হিন্দু কবি ধর্ম্মের উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—একদিন সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ধর্ম্মহীন উন্নতি অতি অকিঞ্চিৎকর,—তাহার ভিত্তি নিতান্তই শিথিল। দেশপ্রাণ কবি দেশবাসীকে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারত আগমন সময়ে কবিবর হেমচন্দ্রের দুঃখিনী ভারত জননী কুমারের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। আর বঙ্গেশ্বর সার চার্লস্ ইলিয়টের নিকট কবিবর গোবিন্দ দাস প্রার্থনা জানাইতেছেন।

"ভারতের রাজভক্তি— যা আছে সম্বল
দিতেছি তোমারে তাই—
এ রত্ন কোথাও নাই
কোটী কোহিনুর চেয়ে অতি সমুজ্জ্বল।"

খাঁটী সত্য—প্রাণের ভিতরের কথা! তারপর কবি 'প্রজার প্রাণের ব্যথা' নিবেদন করিয়াছেন। প্রজার অকাল মরণ, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দেশে শনির দৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, বিসূচিকা, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। আর স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন,—

"বৃথাই তোমার প্রভু, স্বাস্থ্য কমিশন।"

বঙ্গের দরিদ্র কৃষক একখানি ক্ষুদ্র লাঙ্গলে কৃষিকার্য্য করিয়া ভারতের কোটী কোটী নরনারীর 'শূন্যোদর' পূর্ণ করে। কিন্তু

"হায় সে মুখের গ্রাস
রপ্তানিটা বার মাস
কি দিয়ে ভরিবে বল হেন দামোদর।"

আজ ৩০ বৎসর পরে আমরা এই রপ্তানীতে যে আমাদের মরণ, তাহা বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিতেছি। কবি দেশে কিসে বেশী শস্য জন্মে—অনভিজ্ঞ কৃষক তাহা জানে না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন; কারণ তাহারা "চাষা নিরক্ষর।" আজ যে শিক্ষা প্রণালী নিন্দিত,—কবি গোবিন্দদাস ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন,—

"শোন প্রভু আরো দুঃখ করি নিবেদন,
নাহি দেশে শিল্প শিক্ষা
কেবল দাসত্ব ভিক্ষা।
ভারতে দাসের জাতি হইল গঠন।
কৃষি নাই শিল্প নাই
উদরে কি দিবে ছাই?
সাধে কি দরিদ্র দেশ কাঙ্গাল কাতর?

মনে সাধ হয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের

"সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

এক সঙ্গে গাঁথিয়া রাখি। কবি বঙ্গেশ্বরের নিকট বলিয়াছেন—এদেশে সংস্কৃত ভাষার পুনঃ চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজন।

১২৯০ সালে রোগশয্যায় থাকিয়া কবি গোবিন্দদাস দেশ মাতৃকাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা!
এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—
এই কাঙ্গালিণী বেশে,
এত কষ্ট এত ক্লেশে—
এই বিমলিন মুখ এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হল, জননী আমার।
অন্নপূর্ণা উপবাসী
আত্মগৃহে পরদাসী
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর মর্ম্ম বেদনায়।
শত পুত্রে অভাগিণী
শত রাজ্যে ভিখারিণী

কবি মাতৃভূমির দুর্দ্দশা চিন্তা করিতে করিতে অশান্ত হইয়া উঠিতেছেন—

নাহি শান্তি জননি রে এ মৃত্যু শয্যায়
সুখ তুমি, শান্তি তুমি, স্বর্গ তুমি জন্ম ভূমি,
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদয়।"

আজ দ্বিজেন্দ্রলালের "দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার, আমার দেশ" গানের কত গৌরব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ময়নামতির গান (আলোচনা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার এম, এ পরীক্ষায় "ময়নামতির গান" নামধের একখানা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত ছিল। এই পুস্তক স্বর্গীয় কবি ভবানীদাস কর্ত্তৃক বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পুস্তকের প্রকাশ কালে সম্পাদকদ্বয় যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন. ইহা ভূমিকাসহ পুস্তকখানা আদ্যন্ত পাঠ করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়; কিন্তু বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও যে সকল স্থানে সম্পাদকদ্বয়ের অমনোযোগ, অনবধানতা ও অক্ষমতা আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা সমীচীন বোধ হইতেছে। এই নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অবতারণা। সুধী পাঠকগণ এবং সম্পাদকদ্বয় নিম্ন প্রদত্ত বিবরণ সমূহের যাথার্থ্য অবধারণ করিবেন।

কবি ভবানীদাসের পরিচয়প্রসঙ্গে ভূমিকাতে যে সমস্ত অনুমানের অবতারণা করা হইয়াছে, নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ ভিন্ন সকলগুলিই খাটি সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ময়নামতির গান ভিন্ন কবির আরও দুই-খানি প্রাচীন পুথির পরিচয় পাওয়া যায়—"রামের স্বর্গা-রোহণ" ও "লক্ষ্মণের দিগ্বিজয়।" এই দুই পুস্তকের ভাষা, ভাব ও ইতিবৃত্ত প্রভৃতির সহিত ময়নামতির গানের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা, পরন্ত পুস্তকত্রয়ের স্থানবিশেষে বর্ণিত ক্ষুদ্র বিবরণ দ্বারা কবির বংশ, বাসস্থান, জন্মকাল বা স্থিতিকাল প্রভৃতির কি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহার কোনও পরিচয় ভূমিকাতে নাই। কাব্য না জানিলে যেরূপ কবিকে জানা যায় না, তেমনি কবিকে না জানিতে পারিলে তৎ-প্রনীত কাব্য পাঠও বৃথা।

কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে এবং যষ্ঠীবরকে কুমিল্লা অঞ্চলের লোক বলিয়া স্বীকার

করা চলে না। কুমিল্লাবাসিগণ যে কবিকে বিনাপ্রমাণে কুমিল্লার লোক বলিয়া আসন দিতে চাহিবেন, ঢাকাবাসিগণও সেই কবিকে (বিনাপ্রমাণে) ঢাকাবাসী বলিয়া সম্মান দেখাইবেন না কেন? যে-হেতু উভয় স্থানেই কবিবরের পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণের অভাব। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে "ষষ্ঠীবরের বাসস্থান 'দিনার দ্বীপ' ছিল বলিয়া উল্লেখিত আছে।" এই দিনার দ্বীপ নাকি কুমিল্লা জেলায়। অপর কেহ হয়ত দেখাইতে চেষ্টা করিবেন, এই দিনারদ্বীপ ঢাকা জেলার অন্তর্গত দিনারদ্বী বা জিনার্দ্দী; যাহার উপর দিয়া অধুনা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। অথচ এই দিনার্দ্দী বা জিনার্দ্দী গ্রামের আশে পাশে আজিও কবি ষষ্ঠীবরের নাম স্থানে স্থানে শ্রুত হওয়া যায়।

ষষ্ঠীবর অশ্বমেধ পর্ব্ব (অনুগীতা) ও মহাভারতের অন্যান্য কতিপয় পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল এবং ইনি প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। মহাভারত ব্যতীত পদ্মপুরাণ এবং রামায়ণেরও কোন কোন প্রস্তাব ইনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে প্রকাশ, তিনি জগদানন্দ নামক কোনও ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া "ভারত কথা" লিখিয়াছিলেন।

"অমৃত লহরী ছন্দ পুণ্য ভারতের বন্দ
কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুত জগদানন্দে অহর্নিসি হরি বন্দে,
কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

ভূমিকাতে লিখিত হইয়াছে পুস্তকের অন্তর্গত ভাষার নমুনা দেখিয়া কবিকে কুমিল্লার লোক মনে করা যাইতে পারে। আমরা ত অনুসন্ধান করিয়া তেমন কিছু ভাষা-বৈসাদৃশ্য পাইলাম না, যাহাদ্বারা তিনি ঢাকা হইতে কুমিল্লার সীমায় বিচ্যুত হইতে পারেন। পল্লীলেখায় এমন কি ভাষাইবা পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে প্রাদেশিকতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত থাকিবে। কয়েকটী শব্দমাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা ঢাকা ও কুমিল্লা দুই জেলাতেই একই প্রকার উচ্চারিত ও লিখিত হয়। যথা—উল্লা (আড়াই উল্লা, খণ্ডল্লা) বৃথা অর্থে অরেণ্যা, কুমারী অর্থে অকুমারী। ডাঙ্গর=বড়। পোলাপাইনে=শিশুগণ (২৩ পৃষ্ঠা) আজুকা=অদ্য (২০পৃষ্ঠা) লাগ পাইল (১৪ পৃঃ) লর দিয়া গেল ইত্যাদি।

তবে এমন তিন চারিটি শব্দ পুস্তকে আছে যাহা বর্ত্তমান সময় ঢাকা জেলায় ব্যবহৃত হয় না। ৩০০।৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইত কিনা সেই অনুসন্ধান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের পরিশ্রমের বাহিরে। রাজকীয় শাসনের সৌকর্য্যার্থ দেশবিশেষের ভৌগোলিক পরিমাণ যে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য, বিশেষতঃ ঐতিহাসিকগণের। দিনার্দ্দী বা জিনার্দ্দী গ্রামের অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ গ্রামের খানিক পূর্ব্বে মেঘনা নদী, যাহার পূর্ব্বপারে কুমিল্লা জেলা পশ্চিম পারেই ঢাকা জিলা। বিশেষতঃ দিনার্দ্দী গ্রামের কিয়দ্দূর উত্তর প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়াই পূর্ব্বে কুমিল্লা জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রায়পুরা, মেথিকান্দা, হাইরমারা, মণিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা এই তিন জেলায় বিমিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই সকল গ্রাম ঠিক ঐ তিনটী জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিলেই হয়। অতএব আবুজিয়া, সামাইল (প্রবেশ করিল) উন্দুর (ইন্দুর) করিবাম, যাইবাম প্রভৃতি শব্দ যে শুধু কুমিল্লা জিলারই বিশেষত্ব তেমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। আবুজিয়া, সামাইল করিবাম, যাইবাম, খাইবাম প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ময়মনসিংহ জেলাতেও চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ পুস্তকের একস্থানে হয়ত আছে করিবাম, যাইবাম, খাইবাম, অন্যত্র হয়ত করিমু যাইমু খাইমু প্রভৃতিও রহিয়াছে (২৬ পৃষ্ঠা) যাহা ঢাকা জেলাতেও উচ্চারিত হয়।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করুন। ভূমিকার অধিকাংশ লেখাই যখন অনুমানের উপর নির্ভর করে এই অবস্থায় পাঠকদিগকে হতবুদ্ধি করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া ভূমিকার কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিলেই যেন ভাল হইত! কথাটী বলিবার হেতু আছে। পুস্তকের আট পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে "তার বেটি বিবা কৈলুম মহিম জিনিয়া" পুথিতে উল্লিখিত গোপীচাঁদ বলিতেছেন যে তিনি "মহিম" জয় করিয়া অপর একটী রমণীর পানি গ্রহণ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে "মহিম" শব্দদ্বারা মহিম নামক কোনও স্থান বিশেষের অনুমান করিতেছেন। অপরে হয়ত বলিবে, মহিম শব্দ যুদ্ধের বাচক, অতএব "মহিম জিনিয়া" মানে যুদ্ধ জয় করিয়া। মাদ্রাসার মৌলানা, মক্তবের মৌলবী ও মসৃজিদের মোল্লা মহোদয়দের মতে "মহিম" মানে সমর কিনা মীমাংসার দরকার। এতদ্ভিন্ন সম্পাদক অপর স্থলে "খাণ্ডাএ জিনিয়া" পদদ্বারা উড়িষ্যার 'খণ্ডাইত' দিগকে জয় করিয়া এই অর্থ করিয়াছেন। কোনও একটী অশ্রুতপূর্ব্ব ও অভিনব শব্দের গন্ধ পাইলেই যে তদ্দ্বারা একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক স্থানের আবিষ্কার করিতেই হইবে তেমনধারা প্রত্নতাত্বিক সকলে নহে। যাহারা অনুসন্ধিৎসু তাহারা "খাণ্ডাএ" শব্দের অর্থ করিবেন খাণ্ডাএ = খাণ্ডায় = খাঁড়ায় = খড়্গো। অতএব খাণ্ডাএ জিনিয়া অর্থ = খড়্গা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া। খাণ্ডা শব্দের এতাদৃশ অর্থ যে অত্যধিক-পাণ্ডিত্য-বিমণ্ডিত ইহা যেন কেহও মনে না করেন। পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্বয়ং প্রকাশকগণই উদ্ধৃত করিয়াছেন "খাণ্ডাএ কাটা গেলে মএনামতি আঞি।" এই স্থলেও কিন্তু খাণ্ডাএ মানে খাঁড়ায়। পুস্তকের প্রকাশকগণ অবশ্যই এ সমস্ত পাদটীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন? তবে জিজ্ঞাসুগণ সন্দেহ করিতে পারেন পুরাতন পুথি কাননের সকল শিকারই পরের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া হইতেছে।

পুস্তকের ৯ম পৃষ্ঠায় প্রশ্ন।

"তুক্ষি সাত আক্ষি পাঁচ এমত কালের বিয়া।" অদুনার এই উক্তিতে গোপীনাথকে অদুনা পত্নী হইতে দুই বৎসরের বড় বুঝায়; কিন্তু পরবর্ত্তী স্থানে

"আটার বচ্ছর হৈল তুক্ষি অধিকারী।
এ বার বচ্ছর হৈল মোরা চারি নারী॥"

এই উক্তি কিপ্রকারে সঙ্গত হয়? গোপীচাঁদের আঠার বৎসর বয়সের কালে অদুনার ষোল বৎসর বয়স হইবে। আর যদি গোপীচাঁদের বাড়ীতে বার বৎসর স্থিতিকাল বুঝায় তবে অদুনার বয়স সেই সময় ৫ + ১২ = ১৭ বৎসর হয় বটে, কিন্তু আঠার বছর অধিকারী বলাতে গোপীচাঁদের বয়সও সেই সময় ৭ + ১৮ = ২৫ হইয়া পড়ে। অতএব আটার বৎসর বয়সে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণ ইহা অস্বীকার্য্য হয়। আমাদের চারি নারীরই এখন বার বৎসর এমন দুর্ব্যাখ্যা করিলে অদুনা ও পদুনাকে যমজ ভগিনী স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু বার বৎসর বয়সের রমণীদের বুদ্ধিতে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধ মন্ত্রণা অসম্ভব বলিয়াই ধারণা হয়।

পুস্তকের পাদটীকায় অনেক জানা শব্দেরও অর্থ দেওয়া হইয়াছে বটে, পক্ষান্তরে অনেক অজানা শব্দের এবং অজানা পদের ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত কিছুই করা হয় নাই। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় "শেত বান্দা এড়ি যামু হারিয়া ছোঁহর।" এবং ১১ পৃষ্ঠায়

"টান কচু পশরি তুক্ষি খুইয়াছ হেঁজা।
খিজিরের হাতে প্রভু সমার্পিলা গেজা॥"

এই সকল স্থলে অর্থের ইঙ্গিত বা আভাস কিছুই দেওয়া হয় নাই। ১২ পৃষ্ঠায়

"আর আছে আইধা মাটি তরপের দেশ।" এইপঙক্তিতে "তরপের দেশ" কথাটী দ্বারা নাকি রঙ্গপুর ধ্বনিত হইতেছে। উত্তমকর্ণ ব্যক্তিগণ কুমিল্লা জিলার

তরূপ গ্রামেই উহার ধ্বনি না শুনিলেও প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। ঐ সঙ্গে "চাটিগ্রাম পূর্ব্ব মাটির" পরিচয়ও বিশেষ জানা যাইতে পারে।

পুস্তকের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয়গণ প্রতিবচনাধীন (বা answerable) হইয়া পড়িয়াছেন। ৭ম পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

"মাএ কান্দে পুত্র পুত্র ভৈনে কাঁদে ভাই।" মূলপুস্তকের এই পঙ্‌ক্তিতে "পুত্র পুত্র" শব্দই আছে অথবা "পুত পুত" আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সংশয় বাড়িতেছে। প্রাচীন পুথি সংশোধন করিবার কালে যদি কেহ স্ব স্ব রুচিবশতঃ কোনও স্থলে "তোমরার" পরিবর্ত্তে "তোমাদের" মুদ্রিত করেন তবে প্রকৃত-সত্য-অনুসন্ধানে আকাশ জমিন তফাৎ থাকিতে হয়। তৎপর, উপাধি লিখিতে উপাধী, পুথি লিখিতে পুঁথি (ললিত বাবুর "চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয় ?") পুনরভিনীত স্থলে পুনরাভিনীত প্রভৃতি লিখিয়া প্রকাশকগণ অনবধান (careless) হইয়াছেন। ২য় পৃষ্ঠার পাদটীকায় "দলের সমস্ত লোক মিলিয়া উচ্চ বাদ্য সহকারে যে অংশ গীত হইত তাহার নাম ঘোষা।" ইহা কোন বিদ্যালয়ের "বাংলা ?"

"ময়নামতীর গান" এই নামখানিতে বর্ণবিন্যাস ঠিক আছে কিনা তাহাও আলোচনার বিষয়। মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈকারান্ত হইলে + + মতী আকার ধারণ করে। যথা শ্রীমতী, বুদ্ধিমতী, ভানুমতী ইত্যাদি। ময়না শব্দের পর মতুপ্ প্রত্যয় হইতে পারে তেমন কোনও সূত্রের অভাব; স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈকার হওয়াত পরের কথা। সংস্কৃতে হ্রস্ব ইকারান্ত মতি শব্দের অর্থ বুদ্ধি। যাবনিক মতি শব্দে রত্নবিশেষকে (pearls) বুঝায়, হীরা, মণি, মানিক্য, মতি, চুনী ইত্যাদি। ইহা হইতেই হীরালাল, মতিলাল, মণিলাল, চুনীলাল প্রভৃতি পুরুষের নাম, মতিঝিল, হীরাঝিল প্রভৃতি সরোবরের নাম, মতিবিবি, মতিজান্ প্রভৃতি মুসলমান রমণীর নাম। ইহা ছাড়া আরবীতে মোতিহ্ একটী শব্দ আছে যাহার অর্থ বশ্য বা বাধ্য (obedient); এই অর্থে মোতিহ্‌র রহ্‌মান প্রভৃতি নাম রাখা হয়। ময়নামতি স্থলে, ময়না এবং মতি কোন শব্দই খাটি বাঙ্গালা নহে। অতএব ময়নামতি শব্দে রত্ন স্বরূপ ময়না পাখী এরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়; অথচ হ্রস্ব ইকার স্বীকার না করিলে কোন অর্থ ই হয় না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

অধিশ্রয়ণ।

এই মোর বক্ষের বীক্ষণে
ক্ষুদ্র যে বৃহৎ হয়ে আসে,
ক্ষীণ প্রাণ দ্বিতীয়ার চাঁদ
পূর্ণিমা গৌরব লয়ে হাসে।

(২)

অবজ্ঞাত তৃণের কুসুম
ফোটে হায় পারিজাত হয়ে,
স্বল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রজাপতি
শোভার ভাণ্ডার আসে লয়ে।

(৩)

ফিরি শিশু গঙ্গাস্নান হতে
পথের যে কত কথা কয়,
তার কাছে তুচ্ছ মোর লাগে
'প্রবাস চিত্র' কি 'হিমালয়।'

(৪)

কৃষাণীর মরণের পর
হেরিয়া করুণ তার স্বামী,
ফেলিছে যে নয়নের জল
'উদ্ভ্রান্ত প্রেমের' চেয়ে দামী।

(৫)

দীন গৃহী দুর্ভিক্ষে বন্যায়
ভবন উজাড়ি' গেল যারা,
তাদের সে আঁধার ভবনে
'হরিবংশ' গোটা হয় হারা।

(৬)

নিকানো তুলসী তলে লুটি
ভক্তিমতী অশ্রুমুখী র'ন,
তাঁর সেই অতি ক্ষীণ ডাক
'ভাগবত' হৃদি রসায়ন।

(৭)

তুচ্ছ ক্ষীণ অজ্ঞাত ক্ষণিক
তাহারা আমারে যেন চায়,
গৃহ হীন সাঁওতাল সম
তাম্বু ফেলে বুকের ডাঙ্গায়।

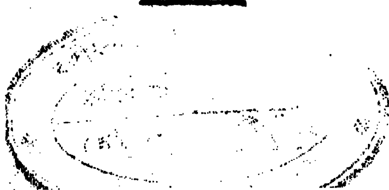
(৮)

আঘাত দুর্ব্বল তরীগুলি
আমার বন্দরে এসে লাগে,
দরিদ্রের 'জলমাত্র' ভাই
পথের পিপাসী বারি মাগে।

(৯)

আমি এক ওষধি দুর্ব্বল
বড় থেকে বহু দূরে আছি,
শিলা যায় দাগ দিয়ে প্রাণে
শিশির বুকেই ধরি বাঁচি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



ফরাসীবিপ্লব-যুগের কয়েকটি চিত্র।

প্যারিসের রাজপথ।

নাগরিক জীবনে তখন বিস্তৃত কিছু ছিল না। ঘরের বাহিরে টেবিল পাতিয়া লোকেরা প্রকাশ্যভাবে আহারাদি করিত। রমণীরা গির্জ্জার সিঁড়িতে বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত "মার্সেলেজ" গাহিতে গাহিতে সেলাই ও বুনানি করিত। পার্কে পার্কে সৈন্যদের কাওয়াজ হইত, এবং সকলের চোখের সামনেই বন্দুকের কারখানায় পুরাদমে কাজ চলিত, আর লোকেরা বাহাবা দিত। সকলেরই মুখে এই কথা "ধৈর্য্য ধর, বিপ্লব চলিতেছে।" এরূপ সময়েও তাহাদের সস্মিত বদন। থিয়েটারে দর্শকের অভাব ছিল না।

জার্ম্মেনরা একেবারে নগর তোরণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বাজারে গুজব প্রুসিয়ার রাজা পূর্ব্বাহ্নেই থিয়েটারে আসন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। "সন্দিগ্ধ-দের" সম্বন্ধে অদ্ভুত আইন প্রত্যেকের অন্তরে মাথার উপরে উদ্যত গিলোটিনের দৃশ্য জাগাইয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকে বিভীষিকা, তবু কেহই ভীত নহে। লেরাঁস নামক একজন এটর্ণী অভিযুক্ত হইয়া ড্রেসিংগাউন পরিয়া চটিজুতা পায়ে জানালার ধারে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গ্রেফ্তারের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পুরাতন বাজে জিনিষের দোকান রাজপ্রসাদ হইতে অপসারিত মুকুট, সোনার আশাসোঁটা, ফ্লোর-ডি-লিস প্রভৃতিতে পূর্ব রাজতন্ত্রের ধ্বংস নিঃশেষে চালাইতেছিল। সামান্য লোকেরাও চাঁদা তুলিয়া বুটজুতা কিনিয়া সাধারণ তন্ত্রের সৈনিকদের জন্য "কন্‌ভেনসনের" নিকট পাঠাইয়া দিত। দোকানে দোকানে বাড়ীতে বাড়ীতে ফ্রাঙ্কলিন, রুসো, ব্রুটাস্ এবং ম্যারাটের আবক্ষ প্রতি-মূর্ত্তির ছড়াছড়ি।

প্রধান প্রধান দোকানগুলি প্রায়ই বন্ধ ছিল। মেয়েরা ফিতা, রিবণ, খেলনা প্রভৃতি ফিরি করিয়া

বিড়াইত। মঠ-প্রাচীরাবদ্ধ ভূতপূর্ব্ব 'নানেরা' পরচুলা সজ্জিত মস্তকে মুক্ত আকাশের নীচে দোকান করিয়া বসিত। এই স্থলে যিনি মোজা বুনেন—তিনি ছিলেন একজন কাউন্টেস্; ওখানকার পোষাক বিক্রেত্রী—তিনি একজন মার্শিয়নেস্। মডাম ডি বুফ্লারস্ একটী ক্ষুদ্র কুঠুরীতে বাস করিতেছিলেন—সেখান থেকে তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য দেখা যাইত। রাজার সঙ্গীত রচয়িতা পাইটু জনতাকর্তৃক রাজপথে অপমানিত হয়। এই লোকটি খুব সাহসী—বাবিংশবার কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছে। কোটের ল্যাজ চাপড়াইতে সে "সিটিজেন-সিপ" (নাগরিকতা) এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহাকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। মাথাটাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল "কিন্তু, যদি কারুর অপরাধ হইয়া থাকে তবে সে ত আমার মাথার উলটো দিকের।"

এই রসিকতায় জজেরা হাসিয়া ফেলিলেন এবং পাইটু সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। গ্রীক এবং লাটিন নাম বাথার ক্যাসানকে পাইটু খুব বিদ্রূপ করিত। তাহার ফলে অনেক সাধারণ স্থান ও রাজপথের নূতন নাম করণ হইল। একজন মার্কুইস 'ডিক্স্ উট' (দশই আগষ্ট) * এই নাম গ্রহণ করেন। 'ভদ্রমহোদয়' ও 'ভদ্রমহিলা' শব্দের ব্যবহার রহিত হইয়া 'সিটিজেন' (দেশভ্রাতা) এবং সিটিজেনেস্ (দেশভগ্নী) শব্দের প্রচলন হয়। নূতন আমদানী 'লিবার্টি-ক্যাপ' (স্বাধীনতা-টুপী) মাথায় দেওয়ার রেওয়াজ দেখিতে দেখিতে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

মেয়রের আপিসে নূতন পদ্ধতির বিবাহকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দোরের সম্মুখে ভবঘুরের দল আসিয়া জটলা করিত। বরকনে চলিয়া যাইবার সময় তাহারা চেঁচাইয়া উঠিত 'মিউনিসিপ্যাল্ বিয়ে'। 'চৌমাথার' পাথরের উপর বসিয়া লোকেরা তাস খেলিত। তাসের ছবিতেও ঘোর বিপ্লব—রাজার (সাহেবের) ছবির পরিবর্ত্তে দানবের ছবি, রাণীর পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা দেবী, গোলামের পরিবর্ত্তে সাম্যের ছবি এবং টেক্কার স্থলে আইনের বিবিধ পরিকল্পিত মূর্ত্তি। সাধারণ উদ্যান, এমন কি টুইলারিস্ প্রাসাদ সংলগ্ন ভূমিও, কর্ষিত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই সব বাড়াবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত পক্ষের লোকদের জীবনের প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। ফুকিয়ার নিকট একজন লিখিয়া পাঠায়, "দয়া করে আমাকে এই অস্তিত্ব থেকে মুক্তিদান কর। আমার ঠিকানা দিলাম।"

অসংখ্য খবরের কাগজের প্রাচুর্ভাব হয়। কেশ-বিন্যাসবিপনিতে দোকানের কর্ত্তা বসিয়া বসিয়া 'মনিটার' কাগজ পাঠ করিত, আর তাহার ভৃত্যগণ প্রকাশ্যভাবে রমণীদের পরচুলা কুঞ্চিত করিয়া দিত। অন্যেরা সোৎসুক দলে পরিবেষ্টিত হইয়া 'ট্রাম্পেট' বা অন্যান্য কাগজ পাঠ করিতে করিতে টিপ্পনী কাটিত। পলাতকগণের মদ্যাদি প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হইত। এক মদ্যবিক্রেতা বায়ান্ন রকমের মদের বিজ্ঞাপন দেয়। এক নাপিতের দোকানের সাইনবোর্ডে লিখা ছিল "আমি পাত্রীদিগের ক্ষৌরকর্ম্ম করি; অভিজাতগণের কেশ সংস্কার করি; এবং 'তৃতীয় সম্প্রদায়ের'ও সুখলোকন করিয়া থাকি।"

রুটি, কয়লা ও সাবানের বড়ই অভাব ছিল। গ্রাম থেকে দলে দলে দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী হইত। এক পাউণ্ড মটনের দাম ছিল পনর ফ্রাঙ্ক। কমিউনের আদেশে প্রতি দশদিনে জনপ্রতি অর্দ্ধ পাউণ্ড মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। কসাইর দোকানের সম্মুখে লোক পর-পর সার দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত—পর্য্যায়ক্রমে মাংস কিনিবে। এইরূপ একটি সারি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

* ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট প্যারিসের জনগণের অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের ফলে ষোড়শ লুই রাজক্ষমতা পরিচালন হইতে লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লি কর্ত্তৃক আহত হয়।

উহা রু ত্ব পেটিটের একটি মুদীর দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া রু মনটরউইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুর্দ্দশাতেও রমণীরা খুব সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। পালাক্রমে রুটি কিনিবার জন্য তাহারা অনেক সময় এরূপভাবে সারারাত কাটাইয়াছে।

কাঠের দাম ভয়ঙ্কর চড়িয়া গিয়াছিল। এক এক বোঝার দাম ৪০০ ফ্রাঙ্ক। তক্তাপোষ কাটিয়া জ্বালানি কাঠের যোগাড় হইতেছে—এরূপ দৃশ্য রাস্তায় চোখে পড়িত। শীতকালে ঝরণাগুলি জমিয়া যায়।' দুই কলসী জলের দাম দুই 'সু'। লোকে নিজেরাই জল তুলিয়া আনিত। একবার ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িলেই ৬০০ ফ্রাঙ্ক লাগিত। দিনভর গাড়ী খাটাইলে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই এরূপ কথোপকথন শুনা যাইত "কোচম্যান, কত দিতে হবে?" "আজ্ঞে, দু'হাজার ফ্রাঙ্ক"।

চুরি তখন অল্পই হইত। চারিদিকে ভয়ঙ্কর অভাব, অথচ অবিচলিত সাধুতা। নগ্নপদ অনশন-ক্লিষ্ট জনসমূহ ধনিরত্ন গহনার দোকানের নিকট দিয়া যাইবার সময় চক্ষু নত করিয়া যাইত। জনৈক রমনী কোন উদ্যানের একটি ফুল ছিঁড়িয়া নিয়াছিল বলিয়া ক্রুদ্ধ জনতা তাহার কান মলিয়া দেয়।

বিপ্লব সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন সংশয় ছিলনা। রাজসিংহাসনের নিপাত সাধন করিয়া তাহাদের বিষাদ গভীর আনন্দ। ভলণ্টিয়ারের অসদ্ভাব ছিল না। প্রতি ষ্ট্রীট্ হইতে এক এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সংগৃহীত হয়। ভিন্ন ভিন্ন * ডিষ্ট্রীকটের ভিন্ন ভিন্ন পতাকা। কেপুচিন্ ডিষ্ট্রীকটের পতাকায় লিখিত ছিল" আমাদের শ্মশ্রু কেহ কাটিতে পারিবে না"। অন্য একটি পতাকায় "মটো" ছিল "হৃদয়ের অভিজাত্য ব্যতীত অন্য অভিজাত্য নাই।" দেওয়ালে দেওয়ালে সাদা' লাল, সবুজে, হলুদে বিবিধ রঙের প্লাকার্ড (বিজ্ঞাপন)—তাহাতে লিখিত কিংবা মুদ্রিত আছে—"সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবি হউক।" ছোট ছোট শিশুরাও সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রচারিত রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের প্রারম্ভ বাক্য অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিত—"শাইরা।" এই শিশুরাই দেশের মহান্ ভবিষ্যৎ।

কিছুদিন পরে আবার সব পরিবর্ত্তিত হয়।

প্যারিসের রাজপথে বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটা দিকই দেখা গিয়াছিল। ৯ই *থার্ম্মিডারের পূর্ব্বে এবং পরে। পিউরিটানসুলভ শুচিবাইএর পরে আমোদ প্রমোদের তরঙ্গ। যেমন চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বের পরে, তেমন এই রবস্পীয়রের শাসনের পরেও লোকের একটু দম লইবার আবশ্যক হইয়াছিল। এ যেন রাষ্ট্রীয় মুক্তির আনন্দ।

*প্রাচীনকাল হইতে ফ্রান্স কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে আইন কানুন, আচার ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের ছিল। দেশাত্মবোধের এই অন্তরায় দূর করিয়া দেশে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আবে সাইয়ের প্রচেষ্টায় পুরাতন প্রদেশ বিভাগের পরিবর্ত্তে ফ্রান্স কতকগুলি ডিপার্টমেণ্টে, প্রতি ডিপার্টমেণ্ট কতকগুলি ডিষ্ট্রিক্ট, এবং প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট কতকগুলি কমিউনে বিভক্ত হয়, এবং ইহাদের মধ্যে আইন ও অধিকার সাম্য স্থাপিত হয়। ইহাদের শাসন কার্য্য,—নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে-গঠিত একটি মন্ত্রণাসভা ও একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সমর্পিত হয়।

* ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। ১৭৯১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এক নূতন বৈপ্লবিক অব্দগণিত হইতে আরম্ভ হয়। বৎসর ৩০ দিনের ১২টি মাসে, এবং প্রতি মাস ৪ সপ্তাহের পরিবর্ত্তে ৩ সপ্তাহে বিভক্ত হয়। ঋতু অনুসারে মাসগুলির নূতন নামকরণ হয়। যথা,—থার্মিডর—গ্রীষ্মমাস, ব্রুমেয়ার—কুয়াসার মাস ইত্যাদি। ২২শে সেপ্টেম্বর—সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আবার শারদীয় সমদিবারাত্রিও সেই দিনেই। তাই ঐ দিন হইতে বর্ষারম্ভ হইল।

* ৯ই থার্ম্মিডারের পরে প্যারিস আমোদে মাতিয়া উঠিল। বাধাবন্ধহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ। বিলাস,ব্যসন, আড়ম্বর, নৃত্যগীতের আতিশয্য। সীবন-কর্ম্ম-নিরতা গম্ভীর নাগরিকাগণের স্থলে এখন প্রসাধনসজ্জিতা, হাবভাবময়ী, ভামিনীবর্গের সমাগম ঘটিতে লাগিল। সৈনিকের ধূলিধূসরিত রক্তাক্ত পদের পরিবর্ত্তে এখন চারিদিকে রমণীয় মণিমুক্তা বিজড়িত নগ্নপদের সৌন্দর্য্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লজ্জাহীনতার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-হীনতার পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইল—কি বড়লোক, কি নিম্ন-শ্রেণী, সকলের মধ্যে। চোর বাটপাড়েতে আবার নগর পূর্ণ হইয়া গেল। পথিকগণকে সন্তর্পণে পকেট বুক রক্ষা করিতে হইত। বিচারালয়ে গিয়া নারীতস্করদিগকে দেখা একটা আমোদের বিষয় ছিল। 'প্রজাবন্ধু' ও তৎশ্রেণীর পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া পঞ্চরঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকার বিক্রী বাড়িয়া যায়।

এই ভাবেই প্যারিস আন্দোলিত হয়—সম্মুখে ও পশ্চাতে। সভ্যতার এই বিশাল পেণ্ডুলাম (দোলা) একদিকে থার্ম্মপলি * অপর দিকে গমোরা † স্পর্শ করে।

'৯৩ সালের পর রাষ্ট্রবিপ্লব যেন একটা ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া যায়। শতাব্দী যেন তাহার প্রারব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিতে ভুলিয়া গেল। ট্র্যাজিডির স্থান ব্যঙ্গ অধিকার করিল এবং দিগন্তের গূঢ় গহ্বর হইতে উত্থিত ধূমরাশি বিপ্লবের করাল মূর্ত্তিকে দৃশ্যপট হইতে যেন মুছিয়া ফেলিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

* থার্ম্মপলি—গ্রীসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম। এইখানে (৪৮০ খৃঃ পূঃ) মাত্র ৩০০ শত সৈন্য লইয়া স্পার্টার রাজা লিওনিদাস পারস্যরাজ জারেক্সাসের অগণিত সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সসৈন্যে নিহত হন।

† গমোরা—বাইবেলোক্ত নগরী। ইহার ও অপর কতিপয় নগরীর অধিবাসীগণের পাপাচরণে ঈশ্বরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, এবং স্বর্গাগ্নিতে ঐ নগরগুলির ধ্বংস হয়।

দীর্ঘ জীবনের কথা।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে কি উপায়ে যে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং মানবদেহে দীর্ঘজীবনের বিশেষ কোনও লক্ষণ থাকে কিনা তদ্বিষয়ে যে নানারূপ পরীক্ষা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অকল্পিতকে বাস্তবে, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার বিষয়ে অচিন্তিত কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া থাকিলেও কি উপায়ে যে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় সে পথটা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বা দীর্ঘজীবনের যে কি বিশেষ লক্ষণ তাহারও সঠিক খোঁজ পান নাই। দার্শনিক পণ্ডিত লর্ড বেকন অতি বৃদ্ধলোক দেখিলেই তাহাদের দীর্ঘজীবনের গুপ্তকথা অর্থাৎ কি প্রক্রিয়ার দ্বারা বা কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়াছেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বহু বৎসর ব্যাপী চেষ্টা করিয়াও এ সকল লোকের উত্তর হইতে কোনও চুরান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া দীর্ঘজীবন-রহস্য সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তবে দীর্ঘজীবী লোকদের সাধারণ দৈহিক গঠন পর্য্যবেক্ষন করিয়া মোটামটি তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে :—(১) যাহাদের শিরা, উপশিরা সমূহ সুস্পষ্ট, (২) যাহাদের দাঁত মুখের তুলনায় বেশী বর অথবা (৩) যাহাদের চুল খাড়া খাড়া অর্থাৎ চিরুণীদ্বারা পাট করা যায় না তাহারা সাধারণত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে যে "লম্বা গলা হইলে জীবনও লম্বা হয়", এবং যাহাদের গলা খাটো তাহারা সাধারণত অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ু হয়। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের গলা অতিমাত্রায় খাটো অর্থাৎ যাহাকে "ঘারে-গর্দ্দানে" মানুষ বলে তাহাদের অনেককেই সন্ন্যাস রোগে মরিতে দেখা যায়।

দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈশিষ্টের জন্য মানুষ দীর্ঘজীবী হয় কিনা কিছুদিন যাবৎ পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক

গণ তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। এই আলোচনার ফল যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে যাহারা হ্রস্বপদবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাদের দেহের তুলনায় পা ছোট তাহারা সাধারণত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে; যাহাদের পা বড় অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের বুকের গড়ন তেমন সবল নয়। হ্রস্বপদীলোক দীর্ঘপদীলোকের ন্যায় কখনও হঠাৎ সর্দ্দিরোগে আক্রান্ত হয় না। হ্রস্বপদীদের তুলনায় দীর্ঘপদীদের দেহে রক্ত সঞ্চালনও অনেকটা অনিয়মিত হইয়া থাকে, কাজেই শেষোক্ত সম্প্রদায় রোগের বিরুদ্ধে তেমন তুমুলভাবে যুদ্ধ করিতে পারে না। শারীরিক বলবত্তার জন্য জগৎ প্রসিদ্ধ সেণ্ডোর (Sandow) পদযুগল দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেকটা ছোট। পাশ্চাত্য খণ্ডে স্বনামখ্যাত নর্ত্তকীদের মধ্যে প্রায় সকলেরই পা দেহের তুলনায় অনেকটা বেশী বড় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহাদের মধ্যে দীর্ঘজীবীর সংখ্যাও অতি অল্প। ইউরোপ খণ্ডে কৃষিকার্য্যেলিপ্ত পঞ্চাশের উর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা পচানব্বই জনেরই পা দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট এবং এই শ্রেণীর লোক সাধারণত যেরূপ বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী অন্য কোনও শ্রেণীতে সেরূপ দেখা যায় না। যাহারা দ্রুত ধাবনে সুপটু অর্থাৎ দৌড়ে নাম কিনিয়াছে, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে তাহাদের পা অধিকাংশ স্থলেই অতি লম্বা এবং তাহাদের ভিতর কেহই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। দেহের তুলনায় পা ছোট হইলেই যদি দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় তাহা হইলে কেহ হয়ত এ স্থলে বলিতে পারেন যে চীন-রমণীগণের অমর হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যাহার দেহের গঠন যত কুৎসিত তাহার তত দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহারা কুৎসিত তাহাদের সান্ত্বনার যথেষ্ট কারণ আছে এবং নিজের দেহে সৌন্দর্য্যের অভাবের জন্য মনোকষ্টের কোনও হেতু নাই। দৈহিক গঠনের যে সকল বিশিষ্টতা লইয়া সৌন্দর্য্য-বিচার হইয়া থাকে পাশ্চাত্য-খণ্ডে নাসিকা ও চক্ষুর গঠন বোধহয় তন্মধ্যে বিশেষ উচ্চস্থান পায় না। নতুবা হয়ত কোনও ধুরন্ধর পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিতেন যে যাহার নাসিকা যত কদাকার ও যাহার চক্ষু যত ছোট সে তত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

সাধারণ লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সন্তান প্রসব করিলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং পরমায়ু কমিয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু গবেষনার পর ঠিক উহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনেক পরীক্ষার পর তাহারা বলিতেছেন যে যে রমণী যত অধিক সন্তান প্রসব করে সে রমণী তত অধিক আয়ুষ্মতী হয়। একটু পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরের এবং কুলী মজুর শ্রেণীর রমণীরা সমাজের উচ্চস্তরের এবং ভদ্র পর্য্যায়ের রমণীদের অপেক্ষা অধিক সন্তান প্রসব করে এবং বেশী বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। গড় পড়তা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সন্তানের জননীর জীবন বন্ধ্যা রমণীর জীবনের তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ হয়। এরূপ হওয়ার কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে;—প্রকৃতি সন্তানবতীদিগকে সন্তান পালনের জন্য অতিরিক্ত জীবনীশক্তি প্রদান করিয়া থাকে। জননীদিগকে বাধ্য হইয়া দেহের মাংস-পেশীর যে সঞ্চালন করিতে হয় তাহাতে উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়। এই একটি মাত্র ব্যায়ামই জননীদিগকে দীর্ঘজীবনী করার পক্ষে যথেষ্ট। বন্ধ্যা রমণীগণ উক্তরূপ ব্যায়াম করার কোনও সুযোগ পায় না। চিকিৎসকগণ আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়স মধ্যে যাহারা অল্প সন্তান প্রসব করে তাহাদের তুলনায় যাহারা ঐ বয়স মধ্যে অধিক সন্তানের মাতা হয় তাহাদের জীবন দীর্ঘ হয়। অবশ্য যাহারা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া অথবা অন্যবিধ অনিয়ম ও অত্যাচারের মধ্যে সন্তান-জননী হয় তাহাদের বিষয় অন্যরূপ।

পাশ্চাত্য-খণ্ডে সমাজের উচ্চস্তরের রমণীদের হৃদয়ে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ ছুটিয়াছে যে জীবনটা উপভোগ করার জন্য। অপ্রতিহতভাবে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বা কাজ করিয়া যে যতটা সময় কাটাইতে পারে তাহার জীবন ততটা সার্থক। ইহারা সন্তান প্রসবরূপ জঞ্জালকে মাঝখানে টানিয়া আনিয়া জীবনটাকে ব্যর্থ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। ইহাদের মতে মাতৃত্ব হইতেছে স্ত্রীজাতীর উপর প্রকৃতির একটা অন্যায় অভিশাপ এবং তাহার ফলে হইতেছে যে ইউরোপে কোনও কোনও দেশে সমাজের উচ্চস্তরের জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে।

এমন অবস্থায় কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে ঐ তরঙ্গের গতি ফিরাইবার জন্যই ভবিষ্যৎদর্শী চিকিৎসকগণ ওরূপভাবে মাতৃত্বের মহিমা প্রচার করিয়া স্ত্রী জাতীকে জননী হইতে প্রলুব্ধ করিতেছেন। কারণ দীর্ঘজীবন লাভের আশা দিয়া লোককে যেরূপ আয়ত্ত করা যায় অন্য কোনও পন্থাতেই ততটা সুফল হয় না।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানব জীবনে প্রথমে শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, তৎপর প্রৌঢ়াবস্থা এবং অবশেষে বার্দ্ধক্য আসিয়া থাকে। বার্দ্ধক্যের পরই মৃত্যু, অর্থাৎ বার্দ্ধক্য হইতেছে মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা, এবং এই অবস্থার কবল হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। সারা জীবন জরারহিত ভাবে যাপন করিলেও দুদিন আগে হউক পরে হউক বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবেই। তখন দেহের অঙ্গ সমূহ ক্রমে শিথিল হইয়া আসে এবং অবশেষে নিষ্ক্রিয় হইয়া পরে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বুলগেরিয়া দেশবাসী বৈজ্ঞানিক মেব্‌নিকফ্ ঘোষনা করেন যে আমাদের জীবনে বার্দ্ধক্য নামক কোনও অবস্থা মোটেই নাই। বার্দ্ধক্য বিসুচিকা, বসন্ত, যক্ষা বা সর্দ্দি কাশির মত একটি সাধারণ রোগ মাত্র। তবে এই রোগের বিশেষত্ব এই যে ইহার আক্রমণ হইতে কেহই নিস্তার পায় না এবং কাজেই সকলেরই মরিতে হয়। যদি এই বার্দ্ধক্য রোগটীর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহা হইলেই আমরা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। মেব্‌নিকফ্ রোগ নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছে। অধ্যাপকের মতে অধিকাংশ রোগই যেরূপ বীজাণুবিশেষ দ্বারা মানব দেহে সংক্রামিত হয়, বার্দ্ধক্য রোগও ঠিক এরূপ ৪০ বৎসর বয়সের পর মনুষ্যের অন্ত্র মধ্যস্থ জীবাণু সমূহের সংখ্যা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে যদি আমরা এ রোগ বীজাণু সমূহের আক্রমণ হইতে দেহটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, অর্থাৎ বীজাণু দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও কোনও উপায়ে উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিতে পারি তাহা হইলে আর আমরা সহজে বুড়া হইব না। অধ্যাপক প্রবর উহার পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ দ্বারা যেরূপ বিষক্ষয় করিতে হয় সেইরূপ অনেক রোগের বীজাণু দ্বারাই রোগ বীজাণু নষ্ট করা হয়। বসন্ত প্রভৃতি রোগের কবল হইতে অনাক্রান্ত থাকার জন্য টিকা লওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ স্থলে টিকার বীজের সঙ্গে দেহের মধ্যে এমন একপ্রকার ক্ষমতাশীল বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয় যাহা দেহের কোনও অনিষ্ট সাধন না করিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে থাকে এবং ভবিষ্যতে বসন্ত রোগ বীজাণু দেহে প্রবেশ করিবা মাত্র উহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরেই তাহাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে; কাজেই আর বসন্তরোগ হইতে পারে না। মেব্‌নিকফের মতে দুগ্ধ-অম্ল-বীজাণু (Lactic acid Bacilii) বার্দ্ধক্য-রোগ আনয়নকারী বীজাণু সমূহকে আংশিকরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিতে পারে, অথচ উহারা মানব দেহের কোনও অনিষ্ট সাধন করে না। দধিতে Lactic acid Bacilli যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে; অতএব নিয়মিত দধি ভোজন করিলে আর আমাদের সহজে বুড়া হইবার আশঙ্কা নাই।

কারণ দধি ভোজন করিলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধ-অম্ল বীজাণু সমূহও তৎসহ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং ঐ স্থানে দধিস্থ অবশিষ্ট শর্করা ভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিবে। এই দুগ্ধাম্ল অন্ত্র মধ্যস্থ দেহ ক্ষয়কারী জীবাণু সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অকাল বার্দ্ধক্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার রোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবে। মেষ্‌নিকফ্‌ বুলগেরিয়া (Bulgaria) রাজ্যের অধিবাসীদের আয়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উক্ত সত্য প্রমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত রাজ্যের অধিবাসীগণ প্রত্যহ অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে অল্পাধিক মাত্রায় দধি ভোজন করিয়া থাকে। সমগ্র বুলগেরিয়ায় ত্রিশলক্ষ লোকের বাস; তন্মধ্যে দশ জনের বয়স ১২৫ এর উপর, ৮৮ জনের বয়স ১২০ হইতে ১২৫ এর মধ্যে; ২৩৪০ জনের বয়স ১১০ এর উপর। পৃথিবীতে বুলগেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মানুষের দেশ। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে ঐ রাজ্যের অধিবাসীগণ প্রত্যহ দধি ভোজন করে বলিয়াই এত দীর্ঘজীবী হয়। বার্দ্ধক্য আনয়নকারী জীবাণু সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রতিহত করা ছাড়া দধি-বীজাণু আরও বহু প্রকার রোগ বীজাণুর উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এদেশে দধি-বীজাণুর সহিত মিশ্রিত হইলে বিসূচিকার বীজাণু ১২ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং একদিন পর তাহাদের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। সান্নিপাত জ্বরের (Typhoid) বীজাণু দধির সহিত মিশ্রিত হইলে ৪৮ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মেষ্‌নিকফের উক্ত আবিষ্কারের পর ইউরোপ-খণ্ডে দধি ভোজনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছে।

অনেকের মতে বিবাহটা হইতেছে দীর্ঘজীবন লাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। ইহারা চিরকুমার ব্রতাবলম্বী সাধু সন্ন্যাসীদের দীর্ঘজীবনের উদাহরণ তাহাদের মতের অনুকূলে উপস্থিত করেন। আপাত দৃষ্টিতে কথাটা যেরূপই হউক না কেন বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর যে উক্তরূপ মতের ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে ১৩২৭ সনে পৌষ সংখ্যা প্রতিভায় "বিবাহ ও দীর্ঘজীবন" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে পরিমিত আহারে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু বিখ্যাত কাউন্টেস অফ ডেস্‌মণ্ড, একশো চল্লিস বৎসর বয়সে যিনি গাছ হইতে পড়িয়া অকালে মারা যান, তিনি যে খুব পরিমিত আহার করিতেন এমন কথা শোনা যায় নাই। তবে বিখ্যাত পার-সাহেব যখন একশো বাহান্ন বৎসর বয়সে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন অনেকে বলিয়াছিল যে পরিমিত আহার ছাড়াতেই ওরূপ হইল।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

দেহের লোম।

(চয়ন)

সর্ব্বপ্রকার বানর ও নরগণের মধ্যে নরগণের দেহে লোম অত্যন্ত কম। কিন্তু ভ্রূণ-অবস্থায় নরগণেরও দেহে প্রায় সর্ব্বত্রই লোম থাকে। ওষ্ঠ, হস্তের তলভাগ, পদের তলভাগ, এবং আরও দুই একটী স্থান ব্যতীত ভ্রূণের দেহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোমাবৃত। এ সম্বন্ধে পুংজাতীয় অথবা স্ত্রীজাতীয় ভ্রূণ মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

ভ্রূণের বয়স তিন মাস অথবা সাড়ে তিন মাস হইলে লোম হইতে আরম্ভ হয়। তখন মুখমণ্ডল এবং কপালে লোম হয়। কিন্তু গায়ের চর্ম্ম ভেদ করিয়া লোম উঠিতে পাঁচ মাসের কমে হয় না; এবং সাত মাস পূর্ণ হইয়া গেলে লোম উঠাও শেষ হয়। সর্ব্বপ্রথমে ভ্রূণের মস্তকে লোম উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বশেষে বাহুতে ও পদে হইয়া থাকে।

এই লোমগুলি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কেশের ন্যায় নহে; উহারা প্রায় সাদা বর্ণের এবং অতি ক্ষুদ্র ও অতি নরম মসৃণ। জাতক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মস্তক ও ভ্রূ

ব্যতীত দেহের প্রায় সর্ব্বস্থান হইতেই ঐ লোম অন্তর্হিত হয়; উহা দেহচর্ম্মে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও দেহের দুই এক অংশে বড় বড় কেশবৎ লোম থাকিতে দেখা গিয়াছে।

যৌবনকালে ঐ লুপ্ত লোমাবলীর স্থানে কেশজাত হয়; কিন্তু সর্ব্বত্র হয় না। গালে ও তাহার নিম্নভাগে, ওষ্ঠের উপরে ও অধরের নীচে, বগলে, বুকে, এবং তল-পেটের নিম্নদেশে এবং গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ও উপরি-ভাগে কেশ জাত হয়। অন্যত্র প্রায়শঃ হয় না। কিন্তু কাহারও কাহারও পীঠে এবং বাহুতে এবং পদযষ্টিতে কেশ থাকা দেখা যায়। উহা সাধারণ নিয়ম নহে। উপরের লিখিত গাল ইত্যাদি চারি পাঁচ স্থান ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহের কোথাও লোম থাকা সাধারণ নিয়ম নহে। তথাপি ভ্রূণের দেহ যেমন প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোমাবৃত থাকে, তেমনই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহেও প্রায় সর্ব্বত্রই লোমের মূল বিদ্যমান থাকে! কিন্তু সেই মূল হইতে আর লোম জাত হয় না।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ মধ্যে স্ত্রীগণের অপেক্ষা পুংগণের দেহই অধিক লোমশ! স্ত্রীগণের গালে, ওষ্ঠে, বুকে, বাহুতে প্রায় কাহারই লোম জাত হয় না; তথাপি কদাচিৎ দুই একটী স্ত্রীলোকের ওষ্ঠের উপরে এবং গালে ও তাহার নিম্নভাগে, কেশ থাকা দেখা যায়। আমি বাল্যকালে একটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, তাহার দাড়ি ও গোঁপ ঠিক পুরুষের মত ছিল; তৎপরেও দুই একটী ঐরূপ স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন।

দেহের কেশাবলী যেরূপভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত, তাহা বিবেচনা করিলে মনে কতিপয় প্রশ্নের উদয় হয়। প্রাপ্তবয়স্কের দেহ অপেক্ষা ভ্রূণ দেহের লোম সকল যে ভাবে সজ্জিত থাকে, তাহাই অধিকতর চিন্তনীয়। তথাপি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কেশ সংস্থানও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

কেশসংস্থানের প্রণালী এই যে (১) কতিপয় কেশের অগ্রভাগ একটী বিন্দু অথবা চক্র হইতে চারিদিকে চলিয়া যায়; (২) কতিপয় কেশের অগ্রভাগ একটী রেখার দিকে বিপরীত ভাবে চলিয়া যায়। (৩) এবং আরও কতিপয় কেশের অগ্র চারিদিক্ হইতে একটী বিন্দু অথবা চক্রের দিকে চলিয়া আসে। প্রথম প্রণালীর উত্তম উদাহরণ—মস্তকের উপরিভাগের চক্র [অথবা পাক]। মস্তকের কেশের অগ্র ভাগ এই চক্র হইতে চতুর্দ্দিকে গিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তির এই স্থানে দুইটী চক্র দেখা যায়; তাহাদিগের দুই চক্র হইতে কেশাগ্র সকল চতুর্দ্দিকে যায়। দ্বিতীয় প্রণালীর দৃষ্টান্ত—বক্ষের ও বাহুর কেশ; এই দুই স্থানে একটী কাল্পনিক রেখায় দুই বিপরীত দিকে কেশাগ্র চলিয়া গিয়াছে। বক্ষের ঠিক মধ্য দিয়া একটী উর্দ্ধাধঃ রেখা কল্পনা করিলেও বামদিকে কেশাগ্র স্থাপিত থাকা বুঝা যায়। তলপেটের নিম্নভাগেও এইরূপ। পৃষ্ঠে কেশ থাকিলে সেখানেও এই প্রণালী দৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রণালীর উত্তম দৃষ্টান্ত নাভি। চারিদিক্ হইতে এই চক্রের দিকে কেশাগ্র চলিয়া আসে। এই সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। যে চক্রের দিকে চারিদিক হইতে কেশাগ্র চলিয়া আসে, সে চক্রের মধ্য দিয়া দেহের বাহিরের দিকে কোনও কিছু বাহির হইতে দেখা যায়। জাতকের নাভিচক্র হইতে বাহিরের দিকে একটী নল থাকে; ঐ নল অথবা নাড়ী জাতক ভূমিষ্ঠ হইলে পর কাটিয়া দিতে হয়। আরও একটী স্থানে এইরূপ দেখা যায়; তাহা মানবজাতির দেহেই লক্ষিত হয়। বা-নরদিগের প্রাপ্তবয়স্কের দেহেও লক্ষিত হয়। সে স্থান মেরুদণ্ডের নিম্নে এবং গুহ্য দ্বারের পশ্চাদ্ভাগের উপরে। ঐ স্থানে একটী ক্ষুদ্র খালের মত প্রায় সকল মানবের দেহেই আছে। যাহাদিগের ঐ স্থানে লোম থাকে [অর্থাৎ ছোট, সাদা বর্ণের মসৃণ লোম থাকে] তাহা-দিগের লোমের অগ্রভাগ ঐ খালের দিকে স্থাপিত।

ঐ খাল ভেদ করিয়া বানরাদির এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী পশুদিগের লেজ বাহির হয়। ঠিক ঐ স্থানে নরগণের একটী ক্ষুদ্র খাল; এবং সেই খালের দিকে চারিদিক্ হইতে লোমাগ্র চলিয়া আসে। ইহার অর্থ কি? ঐ স্থান ভেদ করিয়া কি মানবজাতির প্রাচীনতম পূর্ব্ব পুরুষের লেজ বাহির হইত? এই বিষয় নিশ্চয়ই বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। মানবের ভ্রূণ দেহে স্পষ্ট দেখা যায়, যে স্থান হইতে সমস্ত মেরুদণ্ডটী গঠিত হইবে, তাহার সর্ব্ব নিম্নভাগ সূক্ষ্ম (চোখা) হইয়া উপরের দিকে বাঁকিয়া দেহের বাহির হইয়া রহিয়াছে। এই অংশ সচরাচর ভ্রূণের চারি বৎসর বয়সে দেহ মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত গার্ল্যাক্ একটী মানব-ভ্রূণের চারি মাস বয়সেও ঐ বাহিরের অংশ লক্ষ্য করিয়াছেন। * মেরুদণ্ডের এই সূক্ষ্মাগ্র নিম্নভাগ ভ্রূণ দেহ হইতে বাহির হইয়াছে; এবং বাহিরের অংশ সমস্ত দেহের এক ষষ্ঠাংশ পরিমিত দীর্ঘ। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম মেরুতন্তু দেখা গিয়াছে। এবং ইহার সহিত অপুষ্ট পেশীগুচ্ছও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ে এ অংশ প্রকৃত মেরুদণ্ডের ন্যায়। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়াও সূক্ষ্ম মেরুতন্তু আছে; এবং ঐ দণ্ডের প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের সহিত পেশী ও শিরা সংযুক্ত আছে। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে কটির অধোদেশে যে চারিখানি খণ্ডাস্থি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক নরগণের সকলেরই বর্ত্তমান আছে, তাহা অপুষ্ট এবং জমাট হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। উহারা আর কার্য্য করে না। উহার অগ্রভাগ ভ্রূণের দেহে উপরের দিকে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সচরাচর উহার সূক্ষ্মাগ্রভাগ যাহা দেহ হইতে কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে, তাহা ভ্রূণ অবস্থাতেই দেহমধ্যে লীন হইয়া যায়। এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক নরগণের মেরুদণ্ডের ঐ শেষাংশ নিম্নগামী। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত গার্ল্যাক্ একটী মানবীয় ভ্রূণের উপরের লিখিত অংশ দেহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মাগ্র হওয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য মানবীয় ভ্রূণেরও মেরুদণ্ডের শেষাংশ ঐরূপ; কিন্তু সচরাচর দেহমধ্যেই থাকে এবং অতিশয় অপুষ্ট ও প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত দেখা যায়। কিন্তু গার্ল্যাক মহোদয়ের লক্ষিত ভ্রূণের মেরুদণ্ডের শেষাংশ প্রকৃত পুষ্ট, মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধতন অংশের ন্যায় লক্ষণযুক্ত ছিল। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ উহার সংলগ্ন অপুষ্ট পেশী গুচ্ছ থাকায় উহাকে মেরুদণ্ড বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। স্তন্যপায়ী পশুগণের লেজও মেরুদণ্ডের শেষাংশ; উহা দেহ হইতে বাহির হইয়া প্রাপ্ত বয়সেও কার্য্যক্ষম থাকে। উহাদিগের দেহমধ্যস্থ প্রকৃত মেরুদণ্ড এবং দেহের বাহিরের লেজাংশে সর্ব্বসমেত ন্যূনাধিক ৪০।৪২ খানি * খণ্ডাস্থি থাকে। কিন্তু মানবের দেহমধ্যেই মেরুদণ্ড অবস্থিত, বাহিরে নাই। তাহার খণ্ডাস্থির সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩)। তন্মধ্যে সর্ব্ব নিম্নের অংশে চারিখানি অপুষ্ট, জমাট ও নিশ্চেষ্ট। উপরের ২৯খানি কার্য্যক্ষম। নিম্নের চারিখানি কার্য্যক্ষম নহে। উহাদিগের সহিত সচরাচর পেশীগুচ্ছ সংলগ্ন না থাকায় উহারা নড়িতে পারে না। কিন্তু পশুদিগের লেজাংশের খণ্ডাস্থিতেও পেশী ও শিরাযুক্ত থাকায় ঐ অংশ সঞ্চালন করা যায়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই লেজাংশ যে স্থান হইতে দেহের বাহিরে আসিয়াছে, সে স্থানে পশুগণেরও কেশ থাকে। মানব ভ্রূণেরও ঐ স্থানে সকলেরই কেশ থাকে; এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানবের ঐ স্থানে ক্ষুদ্র একটী খাল থাকে; † তাহার চারিদিক্ হইতে কেশাগ্র ভাগ ঐ খালের দিকে চলিয়া আসে। কিন্তু সকলের ঐ খালের নিকট কেশ থাকে না; তথাপি যাহাদিগের থাকে, তাহাদিগের ঐরূপ অবস্থা হয়।

* Wisders speim's Structure of man p. 27.

* ভিন্ন ভিন্ন পশুর লেজাংশের খণ্ডাস্থির সংখ্যা বিভিন্ন।

† কদাচিৎ কাহারও থাকে না।

সুতরাং ইহা অনুমান করা যায় যে, মানবের অতি প্রাচীনতম পূর্ব্ব-পুরুষের ঐ খালের স্থান হইতে আরও কয়েকটী [মেরুদণ্ডের] খণ্ডাস্থি বাহির হইত, তাহাকে লেজ বলা যাইত। এক্ষণ খণ্ডাস্থির সংখ্যা কমিয়া গিয়া ৩৩টী মাত্র হওয়ায় মেরুদণ্ড সমস্তই দেহের মধ্যে থাকিবার স্থান পায় ; দেহের বাহিরে আসিবার প্রয়োজন হয় না। এই হেতু এক্ষণে নরগণের লেজাংশ লুপ্ত হওয়া বলিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় ভ্রূণের লেজাংশ স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কেশের কথা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি। দেহের কেশসংস্থান যে ত্রিবিধ প্রণালীতে হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি। তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তৃতীয় প্রণালী মতে, চক্রের দিকে কেশাগ্রভাগ অবস্থিত থাকে। ইহা হইতে বিবেচনা করা যায় যে, ঐ চক্র হইতে কোনও কিছু বাহির হয়। নাভি হইতে নারী বাহির হয় ; এবং গুহ্যের পশ্চাদ্ভাগের উপরের ক্ষুদ্র খাল হইতে পূর্ব্বে পৃষ্ঠবংশের অতিরিক্ত খণ্ডাস্থি বাহির হইয়া লেজ গণ্য হইত ; এক্ষণে খণ্ডাস্থির সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় সেই অংশ নাই।

কেশসংস্থান হইতে আর একটী কথা প্রতীয়মান হয়। নরগণের মুখে, বগলে, বুকে, তলপেটের নীচে কেশ থাকে। মস্তক বাদ দিলে প্রধানতঃ এই সকল স্থানই মানবদেহে কেশ থাকা দেখা যায়। কিন্তু এ সকল স্থানই দেহের সম্মুখ ভাগে। সুতরাং চতুষ্পদের মত হইয়া থাকিলে নীচের দিকে থাকে। উপরের দিক পৃষ্ঠ, কটি, নিতম্ব ও পদকক্ষীর পশ্চাৎ ভাগ। এই সকল স্থানে সচরাচর কেশ থাকে না। চতুষ্পদের মত থাকিলে উপরের দিকে দেহের যে ভাগ থাকে, তাহার মধ্যে কেবল মস্তকের পিছের দিকে কেশ আছে ; আর কোন স্থানেই থাকে না। আর মুখ, বক্ষ ইত্যাদি দেহের যে ভাগ চতুষ্পদ অবস্থায় থাকিলে নীচের দিকে থাকে, তাহাতে কেশ থাকে। বগল নীচের দিকেও না, উপরের দিকেও না ; কিন্তু দেহের বাহুর মধ্যভাগে সুরক্ষিত। পৃষ্ঠ ইত্যাদি উপরের ভাগে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ইত্যাদি সর্ব্বদাই লাগে ; কিন্তু বক্ষ ইত্যাদি নীচের দিকে ও বগলে তাহা লাগে না। এই কারণেই কি বক্ষ ইত্যাদি স্থানে কেশ থাকে এবং পৃষ্ঠ ইত্যাদি স্থানে কেশ থাকে না ? চতুষ্পদ অবস্থায় পৃষ্ঠে বৃষ্টি পড়িলে দক্ষিণ ও বামভাগ দিয়া গড়াইয়া পড়ে। বস্তুতঃও দেখিতে পাই যে, মেরুদণ্ডকে একটী রেখা বিবেচনা করিলে তাহার দুই পার্শ্বে বিপরীত দিকে পৃষ্ঠের কেশাগ্রভাগ চলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদিগের পৃষ্ঠে কেশ আছে, তাহাদিগের ঐরূপ। বাহুর কেশ সংস্থানও ঐরূপ। যদিও এই অঙ্গে আপাততঃ একটু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই অংশে উপরের লিখিত দ্বিতীয় প্রণালী মত কেশ সংস্থান হইয়া থাকে। বাহুতে যে কল্পিত রেখার উভয় দিকে কেশাগ্র চলিয়া যায়, তাহা মানবদেহের সম্মুখভাগে ; সুতরাং চতুষ্পদের মত থাকিলে নীচের দিকে হওয়ায় উহাকে অধিক বৃষ্টিপাত হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু স্কন্ধে ও বাহুমূলে যে সকল বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা বাহুর সম্মুখস্থ ভাগ দিয়াই অধিক গড়াইয়া পড়ে। পশ্চাদ্ভাগে তাদৃশ অধিক পরিমাণে গড়িয়া পড়ে না। ইহা আমি বহুবার বৃষ্টির সময় লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং আপাততঃ এ সংস্কার জন্মিতে পারে যে, চতুষ্পদ অবস্থায় দেহের যে অংশ আকাশের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে থাকে, সে অংশ সচরাচর কেশহীন হইবার কারণ বোধ হয় রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ইত্যাদি। আর ঐ অবস্থায় দেহের যে ভাগ মাটির দিকে অর্থাৎ নীচের দিকে থাকে, তাহা বোধ হয় ঐ সকলের অভাববশতঃ লোমশ হয়। বাস্তবিক পক্ষে যদিও ঐ তিনটীকে কারণ বলা যায় না, তথাপি কেশোৎপত্তির ও কেশ সংস্থানের প্রকৃত কারণ [অর্থাৎ শুক্র শোণিতগত কারণ] রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সহায়তা লাভ করিয়া উপরিভাগকে সচরাচর

কেশহীন করিয়াছে; এবং ঐ সকলের অভাব বশতঃ অথবা সহায়তার অভাবে নিম্নভাগ কেশহীন হইতে পারে নাই, লোমশ আছে;—এইরূপ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

কেশ বস্তুতঃ ত্বকেরই বিকার।* ইহার কারণ [ত্বকেরই ন্যায়] শুক্রশোণিতগত। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শুক্রশোণিতগত কারণ প্রকাশ লাভ করে, অথবা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে, এ ক্ষেত্রের অবস্থাও তাহাই।

কোন কোন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে কেশ, এমন কি কপালেও কেশ জাত হয়। কিন্তু মানব জাতিমধ্যে তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কাহারও বা মস্তক ভিন্ন দেহের অন্যত্র কেশ জাত হয় না। আবার কাহারও জন্মাবধি মস্তকেও কেশ থাকে না। কেশ উৎপত্তির প্রধান কারণ যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহা পশ্চাৎ বিবৃত করিব।

(সাহিত্য) শ্রীশশধর রায়।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

অষ্টম প্রস্তাব—ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রথম অংশ, সৃষ্টিতত্ত্ব।

(হিন্দু মত ও পাশ্চাত্য অহিন্দু মত)

পূর্ব্ব প্রস্তাবের শেষাংশে পাশ্চাত্য প্রমাণ আলোচনা পূর্ব্বক আমরা দেখিয়াছি যে খৃষ্টাবতারের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পারস্য ও তাহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত (যথা মেসোপোটামিয়া, আর্ম্মানিয়া, প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি) দেশ সমূহে আর্য্য ভাষা ভাষী এবং আর্য্যদেব পূজক জাতি বৃ্যহের বসবাস ছিল। বহুশতাব্দী হইতে ঐ সকল দেশে ক্রমশঃ রাজ-নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সহিত ধর্ম্ম বিপ্লবের প্লাবন এরূপ বেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে যে প্রাচীনকালে ঐ ঐ সকল দেশের অধিবাসীগণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, পরিচ্ছদ এবং ভাষার প্রকৃত অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার পরে য়ুদীয় সভ্যতা এবং ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া তথায় সত্যই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। প্রাচীন কাল্‌ডিয়ার অধিবাসীরা সেমেটিক, আর্য্য অথবা অনার্য্য ছিল, এবং তাহারা ঐ দেশেই আদিম কাল হইতে বসতি করিতেছিল কিংবা অন্য কোন দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিল, তাহার কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কীলরূপা লিপিতে যে ভাষার ব্যবহার হইয়াছে, তাহারও প্রকৃত ইতিহাস আজিও নিরূপিত হয় নাই। কালডিয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইল প্রাচীন মিসর সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। মিসরের প্রাচীন অধিবাসীগণের জাতিতত্ত্বের ইতিহাস আজিও গাঢ় অন্ধকারের আবরণে আবৃত রহিয়াছে। ফলতঃ প্রাচ্য চীন জাপান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতীচ্য মিসর ও প্যালেষ্টাইন পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের (প্রাচীন ভারতবর্ষ মহাদেশের) সভ্যতা, ধর্ম্ম ও রাজনীতির ইতিহাস পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া অধ্যয়ন ও অনুধাবন না করিতে পারিলে এই সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। মিসর, মেসোপোটামিয়া এবং ইণ্ডিয়া দেশকে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া বিচার করিলে সে বিচার একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হইবে। মিসরতত্ত্ব (Egyptology) এবং অসুরদেশ-তত্ত্বের (Assyriology) সহিত পারস্য, ইণ্ডিয়া এবং চীন জাপান তত্ত্ব অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে পারিলে তবে "আর্য্য সভ্যতার" প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যাইবে। ভারতকে অবজ্ঞা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল বড় বড় যুক্তি এবং ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা বিকল ও অঙ্গহীন রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং

---

* আধুনিক শরীর তত্ত্বের এই মত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্যেও পাওয়া যায়।

তাহাদিগের দ্বারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্যকাম ব্যক্তির তৃপ্তি হইতেছে না।

প্রাচীন সভ্যজাতি সমূহের ভিতর দেবতত্ত্ব এবং সৃষ্টি-তত্ত্বের সম্বন্ধে কতকগুলি পরম্পরাগত অতি পুরাতন কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। ঐ সকল কিংবদন্তীর তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারিলে প্রাচীন জাতি সমূহের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক বিশেষ মূল্যবান তথ্য জানা যাইতে পারে। এইবারে আমরা এইরূপ তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ হিন্দুশাস্ত্রের মত লইয়া সৃষ্টি তত্ত্বের কথার আলোচনা করিয়া তাহার সহিত পরে বাবিলিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মিসরের প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের কথার তুলনা করিবার মনঃস্থ করিয়াছি। সৃষ্টিতত্ত্বের পরে দেবতত্ত্বের কথা আরম্ভ করিব।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে বেদের ও বৈদিক ব্রাহ্মণাদির স্থান সকলের উর্দ্ধে, তাহার নিম্নে মনুসংহিতার স্থান। আমরাও তাই ঋগ্‌বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া পরে মনুসংহিতার প্রমাণ তুলিব।

ঋগ্‌বেদের অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ-বর্গে, বিখ্যাত "নাসদীয় সূক্তে" সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অতিশয় গম্ভীরভাবে দৈবীভাষায় কথিত হইয়াছে; সেই সূক্ত এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে:—

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজোনো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্ম—
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্‌ ॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥২॥
তমঃ আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে-
ঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্ব মা ইদম্‌।
তুচ্ছ্যোনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্‌ ॥৩॥"

ঋগ্‌বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই নাসদীয় সূক্ত ভিন্ন আরও অনেকগুলি মন্ত্র আছে। বিখ্যাত পুরুষসূক্তেও এই সৃষ্টিতত্ত্বই কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে বেদমন্ত্র বহুশঃ উদ্ধার এবং তাহার ভাষ্য ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ উদ্ধার করিবার স্থানাভাব; কেবল আভাসমাত্র দেওয়ার জন্য এই তিনটি মন্ত্র উদ্ধার করা গেল। অতঃপর বেদানুগামিনী মনুস্মৃতি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। এই তিনটী মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই,—

"তৎকালে অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না; যাহা নাই তাহা তখন ছিল না, যাহা আছে তাহাও তখন ছিল না! এই পৃথিবীও ছিল না উর্দ্ধে আকাশও ছিল না। কে ইহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল? ইহারা কাহার আশ্রয়েইবা ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল তখন কি ছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না; রাত্রি হইতে দিবাকে প্রভেদ করিবার কিছু ছিল না। গাঢ় অন্ধকারের চতুর্দ্দিকে আরও নিবিড়ান্ধকার ঘনীভূত হইলে যেরূপ হয়, তখনকার অবস্থা তদ্রূপ ছিল।" *

* শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ বিদ্যারত্ন প্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা হইতে অনুবাদাংশ উদ্ধৃত হইল।

উল্লিখিত তিনটী মন্ত্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা ছিল, তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা যে এক ব্রহ্ম, তাহাও ঐ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে ও অন্যান্য স্থানে কথিত হইয়াছে। ভগবতী বেদবাণী বলিতেছেন,—

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥"

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥১॥"

ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত।

ইহার অর্থ,—"হে মনুষ্য, যাঁহা হইতে এই বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ইহার ধারণ ও প্রলয় করিয়া থাকেন, যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ এবং যাঁহাতে এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইতেছে, তাঁহাকে জান।৭ হে মনুষ্য, যিনি সমস্ত সূর্য্যাদি তেজঃ পদার্থের আধার এবং এই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জগতের যিনি অদ্বিতীয় পতি এবং যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে উৎপন্ন করিয়াছেন, ঐ পরমাত্মাকে প্রেম ও ভক্তি কর।১।"

বৈদিক এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা নানা ভাবে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীর নানাস্থানে কথিত হইয়াছে এবং তৎসমুদায়কেই আশ্রয় করিয়া মনু মহারাজ বলিতেছেন,— *

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥৫॥
ততঃ স্বয়ংভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসী তমোনুদঃ ॥৬॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥৭॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥৮॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৯॥
আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১০॥
যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে ॥১১॥
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয় মেবাত্ম নো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্ দ্বিধাঃ ॥১২॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিং চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানং চ শাশ্বতম্ ॥১৩॥
উদ্বর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহংকার মভিমন্তারমীশ্বরম্ ॥১৪॥
মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি চ ॥১৫॥
তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষন্নামপ্যমিতৌজসাম।

* সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১০ সর্গে, হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়ে, এবং সমস্ত মহাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে; তন্ত্রেও সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলেরই মূল বৈদিক গ্রন্থে; তাই গ্রন্থবিস্তার ভয়ে সে সকল আলোচনা করিলাম না।

সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে ॥১৬॥
যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ ॥১৭॥
কর্ম্মাত্মনাং চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাং চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞং চৈব সনাতনম্ ॥২২॥
কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমাণি চ ॥২৪॥
লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥৩১॥
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং চ বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩২॥ *
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তো দতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥৪৩॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পাঃ নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানিচৈবং প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকাণি চ ॥৪৪॥
স্বেদজং দংশমশকং যুকামক্ষিক মৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্ ॥৪৫॥
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ড প্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ ॥৪৬॥

ইত্যাদি—মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়ে।

অনুবাদ। "এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়; কোন লক্ষণাদ্বারা অনুমেয় নয়; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। ৫। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ (১) মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া, সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক (২) হইয়া প্রকাশিত হন। ৬। যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত ও সনাতন, সেই সর্ব্বভূতের অচিন্ত্যপুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৭। তিনি স্বকীয় শরীর (৩) হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জলের (৪) সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন। ৮। অর্পিত বীজ সুবর্ণ বর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হইল; ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ৯। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে জলকে (৪) 'নারা' বলে, এবং 'নারা' ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে 'নারায়ণ' বলে। ১০। যিনি আদি কারণ, অব্যক্ত, নিত্য এবং সদসদাত্মক, তৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত ঐ প্রথম পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। ১১। ভগবান্ ব্রহ্মা, সেই

* "ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ ॥৫॥" পুরুষসূক্ত, তুলনা করুন।

(১) স্বয়ম্ভু=উৎপত্তিরহিত, স্বয়ং প্রকট, যাঁহার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই।

(২) "তমোনুদ" শব্দে কুল্লুক ভট্ট "প্রকৃতি-প্রেরক" বলিয়াছেন, মেধাতিথি এবং গোবিন্দরাজ তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক বলিয়াছেন।

(৩) শরীর=এস্থলে জগতের উপাদান কারণস্বরূপ 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান' তত্ত্বকেই ভগবানের শরীর বলা হইয়াছে; মেধাতিথি বলিয়াছেন "প্রধান মেব তস্যেদং শরীরম্"। ইহার পরের ১৭শ শ্লোকের অর্থ দেখুন।

(৪) জল=এস্থলে মূলে "অপ" শব্দ আছে। এই 'অপ' শব্দের অর্থে রসায়ন শাস্ত্রের H^2O চিহ্নের দ্বারা সর্ব্বপরিচিত নদী হ্রদ সমুদ্রাদির জল নহে। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে "অপ্‌তত্ত্ব" মাত্র; পরমাত্মা প্রকৃতিকে যে সময়ে কার্য্যোন্মুখ করিয়া সৃষ্টি উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে প্রকৃতির পরিণাম স্বরূপ যে তত্ত্ব প্রথমে প্রকটিত হয়, উহাকেই "অপ" তত্ত্ব বলা হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। সাংখ্য দর্শন শাস্ত্রে দেখা যায় যে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম রূপে 'মহত্তত্ত্বের' উদ্ভব হয়,—"প্রকৃতে মহান্"—এই মহত্তত্ত্ব-

ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মমানের সংবৎসর কাল (৫) বাস করিয়া শেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন।১২। তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদি লোক ও অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক, ও চিরস্থায়ী সমুদ্রসকল (৬) স্থাপিত করিলেন ।১৩। ব্রহ্মা পরমাত্মস্বরূপ সদসদাত্মক মনের উদ্ধার করিলেন; মনঃস্ফুরণের পূর্ব্বে অহং অভিমানী সর্ব্বকর্ম্মাত্মক অহংকারতত্ত্ব প্রস্ফুরিত করিয়াছিলেন।১৫। অহঙ্কারতত্ত্বের পূর্ব্বে (আত্মার প্রথম অভিব্যক্তি) মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল—এ সমুদায়ই সত্ত্বরজস্তমোময়। তিনি ক্রমে ক্রমে বিষয়গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিলেন। ।১৫। তাহাদিগের মধ্যে অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টির সূক্ষ্মতম অবয়বকে তদীয় বিকার —ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের—সহিত যোজনা করিয়া তিনি দেব মনুষ্যতীর্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন ।১৬। প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের মূর্ত্তি সম্পাদক এই ছয়টী সূক্ষ্ম অবয়ব বক্ষ্যমান পঞ্চভূতাদিকে কার্য্যরূপে আশ্রয় করে বলিয়া মনীষিগণ, তদীয় মূর্ত্তিকে 'শরীর' বলিয়া থাকেন ।১৭। (৭) সেই প্রভু, কর্ম্মাত্মভূত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদি দেবগণ, সাধ্যনামক সূক্ষ্মদেবসমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি

কেই এখানে 'অপ্ তত্ত্ব' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। আর্য্য সৃষ্টিতত্ত্বে "আপঃ" শব্দকে সর্ব্বসৃষ্টির মূলীভূত পঞ্চভূতেরই প্রথম সূক্ষ্মাবস্থারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋগ্ বেদ দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে

"আপো হ যদ্‌বৃহতী বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা কানয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্তাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

এই "আপঃ" শব্দও এইরূপ যোগরূঢ় অর্থে গৃহীত হইয়াছে, এবং ঋগ্ বেদীয় নাসদীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের "অম্ভঃ" এবং তৃতীয় মন্ত্রের "সলিল"ও ঐরূপ অর্থ সূচনা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। পুরুষসূক্তের ১৭শ মন্ত্রের "অদ্ভ্যঃ" শব্দেও ঐ অর্থ প্রকটিত হইতেছে।

(৫) ব্রহ্মার আয়ুষ্কালকে এককল্প বলে; উহার শতভাগের একভাগকে এক পরিবৎসর বলে। সাধারণ মনুষ্য যেমন আমাদের গণনায় শতবৎসর জীবিত থাকে, (শতায়ুর্বৈ মনুষ্যঃ) তদ্রূপ ব্রহ্মা ও তাহার হিসাবের শতবৎসর বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া কল্পনা করা হয়; মনুষ্য শিশুও যেরূপ আমাদের লৌকিক গণনার দশমাস (প্রায় একবৎসর) গর্ভে থাকিয়া প্রসূত হয়, ব্রহ্মা ও তদ্রূপ তাঁহার আয়ুর শতভাগ বা একবৎসর অন্তে বাস করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পিত হইয়াছে। (৬) চিরস্থায়ী সমুদ্র—আমাদের এই লবণ সমুদ্র Ocean নহে; ইহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানস্বরূপ অনন্ত আকাশ পুঞ্জীভূত জগৎ-সৃষ্টির উপাদান মাত্র। বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বে আকাশকে পুনঃ পুনঃ অর্ণব, সমুদ্র, সলিল ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

(৭) মনুসংহিতার সৃষ্টিতত্ত্ব বৈদিক প্রণালীক্রমে বর্ণিত হইয়াছে এবং মহর্ষি কপিল কৃত সাংখ্য দর্শনেও ঠিক এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সৃষ্টিতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যার স্থানাভাব; যেহেতু এই সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিতে গেলে সহস্র পৃষ্ঠার এক প্রকাণ্ড পুস্তকেও শেষ হইবার সম্ভাবনা কম। বন্ধুবর পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম, এ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক) তাঁহার "উপনিষদের উপদেশ" নামক তিনখণ্ড উপাদেয় পুস্তকে এই সৃষ্টিতত্ত্বের শঙ্করানুমোদিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিলে উপকৃত এবং সন্তুষ্ট হইবেন, আশা করি। এস্থলে আমরা মনুসংহিতার আরও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ১৭শ শ্লোকের নয় হইতে, "আকাশাদি (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা) মহাভূত সকল অবকাশাদি স্ব স্ব কর্ম্মের সহিত (আকাশের অবকাশ, বায়ুর স্পর্শ ও গতি বা স্পন্দন, তেজের রূপ, জলের রস ও মৃত্তিকার গন্ধ) পঞ্চ তন্মাত্ররূপে অবস্থিত (আকাশের শব্দ তন্মাত্র, বায়ুর স্পর্শ তন্মাত্র, তেজের রূপ তন্মাত্র, জলের রস তন্মাত্র, ও মৃত্তিকার গন্ধ তন্মাত্র) ব্রহ্ম হইতে এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি হেতু

সনাতন যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিলেন ।২২। কাল, কালের বিশেষ বিশেষ বিভাগ সকল, নক্ষত্রসমূহ, গ্রহগণ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, সমভূমি ও বিষমভূমি, (সৃষ্টি করিলেন) ।২৪। পৃথিব্যাপি লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিলেন ।৩১। (৮) সেই প্রভু আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধেক অংশে নারী হইলেন এবং সেই নারীতে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন ।৩২। জীবগণের মধ্যে পশু, মৃগ, হিংস্র জন্তু, দুইপংক্তি-দন্তবিশিষ্ট জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য,ইহারা জরায়ুজ অর্থাৎ গর্ভকোষে জন্মগ্রহণ করে ।৪৩। (৯) পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং এই প্রকারের নানাবিধ স্থলজ ও জলজ প্রাণী অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।৪৪। দংশ, মশক, যূক, মক্ষিক, মৎকুণ,—ইহারা স্বেদজ,—ইহারা এবং ইহাদের তুল্য অপর কতকগুলি প্রাণী উষ্মা হইতে জাত হইয়া থাকে ।৪৫। উদ্ভিদ্ সমুদায় স্থাবর; তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে এবং কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যাহারা বহু পুষ্পফলযুক্ত হইয়া থাকে এবং ফল পাকিলেই মরিয়া যায়,তাহাদিগকে ওষধি বলে;—যথা ধান্য, যব ইত্যাদি ।৪৬। ইত্যাদি। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ হইতে গৃহীত)।

অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে মনুসংহিতা হইতে সৃষ্টি বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুশীলন করিলে এই মূল তত্ত্ব প্রতীত হয় যে এক অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের ইচ্ছা অথবা কামনার ফলে তাঁহার মহিমা হইতেই এই চরাচরময়ী সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের মত স্থূলভাবে দেখিলে মনে হয় যে জগতের উপাদানকারণ স্বরূপা প্রকৃতি সৃষ্টির প্রথম হইতেই বর্ত্তমান ছিলেন, পরে পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ তাঁহার বিকার অথবা পরিণাম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে;—অর্থাৎ পুরুষ জগতের উপাদান স্বরূপ প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র ভাবেই পাইয়াছিলেন,—আর বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের (উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী ও বেদান্ত দর্শন) মতানুযায়ী মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মই স্বয়ং উপাদান কারণ প্রকৃতি এবং নিমিত্ত কারণ ঈশ্বররূপে সৃষ্টির উৎপাদন করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ নাই,—সাংখ্যশাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র প্রকৃতির পরিণাম লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বয়ংই উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ

অব্যয় মন ও ইচ্ছাদ্বেষাদি স্বকীয় সূক্ষ্ম অবয়বের সহিত অহংকাররূপে অবস্থিত (অহং=আমি কার=তাহার অস্তিত্ব বোধ—'আমি আছি' আত্মার এই বোধ) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন ।১৮। মহত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব, এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি অনন্ত কার্য্যক্ষম পুরুষতুল্য পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে,—অবিনাশী কারণ হইতে এইরূপ অস্থির কার্য্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে ।১৯। আকাশাদি ভূত সকলের মধ্যে পর পর প্রত্যেকে পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণগ্রহণ করে। যে যত সংখ্যায় গুণিত,তাহার তত গুণ; ১ম ভূত আকাশের ১ গুণ শব্দ; ২য় ভূত বায়ুর ২ গুণ,শব্দ ও স্পর্শ; ৩য় ভূত অগ্নির ৩ গুণ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; ৪র্থ ভূত জলের ৪গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ৫ম ভূত পৃথিবীর ৫ গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ।২০। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ হইতে গৃহীত)

(৮) প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তের একাদশ মন্ত্র "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকৃতঃ। উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাত্-শূদ্রো অজায়ত।" তুলনা করুন।

(৯) ঐ সূক্তের অষ্টম মন্ত্র "তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাবজাতা অজাবয়ঃ।" তুলনা করুন। এই মন্ত্রে স্পষ্ট "অশ্ব এবং যে সকল পশুর দুই পাটি দাঁত (গর্দভ, উষ্ট্র ইত্যাদি) তাহারা জন্মগ্রহণ করিল" লিখিত হইয়াছে; এবং ৬ষ্ঠ মন্ত্রে "পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।" গ্রাম্য ও আরণ্য পশু সৃষ্টির কথা রহিয়াছে।

হইয়া কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাহার সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদ্ এক বিখ্যাত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭॥"

প্রথম মুণ্ডকে, প্রথম খণ্ড।

"উর্ণনাভি (মাকড়সা) যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে; পৃথিবীতে যেরূপ ওষধি সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম সমূহ সমুৎপন্ন হয়; সেইরূপ সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।৭।" (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অনুবাদ, লোটাস লাইব্রেরী সিরিজ)।

এই আর্য্য সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত তুলনা করিবার জন্য এইবার আমরা পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে এ সম্বন্ধে চিরাগত ধারণা কিরূপ, তাহার পরিচয় বাইবেল, কোরাণ এবং মিসর ও মেসোপোটামিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব একণে জগতের সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা প্রথমে বাইবেল লইয়াই উপস্থিত হইতেছি।

"প্রথমেই ঈশ্বর স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন (১) এবং পৃথিবী আকাররহিত এবং শূন্যময় ছিল; এবং অন্ধকার সমুদ্রের উপর বিদ্যমান ছিল। এবং ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিলেন। (২) এবং ঈশ্বর বলিলেন 'আলোক হউক'; এবং আলোক হইয়াছিল। (৩) এবং ঈশ্বর আলোক দেখিলেন, (এবং ভাবিলেন) যে ইহা উত্তম হইয়াছে; এবং ঈশ্বর আলোককে অন্ধকার হইতে পৃথক করিলেন। (৪) এবং ঈশ্বর আলোকের নাম রাখিলেন 'দিবা' এবং অন্ধকারের নাম করিলেন রাত্রি। এবং সন্ধ্যা এবং উষা সেই দিন প্রথম হইল। (৫) এবং ঈশ্বর বলিলেন, জলরাশির মধ্যভাগে আকাশ (অবকাশ) হউক, এবং ইহা জলরাশি হইতে জলরাশিকে পৃথক্ করুক (৬) এবং ঈশ্বর আকাশকে উৎপাদন করিলেন, এবং যে জলরাশি আকাশের নিম্নে রহিল, তাহাদিগকে আকাশের উপরিস্থিত জলরাশি হইতে পৃথক করিলেন, এবং তাহাই হইল (৭) এবং ঈশ্বর আকাশের নাম স্বর্গ রাখিলেন। এবং দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা এবং উষা হইল (৮) এবং ঈশ্বর বলিলেন, স্বর্গের নিম্নে অবস্থিত জলরাশি একস্থানে একত্রিত হউক, এবং শুষ্ক ভূমি বাহির হউক; এবং তাহাই হইল (৯) এবং ঈশ্বর শুষ্ক ভূমিকে 'পৃথিবী' বলিলেন; এবং একত্রিত পুঞ্জীভূত জলরাশিকে 'সমুদ্রসমূহ' বলিলেন; এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে ইহা উত্তম হইয়াছে (১০) এবং ঈশ্বর বলিলেন, পৃথিবী তাহার উপরে ঘাস, বীজ উৎপাদক উদ্ভিদ্ (ওষধি) নির্দ্দিষ্ট ফলোৎপাদক ফলবৃক্ষ (যাহাদের ফলের ভিতরে তাহাদের বীজ থাকে) উৎপাদন করুক; এবং তাহাই হইল (১১) এবং পৃথিবী ঘাস, নির্দ্দিষ্ট বীজোৎপাদক উদ্ভিদ্ (ওষধি) এবং নির্দ্দিষ্ট ফলোৎপাদক ফলবৃক্ষ (যাহাদের ভিতরে সেই জাতীয় বৃক্ষের বীজ থাকে) উৎপাদন করিল; এবং ঈশ্বর দেখিলেন ইহা উত্তম হইয়াছে (১২) এবং তৃতীয় দিন সন্ধ্যা এবং উষা হইল (১৩) এবং ঈশ্বর বলিলেন, দিবাকে রাত্রি হইতে পৃথক্ করিবার জন্য স্বর্গের আকাশে আলোক হউক এবং তাহারা ঋতু, দিবস এবং বৎসর পরিচয়ের চিহ্নস্বরূপ হউক (১৪) এবং পৃথিবীতে আলোক দিবার জন্য তাহারা স্বর্গের আকাশে আলোক-স্বরূপ হউক; এবং তাহাই হইল। (১৫) এবং ঈশ্বর দুইটি প্রধান আলোকের সৃষ্টি করিলেন; উহার মধ্যে বৃহত্তরকে দিবার অধিপতি এবং ক্ষুদ্রতরকে রাত্রির অধিপতি হইবার জন্য (নিয়োগ

করিলেন); তিনি নক্ষত্রাবলীরও সৃষ্টি করিলেন (১৬) *

এবং ঈশ্বর বলিলেন, জলরাশি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চরণশীল জীবসমূহ, এবং পক্ষীগণকে (যাহারা পৃথিবীর ঊর্দ্ধভাগে

---

* 1. "In the beginning God created the heaven and the earth. 2. And the earth was without form, and void; and darkness *was* upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 3. And God said, Let there be light: and there was light. 4. And God saw the light, that *it was* good; and God divided the light from the darkness. 5. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And first the evening and the morning were the first day. 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. 7. And God made the firmament, and divided the waters which *were* under the firmament from the waters which *were* above the firmament, and it was so. 8. And God called the firmament Heaven. And the evening and morning were the second day. 9. And God said, let the waters under the heaven be gathered togethers unto one place, and let the dry *land* appear: and it was so. 10. And God called the dry *land* Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God said that *it was* good. 11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, *and* the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed *is* in itself, upon the earth; and it was so. 12. And the earth's brought forth grass, *and* herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed *was* in itself, after his kind; and God saw that *it was* good. 13. And the evening and morning were the third day. 14. And God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years. 15. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth; and it was so: 16. And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. × × 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl *that* may fly above the earth in the open firmament of heaven. 21. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth, abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind; and God said that *it was* good... 24. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. 25. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth

এবং (স্বর্গের) আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। উৎপন্ন করুক (২০) এবং ঈশ্বর বৃহৎ তিমিসমূহ, এবং প্রত্যেক

---

upon earth after his kind : and God saw that *it was* good. 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 27. So God created man in his own image, in the image of God created he him ; male and female created he them. 28: And God blessed them, and God said into them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it : and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." **Genesis**, Ch. I.

7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life ; and man became a living soul. 18. And the Lord God said, *It is* not good that the man should be alone : I will make him an half meet for him. 21. And Lord God caused a deep sleep fall upon Adam, and he slept ; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead there of ; 22. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man."
Genesis, Ch. II.

সঞ্চরণশীল জীব, যাহাদিগকে জলরাশি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক পক্ষযুক্ত পক্ষী (যাহাদের হইতে তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর জীব উৎপন্ন হইবে) সৃষ্টি করিলেন ; এবং ঈশ্বর দেখিলেন তাহা উত্তম হইয়াছে (২১) এবং ঈশ্বর বলিলেন, পৃথিবী স্ব স্ব শ্রেণীর জীব উৎপাদনকারী জীবজন্তু, গবাদি প্রাণী,সরীসৃপ এবং ভূচর প্রাণী উৎপাদন করুক ; এবং তাহাই হইল (২৪) এবং স্ব স্ব শ্রেণীর উৎপাদক ভূচর প্রাণী, গবাদি পশু,এবং সরীসৃপ সৃষ্টি করিলেন ; এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে ইহা উত্তম হইয়াছে (২৫) এবং ঈশ্বর বলিলেন, আমার মত, আমার আকারে মনুষ্য সৃষ্টি করি ; এবং তাহারা সমুদ্রের মৎস্য, আকাশের পক্ষী, পশু, সরীসৃপ, এবং সমুদয় পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিবে (২৬) এইরূপে, ঈশ্বর মনুষ্যকে তাঁহার নিজের আকার অনুসারে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের আকারে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিলেন ; তিনি তাহাদের পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিলেন (২৭) এবং ঈশ্বর মনুষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর, তোমরা বহু হও, পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর, এবং তাহাকে শাসন কর, এবং সমুদ্রের মৎস্য, আকাশের পক্ষী এবং যাবতীয় ভূচর প্রাণীর উপর আধিপত্য কর। (২৮) "জেনিসিস্ অথবা সৃষ্টিবিবরণ পুস্তক, প্রথম অধ্যায়।"

"এবং ঈশ্বর ভূমির ধূলি হইতে মনুষ্যকে গঠন করিলেন এবং তাহার নাসিকায় প্রাণবায়ু প্রয়োগ করিলেন, এবং মনুষ্য সজীব আত্মা হইল (৭) এবং ঈশ্বর বলিলেন, মনুষ্য একাকী থাকিবে তাহা ভাল নহে ; আমি তাহার জন্য এক সাহায্যকারিনীর সৃষ্টি করিব (১৮) এবং ঈশ্বর আডামকে (উক্ত মনুষ্যকে) গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিলেন এবং সে নিদ্রিত হইল ; এবং ঈশ্বর উহার একখানি পঞ্জরস্থি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে মাংস দিয়া সেই স্থান পরিপূর্ণ করিলেন (২১)

এবং ঐ পঞ্জরাস্থি, যাহা প্রভু ঈশ্বর মনুষ্যের দেহ হইতে লইলেন, তাহাকে নারী গড়িলেন এবং তাহাকে ঐ মনুষ্যের নিকট (পত্নীত্বের নিমিত্ত) আনিলেন (২২)"—"জেনিসিস" অথবা সৃষ্টিবিবরণ পুস্তক, দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরাতন বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। আর্য্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আমরা অতি সংক্ষেপে বাক্য উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে ভগবানের কর্তৃক সূর্য্য চন্দ্র, দিন রাত্রি ইত্যাদির সুস্পষ্ট সৃষ্টিজ্ঞাপক কোন মন্ত্র উদ্ধার করা হয় নাই। ফলতঃ অর্য্যশাস্ত্রের অগাধ সমুদ্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অগণ্য রত্ন বিদ্যমান আছে; আমরা ভয়ে ভয়ে কেবল কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। রাত্রি, দিন, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টির বর্ণনা, দ্বিজ সাধারণের সন্ধ্যা বন্দনায় নিত্য উচ্চার্য অপমর্ষণ মন্ত্রে সুন্দররূপে আছে, যথা—

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ১ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী ॥ ২ ॥
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩ ॥" ঋগ্বেদ, ১০মণ্ডল, ১৯০ সূক্ত।

মর্ম্মানুবাদ। "প্রলয়কালে একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, তৎকালে কেবল রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকারাবৃত সমস্ত জগৎ থাকে। প্রলয়াবসানে জলপূর্ণ সমুদ্রে (এই জলপূর্ণ সমুদ্র, সাধারণ জলপূর্ণ সাগর নহে, সৃষ্টির উপাদান কারণ স্বরূপ মহাকাশ) সমস্ত প্লাবিত থাকে, সেই জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সমস্ত জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া দিবা ও রাত্রি উভয় সম্পাদক চন্দ্র ও সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তদবধি দিবা ও রাত্রি বিভাগ হয়, এবং তদ্দ্বারা সংবৎসরাদির ব্যবস্থা হয়, অনন্তর ব্রহ্মা পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও সমস্ত লোক নির্ম্মাণ করিলেন।" পণ্ডিত ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্নের অনুবাদ হইতে গৃহীত।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোরাণ বাইবেলেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কোরাণের ৪১শ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য স্থানে বিপ্রকীর্ণরূপে সৃষ্টির বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলের উদ্ধৃত অংশে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত কোন মূল্যবান সংবাদ কোরাণে আমরা পাই নাই;—সুতরাং তাহার ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা অনুবাদ তুলিয়া প্রস্তাবের দীর্ঘতা বাড়াইবার আবশ্যক নাই। পাঠকগণের মধ্যে কোরাণ এবং হদীস শাস্ত্রের অধিকারী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বড় উপকার হইবে।

অতঃপর প্রাচীন ক্যালডিয়া দেশের সৃষ্টি বিবরণ আরম্ভ করা যাউক। সে দেশের প্রাচীন পরম্পরাগত বার্ত্তা এই:—"যে সময়ে, যাহাকে স্বর্গ বলা যাইত, ঊর্দ্ধে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, এবং যে সময়ে নিম্নের কোন বস্তুই 'পৃথিবী' এই নামে পরিচিত হয় নাই, সেই সময়ে "অপসু" অথবা মহাসাগর, যে উহাদের প্রথম জনক ছিল, এবং কেয়াস-টিয়ামট্, যে সকলকে প্রসব করিয়াছিল, উভয়ে উভয়ের জল একত্র মিশ্রিত করিতেছিল, তৃণসমূহ তখন সম্মিলিত হয় নাই, উদ্ভিদ তখন ফল উৎপাদন করে নাই'।* যে সময়ে দেবগণের

* "In the time when nothing which was called heaven existed above, and when nothing below had as yet received the name of earth, Apsu, the Ocean, who first was their father, and Chaos—Tiamat, who gave birth to them all, mingled their waters in one, reeds

সৃষ্টি হয় নাই, কেহই তখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই, যখন তাঁহাদের নামকরণ হয় নাই, অথবা নিয়তি কর্ত্তৃক তাঁহাদের নিজ নিজ ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, দেবগণ তখন প্রকটিত হইলেন। লখ্‌মু এবং লখমু প্রথমেই আবির্ভূত হইলেন এবং অনেকদিন ধরিয়া বাড়িতে লাগিলেন; তাহার পর আন্‌সার এবং কিষার উৎপন্ন হইলেন। দিবসের উপর দিবস যোগ হইতে লাগিল এবং বৎসরের উপর বৎসর পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল; অনু, ইন্‌লিল এবং য়া ক্রমশঃ উৎপন্ন হইল, কারণ আন্‌সার এবং কিষার উহাদিগকে উৎপাদন করিলেন।' * । য়া দেবের পুত্র মর্দ্দুক টিয়ামটের (দেবী অথবা দানবী) সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন এবং তিনি টিয়ামটের মৃতদেহ দ্বিখণ্ড করিলেন, যেমন লোকে শুকাইবার উদ্দেশ্যে মাছকে চিরিয়া দুই খণ্ড করে; তাহার পর তিনি একার্দ্ধ উপরে ঝুলাইলেন, এবং উহা স্বর্গ (বা আকাশ) হইল; এবং অপরার্দ্ধকে তিনি তাঁহার পদদ্বয়ের নিম্নে বিস্তৃত করিয়া দিলেন, তাহার দ্বারা পৃথিবী গঠিত হইল;—এবং এই প্রকারে লোকের পরিচিত জগৎকে তিনি সৃষ্টি করিলেন †। এই প্রকারে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, সাগর ও পর্ব্বতাদির সৃষ্টি এবং তাহাদের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া মর্দ্দুক দিবা, রাত্রি মাস ও বৎসরাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ গ্রহগণের আকার, অবস্থান ও গতি এবং নক্ষত্রাদির নাম নিরূপণ করিয়া আকাশের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করিলেন ‡।

আকাশের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া মর্দ্দুক পৃথিবীকে জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। এই জীব সৃষ্টি ব্যাপারে দেবগণ তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উদ্ভিজ্জ দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং "অনেক শ্রেণীর জীবের সৃষ্টি করিলেন; ভূচর গবাদি গ্রাম্য এবং আরণ্য পশু, এবং সরীসৃপাদির সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদিগকে জীব দান করিলেন" ¶।

মেসোপোটামিয়ার দক্ষিণপ্রান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উক্তরূপ জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধে চিরাগত গল্প চলিয়া আসি-

which were not united, rushes which bore no fruit."

Prof : Maspero's The Dawn of civilization, Ancient Chaldæa, Ch. VII p. 537.

* "In the time when the gods were not created, not one as yet, when they had neither been called by their names, not had their destinies been assigned to them by fate, Gods manifested themselves. Lakhmu and Lakhamu were the first to appear, and waxed great for ages ; then Anshar and Kishor were produced after then. Days were added to days, and years were heaped upon years ; Anu, Inlil, and Ea were born in their turn, for Anshor and Kishar had given them birth." Ibid, p p 587—538.

† He (Marduk or Merodach) Split it (body of the goddess or demonen Tiamat) in two as one does a fish for drying ; then he hung up one of the halves on high, which became the heavens ; the other half he spread under his feet to form the earth, and made the universe such as men have since known it." Ibid. p, 542.

‡ Ibid p. p. 542—545.

¶ "They (the god) covered the soil with verdure, and all collectively made living beings of many kind. The cattle of the fields, the wild beasts of the fields, the reptiles of the fields, they fashioned them and made of them creatures of life." Ibid p. 545.

তেছে। এইরূপ প্রবাদ আরও অনেক থাকিবার সম্ভাবনা,—কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তৎসম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পান নাই; হয় তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা এখনও কোন ধ্বংসাবশেষ প্রাসাদের স্তূপের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে;—এমন কি ঐ সকল লিপিপূর্ণ ইষ্টক-ফলক হয়ত য়ুরোপের কোন যাদুঘরের অজ্ঞাত কোণে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। প্রোফেসর মেসপেরো অনুমান করেন যে এই দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ ঈশ্বরের অথবা দেবগণের দ্বারা (উপাদান কারণ ভিন্ন) হঠাৎ জগৎ সৃষ্টির বিবরণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনাদি ও পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান উপাদান কারণ স্বরূপ মূল ভূতাদিকে গতিশীল করাই 'সৃষ্টি', এবং সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল প্রলয়াবস্থায় ভাসমান বিশৃঙ্খল নানা প্রকার উপাদান কারন সমূহকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় সুসম্বদ্ধ ভাবে আনয়ন-কর্ত্তা মাত্র *।

এসিরিয়া (পৌরানিক অসুর দেশ, গ্রীক অসুরিয়া Assuria) এবং বাবিলোনিয়া (বৌদ্ধজাতকের বাবেরু) দেশের প্রাচীনতর নাম কালডিয়া ছিল, বলিয়া বোধ হয়; কোন কোন মতে কেবল বাবিলোনিয়া দেশকেই প্রাচীনেরা কালডিয়া বলিতেন। এই প্রাচীনদেশে সেই পুরাতন কালে অর্দ্ধশুষ্ক মৃৎফলকে লৌহলেখনীদ্বারা আঁচড়াইয়া লিখিবার রীতি ছিল এবং পরে ঐ মৃৎফলকগুলিকে পোড়াইয়া ইষ্টক অথবা টালির আকারে পরিণত করা হইত। পেরেকের ঊর্দ্ধভাগের আকারের ঐ লিপিকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা Nail headed character বলিয়াছেন, আমরা উহারই অনুকরণে "কীলরূপা লিপি" বলিয়া থাকি। ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ এবং ইংরাজ পণ্ডিতেরা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে এই সকল মৃৎফলকগুলির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহারাই এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দেশের ধ্বংসশেষ মহানগরের স্তূপের নীচে এইরূপ বহু মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছিল এবং এক্ষণে ঐগুলি য়ুরোপের অনেক নগরের বিখ্যাত যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে। পাকা টালির মত এই সকল মৃৎফলক পুঁথির পাতার মত ব্যবহৃত হইত এবং এইরূপ মৃৎফলকের পুঁথি পাকা বাড়ীর দেওয়ালের কোলঙ্গা অথবা তাকে (recess) সাজাইয়া লাইব্রেরী করা হইত। এইরূপ লাইব্রেরী যে দেশের ধ্বংসশেষ নগরে আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহাদেরই সাহায্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই সকল তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এদেশের প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য সুযোগ্য দেশীয় পণ্ডিতের সাহায্যে পাঠ করিয়াও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক স্থলেই যেরূপ মারাত্মক ভুল করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে তাঁহারা অসুরদেশের প্রাচীন সাহিত্যের অর্থ বুঝিতেও অনেক গোলমাল করিয়াছেন। মিসর দেশের চিত্রলিপি সম্বন্ধেও আমাদের এই ধারণা হয়। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ আমাদের দেশের লোকের পক্ষে যখন ঐ সকল প্রাচীন দেশের বিবরণ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনা করা অসম্ভব, তখন অগত্যা আমাদিগকে সাহেবদের তরজমার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের দেশের কমলার কৃপাপাত্র অভিজাত সজ্জনগণ (অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত) যখন তাঁহাদের স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের সেবায় অর্থব্যয় করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ, তখন তাঁহারা যে কোন কালে এসিয়া, আফ্রিকা এবং য়ুরোপাদি মহাদেশের প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কারের

* "They do not seem to have conceived the possibility of an absolute creation; ...the creation for them was merely the setting in motion of pre-existing elements, and the creature only an organizer of the various materials floating in chaos." Ibid. p. 546.

নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন, সে কথা মনে করাও দুরাশা। তবুও মনে হয় যে যদি ভারতে অর্থসামর্থ্যশালী কোন প্রাচীন-তত্ত্বান্বেষণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইত, তাহা হইলে জগতের সভ্যতার ইতিহাস অনেক দিন পূর্ব্বেই সুষ্টু এবং প্রকৃতরূপে রচিত হইতে পারিত এবং এখন যে সকল তত্ত্ব অন্ধকারময় দারুণ দুর্ভেদ্য রহস্যরূপে পণ্ডিতগণের চক্ষুকে পরাস্ত করিতেছে, তখন তাহা সুস্পষ্ট দিবালোকের দৃশ্যের মত সুন্দররূপে প্রতিভাত হইতে পারিত। কিন্তু হায়! এ আক্ষেপ করাই বৃথা বোধ হইতেছে!

অসুর দেশের কথা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে মিশ্র অথবা মিসরদেশের প্রাচীন সৃষ্টিকাহিনীর অবতারণা করিব। মিসরদেশের সৃষ্টিকর্ত্তাও (একমাত্র পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত) শূন্য হইতে সৃষ্টির বিকাশ করেন নাই; তিনিও অনাদিকাল হইতে অবস্থিত ভূতগ্রাম লইয়াই সৃষ্টির বিকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টির মূল তত্ত্ব অব্যক্ত অথবা সুপ্ত অবস্থায় কতকাল হইতে সর্ব্বদাই "ন" অথবা অন্ধকারময় সলিলগর্ভেই অবস্থিত ছিল *। মিসরদেশের পূর্ব্বদিগ্বিভাগস্থ প্রদেশে সৃষ্টি প্রকরণ এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা, :—'সৃষ্টির দিবসে সু নামে এক নূতন দেব সেই অনাদি প্রলয় সলিল হইতে আবির্ভূত হইয়া দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ ভূদেব এবং দ্যুদেবীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার পর সৃষ্টি আরম্ভ হইল † "ভূ" দেবের মিসরীয় নাম 'শিবু' এবং "দ্যু" দেবীর নাম 'নুইট' এবং প্রলয় পয়োধির নাম 'নু' অথবা ন। সূর্য্যই ঐ নূতন "সু" দেব এবং ক্রমশঃ সূর্য্যই নানা নামে মিসরের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ‡। সূর্য্যই আবার চন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া মন্ত্রবলে জগৎসৃষ্টির সহায় করিয়াছেন; তিনিই যথাযথরূপে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবদেবীর বশীকরণ হইতে জগতের সর্ব্বকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রের নাদ ব্রহ্ম এবং মন্ত্রশক্তির সহিত মিসরের মন্ত্রশক্তির তুলনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ ইচ্ছা বা কামনা সহায়ে এবং শব্দের সহায়ে সৃষ্টির রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে, মিসরের শাস্ত্রে তাহার যেন ঠিক প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় ¶। প্রফেসার মেসপেরো মিসরের সৃষ্টিতত্ত্ব দেবতত্ত্বের সহিত মিশ্রিতভাবে তাঁহার পুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠা হইতে ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। দেবতত্ত্ব আলোচনাকালে পুনশ্চ ইহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

* "Not that he (the god) had evoked it (creation) out of nothing; there was as yet no concept of nothingness, and even to the most subtle and refined of primitive theologians creation was only a bringing of pre-existents elements into play. The, latest germs of things had always existed, but they had slept for ages in the bosom of the Nu (ন?) of the dark waters." Ibid p. 127.

† "There it was admitted that in the beginning earth (Shibu) and sky (Nuit) were two lovers lost in the Nu, fast locked in each others embrace, the god lying beneath the goddess. On the day of creation a new God, Shu, came forth from the primæval waters, slipped between the two, and seizing Nuit with both hand, lifted her above his head without stretched arms." Ibid p. 128.

‡ Ibid p. p. 145—146.

¶ কাল্‌ডিয়া দেশের মর্দ্দুক (Marduk or Merodach) দেব ও সূর্য্য। আমাদের বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্যের অপর নাম "সবিতৃ" প্রসব করা অর্থ যুক্ত "সু"

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রাচীন মিসর এবং কাল্‌ডিয়া দেশের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে চিরগত ধারণা পুরাতন বাইবেলের বর্ণিত ধারণা অপেক্ষা অনেক পুরাতন। আমাদের নিজের বিশ্বাস যে আর্য্য বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব মিসর ও কালডিয়ার কাহিনী অপেক্ষাও বহু পুরাতন। দুঃখের বিষয় যে প্রাচ্যের চীনজাপান এবং প্রতীচ্যের পারস্য দেশের প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের কোন কাহিনী সম্বন্ধে আমরা একবারে অজ্ঞ,—এমন কি তৎসম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় উত্তম ও বিশ্বাসযোগ্য কোন পুস্তকের অস্তিত্বও জানি না। কালডিয়া, মিসর এবং পালেষ্টাইন দেশের প্রাচীন সৃষ্টিকাহিনী আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছি; এই সকল উদ্ধৃত অংশের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈদিক (ও মনুসংহিতা সম্মত) বাক্যগুলির তুলনা করিলে অতি আশ্চর্য্যরূপে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্তে এবং মানবশ্লোকে সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা এবং পরে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টির যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে এবং কালডিয়া দেশের সৃষ্টিকাহিনীতেও প্রায় সেই বর্ণনাই যথাযথ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি অম্ভঃ, সলিল, অর্ণব এবং মনুসংহিতায় উহাকে "অপঃ" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। বাইবেলের ইংরাজী তরজমায় উহাই (waters) জলেররাশি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কালডিয়া দেশেরইষ্টক পুঁথিতেও উহাকে "অপ্‌সু" (Apsu) বলা হইয়াছে *। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অম্ভঃ, সলিল, অর্ণব, অপঃ, অপ্‌সু, ও waters আমাদের লৌকিক স্নান পাত্রের জল নহে,—উহা সৃষ্টির প্রথম উপাদান এবং সাংখ্যদর্শনের ভাষায় উহাকে 'মহত্তত্ত্ব' বলা যাইতে পারে। সৃষ্টির প্রথম উপাদান সম্বন্ধে এরূপ ঐক্য বস্তুতঃই আশ্চর্য্যজনক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ধাতু হইতে উৎপন্ন। "সবিতা" শব্দের অর্থ যিনি জগৎ প্রসব করিয়াছেন বা সৃষ্টি করিয়াছেন।

* "Apsu" এই শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থ লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ বাধিয়াছে এবং তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। (see foot note ও p. 537 of Prof: Maspero's "The Dawn of Civilisation. হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"হিরণ্যগর্ভোভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
তদণ্ডমকরোদ্দ্বৈধং দিবং ভুব মথানিচ ॥৩০॥
অপ্সু পারিপ্লবাং পৃথ্বীং দিশাশ্চ দশধা দধে ॥৩১॥"

এই বর্ণনা মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর অনুবাদ মাত্র।

স্বপ্ন-মধু।

একটি চুম্বন দিতে, একটি চুম্বন নিতে,
তুমি কি আসিয়াছিলে তৃষিত তাপিত চিতে!
কহিলে না কোন কথা শুধু মধু বিতরিয়া
স্বপনেতে দেখা দিয়া স্বপনে মিলালে প্রিয়া!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জেনারেল নোগি।

জাপানের জেনারেল নোগির নাম বোধহয় পাঠকদের কাহারও অবিদিত নহে। তিনি যখন পোর্ট আর্থারের যুদ্ধের সময়ে তথায় গমন করেন তখন তাঁহার আহারের সময় পাচক এক উপাদেয় জাপানি খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন নোগি বলিলেন "ইহা অত্যন্ত সুখাদ্য বলিয়া মনে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এতটা হওয়া উচিত নয়। যাহা হউক সৈন্যগণ ইহাতে প্রম আহ্লাদিত হইবে।" উপস্থিত পে মাষ্টার—"সমস্ত সৈন্যদিগকে এরূপ খাদ্য দেওয়া অসম্ভব, ইহা কেবল আপনার জন্য"। জেনারেল—"তবে আমি ইহা খাইব না, আমার সৈন্যগণ যে আহার পাইবে না আমি তাহা স্পর্শ করিব না।" উপস্থিত কর্ম্মচারিবৃন্দ অবস্থা ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন। জেনারেল হুকুম দিলেন "যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের খাদ্য সমান হইবে"। পরদিন তাহাই হইল। যে দুই একটী খাদ্য করা হইয়াছিল তাহার একটু অংশ (অবশ্য অল্প) সকলেই পাইল। এবং নায়কগণ প্রচার করিল যে জেনারেলের আদেশেই সৈন্যগণ ঐরূপ সুখাদ্য পাইয়াছে। ফলে সৈন্যগণের শ্রদ্ধা জেনারেলের উপরে আরও বৃদ্ধি হইল।

রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়ে একদা জেনারেল নোগি তাহার কর্ম্মচারিগণ সহ নান্‌সান্ পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে দুইটী প্রস্তরের স্মৃতিফলক দেখিতে পান। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন উহা একটী মৃত কর্ম্মচারিদের সমাধির উপরে স্থাপিত এবং অপরটী সাধারণ সৈনিকদের সমাধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। শুনিবামাত্র তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। এবং কর্ম্মচারিদের সমাধির নিকটে উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করার জন্য প্রস্তরফলক হইতে একটী করিয়া নাম পাঠ করিতে লাগিলেন। এবং সেই সঙ্গে অভিবাদন করিয়া বোতল হইতে একটু করিয়া জল দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমান্বয়ে ৬ষ্ঠ নাম পাঠ করিয়াই চমকিয়া উঠিলেন এবং দুই কদম পিছাইয়া গেলেন কারণ উহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম। তিনি আর বিশেষ বিচলিত না হইয়া সেস্থানে দাঁড়াইয়া একটী কবিতা লিখিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পুত্রের কোনই উল্লেখ ছিল না।

জেনারেল নোগির ২য় পুত্র স্বেচ্ছায় এক বিপদ সঙ্কুল স্থানে যুদ্ধ করিতে যাইয়া মারা যায়। যখন এই দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য একজন কর্ম্মচারি জেনারেলের কক্ষে প্রবেশ করে তখন জেনারেল দেখিলেন যেন তাহার পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি পুত্রের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পুত্র বলিল আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তাই আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। জেনারেল বলিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ থাকে না। তুমি সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া যাও। ঠিক সেই সময়ে সৈনিক কর্ম্মচারি কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "আমি ইজু (Izu) আমাকে যে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন তাহা পালন করিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী সংবাদ দিয়া যাইব।" ইহাতে জেনারেল বলিলেন আমি এমাইত্র আমার পুত্রের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। আমি তাহাকেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে আদেশ করিলাম।

ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারি ইজু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল মৃতপুত্রের প্রেতাত্মা পিতার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন সে বলিল আপনার পুত্র ২০৩নং সিটার হিলের নিকটে গুলির আঘাতে মারা গিয়াছে। জেনারেল উত্তর করিলেন—আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন কর্ম্মচারি দুই একটী সান্ত্বনার বাক্য বলিয়া বিদায় হইবার উপক্রম করিলেই জেনারেল তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—এই যুদ্ধে বহু পিতা মাতা পুত্রহীন হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে কি কৈফিয়ত দিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না কিন্তু আজ শেষ পুত্র হারাইয়া তাহাদের সমকক্ষ হইয়াছি। এখন আমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি তাহা সমাধা করিব।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।



প্রতিভা

১১শ বর্ষ কার্ত্তিক ১৩২৮ ৭ম সংখ্যা

বাঙ্গালী কবি ধোয়ীর "পবনদূতম্"।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সমগ্র উত্তরাপথে, বিশেষতঃ কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, চেদী, ধারা প্রভৃতি রাজ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যে এক নব-জীবনের স্পন্দন লক্ষিত হইয়াছিল। সাহিত্যের এই নূতন স্রোতঃ গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাদেশে আসিয়াও পতিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধসময়ে বাঙ্গালার পক্ষে, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের পক্ষে, এক অতীব দুঃসময় ছিল। বরেন্দ্র-ভূমিতে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই পাল-নরপালগণের পূর্ব্ব প্রতাপ প্রতিহত হইতে আরম্ভ করে, এবং সম্ভবতঃ তখন হইতেই দক্ষিণাপথ হইতে আগন্তুক সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ়াঞ্চলে আত্মশক্তি বাড়াইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পরে, কিপ্রকারে এই বংশের বিজয়সেন-নামা নরপতি সর্ব্ববঙ্গে রাজ্যবিস্তার-ব্রতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—তাহা আমরা অন্যত্র ("সাহিত্য"—১৩২৮ আষাঢ় সংখ্যায়) আলোচনা করিয়াছি। তাই মনে হয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের এই গোলযোগের সময়ে বাঙ্গালাদেশে কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শন-স্মৃতি-প্রভৃতির তত্টা চর্চ্চা চলিতে পারে নাই। কাজেই একাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের উত্তরভারতীয় নবজাগরণ বাঙ্গালাদেশে বড় একটা বিশেষভাবে লক্ষিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারিবে না যে, সেই সময়েই আমাদের দেশে "রাম-চরিত"-রচয়িতা কলিকাল-বাল্মিকী সন্ধ্যাকর-নন্দীর মত উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত কবিরও অভ্যুদয় হইয়াছিল। তৎপর অবাঙ্গালী সেনরাজগণ বাঙ্গালার গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম-রাঢ়া প্রদেশে একবার নিজ প্রতিপত্তি সুসংস্থাপিত করিয়া লইবার পর, দ্বাদশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন অনুভূত হইতে থাকে। সেন-বংশীয় নরপতিগণ পাল-নরপালগণের ন্যায় বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা "পরম-মাহেশ্বর" অথবা "পরমবৈষ্ণব"

ছিলেন। তাই বৌদ্ধপ্রভাব হইতে বাঙ্গালীদিগকে কতকটা মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই, সম্ভবতঃ, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও বর্ণকৌলিন্যের প্রচলনে তৎপর হইয়া পড়েন, এবং তাঁহাদের অতুল সমৃদ্ধির কতক অংশ পণ্ডিতকুলের সহায়তায় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধির উপর সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। জাতিতে বাঙ্গালী পালরাজগণের সার্ব্বজনীনতার ভাব যদি অবাঙ্গালী সেনরাজগণ সর্ব্বাংশে রক্ষা করিতে পারিতেন —এবং সাহিত্যের তৎকালীন নূতন ধারাটিকে যদি সেই দিকেই চালাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বাঙ্গালার সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস এবং তৎসঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রের ইতিহাসও অন্যপ্রকার আকার ধারণ করিত। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার কবিকুল ও বিদ্বৎ-সমাজ সেনরাজগণের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের পুনরুত্থানের কার্য্যে নিজশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

এ সময়ের সাহিত্যে আমরা কেবল স্মৃতির ক্রিয়া-পদ্ধতি ও রসকাব্যেরই অধিকতর পরিচয় পাইতেছি। সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের চর্চ্চাদি আদৌ ছিল না, এরূপ বলিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘিত হয় কারণ, এই যুগেই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেব "ভাষাবৃত্তি" নামক বৃত্তি লিখিয়া বাঙ্গালাদেশে পাণিনি-প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের পঠন-পাঠন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। বিজয়সেনপুত্র বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লালসেনের গুরুর নাম অনিরুদ্ধ। তাঁহার প্ররোচনাতেই শিষ্য সেনরাজ "দান-সাগর"-নামক স্মৃতিনিবন্ধের সঙ্কলন করেন; বল্লালের অপর গ্রন্থ "অদ্ভুত-সাগর"—এবং এইখানি একটি জ্যোতিষ-নিবন্ধ। গুরু অনিরুদ্ধ "বেদার্থ স্মৃতিসংগ্রহের" আদিপুরুষ বলিয়া "দানসাগরে" অভিহিত হইয়াছেন। সেনরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ নিজেও কবি ছিলেন বলিয়া প্রমাণের অভাব নাই। লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধি-করণের প্রধান বিচারপতি ("মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ") ছিলেন "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"—রচয়িতা হলায়ুধ। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-গণের বেদাধ্যয়নের অভাব লক্ষ্য করিয়াই হলায়ুধ "মীমাংসা-সর্ব্বস্ব", "বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব", "শৈবসর্ব্বস্ব","পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঈশান ও পশুপতি-নামক তদীয় অগ্রজদ্বয় যথাক্রমে "দ্বিজাহ্নিকবিধির" এক পদ্ধতি ও "দশকর্ম্মপদ্ধতি"-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তদানীন্তন ও প্রাচীন কবিগণের শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মণসেন-দেবের "মহাসামন্ত-চূড়ামণি" বটুদাসের পুত্র, "মহামাণ্ডলিক" শ্রীধরদাস "সদুক্তিকর্ণামৃত" বা "সূক্তিকর্ণামৃত" নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় দুই সহস্রের অধিক শ্লোক বর্ত্তমান আছে। শ্লোকশেষে রচয়িতা কবির নাম প্রদত্ত আছে। তাহা হইতে প্রায় সার্দ্ধচারিশত কবির নাম অবগত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১২০৬ খৃষ্টাব্দ। এই একখানি গ্রন্থপাঠেই সেকালের কবিকুলের অবস্থা কল্পনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। "আর্য্যসপ্তশতীর" রচয়িতা আচার্য্য গোবর্দ্ধন, "গীতগোবিন্দের" প্রণেতা জয়দেব, "বিজয়সেন-প্রশস্তির" কবি উমাপতিধর ও দুরূহ-শ্লোক-নির্ম্মাতা শরণ ও "পবনদূত"-কাব্যের প্রসিদ্ধ কবি "কবিরাজ"-উপাধি-ভূষিত ধোয়ী—এই পঞ্চকবি লক্ষ্মণ-সেনদেবের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃতে" উদ্ধৃত কতকগুলি শ্লোকের রচয়িতার নাম ধোয়ী বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। "পবনদূত"-খণ্ডকাব্যের অবসানেও কবি নিজের নাম ধোয়ী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি যে "গৌড়েন্দ্রের" নিকট হইতে "দন্তিব্যূহ", "কনক-লতিকা" এবং "হৈমদণ্ড চামর" পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই এক শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। "পবনদূতে" শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। রসিকজনের

চিত্তবিনোদনের পক্ষে ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কাব্যে সর্ব্বসমেত ১০৪টি শ্লোক আছে। মন্দাক্রান্তাছন্দে শ্লোকগুলি রচিত। মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব ও অননুকরণীয় খণ্ডকাব্য "মেঘদূতের" কষ্টসাধ্য অনুকরণের প্রয়াসী হইয়াই ধোয়ী এই "পবনদূত" লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উভয় কাব্যের বিষয়ও প্রায় অনুরূপ। ধোয়ী কালিদাসের গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের অনুকরণ করিয়াছেন। মেঘের দৌত্যের কথা মনে রাখিয়া, ভারতবর্ষের কত প্রদেশে কত কবি কখনও উদ্ধবকে, কখনও কীরকে, কখনও শুককে, কখনও হংসকে, কখনও ভ্রমরকে, কখনও আবার চাতককে নায়িকার দূতকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া নায়কের প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ধোয়ীর "পবনদূতের" গল্পাংশ সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণিত হইতে পারে। একদা গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। সেখানে চন্দনাদ্রিতে কুবলয়বতী-নাম্নী এক গন্ধর্ব্বকন্যা রাজাকে দর্শন করিয়া মদনদেবের শরাধীন হইয়া পড়েন। রাজার প্রতি চিত্তের প্রবল অনুরাগ বিজ্ঞাপিত করিতে অসমর্থ হইয়া গন্ধর্ব্বকন্যা অত্যন্ত বিরহ-কাতরা হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুদিন বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর, যখন মধুমাসে মলয় পবন দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাভিমুখী হইয়া বহিতে আরম্ভ করিল—তখনই কুবলয়বতী সেই পবনের নিকট নিজের মনোদুঃখ জানাইয়া সেইস্থান হইতে তদীয় অনুরাগ বার্ত্তা গৌড়াধিপের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যাচ্ঞা করিলেন। গন্ধর্ব্বকন্যা পবনকে গন্তব্য পথ বলিয়া দিতে লাগিলেন। পথে যে যে দেশ অতিক্রম করিয়া ও যে যে জাতির সহিত পরিচিত হইয়া তিনি গৌড়দেশে বিজয়পুর-নামক রাজধানীতে উপনীত হইতে পারিবেন তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গন্ধর্ব্ব-দুহিতা পবনের পথ-গমনের সহায়তা করিয়া দিয়াছিলেন। পবন যুবতীর যাচ্ঞা শুনিবার পর অনুকূল হইয়া দৌত্য সম্পাদন করিতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেন গন্ধর্ব্ব-কুমারীর অনুরাগের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কি না, আমরা কবি ধোয়ীর নিকট হইতে তাহার কোন পরিচয় বা বর্ণনা প্রাপ্ত হই নাই।

এই রমণীয় শ্রুতিমধুর কাব্যে কবি সমসাময়িক অনেক দেশ, রাজ্য ও দেশবাসী জাতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তৎকালীন ভারতীয় ভৌগলিক বৃত্তান্ত ও অন্যান্য অনেক প্রকার ঐতিহাসিক উপাদান এই কাব্যের পাঠ হইতে জানিতে পারা যায়। রসিকজন ইহা হইতে একরূপ রস আস্বাদন করিবেন—ঐতিহাসিক অন্যরূপ রস ভোগ করিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয় এই কাব্যের সমাচার মনীষিগণের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন ["Notices of Sanskrit Mss." Second series, Vol I, part II, pp. 221—2 (No. 225)]। স্বর্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্ত্তি-মহাশয় এই কাব্য সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করিয়া (J. A. S. B. 1905, Vol I, No. 3, N. S.) জগজ্জনের চিত্তবিনোদনের এক নূতন উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। এই উভয় মনীষীর নিকট বাঙ্গালী-জাতির কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিয়া আমরা নিম্নে এই কাব্যের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার প্রথম চেষ্টায় ব্রতী হইতেছি। যে আদর্শ পুঁথি হইতে এই নূতন কাব্য মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাকুঁড়া জিলার অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুর-নামক স্থানের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুরাম তর্করত্নের গৃহে পাওয়া গিয়াছিল। পুঁথির মালিক রঘুরাম তর্করত্নের পিতা রামগতি ইহা পরিষ্কার বঙ্গাক্ষরে ১৭৫২ শকাব্দে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আদর্শ পুঁথির উদ্ধৃত পাঠে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তি মহাশয় স্থানে স্থানে শুদ্ধপাঠ ও নূতন পাঠ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তদীয়

পাঠেও স্থানে স্থানে অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। মূল পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করিবার সময়েও তিনি অনেক স্থলে ভুল করিয়াছেন তাহাও অনুমিত হয়। পাঠ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আমরা যথাস্থানে নির্দ্দিষ্ট করিব।

পবন-দূতম্।

(বঙ্গানুবাদ)।

অস্তি শ্রীমত্যখিল-বসুধা-সুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্ব্বাণাং কনকনগরী নাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈহৈর্লীলা-ভবন-শিখরৈ র্ম্বরং ব্যালিখন্তি—
র্ধত্তে শাখানগর-গণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্য ॥১॥

১। অখিল-পৃথিবী-সুন্দর শোভাময় চন্দন-পর্ব্বতে কনকনগরীনামক গন্ধর্ব্বগণের এক রমণীয় নিবাস বর্ত্তমান আছে—যাহার লীলাগৃহের সুবর্ণময় শিখররাজি আকাশকে স্পর্শ করে বলিয়া, যাহা সুরপুরের শাখা-নগররূপে পরিগণিত হইতে পারে।

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদু কুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা পত্যুঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়াবভুব ॥২॥

২। সেই স্থানে কুবলয়বতীনাম্নী এক গন্ধর্ব্বকন্যা (বাস করেন)। মনে হয় তিনি মদনদেবের কুসুমাধিক-মৃদু জয়শীল আয়ুধ-বিশেষ। এই বালা ভুবন-বিজয়ে (বিনির্গত) পৃথিবীশ্বর লক্ষ্মণ-দেবকে অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণাৎ পুষ্পধনুঃ (মদনের) বশগামিনী (সংবিধেয়া) হইয়াছিলেন।

বাল্যাদালীষ্বপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুক্ষামা কতিচিদনয়ৎ কাতরা বাসরাণি।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্যথৈব প্রবৃত্তং
পাচ্যোৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥৩॥

৩। বাল্যবশতঃ সখীগণের নিকটও মদনভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া, (মনোব্যথায়) কাতরা সেই কন্যা পাণ্ডু ও কৃশ হইয়া কতকদিন কাটাইয়া-ছিলেন। অনন্তর বসন্ত-সময়ে দেশান্তরে যাওয়ার জন্য অন্যথা প্রবৃত্ত মলয়-পবনকে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিলেন।

ত্বত্তঃ প্রাণাঃ সকলজগতাং দক্ষিণস্ত্বং প্রকৃত্যা
জল্পন্ত্যেবং ত্বাং পবন মনসোঽনন্তরং ব্যাহরন্তি।
তস্মাদেব ত্বয়ি খলু ময়া সংপ্রবৃত্তোঽর্থিভাবঃ
প্রায়ো ভিক্ষা ভবতি বিফলা নৈব যুষ্মদ্বিধেষু ॥৪॥

৪। "হে পবন—তোমা হইতেই সর্ব্বজগতের প্রাণ—(এবং) তুমি স্বভাবতই উদার (দক্ষিণ অথচ, দক্ষিণ-দিগাগত)। লোকে মনের পরে তোমাকেই অতিমাত্র দ্রুতগামী বলিয়া কহিয়া থাকে। অতএব, আমি তোমার নিকট প্রার্থিভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছি। তোমার মত লোকের নিকট প্রায়ই ভিক্ষা বিফলা হয় না।

বীক্ষ্যাবস্থাং বিরহ-বিধুরাং রামচন্দ্রস্য হেতো—
র্যাতঃ পারং পবন সরিতাং পত্যুরপ্যাত্মজন্মঃ।
তত্তাতস্ত্বাপ্রতিহতগতের্যাস্যতস্তে মদর্থং
গৌড়ী ক্ষৌণী কতি নু মলয়-ক্ষ্মাধরাদ্যোজনানি ॥৫॥

৫। "হে পবন, রামচন্দ্রের বিরহ-কাতর অবস্থা দর্শন করিয়া, তাঁহার জন্য তোমার পুত্র অঞ্জনা-নন্দন (মারুতি হনুমান্) সরিৎ-পতি সমুদ্রের অপর-পারে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পিতা তুমি আমার জন্য অপ্রতিহতগতিতে যাইতে প্রস্তুত হইলে, মলয়পর্ব্বত হইতে গৌড়ভূমি আর কত যোজনের পথ হইবে?

তত্রাবশ্যং কুসুম-সময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ
সান্দ্রোদ্যান-স্থগিত-গগন-প্রাঙ্গণে গৌড়দেশঃ।
তস্মেঽবস্থাং কথয় নৃপতে জীবন-ত্রাণ-হেতো—
প্রাদুর্ভাব স্ত্রিজগতি খলু ত্বাদৃশানাং পরার্থম্ (১) ॥৬॥

(১) এই স্থলে স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের উদ্ধৃত "পরার্থঃ"—পাঠটি সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

৭। "যখন নিবিড় উত্থানে গগন-প্রাঙ্গণ (লোকদৃষ্টি হইতে) লুক্কায়িত হইয়া পড়ে সেই সমস্ত সময়ে তুমি নিশ্চিতই সেই গৌড়দেশ দর্শন করিতে যাইবে। সুতরাং নৃপতির জীবনরক্ষার জন্য তুমি আমার অবস্থা তাঁহাকে বলিবে। কারণ, পরোপকারের জন্যই জগতে, তোমাদের মত ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব।

হৃত্বানর্ঘ্যং পরিমলমিতশ্চন্দনানোকহানাং
তূর্ণং তাবজ্জহিহি মলয়োপত্যকা-কাননানি।
যাবন্নৈতে নিধুবন-কলা-কেলিভাজো ভুজঙ্গা
ভোগব্যাজাচ্চুলুকচুলুকং মৎসরাত্ত্বাং পিবন্তি ॥৭॥

৭। "রতিকলা-কেলি-পরায়ণ এই ভুজঙ্গকুল (পবনাশন-গণ) যতক্ষণ তোমাকে ভোগব্যাজে চুলুকে চুলুকে (গণ্ডূষে গণ্ডূষে বা পাত্রবিশেষে করিয়া) পান করিয়া না ফেলে, ততক্ষণ তুমি এইস্থান হইতে চন্দনবৃক্ষ-সমূহের অমূল্য পরিমল হরণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মলয়-পর্ব্বতের উপত্যকা-কাননরাজি পরিত্যাগ কর।

শ্রীখণ্ডাদ্রেঃ পরিসরমতিক্রম্য গব্যূতি-মাত্রং
গন্তব্যস্তে কিমপি জগতীমণ্ডনং পাণ্ড্যদেশঃ (২)।
তত্র খ্যাতং পুরমুরগমিত্যাখ্যয়া তাম্রপর্ণ্যা-
স্তীরে যুগ্ম-ক্রমুক-তরুভির্বদ্ধবৈর্ভজেথাঃ ॥৮॥

৮। "শ্রীখণ্ড পর্ব্বতের পরিসর অতিক্রম করিয়া তুমি, গব্যূতিমাত্র দূরে (অবস্থিত) জগতের এক অনির্ব্বচনীয় অলঙ্কার-স্বরূপ পাণ্ড্যদেশে গমন করিবে। তথায় তাম্রপর্ণী নদীর তীরে মনোহর সারিবদ্ধ গুবাক-বৃক্ষরাজির সাহায্যে উরগ-পুর-নামে প্রসিদ্ধ নগরে প্রবেশলাভ করিবে।

সম্ভোগান্তে শ্লথভুজলতা-নিঃসহানাং বধূনাং
ব্যাধুন্বানো রুচিতকবরী ভারমব্যাজমুগ্ধম্।
অস্মিন্ সদ্যঃ শ্রমজলমুষঃ সৌধজালৈরুপেত্য
প্রত্যাসন্না মলয়মরুতস্তালবৃন্তী ভবন্তি ॥৯॥

(২) "পাণ্ড্যদেশঃ"— পাঠ বর্জন করিয়া "পাণ্ড্য-দেশঃ" পাঠই উদ্ধৃত করা হইল।

৯। "এইস্থানে (উরগপুরে) সম্ভোগান্তে শিথিল ভুজলতার ভারবহনে অসমর্থ বধূগণের অব্যাজসুন্দর অমুচিত কবরীভার কম্পন করিতে করিতে সৌধবাতায়ন-পথে প্রবেশপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী হইয়া, মলয়পবন তৎক্ষণাৎ শ্রমজলের অপনোদন করিবার জন্য তালবৃন্তের কার্য্য করিয়া থাকে।

ক্রীড়াশৈলং ভুজগনগরী-যোষিতাং কৌতুকঞ্চেৎ
সেতুং যায়া (৩) জলাবিকিরণঃ(?)শৃঙ্খলা-দাম-দীর্ঘম্।
ভাতি স্নেহাদবনি-তনয়া-জীবনাশ্বাস-হেতো—
র্লঙ্কাদ্বীপং প্রহিত ইব যো বাহুরেকঃ পৃথিব্যাঃ ॥১০॥

১০। "যে সেতুকে দেখিলে মনে হয় যেন বসুধা-তনয়ার (সীতাদেবীর) জীবনাশ্বাসের জন্য পৃথিবী স্নেহবশতঃ লঙ্কাদ্বীপের দিকে একটি বাহু প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন—(মনে) যদি কুতূহল হয়, তাহা হইলে তুমি জল বিকিরণ করিতে করিতে (?) উরগপুরের রমণীগণের ক্রীড়াপর্ব্বতস্বরূপ শৃঙ্খলারজ্জুদীর্ঘ সেই সেতু-বন্ধে গমন করিবে।

ক্রুধ্যদ্গৌরী-(কর*)-কিসলয়াকৃষ্ট চূড়া-সুধাংশো
র্দ্রক্ষ্যস্যুচ্চৈঃ ফল (পদ?) মকলুষং তত্র রামেশ্বরস্য।
মধ্যং যত্র ত্রিবলিবিষমং বারসীমন্তিনীনাং
হস্তোৎকম্পং কথয়তি বিধেঃ সৃষ্টকাঞ্চীপদস্য ॥১১॥

১১। "যেস্থানে বারাঙ্গনাগণের ত্রিবলি-বিষম শরীর-মধ্য কাঞ্চী-স্থানের (কোটি-দেশের) সৃজনকারী বিধাতার হস্তকম্পন সূচনা করে—সেখানে (সেতুবন্ধে) গৌরী নিজকর কিসলয়দ্বারা যাঁহার চূড়াস্থিত চন্দ্রমাকে আকর্ষণ করিতেছেন, তুমি সেই রামেশ্বর (মহাদেবের) অকলুষ উচ্চ ক্ষেত্র (?) দর্শন করিবে।

(৩) স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী এই শব্দের "জলাধিকরণঃ" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন. কিন্তু এই পাঠ অবলম্বন করিলে তাহার অর্থ সুখকর বোধ হয় না বলিয়া আমরা সংশয়-সহকারে শব্দটিকে "জল-বিকিরণঃ"-রূপে পাঠ করিতে প্রয়াসী হইলাম।

লীলাগারৈরমর-নগরশ্রীপ গর্ব্বং হরন্তীং
গচ্ছেঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ।
যস্যাং যত্র প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং
কুর্ব্বন্ পাণিপ্রণিহিতধনুর্জ্জায়তে পঞ্চবাণঃ ॥১২॥

১২। "অনন্তর তুমি লীলাভবনদ্বারা দেবনগরের গর্ব্বহারিণী দক্ষিণদিকের ভূষণরূপিণী কাঞ্চীনগরীতে গমন করিবে—যেখানে রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া হস্তে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক পঞ্চবাণ (মদনদেব) নগরবাসিগণের প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

বাঙ্গলার সঙ্গীত ধারা।

(১)

প্রকৃতির নর্ম্মোদ্যান আমার শ্যামা জন্মভূমি—আমার "সোনার বাঙ্গলা" কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পদ শালিনী! উত্তরে মায়ের তুঙ্গ শীর্ষে হীরক খচিত কাঞ্চন মুকুট কি গৌরবে উদ্ভাসিত, আর দক্ষিণে তাঁহার বন্দ্য চরণ কমল ধৌত করিয়া নীল নীরধি দিনে নিশীথে অবিরাম অবিশ্রাম মায়ের আমার কি গম্ভীর বন্দনাই না গাইতেছে! মা আমার হরিদ্বসনা, কানন-কুন্তলা, নদী-মেখলা, ফুল্লকুসুমদাম-ভূষিতা, জ্যোৎস্না-চন্দন-চর্চ্চিতা, স্নিগ্ধ মলয়ানিল সেবিতা, স্মেরাননা, সন্তান স্নেহশালিনী! তাঁর "বিগলিত করুণা" বরাপগা পুণ্য পীযুষতটবাহিনী" অগণিত তরঙ্গিনী-কুল তাঁহার "হরিৎক্ষেত্র" গুলিকে কি উর্ব্বরতা দান করিতেছে! তাইত উর্ব্বর ক্ষেত্রের স্বর্ণ শস্য ভাণ্ডার দিকে দিকে জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলভারাবনত আম, যাম, নারিকেল, গুবাক, কাঁটাল, তাল বনের কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা। মায়ের—

"পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।"

যে দিকে চাহিয়া দেখি সেই দিকেই উর্ব্বরতা ও প্রাচুর্য্যের দৃশ্য হরিতে হীরণে মিলিয়া মিশিয়া নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং প্রাণ মন মোহিত করিয়া ফেলে, আর অমনি ভক্তিভরে মস্তক অবনত হয়।

বাঙ্গলা মায়ের প্রকৃতির ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ, তাঁহার বন প্রান্তর ক্ষেত্ররাজি যেমন উর্ব্বর, তাঁর সঙ্গীত ক্ষেত্রও ঠিক সেইরূপই উর্ব্বর। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁর সন্তান-গণের হৃদয়ক্ষেত্রে সঙ্গীতের আবাদ হইয়াছে, এবং তাহার অপূর্ব্ব ফলসম্ভারে,—সুস্বাদু সোনার ফসলে বাঙ্গলার সঙ্গীত ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে বাঙ্গালীর ধর্ম্মের কথা, প্রাণের ব্যথা, হৃদয়ের অরুণাবেগ, মান অভিমান, বিচ্ছেদ মিলন, প্রণয় বিদ্বেষ, সুখ দুঃখ, হাস্য পরিহাসের কাহিনী কত লক্ষ লক্ষ সঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার সময়ে সহসা যখন শিশির ঋতুর শোভার নিদান সর্ষপ-ক্ষেত্রের অসংখ্য অগণিত স্বর্ণ কুসুমদলের প্রভাত কিরণোজ্জ্বল রূপের ছটারই মত অপূর্ব্ব সঙ্গীত কুসুমরাজি সহস্রে সহস্রে, অযুতে অযুতে, লক্ষে লক্ষে তাহাদের স্বপ্নময়, মায়াময়, মোহময়, বর্ণ গন্ধ রূপ লইয়া আমাদের মানস নয়ন সমক্ষে দুলিতে থাকে, তখন কি অনির্ব্বচনী আনন্দের অনুভব হয়!—

চিরকালই বাঙ্গালীর হৃদয় উৎস বিচিত্র সঙ্গীত ধারায় উৎসারিত হইতেছে। এই যে বর্ত্তমানের দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ, মায়ের দেওয়া বারা ভাতও দেশের লোকের ভাগ্যে জুটিতেছে না, রোগে শোকে দুঃখে চারিদিকে হৃদয় বিদারী হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে, ইহার মধ্যেও সঙ্গীত ধারা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাঙ্গলার কবিকুল, তা তাঁহারা গ্রাম্যই হউন বা নাগরিকই হউন, অজস্র সঙ্গীত রচনা করিতেছেন। সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে, আনন্দ উৎসবে, বিবাহ ব্যাপারে, পূজা পার্ব্বনে বাঙ্গলার সঙ্গীতও অখণ্ড

থামিয়া যায় নাই। শোকপূর্ণ শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পরেও দেশে রাম মঙ্গল গানের ব্যবস্থা। পল্লিবাসী কৃষকগণ আজও অবসর বিনোদন সময়ে, ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময়ে, মাঝিগণ নৌকা বাহিবার সময়ে, রাজমজুরগণ ছাদ পিটিবার সময়ে, বৈরাগী বৈরাগিনী, ভিখারী ভিখারিণীগণ ভিক্ষা করিবার সময়ে বাউল-ভাটিয়াল-শ্যামা-সঙ্গীত কত রকমে গাইয়া থাকে। ছায়াচ্ছন্ন পল্লীপথে চলিতে চলিতে কখনও বা গৃহস্থিতা কোন "চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণার" সুধা-কণ্ঠ-নিসৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণে পশিয়া মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। কখনও বা গ্রামের মেয়েরা জ্যোৎস্না রাতে আঙ্গিনায় বসিয়া সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্চতানে পল্লী বিথী প্রতিধ্বনিত করিয়া মনের আনন্দে গান করিয়া থাকে। শত দুঃখ কষ্টে পড়িলেও মানুষ গান একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারে না। পুত্র-শোকাতুরা জননী, সদ্য বিধবা তরুণী, ভ্রাতৃবিয়োগ-বিধুরা ভগিনী যখন হৃদয়ের মর্ম্মন্তদ যাতনায় ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠে, আর তাহার সঙ্গে মৃতের জীবন কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে থাকে তাহার মধ্যেও আকুল শোকসূচক একটা করুণ সুর শোনা যায়। সেই শোকগাথা যতদূর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হয় তদবধি পল্লীর প্রতি গৃহে একটি শোকের ছায়াপাত করিয়া দেয়, প্রাণ যেন কেমন উদাস হইয়া যায়—এ পৃথিবীর নশ্বরতা যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে পরিস্ফুট হইয়া উঠে! বাস্তবিক দুঃখের গানগুলিই যেন অধিকতর হৃদয়স্পর্শী। উহারই করুণ স্পর্শে যেন কোমল বাঙ্গালী হৃদয় বেশী বিমুগ্ধ হয়। শুধু বাঙ্গালী হৃদয় নয়, বিদেশীয় কবিও ত গাইয়াছেন :—

"Our sweetest songs are those that tell
of saddest thought."

বাঙ্গলার গানগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়ভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—

১। ধর্ম্মসঙ্গীত, (যথা—শ্যামা সঙ্গীত, বৈষ্ণব পদাবলী, সংকীর্ত্তন, বাউল সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি)।

২। জাতীয় সঙ্গীত।

৩। পৌরাণিক সঙ্গীত।

৪। ভাটিয়াল সঙ্গীত।

৫। কবি সঙ্গীত।

৬। প্রণয় সঙ্গীত।

৭। সময়সাময়িক ঘটনাবলম্বনে গান, (ভাটদের গানগুলি এই শ্রেণীর)।

৮। হাসির গান।

৯। জারি গান।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সেই প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার কতিপয় প্রধান অপ্রধান রচয়িতার কতগুলি সঙ্গীত লইয়া আলোচনা করিব। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও ভাব প্রকাশ ভঙ্গীর ক্রম পরিবর্ত্তন ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গলার গান যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই মহোদয় সংগৃহীত "বৌদ্ধ গান ও দোহা"ই বোধ হয় প্রাচীনতম। উহা ১০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের। উহার ভাষা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া গেল :—

"রাগ পটমঞ্জরী।"

"কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঠ করি অ মহা সুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছি অয়জাণ॥ ধ্রু॥
স অল স [মা] হি অ কাহি করি অই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি আই॥ ধ্রু॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস
সুনু পাখ ভিতি লাহুরে পাস॥ ধ্রু॥
ভণই লুই আমহে সাণে দিঠা
ধমন চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ॥ ধ্রু॥"

ইহার পরে অবশ্য মানিকচাঁদ ও ময়নামতীর গান প্রভৃতি পাওয়া যায়। তবে সে গুলি কতকটা পাঁচালীর মত। আমরা যে জাতীয় গানের বিষয় লিখিতেছি উহা তদ্রূপ নহে। তাই উহার নমুনা দেওয়া হইল না।

ইহার পরে "মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর" অদ্বিতীয় গায়ক জয়দেব সরস্বতী হইতেই বাঙ্গলার গানের ধারা কতকটা অবিচ্ছিন্নরূপে পাওয়া যায়। কবিবর তাঁহার মানসনেত্রে "মেঘমেদুর অম্বর" এবং "তমাল দ্রুমশ্যাম" বনভূমিতে যমুনা পুলিনে কেলিপরায়ণ রাধামাধবকে নিরীক্ষণ করিয়া কি মধুর গানই না গাইয়াছেন। অন্যত্র কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকাকে সখি মুখে বলিতেছেন :—

"রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশং
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশং।
ধীর সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী
পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-চঞ্চল-করযুগশালী ॥
নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুং।
পতিতি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপয়ানং
রচয়তি শয়নং স চকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং
চল সখি কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলং ॥

* * * *

শ্রীজয়দেবে কৃত-হরিসেবে ভণতি পরম-রমণীয়ং।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতি-সদয়ং নমত সুকৃত-কমনীয়ং ॥

জয়দেব গোস্বামীর পরে আমরা "বঙ্গসাহিত্যাকাশের আদি নক্ষত্র" চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গানে মুগ্ধ হই। বৈষ্ণব পদাবলী-সঙ্গীত-মধুচক্রের ইহাঁরাই আদি মধুকর।

সেই নিখিলের পতি "কানুর পিরীতি" সম্বন্ধে চণ্ডীদাস গাইলেন,—

"পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল, প্রেমসরোবর, নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহলা, পড়সী জীয়ল মাছে।
কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তার ঠাঁই ॥"

আর বিদ্যাপতি গাইলেন :—

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়?
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নৌতুন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু,
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু,
না বুঝনু কৈসন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন, রসে অনুমগন,—
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ, প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥"

সেই অনন্ত রূপের আকর অরূপের রূপ দেখিয়া কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে কি?

মিলনে বিদ্যাপতির রাধা আনন্দ-বিহ্বলা। হৃদয়ের আনন্দ যেন শতধারায় উছলিয়া বহিয়া যাইতেছে। রাধিকা শ্যামকে পাইয়া গাইলেন,—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু,—
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।

জীবন যৌবন সফল করি মানলু,
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ-বান হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অবহু সোন যবহু মোহে পরিহোয়ত,
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ, অলপ ভাগি নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥"

আর ঠিক এমনই সময়ে চণ্ডীদাসের বিরহ বিধুরা দুঃখিনী রাধা তাঁর প্রাণবন্ধু জগদাশ্রয়ের পায়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া গাইলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি ॥
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে, আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে, যদি না দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডী দাস কহে, পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি ॥"

বিদ্যাপতির বৃদ্ধ বয়সের একটি আত্ম নিবেদন দিতেছি,—

"তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপিনু, অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তহু জগতারণ, দীন-দয়াময়, অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধজনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু, জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত, সাগর লহরী সমানা ॥
ভনয়ে বিদ্যাপাত, শেষ শমন ভয়ে, তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি, অব তারণ ভার তোহারা ॥"

"কত চতুরানন" এই পদটিতে কেমন অপূর্ব্ব সংক্ষিপ্ত ভাষায় অদ্বৈত বাদের প্রধান তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

কানুর প্রেমে ভরপুর মাতোয়ারা কমলিনী রাই একদিন কৃষ্ণমুখ স্মরণ করিয়া সখীকে বলিতেছেন,—

"ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পীবইতে জাউ করি সাধ।"

এমন সময়ে শ্যামের বংশীধ্বনি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল," আর কি থাকা যায়? রাধা অভিসারে চলিলেন। রজনী ঘনঘটাচ্ছন্ন, অবিরাম বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে। সখী রাধাকে বলিলেন:—

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দারুণ বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
এ সখি, কৈসে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার ॥
ইথে যদি অব তুহু তেজবি গেহ।

প্রেম কি লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বান কিয়ে যতনে নিবার ॥"

আবার অন্য সময়ে শ্যাম সুন্দর সখি-সমীপে রাধার কথা কহিতে কহিতে বলিতেছেন,—

"যাঁহি যাঁহি নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহি তাঁহি বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সনে করত হি খেলি ॥
যাঁহি যাঁহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহি তাঁহি উথলই কালিন্দী হিলোল ॥
যাঁহি যাঁহি তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহি তাঁহি নীল উৎপল বন ভরই ॥
যাঁহি যাঁহি হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহি তাঁহি কুন্দ কুসুম পরকাশ ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিনইতে রাই চিনল নাহি জান ॥"

রাধার সঙ্গে কানুর— প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের—মিলন হইলে কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি ॥
আনন্দ মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা কল্প লতা মোর কামনা মূরতী ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম ॥
গলে বন মালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥"

সেই চতুর চূড়ামণীর সঙ্গে মিলন ত কখনও স্থায়ী হয় না। তিনি চলিয়া গিয়াছেন,—আর ত রাধার কাছে আসেন না! বিরহ বিধুরা রাধিকার দুঃসহ হৃদয়-বেদনা অশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়া কি প্রাণস্পর্শী ভাষায়ই না প্রকাশ পাইয়াছে,—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধনু,—আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥
সখি, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু,—ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বাঢ়ল, মাণিক হারাণু হেলে ॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলেম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগী করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞান দাস কহে পিরীতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে ॥"

আবার মিলন হইয়াছে। শ্যামের যে বাঁশী এই মিলন সংঘটন করিয়াছে সেই নিখিল অবসকরা বাঁশী কি করিয়া বাজান যায়, উহার কোন্ রন্ধ্রে কি সুর কি কৌশলে বাহির করিতে হয়, রাধা এই সকল শিখিবার জন্য তাঁহার মুরলী মোহনের কাছে উপদেশ চাহিতেছেন,—

"মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী ॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেহে প্রাণনাথ ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফুলে ॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায় ॥

জ্ঞান দাস কহে হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবে বাঁশী॥"

এ বার বৃন্দাবন হইতে মুগ্ধ মনকে কষ্টে ফিরাইয়া আনিয়া নবদ্বীপের দুইটি চিত্র দেখাইব। প্রাণের গোরা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। শ্রীহীন নবদ্বীপে আর তাঁর মধুর কণ্ঠের "হরিবোল" ধ্বনি শোনা যায় না। নদীয়ার পথ ঘাট প্রাঙ্গনের পবিত্র ধূলি আর তাঁহার চরণ কমল স্পর্শে পবিত্রতর হয় না। গৃহে গৃহে হাহাকার। শচী মাতা ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার আকুল ক্রন্দনে. বুক ফাটা বিলাপে নদীয়ার আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অশ্রু প্রবাহে কলনাদিনী সুরধুনীর সলিলরাশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এমনই সময়ে একদিন :—

"ভাবে গদ গদ বুক, গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ, ভাবিতে শুইলা শচী মায়॥
কনক কষিত জনু, গৌর সুন্দর তনু, আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিয়া গোরা, অরুণ নয়নে ধারা, চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠে মায়, ধেয়ে কোলে করে তায়, ঝর ঝর নয়নের নীরে॥
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ কাঁদে, দুহুঁ থির নাহি বাঁধে, কহে মাতা গদ গদ ভাষে।
আকুল করিয়া মোরে, ছাড়ি গেলা দেশান্তরে, প্রাণহীন তোমার হুতাশে॥
যে হউ সে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা, ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর, পরম বৈষ্ণববর, কি ধরম সন্ন্যাস করণ॥
এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচী মাতা—
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কাঁদিয়া ওঠে, ধারা বহে দুহুঁ দিঠে,
প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥

শচীমাতা আর এক দিন বলিতেছেন :—

"আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়ে, গৃহপানে চেয়ে চেয়ে,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥
ঘরেতে শুইয়াছিলাম, অচেতনে বাহির হ'লাম,
নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে।
আমার চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হতে প্রাণ কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কি কহিব কহনা উপায়।
বাসুদেব দাসে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়,
নাহলে কি সদা দেখ তায়॥"

এর পরে আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা-সঙ্গীত ভাণ্ডার প্রাপ্ত হই। তাঁহার পূর্ব্বেও বহু গান ছিল, হয়ত সেগুলি এখনও পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু কোন্ কালের তাহা চিনিবার কোন উপায় নাই। কত ফুল ঝরিয়া মাটীতে মিশাইয়া গিয়াছে, কত ফুল বা কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাম প্রসাদের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি খাঁটি সোনা, উহাতে জ্ঞান ভক্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। একপক্ষে বঙ্গের শক্তিবাদে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের সামঞ্জস্য হইয়াছে। যে যাহাই বলুক প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং শক্তিবাদ বঙ্গের অতি উপাদেয়

নিগম সম্পত্তি, কিশোরী ভজন ও ভৈরবিচক্র আর সুরাপান উহার ব্যভিচার বই আর কিছুই নহে। আমরা বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিগণ হইতে কি চমৎকার সঙ্গীতমালা ও কাব্য কুসুমরাজিই না প্রাপ্ত হইয়াছি।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত এ যাবৎ যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সংখ্যা তাঁহার রচিত গানের তুলনায় অল্পই। তিনি একটি গানে তদ্রচিত গানের সম্বন্ধে বলিয়াছেন "লাখ উকীল করেছি খাড়া"। তিনি দিবা নিশি শ্যামা মায়ের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন, আর তাঁহার হৃদয় উৎস হইতে অবিরল সঙ্গীতসুধা নিসৃত হইত। তিনি জানিতেন যে তাঁর আত্মাশক্তি শ্যামা তাঁহার নিজ হৃদয়েরই বস্তু। আত্ম হৃদয় খুঁজিলেই তাঁহার দর্শন মিলিবে। তাই তিনি গাইলেন,—

প্রসাদী সুর (খাম্বাজ) একতালা।

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তিভাবে কুড়ায়ে পাবে, শিব যুক্তি মতন চেলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলুদি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মানিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥"

সেই "ব্রহ্মাণ্ড-উদরী বিশ্বেশ্বরীর" বিরাট রূপ ভাবিতে ভাবিতে রামপ্রসাদ কেমন সহজ সরল ভাষায় গাইয়াছেন,—

"সে কি এম্‌নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে ॥
যে চরণ শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব, যাঁর চরণে লুটায়ে ॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥"

রামপ্রসাদ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে এ জগতে সুখের মত দুঃখ ও সেই জগন্মাতা করালিনী কালারই দান। তাঁহার মা যেমন বরাভয়দায়িনী,—তেমনই "খর্পরকরবালিনা"। যেমন হৃদপদ্মবাসিনী, তেমনই শ্মশানস্থলচারিণী। তাই তিনি মাথা পাতিয়া জগতের দুঃখভার লইয়াছিলেন, এবং বীর সাধকের মত সেই জগদ্দলদুঃখ রাশির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া মা কে বলিয়াছিলেন,—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥"

শক্তিমান ছেলে রামপ্রসাদ "ক্ষণেক জিরাইতে" চাহিলেও মায়ের ভ্রুকুটি ভঙ্গে একেবারেই ভয় না পাইয়া কেমন তেজের সঙ্গে গাইয়াছেন,—

প্রসাদী সুর—একতালা।

"আমি কি আটাসে ছেলে?
ভয়ে ভুলব নাকো চোক রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ঐ রাঙ্গা পদ, শিব ধরেন যা হৃদকমলে।
ও মা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে'।

এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥"

রামপ্রসাদের মাতৃ সাধনা কেমন বিশ্বজনীন ভাবের ছিল। উহা আকাশের মত উদার,—সাগরের মত গম্ভীর। তিনি গাইয়াছেন,—

পিলু বাহার—জৎ।

"ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবা নিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী, পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মা রে ॥"

রাম প্রসাদের মা আত্মা রূপিনী, তিনি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করেন, একবার এ তত্ত্ব জানলে পরে আর ত ভেদাভেদ থাকে না। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—

সিন্ধু—মধ্যমান।

"এমন দিন কি হবে তারা।
যে দিন তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরা তলে পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি-অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা ॥

রাম প্রসাদের পরে আমরা রায় গুণাকর ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে শিব ও ভবানী বিষয়ক এবং বিদ্যা সুন্দরে কৃষ্ণলীলা ও প্রেম বিষয়ক কএকটি সঙ্গীত পাই।

মহা কবি জীবশিবের অভেদ ভাব এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই তত্ত্ব নিম্নলিখিত গানটিতে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"ভব সংসার ভিতরে,
ভব ভবানী বিহরে ॥
ভূতময় দেহ, নবদ্বার গেহ,
নরনারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লয়ে,
দোঁহে নানা কেলি করে ॥
উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সব জীবের অন্তরে।
চেতনা চেতনে, মিলি দুইজনে,
দেহী দেহরূপে চরে ॥
অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরা চরে।
পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
কবি রায় গুণাকরে ॥"

মানস নেত্রে শ্যাম সুন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়া ভারত তাঁহার বীণা ঝঙ্কার দিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় গাইতেছেন,—

"ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নব জলধর তনু, শিখি পুচ্ছ শক্রধনু,
পীত ধড়া বিজুলীতে, ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে, সেই মত চাওহে ॥"

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

সর্প।

বড় বড় সর্পের মেরুদণ্ড প্রায় ৩০০ হইতে ৪০০ অস্থিতে নির্ম্মিত। ইহাদের সন্ধিস্থল অনেকটা আমাদের উরুদেশের সন্ধির মত অর্থাৎ এক দিকের অস্থি ডিম্বাকার এবং অপর দিকের অস্থিতে একটি গর্ত্ত। ইংরাজিতে ইহাকে Ball and socket সন্ধি বলে। ইহা দ্বারা মেরুদণ্ড অনেকটা পাশাপাশি ঘুরান ফিরান যায়। এই মেরুদণ্ডের অস্থিগুলির সঙ্গে ২ দুইদিকে দুইটী করিয়া বক্র পঞ্জরের অস্থিও বর্ত্তমান। কাজেই পঞ্জরাস্থির পরিমাণ মেরুদণ্ডের অস্থির দ্বিগুণ।

মস্তক ভিন্ন শরীরের অবশিষ্টাংশ সমান্তরাল ভাবে মৃত্তিকার উপরে রাখিয়া সর্প চলিয়া থাকে। অনেক কাল্পনিক ছবিতে জলের তরঙ্গের মত ঢেউ তোলা ভাবে সর্পের গমনের ভঙ্গি দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু উহা অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সর্প কিরূপে এবং কিসের সাহায্যে চলিয়া থাকে। প্রত্যেক খণ্ড মেরুদণ্ডের অস্থির সহিত যে এক জোড়া পঞ্জর থাকে উহা একখানা পায়ের কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপে সর্পের দৈর্ঘ্যানুসারে অথবা মেরুদণ্ডের অস্থি খণ্ডের পরিমাণ অনুসারে পায়ের কল্পনা করা যাইতে পারে। এ সকল পঞ্জরের অগ্রদেশ সর্পের পেটের নীচের এক একটী আঁইসের সহিত এক একটী ক্ষুদ্র এবং মজবুত মাংসপেশী দ্বারা সংযুক্ত থাকে। সর্প চলিবার ইচ্ছা করিলে এই পঞ্জর সকল আঁইশগুলিকে এরূপ ভাবে বক্র করে যে উহা ভূমি মৃত্তিকা কিংবা বৃক্ষ গাত্রে একটু আটকাইয়া যায় এবং ঐরূপে পঞ্জরের উপরে ভর করিয়া সম্মুখে অগ্রসর থাকে। সে জন্য সর্প অতি মসৃণ কাচখণ্ডের উপরে চলিতে পারে না। কোন কোন সর্পের ক্ষুদ্র ২ শলাকার মত এখনও পায়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে আবার কোন জাতির পা অপকর্ষতা লাভ করিয়া ক্ষুদ্র অস্থিরূপে পরিণত হইয়াছে। এবং ঐ সকল হাড় ইত্যাদির সাহায্যে সর্প ভূমিতে চলিতে পারে কিন্তু বৃক্ষারোহণ সময়ে ইহাদের পঞ্জরের অস্থিই একমাত্র সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের অনেকের ধারণা যে অতিকায় কেয়া সর্প গাছে উঠিতে পারে না, কিন্তু উহা ভুল; প্রকৃত পক্ষে উহারাই গাছে উঠিতে মজবুত।

বিষধর সর্পে দংশন করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই জীব মরিয়া যায়। ইহাদের বিষ অত্যন্ত ভয়ানক কিন্তু ইহা খাইয়া ফেলিলে লোকের সহজে কিছু হয় না। সে জন্য সর্পদংষ্ট স্থান চুষিয়া বিষ উঠাইয়া ফেলার রীতি আছে। কিন্তু মুখে কোনরূপ ক্ষত থাকিলে মৃত্যু ধ্রুব। সর্পে না কামরাইলেও উহার বিষ কোন প্রকারে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করিলে যে কিরূপ ভীষণ ফল হয় তাহার একটী উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

ফ্রেঙ্ক বাক্লেণ্ড (Frank Buckland) নামক একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ একদা লণ্ডন চিরাখানায় একটী ইন্দুরকে একটী বিষধর সর্পে দংশন করিল দেখিতে পান। তিন মিনিটের মধ্যে ইন্দুরটী মরিয়া যায়। ঐ মৃত ইন্দুরটীর অবস্থা দেখিবার জন্য উহাকে সর্পের বাক্স হইতে বাহির করিয়া আনেন; কোথায় দংশন করিয়াছে স্থির করিতে না পারায় ছুড়ি দ্বারা উহার চর্ম্ম খুলিয়া ফেলেন। তখন মাংসের একস্থানে অতি সূক্ষ্ম সূচের খোচার মত একটী চিহ্ন দেখিতে পান। মাত্র ১০ মিনিট হয়, ইন্দুরটী মারা গিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ স্থানের মাংস একরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তখন দংশিত স্থানের চর্ম্মের ভিতরের দিকের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য নখ দ্বারা ঐ স্থানের চর্ম্ম-সংলগ্ন-মাংস আস্তে ২ সড়াইতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিবস চিরাখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটী শলাকা দ্বারা নখের ভিতরের দিক পরিষ্কার করিবার সময়ে নখের নিম্নে এক স্থানের একটু মাংস উঠিয়া গিয়াছিল। ভ্রমক্রমে তিনি ঐ নখের দ্বারাই ইন্দুরের মাংস আচড়াইতেছিলেন। বিষ নখের ক্ষতস্থানে প্রবেশ করা মাত্র

তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহার মাথায় এক লগুড়াঘাত করিল এবং বক্ষস্থলে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল, সেই সঙ্গে তাঁহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার সঙ্গীকে তাড়াতাড়ি কোন এক চিকিৎসকের নিকটে লইয়া যাইতে বলিলেন। সঙ্গী তাঁহাকে আদেশ মত অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতাবস্থাতে এক চিকিৎসকের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিল। চিকিৎসক তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অনেকটা কার্ব্বনেট্ অব্ এমনিয়া (Carbonate of amouia) জলে গুলিয়া খাইতে দিলেন। উহা পান করিয়া তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেন। ইহার পরে দীর্ঘকাল ভোগিয়া তিনি নিরাময় হন।

ভারতবর্ষে দুই জাতীয় কোব্রা (Cobra) বা জাত সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে তিন প্রকার এবং আফ্রিকাতে চারি প্রকার কোব্রা দেখা যায়। ভারতের অতিকায় কোব্রা ১৩ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। এবং সাধারণ কোব্রা ৬।৭ ফুট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বৎসরে সর্প দংশনে ১৮ হইতে ২২ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন পশু যে কত মরে তাহার সংখ্যা নাই। ১৯০৫ সনে ভারতে সর্প দংশনে মৃত্যু হইয়াছিল ২১৭০৭ জন লোকের এবং ১৯০৬ সনে ঐ মৃত্যুর সংখ্যা ২২৮৫৪। গভর্ণমেণ্ট সাপ মারিবার জন্য পুরস্কার দিয়া থাকেন। সে জন্য মৃত সাপের অনেকটা হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৮০ সনে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাপ মারিয়াছিল কিন্তু ১৮৮৯ সনে উহার পরিমান বইয়াছিল ৬ লক্ষ।

পৃথিবীর অনেক স্থলেই সাপের পূজা হইয়া থাকে এবং আমাদের ভারতেও ঐরূপ পূজা করার রীতি আছে। বঙ্গদেশে অনেক স্থলে মনসা পূজায় বেশ একটু ধুম হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বহু সাপের ওঝা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা অনেক সময়ে লোককে ঠকাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সাপ ধরিবামাত্র উহার বিষ দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দন্ত ভাঙ্গিবার এক সহজ উপায় এই যখন সাপ ধরা হয়, তখন উহার উপরে একখানা বস্ত্র ফেলিয়া দেয়, তৎক্ষণাৎ সর্প ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ বস্ত্র দংশন করে। উহাদের দন্ত বংশীর মত বক্র বিধায় বস্ত্র হইতে দন্ত সহজে ছাড়াইতে পারে না, সে সময়ে হঠাৎ জোরের সহিত টান দিলেই দন্ত ভাঙ্গিয়া যায় ইহার পরে লোহার শলা পোড়াইয়া উহার বিষের থলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কখন ২ ঐ বিষদন্ত ও বিষের থলি পুনরায় উদগম হয়। সে অবস্থায় অনেক ওঝা মারা যায়।

এই ওঝা গৃহস্থ বাড়ীর যে কোন স্থান হইতে অল্প সময়ের মধ্যে বিষধর সর্প বাহির করিয়া ফেলিতে পারে। কারণ তাহারা কাপড়েরর ভিতরে নিজেদের পোষা সাপ লুকাইয়া রাখিয়া তাহাই বাহির করিয়া থাকে। তাহাতেও বাজিকরদের মত হাত ছাপাইয়ের দরকার। তবে কথা এই নূতন সাপও ইহারা ধরিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতা দরকার। সাপের লেজ ধরিয়া জোরের সাহত ঝিটকা টান দিতে পারিলে উহার মেরুদণ্ডের অস্থি সকলের সন্ধি সাময়িক শিথিল হইয়া পড়ে এবং সে সময়ে সর্পের গলদেশ শক্ত করিয়া ধরিলে সর্প কাবু হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ সাপ কখন বক্র হইয়া গলদেশের নিকটে মুখ আনিতে পারে না। কাজেই কামড়াইতে পারে না।

জীবদেহে বিষধর সর্পের বিষ ঢালা অনেকটা ডাক্তারদের হাই-পডার্ম্মিক (Hypodermic) পিচ্‌কারী দ্বারা বিষ ঢালার মত। উহাদের বিষদন্তের ভিতরে ছিদ্র আছে এবং দংশন করা মাত্র বিষের থলিতে চাপ পড়ে, সে সময়ে দন্তের ছিদ্র দ্বারা বিষ শরীরে প্রবেশ করে।

শঙ্খিনী সাপকে আমাদের দেশে সাপের রাজা বলা হইয়া থাকে, কারণ উহারা অনেক বিষধর সর্প খাইয়া ফেলে কিন্তু এই শঙ্খিনীও বিষধর এবং ইহার কামড়ে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেক সাপের জীবদিগকে মোহিত (Hypnotise) করিবার শক্তি

[illegible]; এই শাঙ্খনীও অপর সাপকে মোহিত করিয়া ফেলে।

আফ্রিকার একশ্রেণীর বন্যলোক একরূপ সাপের বিষ দ্বারা তাহাদের তীর বিষাক্ত করিয়া থাকে। এই বিষের সামান্য আঘাতেই হরিণ মরিয়া যায় এবং তাহারা ঐ হরিণের মাংস নির্ভয়ে খাইয়া থাকে।

আফ্রিকার এক জাতীয় ক্ষুদ্র শৃঙ্গ বিশেষ্ট সর্প আছে, উহারা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ও ধূর্ত্ত।

উত্তর আমেরিকায় রেটেল সর্প (Rattle Suake) নামক একরূপ বিষধর সর্প আছে। উহাদের লেজের [illegible]কটী শুষ্ক পাতলা হাড়ের বলয় থাকে। উহা [illegible]একরূপ ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ হয়। এই শব্দ হইতে উহাদের নাম হইয়াছে। ভগবান যে কি উদ্দেশ্যে ইহা-দিগকে এই বাদ্যযন্ত্র দিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তবে [illegible] যায়, একটী সর্প লেজ নাড়িয়া শব্দ করা মাত্র নিকটস্থ ঐ জাতীয় অন্য সর্পও শব্দ করিয়া থাকে। [illegible] আছে শীতকালে ইহাদের বহু সহস্র একত্র হইয়া বাস করিত এবং সেই সময়ে অনেক সাপ ২০ ৩০ মাইল দূর হইতে আসিয়া দলে মিশিত।

বোয়া জাতীয় অতিকায় সর্পের দন্তের পরিমান অনেক কিন্তু ইহারা ইহাদের ভক্ষ্য জীবনে পিষিয়া মারিয়া ফেলে। সাধারণ ছোট জাতীয় সর্পের দন্তের পরিমান কম অথচ উহারা উহাদের খাদ্য চিবাইয়া মারিয়া লয়।

সাপের দাত বরশির মত বক্র হওয়াতে উহা একবার যাহা কামড়াইয়া ধরে তাহা সহজে ছাড়িতে পারে না। এই কারণে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একবার এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। তথায় এক কুঠরীতে এক জোড়া বোয়া সর্প থাকিত; একটী লম্বে ১১ ফুট এবং অপরটী ৯ ফুট। একদিবস সন্ধ্যার সময়ে উহাদের রাঁক দুইটী মুরগী দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পর দিবস প্রাতে আসিয়া দেখিল বৃহৎ সর্পটীর আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হইয়াছে এবং ছোটটীর চিহ্ন মাত্র নাই। পরে বুঝা গেল বড় সাপ ছোটটীকে খাইয়া ফেলিয়াছে। বড়টীর আহারের পরে যখন দেখিল তাহার সঙ্গিনীর মুখে একটী মুরগী রহিয়াছে তখন ঐ মুরগী ধরিতে গিয়া ছোটটীর মস্তক গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে সমস্ত সর্পটীকেই উদরস্থ করিতে হয়। এই গুরু ভোজনের পরে ২৮ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিতে হয়। এইরূপ একবার একটী সর্প একখানা কম্বল খাইয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

কৃষ্ণভক্ত মুসলমান।

মহাত্মা চৈতন্যদেব যখন অবতাররূপে অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনি হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ভক্তবীর যবন হরিদাস তাঁহারই পার্শ্বচর ছিলেন। অধর্ম্ম প্রভাবে যখন দেশ পাপে ডুবুডুবু হয়, যখন দেশের মানব শ্রেণী পাপ পঙ্কে ডুবিতে থাকে তখনই ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া অবতার সাজিয়া মানবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। দেশের পাপ পঙ্কিলঅবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি, দয়া ও ভক্তির আধাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে দেখিলেই হৃদয় ভক্তিরসে ভাসিয়া যাইত। তাঁহার সহিত শাস্ত্র, ধর্ম্মালোচনা করিতে গেলে তাঁহা হইতে দীক্ষা লওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। এইরূপে মহাপ্রভু দেশের লোককে ধর্ম্মে জাগ্রত করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানা যায় তৎকালে বহুতর অহিন্দু বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় বহুতর হিন্দু যাহারা বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছিলেন অথবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের আয়োজন করিয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে প্রেম, ভক্তি প্রদান করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, মহাপাপীকেও তিনি আলিঙ্গন দান করিয়া উদ্ধার করিলেন।

এখনও স্থানে স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলে কৃষ্ণভক্ত মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জেলার স্থানে স্থানে এইরূপ মুসলমান বিরল নহে। আজ এইরূপ দুই একটী মুসলমানের পরিচয় প্রদান করিব। ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগে ও শ্রীহট্ট জেলায় বহুতর মুসলমান কৃষ্ণভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা শ্রোতা ও দর্শকের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। অনেক মুসলমান কবিওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনা করিয়া উপস্থিত মতে গান গাহিয়া সকলকে মাতাইয়া থাকেন। এখন ইহাদের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার অন্তর্গত কামঠখালী গ্রামে বৈলর খাঁ নামক একজন সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। তাহার বয়স এখন প্রায় বাইট্‌ বৎসর। বৈলর খাঁ কৃষ্ণভক্ত, তিনি গোঁসাই চান্দুরা গ্রামের অধিবাসী ৺ বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই মালা জপ করেন। কতিপয় বৎসর হইল বৈলর খাঁ উক্ত গোস্বামী মহাশয় দ্বারা তাঁহার বাড়ীতে মহোৎসব দিয়াছিলেন। গোস্বামীর আহ্বানে [illegible] সে উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। সে উৎসবে [illegible] কয়েক দিনের কৃষ্ণকীর্ত্তন উল্লেখ যোগ্য। বৈলর খাঁ নিরামিষাশী, তাহার বাড়ীতে মুসলমানের জুম্মাঘর ও হিন্দুর ঠাকুর ঘর বর্ত্তমান আছে। হিন্দু ও মুসলমান অতিথি তাহার বাড়ীতে সাদরে স্থান পায়।

বৈলর খাঁ ব্যতীত তাহার বাড়ীর নিকট হাটশিরা গ্রামে উজীর সরকার নামে এক মুসলমান কবিওয়ালা বাস করিতেন। তাহার গান আমরা শুনিয়াছি, তাহার কবিগান ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ত্তনও শুনিয়াছি। তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক গান করিলেও তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন নাই। উজীর সরকার কয়েক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। এখন কাবওয়ালা সাধু সরকারের নাম শুনিতে পাই। তাহার বাড়ী কেন্দুয়া থানার এলাকায়। সাধু সরকারের কবিগান আমরা শুনিয়াছি, মুসলমানের মুখে কৃষ্ণ চরিত্র বেশ ভাল শুনায়। এই সকল মুসলমানগণ তাহাদের স্বীয় সমাজে হতাদৃত নহেন।

অনেকে কুমিল্লা জেলার শ্যামগ্রামের গোলমামুদের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি সাধক প্রবর ৺ [illegible] রায় হইতে কালী মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এখনও গোলমামুদ জীবিত আছেন বলিয়া অবগত

...ছি. গোলমামুদ কালী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহার কীর্ত্তনও আমরা শুনিয়াছি। গোলমামুদ একজন শ্রেষ্ঠ কালী সাধক। এ সকল ব্যতীত আরো হিন্দু দেবতার উপাসক মুসলমান সাধকের কথা শুনা যায়—তাহাদের সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। গোলমামুদ নিজে রচনা করিয়া কালীকীর্ত্তন গাহিয়া থাকেন। সাধক শ্রেষ্ঠ ভুবন রায়ের বহুতর গান এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমি ৺ভুবন রায়ের গানগুলি বা গানের বহি সংগ্রহ করিতে তাঁহার পল্লীর নিকট শ্যামগ্রামে গিয়াছিলাম কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইচ্ছা ছিল ঐ সকল সংগ্রহ ...রিলে মুদ্রিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

ফরাসীবিপ্লব-যুগের কয়েকটী চিত্র।

কন্‌ভেন্‌সন্‌।

(ক)

মানবজাতির দৃষ্টিসীমায় কন্‌ভেন্‌সন্‌ (জাতীয় মহাসমিতি) অপেক্ষা উচ্চতর দৃশ্য আর কখনো আবির্ভূত হয় নাই। ইহার মহীয়সী উচ্চতার সান্নিধ্যে দৃষ্টি আপনা হইতেই সংযত হইয়া আইসে।

হিমালয় জগতে একটিই আছে। কন্‌ভেনসনেরও আর দ্বিতীয় নাই।

ইতিহাসের উচ্চতম শীর্ষ এই কন্‌ভেন্‌সন্‌।

ইহার জীবদ্দশায় (কন্‌ভেন্‌সনেরও জীবন ছিল) লোকে এটাকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সমসাময়িকগণ ইহার প্রতাপে অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাহা কিছু বিরাট, তাহাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভীতিরও উদ্রেক করে। যাহার বিশেষত্ব আমাদের ধারণাতীত নহে—যেমন সামান্য শৈলমালা—তাহার প্রশংসা করা সহজ। কিন্তু যাহা কিছু অত্যুন্নত—তাহা প্রতিভাই হউক, কি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গই হউক—কোন পারিষৎই হউক, কিংবা চারুকলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনই হউক—তাহার আত্যন্তিক নৈকট্য আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। একটা অপরিমেয় উচ্চতাকে নিতান্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। ইহার চড়াইয়ে দম আটকাইয়া আসে, উৎরাইয়ে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে হয়, খাড়াইয়ে দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়; ঝরণার সফেন তরঙ্গ খাদের গভীরতা প্রকাশ করে; চূড়াগুলি চির-মেঘাবৃত। নিতান্ত খাড়া পর্ব্বতে আরোহণ তথা হইতে পতনের মতোই ভয়াবহ। সুতরাং ভীতিবিহ্বল চিত্ত তাহার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিবার আর অবকাশ পায় না। ফলে, ভাবটা হয় অদ্ভুত রকমের—বিরাটের প্রতি বিরক্তি। গভীর গহ্বর দর্শনে আতঙ্কিত-হৃদয় ব্যক্তির চক্ষে পর্ব্বতের মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি আর প্রতিভাত হয় না। বৃহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব মুগ্ধ বিস্ময়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

কন্‌ভেন্‌সনের সম্বন্ধে লোকের ধারণা প্রথমে এইরূপই ছিল। ঈগলের দূরদৃষ্টি লইয়া যাহার পরিমাপ করা উচিত ছিল, তাহা পরিমিত হইল অর্দ্ধান্ধের ক্ষীণ-দৃষ্টি দ্বারা।

আজ আমরা কন্‌ভেন্‌সনকে তাহার উপযুক্ত পারিপ্রেক্ষিকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। সুদূর গভীর নীলাকাশের ভিতর দিয়া প্রশান্ত বিষাদময় পৃষ্ঠপটের উপর উহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বিরাট মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

(খ)

১৪ই জুলাই এ মুক্তি।

১০ই আগষ্টে বজ্রনির্ঘোষ।

২১শে সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা।

২১ শে সেপ্টেম্বর সমানবারাত্রি—পঞ্জিকাযোর পুণ্যাহ।

তুলাদণ্ড সাম্য ও ন্যায়ের চিহ্ন। তুলারাশিতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কন্‌ভেন্‌সন্‌ জনসাধারণের প্রথম অবতার। কন্‌ভেন্‌সন্‌ হইতেই ইতিহাসের উজ্জল নূতন পৃষ্ঠার আরম্ভ। কন্‌ভেনসনেই মহান্‌ ভবিষ্যতের উদ্বোধন।

আইডিয়া মাত্রেরই দর্শনযোগ্য পরিচ্ছদ চাই। মত মাত্রেরই আবাস-স্থলের প্রয়োজন। গির্জ্জা, প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বর। প্রতি ধর্ম্মমতই মন্দির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কন্‌ভেন্‌সন্‌ যখন একটি বাস্তব সত্তায় পরিণত হইল, তখনই সমস্যা দাঁড়াইল, ইহার ভবন হইবে কোথায়?

প্রথমতঃ 'ম্যানেজ' ক্লাবগৃহ, তৎপর টুইলারিস্‌ উত্থানবাটিকা এতদর্থে নির্ব্বাচিত হয়। মঞ্চ প্রস্তুত হইল, বৃন্তাবলী সংযোজিত হইল, সারি সারি বেঞ্চ সজ্জিত হইল। একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ—তথায় দাঁড়াইয়া বক্তারা বক্তৃতা করিত। হলটি কতকগুলি আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত। তাহাতে দর্শকদের ভিড় হইত। রোমীয় চন্দ্রাতপ ও গ্রীসীয় পর্দ্দা খাটানো হইল।

এই সব সমকোণ ও সরল রেখার মধ্যে কন্‌ভেন্‌সন্‌ প্রতিষ্ঠিত হইল—জ্যামিতিক সজ্জার মধ্যে ঝটিকাকে অবরুদ্ধ করা হইল।

বক্তৃতামঞ্চে লাল টুপী ধূসরাক্ত করিয়া অঙ্কিত হইল। এই রক্তধূসর টুপী, এই থিয়েটারের হল, এই পিজ-বোর্ডের স্মৃতিস্তম্ভ, এই কাগজের মন্দির, এই কাদামাটির দেবায়তন—এই সব লইয়া রাজপক্ষীয়েরা হাসিঠাট্টা করিত। কত শীঘ্রই না এইগুলির বিলোপ হইবে! পিপের তক্তায় তৈয়ারী স্তম্ভ, প্যাকিং বাক্সের কাঠের খিলান, খড়িমাটির প্রতিমূর্ত্তি, চিত্রিত মার্ব্বেল, আর ক্যানভাসের দেয়াল, এই অস্থায়ী আশ্রয় স্থলকে ফ্রান্স চিরন্তন আবাস ভবনে পরিণত করিয়াছে।

রাইডিং স্কুলে কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রাচীরগুলি প্ল্যাকার্ডে আবৃত থাকিত। প্যারিস তখন এই রকম প্ল্যাকার্ডে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এটা হচ্চে ভ্যারেনিস্‌ হইতে রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে।

একটা প্ল্যাকার্ডে এই কথাগুলি ছিল:—

রাজা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়া উল্লাসধ্বনি করিবে, যে প্রহৃত হইবে; যে রাজার অপমান করিবে, তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইবে।

আর একটাতে:—চুপ,চুপ, মাথার টুপী খুলিও না। সে তাহার বিচারকদের সম্মুখ দিয়া এখনই চলিয়া যাইবে।

আর একটাতে:—রাজা দেশের লোকের উপর বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। এখন দেশের লোকদের পালা।

আর একটাতে:— আইন! আইন!

ঐ দেয়ালগুলির মধ্যেই ষোড়শ লুইএর বিচারের জন্য কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইয়াছিল।

১৭৯৩ অব্দের ১০ই মে তারিখ হইতে টুইলারিসে কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইতে লাগিল। উহার নাম হইল "জাতীয় প্রাসাদ"। "ঐক্য ভবন" ও "স্বাধীনতা" ভবনের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থান কন্‌ভেন্‌সনের মিটিংএর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। "সাম্যভবনও" একটি ছিল। কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইত দ্বিতলে। নিম্নতল বহুসংখ্যক ক্যাম্পখাট বিছানাপত্র ও আসবাবে পূর্ণ ছিল। কন্‌ভেন্‌সনের রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র সৈনিকগণ তথায় পাহারা দিত। কন্‌ভেন্‌সনের একদল 'গার্ড অব অনার' ছিল। তাহারা কন্‌ভেন্‌সনের গ্রেনাডিয়ার নামে অভিহিত হইত।

প্রাসাদে এসেম্ব্লির অধিবেশন হইত। তৎসংলগ্ন উত্থানে জনসাধারণ যাতায়াত করিতে পারিত। একটি ত্রিবর্ণের ফিতা দ্বারা উভয়ের ব্যবধান চিহ্নিত ছিল।

(গ)

এখন অধিবেশন হলটির বর্ণনা দেওয়া যাক্। এই ঐতিহাসিক স্থানের প্রত্যেকটি জিনিষই কৌতুহলপূর্ণ।

হলে প্রবেশ করিবা মাত্র প্রথমেই চোখে পড়ে দুইটি প্রশস্ত জানালার মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত 'স্বাধীনতা' দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ১৪০ ফুট, প্রস্থে ৩৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৭ ফুট। রাজার এই রঙ্গভূমি পরে রাষ্ট্রবিপ্লবের রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। রাজ পারিষদগণের জন্য নির্ম্মিত এই সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ হল ১৭৯৩ সালে কাষ্ঠমঞ্চে ঢাকা পড়িয়া যায়। সেই সব কাষ্ঠ মঞ্চে জনসাধারণ উপবেশন করিত।

যে কাঠামোর উপর এই সব মঞ্চ তৈরী হইয়াছিল তাহা ৩২ ফুট পরিধির একটি মাত্র কাষ্ঠস্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান ছিল। বহুবর্ষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের গুরুভার এই স্তম্ভটি বহন করিয়াছে। প্রশংসার করতালি, উৎসাহের উদ্দীপনা, ধৃষ্টতার চীৎকার, কলহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, বিরুদ্ধ দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা—ইহার উপর দিয়া কতই ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও ইহা ভাঙিয়া পড়ে নাই। কন্‌ভেন্‌সনের পর ইহা কাউন্সিল অব দি এ্যান্‌শেন্টকেও (প্রবীণগণের পরিষৎ) দেখিল। অবশেষে বৈপ্লবিক অব্দের ১৮ই ক্রমেয়ার তারিখে ইহার খাটুনীর অবসান হয়। তখন কাষ্ঠস্তম্ভের পরিবর্ত্তে মর্ম্মরস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হয়। কিন্তু সেগুলি এরূপ স্থায়ী হয় নাই।

এই সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো হলটির একপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড বৃত্তার্দ্ধ। তাহাতে ক্রমোচ্চ ঊনবিংশ সারি বেঞ্চ অর্দ্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। এইগুলিই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের আসন।

আসনগুলির সম্মুখে উচ্চ মঞ্চ। মঞ্চের সম্মুখভাগে লেপেলটিয়ার সেন্টফার্গুর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি, পশ্চাদ্ভাগে প্রেসিডেন্টের চেয়ার। মঞ্চের পাদমূলে দৌবারিকগণের স্থান। মঞ্চের একপার্শ্বে তাম্রপাতের ফ্রেমে বাঁধাই ৯ ফুট লম্বা একটা প্ল্যাকার্ড দেওয়ালে টাঙ্গান। তাহাতে মানবের স্বাভাবিক স্বত্ব সম্বন্ধীয় ঘোষণা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মঞ্চের উপরিভাগে বক্তার মাথার উপর দিয়া তিনটী প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণের পতাকা উড্ডীন ছিল। পতাকাগুলি একটি বেদীর উপর স্থাপিত। উক্ত বেদীতে 'আইন' এই কথাটি লিখিত ছিল। প্রেসিডেন্টের দক্ষিণে লাইকার্গাস এবং বামে সোলোন—প্রাচীন স্পার্টা ও এথেন্সের এই দুই ইতিহাস বিখ্যাত বিধিব্যবস্থাপকের প্রস্তর মূর্ত্তি।

হলের এক এক পার্শ্বে দশটি করিয়া সাধারণ মঞ্চ ও দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড ঘেরা জায়গা ছিল। মোটের উপর চারিশতটি আসন। এইগুলিতে জনতার মহোত্সব হইত। কন্‌ভেন্‌সনের হলে দুই হাজার লোকের সহজেই স্থান হইত। নগরবাসীদের বিদ্রোহের দিন তথায় ৩০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল।

প্রত্যহ দুইবার করিয়া কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইত—দিনের বেলায় একবার এবং সন্ধ্যাকালে একবার।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ বঙ্কিম ও সোনালী কীলকমণ্ডিত। টেবিলটা পক্ষযুক্ত একপদ রাক্ষস মূর্ত্তি-চতুষ্টয় কর্ত্তৃক ধৃত। টেবিলের উপর একটি প্রকাণ্ড হ্যাণ্ড-বেল, একটা বৃহৎ মসীপাত্র এবং পার্চমেন্টে কাগজের তাড়া—সরকারী রিপোর্টের বই।

বর্শাগ্রে বাহিত সদ্যছিন্ন শির হইতে অনেকবার এই টেবিলের উপর রক্তবিন্দু সিঞ্চিত হইয়াছে।

মঞ্চের দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বাদশফিট উচ্চ দীপাধার, তাহার প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া ল্যাম্প। প্রতি সাধারণ মঞ্চে একটি করিয়া এরূপ বাতিদান ছিল।

গবাক্ষ পথের ম্লান আলোকে দিনের বেলায়ও কক্ষের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হইত না। সন্ধ্যা সমাগমে যখন ল্যাম্পগুলি প্রজ্বলিত হইত তখন তাহাদের ক্ষীণালোকে অস্পষ্ট রহস্যময় দৈত্যপুরের আবির্ভাব

জ্বলিত। তাহাদের মলিন রশ্মি সান্ধ্যচ্ছায়াকে যেন আরো গাঢ়তর করিয়া তুলিত এবং সান্ধ্য অধিবেশনগুলি কেমন বিষাদময় ও ভীতিজনক হইয়া উঠিত।

ইহার সমস্ত পারিপার্শ্বিকই অদ্ভুত ও কোমলতা বর্জ্জিত,—কিন্তু যথাযথ। বর্ব্বরতার মধ্যে শৃঙ্খলা;—বিপ্লবেরই একটা দিক। কন্‌ভেন্‌সনের হলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন শিল্পীগণ মনে করিত—যাহা রীতি-বিরুদ্ধ, পরস্পর-সদৃশঅংশ-বিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। এই ভাবের আতিশয্য ক্রমে মহিমাকে শ্রীহীনতায় এবং পবিত্রতাকে হাস্যকর অযৌক্তিকতায় পরিণত করে। স্থাপত্যেরও শুচিবাই আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণপারিপাট্য ও গঠন সৌষ্ঠবের চোখ্‌ ঝলসান মহোৎসবের পর আর্ট যেন একেবারে উপবাসের ব্যবস্থা করিল এবং শুধু সরল রেখার মধ্যে নিজকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিল। ইহার পরিণাম—শ্রীহীনতা। কলালক্ষ্মী কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা হইয়া রহিলেন। এরূপ বুদ্ধি ও রুক্ষতার দোষ এই যে গঠন-পদ্ধতি ক্রমে কঠোর হইতে হইতে সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়া একেবারে নগণ্য হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রনৈতিক ভাব-প্রাবল্য বাদ দিলেও এই হলের গঠনের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাহাতে বুক দুর্‌দুর্‌ করিয়া উঠিত। আপনা হইতেই লোকের মনে জাগিয়া উঠিত অতীত দিনের স্মৃতি—পুষ্পমাল্যবিভূষিত আসন-শ্রেণী, কক্ষের নীল লোহিত ছাদ, বহু-ডাল-সমন্বিত হীরক-জ্যোতির ঝাড় ও ঝাড়ের কলম হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মিরেখা, কাঁচ ও রঙির চিত্রশোভিত মূল্যবান পর্দ্দাসকলের উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্র্য,—চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে সর্ব্বত্র কেবল মধুর ভাবের বিকাশ, যাহাতে এই বিষন্ন গম্ভীর হলটীকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া রাখিত। আর এখন যে দিকে তাকাও, কেবল কঠোর সরল রেখা ও সমকোণ—ইস্পাতের তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ও তুষার-শীতল।

(ঘ)

কিন্তু "মহাসমিতির" দিকে চাহিয়া হলের কথা আর লোকের স্মরণ থাকিত না। অভিনয় দর্শনে মন দিলে কি রঙ্গমঞ্চের কথা ভাবিবার আর অবসর হয়? এই জনসভার মতো বিচিত্র, বিশৃঙ্খল, অথচ মহিমময় জগতে আর কিছু দেখা যায় নাই। অগণিত বীর ও সংখ্যাতীত কাপুরুষের অদ্ভুত সমবায়। পর্ব্বতে ক্রীড়াশীল মৃগ, জলাভূমিতে ভীষণ সর্প; বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ঠেলাঠেলি, দলাদলি, রেষারেষি, বাক্‌বিতণ্ডায় সভা গম্‌গম্‌ করিত। আজ সেই সব লোক ছায়া মূর্ত্তি মাত্র।

এ যেন অতিকায় দৈত্যগণের মহাসম্মিলন। দক্ষিণে 'গিরোণ্ডি'নামে প্রসিদ্ধ নরম পন্থীগণ—চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ। বামে 'পর্ব্বত' ভিধেয় চরমপন্থীগণ—শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে সম্পৎশালী।

একদিকে—সেই সাংঘাতিক গডেট। টুইলারিস প্রাসাদে রাণী শিশু যুবরাজকে দেখাইয়া দিলে গডেট তাহার ললাট চুম্বন করে, আবার সেই শিশুর পিতৃমস্তক পতনের উদ্যোক্তা ছিল সে-ই। মাথা পাগলা সেলেস্‌, যে অষ্ট্রিয়ার সহিত অন্তরঙ্গতার জন্য চরমপন্থীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। লস্ ডুপারেট,—একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক তাহাকে বদমাস বলিয়া গালি দিলে ডুপারেট উক্ত পত্র সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দেয় এবং বলে, "আমি জানি, 'বদমাস' কথা দ্বারা আপনি কেবল সেই সব লোককে বোঝাতে চান, যাহারা আপনার সঙ্গে একমত নহে।" কুইনেট্—যোড়শ লুইর পতন যাহারা ঘটায়, তাহাদেরই একজন। পাদ্রী দুহেম, যে ক্যামিল ডেস্ মুলিন্‌সের সহযোগে '১৩ই জুলাই' সংঘটিত করে। জ্যাকব ডুপণ্ট, যে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে," আমি নাস্তিক?" তদুত্তরে রব্‌স্‌পীয়র বলে, "নাস্তিকতা, বড়মানষী বটে"। রেবোক,—রবস্‌পীয়রকে এখনো গিলোটিনে দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে পরিতাপ করে। জ্যাসোর্ণ, যে গিলোটিনে আর

মেয়েরাও সময় বলিয়াছিল, "আমাদের প্রাণ যাচ্ছে, আর দেশ এখনো নিদ্রিত; তোমাদের প্রাণ যাবে, তখন দেশ জেগে উঠ্‌বে"। 'প্যারিস-চিত্র' গ্রন্থের লেখক ম্যার্সিয়ার, যে বলিয়াছিল "২১শে জানুয়ারী তারিখে সকল রাজাই একবার নিজ নিজ ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখেছিল।" পিটিয়ন—যাহার ভাগ্যে ১৭৯২ সালে দেশের লোকের পূজালাভ—"জনসাধারণের পিতা" বলিয়া খ্যাতি—আর ১৭৯৪ সালে দেশবিতাড়িত হইয়া অরণ্যে ব্যাঘ্রকবলে জীবন দান। এইরূপ আরো কত কত ব্যক্তি।

অপর দিকে—ত্রয়োবিংশবর্ষীয় সেন্টজাষ্ট—জার্ম্মানরা যাহার নাম দিয়াছিল, "আগুণে শয়তান"। মার্লিন ডি-ডুয়ে—"সন্দিগ্ধদের সম্বন্ধীয় আইনের" ব্যবস্থাপক। ফেবর ডি ইগ্‌লেন্টাইন — সাধারণতন্ত্রীয় পঞ্জিকার প্রবর্ত্তক। ব্যাগট,— জেলখানার বন্দীদের নগ্নতা সম্বন্ধে কোন কোন লোক তাহার নিকট অভিযোগ করিলে সে জবাব দেয়, "কারাগারই ত প্রস্তরময় পরিচ্ছদ।" জ্যাভার,—যে বলিয়াছিল "সমস্ত পৃথিবী ষোড়শলুইকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আপীল করবে তবে কার কাছে? গ্রহ নক্ষত্রের নিকট?" কুভার,—যাহার উক্তি "রাজার শিরশ্ছেদে অপর সাধারণের শিরশ্ছেদের চেয়ে বেশী হৈ চৈ কেন হ'বে?"—ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। লেকয়েন্ট পুইরাডো;—যে ম্যারাটকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করার জন্ম প্রস্তাব উপস্থিত করে। সিয়েটে,—সেই শয়তানমঞ্চের সৃষ্টিকারী, যাহার বাবা হচ্ছে কমিটি অব জেনারেল-সেফ্‌টি এবং যাহার শতকিলে সহস্র বাহু "বৈপ্লবিক সমিতি" নামে সমগ্র ফ্রান্সকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। চালিয়ার,—যে প্রস্তাব করে যে, অভিজাতগণের সম্বোধনে ও "তুমি" শব্দের প্রয়োগ হওয়া উচিত। এই সম্প্রদায়ের শিরোদেশে ছিল একজন নূতন বিরাবো—তাহার নাম ড্যান্টন।

দুই দলের বাহিরে দুই দলেরই ভীতি উদ্রেক করিয়া রব্‌স্‌পীয়রের অভ্যুত্থান।

(৩)

বীরত্ব, কর্ত্তব্যানুরাগ, দেশপ্রীতি ও উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত এই দুই সম্প্রদায়ের নিম্নে ভীত, আতঙ্কিত, নামহীন, খ্যাতিহীন জনসাধারণের মৌন গড্ডলিকা প্রবাহ। যাহারা সন্দেহ করে, যাহারা দ্বিধায় আন্দোলিত হয়, যাহারা অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া আইসে, যাহারা সমস্যার আশু সমাধান না করিয়া সময়ের উপর বরাত দিয়া ফেলিয়া রাখে, যাহারা কেবলই অপেক্ষা করে, যাহারা প্রত্যেকেই কাহারও না কাহারও ভয়ে ভীত—সেইরূপ লোকে এই দল পুষ্ট ছিল। চরমপন্থীদের 'পর্ব্বত' নামের অনুসরণে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল, 'সমতল'। 'চরম' এবং 'নরম' উভয় দলই বাছা বাছা লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু এই 'সমতল' ছিল জনতার খিচুড়ী, আর তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল—সাইয়ে।

কোন কোন মনের গতি অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। সাইয়েকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। 'তৃতীয় সম্প্রদায়' পর্য্যন্ত আসিয়া সে থামিয়া গেল; তারপর জনগণের সহিত আর সে অগ্রসর হইতে পারিল না। সাইয়ে রব্‌স্‌পীয়রের নাম দিয়াছিল "শার্দ্দূল", আর রব্‌স্‌পীয়র তাহাকে বলিত "ছুঁচো"। এই দার্শনিক যে মধ্যপথে থামিয়া গেল তাহা বিজ্ঞ বিবেচনার ফলে নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের প্রণোদনে। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের সৌখীন সহচর, কিন্তু বিশ্বস্ত সেবক ছিল না। সে সকলকেই কর্ম্মতৎপর হইতে উপদেশ দিত, কিন্তু কর্ম্মের আহ্বানে সে নিজে কখনো সাড়া দেয় নাই। কণ্ডর্সেট, ভার্জ্জনদ ক্যামিলডেস্‌মুলিনস্, ড্যান্টন—ইহারা চিন্তাশীল অথচ বীরপুরুষ। আর সাইয়ে ছিল সেইরকম চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আত্মরক্ষা।

"সমতলের" নিম্নেও এক স্তর ছিল—তাহা জলাভূমি—আত্মম্ভরিতার দূষিত, বদ্ধ, পঙ্কিল বারি রাশিতে পূর্ণ। হীন কাপুরুষতা, গুপ্ত ক্রোধ, দাসত্বের বিদ্রোহ—এই সকলের অদ্ভুত মিশ্রণ। নরম দলের মতামত তাহাদের নিকট ভাল বোধ হইত, কিন্তু সাহায্য করিত তাহারা গরম দলকে। শেষ মীমাংসা তাহাদের ভোটের উপরই সর্ব্বদা নির্ভর করিত। আর তাহারা দলে দলে বিজয়ী পক্ষেই যোগদান করিত। তাহারাই ষোড়শ লুইকে ভার্জিনদের হস্তে, ভার্জিনদকে রব্‌স্‌পীয়রের হস্তে এবং রব্‌স্‌পীয়রকে ট্যালিয়েনের হস্তে সমর্পণ করে। জীবিতাবস্থায় তাহারা ম্যারাটকে ভীষণ শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহারা তাহাকে দেবতার আসনে স্থান দেয়। কাল পর্য্যন্ত যাহা তাহারা সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারা অনায়াসেই তাহা উল্টাইয়া দিতে পারে। পতনোন্মুখ পদার্থকে শেষ ঠেলা দিবার একটা প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে যেন অন্তর্নিহিত ছিল। তাহারাই ছিল সংখ্যা, সুতরাং তাহারাই শক্তি, এবং তাহাদিগকেই ভয়। ঘৃণা দুঃসাহসিকতাও তাহাদেরই। ৩১ শে মে, ১১ই টার্মিনেল, ৯ই থার্মিডরের ট্র্যাজিডির জটিল গ্রন্থি—যাহা অসাধারণ মনীষী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা পাকাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার উন্মোচন হইল এই স্বল্পবুদ্ধি বালখিল্যগণের দ্বারা।

(চ)

এই সব উত্তেজনাশীল ব্যক্তির সঙ্গে আবার অনেক কল্পনা-প্রবণ লোকও ছিল। তাহারা সর্ব্বপ্রকার আদর্শ-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিত। কোন কাল্পনিক রাষ্ট্র যুদ্ধপরায়ণ—তাহাতে বধ্যমঞ্চের বিধান ছিল, কোনটি বা শান্তিপ্রিয়—তাহাতে প্রাণদণ্ডের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্ণটের মস্তিষ্ক চতুর্দ্দশ সেনাদলের সংগঠনে নিযুক্ত ছিল; ওদিকে য়্যা ভেরিব প্রতিভা বিশ্বগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত। একদল যেমন সংগ্রামে প্রমত্ত ছিল, আর একদল তেমনি সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। কাহারও মাথায় যুদ্ধ, কাহারও মাথায় [illegible] শৈবাল।

প্রচণ্ড বক্তৃতা এবং তীব্র চীৎকার ও কোলাহলের মধ্যেও এমন কেহ কেহ ছিল, যাহারা চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের চিন্তাশীল মন পরিণামে কল্যাণকর হইত। লাকাঙ্গাল কোনদিন বক্তৃতা করে নাই, কিন্তু সাধারণ জাতীয়শিক্ষার পদ্ধতি তাহারই চিন্তার ফল। ল্যানৃথেনাস নির্ব্বাক থাকিত—প্রাইমারি স্কুলগুলির সৃষ্টি তাহারই। রেভেলিয়র লেপেঁ। আর একজন, যাহার নির্ব্বাক কল্পনা দর্শনকে ধর্ম্মের মর্য্যাদায় উন্নীত করে। আরো কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। গাইটন মরভোঁ হাসপাতালগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবার উপায় চিন্তনে রত ছিল; মেয়ারে বাধ্যতামূলক "বেগার" প্রথার উচ্ছেদে যত্নবান হয়। ঋণের জন্য কারাদণ্ডের প্রথা যাহাতে উঠিয়া যায় তজ্জন্য পেণ্ট আন্দ্রে চেষ্টা করে।

আর্ট সম্বন্ধেও বাতিকগ্রস্ত ক্ষ্যাপার দল ছিল। ২১শে জানুয়ারী, যেদিন বৈপ্লবিকগণ কর্ত্তৃক ফ্রান্সের রাজমস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়—সেদিনও বেজার্ড নামক একজন প্রতিনিধি রিউবেনের আঁকা একটি ছবি দেখিবার জন্য প্যারিসের এক ক্ষুদ্র গলিতে গমন করিয়াছিল।

কলাবিৎ, বাগ্মী, ভবিষ্যদ্বক্তা, ড্যাণ্টনের মতো শক্তিশালী পুরুষবর্গ, ক্লুটসের মতো শিশুমতি জনগণ, যোদ্ধা, দার্শনিক—সকলেরই লক্ষ্য "উন্নতি, উন্নতি," কিছুতেই তাহারা পশ্চাৎপদ কিংবা হতোৎসাহ হইত না। "অসম্ভব" কথার মধ্যে সত্যতা কতদূর, সেটা নিঃশেষে পরীক্ষা করিয়া দেখা—ইহাই ছিল কন্‌ভেনসনের একটা বিশেষত্ব। উহার একপ্রান্তে আইনের উপর [illegible] রব্‌স্‌পীয়র; অপর প্রান্তে কর্ত্তব্যের উপর স্থির-দৃষ্টি কণ্ডর্সেট। কণ্ডর্সেট সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল; রব্‌স্‌পীয়র কার্য্যতৎপর।

রাষ্ট্রবিপ্লবের দুইস্রোত—জোয়ার এবং ভাঁটা। এই স্রোতদ্বয়ের নানা অংশে নানা ঋতু বর্ত্তমান—চিরতুষার হইতে কুসুমিত বসন্ত পর্য্যন্ত। প্রতি অংশে সেই সেই ঋতুর উপযোগী লোকই জন্মিয়া থাকে—কেহ কেহ উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে ভাসিয়া বেড়ায়, আর কেহ কেহ বা মুহুর্মুহু বজ্রপাতের কন্দুক ক্রীড়ার মধ্যে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে।

(ছ)

কন্‌ভেন্‌সেনের যে কোন অধিবেশন দেখিতে গেলেই যেন ক্যাপেটের (ষোড়শলুই) শোচনীয় বিচার ব্যাপারটা নূতন করিয়া চোখে ভাসিত, এবং মনে হইত তাহার বধ্যমঞ্চের কৃষ্ণচ্ছায়ায় হলের অভ্যন্তর আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ২১শে জানুয়ারীর মর্ম্মান্তিক কাহিনী কন্‌ভেন্‌সনের সকল কার্য্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। আঠার শত বৎসর ধরিয়া প্রজ্বলিত রাজতন্ত্রের অতি প্রাচীন বহ্নিশিখা যাহাদের ভীষণ ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হয়, সেই সকল লোকের নিদারুণ শ্বাস প্রশ্বাসে এই প্রবল-প্রতাপ জাতীয় মহাসমিতির বিশাল কক্ষ সর্ব্বদাই পূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। এই এক রাজার বিচারে যেন ইউরোপের রাজন্যবর্গের সকলের শেষ বিচার হইয়া গেল, এবং অতীতের বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল সেইদিন হইতে তাহার গতি নূতন পথে পরিবর্ত্তিত হইল। সেদিন, ক্রুদ্ধ উত্তেজিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যাহাদের মুখ হইতে বাক্যের অগ্নিঝলক উদ্গীরিত হইয়া অসহায় রাজতন্ত্রকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়াছিল। দর্শকগণ তাহাদিগকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিত। "গ্যারোণে" ডিষ্ট্রিক্টের এগারজন প্রতিনিধিকে যখন ষোড়শলুইর সম্বন্ধে 'রায়' দিবার জন্য আহ্বান করা হইল, তখন তাহারা পরপর এইরূপ উত্তর দেয়।

মেল্‌রে—"মৃত্যু"
জেন্‌সাস—"মৃত্যু"
ব্রোজিয়েন—"মৃত্যু"
কাসে—"মৃত্যু"
আইরল—"মৃত্যু"
জুলিয়েন—"মৃত্যু"
ডেসাবি—"মৃত্যু"।

প্যাগানেল্ বলিল—"মৃত্যু! রাজা দেশের কল্যাণ লাগ্‌তে পারে কেবল মৃত্যুদ্বারা।" মিলড—"মৃত্যু বলিয়া কিছু না থাকিলে তাহা আবিষ্কারের প্রয়োজন হইত।" বৃদ্ধ রাফোঁ ডা টুইলেট—"আশুমৃত্যু।" গুদিয়ো—"বধ্যমঞ্চে, এক্ষুণি, বিলম্বে কেবল মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়ান হইবে।" সাইয়ের উক্তি শেষকৃত্যের মতোই সংক্ষিপ্ত—"মৃত্যু"। থুরিয়ো—যে জনসাধারণের নিকট লুইএর আপীল করিবার প্রস্তাব এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে—"কি! প্রাথমিক সমিতির নিকট আপীল? চল্লিশ হাজার বিচার আদালত! মোকদ্দমার যে আর শেষ হইবে না। ষোড়শ লুইএর মস্তক যে পতনের আগেই শুভ্র হইয়া যাইবে।" রব্‌স্‌পীয়রের ভ্রাতা আগষ্টিন রব্‌স্‌পীয়র বলিল, যে মানবপ্রেম জনসাধারণকে হত্যা করে আর অত্যাচারীকে ক্ষমা করে—আমি তার ধার ধারিনে—মৃত্যু। কুসিডর—"নররক্তপাতে আমার আতঙ্ক হয়—কিন্তু রাজার রক্ত ত আর মানুষের রক্ত নয়—মৃত্যু।" সেণ্ট জাস্ত্রে—"অত্যাচারীকে বধ না করিয়া কোন জাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারে না।" লেভিকণ্টারি—"অত্যাচারীর বেঁচে থাকার মানে স্বাধীনতার শ্বাসরোধ—মৃত্যু।"

তারপর "নরম" দল। জেণ্টিল, যে বলিয়াছিল "আমার ভোট কারাদণ্ডের পক্ষে। লুইকে প্রথম চার্লস করে, তোলা মানে আবার ক্রমোয়েলের সৃষ্টি করা।" বান্কাল—"নির্ব্বাসন। আমি দেখ্‌তে চাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা পেটের দায়ে ব্যবসা করে খাচ্ছে।" এ্যালবয়—"নির্ব্বাসন। এই জীবন্ত প্রেতাত্মা যত রাজসিংহাসনের আশে পাশে ঘুরে' বেড়াক্।" জোক্রিয়াকমি—"কারাদণ্ড। ক্যাপেট বেঁচে থাকুক,—সে লোকটা

তুচ্ছ হয়ে উঠ্‌বে।" চ্যাপল—"তাকে বাচ্‌তে দাও। মৃত্যুর পর যে লোকে তাকে দেবতা করে' তুলবে, সেটা আমি ইচ্ছা করিনে।" আর পীড়িত রোলাণ্ড—তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে তাহাকে রোগশয্যায় শয়ান অবস্থাতেই এসেম্‌ব্লিতে বহিয়া আনা হয়—এবং রাজার জীবন রক্ষার জন্ত ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ইহ জীবনের অবসান হয়। ম্যারাট তাহাতে বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই।

দর্শকগণের চক্ষু আরও একজনকে সেই হলের মধ্যে অনুসন্ধান করিত—ইতিহাস আজ যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে,—যে সেই সাইত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনে ক্লান্ত হইয়া বেঞ্চের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং ভোটের সময় তাহাকে জাগাইয়া দিলে ঈষদুন্মীলিত নেত্রে "মৃত্যু" এই কথা বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

নির্দ্দয় ওষ্ঠপুটের মধ্য হইতে এই সব দণ্ডাজ্ঞা বাহির হইয়া যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল তখন বিচারালয়ের বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা বুককাটা জামা-পরিহিতা রমণীগণ হাতের তালিকায় পিনের খোঁচা দিয়া দিয়া ভোট গণনা করিতেছিল।

ষোড়শ লুইএর দণ্ডাদেশের পর রব্‌স্‌পীয়র আর আঠারো মাস বাঁচিয়াছিল; ড্যান্টন পনেরো মাস; ভার্জিনদ নয়মাস; ম্যারাট পাঁচমাস তিন সপ্তাহ, লেপেলটিয়র সেণ্টফার্গো একদিন।

মনুষ্যের মুখ হইতে দ্রুত নির্গত কি প্রবল ও সাংঘাতিক ফুৎকার।

(জ)

এই মহা সমিতি যেমন বিপ্লব বহ্নির বিস্তার সাধিনী, তেমনি আবার ইহা সভ্যতারও জননী। ইহা চুল্লীও বটে, কারখানাও বটে। ইহার বিরাট কটাহে ফুটন্ত বিভীষিকার মধ্যেই ভবিষ্যৎ উন্নতির পরমাণু গুলি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। এই প্রলয়ের তিমির-গর্ভ হইতে, এই ঝটিকা তাড়িত মেঘপুঞ্জের কৃষ্ণ যবনিকান্তরাল হইতে নৈসর্গিক নিয়মের মতোই সর্ব্বকালোপযোগী বিধিব্যবস্থার সহস্র কিরণরেখা দেশকে আলোকিত করিয়া তোলে। মানব সভ্যতার মহাকাশ এই সকল কিরণমালায় চির উজ্জল হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়, পরমত-সহিষ্ণুতা, দাক্ষিণ্য, সত্য, অধিকারসাম্য এবং উদার জনপ্রীতি, এই গুলিই সেই কিরণ রেখা। সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার মূলসূত্রটুকু কন্‌ভেন্‌সনের এই ঘোষণার মধ্যে ধৃত রহিয়াছে :— "প্রত্যেক সামাজিক মনুষ্যের স্বাধীনতার শেষ সেইখানে, যেখানে অপর একজনের স্বাধীনতার আরম্ভ।"

দারিদ্র্য অপরাধ নহে—ইহা কন্‌ভেন্‌সনেরই ঘোষণা। অন্ধ ও মূকবধিরগণের প্রতিপালন, পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি পাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ষ্টেটের কর্ত্তব্য—এই মত কনভেনসনে বিধিবদ্ধ হয়। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ, অবৈতনিক জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা—প্রতি মিউনিসিপালিটিতে প্রাইমারী স্কুল, প্রতি বৃহৎ নগরে সেণ্ট্রাল স্কুল, এবং প্রতি প্যারিসে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন, সঙ্গীতসমাজ এবং মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বত্র এক আইনের এবং একপ্রকার ওজন পরিমাপের প্রচলন, দশমিক প্রথানুসারে সকল প্রকার গণনার সমীকরণ— এই সবই কন্‌ভেন্‌সনের কার্য্য। রাজ-শাসনে দেশ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল, কন্‌ভেন্‌সন্‌ তাহার অর্থ সমস্যাকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আবার বিশ্বাস জন্মাইতে কৃতকার্য্য হয়। কন্‌ভেন্‌সন নিরুপায় বার্দ্ধক্যের জন্ত অনাথাশ্রম, পীড়িতের জন্ত হাসপাতাল, লোকশিক্ষার জন্ত বিবিধ শিল্প বিদ্যালয় এবং জ্ঞান বিস্তারের জন্ত ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে।

এই মহাসমিতি জাতীয় হইলেও বিশ্বমানবের হিতের প্রতি অন্ধ ছিল না। ইহার এগার হাজার দুইশত দশটি নির্দ্ধারণের মধ্যে তৃতীয়াংশ মাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারের

সহিত সংস্থ, বাকী দুই তৃতীয়াংশেরই উদ্দেশ্য মানব-সাধারণের কল্যাণ।

স্তম্ভের উপর ব্যাঘ্রবৎ ইউরোপীয় নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ এবং অন্তরের মধ্যে ভেতি মহাসর্পের দংশন—এতৎসত্বেও কন্‌ভেন্‌সন এই সকল মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

(খ)

কি বিচিত্র এবং বিপুল জনগণসমারোহ। কন্‌ভেন্‌সনে সকল রকমের লোকই ছিল—মানুষ, অমানুষ, অর্ধমানুষ। বিরুদ্ধ মতের একেবারে জগন্নাথ ক্ষেত্র। ইহা একাধারে ব্যাক্তিমান্ প্রবীণগণের সম্মিলন এবং জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল মজলিশ, মন্ত্রণা গৃহ এবং চৌরাস্তা, বিচারালয় এবং আসামী। গডেট সেণ্ট জাষ্টকে বিদ্রূপ কর্চ্ছে, ভার্জ্জিনদ ড্যান্টনকে অবজ্ঞা কর্চ্ছে, লুভেট রবস্‌পীয়রকে আক্রমণ কর্চ্ছে, বুজো ইগেলিটের উপর দোষারোপ কর্চ্ছে, আর সকলেই ম্যারাটকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। রবস্‌পীয়রের বন্ধু আর্‌মন্‌ভিল্ শক্তি-সাম্যসংস্থাপনার্থ ষোড়শলুইএর পরে রবসপীয়রকেও গিলোটিনে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এই সভাতে এমন সব বাক্য উচ্চারিত হইত যাহাতে, বক্তার অজ্ঞাতসারে, বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণীর সুর বাজিয়া উঠিত। এই সকল কথার পরেই এমন সব ব্যাপার ঘটিত যাহাতে মনে হইত ঘটনাস্রোত যেন উক্ত কথাতেই ঘূর্ণিপাক খাইয়া ক্ষুব্ধ এবং দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতের উপরিস্থিত তুষার-শৈল কখনো কখনো একটি মাত্র কথার বায়ুতরঙ্গাভিঘাতে সঞ্চালিত হয়; একটি বেশী কথার চাঞ্চল্যে সময় সময় পর্বত চূড়া ধসিয়া যায়; কেহ কথা না বলিলে হয়ত এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। ঘটনারও ক্রোধ আছে, বলা যায়।

কন্‌ভেন্‌সনে কথার অমিতাচার যেন লোকের স্বাভাবিক অধিকারে পরিণত হইয়াছিল। দাবানলের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের মতো ক্রুদ্ধ বাক্যাংশগুলি পরস্পর কাটাকাটি করিয়া ছড়াইয়া পড়িত। এস্থলে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

পিটিয়ন—"রবস্‌পীয়র, এখন আসল কথাটা বল"।

রবস্পীয়র—"আসল কথাটা হচ্ছে, তুমি, পিটিয়ন। তা'ইত বলতে যাচ্চি—দেখতেই পাবে"।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল "ম্যারাটের মৃত্যু চাই"।

ম্যারাট—"ম্যারাট যেদিন মরবে, সেদিন প্যারিস আর থাকবে না, আর যেদিন প্যারিস মরবে সেদিন সাধারণ তন্ত্রেরও শেষ।"

বিলড ভ্যারেনিস যেই বলিতে আরম্ভ করিল "আমাদের ইচ্ছা" অমনি ব্যারিয়ার তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "তুমি যে বড় রাজার মতো বহুবচন ব্যবহার কচ্ছ?"

লেকয়ণ্টার—"সাঁ দে বোটের পাদ্রীর আরিশ, তাহার বিশপ ফচেট তা'কে বিয়ে কর্ত্তে বারণ কচ্ছে।"

জনৈক লোক—"ফচেটের তো একাধিক উপপত্নী, তবে সে আর একজনকে পত্নী গ্রহণে বাধা দিচ্ছে কেন? এটাত মোটেই বুঝতে পারলেম না"।

অপর একজন—"পাদ্রী, বিয়ে কর"।

গ্যালারিতে উপবিষ্ট দর্শকেরাও এরূপভাবে সভ্যগণের কথা বার্ত্তায় যোগ দিত।

একদিন রবস্‌পীয়র দুইঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করে। বলিবার সময় সে মাঝে মাঝে ড্যাণ্টনের চোখে চোখে চাহিতেছিল—সেই দৃষ্টি ভয়ঙ্কর। কখনও কখনও বা তাহার দিকে আড় চোখে তাকাইতেছিল—সে চাহনি আরো মারাত্মক। সাংঘাতিক ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় রবস্‌পীয়র তাহার ক্রুদ্ধ বক্তৃতা শেষ করিয়া আনিল—"ষড়যন্ত্রদের আমরা জানি, বিশ্বাসঘাতকদের আমরা চিনি, উৎকোচ-দাতা ও ঘুষখোররা আমাদের অপরিচিত নহে। তা'রা এই সভাতেই রয়েছে। তা'রা আমাদের কথা শুনছে, আমরা তা'দের দেখতে পাচ্ছি; তা'দের থেকে আমাদের দৃষ্টি অপসারিত হয়নি। উপরের দিকে চাইলে তা'রা

দেখতে পাবে তাদের মাথার উপরে আইনের তরবারী ঝুলছে, আর অন্তর মধ্যে চাইলে তা'রা দেখতে পাবে সেখানে নিজেদেরই কলঙ্কিত মূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে। এখনো তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি—সময় থাকতে সাবধান"। রবসপীয়র বলিয়া পড়িলে ড্যান্টন ছাদের দিকে চাহিয়া আনন্দে হেলান দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গুণ গুণ করিয়া একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতার আবৃত্তি করিল।

এই সব লোক যেন বাষ্পের রাশি—উচ্ছৃঙ্খল বায়ুবেগে দিকে দিকে বিধূনিত হইতেছিল।

(ঞ)

কিন্তু এই বাত্যাটি ছিল অঘটন-ঘটন পটীয়সী।

কনভেনসনের এক একজন সদস্য মহা সমুদ্রের এক একটি ঊর্ম্মি মাত্র। একথা সদস্যগণের মধ্যে অতিমাত্র ক্ষমতাশালীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে শক্তিতে এই মহাসভা পরিচালিত হইত তাহা অপার্থিব। কনভেনসনের প্রবল ইচ্ছা শক্তি সকল সদস্যের ইচ্ছার সমষ্টি বটে, কিন্তু ইহা কোন একজনের বিশেষ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নহে। সেই ইচ্ছাশক্তির সমষ্টি একটা দুর্দ্দম্য এবং অমিত পরাক্রম "আইডিয়া"—যদ্দ্বারা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইত। ইহারই নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। এই আইডিয়ার প্রভাবে কাহারও মহা পতন, কাহারও বা উন্নয়ন সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রবাহের প্রবল বেগ কাহাকেও ফেনপুঞ্জের মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইত, কেহ বা মগ্ন-শৈলে আহত হইয়া নিমজ্জিত হইত। এই রাষ্ট্রবিপ্লবকে মানুষের উপর আরোপ করা; আর মহা সমুদ্রের প্রবহমান স্রোতকে তরঙ্গের উপর আরোপ করা একই কথা।

মানুষের পরিমিত জ্ঞান দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত যে মহাশক্তির ধারণা করিতে পারে না, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সেই মহাশক্তির কার্য্য। ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে ইহাকে ভাল বলিতে হয়, অতীতের দিকে চাহিলে ইহাকে মন্দ বলিতে হয়। কিন্তু ভালই বলি, আর মন্দই বলি—ইহা যে ভূমারই বিভূতি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য্য বলিয়া বোধ হইলেও রাষ্ট্রবিপ্লবটা বস্তুতঃ ঘটনা সমষ্টির ফল। বিধান করে ঘটনায়, আর তার ফল ভোগ করে মানুষ। আদেশের ঘটনায়, মানুষ শুধু তাহাতে স্বাক্ষর করে। ১৪ই জুলাইএ ব্যাষ্টিল-ডেস্-মুলিনের স্বাক্ষর; ১০ই আগষ্টে ড্যান্টনের স্বাক্ষর; ২রা সেপ্টেম্বর ম্যারাটের স্বাক্ষর; ২১শে সেপ্টেম্বরে গ্রেগয়েরের স্বাক্ষর; ২১শে জানুয়ারীতে রবস্পীয়রের স্বাক্ষর। কিন্তু ডেসমুলিন্, ড্যান্টন, ম্যারাট, গ্রেগয়র এবং রবস্পীয়র—ইহারা লিপিকরমাত্র। মানবজ্ঞানের অতীত যে বিরাটপুরুষ আসলে এই মহাগ্রন্থের অদ্ভুত পৃষ্ঠাগুলির লেখক তাঁহার নাম বিধাতা এবং নিয়তি তাঁহারই মুখস্। রবস্পীয়র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত। হ্যাঁ, ঠিকই ত।

বিপ্লব একটা চিরন্তন ব্যাপার—যাকে আমরা প্রয়োজনের তাগিদ বলি। ইহা হইতেই জগতের সুখ দুঃখের রহস্যময় জটিল সমস্যা। ইতিহাসের 'কেন'র উত্তরও এইখানেই।

সভ্যতা বিধ্বংসী অথচ সভ্যতার পুনরুজ্জীবনকারী এই সকল গভীর সমস্যাপূর্ণ যুগ-পরিবর্ত্তন-সংসাধক ঘটনাপুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া চুলচেরা সমালোচনা করিতে স্বতঃই দ্বিধা উপস্থিত হয়। এই মহাবিপ্লবের ফলাফলের জন্য মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা করা, যোগফলের জন্য সংখ্যাগুলিকে দায়ী করারই অনুরূপ হইবে। যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে। যে ঝটিকা বহিয়া যাওয়া উচিত তাহাই বহিয়া যায়—তাহাতে গৌরীশঙ্করের অটলগাম্ভীর্য্য এবং চিরশান্তি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। পৃথিবীর ঝড়-ঝঞ্ঝার বহু ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত আকাশ যেমন সর্ব্বদাই ঝলমল করে, শত রাষ্ট্রবিপ্লব সত্ত্বেও সত্য ও ন্যায়ের জ্যোতি তেমনই চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

কন্‌ফুসিয়াস্ বাতাসের সম্মুখে সর্ব্বদাই অবনত হইত। কিন্তু সেই বাতাস প্রবাহিত হইত জনগণের মুখ হইতে এবং তাহা বহু-বক্তৃ ভগবানেরই নিঃশ্বাস। আজ যদিও বহু বর্ষ-অতীত হইয়া গিয়াছে তবু কন্‌ফুসিয়াসের কথা মনে উদিত হইলেই কি ঐতিহাসিক কি দার্শনিক সকলকেই চুপ করিয়া ভাবিতে হয়। সেই সব ছায়া-মূর্ত্তির বিরাট বাহিনীর সম্মুখে অবহিত চিত্তে স্তব্ধ হইয়া না থাকা অসম্ভব।

কন্‌ফুসিয়স্ ছিল এইরূপ—অমিত এবং অপরিমেয়। ইতিহাসে ইহাঁর তুলনা নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

কাঙালের কথা।

(১)

আমরা গরীব, সত্যি কথাই বটে,
মাথা ঘামাই, শক্তি খোয়াই কাজে,
মোদের কীর্ত্তি আঁকা বিশ্বপটে,
চক্ষু মেলে দ্যাখো জগৎ মাঝে।
ট্রাম-টেলিফোঁ-বিজলিবাতির যুগে,
পাঁচ বছরের মেয়ে এসব জানে;
ক্ষুধের বাদ্‌শা, মরছো ভুগে ভুগে।
প্রাণের কথা ঢুকবে কি আর কানে!

(২)

উচিত কথাই বলতে হোলো তবে,
শুনছো কিগো পঞ্চু মহারাজ!
ধনের গর্ব্ব আর কোরোনা ভবে,
রাখো একটু চোখের সরম-লাজ।
আমরা গরীব জগৎ করি জয়,
জ্ঞানের রাজ্যে আমরা শক্তিমান্;
শক্তিমূর্ত্তের করবে কে আর ভয়?
ভাত রেখে ভাত দিচ্ছ অভিমান।

(৩)

এই জগতের কল্যাণের সব কাজ,
আমরা গরীব করছি জীবন দিয়ে;
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর আজ,
আমরা মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে।
ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি খোলো,
কীর্ত্তি মোদের পাতায় পাতায় লেখা;
মাংস-পিণ্ড, ভোগ লালসা ভোলো।
নাও শিখে নাও অভিজ্ঞতার লেখা।

(৪)

ধনের সাথে মিলতেই হবে তোকে,
মনে রাখিস্ শূন্য (০) কেবল তোরা,
মিলতে হবে মোদের দুঃখ শোকে,
জানিস্ নাকি সংখ্যাগুলিই মোরা?
টাকার বড়াই আর না ভাল লাগে,
শূন্য ছাড়া আর তো কিছু নও!
সংখ্যা মোরা বসলে তোমার আগে,
তখন একটা কেষ্ট বিষ্টু হও!

(৫)

ধন কি শুধুই মানুষ করতে পারে?
ধনবান্‌কে ধ্বংস করছে টাকা;
বাড়লে অভাব মনুষ্যত্ব বাড়ে,
কাঙালগুলোর নয়কো জীবন ফাঁকা।
খেটে খেটে ছুটছি দিনে রেতে,
কত রকম করছি আয়োজন;
অভাব আছে তাই চলেছি মেতে,
জগৎটাকে করতে সুশোভন।

(৬)

ভাঙছি গড়ছি লক্ষ কোটিবার,
জানি কেবল কাজের পরেই কাজ;
নতুন কিছু করতে আবিষ্কার,
ছুটছি সাগর পাহাড় প্রকর মাঝ।

নাক সেঁটকানো চলছে নাকো, ভায়া,
পায়ে হেঁটে চলতে জানি বেশ ;
গাড়ী ঘুড়ীর নাইকো ঈষৎ মায়া,
খাটতে মোদের নাইকো লজ্জা-লেশ।

(৭)

নই তো মোরা ঠুঁটো জগন্নাথ,
হাত পা গুলার মান রাখিতে জানি ;
সুখেই মোদের কাটছে দিবস রাত,
বলকে তোমার তুচ্ছ বলেই মানি।
আমরা খাওয়াই খেতে পাচ্ছ তাই,
পাগুড়া জোগাই তাই তো আছ বেঁচে ;
এতেই আবার গর্ব্ব করা চাই !
সামনে মোদের বেড়াও নেচে নেচে।

(৮)

আর হেসো না দন্ত বাহির কোরে,
বুদ্ধির দৌড় কদ্দুর তাহা জানি ;
বিলাসিতায় জ্যান্ত আছ মোরে,
যাচ্ছে পেটে ভুঁড়ীর রঙীন পানি।
ভণ্ডামিটা বেশ শিখেছো প্রভু !
কোরে যাচ্ছ যা-খুসি তা বেশ।
মাথায় থাকার দাবী করছো তবু ?
নাই কি তোদের লোক-লজ্জা-লেশ ?

(৯)

হিন্দু সমাজ, কানে আঙুল দাও,
শুনতে বোধহয় চাওনা এসব তুমি ?
এসব বোধহয় শুনতে ব্যথা পাও।
ওঠো একবার যুগের বক্ষ চুমি'।
প্রাচীন যুগে নতুন নতুন ভাবে,
দেওয়ালিরি করতো যে সব ঋষি,
নাই বোলে কি শুয়েই জীবন যাবে ?
ব্যক্ত কর যুগের সাথে মিশি'।

(১০)

ধর্ম্ম তোমার বিশ্বগ্রাসীই, মানো,
তেমনি ধারাই থাকতে হবে তাকে ;
যদি তাকে সীমার মাঝে টানো,
মরবে তবে ভীষণতর পাঁকে।
নিমাইয়ের সে উচ্চতর প্রেমে,
সমাজ, তোমায় রইতে হবে বেঁচে।
মঞ্চ ছেড়ে আসতে হবে নেমে,
সঙ্কীর্ণতা ফেলতে হবে বেঁচে।

(১১)

এই কথাটাই বলবো আবার, ভাই,
ধনী, তোমার গর্ব্বটুকুই ছাড়ো ;
আমরা ছাড়া তোমার মূল্য নাই,
কাজ কোরে যাও যতটুকুই পারো।
খেটে খাচ্ছি, ধারবো কেন ধার ?
হুজুর, একটু মজুর হোতে শেখো।
মাংস দেহের বাড়ছে চমৎকার।
হাসি পাচ্ছে—পোড়ে না যাও, দেখো।

(১২)

গরীবগুলোর শোণিত শুষে খেয়ে,
আর কতকাল থাকবে মাথার' পরে ?
প্রাসাদ ছেড়ে দুখীর ঘরে যেয়ে,
বাঁচাও যারা অন্নাভাবে মরে।
জনক রাজার মত রাজ্য চালাও,
নইলে দেখছি বড়ই নিরুপায় ;
"বঙ্গ-সেবী"রা বলছে—"বেঁটে দাও,
এই জাগরণ খালি পেটের দায়!"

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাধু কৃষ্ণমোহন।

সাধু কৃষ্ণমোহন একজন পরম ভক্ত গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ বেতালরি গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী মাউরী গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণমোহন সাধু চরিত্রের, পরমভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি জাতিতে নমঃশূদ্র, নীচ জাতি হইলেও তিনি অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণাপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি জীবনে কখনো মিথ্যাকথা বলেন নাই অথবা কোনও অধর্ম্মের কাজই করেন নাই। কৃষ্ণ নাম বা চৈতন্যের নাম করিতেই তিনি ভক্তিরসে গদ্‌গদ্‌ হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। প্রথম বয়সে তাঁহাকে সকলেই গৃহস্থালী কার্য্য করিতে দেখিয়াছে কিন্তু শেষ জীবনে তিনি কেবলই ভগবানের নাম করিতেন, গৃহস্থালীর দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। প্রায় একশতবর্ষ বয়সে তিন চারি বৎসর হইল পবিত্র মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকালে আমরা কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি যখন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই, দেখি ঋষি তুল্য কৃষ্ণমোহন মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। সর্ব্বদাই তিনি মাটীতে পড়িয়া থাকিতেন। পবিত্র গৌরকান্তি দেহ, দেখিলেই ভক্তি হয়। আমার চরণ তলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম আমি তাঁহার প্রণাম গ্রহণের নিতান্ত অযোগ্য। একথা প্রকাশ্যেও তাঁহাকে বলিলাম, তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "প্রভু, আজ আমার সৌভাগ্য, আপনি ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজাতির গুরু, আপনার পদার্পণে আমার গৃহ ও দেহ পবিত্র হইল, ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন ভগবানের দেহে রহিয়াছে, জগত গুরু ব্রাহ্মণের পদার্পণে আমার বহুপুরুষ আজ উদ্ধার হইল, বিশেষতঃ আপনি রাজা ও ব্রাহ্মণ—একাধারে দুইশক্তি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। হায়, প্রভু বলিয়া দিউন আমার কি উদ্ধার হইবে না, আমি কি ভগবানের চরণ লাভ করিতে পারিব না?"

এইরূপ কথা বার্ত্তায় মনে হইল এ ব্যক্তি সামান্য নহে। আমি কহিলাম "আপনি ভক্ত, আপনার উদ্ধার ভগবানই করিবেন। আমরা পাপী, সামান্য জীব, আপনার প্রতি আমাদের আশীর্ব্বাদ করা চলে না।" ইত্যাদি কথা কহিয়া আমি বিদায় হইলাম। কৃষ্ণমোহনের দুইপুত্র, রাজচন্দ্র ও বৃন্দাবন, তাহারাও পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। প্রতি বৎসর গৃহে ধান, পাট ইত্যাদি হয়। পানের বরোজ দিয়া বহুটাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরই কৃষ্ণমোহনকে কেহ বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইতে দেখে নাই। গাঁজা খাইয়া অনেকে সাধু নাম ধারণ করে কিন্তু কৃষ্ণমোহন জীবনে কখনো মাদক দ্রব্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর হইতেই তাহার মুখে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নাম ব্যতীত অন্য কোন কথা ছিল না। তিনি লিখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু প্রত্যহ তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ও চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ হইত, অতি উৎকণ্ঠচিত্তে তিনি সাগ্রহে তাহা শ্রবণ করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে বহুলোক সমাগম হইত, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া আসিতেন।

তিনি তাঁহার বাড়ীর পূর্ব্বদিকে এক আখড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল না, বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে পবিত্র স্থানে তাঁহার আশ্রম নির্ম্মিত হয় অনেকে তাঁহাকে নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে কহিতেন কিন্তু তখনই তিনি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কহিতেন। "হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে সকল স্থানইত নবদ্বীপ, বৃন্দাবন। আমার হৃদয়ে যদি নবদ্বীপ, বৃন্দাবন না রহিল তবে কি তাহারা আমার হৃদয়ে ভক্তিরস আনিয়া দিতে পারিবে?" তিনি নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন বা কোন বৈষ্ণবতীর্থে গমন করেন নাই। পৌষ সংক্রান্তিতে প্রতিবৎসর প্রায় সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও হরিনাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে, সহস্র সহস্র লোক ঐ সময়

একত্র হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ এই উৎসব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গৃহে অন্ন নাই অথচ এত লোকের পান ভোজনের ব্যবস্থা কোথা হইতে হইয়া থাকে ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। নানাশ্রেণীর নানা-জাতীয় লোকেরা আখড়ার চতুর্দ্দিকে বহুতর চুলী করিয়া আহারের আয়োজন করিতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসিয়া তাহাদের রন্ধন কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। ঐ সময় বহুতর ভক্ত বৈষ্ণবগণ আসিয়া সপ্তাহব্যাপী কীর্ত্তন করিয়া সে অঞ্চল মুখরিত করিয়া রাখে। কৃষ্ণমোহন জীবিত থাকিতে আমি এ উৎসব স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সাধারণ পল্লীগ্রামে এরূপ জাঁবন্ত উৎসব অতি বিরল। কৃষ্ণমোহন যদিও লেখাপড়া জানি-তেন না তথাপি তাঁহার মুখে কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মকথা অনেক অবগত হওয়া যাইত। ফলে লেখাপড়া জানিলেই যে ধার্ম্মিক হইবে একথা বলা যাইতে পারে না। এই সাধু চরিত্র দেখিয়া অনেকের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। কৃষ্ণমোহন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র অনেকগুলি বংশধর রাখিয়া শতবর্ষে জীবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যখন তিনি প্রথম বয়সে ধর্ম্মালোচনা ও বৈষ্ণব ভক্ত হন, লোকে তখন তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া অবিশ্বাস করিত কিন্তু কিছুদিন পর যখন তাঁহার প্রকৃত রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তখন হইতেই তাঁহার আখড়ায় নিত্য কীর্ত্তনে বহুলোক সমবেত হইত। ইহা তাঁহার একটী গুণ ছিল যে, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদাই হীন ও নীচ বলিয়া মনে করিতেন। অতি নীচ ব্যক্তিকেও তিনি সাদর সম্ভাষণে উচ্চাসনে বসাইতেন। তিনি সর্ব্বদাই মৃত্তিকা আসনে বসিতেন, মৃত্তিকায় পড়িয়াই শয়ন করিতেন, তৃণ বা মৃৎপাত্রে আহার করিতেন। অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে আশ্রয় দিয়া সেবা করিতেন। কোন জাতি বিশেষের প্রতি তাঁহার ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সকল ধর্ম্মকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, সকলের সঙ্গেই আলিঙ্গন দিতেন। ব্রাহ্মণের সমাদর তিনি যত করিতেন এরূপ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত বা ধার্ম্মিক লোক পাইলেই তাঁহার নিকট হইতে কিছু ধর্ম্মকথা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এরূপ লোক বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। সেই পবিত্র স্থান "কৃষ্ণমোহন সাধুর আখড়া" নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে, বোধ হয় এ নাম অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। "সাধুর আখড়ায়" নিত্য কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান করিলে বহু লোক মুখে তাঁহার অলৌকিক চরিত্র এবং আরো নানা গুণের কথা অবগত হওয়া যায়। সাধু তাহার বাড়ীতে কে আসিবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিতে পারিতেন। আমি যে দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সাধু প্রাতেই তাহা বলিয়াছিলেন। কোন অতিথি তাঁহার বাড়ীতে আসিলে পূর্ব্বেই তাহার কথা বলিয়া দিতেন ও তদ্রূপ আহারাদির উদ্যোগ রাখিতে গৃহিণীকে উপদেশ করিতেন। একদিন তাঁহার এক দৌহিত্র মরণাপন্ন কাতর, তাহাকে দেখার জন্য লোক আসিয়াছে, তৎপর দিন খবর আসিল তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে গৃহের বাহিরে রাখা হইয়াছে। তিনি "এ যাত্রা মরিবে না" বলিলেন এবং তিনি তাহাকে দেখিতে যাত্রা করিলেন। সে বাড়ী গিয়া দেখেন তাহাকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। তাহার দেহাবৃত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহার চরণ তাহার মাথায় স্পর্শ করিয়া বলিয়া দিলেন "ইহাকে গৃহে লইয়া যাও— আর মরিবে না।" তাঁহার সে দৌহিত্র এখনও বাঁচিয়া আছে। যখন সাধুর বাইট বৎসর বয়স তখন তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিতে না পারিয়া দুঃখত হইলেন বিশেষতঃ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বসিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিবার লোক পাওয়া যায় না তাই তিনি লিখা পড়া শিক্ষা করিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বিনা চসমায় ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন।

সাধুর মৃত্যুকালের দুইদিন পূর্ব্বে যে সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা বলিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণকে

আনিয়া দেখিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সকলকে হরি সংকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এই নাম কীর্ত্তনের সঙ্গেই ভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। তাঁহার এক কন্যা আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন "সে বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়াছে, সে না আসিলে আমার যাত্রাকরা হইবে না।" তাঁহার কন্যা আসিলে পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলকে ডাকিয়া হিতোপদেশ দিয়াছিলেন। পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন "তোমরা কাহারও অনিষ্ট করিও না, কেহ তোমাদের অনিষ্ট করিলেও তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিও না। যথাসাধ্য জীবের উপকার করিও।" তাঁহার অভাবে আমাদের অঞ্চলে একজন প্রকৃত মানুষের অভাব হইয়াছে তাঁহার যে সকল গুণের কথা শুনা যায়, সাধারণ লোকের তাহা দেখা যায় না। তাঁহার পিতাও একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

কোর্‌আন্ তত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, মৌলবি মবিমুদ্দীন আহম্মদ। পৃষ্ঠা ১৷৴+১৫৩, মূল্য ১৷০ মাত্র। ইহাতে গ্রন্থকার প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন—

(১) সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মোটামুটি তথ্য সম্বন্ধে কুর্‌আনের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য। (২) শয়তানের প্রকৃত অর্থ। (৩) আদম হইতে ইব্রাহীম পর্য্যন্ত পয়গম্বরগণের ইতিহাস। (৪) হয়্যের বিবিধ অনুষ্ঠান। গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে নীহারিকাবাদ (Nebular Hypothesis), পৃথিবীর প্রাচীনত্ব, সূর্য্যের আহ্নিক গতি, সপ্তগ্রহের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন, পৃথিবীর গোলত্ব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি কুর্‌আনে উল্লিখিত হইয়াছে। হয্যের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা ঘরে বসিয়া হয্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে কৌতুহলী তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন। গ্রন্থকার কৃতবিদ্য ও উচ্চপদস্থরাজকর্ম্মচারী। অবসর সময়ে এইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা তাঁহার সহৃদয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের মীমাংসাগুলি মুসলমান সমাজে সর্ব্ববাদি সম্মত নহে। 'আলীমগণ তাঁহার সমস্ত মত কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। তথাপি এইরূপ বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান্ সময়ে আবশ্যক বলিয়া মনে করি। দুঃখের বিষয় গ্রন্থ মধ্যে কয়েকটী গুরুতর ভুল বোধ হয় গ্রন্থকারের অনবধানতা বশতঃ রহিয়া গিয়াছে। যথা; (১) সূর্য্য একস্থানে অবস্থিত; কিন্তু ২০½ দিনে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করে। (৭ পৃষ্ঠা)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে সূর্য্যও আর একটি বৃহত্তর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। (২) চন্দ্র যে সময়ের মধ্যে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সেই সময়ের মধ্যে উহা স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকেও একবার আবর্ত্তন করে (১০ পৃষ্ঠা)। ইহা সুবিদিত যে চন্দ্রের অক্ষ পরিভ্রমণ (r tion) নাই) (৩) অনন্তর মক্কার নিকটবর্ত্তী আরকা উপত্যকায় তাঁহাদের পুণর্ম্মিলন হয়। এই স্থানই ব্যাক্‌টরিয়া বা বাল্‌খ প্রদেশের শিখর ভূমি (২৭ পৃষ্ঠা)। কোথায় মক্কা ও কোথায় বাল্‌খ। মক্কা যে বাল্‌খের শিখর ভূমি তাহা কোন্ ভূগোলে আছে জানি না। গ্রন্থে আরবীর অক্ষরলেখন (Transliteration) সম্বন্ধে একটি প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নহে এবং সর্ব্বস্থলে অনুসৃতও হয় নাই। এ বিষয়ে মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতেন। যাহা হউক গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু অমুসলমানগণ ইহা পাঠে অনেক জ্ঞান লাভ করিবেন। গ্রন্থের ভাষা সাধু বাঙ্গালা ও ইহাতে কা'বাহ্ ও হজ্‌রতের সমাধি মন্দিরের দুইটী এক রঙ্গা চিত্র আছে।

মুখ।

সমাজপতি রাজা কংশনারায়ণ।

রাজা কংশনারায়ণ মনুসংহিতার টিকা কারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্লুকভট্টের সন্তান। কংশনারায়ণ বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তাহেরপুরের জমিদার ছিলেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহেরপুরের রাজাদিগের সুখ্যাতি ও সম্মান সমভাবেই বর্ত্তমান আছে। কংশনারায়ণের পিতামহ উদয়নারায়ণ গৌড় সম্রাট গণেশর্খার শ্যালক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। এই উদয়নারায়ণই এদেশে সর্ব্ব প্রথমে "রাজা" উপাধী প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবন রায় গৌড় বাদশাহ যদুনারায়ণ খাঁর দেওয়ান ছিলেন। জীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র কংশনারায়ণ গৌড় বাদসাহ সলিমানের অধীনে ফৌজদার ছিলেন। এই সময় মোগলজাতীয় আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট হন। এই সময়েই কালাপাহাড়ের অত্যাচারে হিন্দুগণ ও হিন্দুদেব-দেবী উৎপীড়িত ও ধ্বংশপ্রাপ্ত হন। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার ধর্ম্মরক্ষার্থে ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে ছিলেন। কংশনারায়ণও এই সময় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্তভাবে ছিলেন।

যখন মোগলজাতীয় আকবর শাহ দিল্লীর সম্রাট হন তখন মোগলেরা সংখ্যায় অল্প ছিল। এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের সদ্ভাব ছিল না। এই সময় বাঙ্গলাদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে তাহেরপুরের জমিদার কংশনারায়ণ রায়, বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত সিন্দুরীর জমিদার ঠাকুর কালিদাস রায়, সাঁতোলের রাজকুমার গদাধর সান্ন্যাল এবং দিনাজপুরের রাজভ্রাতা গোপীকান্ত রায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ও দেশবন্ধু ছিলেন। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের সহিত মোগলদের সদ্ভাব না থাকায় মোগলেরা হিন্দুদিগকে সপক্ষ করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। এদিকে হিন্দুরাও গৌড় সম্রাট সলিমানের জামতা ও সেনানায়ক কালাপাহারের অত্যাচারে পাঠানদিগের সহিত অসদ্ভাব হওয়ায় মোগলদিগের সহায়তার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন; সুতরাং হিন্দুদিগের প্রতি মোগল সম্রাটের অনুগ্রহের কথা শুনিয়া অনেকে মোগল সম্রাটের চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় দেশনায়ক কংশনারায়ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই মোগল বাদশাহকে বাঙ্গলাদেশ জয়ের জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আকবর, নিকটবর্ত্তী পাঠানও চিতোরের মহারাণার সহিত বিবাদ হেতু এবং চতুর-চক্রী গৌড় সম্রাট সলিমানের প্রতারণামূলক আনুগত্য স্বীকার ও নানা প্রকার বহুমূল্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া, অনবসর-প্রযুত ও লজ্জায় বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আক্রমণের অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

খৃঃ ১৫৭২ সালে সলিমানের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র দাউদ খাঁ গৌর বাদসাহ হইয়া নানাপ্রকারে মোগল সম্রাটের বিপক্ষতাচরণ করেন। সে জন্য আকবর বাদশাহ স্বয়ং দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধগমন করেন। এই সময় কংশনারায়ণ সম্রাট আকবরের যোপদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ আক্রমণের সময় সম্রাট কংশনারায়ণকে পথপ্রদর্শক ও এই কার্য্যের প্রধান মন্ত্রী করেন। কংশনারায়ণ নানাপ্রকার কৌশল ও চেষ্টা করিয়া সলিমানদ্বারা অত্যাচারিত সমস্ত হিন্দুদিগকে দাউদের বিপক্ষাচরণ করিতে বাধ্য করেন। দাউদ খাঁ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। সুতরাং সহজেই বাঙ্গলাদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এবং এই অবধিই বাঙ্গলাদেশে পাঠান রাজত্ব শেষ হয়।

আকবর বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়া সেনাপতি মুনিম খাঁকে বাঙ্গালার সুবেদার পদে ও কংশনারায়ণকে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় যে মহামারীতে গৌড় নগর উৎসন্ন হইয়াছিল তাহাতে মুনিম খাঁর মৃত্যু হয়। ১৫৮০ খৃঃ রাজা তোড়রমল্ল সমস্ত বাঙ্গলা দেশ জরিপ ও জমাবন্দী করিয়া দিল্লী গমন

করিলে, কংশনারায়ণ রাজা উপাধী প্রাপ্ত হইয়া শুবে বাঙ্গলা ও বেহারের দেওয়ান ও শুবেদার হইয়া দুই বৎসর কাল ঐ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে কংশনারায়ণ বহু সম্মান ও ধন সম্পত্তি বর্জ্জন করিয়া পরিশেষে কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ জমিদারী শাসন ও সামাজিক উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন।

বঙ্গদেশে কংশনারায়ণের দুর্গোৎসব প্রচার।

রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজা কংশনারায়ণ সমস্ত পাপ স্খলন উদ্দেশ্যে একটী মহাযজ্ঞ করিতে উৎসুক হইলেন। এবং বাঙ্গলাদেশস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মত ও ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। বর্ত্তমান নাটোরের নিকট বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ কংশনারায়ণের বংশানুক্রমে পুরোহিত ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীমধ্যে রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে বাঙ্গলা বেহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি এই পণ্ডিত সভায় মত প্রকাশ করেন যে, বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাযজ্ঞ আছে। বিশ্বজিৎ এবং রাজসূয় যজ্ঞ করায় অধিকারী সার্ব্বভৌম সম্রাটগণ। রাজা বাদশাহের অধীন নৃপতী সুতরাং তাঁহার এই যজ্ঞে অধিকার নাই। অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ। অপিচ এই যজ্ঞ চতুষ্টয়ে ক্ষত্রিয় রাজারাই অধিকারী, উহা ব্রাহ্মণের করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং এই সকল যজ্ঞ না করিয়া রাজা দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুণ। সত্য যুগে সুরথ রাজা এই পূজা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করেন। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে সেই পূজা করিয়াছিলেন। তাহার ফলশ্রুতি মধ্যে লিখিত আছে যে, যে কেহ রামচন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে দুর্গোৎসব করিবে সে সর্ব্ব যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। এই যজ্ঞ, সকলযুগে, সকলজাতীয় লোকেই করিতে পারে। এবং এই একই যজ্ঞে সকল মহাযজ্ঞের ফল হয় সুতরাং রাজা কংশনারায়ণ এই যজ্ঞ সম্পাদন করুণ। সমাগত সমস্ত পণ্ডিতগণ রমেশ শাস্ত্রীর মতেই মত প্রদান করিলেন সুতরাং রাজা কংশনারায়ণ এই শারদীয় দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ সম্পাদনে উদ্‌যোগী হইবেন।

১৫৮১।৮২ খৃঃ যৎকালে সমুদায় দ্রব্য সস্তা ছিল, সেই সময় সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম রাজা কংশনারায়ণ এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই মহাযজ্ঞের ধুমধাম আনন্দ সকল লোকে সমভাবে করিয়া মোহিত হইয়াছিল। কংশ নারায়ণ সকলকে স্ববস্ত্র দান ও সর্ব্বসাধারণের সমভাবে প্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনদিন তাহেরপুর আনন্দ ও ভোজ্য ভোজনে মোহিত ছিল। এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনে কংশ নারায়ণের পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা রাঢ়ে ও বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়। এবং তদবধি এই শারদীয় দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে বহুলভাবে প্রচার হয়। এবং বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এই দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন। ইহা একটী মহাউৎসব মধ্যে গণ্য হয়। ক্রমে এই পূজা এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তৎকালীয় সম্রাট সাহজাহান এই দুর্গোৎসবে মোহিত হইয়া নিজ ব্যয়ে ব্রাহ্মণদ্বারা মহা আড়ম্বরে এই পূজা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সময় অনেক রাজা জমিদার ঈর্ষা পরবশ হইয়া বাসন্তী দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন। এবং সম্রাট ঔরংজেব মহাসমারোহে মহরম পর্ব্ব সম্পাদন করেন কিন্তু কোন পর্ব্বই এই দুর্গোৎসব তুল্য হইতে পারে নাই।

একাল পর্য্যন্ত কংশনারায়ণ সম্পাদিত সেই মহাযজ্ঞের ধুম বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইতেছে। এমন কি সমস্ত পৃথিবীর সকল জাতি এই দুর্গোৎসবে আনন্দোৎফুল্ল হয়! ঘরে ঘরে ভোজ্য ও ভোজনের ধুম পড়ে; বঙ্গের প্রত্যেক নরনারী বালক বালিকা এমন কি দুগ্ধ পোষ্য শিশু পর্য্যন্ত এই সময়

নবপত্রে সুসজ্জিত হয়। সমস্ত ভারতের প্রত্যেক রাজকীয় আফিস বন্ধ হয়। প্রত্যেক চাকুরীগতপ্রাণ বাঙ্গালী স্বদেশে গমন ও আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হয়। মানুষ নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়। আর সে বিজয়ার কোলাকুলি মানুষকে শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে আপন করিয়া ফেলে। সে দিন আর কাহারও সহিত ঝগড়া বা ঈর্ষাভাব থাকে না। সব যেন এক হইয়া যায়।

কালের কুটীলচক্রে সে শারদীয়োৎসব এখন একটী নীরব মন দুঃখের কারণ হইয়াছে। এককালে যাহা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে ৩।৪টী গ্রামের মধ্যে একখানি প্রতিমাও দেখা যায় না। সে প্রতিমা দর্শনের আকাঙ্খা এক্ষণে ঘরে বসিয়াই মনের ক্ষোভ মিটাইতে হয়। যে দুই একখানি বাড়ীতে পূজা হয়, তথায় নিমন্ত্রিত নিকট আত্মীয়ই পেট পুরিয়া প্রসাদ পায় না। কংশ নারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নূতন বস্ত্র দান করিয়া তাহা পরিধান পূর্ব্বক প্রতীমা দর্শনের যে নিয়ম করিয়া ছিলেন; এক্ষণে নিতান্ত দুস্থ হইলেও ঋণ করিয়াও নববস্ত্র ক্রয় করে। কিন্তু নূতন কাপড় পড়িয়া পূজা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। যে দুই একব্যক্তি পূজা করিয়া আত্মম্ভরিত্ব প্রকাশ করেন, তাঁদের বাড়ীতে দর্শনার্থী গেলে বসিবার কথাত দূরের কথা বরং লোক দ্বারা শেয়াল কুকুরের ন্যায় তাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। আর সে পূজাই কি পুণ্য সম্পাদনের জন্য সম্পাদিত হয়। কেহ বা নাম কেনার জন্য, কেহ বা জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জনের জন্য, কেহ বা পূর্ব্বপুরুষের প্রথা রক্ষা, কেহ বা পূর্ব্বাধিকারীর উইলের মর্ম্ম রক্ষার্থ পুরোহিতের দক্ষিনা ঠিকা, বন্দোবস্তে ভোগের বরাদ্দ কমাইয়া নামে ক্ষুদ্র পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাত্রা, থিয়েটার, খেমটা, বাই প্রভৃতি আমোদের মাত্রা বাড়াইয়াছেন।

কংশনারায়ণের সময়েও বিদেশী বস্ত্র এদেশে আমদানী হইত না। দেশজাত বস্ত্রই লোকের একমাত্র পরিধেয় ছিল। তখনও এখনকার অনুপাতে বস্ত্রের মূল্য কম ছিল না। সাধারণতঃ ধুতি ও উত্তরীয় ও স্ত্রীলোকদিগের মোটা সাড়ি হইলেই চলিত। জানি না কোন্‌দিন কোন্ কংশনারায়ণ আবার বঙ্গদেশে উদিত হইয়া এই বিলাসিতার পরিবর্ত্তে প্রেমভক্তি আনয়ন করিয়া বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবেন।

কংশ নারায়ণের সমাজ সংস্কার।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমাজ সংস্কার ফলে কাপ ও কুলীনদিগের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহার পর বহুকাল পর্য্যন্ত কাপদিগের অত্যাচার বর্ত্তমান থাকায়, কুলীনের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। এদিকে যবন রাজার সংস্রবেও হিন্দুসমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে থাকে। মুসলমানগণ বলপূর্ব্বক হিন্দুদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকে। অন্তঃপুরবাসীনী রমণীগণ মুসলমান কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে বিবাহিত হইতে থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণগণ, মুসলমান সংশ্রব প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা মুসলমান সংস্পৃষ্টদিগের সহিত দলাদলি আরম্ভ করেন কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণগণ এইরূপ মুসলমান সংশ্রবে ধনমর্য্যাদা ও রাজ সম্মানে সম্মানিত হইতেছিলেন, মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণ উক্ত ধনাঢ্য ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় পাইতে লাগিলেন। সুতরাং কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হইতেছিল না। তাহাতে কাপ সমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কুলীন সমাজ দিন দিন হ্রাস ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। কুলীনগণ কাপদিগের ও মুসলমানসংসৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের দৌরাত্মে নিতান্ত উৎপীড়িত হইতেছিলেন।

সমাজের এইরূপ বিশৃঙ্খলতার সময়, রাজা কংশনারায়ণ বারেন্দ্র সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া একজন প্রধান সমাজপতি হইয়াছিলেন। কুলজ্ঞগণ তাঁহাকে বরেন্দ্র সমাজের "যূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কংশনারায়ণ সিদ্ধ শ্রোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তিনি কুলীনদিগের বিশেষতঃ তৎকালীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের দুষ্টে তাহা সংশোধন মানসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, বারেন্দ্র সমাজের সমস্ত গাইকর্ত্তা কুলীন ও কুলজ্ঞ ও কাপদিগকে তাহেরপুরে আহ্বান করিয়া এক বিরাট সামাজিক সভা করিলেন। এই সভায় সকলেই এক বাক্যে কংশনারায়ণকেই এই সমাজ সংস্কারের ভার অর্পণ করিলেন। কংশনারায়ণ সমস্ত কুলজ্ঞদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ করিলেন।

১। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকৃত পরিবর্ত্ত নিয়মে কাপের সহিত কুশবারি সংযোগ অর্থাৎ "করণ" ব্যতীত, কুলীনের কুলভঙ্গ হইবে না।

২। শ্রোত্রীয়গণ কুলীন ও কাপে কন্যাদান করিতে পারিবেন।

৩। কাপের সহিত "করণ" করা ভিন্ন অন্য কোন কারণে কুলীনের কুলপাত হইবে না।

৪। মুখ্যকর্ত্তা কুলীন ও গৌণ কর্ত্তা কাপ হইবেন।

৫। কাপেরা কুলীন ও শ্রোত্রীয়ের মধ্যবর্ত্তী থাকিবেন।

৬। সিদ্ধ শ্রোত্রীয়দিগকে পটি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, অগ্রে কাপে কন্যাদান করিতে হইবে।

৭। কষ্ট-শ্রোত্রীয়েরা অগ্রে কাপে কন্যাদান না করিলে, কুলীনে কন্যাদান করিতে পারিবেন না।

৮। কষ্ট শ্রোত্রীয়ের কন্যা কুলীনে গ্রহণ করিলে, তাহাকে প্রসিদ্ধ কুলীনের সহিত করণ করিতে হইবে। ইহারই নাম হইবে "উপকার করণ"। কিন্তু কাপের ঐরূপ উপকার করণ করিতে হইবে না।

৯। কুলীনগণ কাপে কন্যাদান করিলে কাপ এবং কুলীন ও কাপগণ শ্রোত্রীয়ে কন্যাদান করিলে, শ্রোত্রীয় হইবেন।

১০। কুলীন ও কাপগণ, কোন কুলীন ও কাপের "বন্ধুহীনা" * কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ঐরূপ কন্যার কেবল শ্রোত্রীয়দিগের সহিত বিবাহ হইবে।

রাজা কংশনারায়ণের এই ব্যবস্থা সকল স্থিরিকৃত হইলে, তিনি স্বয়ং এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিজ দুই কন্যা (কাহারও কাহারও মতে তিন কন্যা) কাপে বিবাহ দিয়া, তদুপলক্ষে, কুলীন কাপ ও শ্রোত্রীয়দিগকে একত্রে ভোজন করাইলেন এবং কাপ ও কুলীনদিগকে বস্ত্রাদি দ্বারা ভোজন দক্ষিণা দানে সম্মানিত করিলেন। এইরূপে কাপদিগকে সম্মানিত করিয়া, কাপ কুলীনের দীর্ঘকালের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজা কংশনারায়ণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাই অপ্রতিহত ভাবে একাল পর্য্যন্ত সমস্ত বারেন্দ্র সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে রাজ সংশ্রবে এবং সমাজপতি না থাকায় এবং কুলজ্ঞগণের কুলশাস্ত্র মান্য না করায় সেই সময়ের ন্যায় সমাজে একটা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্যাধিক্যের সহিত কন্যা পণও ক্রমেই বাড়িতেছে। তাহাতে সমাজে একটা পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজের অনেক লোকই সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলেও এবং রাজ সম্মানে সম্মানিত হইলেও এবং সেই তাহেরপুরের রাজা ও রাজ সম্মান সুদৃঢ় থাকিতেও সেই সমাজের মূল বন্ধন ছেদন করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সাহসী হইতেছেন না। বর্ত্তমান সময়ে দেশে কত রাজা ও সমাজপতি হইয়াছেন কিন্তু কংশনারায়ণের ন্যায় সমাজপতি হইবার কাহারও সাহস ও সামর্থ্য হইল না। জানি না কবে কোন্ কংশ নারায়ণ সমাজের এই পুত্র-বিক্রয় ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বারেন্দ্র সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

---

*"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যা জননী তথা।
কন্যাপ্রদ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পর॥"

শাস্ত্রানুসারে ইঁহারাই কন্যা দানাধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কুলশাস্ত্রানুসারে যে কন্যা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি বর্ত্তমান নাই, অথবা কেহ বর্ত্তমান থাকিয়া এবং নিকট সম্পর্কীয় কোন জ্ঞাতি যে কন্যার বিবাহের সময় "করণ" করিতে অসমর্থ হন, তাহাকে 'বন্ধুহীনা কন্যা" বলে। স্ত্রীলোকের করণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং মাতা বর্ত্তমানেও কন্যাগণ বন্ধুহীনা কন্যা হইয়া থাকেন। কুল শাস্ত্রানুসারে পিতা অথবা সহোদর ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকিলে, তাহাকে বন্ধুহীনা কন্যা বলে। সেই সভায় রাজা কংশ নারায়ণের উক্ত ব্যবস্থা সমাজস্থ সকলেই স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কুলজ্ঞগণ এই ব্যবস্থা কুলশাস্ত্রের অন্তর্গত করিলেন।

প্রতিভা

১১শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩২৮ | ৮ম সংখ্যা

ভাস্করবর্ম্মা ও ভিনসেণ্ট এ স্মিথ।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ ভিনসেণ্ট এ. স্মিথ তাঁহার প্রণীত আর্লি হিস্টরি অব্ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "almost certainly he must have been a hinduised koch aborigine" অর্থাৎ ভাস্করবর্ম্মা অনার্য্য কোচ জাতীয় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত নরপতি ছিলেন—এটা একপ্রকার নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা সময়ে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম যে যিনি তদানীন্তন ভারত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক উচ্চ সম্মানে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তিনি এরূপ অনার্য্য জাতীয় হইতেই পারেন না। * বিশেষতঃ ঐ শাসনে তাঁহার পূর্ব্বতন একাদশ পুরুষের নাম রহিয়াছে—ইহাতেই তিনি যে বনিয়াদি ঘরের ছেলে তার প্রমাণ হয়।

প্রায় দুইবৎসর হইল ডাঃ ভি.এ. স্মিথকে উপরিকথিতানুরূপ লিখিয়া তাঁহার ইতিহাসে যে উক্তি আছে, তাহা সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেও এতৎ সম্পর্কে একটা বিরাট প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার শাসনে উল্লেখিত ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের প্রথম ব্যক্তির নাম 'পুষ্যবর্ম্মা' এবং দ্বিতীয়ের নাম 'সমুদ্রবর্ম্মা'। অপর দুই পরাক্রান্ত রাজ-বংশের প্রথম রাজার নামও 'পুষ্য' ছিল; যথা শুঙ্গরাজগণের বীজী পুরুষ ছিলেন—'পুষ্যমিত্র' এবং হর্ষবর্দ্ধনের আদি পুরুষের নাম ছিল 'পুষ্যভূতি'। আবার গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন 'সমুদ্র-গুপ্ত'। এটা আমি এক আশ্চর্য্য ঐক্যের বিষয় (wonderful coincidence) বলে মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু স্মিথ সাহেব তাঁহার পত্রে (১৯। ৫। ২১) লিখেন—

"As to Bhaskaravar[illegible] [illegible]-bhuti) your letter has induced me to look up your paper

---

* যাঁহারা বিস্তারিত দেখিতে চান তাঁহারা 'বিজয়া' আষাঢ় ১৩২০, 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ৭ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা অথবা "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়া", Vol. XII. No. 13 দেখিবেন।

again. I have noted to strike out the suggestion that he was a hinduized aborigine, which was made with reference to the known facts in other cases.***You note the names Pushya varman and Samudravarman as a 'coincidence.' It is I think more, because the genealogy gives the name Dattadevi as that of Samudra's queen. Now, the queen of Samudragupta was also Dattadêvi (see 4 inscriptions in Fleet G. I.) and the double coincidence is almost impossible. I believe that S. Varman is an equivalent of S. Gupta and that the intention was to trace descent from the Guptas. The son of S. Varman Balavarman * might be a synonym for Vikrama (Chandragupta II.) or a younger son of Samudra. R. D. Banerji in his Bengali history traces the descent of the late Guptas of Magadha from Govindagupta second son of Chandragupta II (J. R. A. S. 1917, p. 855 Pushyavarman with whom the genealogy begins may be wrongly given as the father of Samudra and be really a reminescence of the Sunga or may be an equivalent for Chandra Gupta I. The Pullava inscriptions include Asoka among their ancestors—predecessors in title being reckoned as ancestors. You may make use of this suggestion if you think fit"

অর্থাৎ ভাস্করবর্ম্মার শাসনের পুষ্যবর্ম্মা, সমুদ্রবর্ম্মা (এবং তস্য পত্নী দত্তাদেবী) ও বলবর্ম্মা এই প্রথম তিন পুরুষ জাল—তাই ভাস্কর বর্ম্মাকে তিনি 'ভাস্কর ভূতি' বলিয়াও সন্দেহ করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার নকল রাখি নাই—পরন্ত নিম্নে সারাংশ যথাস্মৃত লিখিত হইল।

তাম্রশাসন সমালোচনায় ভাস্করবর্ম্মার আভিজাত্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্মিথ সাহেব দেখিবেন যে ভাস্কর বর্ম্মা একজন হঠাৎ বড়লোক গোচের ছিলেন না যে তাঁহাকে পূর্ব্ব পুরুষের নাম জাল করিতে হইবে। তাঁহাকে "ভাস্করভূতি" সন্দেহ করিয়া বিবিধ অন্যায় করা হইতেছে (১) তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন 'ভূতি' বৈশ্যের উপাধি; (২) হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা ভাস্করের পূর্ব্ব পুরুষেরা অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমন কি সমুদ্রগুপ্তের অপেক্ষাও ভাস্করের বংশগৌরব অধিকতর—কেননা পুরাণ প্রসিদ্ধ নরক ও মহাভারত প্রসিদ্ধ ভগদত্ত—বজ্রদত্ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন—এমন কি বরাহরূপে স্বয়ং নারায়ণ এই বংশের বীজী পুরুষ। তবে পুষ্যবর্ম্মার নামের সঙ্গে পুষ্যমিত্রাদির সাদৃশ্যের কারণ এই যে 'পুষ্য' এই সংজ্ঞাটিও প্রাচীন—মহাভারতের আদি পর্ব্বে 'পৌষ্য-পর্ব্ব' নামক আখ্যান ভাগে 'পৌষ্য' নাম পাওয়া যায়। * সমুদ্র বর্ম্মার নামের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের নাম সাদৃশ্যেরও বিশিষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমান কামরূপ জেলা ছাড়াইয়া উপরের দিকে তেজপুর শহরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের

* ভাস্করবর্ম্মার শাসনে সমুদ্রবর্ম্মার পত্নীর নাম দত্তদেবী এবং পুত্রের নাম বলবর্ম্মা আছে।

* এখন দেখিতেছি যে আরো কিছু লিখিতে পারিতাম। 'পুষ্য' নক্ষত্র বিশেষের নাম হওয়াতে, হয়ত ঐ নক্ষত্রে জাত বলিয়া ইঁহাদের সকলেরই এই নাম হইয়াছিল। পুষ্য নক্ষত্রে জন্ম সৌভাগ্যসূচক।
"প্রগল্‌ভগাত্রঃ পিতৃমাতৃভক্তঃ স্বধর্ম্মযুক্তোঽভিনবাভিযুক্তঃ।
ভবেন্মনুষ্যঃ খলু পুষ্যজন্মা সম্মান চামীকরবাহনাঢ্যঃ॥"
এরূপ নামকরণের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এবংবিধ কারণেই অর্জ্জুনের এক নাম 'ফাল্গুন' হইয়াছিল।

তীরবর্ত্তী একটা গিরি-গাত্রে যে লিপি দেখা যায় তাহাতে "গুপ্তাব্দ ৫১০" রহিয়াছে—ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের প্রভাব কামরূপ রাজ্যের উপরেও যথেষ্ট ছিল। পুষ্যবর্ম্মা তাই সাধ করিয়া গুপ্ত-কুল-রবি সমুদ্রগুপ্তের নামে ছেলেটির নাম রাখিয়া ছিলেন। তবে তাঁহার রাজ্ঞীর নাম "দত্তদেবী" হওয়াটা একটু অসাধারণ ঐক্য হইলেও বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই। 'দত্তা' শব্দটি সংজ্ঞার্থে বোধ হয় খুব সাধারণই ছিল, কেন না ভট্টোজী দীক্ষিত পাণিনির "সংজ্ঞাপূরণ্যোশ্চ" (৬।৩।৩৮) সূত্রের ব্যাখ্যায় স্ত্রী সংজ্ঞার উদাহরণে 'দত্তা' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। অপিচ রাজ্ঞীদের নাম একটা পসন্দ-সই করিয়া নিতেই বা বাধা কি? হয়তো পুষ্যবর্ম্মা পুত্রের 'সমুদ্র' নাম হওয়াতে বধূর নামেও সমুদ্র-পত্নীর নামানুকরণ করিয়া থাকিবেন। এইগুলি যদি কল্পিত কিছু হইত তবে পুষ্যবর্ম্মার স্থলে আমরা সমুদ্র গুপ্তের পিতার নাম দেখিতে পাইতাম। * বিশেষতঃ যখন হর্ষচরিতে উল্লেখিত ভাস্করের পিতৃপিতামহ প্রভৃতির নাম তাম্রশাসনের তত্তৎ নামের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে তখন অপর পুরুষগুলির নামেও কোনও কৃত্রিমতা নাই। ইহার উত্তরে স্মিথ সাহেব লিখেন (5/10/1919)

I have read with interest your letter of Sept. 2, about Bhaskaravarman, and have again looked at your article in Epigraphia Indica Vol. XII. You may be right but the coincidences of names are peculiar and arouse some suspicion, espicially in a copied record.† There is however nothing in my printed observations at p. p. 356 and 359 as amended, to interfere with your belief as I have nothing more to alter.

অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বেই যে সংশোধন করিয়াছেন তদতিরিক্ত আর কিছুই যোজনা করেন নাই—অতএব ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে আমার যাহা বিশ্বাস তদ্বিপরীত কোনও কথা গ্রন্থে লিখিত হইবে না।

তদীয় "আর্লি হিস্টরির" তৃতীয় সংস্করণ বাজারে চলিতেছে—চতুর্থ সংস্করণেই ভাস্করের আভিজাত্যবিরোধী তদীয় ভ্রান্তসংস্কার সংশোধিত হইবে, তদর্থে স্মিথ সাহেব নোট্ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিপত্রেই লিখিয়াছিলেন—এই সংশোধন তদীয় জীবিত সময়ে হইবে না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে—এই পত্রালাপের ৩।৪ মাস পরেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

ঢাকায় সঙ্গীত-চর্চ্চা।

(৪)

৺ রাজাবাবু,—রাজাবাবুর পিতামহ ৺ ভিখনলাল ঠাকুর পঞ্জাব্ লোধিয়ানা হইতে ঢাকার তদানিন্তন নবাবের হিসাব সেরেস্তার (Account department) কাজ নিয়া ঢাকায় আসেন এবং তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে জোয়ার নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা সহরের লক্ষ্মী বাজার নামক স্থান লাখেরাজ সম্পত্তিরূপে প্রাপ্ত হন। এই লক্ষ্মী বাজারেই রাজাবাবুদের বিস্তৃত প্রাঙ্গনযুক্ত নিবাস বাটী অবস্থিত। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিখনলাল ঠাকুর ঢাকা Commercial

* সমুদ্রবর্ম্মার পুত্র বলবর্ম্মার সম্বন্ধে স্মিথ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া উহার সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয় নাই।

† ভাস্করবর্ম্মার শাসনখানি পুড়িয়া যাওয়ার পশ্চাৎ উহার প্রতিলিপি দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হয়। এই সকল যখন ভাস্করের সময়েই দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—তখন ইহাতে পূর্ব্বপুরুষের নামে কৃত্রিমতা কেন হইবে? ফলতঃ স্মিথ সাহেবের এ আশঙ্কাও অমূলক।

এই সকল যখন ভাস্করের সময়েই দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—তখন ইহাতে পূর্ব্বপুরুষের নামে কৃত্রিমতা কেন হইবে? ফলতঃ স্মিথ সাহেবের এ আশঙ্কাও অমূলক।

Resident এর দেওয়ান নিযুক্ত হন। East India Company তাঁহাকে সে সময়ে নবাবের নিকট হইতে চাহিয়া নেন। ভিখনলাল ঠাকুরের গৃহদেবতা ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রের কথা এ দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। চক্রটী অতি বৃহৎ, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং বড়ই মনোজ্ঞদর্শন। লক্ষ্মীনারায়ণ অতি জাগ্রত দেবতা বলিয়া ঢাকার লোকের বিশ্বাস। জোয়ার নারায়ণগঞ্জ এই লক্ষ্মীনারায়ণের দেবোত্তর সম্পত্তি।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভিখনলাল ঠাকুর পরলোক গমন করিলে তাঁহার দুই পুত্র গোপাল প্রসাদ এবং নারায়ণ দাস শর্ম্মা সম্পত্তির অধিকারী হন। উক্ত দুই ভ্রাতার মৃত্যুর পরে গোপাল প্রসাদের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ শর্ম্মা ওরফে রাজাবাবু সম্পত্তির মালিক হন।

রাজাবাবু সঙ্গীতের বিশেষ পোষ্টা ছিলেন। বিখ্যাত তবলচী আতা হোসেনের পিতা হোসেন বক্স মিঞাকে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে ঢাকায় রাখিয়া তিনি তাহার নিকট তবলা শিক্ষা করেন। সুপ্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক হবিব মিঞাকেও রাজাবাবু মাহিনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজে ঢোলকও বেশ বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে বহু পশ্চিম দেশীয় ওস্তাদ ঢাকায় আসিয়া তাঁহার বাটীতে থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহার ও নবাবপুরের রামকুমার বাবুর উদ্যোগেই ঢাকায় নবাবি আমলের পর পুনরায় সঙ্গীত-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়। রামকুমার বাবু আনেন পাখোয়াজী খয়রাতি জমাদারকে আর রাজাবাবু আনেন হোসেন বক্সকে। উভয়েই ঢাকায় সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় করেন।

বর্ত্তমান সময়ে রাজাবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল শর্ম্মা মহাশয়ও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমে ৺ দুর্গা লালা এবং পরে ৺ সুপ্পন্ খাঁর নিকট তবলা শিক্ষা করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ প্রতি বৃহস্পতিবার কলাবৎগণ সঙ্গীত করিয়া থাকেন।

৺ ভারতচন্দ্র বসু ঠাকুর,——বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ মালখা নগর গ্রামে ভারতচন্দ্রের নিবাস বাটী। ঢাকা বারের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺ শরৎচন্দ্র বসুঠাকুর ইঁহারই পুত্র। ভারত বাবু ও রাজাবাবুর ওস্তাদ হোসেন বক্সের নিকট তবলা শিক্ষা করেন এবং তবলা ভালই বাজাইতেন।

৺ বলাইচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,—ইনি ঢাকা ১৭নং সূত্রাপুরনগর নিবাসী শ্রীযুত ক্ষেত্র চক্রবর্ত্তীর পিতামহ। ইঁহারা সূত্রধরের ব্রাহ্মণ। বিক্রমপুর হাঁসারার নিকটবর্ত্তী কাদিরসার্দ্দ গ্রাম হইতে প্রায় ৫.৬ পুরুষ যাবৎ এখানে আসিয়া ইঁহারা বাস করিতেছেন। সূতার নগরে যে স্থানে ইঁহাদের বাড়ী সেই যায়গাটা মালখা নগর নিবাসী তদানিন্তন বিখ্যাত নাজির ৺ বঙ্গচন্দ্র বসু ঠাকুরের ছিল। এখানে আসিয়াই ইঁহারা সূত্রধরদের কার্য্য করাইয়া বর্ণব্রাহ্মণে পরিণত হন। বলাই চক্রবর্ত্তী পাখোয়াজি ছিলেন। সম্ভবতঃ ৺ রামকুমার বসাকের নিকটই তিনি পাখোয়াজ শিখিয়াছিলেন। তিনি উহা উত্তম বাজাইতেন।

৺ হোসেন জান,—ঢাকা মিঞা সাহেবের ময়দানে ইঁহার নিবাস ছিল। খ্যাল ও টপ্পা অতি উত্তম গাইতেন। উহাতে তিনি বড় ওস্তাদ ছিলেন। কণ্ঠ বড়ই মধুর ছিল। ত্রিপুরার মহারাজা ৺ বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে অনেক সময় গান করিয়া ইনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

৺ মদন সূত্রধর,—ইনি ঢাকার বর্ত্তমান ওস্তাদ শ্রীযুত ইন্দ্রমোহন সেতারীর পিতা। বাসস্থান গোয়াল নগর, ঢাকা। ইঁহার পিতার নাম শ্যামলাল সূত্রধর। ইনি প্রথমে পশ্চিম দেশীয় ওস্তাদ আব্দুল্লা খাঁর নিকট, পরে ৺ শুকলাল মিস্ত্রীর নিকট সেতার শিক্ষা করেন এবং সেতার ও বেহালা বেশ বাজাইতেন।

৺কালীচরণ সূত্রধর,—প্রথমতঃ ইনি তাঁতিবাজার গোয়ালনগরে ছিলেন, পরে ঠাঁটারি বাজারে বাড়ী,

করেন। ইহাঁর পিতার নাম রাজেন্দ্র সূত্রধর। ৭।৮ বৎসর হয় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। কালীচরণের কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর ছিল। ইনি ধ্রুপদ ও খ্যাল উভয়ই উত্তম গাইতেন। কালীচরণ প্রথমে ঢাকা নিমতলীর বড় খাঁ সাহেবের নিকট সঙ্গীত শিখেন। বড় খাঁ সাহেব ফকিরের মত লোক ছিলেন, তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন পশ্চিমে। কালু সূত্রধরের পরবর্ত্তী ওস্তাদ ছিলেন ঠাঁটারি বাজারের ৺কৃষ্ণদাস কর্ম্মকার। কালীচরণ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সেতারার পিশতুত ভাই।

ঢাকার নটগণ বহুকাল যাবৎ এখানে বসবাস করিতেছেন। প্রবাদ ইহারা উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে জাহাঙ্গীরের সময়ে ঢাকায় আসেন। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে তাহারা বহু পূর্ব্বে হিন্দুরাজাদের সময়ে কর্ণাট হইতে ঢাকা জেলার বিভিন্নস্থানে অর্থাৎ সুবর্ণ-গ্রামে, রামপাল প্রভৃতি বিক্রমপুরের নানাস্থানে, এবং সাভারে আগমন করেন। ইহারা বলেন যে ইহাদের বংশের লোকেরাই এদেশে সারঙ্গ যন্ত্রের প্রথম প্রচলন করিয়াছেন।

বিক্রমপুরে যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যে "ভক্তিয়া" বলিয়া একটি সমাজ আছে। এই সমাজের বিশ্বনাথ ও রাধানাথ ভক্তিয়া গায়ক ও মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম চাঁদ রায় কেদার রায়ের যায়গীর ভোগী ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে জায়গীর প্রাপ্তির দলিলাদি গৃহদাহে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা দর্শাইতে না পারায় তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বকথিত রাধানাথ ও বিশ্বনাথ ভক্তিয়া একটি তানপুরা ও মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) লইয়া কলিকাতা কি হুগলি চলিয়া গেলেন। তথায় পঁহুছিয়া কোম্পানির তদানিন্তন প্রধান কর্ম্মচারীর বাগানে প্রবিষ্ট হইয়া স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে গান করিতে লাগিলেন। স্থান ও কাল বড়ই অনুকূল ছিল। উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির বিচিত্র শোভা নয়ন সমক্ষে বিস্তৃত, পরিমলাকুল শীতল সমীর ধীরে প্রবাহিত, পক্ষীকুলের কলকাকলিতে, ভ্রমর মুখের গুঞ্জরণে চারিদিক আপুরিত, স্বভাবতঃই—কলাবৎ যুগলের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহারা সঙ্গীতে সুধাধারা বহাইতে লাগিলেন। উদ্যানে হঠাৎ এমন সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে রাজকর্ম্মচারী নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তিনি এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি ১৩৮/০ বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের বংশধর শ্রীযুক্ত হরি আনন্দ ভক্তিয়া এখনও জীবিত আছেন। ইহার বয়স অনুমান ৭০।৭৭ বৎসর হইবে। ইনি সারঙ্গ যন্ত্রে পারদর্শী। বিক্রমপুর ব্রজেরহাটী নামক গ্রামে ইহাদের নিজ তালুকভুক্ত ভূমিতে ইনি বাস করিতেছেন।

৺নবীনচন্দ্র নট—ইহার পূর্ব্বপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে ঢাকা সাভার গ্রামে আসেন এবং সেই সময় হইতে পুরুষানুক্রমে ইহারা তথায়ই বসবাস করিতেছেন। ইহার পিতার নাম গোপীনাথ নট। ইনি সারঙ্গ যন্ত্রে অতি বিখ্যাত ছিলেন। নবীন ত্রিপুরাধিপতি ৺ঈশান-চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সভায় চাকুরি করিতেন। স্বভাবতঃ ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেনঃ এবং নৃসিংহ জীউর উপাসক ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত নৃসিংহ জীউ বিগ্রহ অদ্যাপি আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। সম্ভবতঃ ১২৭৮ সালে অনুমান ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে তিনি ঢাকার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করেন।

৺গোলকচাঁদ নট,—ইনি সারঙ্গী গোলকচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত বাইজী খ্যালি লাড্ডবিলাতনের সঙ্গে সারঙ্গ বাজাইতেন। গোলোকচাঁদ ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমীদার স্বর্গীয়

আনন্দকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে তৎসরকারে চাকরি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। অনুমান ৪৭।৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে তথায় পরলোক গমন করেন। ইহার পিতার নাম ছিল মাধবনারায়ণ নট। ঢাকা পারজোয়ারের অন্তর্গতঃ বাধাপুর গ্রাম ইহার জন্মস্থান। সম্প্রতি উক্ত গ্রাম ধলেশ্বরী গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় ইহার বংশধরগণ ঢাকায় বাস করিতেছেন।

৺বড় দ্বারকানাথ নট,—ইহার বিষয় অতি সংক্ষেপে পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি নূতন অনেক কথা সংগৃহীত হওয়ায় উহা এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ সর্দ্দার। ঢাকা জিলার অন্তর্গত কলাকোপা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ৬৫।৬৬ বৎসর বয়সে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনকুবের বাবু সনাতন দাস মহাশয়ের কোন এক আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে মীরপুর গ্রামে এক বজরা নৌকায় উপরে গানবাদ্যের মজলিসে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

একবার ঘটনাচক্রে তাঁহাকে ঢাকার পরলোকগত স্বনামধন্য নবাব খাজে আবদুল গনি K. C. S. I. মহোদয়ের দরবারস্থ বিখ্যাত তবলাবাদক সুপ্পন্ খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে তবলা বাজাইতে হয়। ঐ সময়ে প্রশংসা লাভ করিয়া ইনি নবাব সরকারের "মেজদরবারে" (সঙ্গীত সভায়—এই দরবারে বিখ্যাত বাইজি ও অন্যান্য কলাবৎদের সঙ্গীত হইত) তবলাবাদক নিযুক্ত হন।

দ্বারকানাথের ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত হোসেন বক্স। ইনি সুপ্পন খাঁরও প্রথম ওস্তাদ। সুপ্পন খাঁ যখন খুব দক্ষ হইলেন তখন কোন কারণে নাকি হোসেন বক্সের গুরুতা স্বীকার করিতে চাহিতেন না। সুপ্পন খাঁ একদা নবাব দরবারে হোসেন বক্সের সঙ্গে তবলার "পাল্লা দিয়া" জয়ী হইতে মনস্থ করেন। কিন্তু নবাব বাড়ীর অনেকে এবং ঢাকার অন্যান্য ওস্তাদরা হোসেন বক্সকে বলেন "তুমি নিজে কখনও সাকরেদের সঙ্গে তবলার 'পাল্লা' দিও না। অন্য সাকরেদ্ করিয়া তাহার সঙ্গে 'পাল্লা' দেওয়াও।" তিনি অনেক খুঁজিয়া দ্বারকাকে সাকরেদ করিলেন এবং নবাব সরকার হইতে ছয় মাস সময় নিলেন। ছয় মাস পরে মজলিস বসিল। হোসেন বক্স তবলার সুর মিলাইতেই সুপ্পন খাঁ "সঙ্গীত" শ্রেণীর একটি গান ধরিয়া দিলেন। এইরূপ গানে অনেক নাচের বোল থাকে। এ জাতীয় গান সাধারণতঃ মজলিসে গাওয়া হয় না। হোসেন বক্স একটু মুস্কিলে পড়িলেন এবং কতকটা লজ্জা পাইবার মত হইলেন। তখন তাঁহার সাকরেদ্ দ্বারকানাথ নট উঠিয়া বলিলেন—"ইয়ে চিজ ওস্তাদ ক্যোঁও বাজায়েগা? উন্‌কো সাকরেদ হাম বাজাউঙ্গা।" তখন দ্বারকানাথ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমবার সামান্য একটু বেশ কম হইল, কিন্তু দ্বিতীয় বারে সব ঠিক হইয়া গেল এবং চতুর্দ্দিক হইতে বাহবা ধ্বনি উঠিল। তৎপর দ্বারকানাথ এই শ্রেণীরই একটি গান ধরিলেন কিন্তু সুপ্পন তাহা সুবিধামত বাজাইতে পারিলেন না। সেই হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ নবাব সরকারে নিযুক্ত থাকেন। দ্বারকানাথ ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরকে প্রথমাবস্থায় তবলা শিক্ষা দেন। তিনি সারঙ্গও উত্তম বাজাইতেন।

ঢাকা ফরিদাবাদে ইনি বাড়ী করিয়া বসবাস করেন। ইহার খুড়তাত ভাই ৺ রাধানাথ নটের পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী নট সারঙ্গে অভিজ্ঞ। ইনি খ্যাল, টপ্পা, ঠুম্‌রি, গজল প্রভৃতি সঙ্গীত জানেন। বর্ত্তমান বয়স ৭০।৭২ বৎসর।

৺ হরিদাস নট,—পিতার নাম গোলোক নারায়ণ নট। নিবাস ঢাকা ভক্তিয়াটুলি। এই স্থান বাঙ্গালা-নগরের নিকটে। "ভক্তিয়ারা" এখানে বাস করে বলিয়া এই স্থান "ভক্তিয়াটুলি" নামে পরিচিত। এই "ভক্তিয়াটুলির" কতকাংশ আটীর রক্ষিত মহাশয়দের

অধিকার ভুক্ত। হরিদাস সারঙ্গ বাদনে এবং খ্যাল, টপ্পা, ঠুম্‌রি ও গজল প্রভৃতি গানে বিখ্যাত ছিলেন। ইহার ছেলে প্যারিমোহন ও রাধারমণ সারঙ্গে দক্ষ বটে।

৺বড় হারান নট—পিতার নাম ৺কৃষ্ণকুমার নট। নিবাস ঢাকা ফরিদাবাদ। কৃষ্ণকুমার বাল্যে প্রথমে ইহাকে পাঠশালায় কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়া পরে ঢাকা নবাবপুরের "কুঞ্জেশ্বরী মিলন" যাত্রার দলে প্রবেশ করাইয়া দেন। হারানই কুঞ্জেশ্বরী অর্থাৎ রাধিকা সাজিতেন। সেখানে থাকিয়া হারান বিখ্যাত ধ্রুপদী ৺হরি কর্ম্মকারের নিকট ধ্রুপদ গান এবং মদনমোহন বসাকের নিকট সারঙ্গ, এস্রাজ, এবং আনন্দমোহন বসাক হইতে মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) ও তবলা শিক্ষা করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরে বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গনিবাসী পাল চৌধুরী মহাশয়দের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ৫।৬ বৎসর ইনি সঙ্গীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে তথাকার উচ্চ ইংরেজীবিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তখন তাহার বয়স অনুমান ২০।২২ বৎসর। দিনে স্কুলে পড়িতেন, রাত্রে সঙ্গীতের শিক্ষকতা করিতেন, এমনই তাহার লেখাপড়া শিখিবার ঝোঁক ছিল। পরে ঢাকা আসিয়া একবৎসর পাঠ করেন। উক্ত "কুঞ্জেশ্বরী মিলন" যাত্রা নবাবপুরের রামকুমার বাবুর "ভ্রমর গীতা" যাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অভিনীত হয়। এই কুঞ্জেশ্বরী মিলন যাত্রারগানসমূহে প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দিবা ও রাত্রির বহু রাগ রাগিনী এবং বিবিধ তাল ব্যবহার করা হইয়াছিল।

পরে নানা কারণে বাধ্য হইয়া হারানকে স্বীয় জাতীয় ব্যবসা সফরদারী আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। ইহার পরে অবশিষ্ট জীবন ইনি তেজারতি ব্যবসাদ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া ১৩০১ সনে ৩৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কনিষ্ঠ সহোদর বিখ্যাত সারঙ্গী কালীকুমার নট। কালীকুমারের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই লেখা হইয়াছে।

৺দুর্গাচরণ নট,—ইনি অতি গুণবান লোক ছিলেন। সারঙ্গ, বেহালা, এস্রাজ, তবলা ও গানে ইহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ঢাকা, কাশীমপুরের সঙ্গীতজ্ঞ জমীদার স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সরকারে চাকুরী করিয়া অনুমান ১৩১২ বৎসর সনে ২০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহার দীনবন্ধু, মদন, বিপিন ও ভুবন নামে আরও চারিটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল বলিয়া গুণগ্রাহী লোকেরা ইহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া উল্লেখ করিত। ঐ ভ্রাতাগণও উক্ত যন্ত্রসকল বাজাইতে জানিত। ঢাকাজেলার শিমুলিয়া গ্রামে ইহাদের নিবাস ছিল।

৺রাধাকান্ত নট কীর্ত্তনিয়া,—ইহার নিবাস বিক্রমপুর আউটশাহী গ্রামে। ইনি তবলাতে বিখ্যাত ছিলেন; যাত্রার দলে তবলা বাজাইতেন এবং গানও উত্তম করিতেন।

এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে উল্লিখিত নটদিগের বিবরণ আমি ঢাকা ফরিদাবাদের পাঠশালা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নট মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

৺দীনু সিং—ইহার নিবাস ঢাকা কেরাণীগঞ্জ থানার আটী নামক গ্রামে। দীনু সিং আটীর রক্ষিত মহাশয়দেরই প্রজা ছিল। ইহার পিতার নাম ছিল রামকৃষ্ণ সিং। দীনু সিং আটীতে অভিনীত "হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ" পালা এবং "রাবন বধ" পালা নামক যাত্রার দলের অধিকারী ছিল। স্বয়ং বেহালা বাজাইয়া অতি সুন্দর গান করিত। কিন্তু শেষ বয়সে সে খাদের সুরে গান গাইতে অভ্যাস করিয়াছিল। ৫৫।৫৬ বৎসর বয়সে ঢাকা নারাণদিয়ায় শ্বশুরবাড়ীতে প্রায় ২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বে দীনু পরলোক গমন করে। যখনই সে গান করিত তখনই জমিয়া যাইত—ইহাই তাহার বিশেষ গুণ ছিল। সে বেহালা, বাঁশী ও তবলা বাজাইতে পারিত। লোকটা বুদ্ধিমান ও বড় ঢঙ্গী ছিল। অনেক সময়ে নিজে উদ্ভাবনা করিয়া নানা সাজ দিয়া সকলকে

আমোদিত করিত। মালসী গান, যাত্রার গান, দাশরথীর, রামমোহন আবদীর এবং বিশেষতঃ রামপ্রসাদী মালসী গান করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। শ্যামা-ভক্ত রামমোহন আবদী মহাশয় যখন বার্ষিক আনিবার জন্য ধনিক বাড়ীতে যাইতেন তখন গানের বৈঠকে দীনুর ডাক পড়িত এবং আবদী মহাশয় তাহার গানে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। দীনু সিংহের একদিনকার বাঁশী বাজাইবার কথা আমার মনে হইতেছে। সেদিন পূর্ণিমা কি এমনই কিছু ছিল। বর্ষাকাল—আমি দোতালার ঘরে ঘুমাইয়াছিলাম। খানিক পরে স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন এক অমৃত ধারা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল—সে দীনুর মোহন বাঁশীরই মধুর স্বর। ক্ষণমাত্র পরে সেই স্বর লহরীর হিল্লোলে হিল্লোলে আমার সুপ্ত হৃদয় নাচিয়া জাগিয়া উঠিল—আমি স্বর উদ্দেশ করিয়া চলিলাম। তখন রাত্রি একটা। পৃথিবী ও আকাশ জ্যোৎস্নায় ছাইয়া গিয়াছে—গাছ, পাতা, লতা, ফুল সকলই যেন হাসিতেছে। আমি উধাও হইয়া ছুটিলাম। ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমাদের বাহির বাড়ীর পুকুরের ঘাটলায় বসিয়া একাকী দীনু সিং মধু ঢালিতেছে। তখন সুধীরে বাতাস বহিতেছিল—পুকুরের কানায় কানায় জল—জলে নির্ম্মল ধবল কুমুদরাজি প্রস্ফুটিত, তীরে কদম ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর—নৈশ প্রকৃতি নীরবপ্রায়—ঝিল্লীদলের ঐকতান ধ্বনিমাত্র শ্রবণে পশিতেছে—দীনবন্ধুর বাঁশীর স্বর বর্ষাজলে প্রতিধ্বনিত হইয়া নীল আকাশপানে ছুটিতে ছুটিতে যেন চন্দ্রকিরণ বাহিয়া বাহিয়া অনন্তে মিলাইতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য সেখানে স্বর্গসৃষ্ট হইল। সে দিনের কথা জীবনে ভুলিব না।

৮ চন্দ্রকান্ত শিকারী,- ইহার নিবাস ঢাকা কেরানী-গঞ্জ থানার অন্তর্গত আটী নামক গ্রামের "শিকারীটোলা" নামক পল্লীতে। এখানে শিকারীদের বাস বলিয়াই এই পল্লীর উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। শিকারীরা এ দেশের আদিম অধিবাসী নহে। ঢাকার নবাবগণ সুদীর্ঘ ছিপ নৌকায় শিকার করিতে যাইতেন। এই নৌকা ২।৩ হাত পাশ ও ৬০।৭০ হাত লম্বা হইত। এই সকল নৌকার মাঝিগিরি করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে শিকারীগণ এদেশে আনিত হয়। ঢাকা সহরের পশ্চিমপাশে ও ইহাদের বাসস্থান আছে। ইহারা এখন এ দেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। এদের কথা বলিবার ভঙ্গী মোটেই এ দেশীয় নহে। মোদক জাতি বলিয়া ইহারা পরিচয় দেয়। এদেশে আসিয়া ইহাদের জল অচল হইয়াছে। তবে পৌরহিত্য কার্য্য করিবার জন্য নিজেদের ব্রাহ্মণ আছে। মুড়ি, মুরলী বেচা, নৌকা বাওয়া, মজুরী করা, বড় বড় নৌকায় ক্ষেপ দেওয়া ও অন্যান্য নানারূপ কারবার করা ইহাদের ব্যবসা। শিকারী বিধবা রমণীগণ নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে ও ঢাকা সহরের উপর ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া মুড়ি, ভাজা মটর, বাখরার খৈ প্রভৃতি বিক্রয় করে। "টেটা" নামক অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে শিকারীরা বড়ই ওস্তাদ। এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ইহারা আশ্চর্য্য কৌশলে নদীতে কাউঠা ধরে। টেটাটি হাতে লইয়া একজন লোক খাড়া পদে একখানি ডিঙ্গি নৌকার উপর সতর্ক দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ করিতে থাকে নদীর কোনস্থানে কাউঠা ভাসান দিল। অন্য আরেকজন লোক নৌকাটি আবশ্যক মত চালায়। কাউঠা দেখিলেই শীকারী উহাকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধদিকে "টেটা" নিক্ষেপ করে, আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ ঊর্দ্ধনিক্ষিপ্ত অস্ত্র মুহূর্ত্তে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ফেলে এবং নৌকা দ্রুত চালাইয়া ঐ শর হস্ত অস্ত্রের কাউঠা বেচারীকে ধরিয়া তোলে। শীকারীগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। ইহারা সঙ্গীতপ্রিয়, কীর্ত্তনে ইহাদের বড়ই আনন্দ। ইহাদের মধ্যে ভেকধারী বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা বড় বেশী। পূর্ব্বে হুলির সময় ইহারা ছাদপান করিত। এখনও দিবাবসানে গ্রাম্যপ্রকৃতি যখন তিমিরাবরণে ঢাকা বহন [illegible]টিকে

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন দিবসের ক্লান্তি দূর করিয়া ইহারা গৃহকুটীরের প্রাঙ্গনে বা বারান্দায় বসিয়া সারিন্দা ও মন্দিরার মধুর নিক্বণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া খঞ্জরী বা খোল বাজাইয়া সুধামাখা হরিনামে পল্লীটিকে মুখরিত করিয়া তোলে।

আমাদের চন্দ্রকান্ত ইহাদেরই একজন ছিল। সে সন্নিকটবর্ত্তী একটি পাঠশালার গ্রাম্য গুরুমহাশয়গিরি করিত, সুতরাং কিছু লেখাপড়া সে জানিত। চন্দ্রকান্তের কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল। সে "সীতার বনবাস" পালা নামক একটি যাত্রার দল করিয়াছিল। প্রায় ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বে আমরা আটীর রক্ষিত বাড়ীতে দুর্গাপূজা, দীপান্বিতা বা বারোয়ারি কালীপূজার সময়ে এই যাত্রা বহুবার শুনিয়াছি। ইহা চন্দ্রকান্তেরই রচনা। ৮।৯ বৎসর বয়সের শোনা বিষয়ের ভাল মন্দের বিচার এখন করিতে পারিব না। কারণ আমরা তখন, প্রকাণ্ড জড়িত লেজ পাকাইতে পাকাইতে শ্রীহনুমান কখন আসিবেন তার জন্যই বেশী ব্যস্ত থাকিতাম। তবে একথা বেশ মনে পড়ে যে সীতাদেবীর বিলাপপূর্ণ গানগুলি শুনিয়া বৃদ্ধেরা বড়ই কাঁদিতেন। আমার গম্ভীর প্রকৃতি স্বর্ণকান্ত পিতামহদেবের দুই গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাঁদিতাম। ঐরূপ অল্প বয়সেই আমরা রামায়ণ কাহিনীটি মোটামুটি জানিতাম, ইহা পিতামহঠাকুরের কৃপা। তিনি প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর আমাদিগকে রামায়ণের কোন না কোন কাহিনী মধুর ভাষায় মুখে মুখে বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন। তাই যাত্রার বিবরণটি মোটামুটি না বুঝিতাম এমন নহে। আর একটা স্থান—রামের সঙ্গে লবকুশের ধনুর্ব্বান নিয়ে যুদ্ধটা আমাদের কাছে বড় বেশ লাগিত। ছোট ছোট দুটি নধরদেহ ছেলেকে সবুজ রঙ মাখাইয়া লবকুশ সাজাইয়া দিত আর তাহারা তেমনি সবুজ রঙমাখানো রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া ধনুগুর্ণ টানিয়া ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া বান ছাড়িতে ছাড়িতে গাইত,—

"কি পরিচয় দিব তোমায় যুদ্ধকালেতে?
আগে মান রাখ প্রাণ এ সময়েতে।"

এই যাত্রায় কথোপকথন খুব কমই ছিল। সবই প্রায় গান। কেবল ভাবের যোগ রাখার জন্য মাঝে মাঝে কথা, তাও যেখানে বেশী কথার দরকার সেখানে সুরসংযোগে অধিকাংশই পয়ার।

এ যাত্রার আরেকটি বিশেষত্ব ছিল,—হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মিলিয়া এ যাত্রার অভিনয় নিষ্পন্ন করিত। বাল্মীকি সাজিত গায়ে খড়িমাটি মাখিয়া গলদেশে শুভ্র উপবীত গুচ্ছ ধারণ করিয়া সুন্দর গঠন শুভ্র শশ্রুধারী জনাবালী বেপারী। সে ছিল, অধুনা স্বর্গগত নির্ম্মল নম্র-স্বভাব জনৈক মোসলেম সন্তান। পল্লীমাতার হিন্দু মুসলমান সন্তানেরা এইরূপে সম্মিলিত হইয়া "সীতার বনবাস" যাত্রা গাইয়া উভয়শ্রেণীর শতসহস্র শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিত। প্রায় ৩০বৎসর হয় চন্দ্রকান্ত শিকারী পরলোক গমন করিয়াছে।

আটীর সন্নিকটবর্ত্তী বলসতা নামক গ্রামের পরলোকগত নিমাই ব্যাপারী নামক জনৈক মোসলেম্ সন্তানের কর্ত্তৃত্বে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী অবলম্বনে একটি "ভাসান যাত্রার" অভিনয় হইয়াছিল। ইহাতেও হিন্দু মুসলমান একত্রে যোগদান করিয়াছিল। ২০।২২ বৎসর হয় নিমাই ব্যাপারীর মৃত্যু হইয়াছে।

ইহার বহু পূর্ব্বে আটীর পাঁচদোনা নামক পল্লীর জনৈক মুসলমান ব্যাপারীর উদ্যোগে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে মিলিয়া "শতস্কন্ধ রাবন বধ" পালা নামক যাত্রার অভিনয় করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শশীমোহন বসাক,—ইহার নিবাস ৭নং আনন্দমোহন বসাক লেন, (তাঁতিবাজার, বাসাবাড়ীর গলি)। ইনি ৺গোবর্দ্ধন বসাক মহাশয়ের পুত্র। ঢাকা জজকোর্টে ২৯।৩০ বৎসর যাবৎ Camparing clerkএর কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান বয়স অনুমান ৬০ বৎসর।

শশীবাবু ঢাকার ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ তবলা বাদক সুপ্রন্ খাঁর একজন প্রধান সাক্রেদ। ইহার হাত বড় মিঠে। সেতার ও সর্ব্বপ্রকার গানের সঙ্গে উত্তম সঙ্গৎ করেন।

ঢাকার তদানিন্তন সরকারী উকিল স্বর্গীয় রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের বাসায় একদিন গানের মজলিস হয়। সে সভায় দিনাজপুরের মহারাজ স্বর্গীয় সার্ গিরীজানাথ রায় এবং কাশিম বাজারের মহারাজ শ্রীযুত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়দ্বয় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তথায় বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদী কলাবত শ্রেষ্ঠ শ্রীযুত রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সভার আরও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঢাকার ওস্তাদকুল—ধ্রুপদী ৺ হরি কর্ম্মকার, শ্রীযুত ভগবান সেতারী, শ্রীযুত এমদাদ্ খাঁ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। প্রথমে গান হইল। পরে গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে মহারাজদ্বয় শ্রীযুত ভগবান সেতারীর সেতার শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। ভগবান তাহার সেতারে মধুর ঝঙ্কার দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলে শশীবাবু তৎসঙ্গে তবলার সঙ্গৎ করিতে লাগিলেন। সেতারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সুরের অনুরননে পরদায় পরদায় মধু ঝরিতে লাগিল। শশীবাবুর তবলাও এমন বাজিতে লাগিল যে সেতারের বোলের নীচে তবলার বোলপরন মধুরে ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল। মনে হইল যেন তবলার লাগ ডাঁট্ আওয়াজরূপ সবুজ মকমলের উপর বোল্-পরনের রেশমী ফুলপাতা তোলা হইতে লাগিল, আর সেই জমিনেরই উপরে সেতারের ফুল বুটারূপ কারচুপীর কাজ গুলজার হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভগবানে শশীতে অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য লয়ের কারখানা চলিল। সভাজন মুগ্ধ মোহিত হইয়া সে আনন্দধারা শ্রবণপথে পান করিতে লাগিলেন। সমে সমে বাহবা পড়িতে লাগিল।

১৯০৬ সনে ঢাকা নবাবগঞ্জ থানার কোন এক গ্রামের জমিদার স্বর্গীয় চৌধুরী অলিউল্লা সাহেব শশীবাবুকে একটি সুবর্ণপদক উপহার দেন। পদকের উভয়পৃষ্ঠে এইরূপ লিখিত আছে :—

"Presented by
Ch. Aliullah Shaheb,
Th. P. P. S. C. Ghosh,
to B. S. M. Basak,
Lay Bisharad.
Dacca.
1906."

"Preparing
Hooly song
with different
varieties."

সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলির ব্যাখ্যা,—

Th. P. P. S. C.=through Public Prosecutor Sarat Chandra Ghosh.

B. S. M. Basak=Babu Shasi Mohan Basak.

Lay=লয়।

শশীবাবু হলির গান রচনা করিতে প্রসিদ্ধ। দোলের সময়ে রাজাবাবুর ময়দানে যে হুলিগান হয়, তাহাতে তিনি বহুগান দিয়া থাকেন। ইহাতে তাল লয় এবং রাগরাগিনীর পারিপাট্য বিশেষভাবে থাকে। নিদর্শন স্বরূপ একটি গান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাগিনী খাম্বাজ—তাল ফেরতা।
চৌতাল।

আস্থায়ী :—

"অ্যায়সি চণ্ড সে ত্রিপুরারি
গাওয়ত শ্রীখাম্বাজ কি তান,
সা রে গা মা পর লাগাওয়ে ধ্যান,
আনন্দ মচায়ে দেবতাগণ,
সারেরেরে রেরেরেরে রেরেরেরে রেরেরেরে,
সারেরেরে রেরেরেরে রেরেরেরে গা।
নিনিনিনি ধাধাধাধা পাপাপাপা
মামামামা গাগাগাগা গাগাগাগা
রেরেরেরে সা সা॥

সুরফাঁক তাল।

অন্তরা :—

বাজে মৃদঙ্গ ধেৎ ধামা নানা নানা বোলে,
তালে মানে গণপতি আয়সি বাজাওয়ে,
ধাধা ধেনৃতা কেৎধা ধেনৃতা
কেটে কতা গধি ধেনে,
কতাক্ ধেকেটে তাংনা নাংনা
ধাত্রে কেট্ ধেকেটে নাংনা নাংনা
কতা কত্তা কতা গ্রেধেন্ তান্,
তৎ তৎথে জগ জগতাতা তেৎতা
থোম্ তেৎতা কিটি তাক্ তাক্ দিগি
থোরি আদি দিদি মদা বলবৎ ধা।
ধেণাকে ধেনাকেটে হরণও গণপতি ঝাঝাঝা,
ঝালা চুটু মুটু কুকু আলা মাথো সা সা
গৌতম গা,

যেষাং শ্রীমদ্ যশোদা সুত পদকমলে নাস্তি ভক্তি র্নরানাং,
যেষা মাভীরকন্যা প্রিয় গুণ কথনে নাভিলাষঃ কদাচিৎ।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রবিশতি মধুরা সাদরং নৈব কর্ণে,
ধিক্তান্ ধিক্তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিয়তং কীর্ত্তনস্থো
মৃদঙ্গঃ ॥ ঝা ঝা ঝা ॥

এখানে ঢাকা উর্দ্দুবাজারস্থ ৺ লালা বাজপাই লালের রচিত একটি হুলিগানের কীয়দংশ দেওয়া গেল। গানটি সুন্দর। উর্দ্দুবাজারেও এক ময়দানে হুলিগান হইয়া থাকে। একবৎসর লক্ষ্মীবাজারে পরবৎসর উর্দ্দুবাজারে এইরূপভাবে প্রতিবছর ঢাকায় "হোলির ঘোড়ের" গান হইয়া থাকে। লালা বাজপাই লাল উর্দ্দুর দলে গান রচনা করিয়া দিতেন। বাজপাই লালের বিষয় আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধেই লিখিত হইয়াছে। গানটি এই :—

দেশমল্লার—ফেরৃতা।
(পঞ্চম সোয়ারি)।

"যব দেশ মল্লার সুর
শিব শঙ্কর হর গাওয়ে হো,
ঘন গরজে গগন, বিজলি চমকে সঘন,
ঘটা ছায়ে হো।

(সুরফাঁকতাল)।

বোলন লাগি হংস ময়ুর,
চকোর ধতুর, সারস, পাপিয়া,

(খেমটা)।

শোন্ শোনকে হর্রঙ্গকি তান,
ছুট্ গাই মুনিয়ান্ কি ধ্যান,

(দৌরী)।

বিষ্ণু পিয়াস ভয়ে,
সরস্বতী মতি ভঁওরায়ে হো॥"

শ্রীযুত হাফেজ রহমান,—পিতা ৺ ফজলুর রহমান। বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৬৬ বৎসর নিবাস ৩নং শঙ্করটোলা (সঙ্গৎ টোলা—এই গলিতে নানক পন্থীদের একটি আখড়া আছে, এটিকে "সঙ্গতের আখড়া" বলে, ইহারই নামানুযায়ী এই স্থানের নাম "সঙ্গৎ টোলা" হয়, ক্রমে এখন কিন্তু ইহাকে "শঙ্করটোলা"য় পরিণত করা হইয়াছে)। এই বাড়ীতে ইহারা ৩০০শত বৎসর যাবৎ আছেন। এ বাড়ীটি এক সময়ে ওলন্দাজদের কারখানা (factory) ছিল। এই বংশের সৈয়দ গোলাম নবি এই বাড়ীতে প্রথম বাস করেন। হাফেজ সাহেবের পিতা সেতার বাজাইতে পারিতেন; তিনি সুবিখ্যাত শ্রীযুত ভগবান সেতারীর পিতা রতন দাস বাবাজির নিকট সেতার শিক্ষা করেন। হাফেজ সাহেব প্রথমে তদীয় মাতুল মীর রেয়াজুদ্দিনের নিকট সেতার শিখেন,

তৎপরে ভগবান সেতারীর নিকট বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহার একজন প্রধান সাক্রেদ হন। ইনি ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে কাজ করিতেন। পরে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার হইয়া যান। তথায় সরদী আহাম্মদ খাঁ, এবং ভারতবিখ্যাত বীনকার উজির খাঁর নিকট কিছুদিন সেতার শিক্ষা করেন। ইঁহার হাত অতি মিষ্ট। ইনি বড় অমায়িক লোক। প্রায় তিন বৎসর যাবৎ পেন্সেন্ লইয়া বাড়ীতে আছেন। সেতারের মধুর আলাপ করিয়া দিবসের অধিকাংশ ভাগ উহার মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ—মগ্ন হইয়া অবস্থান করেন। আমার সঙ্গে কখনও তাঁহার পরিচয় ছিল না, কিন্তু একদিন উপস্থিত হইয়া সেতার শুনিতে চাওয়া মাত্র গৈরিক পরিহিত হাফেজ মিঞা সেতারটি হাতে নিয়া "ভৈরবীর" আলাপে সেই প্রভাত প্রকৃতিকে যেন সুরের আবেশে ছাইয়া ফেলিলেন, মুহূর্তের জন্য সংসার ভুলিয়া গেলাম। মনে স্বর্গীয় আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতে লাগিল। মানসনেত্রে দেখিতে লাগিলাম,—

"স্ফটিক রচিত পীঠে রম্য কৈলাস শৃঙ্গে
বিকচ কমল পত্রে রর্চ্চয়ন্তী মহেশম্।
করধৃতঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী
* * ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী॥"

অতঃপর হাফেজ সাহেব আশাবরী রাগিণীর মধুর গম্ভীর আলাপ করিয়া বাদন শেষ করিলেন। তখন হঠাৎ যেন কোন ধ্যানলোক হইতে মর্ত্তে নামিয়া পড়িলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কালের লিপি।

কালের লিপি আস্‌ছে ধীরে ওই
খেয়াল তব নাইক কিছু কবি!
আপন ভাবে আপনা-হারা হই'
চাও না ফিরে ডুব্‌ছে যেগো রবি!

মাথায় তব কালো কেশের ফাঁকে
ওই দেখ না পাক্‌ল দু'টী চুল,
আর কে বল ঠেকিয়ে তোমা রাখে
দু'খান চিঠি—নয় গো নয় ভুল!

হাজার মজা লুটলে তুমি গানে
এবার মজা বুঝ্‌বে ভাল করে,
থামাও বাঁশী—ভয় কি নাই প্রাণে
পায়ের কড়ি জমল নাত ঘরে!

পাগল কবি বল্‌ল শুধু হেসে
"কালের লিপি আমার তরে নয়,
নীল আকাশে ফিরব সদা ভেসে
গানের সুরে কালেই করি জয়!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাধারণ পুস্তকাগার। *

মানব জগতে জ্ঞান বিধাতার অতুল্য ও অমূল্য দান। ধন, ধান্য, রত্ন সম্ভারে অদ্বিতীয় মানব যদি জ্ঞানালোকে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি রত্নগর্ভ তিমিরাবৃত খনির ন্যায় জনগণের অগম্য ও ভয়াবহ হইয়া থাকে।

* কলিকাতা বহুবাজার ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক উৎসবের পুরস্কার প্রবন্ধ।

এই অমূল্য জ্ঞানরত্ন লাভ করিবার প্রধানতম উপায় বিবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক। প্রবীন ও নবীন জ্ঞানি মহাজনগণ তাঁহাদের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি যে পবিত্র ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়া থাকেন, উহারই নাম পুস্তক। জগতের আদিম শিক্ষাগুরুগণ কতকাল পূর্ব্বে ইহকাল হইতে স্ব স্ব সাধনোচিত দিব্য ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। কাল শুষ্ক কুসুমের ভুবনমোহন পরিমলের ন্যায় উঁহাদের প্রদত্ত জ্ঞানোপদেশ অদ্যাপি জগতের দ্বিতীয় গুরুস্বরূপে আমাদের মহোপকার সাধন করিতেছে। মহর্ষি বেদব্যাসের অক্ষয় কীর্ত্তি মহাভারত, কবিগুরু বাল্মীকির অমর কাব্য রামায়ণ, গৌতম, কপিল, কনাদাদির যশো মন্দির ষড়্দর্শন, কবিশেখর মুকুন্দরামের 'গজদন্ত কনকে জড়িত' কবিকঙ্কণ, ভক্ত রসিক কবি চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির কীর্ত্তি কোহিনুর সুমধুর পদাবলী, ভাবুক কবি জয়দেবের 'মধুর কোমলকান্ত' পদকদম্ব রচিত গীত গোবিন্দ প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থরাজি ঐ সকল ক্ষণজন্মা দিব্য গ্রন্থকারের কৃতীপুত্র ও শিষ্য পরম্পরায় জগতের শিক্ষাদান কার্য্যে পর্য্যাপ্ত সাহায্য করিতেছে। ফলতঃ অতীত কালের ঋষিগণ দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর যোগ ও তপস্যার প্রভাবে জগতের মঙ্গলার্থে যে সকল দুরূহ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান মনীষিবর্গ তাঁহাদের অদ্ভুত মনীষা ও প্রতিভা বলে পৃথিবীর জ্ঞান বৃদ্ধির ও সুখ সমৃদ্ধির মূল যে নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, আমরা একমাত্র পুস্তকের সাহায্যেই ঐ গুলি শিখিতে ও আয়ত্ত করিতে পারি। অতএব পুস্তক শিক্ষা লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। জনশিক্ষার পথ সুগম ও সহজ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের ও জাতির রচিত এবং সংগৃহীত বহুল গ্রন্থের একত্র সমাবেশের নাম পুস্তকালয়, Library. এইরূপে পুস্তক সংগ্রহ সাধারণতঃ দুইটী কারণে হইতে পারে। প্রথমতঃ সংগ্রহ কর্ত্তার নিজের ও নিজ পরিবারের শিক্ষার জন্য। ইহাকে আমরা ব্যক্তি বিশেষের পুস্তকালয় (Private Library) কিংবা পারিবারিক পুস্তকালয় (Family Library) নামে অভিহিত করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের জ্ঞান বর্দ্ধনের শুভ সংকল্প প্রনোদিত হইয়া যদি কোন ধনী মহাত্মা নিজব্যয়ে অথবা কতিপয় পরার্থপর ব্যক্তি নিজ নিজ প্রদত্ত অর্থ ও অন্যের নিকট সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা উক্তরূপ পুস্তকালয় স্থাপন করেন; উহা সাধারণ পুস্তকাগার বা Public Library নামে পরিচিত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকালয় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের ও পাঠকবর্গের আর্থিক অবস্থা এবং রুচি ভেদে দুইভাগে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠাতাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা না থাকিলে উহাতে জনসাধারণকে বিনা চাঁদায় পড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর লাইব্রেরী পাশ্চাত্য দেশে (Free Library) নামে উক্ত হইয়া থাকে। আর যে স্থলে ঐরূপ বিনা চাঁদায় পাঠ করিতে দেওয়া অসম্ভব বিবেচিত হয় তথায় নিয়মিত চাঁদা লইয়া পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই প্রকৃতির লাইব্রেরীকে সচরাচর Reading Library বলা হইয়া থাকে। ভারতে কতকাল পূর্ব্বে জনশিক্ষার বহুল প্রচার বাসনায় এইরূপ পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থরক্ষার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলা কঠিন। তবে শব্দ বিজ্ঞানের দিকদিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে 'গ্রন্থশালা, গ্রন্থকুটী' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ আধুনিক পুস্তকালয়েরই পূর্ব্বপুরুষ। কাল বিপ্রকর্ষে ইহাদের পরস্পর নিকট সাপিণ্ড্য বিচ্ছিন্ন হইলেও আকৃতি প্রকৃতি ঘটিত সাজাত্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। পুস্তকের আদিম নাম গ্রন্থ। এ দেশে কাগজের প্রচলন হওয়ার পূর্ব্বে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, কদলীপত্র প্রভৃতি সামগ্রী লেখিবার আধার ছিল। ঐ সকল পাত্রে লেখ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া উহাদিগকে একত্র গ্রথিত করিবার জন্য পত্রগুলির মধ্যস্থানে সূক্ষ্মাগ্র লৌহশলাকাদির সাহায্যে এক একটী ছিদ্র করা হইত। তৎপরে একগাছি সূত্রদ্বারে ঐ পত্রগুলি একে একে গাঁথিয়া একএকটী বিষয় যতগুলি

পত্রে লিখিত হইত উহার সমগ্রগুলি একত্র এক একখানি গ্রন্থরূপে সংরক্ষিত হইত। গ্রথিত পত্র সমষ্টিরূপ গ্রন্থখানিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য উহার উপরে ও নীচে দুইখানি পাতলা কাঠের পাটী wooden board সংযোজিত হইত। গ্রন্থবিলাসী সুধীগণ কখনও কখনও ঐ পাটার পৃষ্ঠে নানা বর্ণের চিত্রাঙ্কন করিয়া লিপি বিস্তার সহিত চিত্রবিস্তার যুগপৎ অনুশীলন ও উৎকর্ষের পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইতেন না। আজ কালকার পুস্তকের সুচিত্রিত মলাট যেমন পাঠক পাঠিকার চিত্তাকর্ষণ করে, পূর্ব্বকালের কাঠের পাটার পুথির মলাটও বোধহয় সেই উদ্দেশ্যে সুচিত্রিত করা হইত। এই গ্রন্থন কার্য্য Act of knotting হইতেই 'গ্রন্থ' নামের উৎপত্তি। ইহার দ্বিতীয় স্তরে তুলট কাগজের প্রচলনে গ্রন্থের নাম পুঁথি। তৎপর তৃতীয় স্তরে কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের কৃপায় প্রাচীন 'টোল'এর আধুনিক 'কলেজ'এ পরিণতির ন্যায় সাবেক কালের 'গ্রন্থ' নব কলেবর ধারণ করিয়া অধুনা 'পুস্তক' নামে পরিচিত হইলেন। পুস্তকালয় সংক্রান্ত সূক্ষ্ম শব্দ বিজ্ঞানের সমর্থক প্রাচীন প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। আমরা স্মৃতি শাস্ত্রে

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ গ্রন্থিভ্যো ধারিনো বরাঃ"॥

এই প্রমাণ দেখিতে পাই। উহার অর্থ

"মূর্খ লোক হইতে যিনি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তিনি প্রশংসার্হ আবার যিনি কেবল গ্রন্থ সংগ্রহই করেন, সংগৃহীত গ্রন্থ পাঠ করিয়া উহা হইতে জ্ঞানার্জ্জন করেন না, তাঁহার অপেক্ষায় যিনি গ্রন্থের তাৎপর্য্যবেত্তা তিনিই শ্রেষ্ঠ" চলিত কথায় উদ্ধৃত প্রমাণটীর "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ" এইরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে। গ্রন্থ সংগ্রহ বা Library যে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানার্জ্জনের সুদৃঢ় সোপান এই সনাতন প্রবাদ বাক্যটীও তাহার অকাট্য প্রমাণ। সুপ্রাচীন শব্দানুশাসন গ্রন্থ পাণিনির অনুসরণ করিলে গ্রন্থ রক্ষা কার্য্য ন্যূনান তিন-সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। "খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন স্যাং ভারতের প্রাচীন বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিহারে বহুলক্ষ পুঁথি সংগৃহীত দেখিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ প্রতি গমন কালে অশ্ব ও গজ পৃষ্ঠে চাপাইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ও পরে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এদেশের বহু পুঁথি চীন রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। এখনও চীন ও জাপানের অনেক পুরাতন মঠে উহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।" বিশ্ব কোষ। আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর সুবিক্রত মৃচ্ছকটিক নামক সংস্কৃত নাটকের চতুর্থ অঙ্কে নায়িকা বসন্ত সেনার সুরম্য অষ্ট প্রকোষ্ঠ হর্ম্মের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, তথায় সম্ভ্রান্ত অভিজাত-বর্গের উপবেশনার্থ হস্তি-দন্ত নির্ম্মিত রত্নখচিত বহুমূল্য আসনসকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। উহার একপার্শ্বে "অর্দ্ধ কচিতং পাশক পীঠে তিষ্ঠতি পুস্তকং" অর্থাৎ টেবিলের উপর অর্দ্ধ পঠিত পুস্তক খোলা রহিয়াছে। ঐ শতাব্দীতে প্রণীত বলিয়া অনুমিত ভট্টি নামক মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকের "শ্রুতান্বিত" পদটীর ব্যাখ্যায় টিকাকার "শ্রুতানি বেদাদীনি, তৈরন্বিতঃ সমৃদ্ধঃ। গ্রন্থতঃ অর্থ-তশ্চ গৃহীত স্যাৎ" এইরূপ লিখিয়াছেন। এখানেও বিবিধ বিদ্যাবিৎ মহারাজ দশরথের গ্রন্থ সংগ্রহের আভাস পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকের পুস্তক পাঠ বিবরণ হইতেও বৃহৎ পুস্তকালয় না হউক, ঐ প্রমোদ প্রকোষ্ঠে একটী ছোট খাট পাঠ কক্ষের (Reading room) নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে পঞ্চ খৃষ্টাব্দে "পঞ্চতন্ত্র" "হিতোপদেশ" প্রভৃতি আখ্যান গ্রন্থ সকলে যে বহুবিধ গ্রন্থের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠে অনায়াসে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ উক্ত প্রকার গ্রন্থে আমরা মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা, পুরাণ, চাণক্য নীতি, শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতি প্রভৃতি গ্রন্থের ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাই। পৃষ্ঠ পোষক রাজার রাজধানীতে ঐ সকল গ্রন্থ বা

থাকিলে এবং সঙ্কলয়িতা পণ্ডিত মহাশয় উহা দেখিতে না পাইলে ঐ প্রকৃতির সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচার দেশের, জাতির ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। শিক্ষাহীন দেশ অজ্ঞান ও অন্ধকারে সমাহত। অজ্ঞানতা দারিদ্র ও কুসংস্কারের অঙ্কুরোন্মুখ বীজ। দারিদ্র ও অভাবে লোকের স্বভাব নাশ ঘটে। স্বভাব বিকৃত হইলে চরিত্র হানী হয়। অসচ্চরিত্রতা সর্ব্বপ্রকার রোগের কীটাণু। রোগ মৃত্যুর অনারিত দ্বার। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে, শিক্ষার অভাবই জাতির সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। তথাকথিত শিক্ষিত ভারতবাসী আমরা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আজ ভারত সন্তান উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগের অভাবে ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুএঞ্জা, বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি বহুবিধ সংক্রামক মহামারিতে জীবন্মৃত। উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, শরীরে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, আত্মায় শান্তি নাই। এত বড় একটা অতি পুরাতন জাতি ভাগ্যবিধাতার দুরন্ত অভিশাপে যেন বুভুক্ষু মানবের ক্ষুধা শান্তির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা যেন দাবাগ্নি দগ্ধ মহারণ্যের শাখাপল্লবহীন জীর্ণ বৃক্ষ। সোনার ভারত আজ যেন একটা বিরাট কুরুক্ষেত্রের দিগন্ত বিস্তারী মহা শ্মশান। এই দুর্দ্দশার নিদানের অন্বেষণ করিলে শিক্ষার অভাবই প্রথমতঃ আমাদের চক্ষে পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষালয়ে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, উহা দেশের অভাব মোচনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ঐ বিদ্যালয় কৃষিজীবী ভারতবাসী আমাদের কৃষি শিক্ষার সহায়তা করে না। অন্যান্য দেশের মত ধনাগমের প্রশস্ত পথ শিল্প বাণিজ্যের অভ্যুদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয় না। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান গুণ একতার উন্মেষ সাধন করিয়া শিক্ষিতগণের হৃদয়ে সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যশক্তির ও সর্ব্বজনীন সহানুভূতির অবাধ স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে না। এ অন্তঃসার শূন্য শিক্ষার স্রোত রুদ্ধ করিয়া দিয়া দেশ মধ্যে সুশিক্ষার বিমল প্রবাহ প্রবাহিত করিতে হইবে। সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন এই কার্য্যের শক্তিশালী সহায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা লাইব্রেরীর শিক্ষা বহুগুণে কল্যাণকর। ইহাতে কেবল আমাদের পরিমিত বিদ্যা পল্লব গ্রাহীর উপদিষ্ট অভ্যস্ত বিদ্যা গলাধঃকরণ করিয়া অহরহ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে হয় না। লাইব্রেরী স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক জ্ঞান গবেষণার সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষকে কেবল কূপ মণ্ডূক করিয়া তোলে। লাইব্রেরীর শিক্ষায় মানবের হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমের ক্ষীর সাগরে পরিণত হইয়া উঠে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট সময়, নির্দ্দিষ্ট বয়স, নির্দ্দিষ্ট বিষয় ও নানাবিধ আইন কানুনের অধীন। কিন্তু লাইব্রেরীর শিক্ষা মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক ঐ সকল বাধা বিঘ্ন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা "ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই। ভয়ে ভয়ে সদা, পুঁথি আওড়াই।" এইরূপ সরস্বতীর বিশ্ববিদ্যা মন্দিরের প্রকৃত বিদ্যালাভের পরিবর্ত্তে বিকট অবিদ্যার আরাধনা করিয়া পরিশেষে আপ্‌শোষের তপ্তশ্বাসে নিরন্তর দহ্যমান হই। অপর পক্ষে বিদ্যামূর্ত্তি লাইব্রেরীতে, "হেঁসে খেলে যাই, প্রাণ খুলে চাই। মনের আনন্দে মেতে, পুঁথি আওড়াই।" এইভাবে শিক্ষার কার্য্য যেন একটা সাধারণ পর্ব্বোৎসবের সুখ সম্ভোগের সহিত নির্ব্বাহ হইতে থাকে। জগতের উষাকালে অশেষ শাস্ত্রবিৎ এক এক জন আচার্য্য চলন্ত লাইব্রেরীর মত (Walking Library) দেশ দেশান্তরে যাইয়া জনমণ্ডলীর শিক্ষা বিধান করিতেন। তৎপরে ঐ আর্য যুগেই গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থ সংগ্রহ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য বিষয় পাবলিক্ লাইব্রেরীর সূত্রপাত হয়। অনন্তর লোকহিত ব্রত বৌদ্ধ নৃপতিদের যত্নে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে উহার সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত নালন্দা বিহার বিশ্ববিদ্যালয় ইহার জীবন্ত সাক্ষী। তৎপরে মুসলমান রাজত্বের আমলে ঐ পাকা ভিত্তের উপর স্থায়ী অট্টালিকা

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাটনা নগরী ও অন্যান্য মুসলমান্ প্রধান স্থানে সুবৃহৎ খোদাবক্স লাইব্রেরীর ন্যায় অনেক পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে বিধাতার ইচ্ছায় ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আমলে, পূর্ব্বতন উদার চরিত, জ্ঞান পিপাসু প্রজাবৎসল ইংরাজ রাজ পুরুষগণের চেষ্টায়, বিভাগীয় রাজধানীতে কলিকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, এসিয়াটিক সোসাইটির ন্যায় সমুন্নত ও পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব নির্ম্মিত মহতী অট্টালিকা সুশোভিত অলঙ্কৃত করিয়াছে। ইহার ফলে পরবর্ত্তী-কালে আমরা রামমোহন লাইব্রেরী, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, মাইকেল লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী প্রভৃতি কতিপয় দেশ হিতকর মহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছি। দেশের বিশাল প্রজা মণ্ডলীর পক্ষে এই কয়টী অঙ্গুলি মেয় লাইব্রেরী কিছুই নহে। উহা আজন্ম তৃষিত লক্ষ লোকের নিকট একটী মাত্র সজল কলসী। ভারতের প্রতি পরিবারে না হউক অন্ততঃ প্রতি পল্লিতে একটী করিয়া পাবলিক লাইব্রেরী যাহাতে স্থাপিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারত-বাসীর যথাসাধ্য যত্ন করা উচিত। এক্ষণে সাধারণ পুস্তকাগারের প্রকৃতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য। বৃহৎনগর কিংবা সহরের বিভিন্ন অংশও প্রতি পল্লিগ্রামের কেন্দ্রস্থলে এইরূপ লাইব্রেরী স্থাপিত হইবে। লাইব্রেরী গৃহের চতুষ্পার্শে উন্মুক্ত ভূমি রাখা উচিত। লাইব্রেরী গৃহসংলগ্ন একটী ব্যায়ামশালা থাকিবে। উদ্যান মধ্যস্থ গৃহে লাইব্রেরী রক্ষিত হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। কারণ লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য কেবল বই পড়া বা বইয়ের কথা মুখস্থ করিয়া অসার বাক্যবাগীশ হওয়া নহে। পাঠকের মনে মনন্ শক্তির উন্মেষ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বিচার শক্তির সূক্ষ্মতা, প্রতিভার উৎকর্ষ, নৈতিক বলবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সম্পৎ লাভ ও পরহিতৈষনা বৃত্তির উদ্দীপনা করাই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য হওয়া বিধেয়। পাঠকবর্গের সম্মতিক্রমে লাইব্রেরীর জন্য নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট কতগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। বিনাব্যয়ে পাঠের ব্যবস্থাই উত্তম। অসম্ভব পক্ষে যথা সম্ভব অল্প বার্ষিক বা মাসিক চাঁদা ধার্য্য কর্ত্তব্য। অক্ষম ও দরিদ্র পাঠকদিগকে বিনা চাঁদায় পড়িতে দেওয়া উচিত। পুস্তকের আদান প্রদান, তত্ত্বাবধান ও আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার জন্য একজন গ্রন্থরক্ষক Librarianএর প্রয়োজন তিনি অবৈতনিক হইলে খুবই ভাল হয়। বেতনভোগী হইলে যত কমে পাওয়া যায় ততই ভাল। শিক্ষানুরাগী ও জনকল্যান-কামী ব্যক্তিকেই Librarian করা উচিত। মধ্যে মধ্যে তৎকৃত কার্য্যের আলোচনা ও লাইব্রেরীর উৎকর্ষ সাধনের উপায় উদ্ভাবনার্থ একটী পরামর্শ সমিতির গঠন প্রয়োজনীয়। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের সাধ্যমত চাঁদা, ধনাঢ্যবর্গের এককালীন দান, পাঠকগণের নিয়মিত চাঁদাই উহার ব্যয় নির্ব্বাহের প্রধান পন্থা। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্মকার্য্যে গৃহস্থের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান সংগ্রহ করিয়া লাইব্রেরীর ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে হইবে। লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ থাকা উচিত। যতদিন উহা না হয় ততদিন সরকারী বিদ্যালয়, গ্রাম্যদেব দেবীর-মণ্ডপ, কিংবা স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ধনী-গৃহস্থের বৈঠকখানার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উহার স্থান নির্দ্দেশ বিধেয়। ইহাতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই পাঠের অধিকারী হইবেন। ছোট বড়, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিতের অবাধ মেলামেশার ফল ও পরস্পর সহানুভূতির উদ্রেক, জ্ঞান ও ভাবের পরস্পর বিনিময় এইগুলি লাইব্রেরীর বিশেষ গুণ। প্রতি বর্ষে ইহার সাধারণ উৎসব বিখ্যাত মনীষীর উপদেশ, সাময়িক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কথকতা প্রভৃতি ইহার অঙ্গ পুষ্টি ও উপকারিতার পরিপোষক। ক্রয়, গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের নিকট প্রার্থনা এই বিবিধ উপায়েই গ্রন্থসংগ্রহ করিতে হইবে। পুস্তকাগার নাম হইলেও ইহাকে সুসজ্জিত ও পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ইহাতে

সংবাদ পত্র, চিত্র, ধাতবী, দারবী ও পাষাণময়ী মূর্ত্তি, স্বদেশের ও বিদেশের মানচিত্র সকল সুরক্ষিত হইবে। জাতিধর্ম্ম অভেদে পুস্তক যথা।—ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দোগ্রন্থ, শব্দবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, নাটক, দর্শন, পুরাণ, বৈদ্যশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমন কাহিনী, কুলশাস্ত্র, সর্ব্বজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজনীতি, কথাগ্রন্থ, উপাখ্যান গ্রন্থ, শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস, রমন্যাস, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মূলগ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, স্তম্ভলিপি, শিলালিপি, তাম্রফলক প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার উপকরণই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এক একটী পাবলিক লাইব্রেরী যখন বর্ত্তমান অশিক্ষিত জড়বৎ নিষ্পন্দ দুর্ব্বল সপ্তকোটি ভারত সন্তানকে সুশিক্ষার স্বর্ণোজ্জ্বল সুবর্ণবর্ম্মে ভূষিত করিবে, তখন শীতসঙ্কুচিতশ্রী জীর্ণ প্রকৃতির বসন্তাগমে নব লাবণ্য সুষমা সঞ্চারের ন্যায় দেশের দৈন্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন আবার আমরা শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যার সম সুশিক্ষিত দ্রোনাচার্য্যের ন্যায় আদর্শ ব্রাহ্মণ, রাজ্যরক্ষণ ও তপশ্চারণে তুল্য ব্যুৎপন্ন-জনক বিশ্বামিত্রের মত আদর্শ ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতিতে অনুরূপ দক্ষতাসম্পন্ন মহামতি বিদুরের ন্যায় আদর্শ বৈশ্য, ধনুর্ব্বিদ্যা ও আত্মবিদ্যার সমরূপ পারদর্শী ধর্ম্মব্যাধের মত আদর্শ শূদ্রের শুভ আবির্ভাবে দীনাভারত মাতার ম্লান বদনে সৌভাগ্য হাস্যের অমলচ্ছটা দর্শনে দেশবাসীর চিরবাঞ্ছিত স্বরাজ্যলাভের মহেন্দ্রক্ষণ অদূরাগত বুঝিয়া অপার আনন্দ-পারাবারে সুখে অবগাহন করিতে থাকিব।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

জন্মান্তর রহস্য।

(রাজা সীতারাম রায়)

শীতকাল।—রাজা সীতারাম দরবারে বসিয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন—সভা রাজকর্ম্মচারী ও দেশ বিদেশের সাধু, পণ্ডিত ও অর্থী প্রার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি পাকা কাঠালের সৌরভ পাইতেছেন—রাজা জিজ্ঞাসু নেত্রে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন কিন্তু সভার কোন স্থানেই কাঠাল দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সুপক্ক কাঠাল খাইলে লোকে যেমন তৃপ্তি বোধ করে তিনি সেইরূপ সুখকর তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন—তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া দরবারস্থ জনগণের মধ্যে কেহ পাকা কাঠালের গন্ধ পাইতেছেন কি না বা কাঠাল খাইলে লোকের যেরূপ তৃপ্তি বোধ হয় কেহ সেরূপ তৃপ্তি পাইতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় সকলই তাহা অস্বীকার করিলেন। রাজা তখন সভাস্থ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতবর্গ বলিলেন—'রাজন্! শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে এই বলিতে পারি যে আপনার পূর্ব্বজন্মের পুত্র বা পৌত্র তাহাদের পিতা বা পিতামহের উদ্দেশ্যে যে বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সুপক্ক কাঠাল উৎসর্গ করিয়াছে তাহার ফলেই আপনি এইরূপ তৃপ্তি বোধ করিতেছেন।' সীতারাম পণ্ডিত-বর্গের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া দরবারের জ্যোতির্ব্বিদগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্রের কথা বলিলেন, এখন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া গণনা দ্বারা আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম, তাহা বলিয়া দিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।"

রাজার কথা শুনিয়া প্রাচীনতম জ্যোতির্ব্বিদ বলিলেন—'রাজন্! আপনার এ কৌতূহল দমন করাই ভাল ছিল, কারণ গণনায় যদি আপনি রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন বলিয়া অবধারিত হয় তবে আপনি সুখী হইবেন কিন্তু যদি নীচ বা দারিদ্রবংশের বলিয়া জানা যায় তবে আপনি সভার মধ্যে লজ্জা পাইবেন, হয় ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমার অনিষ্ট করিবেন—সুতরাং আপনি বিরত হউন।'

সীতারাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'ঠাকুর আপনার কোন ভয় নাই, আমি পূর্ব্ব জন্মে যত নীচ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি না কেন, তাহা জানিতে পারিলে আমি লজ্জিত বা দুঃখিত হইব না বরং সুখীই হইব। তবে যদি আপনার সকলের মধ্যে বলিতে দ্বিধা বোধ হয় তবে গোপনে আমাকে তাহা বলিবেন—আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি তাহাতে আপনার ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না।' জ্যোতির্ব্বিদ একদিনের সময় লইলেন—পরদিন রাজা ও তাঁহার দরবারস্থ সকলেই কৌতূহলে উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, ধীরে ধীরে জ্যোতির্ব্বিদ সভায় প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলের উৎসুক দৃষ্টি তাহার উপর ন্যস্ত—তিনি ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—'রাজন্, পূর্ব্বজন্মে আপনি পুঁড়া ছিলেন।' জ্যোতির্ব্বিদের কথা শুনিয়া দরবারের সমস্ত লোক মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন, সীতারাম বিনীতভাবে বলিলেন—"ঠাকুর আর একটু কষ্ট করিয়া গণিয়া বলুন যে পূর্ব্বজন্মে আমার বাড়ী কোথায় ছিল, সে জন্মের পুত্র পৌত্র কে কোথায় আছে এবং কোন্ সুকৃত বলেই বা আমি পুঁড়া হইতে এ জন্মে রাজপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয় দুইদিনের সময় লইলেন। তৃতীয় দিবসে দরবারে আসিয়া তাঁহার গণনার ফল ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—'আপনার রাজধানী হইতে ঈশান কোণ অমুক গ্রামে আপনার পূর্ব্বজন্মের বাসস্থান ছিল—সে জন্মের আপনার এক পুত্র আছে সে জন্মে আপনার ফুটি ও তরমুজের ক্ষেত ছিল। ফসল রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্রে এক সামান্য পর্ণকুটীর বাঁধিয়া আপনি দিনরাত্রি সেখানে বাস করিতেন। একবার জ্যৈষ্ঠমাসের কাঠফাটা রৌদ্রে তৃতীয় প্রহরে অনেক শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণ পথিক আপনার গৃহের নিকট আসিয়া কাতর ও ত্রস্তকণ্ঠে বলিলেন—'এখানে কে আছ, জলদানে তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা কর।' আপনি তখন দ্রুত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন—'ঠাকুর আপনি কি পুঁড়ার বামন? 'না বাবা।' 'তবে আমি পুঁড়া হইয়া কি করিয়া আপনাকে জল দিব।' 'বাবা তুমি যে জাতীয়ই হও, জল দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর—পরে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব।' পথিকের কথা শুনিয়া আপনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'ঠাকুর আপনার পিপাসা নিবারণ করিলেই ত হইল? 'হ্যাঁ বাবা' 'তবে আমার সঙ্গে আসুন' এই বলিয়া আপনি তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনার ঘরের ছায়ায় বসাইলেন। এবং একটী বৃহৎ সুপক্ক তরমুজ ও একখানি দা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন'ঠাকুর সেবা করুণ'—ক্ষুৎপীড়িত, পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক ব্রাহ্মণ অতি আগ্রহে পরম পরিতোষ সহকারে সে তরমুজ পানাহার করিয়া যেন নবজীবন পাইলেন—আর তখনই দুই হাত তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—'বাবা, তুই রাজা হ' তাই এ জন্মে আপনি রাজপদের অধিকারী। রাজন! মানুষ প্রাণের অন্তস্তল হইতে যে আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাৎ করে তাহা ফলিবেই—ইহা স্থির জানিয়া রাখুন। জ্যোতির্ব্বিদের কথা শুনিয়া ও পিপাসার্ত্তকে পানীয় দানের ফলের কথা ভাবিয়া রাজা অবাক্ হইলেন, আর তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন আমার শক্তি, সামর্থ্য ও অর্থ জল দান কার্য্যেই ব্যয় করিব। তাই আজ দেশ ভরিয়া সীতারামের দীঘি—তাই দেশের লোক এখনও পিপাসায় সীতারামের

জলাশয়ের সুপেয় জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিতেছে।

এদিকে জ্যোতির্ব্বিদের নির্দ্দিষ্ট গ্রামের পুড়াকে আনিবার জন্য রাজ পদাতিক প্রেরিত হইল—সীতারাম ডাকিয়াছেন শুনিয়া পুড়ানন্দন কাঁপিতে কাঁপিতে রাজ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহার ভীত অসহায় ভাব দেখিয়া সীতারাম ধীরভাবে বলিলেন—তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি ধীরভাবে তাহার উত্তর দাও। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য তোমার পিতা কতদিন হইল মারা গিয়াছেন? তুমি কি তাহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাক—এবার কোন্ দিন শ্রাদ্ধ করিয়াছ? শ্রাদ্ধে কি কি জিনিষ উৎসর্গ করিয়াছিলে? উত্তরে পুড়াপুত্র অতি বিনীত ভাবে পিতার নাম ও মৃত্যু তারিখ বলিয়া বলিতে লাগিল—'মহারাজ! পিতার শ্রাদ্ধ আমি প্রতি বৎসরই করিয়া থাকি, এ বৎসরও ৫ দিন পূর্ব্বে করিয়াছি—আমরা সামান্য গৃহস্থ যাহা সংগ্রহ হয় তাহাই উৎসর্গ করিয়া দেই, এবার শ্রাদ্ধের 'সঙ্গে' বাড়ীর গাছের পাকা কাঁঠাল দিয়াছিলাম। এই গাছটী আমার পিতার স্বহস্তে রোপিত। যখনই কাঁঠাল পাকিত তখনই আমার পিতাকে মনে পড়িত, বড় দুঃখ হইত—বাবা তাঁহার হাতের রোয়া গাছের কাঁঠাল খাইয়া যাইতে পারিলেন না—আমার বাবা শীতকালে মারা গিয়াছেন সুতরাং তাঁহার শ্রাদ্ধে যে কাঁঠাল উৎসর্গ করিয়া তাহার তৃপ্তি সম্পাদন করিব তাহারও সম্ভাবনা ছিল না—ভগবানের নিকট আমি নিয়ত প্রার্থনা করিতাম যেন এই গাছে শীতকালে অকাল কাঁঠাল হয় তাহা হইলে আমি পিতার শ্রাদ্ধের সময় কাঁঠাল দিতে পারিতাম—আমার কাতর প্রার্থনায় এবার ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—এবার গাছে একটী অকাল কাঁঠাল হইয়াছিল, শ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্ব্বে আমি উহা গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধের দিন উহা ভাল রকমই পাকিয়াছিল—সেই কাঁঠাল আমি এবার শ্রাদ্ধে পিতার তৃপ্ত্যর্থে উৎসর্গ করিয়া আমার চিরজীবনের আশা মিটাইয়াছি—ইহা বলিতে বলিতে পুণ্ডরীক কাঁদিয়া ফেলিল। রাজা ও দরবারের সকলে স্থির করিয়া দেখিলেন যে পুড়াপুত্র যে দিন যে ক্ষণে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছিল রাজা সেই দিনে, সেই ক্ষণেই কাঁঠালের গন্ধ ও কাঁঠাল খাওয়ার তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন —এই সামঞ্জস্যে সকলে অতি মাত্র বিস্মিত হইলেন আর হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন।

সীতারাম তাহাকে বহু নগদ টাকা কড়ি ও বিষয় সম্পত্তি দান করিয়া তাহার পাকা বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন—শুনিয়াছি তাহার বংশধরগণ এখনও নাকি সে সম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

এ কাহিনীর মূল কোথায় জানি না, তবে ইহা হইতে হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের প্রতি একটী ঐকান্তিক আস্থা এবং বাস্তব জীবনের ঘটনা বিশেষের সহিত তাহার সুসঙ্গত সামঞ্জস্য দেখাইয়া সাধারণ জনগণের মধ্যে এই অনুষ্ঠানগুলির প্রসার বৃদ্ধি করার একটা বিশিষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হয়—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

উমানন্দ ভৈরব।

১৩২৭ বাং ১৯শে কার্ত্তিক প্রাতে অনুমান ৯টার সময় আমরা কামাখ্যা পর্ব্বত হইতে রওয়ানা হইলাম। আমরা পূর্ব্বদিকের সোপান দ্বারা পর্ব্বত আরোহণ করিয়াছিলাম; প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় আমরা সেই পথে অবতরণ না করিয়া পশ্চিমদিকের পথে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এই পথ গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া গিয়াছে। পথের দৃশ্য বড় মনোরম। কামাখ্যা পর্ব্বত

নানাজাতীয় বৃক্ষ সমাকীর্ণ। আমরা প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত মূলে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আসিলাম। এই স্থানে আমাদের নৌকা ছিল। এইস্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ ও ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ব্রহ্মপুত্র প্রশস্ত বক্ষ বিস্তার করিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অপর তীরে মেঘমালার ন্যায় ঘন তরুরাজি সমাকীর্ণ পর্ব্বতমালা স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মনে হইল যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের ডালি লইয়া বসিয়া আছেন। কোমলে ভীষণে এমন মিলন, মাধুর্য্যে গাম্ভীর্য্যে এমন মিশামিশি বুঝি আর কোথাও নাই। আমরা নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। নৌকা অতি ক্ষুদ্র। খরস্রোত ব্রহ্মপুত্র নদের উপর এই নৌকা দিয়া চলিতে মনে খুব আশঙ্কা হইতে লাগিল। কি করিব ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। নৌকা কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদমূল অতিক্রম করিয়া যতই দূরে যাইতে লাগিল ততই কামাখ্যা পর্ব্বতের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। কামাখ্যা পর্ব্বতের উপরে থাকিয়াই এক প্রকার শোভা আবার নৌকা হইতে আর এক প্রকার শোভা নয়নগোচর হয়। না দেখিলে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না।

ব্রহ্মপুত্র নদ উজাইয়া আমরা গৌহাটী সহরাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল স্রোতের প্রতিকূলে চলিয়া আমরা ৺ উমানন্দ শৈলের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম।

উমানন্দ শৈল ব্রহ্মপুত্রের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা গৌহাটী সহরের মধ্যভাগ সমসূত্র নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে।

উমানন্দ শৈলের দক্ষিণ বা পূর্ব্ব দিকে (ঠিক বলিতে পারিব না কারণ এই স্থানে আমার দিক ভ্রম হইয়াছে) ব্রহ্মপুত্রগর্ভে আরও দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল। একে ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত অতি খরতর ও ভীষণ তাহাতে তিনটী শৈলে প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মপুত্র ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে। এইস্থানে জলে এমন আবর্ত্ত ও স্রোত এত ভীষণ যে নৌকা পরিচালন করা বিশেষ বিপজ্জনক। বর্ষার সময় স্রোতের বেগ এত তীব্র হয় যে সময় সময় নৌকা জলমগ্ন হয়। আমাদের ক্ষুদ্র—তরণী ভীষণ আবর্ত্ত ভেদ করিয়া যখন চলিতে লাগিল তখন এক এক সময় প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল এবং আবার প্রাণের ভিতর কেমন একটী অননুভূত আনন্দের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাদের নৌকা উমানন্দ শৈলের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম আমাদের পূর্ব্বে আরও ২ খানা নৌকা আসিয়াছে। আমাদের পরেও নৌকা আসিল। আমরা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলাম। ঘাটে ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, তিনি উর্ব্বশীকুণ্ডে স্নানের মন্ত্র পাঠ করাইলেন। উর্ব্বশীকুণ্ড এখন অদৃশ্য, ইহা ব্রহ্মপুত্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। আমরা স্নান করিয়া শৈল আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী দ্বারা শৈল আরোহণ করিতে হয়। ঘাটের নিকটস্থ সোপানাবলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই স্থানে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডসমূহ দর্শকের হৃদয়ে ভীতি ও বিস্ময়ের ভাব উৎপাদন করত পড়িয়া আছে। আমরা প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করিয়া সোপানাবলীর সাহায্যে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। উর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি—প্রাণবিমোহন গম্ভীর দৃশ্য। সম্মুখে তীব্রগামী বিশালবক্ষ ব্রহ্মপুত্র। দুই পার্শ্বে সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী। কোন কোন স্থানে হরিতকী ও আমলকী বৃক্ষ ফলভারে অবনত হইয়া আছে। শরতের নির্ম্মল আকাশ। মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে। আমরা পর্ব্বতারোহণ

করিয়া ক্রমে মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম চারিদিকে নানা জাতীয় বৃক্ষরাজি। প্রাঙ্গনের প্রাচীরের উপরিভাগে কয়েকটী উলুক জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ বৃহল্লাঙ্গুল বিশিষ্ট বানর দেখিতে পাইলাম। আমরা ইহাদের আহারের জন্য কয়েকটী কদলী ফল প্রদান করিলাম। ইহারা সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিল।

আমরা অতঃপর উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের বারান্দায় ব্রাহ্মণগণ খাতা লইয়া বসিয়া আছেন। বারান্দা পার হইয়া একটী বৃহৎ কক্ষ (Hall)। তাহার মধ্যভাগে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ। আমরা বিগ্রহ দর্শনান্তে সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে উপস্থিত হইলাম। ইহার ডানদিকে ভোগ গৃহ। কুঠরী অতিক্রম করিয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া ৺ উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরে উপনীত হইলাম। মন্দিরটী ক্ষুদ্র। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার। উজ্জ্বল দীপালোকে আমরা ৺ উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিলাম। সুন্দর বিগ্রহ। পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের মূর্ত্তি। মহাদেবের মূর্ত্তির সন্নিকটে অষ্টভুজা কি দশভুজা দেবী সমন্বিত হরের আর একটী রমণীয় বিগ্রহ। পূজক ব্রাহ্মণ ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া পূজোপকরণ সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতেছেন। ব্রাহ্মণটী প্রত্যেক যাত্রীকে মন্ত্র পড়াইয়া অঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ করাইলেন। ব্রাহ্মণ বেশ শুদ্ধ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ব্রাহ্মণের পূজা দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম।

৺ উমানন্দ ভৈরব দর্শনান্তে আমরা বাহিরে আসিলাম। বারান্দায় যে ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট আছেন তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক যাত্রীকেই ৵১০ আনা করিয়া দিতে হয়। তাহারা জমা করিয়া রসীদ দেন। কামাখ্যা আসিয়া পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণদের ব্যবহারে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। কামাখ্যা তীর্থের পাণ্ডাগণের সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য সর্ব্বজন বিদিত। আমরা কামাখ্যা পাহাড়ে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাণ্ডার বাড়ীতে ছিলাম। ইঁহার সদ্ব্যবহার যত্ন ও সৌজন্যের কথা সর্ব্বদা মনে থাকিবে। ইঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণের নিকট আমরা মাতৃসদৃশ স্নেহ মমতা ও যত্ন পাইয়াছি। ৺ উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরস্থ ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারও বেশ সন্তোষ জনক।

৺ উমানন্দ ভৈরব দর্শনান্তে আমরা অনতিদূরে আরও দুইটী মন্দির দর্শন করিলাম। সেখানেও শিবলিঙ্গ আছেন। শিবলিঙ্গের নাম ঠিক মনে পড়িতেছে না। সম্ভবতঃ মুক্তিনাথ ও কেদারনাথ।

উমানন্দ শৈল কালিকাপুরাণে ভস্মকূট নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের অপর নাম লৌহিত্য। উমানন্দ-শৈল ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যভাগে নদগর্ভে অবস্থিত। কালিকাপুরাণে কথিত আছে :—

"তস্মিন্ তীর্থবরে দেবি পূর্ব্বস্যাং ক্ষেত্রবর্ত্মনঃ
লৌহিত্যস্য তথা মধ্যে স্থিতঃ শৈলোবরাননে
তত্রাস্তি ভগবান্ শম্ভু রুমানন্দকরঃ প্রভুঃ॥"

পর্ব্বতারোহণের নিয়ম যথা—

"পূর্ব্বাশাভিমুখেনৈব আরোহেৎ ভস্মকূটকম্।
বক্ষ্যমানেন মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভস্মকূটকে প্রণাম করিতে হয়।

"বৃষাচল নমস্তেঽস্তু ধর্ম্মমার্গ ত্রিপিষ্টপ।
আরোহয়াম শিখরং ভস্মকূট নমোঽস্তুতে॥"

উমানন্দের প্রণাম মন্ত্র এই—

"ধর্ম্মকামার্থমোক্ষায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
নমস্ত্রিশূলহস্তায় উমানন্দায় বৈ নমঃ।
প্রসীদ পার্ব্বতীনাথ উমানন্দ নমোঽস্তুতে॥"

দর্শনমন্ত্র যথা—

"দেব দেব মহাদেব শশাঙ্ক শেখর।
তব দর্শনমাত্রেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করত উমানন্দ স্পর্শ করিতে হয়।

"জন্মকোটি সহস্রাণি কল্পকোটি শতানিচ।
উমেশস্পর্শনাৎ সদ্যঃ পাপংযাতু ক্ষয়ংমম॥"

জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানেনাজ্ঞানতঃ কৃতম্।
তম্মে নশ্যতু গৌরীশ স্পর্শনাদ বৃষভধ্বজ ॥
শিবলিঙ্গং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
যঃ স্পৃশেদপি পাণিভ্যাং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥"

আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণ পূর্ব্বে উমানন্দ ভৈরব দর্শন করতঃ পরে কামাখ্যা দর্শন করিয়া থাকেন। উমানন্দ ভৈরবের অনুমতি গ্রহণ করত কামাখ্যা দর্শন করিতে হয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতে, হয়।

"উমানন্দ নমস্তেহস্ত পার্ব্বতীপ্রীতি বর্দ্ধন।
নির্ব্বিঘ্না যাতুমে সিদ্ধির্যাৎ পূজা কৃতাতমে।
জগন্নাথ প্রসাদেন শ্রীমৎকামেশ্বরী শিবাং।
অর্চ্চয়ামস্ত দেবেশ আজ্ঞয়া পরমেশ্বর ॥"

আমরা উমানন্দ শৈল দর্শনান্তে গৌহাটী সহরে গমন করিলাম।

গৌহাটী সহর দেখিতে অতি সুন্দর। একধারে পর্ব্বত ও নদের এমন সমাবেশ বিরল। গৌহাটীতে উগ্রতারাদেবী নবগ্রহ শুক্রেশ্বর মহাদেব ও জনার্দ্দনের দর্শনীয় তারাপীঠ ও নবগ্রহ অতি প্রাচীন।

গৌহাটীতে একটী উচ্চশ্রেণীর কলেজ আছে। গৌহাটীতে কয়েকটী বাজার আছে। একটী বাজার অতি বৃহৎ ও সুন্দর। গৌহাটীতে কাঁসার থালা প্রসিদ্ধ। কাঁস পিতলের নানাপ্রকার জিনিস এইস্থানে পাওয়া যায়। এইস্থানে কার্ত্তিকমাসেই বিস্তর কমলালেবু দেখিতে পাইলাম। গৌহাটীতে বিস্তর মাছ পাওয়া যায়। এখানকার মহাশৈল ও চিতল মাছ প্রসিদ্ধ। এত বড় চিতল ও মহাশৈল অন্যত্র দুর্লভ। হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে বিস্তর মহাশৈল আছে কিন্তু সেখানে কেহ মৎস্য হিংসা করে না। গৌহাটী হইতে মাছ নানাস্থানে রপ্তানী হয়।

গৌহাটী হইতে মটরগাড়ীতে শিলং যাওয়া যায়। গৌহাটী হইতে শিলং এর রাস্তা অতি সুন্দর। গৌহাটীর কয়েকটী রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খুব সুন্দর।

গৌহাটীর প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর। কথিত আছে যে ব্রহ্মা এইস্থানে থাকিয়া প্রথম নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার নাম প্রাগজ্যোতিষপুর হইয়াছে।

"অত্র মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্নক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
ততঃ প্রাগজ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা ॥"
কালিকাপুরাণ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন।

আঁখির ভাষা।

দূরে রাস্তায় এক গাড়োয়ান গাইতেছে—
"পাগল করেছে মোরে
আঁখিতে প্রাণ তোমারই"

দূরবিশ্রুত সে সঙ্গীতের অস্পষ্ট স্বর হঠাৎ কানে বাজিল—মনে প্রশ্ন এলো—আঁখিতে প্রাণ পাগল করেছে? এ কি রকম? না জানি সে আঁখিই কেমন আর সে প্রাণই কেমন! সামান্য একটা গাড়োয়ানকে আঁখিতে পাগল করেছে এও বড় বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পৃথিবীতে সে শুধু একাই কি আঁখিতে পাগল? বহুদিন হ'লো একটি গান শুনেছিলাম—

"চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইব না?
আঁখি যে দিয়েছে বিধি হেরবো বলে নিরবধি
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি তার
তাও কি পাব না?
নয়ন ভোরে দেখ্‌বো তারে
কারও কথা শুন্‌বো না।

এ মুখইবা কেমন ছিল—যার আঁখিতে পাগল করে—যা' দেখতে ভাল লাগে—অথচ যেন দেখতে দিবে না বলে মনের শত অভিমান জাগাইয়া তোলে—বলিতে পারি না—হয়ত কোন সুদূর অতীতে সে গাড়োয়ান তার

"পেখল পিয়া মুখ চন্দা"

তবু আজ কেন তাঁর মোটবোঝাই গাড়ীর অবিশ্রান্ত গতির মধ্যেও থেকে থেকে সে 'পাগল করা' আঁখির কথা মনে আসিতেছে? মুখ ত সে পৃথিবীতে অহরহ অনেক দেখিতেছে—চোখের সংখ্যারও তার কাছে অভাব নাই। কিন্তু সেই একটী 'চাহনী' তার কাছে কেমন "আকুল পাগল পারা" ছিল যে সে ভুলিয়াও ভুলিতে পারিতেছে না? হয়ত যে গান সে এখন গাহিয়া যাইতেছে তার অর্থ কিছু সে বোঝে না, হয়ত তার দৃষ্টি শুধু "পড়ে থাকা" 'চেয়ে থাকা' পথের দিকে বাধা বিঘ্ন লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু এমনই সময়ে কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও তার গাড়ী তাড়ান জীবনে কি মনের আবেগে গানের কথাগুলি বলিতেছে? হয়ত কোন সুদূর অতীতে কোন সময় সে চাহনীর ভঙ্গিমা দেখে মনে মনে নিরুত্তর প্রশ্ন করেছে—

"সে কেন আমার পানে ফিরে ফিরে চেয়ে গেল?"

হয়ত আবার "চকিতে" সে হাসি সে চাহনী কেমন করে তার নয়নকোণে লুকাইল তা ভাবিতে সে বিভোর হয়েছিল—কিন্তু এতদিন পর 'আঁখিতে পাগল করেছে' বলে কার উদ্দেশ্যে সে গেয়ে যাচ্ছে? তার জ্ঞানহীন নিস্পন্দ চোখে সে উদাসভাবে কার দিকে "দীননয়নে" চেয়ে আছে? কে আমাকে আজ তার "পাগল করা" আখির চাহনী ভঙ্গিমা দেখাইবে ও তাহার মহিমা বুঝাইয়া দিবে? এ সব স্বতঃ প্রণোদিত প্রশ্নেরই বা কে উত্তর দিবে? কে যেন চুপি চুপি আমাকে শুনাইতেছে শুধু কি এ টুকুই?

"জনম অবধি হাম্

সে রূপ নেহারিনু"—

(তবু) "নয়ন না তিরপিত ভেল"—

মনে পড়ে কোন একটী বিখ্যাত ছবির নীচে লেখা দেখেছিলাম—

"Eyes are the windows of the soul"

চক্ষু যেন হৃদয় মন্দিরের দরজা ও জানলা বিশেষ, হৃদয়ের সামান্য একটু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চোখে উদ্ভাসিত হয়। মনের কথা লুকাইয়া রাখিতে পারি কিন্তু ভাব চোখে ধরা পড়ে, আবার অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশ চাহনীকে বৈচিত্রময় করে তোলে। এ জটিল ভাব ও ভঙ্গিমা ভাষায় সম্পূর্ণ বর্ণনা করা যায় না কারণ ভাষা সীমাবদ্ধ, কিন্তু মনের ভাবরাজ্য যেন অনন্ত অসীম। যখন মহারথি কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে ধনুর্ব্বান হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন গর্ব্বিতা অভিমানিনী রাজকন্যা দ্রৌপদী অমনই তাচ্ছিল্যপূর্ণ নয়নে বলে উঠিলেন

"নাহং সূত পুত্রংবরিষ্যে"

হাতের ধনুর্ব্বান হাতেই রহিল উর্দ্ধদৃষ্টি কর্ণ তখন

"সামর্ষ হাসং সবিতার মৈক্ষত"

এত লোকের সম্মুখে অপমান একটা ক্ষুদ্র বালিকা তাহার সব গর্ব্ব ধূলিসাৎ করে দিল, তার শত অস্ত্রশিক্ষা শত অভিমান শুধু একটি কথাতে ম্লান হয়ে গেল এবং সে কথায় একমাত্র কারণ যিনি তাঁর দিকে "সামর্ষ হাসং" তাকাইলেন। এ দৃশ্যের চিত্রমান শুধু ক্ষীণ কল্পনাতেই আসে। আবার যখন মনে পড়ে—সেবা তৎপরা পার্ব্বতী পুষ্কর বীজমালা হাতে নিয়ে পূজা করিতে গিয়া কাম দেবের সম্মোহন বানে বিদ্ধ হয়েছিল তখন মহাদেব

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুব্ধ ধৈর্য্যঃ

চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

উমা মুখে বিম্ব ফলাধরোষ্ঠে

ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥

কিন্তু যখন আবার হঠাৎ এমন চাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে মহাদেব

"দিশামুপান্তে স সর্জ্জ দৃষ্টিং"

তখন সে "অনুপম কান্ত মধুর রূপ" দেব চাহনী মুহূর্ত্তে কি ভীষণ কি তীব্র হয়ে উঠিল—

"তারেৎ স বহ্নিঃ ক্ষণ নেত্র জন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার"

মুহূর্ত্ত মধ্যে এক প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে মহাদেব ব্রহ্মচারী বেশে তপস্যামগ্না

"ভবানীপ্রাপ্যা শিখরি দশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী"

গৌরীর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

"অমুলা মৈশ্বর্য্যা সুখং নবংবয়ঃ

তপঃ ফলং স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ"

তখন সে প্রশ্নোৎপাদক চাহনীর তুলনায় না জানি কেমন শান্ত মধুর দৃষ্টি আঁখিতে এনেছিলেন যখন সে অপরিচিত ব্রহ্মচারীকে মহাদেবের নিন্দার জন্য গালাগালি করিয়া রাগে স্খলিত বসনা আলুলায়িত কেশা গৌরী যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাদেব স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করা মাত্র

"মার্গাচল ব্যতি করা কুলিতেব সিন্ধুঃ

শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌনতস্থৌ"

সে "অনন্ত মুহূর্ত্তে" চাহনীর ভাষা কেমন প্রকাশ পেয়ে ছিল? সে দৃশ্যের কথা মনে হলে আবার মনে আসে যখন "পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে" অছিলা করে শকুন্তলা সে ব্রহ্মচারীর উপবনে রাজা দুষ্মন্তের দিকে "ফিরে ফিরে চেয়েছিল" তখন বলিতে পারি না সে চাহনী ভঙ্গিমার মধ্যে অকস্মাৎ কেমন এক পবিত্র প্রাণময় সাম্রাজ্যের আভাষ ঈষৎ উদ্ভাষিত হয়েছিল। অন্যদিকে আবার যখন মনে হয় অভিশপ্ত নল সুষুপ্তা অর্দ্ধবসন পরিহিতা দময়ন্তীর অর্দ্ধেক অঞ্চল কেটে চলে গেলেন, তখন সুপ্তোত্থিতা আশ্চর্য্যান্বিতা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া দময়ন্তীর আঁখিতে কেমন মর্ম্মন্তুদ হৃদয় বিদারকভাব হয়েছিল— কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন ব্যাধকে সতীত্ব তেজে ভস্মীভূত করিলেন তখন সে চাহনী কেমন তেজোদীপ্ত বা কঠোর হয়েছিল। যখন ক্ষুদ্ধা অভিমানিনী ভ্রমর নিজের ভালবাসার অপমান ও তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বড় গম্ভীর স্বরে গোবিন্দলালকে বলেছিল "তবে যাবে যাও ……তুমি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলে ডাকিবে……তুমি আমারই…রোহিনীর কেহ নও" তখন রোহিনীমুগ্ধ গোবিন্দলাল সে প্রেমগর্ব্ব দীপ্ত চাহনীর দিকে নিশ্চয় তাকাইতে পারে নাই। পাষাণে সূর্য্য কিরণ সংপাতের মত সে যেন তাহা শূন্যে ফিরাইয়া দিল কিন্তু বক্ষে তাহার উত্তাপ রহিয়াই গেল। সেই উত্তাপই শেষে রোহিনীকে রাসবেহারী ঘোষের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করিতে দেখিয়া চোখে হঠাৎ তীব্র বিদ্যুৎ খেলে উঠেছিল এবং তার উত্তাপের তীব্রতা স্বরের বজ্র কঠোর প্রতিধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়াই হৃত গর্ব্বা পতিতা রোহিনী "আমায় মেরো না" বলে কত কাকুতি মিনতি করেছিল কিন্তু গোবিন্দ লাল আর বক্ষে সে উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দৃঢ় তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছিল "পাপিষ্ঠা এত ভালবাসার এই পরিণাম? নাঃ—তোমার বাঁচা হবে না………তখন কার দৃষ্টিতে কতখানি প্রতিহিংসা জ্বলে উঠেছিল। তবু সে উত্তাপ গোবিন্দলালের আর ফুরাইল না—তুষের অনলের মত তাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেই লাগিল। ভ্রমরের সে ক্ষণিক তেজোময়ী চাহনী তাহাকে এতখানিই উত্তাপ দিয়েছিল যে শেষ জীবনে সন্ন্যাসী হয়েও গোবিন্দ লাল তাহা নিবাইতে পারে নাই।

আবার মনে হয় ক্রুদ্ধা প্রেমলাঞ্ছিতা আয়েষা ওসমানের হিংসা পরিপূর্ণ শ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রেমগর্ব্বস্ফীত বক্ষে তাকে বলে উঠেছিল "এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর" তখন তার চাহনী দেখে ওসমান

"মন্ত্রৌষধি রুদ্ধবীর্য্যঃ বিফল প্রযত্নঃ"

এর মত স্তব্ধ হয়েছিল। কিন্তু আবার সে একই চাহনীর মধ্যে পীড়াক্লিষ্ট চলচ্ছক্তিরহিত জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে জগৎসিংহ কি এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় অনভিব্যক্ত শান্তিরাজ্যের ক্ষীণ ছায়া দেখিতে পেয়ে ছিল। এ সব দৃষ্টি এ সব চাহনী যেন স্বর্গীয় অপার্থিব, ভাষার অযোগ্য—লেখনী অসংখ্য ভাবে বর্ণনা করেও তাহার কথঞ্চিত আভাষ দিতে পারে কি না

সন্দেহ। এ যেন কল্পনাময়ভাব রাজ্যের বিচিত্র চিত্রাবলী। যখন মাংস পরিবেশন করিতে করিতে ইন্দিরা তাহার চোরা চাহনীতে উপেন্দ্র বাবুকে দেখে নিয়েছিল, তখন সে প্রলুব্ধ সলজ্জ ব্রীড়াবনত আঁখিতে দুজনে মুহূর্ত্তে কি পরিচয় হয়েছিল? আবার যখন রসিকা সুভাষিনী ইন্দিরাকে তাহার হারাণ স্বামী'র অভিসারে যাওয়ার জন্য আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে ঝালিয়ে দিচ্ছিল তখন তাহার কেমন এক চাহনী দেখে সুভাষিনী বলে উঠেছিল "দূর হ' পাপিষ্ঠা—তুই আস্ত কেউটা সাপ তোর চাহনীতে মানুষ মরে ভূত হয়।" আবার যখন নবকুমার নিভৃতে লুৎফন্নেছার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে হঠাৎ বুঝিতে পেরেছিল, সে আর কেহ নয় তারই বিবাহিতা অপরাধা পত্নী পদ্মাবতী—তখন দুজনে বিস্ফারিত লোচনে দুজনকে কি কথা বলেছিল? সম্মুখে অগাধ সিন্ধু—তৃষ্ণায় নবকুমার আতুর অথচ সে যেন—

পিপাসিত জনে···দেখায়ে
আশাতীত বারিদানে
পিপাসার তীব্রতা বাড়াইয়ে
দেখিতে কৌতুক·········"

জল আছে অথচ পান করিতে পারে না—সে চাহনীর মধ্যে একত্রে কত আশা নিরাশা লজ্জা ভয় সুখ দুঃখ হতাশ আশ্চর্য্য প্রভৃতি বিভিন্নভাবের সমাবেশ হয়ে ছিল। অন্য এক চিত্র আবার মনে আসে—ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের কথা। মালাহস্তে সাভরনালংকৃতা রাজকুমারী ইন্দুমতী যখন সভাগৃহে প্রবেশ করিল—

"তস্মিন্ বিধানা নিশয়ে বিধাতুঃ
কন্যাবায় নেত্র শতৈকলক্ষ্যা।
নিপেতরন্তঃ করণৈঃ নরেন্দ্রাঃ
দেহৈস্থিতা কেবল মাননেষু॥"

কিন্তু দূতী যখন এক একজন কুমারের রূপ ঐশ্বর্য্য গুণ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া এক একজনকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন তখন সে ঈপ্সিত রূপ লাবণ্য—

"সমীরণোত্থেব তরঙ্গ লেখা
পদ্মান্তরং মানস রাজহংসীং।"

সকলে দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের চেহারা তখন—

"সঞ্চারিনী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরাসা।
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণ ভাবং স স ভূমি পালঃ।

আবার যখন সকলকে একে একে অতিক্রম করিয়া অজ রাজকুমারের সান্নিধ্যে এলেন তখন দূতীকে কিছু বলিতে হইল না—

"রোমাঞ্চ লক্ষেণ স গাত্রযষ্টিং
ভিত্বা নিবাত্রামদরায় ক্লেশ্যাঃ।"

ইন্দুমতীও তাকাইতে সাহস পেল না—মুহূর্ত্তে সে রাজকন্যাতো—

"উষসি সর ইব প্রফুল্ল পদ্মং
কুমুদবনে প্রতিপন্ন নিদ্রাবাসীৎ ..

কেমন শান্ত মধুরভাবে কবি বর্ণনা করেছেন—তবু যেন কল্পনাতে এ চিত্র আরও কত অব্যক্ত মধুর হয়ে ওঠে।

যখন মেরাইয়াস্ (Marius) কে বাঁচাইতে গিয়া Eponine (ইপনাইন্) পিস্তল গুলিতে আহত হয়ে পড়েছিল তখন হঠাৎ মৃত্যুর দুয়ারে এসে "দীননয়নে" Marius কে বলে ছিল "Please deposit a kiss on my cheek when I am dead"

"ক্ষীণ যবে দেহলতা পড়ে রবে ভূয়ে
চুম্বিও অধর কোণে এই শেষ আশা।"

কৃতজ্ঞ Marius এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে ছিল—এতদিনের আদরে লুক্কায়িত ভালবাসা মৃত্যুর দুয়ারে এসে Eponine না জানাইয়া থাকিতে পারিল না—মুহূর্ত্ত পরেই সে Marius থেকে দূরে অতি দূরে কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলে যাবে—তার এ অফুরন্ত বুকভরা ভালবাসার কথা—যা সে স্বর্ণাক্ষরেও তাহাকে জানিতে দেয় নাই—যার জন্য সে Marius ঘুমাইলে সে চুপে চুপে দরজার কাছে বসে সমস্ত রাত্রি আজীবন পাহারা দিয়ে এসেছে, যার জন্য সে Marius এর প্রণয়িনী

Cosette এর নিকট অম্লান বদনে অশেষ কষ্ট সহ্য করেও প্রেমলিপি নিয়ে দিয়েছে—এতটা হতাদরের মধ্যে গোপনে যে প্রেম ধীরে পল্লবিত হয়েছিল আজ তাহা না জানাইয়া পারিল না—এ জীবনে তার সাধ পূর্ণ হ'লো না—সে জানে তা' পূর্ণ হবে না তাই শুধু হৃদয়ের আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার সে ক্ষুদ্র অথচ প্রাণমনব্যাপী প্রার্থনাটুকু জানিয়ে গেল। সে চাহনী কৃতজ্ঞ Marius জীবনে ভুলিতে পেরেছিল কি না বলিতে পারি না—এই প্রসঙ্গে আর একটী দৃষ্টান্তের কথা মনে আসে, সে লম্পট নিষ্ফল জীবন মদাশক্ত Sydney Carton এর কথা। তার জীবনের মধ্যে যেটুক পবিত্রতা ও ভালবাসা ছিল তা নিয়ে যখন Dr. Minnet এর কন্যার সঙ্গে দুটি কথা বলিবে আশা করে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তখন তাহার চাহনী না জানি কেমন হয়ে ছিল। আবার যখন তাহার সব আগ্রহ ভালবাসা সে ফিরাইয়া দিল তখন কেমন উচ্ছ্বসিত নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে 'দীন নয়নে' সে বলে ছিল—"If you cannot love me. Please remember me as your Friend" সেই বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিলে যখন তাহার স্বামীকে জেল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিজে স্ব ইচ্ছায় Aniilotine এর সম্মুখে এসে বলেছিল "Far better than what I did in life. Far Far better than what I ever thought I would do in life. I am doing now" তখন সে মৃত্যুর ফাঁস গলায় পরে কোন্ অসীম প্রেমময় সাম্রাজ্যের দিকে ধীর স্থির প্রশান্ত তৃপ্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল? সে দৃষ্টিতে কোন আশা নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, জীবনে কোন সফলতার জন্য ইচ্ছা ও ব্যস্ততা নাই। প্রেমের ও বন্ধুত্বের এ মহান্ আদর্শ ছবি জগতে অতি বিরল। এ সব 'আঁখির' ভাষা লিখিয়া শেষ হয় না।

আঁখি শৈশব অবস্থায় 'টল্‌টলে' 'ভাসা ভাসা' চোখ যেন এ পৃথিবীর কোন জিনিষই দেখে না সে "কাজল বিহীন সজল আঁখি" কিন্তু রে যে "হৃদয় দুয়ারে ঘা দেয়" তাহা যেন গভীর রহস্য নয়। সে আঁখি কোন্ "ছায়াময়ী অমরার" জিনিষ নির্নিমেষ নিস্পন্দ চাহনীতে দেখিতে থাকে, তাহা কে বলিয়া দিবে?

'A simple child what should he know
of death'

সে আঁখিতে কোন কালিমা নাই। ভবিষ্যতের আশা ভরসা নিরাশার কোন ছায়া নাই। সে যেন নির্ম্মল স্বচ্ছ নিরুদ্বেলিত পুষ্করিণীর কাল জল অনন্ত দিগশূন্য আকাশের দিকে চেয়ে অনিমেষ নয়নে কি বলিতে থাকে—? যা' দেখে তাই নিতে আগ্রহ করে, যা চোখের সাম্নে আসে তাতেই আশ্চর্য্যজনক কি যেন দেখে। কিন্তু যখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ আনন্দ-হিল্লোল খেলে ওঠে, তখন পুষ্করিণীর সে কলকল স্বর-মুখরিত তরঙ্গ লেখা আরম্ভ হতে থাকে। কোথাও যেন উদ্দাম উন্মত্ত হয়ে ওঠে, আবার কখনও যেন তরতর শব্দে ঝঙ্কৃত হতে থাকে। ক্রমে যখন—

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেলা"

হয়ে ওঠে তখন—

"শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেলা"

ক্ষুদ্র তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত চাহনী ভঙ্গিমা নানা ভাবে উদ্ভাসিত হতে চেষ্টা করে। মেঘে ঢাকা চন্দ্রকিরণের ন্যায় অল্পে দেখা দেয়। আবার যেন চকিতে "সরম লাগে মুখে চাহিব না" বলে জ্যোৎস্না তরঙ্গ বিকশিত হয়ে ওঠে। তখন সেই—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগণে
প্রথম শ্যাম রব তব তপোবনে"

বালার্ক কিরণের ন্যায় সদ্যঃস্নাত শিশির সিক্ত দিগ্‌মণ্ডলে উদ্ভাসিত হতে থাকে। আবার মনে হয়—

"পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি যবে নদী ধায় সিন্ধু পানে"

তখন সে অমৃত নিস্যন্দিনী স্রোত ধারার—

"কার হেন সাধ্য আছে রোধে তার গতি"

নির্ঝরিণীর উদ্দাম উন্মুক্ত গতির ন্যায় সে আঁখিও যেন তখন উদ্দাম চিত্তে বলিতে থাকে—

আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা—
এত সুখ কোথা (আছে)
এত রূপ কোথা—
এত খেলা কোথা আছে
যৌবন বেগে বহিয়া যাইব
কে যেন কাহার কাছে।
অগাধ বাসনা অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই—
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।

শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে সে জন্ম দেখা যায়—

ক্ষণং সরলবীক্ষণং ক্ষণমপাঙ্গসংবীক্ষণং
ক্ষণং রজসি খেলনং ক্ষণমতীবভূষাদরঃ।
ক্ষণং দ্রুততরা গতিঃ ক্ষণমতীবমন্দাগতিঃ
ক্ষণং ক্ষণবিলক্ষণং জয়তি চেষ্টিতং সুভ্রুবঃ॥

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে আঁখিতে কেমন এক অব্যক্ত কমণীয় চঞ্চলতা এসে উপস্থিত হয়। তাহার উপমা দিতে মনে পড়ে যেন তাহা—

প্রবাত নীলোৎপল নির্ব্বিশেষঃ
অধীর বিপ্রেক্ষিত মায়তাক্ষ্যা।
ত্বয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যঃ
ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

সে যে কার কাছে এ বিচিত্রতা শিখে তাহা কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে? কখনও তাহা কমলের পলাশের ন্যায় স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাণো-মাদনকারী আবার কখনও তাহা চকোরের মত "আশাপথ পানে" চেয়ে চেয়ে থাকা সতৃষ্ণ দৃষ্টি। কখনও সে "পটোল চেরা" চখের ভ্রূ ভঙ্গিমা পক্ষি বিশেষের অঙ্গচালনা মনে করিয়া দেয়, আবার কখন তাহা সমুদ্রের মত সদা চঞ্চল অথচ দিগন্তশূন্য অনন্ত কি এক রাজ্যের আভাব পরিপূর্ণ। মুহূর্ত্তে যেন আবার সে আঁখির—

"ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়"

কে যেন আবার অস্পষ্টস্বরে বলিতে থাকে—

"মনেরে বুঝায়ে ব'লো নয়নেরই দোষ কিবা"

'শুভদৃষ্টি'র 'অনন্ত মুহূর্ত্ত' জীবনকে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন করে দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চোখে চোখে যে কথা হয় তাহা কোন ইতিহাস অথবা বিজ্ঞানে লেখা নাই। তখনকার একাগ্রতা সমস্ত জীবনের ক্ষীণ আভায় চাহনীকে বিচিত্রময় করে তোলে—

তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি
কিঞ্চিৎ ব্যবস্থাপিত সংহৃতাণি।
হ্রী যন্ত্রণাং তৎক্ষণমন্বভূব
নন্যোন্য লোলানি বিলোচনাপি॥

সমস্ত জীবনকে সে চাহনীর স্মৃতি উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখে, মনের সঙ্গে সময় অসময় তাহা কত না লুকোচুরী খেলিতে থাকে। আবার যখন দুদিন পরে—

প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি·········

"ফুলশয্যার" রাত্রিতে "নবীনা বুদ্ধিহীনা" নববধূর সঙ্গের "দুরু দুরু হিয়া" নিয়ে আলাপনের চেষ্টা হয় তখন তার "আধ আঁচরে ঢাকা" সোনার পাত্রে ভরা নন্দনবনমধু" "মুকুল কোরক সঞ্চিত মধু" পরিপূর্ণ সে "লাজমান" ভরা সকৌতুক স্নিগ্ধ ব্রীড়াবনত ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, ভ্রান্তি-আশঙ্কা-পূর্ণ নির্ম্মল বিস্ফারিত চাহনী কি এক মোহিনী শক্তিতে অভিভূত করে ফেলে তার পর প্রথম আলাপের নির্ব্বাক নিস্পন্দ চেয়ে থাকার ভাষা কতভাবে কত ছন্দে কত কথা বলিতে থাকে। তখন যে—

"অবিদিত গতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ"

তাহা কাহারও খেয়ালে আসে না—সে চাহনীর ভাষা যেন অফুরন্ত—মনে মনে তখন—

"নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি"

তখন আমার মনে হয়—

তোমারও হৃদয়খানি
আমার হৃদয়ে আনি
রাখি না যতই কেন কাছে—
তোমার হিয়ার মাঝে কি যেন অভাব আছে
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।

তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারা যায় না—বুঝিতে চেষ্টা করিতে আত্মহারা হতে হয়। উত্তর কেহ দেয় না—যখন ক্রোড়ে শয়নে থেকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে হেঁসে উঠে স্বপ্ন ভঙ্গে অধরপল্লবে ঈষৎ'সে হাঁসির রেখা অঙ্কিত করে সীতাদেবী ঊর্দ্ধমুখে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে চেয়েছিলেন তখন সে চাহনী সে স্পর্শ অনুভব করে তিনি যেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন "এ কি?

স্বপ্নো নু? মায়া নু? মতিভ্রমো নু?"

তিনি বুঝিতে পারেন নাই—এ চাহনী কি জিনিষ, এ কোন্ দেশের? সে দৃষ্টি শিশিরসিক্ত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সেফালিকার মত নির্মল পবিত্র কিন্তু বহির্জগতের তীব্র আলোকে ম্লান হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু প্রেমের আলো আঁধারে যতক্ষণ থাকে চতুর্দ্দিকে কেমন উন্মত্ততা ও "পাগল করা" গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে নিজের মনে মনে নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা ও তৃপ্তি অনুভব করিতে থাকে—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম এ পৃথিবীতে শুধু সে তুচ্ছ প্যারোয়ানই কেবল কি আঁখিতে পাগল হয়েছে?

শৈশবের চপলতা দূরে গিয়ে মনের ও দেহের যখন বাঁধনি ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে আঁখির ভাষাও তখন জ্যোতির্ম্ময় স্থির ধীর প্রশান্ত হয়ে ওঠে। যৌবনের সে—

"ভরা নদী ক্ষুর ধারা খরপরশায়"

মধ্যেও কেমন একটা তেজঃ একাগ্রতা কমনীয়তা এসে দেখা দেয়। অঙ্গসৌষ্ঠব দেখানের "অন্যে আমাকে সুন্দর দেখুক" এ ভাবটা সম্পূর্ণ জেগে ওঠে তখন—

"চরণ চপলতা লোচন নেল।
দুহুক নয়ন কর দূতক কাজ
ভুষণ ভএ পরিণত ভেল লাজ॥"

এমন একটা ভাব ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হতে থাকে কিন্তু তবুও যেন—

নয়ন নলিনি দউ অঞ্জনে রঞ্জাই
ভেট বিভঙ্গ বিলাসা।
চকিত চকোর জোর বিধি বাঁধল
কেবল কাজর পাসা—

এ ইচ্ছা ত্যাগ করা কঠিন হয়। তখন "শিথিল কবরী বাঁধিতে" গিয়া "কাজল বিহীন সজল আঁখি" পুনরায় "হৃদয় দুয়ারে ঘা" দিয়া ওঠে কিন্তু প্রস্রবিনীর জল যেমন প্রথমে অশেষ কঙ্করময় ও কর্দ্দমাক্ত হলেও শেষে নদীতে এসে স্বচ্ছ নির্ম্মল গভীর ও খরস্রোতা অনন্ত রাশি হয়ে ওঠে এ চাহনী ভঙ্গিমা ও শৈশবের সব আবিলতা ত্যাগ করে স্নিগ্ধ ভাবময়ী হয়ে আসে। তার জ্যোতিঃতে তখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখরতা থাকে না, শরৎপ্রসন্ন আকাশের জ্যোৎস্না থাকে। অন্তরকে প্রাণমন স্নিগ্ধ করে কিন্তু উন্মাদনা আনে না। "ক্ষুরধারা" "খরপরশা" হলেও তাহাতে "ধারাল" "তীক্ষ্ণ" ভাব নাই—তার হাঁসিতে মাধুর্য্য থাকে—তার ক্রন্দনে সহানুভূতি আসে। সে নিজে যেমনটা অনুভব করে অন্যকে তেমনই অনুভব করায়। হাঁসিলে যার চোখ হাঁসে না তেমন লোককে বিশ্বাস করা কঠিন আর যার ক্রন্দনে মন বিচলিত করে না সে বোধ হয় মনুষ্যের মধ্যে অধম।

আবার যখন সে "ভরা যৌবনের"—

"উষার রক্ত মেঘের মতন
দীপ্ত সরমখানি"

জীবন ও মনকে—

"শিশির ধৌত প্রথম প্রভাত" এর মত

করে দেয় তখন তাহা হঠাৎ মনে হলে—

"বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা যেন উঠে যে ফুটি"

এবং মনে হয় প্রাণ মন ভরে করুণ কিশোর কোকিল কণ্ঠে বন্দনা করি

আনন্দময়ী মুরতি তোমার
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা
অমৃত সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা"

কথা বাহুল্য সে বন্দনা গীতির সঙ্গে সঙ্গে—

"জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি"

সব এক সঙ্গে হৃদয় বীণাতে ঝঙ্কৃত হতে থাকে আজীবন এ বন্দনার গান কানে বাজিতেই থাকে। তবে "সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর সকল সাধেরই সাধনা" সেই কল্পনাময়ী মানস সুন্দরীর কাছে কোন সময় তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হয় কি না কে বলিবে? যৌবনের সে উচ্ছ্বসিত গৌরবের মহিমা দেখে মনে হয়

"..................দশদিশি
অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি
কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে
এর কোনও কূল আছে? সৌন্দর্য্য পাথারে
যে বেদনা বায়ু ভরে ছুটে মনতরী
সে বাতাসে কতবার মনে ভয় করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
(কিন্তু শুধু) অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই..........."

চিত্রাঙ্গদা যখন স্বচ্ছ পুষ্করিণী তটে এসে তার গৌরবময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখে বিস্মিত স্তব্ধ হয়েছিল তখন তার

"........স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর সম; হাসিখানি স্থির
অশ্রু শিশির ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মুঞ্জরিত বল্লরীর মত..............."

দেখে নিজে না জানি কতই আনমনা হয়ে ছিল। নারিশা (Narissa) যখন নিজের সে "চলচল ছলছল গঙ্গা উথাল্য" দেখে নিজেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

[রূপ দেখি আপনার
কৃষ্ণে লাগি চমৎকার
আলিঙ্গিতে মনে ওঠে কাম]

কিন্তু তখন কতই না

"জল তল ছল ছল কান্দিল গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে"

তবু সে ক্রন্দনের অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি তাদের কানে কি কোন সাড়া দিয়েছিল! তাই বলিতেছিলাম "পঞ্চদশ বসন্তের একখানি মালা" তে যখন

শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল...
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি"

তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে "দীন নয়নে" কাতরে মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি হতে থাকে

"পরাণে কেন গো দিলে ভালবাসা
রূপ না দিলে যদি বিধি হে
পূজার তরে হিয়া ওঠে যে ব্যাকুলিয়া
পুজিব তারে আজি কি দিয়ে"

সমস্ত জীবন আর এ পূজার আয়োজন শেষ হয় না, কত যুগ যুগান্ত ধরে এমনই চলে আস্‌ছে—কতলোক কত ভাবে কত ছন্দে তার পূজোপচার ও বন্দনা গীতি গেয়ে এসেছে। কিন্তু তবু এ অনাদি অনন্ত কাল ধরে

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া ওঠে ধরার অঞ্চল
জগতের অশ্রু ধারে ধৌত সে তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদি রক্তে আঁকা থাকে চরণ শোণিমা
মুক্ত বেণী বিবসনা বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার

এ দৃশ্য অটুট অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। আঁখির এ সৌন্দর্য্য স্পৃহা সে জন্য 'জনম অবধি' দেখেও তৃপ্তি হয় না। চোখ যেমন অন্যকে দেখায় ও উদভ্রান্ত করে, নিজেও আবার তেমনই উপভোগ করে, উন্মত্ততা মনের মধ্যে প্রতিফলিত

করে দেয়, একটা তাহার বহির্বিকাশ আর একটী তাহার অনুভব। কিন্তু দুইটাই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাব। তাই মনে পড়ে

শশি যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালবাসা
এরে দেখি হাসি ভাবিত এ লোকে জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরাণ চাহি তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুল গন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
সহকার শাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর শুরু জানে শুধু কলমর্ম্মর কথা।

এই কল মর্ম্মর কথা অনাদি অনন্ত কাল থেকে প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে তবু নয়নের ভাষা এখনও অফুরন্তই রহিয়াছে।

যৌবনের এ উন্মত্ত গরিমা যখন ম্লান হয়ে আসে যখন মনে হয়

দিন শেষ হয়ে এল
আঁধারিল ধরনী
আর বেয়ে কাজ নাই তরনী"

তখন মানুষের চোখে "পরপারের মসী মাখা" এক অজানা রাজ্যের ছায়া এসে পড়ে। তখন দৃষ্টিতে সে একাগ্রতা থাকে না, চাহনীতে সে ভঙ্গিমা থাকে না—স্থির ধীর উদাস "শিব" নেমে তখনই সেই

মহা সিন্ধুর ওপার হতে
কি সঙ্গীত ভেসে আসে।

এবং সে "অনন্ত সাগর মাঝে তরী ভাসাইয়া" দিয়া এ পৃথিবীর সব আশা ভরসা আশঙ্কা ভয় লজ্জা অতিক্রম করে কার দিকে সে দৃষ্টি হয়? ক্ষুদ্র জীবনে মানুষ তাহার ক্ষীণ আভাস বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ। কি যেন আবেশ বিহ্বলে সমস্ত জীবন যেন মুহূর্ত্তে কেটে যায়। তখন "কবে আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি" সে সব প্রশ্ন আর মনে আসে না- গন্ধের খোঁজে সমস্ত জীবন উন্মত্ত হয়ে কাটিয়ে দিয়ে শেষে সে অনন্ত সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে ধীরে ধীরে সে সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়। জীবনের শশি সূর্য্য তখন নিভে যায়। দৃষ্টি কোথায় থাকে তাহা কে বলিবে?

বহির্জগতে যেমন দৃষ্টিতে অশেষ ভাবময় লহর খেলে ও তাহার নিত্য নূতন অভিনব বিকাশ দেখা যায়, অন্তর্দৃষ্টির মধ্যেও তেমনই অনেক মাধুর্য্য দেখা যায়। সকলেই নিজের ভিতর নিজেকে দেখে না। কিন্তু জীবনে দুএকটী ক্ষুদ্র জটিল সমস্যা লইয়া অনেকেই সময় অসময় লক্ষ্যশূন্য ও আত্মহারা হয়ে যান। বাস্তবজগতে যাঁহারা কর্ম্মবীর আছেন ও হয়েছেন তাঁহাদের দৃঢ় তেজোময় দৃষ্টি লোকের ওপর সহজে কেমন একটা আধিপত্য ও শাসন এনে দেয় তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ল্যয়ডজর্জ্জ, আস্কুইথ, কিচেনার প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষদের চেহারা উল্লেখযোগ্য। আবার যাঁহারা যোগী মহাপুরুষ বলে জগতে অশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁহাদের সে মধুর শান্ত উধাও দৃষ্টিতে কেমন এক স্বর্গীয় অপার্থিব আভা দেখা দেয়। তাঁহাদের চাহনীতে তীব্রতা নাই, উন্মাদনা নাই, চাঞ্চল্য নাই অথচ তাহা স্থির ধীর প্রশান্ত। সে "ক্ষমাসুন্দর" "সৌম্য মহান" "বিকচ নয়ান" চাহনী কেমন যেন মনোমুগ্ধকর। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় যেন সকলকেই তাহার বিমল জ্যোতির সম্মুখে মাথা নত করিতে হয়। অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা কাহারও ভাষায় এমন তেজোময় ভাবে ভিতর থেকে ফুটে বাহির হয় যে সে তীব্রতা কেহ সহ্য করিতে পারে না—আবার কাহারও অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়ে "আদরে কাছে ডেকে হেসে হেসে কথা কয়" চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব শুধু চাহনীতেই। কাহারও অশেষ সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও শুধু চাহনীর তীব্রতা মনকে দূরে তাড়িয়ে দেয় আবার কাহারও সৌন্দর্য্য বড়াই করিবার কিছু না থাকিলেও 'ভাসা ভাসা' চোখের চকিত সন্ত্রস্ত নিষ্কলঙ্ক চাহনী মনে কি এক স্নিগ্ধ অপার্থিব ভাব এনে দেয়। মনের ভাবলহরী চোখে কেমন অদ্ভুত ক্রিয়া করে তাহা কোন অভিধান ও বিজ্ঞানে লেখা নাই। অথচ অহরহ কতরকম চাহনী ভঙ্গিমা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সঙ্গীতে যেমন সাতটী সুর ভিন্ন অসংখ্য

সুর "খেলে গগন ঘেরে" এবং কোন যন্ত্র তাহা সব সময় বাজে না, মানুষের মনেও তেমনই এত অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ হয় যাহা ভাষাতে সব সময় প্রকাশ করা যায় না। ভাষা সীমাবদ্ধ কিন্তু ভাবলহরী অসীম অনন্ত পর্য্যন্ত কল্পনা করে। মানুষ মানুষের ভাষা হয়ত বুঝিতে পারে না। কিন্তু চাহনীর ভাষা সার্ব্বজনীন। কোন জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়। মূক-বধির জীবজন্তুদের মধ্যেও তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। "সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে" তাহাতে কোন কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয় না। "চোখ রাঙ্গালেই" অশেষ ভৎর্সনা হয়। আবার ছেলে মেয়ের চোখের জলের কাছে সব রাগ অভিমান ধুলিসাৎ হয়ে যায়। অপরাধের জ্ঞান মান থাকিলে "চোখে চোখে চাওয়া" দায় হয়ে ওঠে। আবার অনেকেই মুখের দিকে তাকাইতে Blush করেন। মানুষের মধ্যে এমন অনেক দেখা যায় "Whose looks are downward bent" তবে তাহারা সব সময় সোনারূপা দেখে কিনা তাহা বলিতে পারি না। শরীর অসুস্থ হলে ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা চোখের জ্যোতিঃই সর্ব্বপ্রথমে দেখেন। হঠাৎ অচেতন হলে চোখে স্পন্দন করানের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে হয়। পাগল ও মাতালের দৃষ্টি যেন "সৃষ্টি ছাড়া"। পেটুকের ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকা সতৃষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি কান্তকবিরা মনোখেদের কথা হয়ত মনে করিয়ে দেয়। ভিক্ষুকের আশাপুর্ণ দীন চাহনী অনেককেই মুহুর্ত্তে অল্পবিস্তর বিচলিত করে। হাসিতে গেলে চোখেই সর্ব্বপ্রথম সাড়া দেয় এবং মনের দুঃখে কষ্টে শোকে তাপে চোখেই সর্ব্বপ্রথমে স্পন্দিত হয়ে উঠে। চোখের পাতা নাচানতে অনেকে আবার ভবিষ্যৎ গণনা করে ফেলেন। যাহার মনে এক মুখে এক তাহার চাহনী এতটা মার্জ্জিত ও শিক্ষিত যে মানুষকে অল্পেই ঠকাইতে পারে। যাঁহারা প্রথমে ষ্টেজে অথবা সভায় অথবা অন্যের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে ওঠেন, তাঁহারা জানেন দর্শকের শত সহস্র চক্ষু ও নিন্দা উৎসুক দৃষ্টি দেখে হঠাৎ কেমন তাঁদের "বুক দুর দুর" করে ওঠে, মাথা ঘুরে যায়, সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে আসে। থিয়েটার ও বায়স্কোপে সকলেই দেখেছেন ভাষার থেকে চাহনী ভঙ্গিমাতে কত সহজে মনের ভাব বুঝিয়ে দেয় "চকিত চাহনী" "ফিরে ফিরে চেয়ে" গিয়ে হয়ত সহজেই হৃদয় বিদ্ধ করে। কিন্তু চোখে চোখে কথা বলা শুধু প্রেমিক প্রেমিকারই সম্পত্তি নয়। রাস্তায় আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হলে অনেকে শুধু "চোক ঠাওরে" ইসারা করে অশেষ আলাপ করে চলে যান। অনেকে আবার চাহনী চাতুর্য্য শিক্ষা করে এমন স্বাভাবিক করে তোলেন যে তাহার ভঙ্গিমাতে ভাষা নীরব করে দেয়। কোনস্থানে কোন ঘটনা হ'লে সবাই যেন চোখ দিয়ে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে ছুটেন। কোন বই পড়িতে অথবা কিছু লিখিলেও অনেকে অনেক রকম চোখের ভঙ্গিমা করেন। বাস্তব জগতে চাহনীর এসব চাতুর্য্য অনেকেই লক্ষ্য করে থাক্‌বেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিলাম না।

সৌন্দর্য্য বোধ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান আঁখির ভাষায় এক অভিনব পরিচ্ছেদ। (Midsummer night's dream) "নিদাঘ নিশাথ স্বপ্ন" কল্পনাতে মহাকবি সেক্‌সপীয়র এ রহস্যের অনেক আভাষ দিয়াছেন। এক জিনিষকে সবাই সমান সুন্দর দেখে না আবার সৌন্দর্য্য জ্ঞান এক এক জন লোকের এক রকমের। ফুল দেখিলেই অনেকের নিতে আগ্রহ হয়, কেহ তাহা পাইয়া অনিমেষ নয়নে দেখিতে থাকে, কেহ তাহা শুঁকিতে যত্ন করেন—কেহ তাহা জামাতে অথবা খোঁপাতে অথবা কোমরবন্ধে গুঁজিয়া রাখিতে ভাল মনে করেন। কেহ তাহার পরস্পর অবস্থিতি Stamens রেণু কণা প্রভৃতি দেখিতে ভালবাসেন, কেহ তাহার বর্ণ ও রং চাতুর্য্য উপভোগ করেন এবং কেহ তাহা চিত্রে ফলাইতে চেষ্টা করেন। কেহ সে ফুল ছিঁড়িয়া ভিতরে লুক্কায়িত কোন সৌন্দর্য্য দেখার বৃথা চেষ্টা করেন। অনেকে আবার একটী ফুল দেখিয়া কত সুষুপ্ত চেতনা ও স্মৃতি মনে করে বিভোর হয়ে ওঠেন। কেহ মনে করেন "ফুল ফুটলে লোকের সুখ। ফুলের কি?" কেহ মনে মনে কত পদ্য রচনা করেন। আবার কেহ মনে মনে ভাবেন কোন্ সুদূর অতীতে একটী ফুলের মালা

রাইয়া কার সঙ্গে যেন কাড়াকাড়ি হয়ে ছিল এবং রাজা রাজড়ার ঝগড়া হলে যেমন উলুখড়ের প্রাণ যায় তেমনই হতাদরে ঝরে পড়ে ফুল মাটিতে বিস্ফারিত লোচনে সে দ্বন্দ্ব ও সন্ধির বোঝা পড়া দেখিয়াছিল। সামান্য ফুলটি কত লোকের মনে কত ভাবে সাড়া দেয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সৌন্দর্য্য জিনিষটী বিশ্লেষণ করা যায় না, কেন না তাহা "আদর্শ-আত্মক"—বঙ্কিম বাবু তাহা বর্ণনা করিতে বলেছিলেন "তুমার তাহাতে কখনও এক রকম দেখিলাম না"। "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি" বলিলেও শেষে মনে আপশোষ থাকিয়া যায় "নয়ন না তিরপিত ভেল"। চির যৌবনের একটা নিরাকার নিখুঁৎ ছবি অনেক কবি মহর্ষিগণ বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কবিতা মহাভারতের মোহিনী মূর্ত্তির কল্পনা বৈষ্ণব কবিদের শ্রীরাধার অবাস্তব বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। অনেকেই জানেন Leonard de Vinci'র my madam নামে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র এ যাবৎ অনেক লোককেই উদ্‌ভ্রান্ত করে এসেছে। সে চিত্রের মধ্যে পাগল করা জিনিষ শুধু "আঁখি ভরা আবেশ বিহ্বল"। মনের কল্পনা যেমন অশরীরি সৌন্দর্য্যের একটা মহান্ পবিত্র চিত্র এঁকে নেয়, সব হাতে সব সময় তাহা সমান প্রতিফলিত করা যায় না।

সৌন্দর্য্য জ্ঞানের তিনটী স্তর সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম জ্ঞান "অন্যে আমাকে সুন্দর দেখুক" ভাব অঙ্গ প্রসাধন আর সৌষ্ঠব দেখানের একটা ইচ্ছা। দ্বিতীয় "অন্যে আমাকে সুন্দর দেখুক" সময় সময় শুধু নিজেকে ভাল ভাবে অন্যের নিকট দেখানের ইচ্ছা। তৃতীয় জ্ঞান "অন্যে আমাকে সুন্দর দেখে" সব সময় যেন কেহ তাকিয়ে দেখিতে থাকে। অঙ্গ প্রসাধন সব জীবজন্তু এবং অসভ্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়। রাজদরবারে অথবা চাকরীর অন্বেষণে যেতে অনেকেই সাজ গোজ করেন এবং সব সময় কেহ দেখিতেছে এ ভাব মানুষকে উন্মুক্ত উদার করে তোলে। ভগবানের বিশ্বরূপ ভাব আমরা খুব কমই মনে কল্পনা করি কিন্তু যে উচ্চ চিত্ত হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে—

"ত্বাকা পৃথিব্যো রিজমন্ত রং ছি
ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্ব্বা"

তাহার কাছে পৃথিবীর কোন আবিলতা স্পর্শ করিতে পারে না। আঁখির ভাষা লোককে যে শুধু পাগল করে তাহা নহে—মন প্রাণ মুগ্ধ করে—এক উন্মত্ত মদিরায় বিভোর করে রাখে—"পূজার তরে হিয়া" ব্যাকুল করে দেয়, বাস্তব জগতে অনেক ক্রিয়া কলাপ দেখায়, পরস্পরের অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট অজানা আভাষ এনে দেয় এবং মনকে উদার উন্মুক্ত করে দেয়। অনন্ত বিকাশের এ সব ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র—কত যুগযুগান্ত হতে নীরবে সকলকে স্পন্দিত করে আসিতেছে এর মর্ম্ম ও আকৃতি বুঝিতে কত লোক কত ভাবে কত ছন্দে বিভোর হয়ে গিয়াছে। পরিশেষে কবির কথা মনে বেজে ওঠে—

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন।
অই যে অবনীতলে পরশমানিক জ্বলে
বিধাতা নির্ম্মিত চারু মানবনয়ন।
ধন্য এই ধরাতল প্রেম ভোগবতী জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে।
যুগল নক্ষত্র দুটি যেখানে বেড়ায় ছুটি
সধারূপে মনোসুখে পৃথিবী উপরে।
স্নেহরূপে কতফুল ফুটায় অণি অতুল
ইহার পরশে ধরা আনন্দ কানন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

কিন্তু তবু এ রহস্যময় আশ্চর্য্য মনে থেকেই যায়

অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর।
বাকি অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

তাই দূরে অতি দূরে আজ এ সঙ্গীত কানে আসিতেছে—
"পাগল করেছে মোরে আঁখিতে প্রাণ তোমারই"

শ্রীকালিদাস বাগচী।

প্রলয় রাতে।

বাহিরে জমেছে মেঘ,—বড় অন্ধকার,
আকাশ বিদারি নামে বাদলের ধার ;
আর্দ্র বায়ু হুহু করি ফিরে চারিভিতে।
হে বন্ধু, আজিকে তাই ভাবিয়াছি চিতে
আমার এ বীণাযন্ত্রে সাধিব না স্বর,
কণ্ঠে আজি তুলিব না রাগিনী মধুর ;
এ উন্মাদ প্রকৃতির জয় কোলাহলে
যে রাগিনী সিন্ধুসম উঠিছে উথলে
আরো সে উঠুক ফুটি'।
হে হৃদয়েশ্বর।
আমার মিলন কামী ক্ষুধিত অন্তর
আজি ওই বাহিরের প্রলয়ের সনে
তোমারি দুরন্ত মূর্ত্তি এঁকে নিবে মনে।
তারি পানে চেয়ে চেয়ে হবে সমাপন
এ প্রলয় রজনীর এই কটী ক্ষণ।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

রাজা কৃষ্ণদাস-পত্নী রাণী মহালক্ষ্মী। *

মহারাজ রাজবল্লভের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্য কুলীন বেদগর্ভ সেন তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান যশোহর জেলার ইতিনা গ্রাম ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর বিলদাউনিয়ায় উপনিবিষ্ট হওয়ায় তদ্বংশীয়গণ স্থান ত্যাগ দোষে দুষ্ট হইয়া কুলহীন হন। তাই রাজবল্লভ যখন বিত্তশালী ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই তিনি ভ্রংশ্ট কুলগৌরব উদ্ধারের আশায় পুত্র কণ্যাগণকে প্রধান প্রধান কুলীন সমাজে বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামদাসের বিবাহ কোথায় হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র ইতিহাস বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণদাসের বিবাহ তিনি বৈদ্য সমাজের অন্যতম কুলীনস্থান খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে দিয়াছিলেন।

এই মূলঘরের কুলীন বিষ্ণুদাস বংশীয় রামশরণ রায়ের কণ্যা মহালক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণদাসের পত্নী। রামশরণ জমীদার বংশীয় হইলেও ঘটনা চক্রের আবর্ত্তণে শেষে নিঃস্ব হইয়া পড়েন, সুতরাং মহালক্ষ্মী দরিদ্র কণ্যা ছিলেন, বলিতেই হইবে। কিন্তু দরিদ্র কণ্যা মহালক্ষ্মী বাল্যকাল হইতেই অতি দানশীলা, বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। এখন শ্বশুরালয়ে ধনসম্পদের মধ্যে আসিয়া অনুকূল সুযোগে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহ ক্রম বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার বিচার শক্তি, তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তাঁহার সাহসিকতা দেখিয়া রাজা রাজবল্লভ পর্য্যন্ত এত মুগ্ধ ছিলেন যে রাজকীয় ও পারিবারিক জটীল বিষয় সম্বন্ধেও অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে রাজবল্লভ যে বঙ্গের অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন, একথা ঐতিহাসিক সত্য। আলিবর্দ্দির পরে হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে রাজবল্লভের প্রাধান্য কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলেও বাঙ্গালার মসনদ যখন মীরজাফরের হস্তে আইসে, তখন আবার তিনি পূর্ব্বের মত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন। কিন্তু মিরজাফরের পর মীরকাশিম যখন বাঙ্গালার দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা

---

* আমার এক 'জেঠীমা'র মাতুলালয় ছিল রাজনগর। ছেলেবেলায় তাঁহার নিকট রাজবল্লভ সম্বন্ধীয় অনেক গল্পই শুনিয়াছি। রাণী মহালক্ষ্মীর এই কাহিনী তাহারই অন্যতম। শ্রীযুত রসিকলাল গুপ্ত বিরচিত 'মহারাজ রাজবল্লভের জীবন চরিতে' ও প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দনাথ রায়ের প্রবন্ধ বিশেষেও মহালক্ষ্মীর কথা কিছু কিছু পড়িয়াছি। পরস্পরের মধ্যে একটু আধটু অসামঞ্জস্য থাকিলেও মূলে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় নাই।

লেখক।

হইলেন তখন রাজবল্লভের নিতান্ত অসময় উপস্থিত হইল।

মীরকাশিম ইংরাজদিগকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না। ইংরাজ যাহাতে বাঙ্গলার বদ্ধমূল না হইতে পারে তজ্জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মীরকাশিম যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন—নানা কারণে ইংরাজদের সহিত তাহার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল—তাই তাঁহার সেনাপতি গুর্গন খাঁর পরামর্শে ইংরাজদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বাঙ্গলার অন্যান্য হিন্দু প্রধান দিগের সহিত মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসকে মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথাসময় এ সংবাদ মহালক্ষ্মীর গোচরীভূত হইল—কিন্তু তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্বশুর ও স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিলাপে সময় নষ্ট না করিয়া কেমন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন, সেই চিন্তা করিতে বসিলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল—অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা নিঃসহায়া কুলবধু বাঙ্গলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মীরকাশিমের বন্দীকৃত কয়েদী উদ্ধার করিতে চলিলেন—যথাসময় তিনি লোকজন লইয়া একেবারে মুঙ্গের দুর্গের সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া দুর্গরক্ষকদিগকে উৎকোচ দানে বাধ্য করিলেন—পরে দুর্গে প্রবেশ করিয়া স্বামী ও শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে কি উপায়ে উদ্ধার করিতে পারেন, সেই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজবল্লভ তাঁহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া অত্যন্ত গৌরব বোধ করিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—'মা, তোমার সাহস দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলেও এ সাহসকে আমি অসম সাহস ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। নবাবের অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও প্রহরীবর্গ পরিবৃত এই দুর্গ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না, লাভের মধ্যে তোমাকে চিনিতে পারিলে হয়ত নবাবের লোকে অপমানিত করিবে—এইরূপ ক্ষেত্রে আমি তোমাকে এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলি—আমাদের অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে, কিন্তু তুমি আর এখানে আসিয়া আমাদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করিও না।'

শ্বশুরের কথা শুনিয়া মহালক্ষ্মী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু রাজবল্লভ কিছুতেই তাঁহাকে এ বিপদের মধ্যে থাকিতে দিতে সম্মত হইলেন না—মহালক্ষ্মী আর কি করিবেন, অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্বশুরকে প্রণাম ও স্বামীকে উপযুক্ত সম্ভাষণ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া রাজনগর রওনা হইলেন। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

রাজবল্লভ যখন ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, তখন আগাবাকর নামক ঢাকার জনৈক জমীদারের জমীদারী খাজনা বাকী পড়ায় খাস দখল করিয়া লইয়াছিলেন—এখন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ থাকায়—এই সুযোগে আগাবাকরের পুত্র আকারেজা পৈত্রিক শত্রুতা প্রতিশোধ দিবার অভিপ্রায়ে রাজনগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন—রাজনগর তখন রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের রক্ষণাধীন ছিল—তিনি এই অতর্কিত সংবাদে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কি করিবেন না করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ভীত, ত্রস্ত আত্মীয় স্বজন ও কর্ম্মচারীবর্গ আকারেজাকে ধনরত্ন উৎকোচ স্বরূপ দিয়া এ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—অনন্যোপায় গঙ্গাদাসও অবস্থা বুঝিয়া এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময়ই রাণী মহালক্ষ্মী রাজনগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পুরীর বিশৃঙ্খল ভাব ও পুরবাসীর ভীতির অবস্থা দেখিয়া তিনিও যেন একটু বিব্রত হইলেন—কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র, পরক্ষণেই তাহার কর্ত্তব্য স্থির হইল, তিনি দেবর গঙ্গাদাসকে আহ্বান করিয়া

বলিলেন—"মহারাজ অবরুদ্ধ আছেন বলিয়াই আগা-বকের পুত্র এখানে আসিতে সাহস পাইয়াছে, কিন্তু আমরাও মহারাজের পুত্র, পুত্রবধু, তিনি এখানে নাই কিন্তু তাহার সুনাম আছে। আমরা কিছুতেই তাঁহার সে সুনামে কলঙ্ক স্পর্শিতে দিব না, উৎকোচ তাহাকে কিছুতেই দেওয়া হইবে না। আমরা পুড়ী রক্ষা করিব, অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে।"

রাণী মহালক্ষ্মীর উৎসাহে রাজা গঙ্গাদাস ও তাঁহার ভ্রাতাদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হইল—তাঁহারা আকারেজাকে দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আকারেজাও সৈন্য সামন্ত লইয়া পুরীর উপর আপতিত হইলেন—রাজপক্ষ ও আকারেজা খাঁর পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। আকারেজা অসংখ্য শিক্ষিত সৈন্য লইয়া প্রতিশোধ দিতে আসিয়াছিলেন। তাহার সৈন্যবর্গের উৎসাহের তুলনা ছিল না। কিন্তু এদিকে রাজপক্ষে রীতিমত শিক্ষিত সৈন্য অতি কম ছিল—যাহারা ছিল তাঁহারা মহারাজ রাজবল্লভ নবাবের কোপে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া যেন উৎসাহশূন্য ছিল, তাই তাহারা আকারেজার সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। অবস্থা দেখিয়া রাজপুরীর অধিকাংশ লোক, এমনকি রাজা গঙ্গাদাস পর্য্যন্ত, সব পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান হইলেন—কিন্তু অতুল তেজস্বিনী রাণী মহালক্ষ্মী তখনও ভীতিশূন্যা। তিনি যখন দেখিলেন যে, পুরী রক্ষা করিবার আর উপায় নাই—তখন অতি সাহসে ভর করিয়া পুরীর বহুমূল্য মনি মুক্তা, ধন রত্ন সহ অন্তপুরীকাদিগকে লইয়া কৌশলে পুরী ত্যাগ করিয়া গেলেন—আকারেজা শূন্য পুরী অধিকার করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিলেন।

পুরী লুণ্ঠন করিয়া আকারেজা যখন চলিয়া গেলেন তখন মহালক্ষ্মী আবার সকলকে লইয়া পুরী প্রবেশ করিলেন—তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিশৃঙ্খল পুরী আবার সুশৃঙ্খল হইল।

এই সময়ে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাশিম বুঝিলেন যে, আর তাঁহার কোন আশাই নাই—তাই অত্যন্ত হতাশ হইয়া জিঘাংসার বশে মহারাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস সহ অন্যান্য বন্দীদিগকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিলেন। এই সংবাদ রাজনগর পৌছিলে পুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল—রাণী মহালক্ষ্মী শয্যা-শায়ী হইয়া পড়িলেন—কিন্তু তিনি বড় অধিক দিন শোকাভিভূতা হইয়া থাকিবার অবসর পাইলেন না। আকারেজার লুণ্ঠনে রাজপুরী লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর আবার এই দারুণ দুঃসংবাদে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িল—কাজেই তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি ভাবিলেন শ্বশুর ও স্বামী গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের বড় সাধের পুরী রক্ষা করিতেই হইবে। এই চিন্তায় তিনি হৃদয়ে বল বাঁধিলেন—কর্ত্তব্যের মুখে শোক তিষ্ঠিতে পারিল না।

ইহার পরে কি রাজা গঙ্গাদাস, কি রায় গোপালকৃষ্ণ যখন যিনি কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন, তিনিই তখন মহালক্ষ্মীর পরামর্শ লইয়া কাজ করিয়াছেন। ফলতঃ রাণী মহালক্ষ্মী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নামে না হইলেও কার্য্যতঃ তিনিই মহারাজা রাজবল্লভের পরিত্যক্ত সম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন—একথা ভাবিতেও আমাদের গৌরব বোধ হয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

অষ্টম প্রস্তাব, দ্বিতীয় অংশ।

(জলপ্লাবনতত্ত্ব,—আর্য ও পাশ্চাত্যমত)

আর্য স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক মতানুসারে বর্ত্তমান সৃষ্টিবয়স যে কত, তাহার হিসাব দিতে গেলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট যে শুধু হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তাহা

নহে, আমাদের দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত সজ্জনের নিকটও তাহা গাঁজাখুরি আষাঢ়ে উপকথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুসংহিতা এবং মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীর মতানুসারে অদ্য হইতে ১,৯৬,০৮,৫৩,০২২ (একবৃন্দ, ছিয়ানব্বই কোটি, আটলক্ষ, তিপ্পান হাজার বাইশ) বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রথম বিকাশ হইয়াছিল এবং পুরাতন বাইবেলের মতে অদ্য হইতে ৫,৯২৫ (পাঁচ হাজার নয়শত পঁচিশ) বৎসর পূর্ব্বে এই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইয়াছিল।* য়ুরোপীয় এবং আমেরিকান খৃষ্টান ধর্ম্মী পণ্ডিতেরা বাইবেলের কথা অমান্য করিয়া আমাদের এই প্রায় দুইশত কোটী বৎসরের কথা মানিতে পারিবে না ; আর আমাদের দেশের ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোক যদিও প্রত্যেক শাস্ত্রীয় কার্য্যকর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে সংকল্পবাক্যে জগৎ সৃষ্টির সময়ের উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, সে কেবল পুরোহিতের মুখ হইতে শুনিয়া পড়াপাখীর বুলির মত বলিয়া যাইতেছেন মাত্র ; পুরোহিত অথবা যজমান কেহই ঐ বাক্যের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেন না। আমরাও কাহাকে এই আর্ষমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অথবা তাহাকে অবিশ্বাস করিতে বলিতেছি না ; শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহারই পরিচয় দেওয়া মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য।

সৃষ্টির প্রথম হইতে ছয়জন মনুর রাজত্বকাল শেষ হইলে, বৈবস্বত মনুর রাজত্ব আরম্ভ হয় ; এবং তাঁহার রাজত্বের প্রাক্‌কালে, অর্থাৎ অদ্য হইতে ১২০৫,৩৩,০২২ বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীতে একটি খণ্ডপ্রলয় ও জল-প্লাবন হইয়াছিল। সমস্ত পৌরাণিক সাহিত্যের শিরোরত্নস্বরূপ মহাভারত হইতে আমরা এই আখ্যান উদ্ধৃত করিতেছি :— *

* মনুসংহিতার প্রথমেই এই তত্ত্ব আছে। সৃষ্টির সময়কে শাস্ত্রে কল্প বলে এবং এক এক কল্পে চতুর্দ্দশজন মনু রাজত্ব করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর এবং এই কালকে এক চতুর্যুগ বলে। এইরূপ ৭১ চতুর্যুগে এক মনুর রাজত্বকাল হয়। প্রথম হইতে যথাক্রমে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ মনুর রাজত্বকাল গত হইয়া সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর ২৭ চতুর্যুগ চলিয়া গিয়া অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলির ৫০২২ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং (৪৩২০০০০ × ৭১ × ৬ =) ১,৮৪,০৩২০,০০০ বৎসরে ছয় মনুর কাল গত হইয়া বৈবস্বত মনুর (৪৩,২০,০০০ × ২৭ + ৩৮৯৩০২২ =) ১২,০৫,৩৩,০২২ =) বৎসর, সুতরাং প্রথম হইতে (১,৮৪,০৩,২০,০০০ + ১২,০৫,৩৩,০২২ =) ১,৯৬,০৮,৫৩,০২২ বৎসর গত হইয়াছে। মনুসংহিতা,প্রথম অধ্যায়, ৬৪—৮০ শ্লোক।

পুরাতন বাইবেল (Appointed to be read in churches) genesis অথবা সৃষ্টিবিবরণ পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে খৃঃ পূ ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে। সম্প্রতি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে ; সুতরাং বাইবেলের মতে অদ্য হইতে (৪০০৪ + ১৯২১ =) ৫,৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হয়।

* "বিবস্বতঃ সুতোরাজন্ মহর্ষিঃ সুপ্রতাপবান্।
বভূব নরশার্দূল প্রজাপতি সমদ্যুতিঃ ॥২॥
তং কদাচিত্তপস্যন্তমার্দ্রচীরজটাধরম্।
চীরিণীতীরমভ্যাগম্য মৎস্যোবচনমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
ভগবন্ ক্ষুদ্রমৎস্যোঽস্মি বলবদ্ভ্যো ভয়ং মম।
মৎস্যেভ্যো হি ততো মাং ত্বং ত্রাতুমর্হসি সুব্রত ॥৭॥
দুর্ব্বলং বলবন্তোহি মৎস্যামৎস্যং বিশেষতঃ।
আস্বদন্তি সদাবৃত্তির্বিহিতা নঃ সনাতনী ॥ ৮ ॥
তস্মাদ্ভয়োঘান্ মহতো মজ্জন্তং মাং বিশেষতঃ।
ত্রাতুমর্হসি কর্ত্তাঽস্মি কৃতে প্রতিকৃতং তব ॥ ৯ ॥
স মৎস্যবচনং শ্রুত্বা কৃপয়াঽভি পরিপ্লুতঃ।
মনুর্বৈবস্বতোঽগৃহ্নাত্তং মৎস্যং পাণিনাস্বয়ম্ ॥ ১০ ॥
উদকান্তমুপানীয় মৎস্যং বৈবস্বতোমনুঃ।
অলিঞ্জরে প্রাক্ষিপত্তং চন্দ্রাংশুসদৃশপ্রভে ॥ ১১ ॥

"সূর্য্যপুত্র (বিবস্বান্=সূর্য্য, তাঁহার পুত্র বৈবস্বত মনু) মহারাজ মনু একদা জটাবল্কল ধারণ করত চীরিণী-নাম্নী নদীতীরে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, 'ভগবন্, আমি ক্ষুদ্র মৎস্য, বলবান্ মৎস্য হইতে আমার ভয় হইয়াছে; হে সুব্রত, সেই সকল মৎস্য হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। মৎস্যদিগের মধ্যে পুরাতন এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে বলবান্ মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে; সেইজন্য আমি বিশেষ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার কৃত এই উপকারের প্রত্যুপকার করিব।" বৈবস্বতমনু মৎস্যের এই বাক্যে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া স্বহস্তে তাহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং অল্প জলপাত্রের মধ্যে উহাকে ডাকিয়া জ্যোৎস্নাধবল এক অলিঞ্জরে (গামলা অথবা চৌবাচ্চা বিশেষ) রাখিয়া দিলেন। সেই মৎস্য, মনু মহারাজের স্নেহে ও যত্নে তথায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং মনুর হৃদয়ে সেই মৎস্যের প্রতি পুত্রবৎ ভাব জন্মিল। ক্রমশঃ, অনেক দিন পরে, সেই মৎস্য এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে আর সেই অলিঞ্জরে তাহার স্থান সংকুলান হইল না। তখন সেই মৎস্য মনুর দেখা পাইয়া পুনরায় বলিল, 'ভগবন্, অদ্যই আমাকে অন্যস্থানে লইয়া চলুন'। তখন মনু মহারাজ অলিঞ্জর হইতে সেই মৎস্যকে লইয়া এক বৃহৎ দীর্ঘিকায় আনিয়া রাখিলেন। সেই বাপী দ্বিযোজন দীর্ঘ এবং একযোজন বিস্তৃত ছিল; তথাপি বহুবৎসরের মধ্যে সেই মৎস্য এরূপ বড় হইল যে আর সেই দীর্ঘিকায়ও তাহার স্থান হইল না; এবং আবার সে মনুর দেখা পাইয়া বলিল, "ভগবন্, আমাকে গঙ্গায় লইয়া চলুন, আমি সেই খানেই বাস করিব, অথবা আপনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন ও আপনার দয়াতেই আমি এরূপ বড় হইতে পারিয়াছি, সুতরাং আমার পক্ষে অকপট চিত্তে আপনার আদেশের বশ্যবর্ত্তী হওয়াই উচিত।" মৎস্যের এই কথা শুনিয়া মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে আনিয়া গঙ্গাতেই নিঃক্ষেপ করিলেন এবং সে তথায় কিয়ৎকালের মধ্যেই অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন সে আবার মনুর দেখা পাইয়া তাঁহাকে বলিল, 'আমি এরূপ বড় হইয়াছি যে গঙ্গায় আর নড়িতে চড়িতে পারিতেছি না, —আমাকে আপনি শীঘ্র সমুদ্রে লইয়া চলুন'। মনু তাহার বাক্য শুনিয়া তাহাকে গঙ্গা হইতে তুলিয়া সমুদ্রে আনিয়া তথায় প্রক্ষেপ করিলেন। যদিও সেই মৎস্যের দেহ অতিশয় বৃহৎ হইয়াছিল, তথাচ মনু যখন তাহাকে লইয়া গেলেন তখন তাহার ভার বহিতে তাঁহার কোন কষ্ট হইল না, এবং মৎস্যের স্পর্শ ও গন্ধ তাঁহার পক্ষে সুখাবহ হইয়াছিল। যখন মনু সেই মৎস্যকে লইয়া সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিলেন, তখন সেই মৎস্য যেন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 'ভগবন্' আপনি আমাকে

সতত্র ববৃধে রাজন্ মৎস্যঃ পরমসৎকৃতঃ।
পুত্রবৎ স্বীকরোত্তস্মৈ মনুর্ভাবং বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥
অথকালেন মহতা স মৎস্যঃ সুমহানভূৎ।
অলিঞ্জরে যথাচৈব নাসৌ সমভবৎ কিল ॥ ১৩ ॥
অথমৎস্যো মনুংদৃষ্ট্বা পুনরেবাভ্যভাষত।
ভগবন্ সাধু মে হন্যান্যৎস্থানং সং প্রতিপাদয় ॥ ১৪ ॥
উদ্ধৃত্যালিঞ্জরাত্তস্মাত্ততঃ স ভগবান্ মনুঃ।
তং মৎস্যমনয়দ্বাপীং মহতীং স মনুস্তদা ॥ ১৫ ॥
তত্রতং প্রাক্ষিপচ্চাপি মনুঃ পরপুরঞ্জয়।
অথাবর্দ্ধত মৎস্যঃ স পুনর্ব্বর্ষ গণান্ বহূন্ ॥ ১৬ ॥
দ্বিযোজনায়তাবাপী বিস্তৃতাচাপি যোজনম্।
তস্যাংনাসৌ সমভবন্ মৎস্যোরাজীবলোচনঃ ॥ ১৭ ॥
বিচেষ্টিতুং চ কৌন্তেয় মৎস্যো বাপ্যাং বিশাং পতে।
মনুং মৎস্যস্ততোদৃষ্ট্বা পুনরেবাভ্যভাষত ॥ ১৮ ॥
নয় মাং ভগবন্ সাধো সমুদ্রমহিষীং প্রিয়াম্।
গঙ্গাং তত্র নিবৎস্যামি যথা বা তাত মন্যসে ॥ ১৯ ॥

সকল প্রকারে রক্ষা করিয়াছেন, সম্প্রতি কার্য্যের সময় আসিয়াছে, আপনাকে যাহা করিতে হইবে, গ্রহণ করুণ। হে ভগবন্, অত্যল্প কালের মধ্যেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই পৃথিবীর তাবৎ পদার্থই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। সংসারের প্রক্ষালন কাল উপস্থিত হইতেছে, আপনার যাহা হিতকর, তাহাই অদ্য আপনাকে জানাইতেছি। স্থাবর জঙ্গম এবং বৃক্ষপাষাণাদি সমন্বিত সর্ব্বসৃষ্টিরই দারুণ কাল উপস্থিত হইতেছে। আপনি রজ্জু সমাবৃত দৃঢ় একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইবেন এবং সপ্তর্ষিগণের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করিবেন। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ যে সকল বীজের কথা কহিয়াছেন, সেই নৌকায় সেই সকল বীজই তুলিয়া সাবধানে পৃথক্ পৃথক্ রক্ষা করিবেন। নৌকায় উঠিয়া আপনারা আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন; আমি শৃঙ্গধর হইয়া আবির্ভূত হইব এবং তাহা দেখিয়াই আমাকে চিনিতে পারিবেন। আপনাকে সকলই বলিলাম, আপনি এইরূপ করিবেন, এখন আমি চলিলাম। সেই প্রলয়ের মহাজল রাশি আমার সাহায্য ভিন্ন কেহই পার হইতে পারে না। আপনি আমার এই বাক্যে সংশয় করিবেন না।' মনু এই কথা শুনিয়া 'এই প্রকারই করিব' এই উত্তর প্রদান করিলে পর উভয়ে পরস্পর পরস্পরের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

নিদেশে হি ময়া তুভ্যং স্থাতব্য মনসূয়য়া।
বৃদ্ধিংহি পরমাপ্রাপ্তা ত্বৎকৃতেহিমহ্যাহনঘ ॥ ২০ ॥
এবমুক্তো মনুর্মৎস্যমনয়দ্ ভগবান্ বশী।
নদীং গঙ্গাং তত্র চৈবং স্বয়ং প্রাক্ষিপদচ্যুতঃ ॥ ২১ ॥
স তত্রববৃধে মৎস্যঃ কিঞ্চিৎকাল মারিন্দম।
ততঃ পুনর্মনুং দৃষ্ট্বা মৎস্যো বচনমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥
গঙ্গায়াং হি ন শক্নোমি বৃহত্ত্বাচ্চেষ্টিতুংপ্রভো।
সমুদ্রং নয়মামাশু প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥ ২৩ ॥
উদ্ধৃত্য গঙ্গাসলিলাত্ততো মৎস্যং মনুঃ স্বয়ম্।
সমুদ্রমনয়াৎ পার্থ তত্রৈচনমবাসৃজৎ ॥ ২৪ ॥

তাহার পর মনু মহারাজ মৎস্যের বাক্যানুসারে সর্ব্বপ্রকার বীজ সংগ্রহ করত সুন্দর নৌকায় চড়িয়া সেই মহোর্ম্মিময় সমুদ্রে ভাসমান হইলে এবং সেই মৎস্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনু মহারাজ চিন্তিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মৎস্য শৃঙ্গধর বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। মনু মহারাজ (মৎস্যের পূর্ব্ব কথিত) শৃঙ্গধর বেশী পর্ব্বতাকার সেই মৎস্যবরকে অগাধ সমুদ্রে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার মস্তকস্থ শৃঙ্গের সহিত রজ্জু দ্বারা নৌকাকে বাঁধিলেন। রজ্জুদ্বারা নৌকার সহিত বদ্ধ হইয়া

সুমহানাপি মৎস্যস্তুসমনোর্যতস্তদা।
আসাদ্ যথেষ্টহার্য্যশ্চ স্পর্শ গন্ধসুখশ্চবৈ ॥ ২৫ ॥
যদা সমুদ্রেপ্রক্ষিপ্তঃ স মৎস্যোমনুনা তদা।
তত এনমিদং বাক্যং স্ময়মান ইবাব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥
ভগবন্ হি কৃতারক্ষা ত্বয়াসর্ব্বা বিশেষতঃ।
প্রাপ্তকালস্তু যৎকার্য্যং ত্বয়াতচ্ছ্রূয়তাংমম ॥ ২৭ ॥
অচিরাদ্ ভগবন্ ভৌমমিদং স্থাবরজঙ্গমম্।
সর্ব্বমেব মহাভাগ প্রলয়ং বৈ গমিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
সংপ্রক্ষালন কালোঽয়ং লোকানাং সমুপস্থিতঃ।
তস্মাত্ত্বাং বোধয়াম্যদ্য যত্তেহিতমনুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥
এসানাং স্থাবরাণাং চ যচ্চেঙ্গং যচ্চনেঙ্গতি।
তস্য সর্ব্বস্যসংপ্রাপ্তঃ কালঃ পরম দারুণঃ ॥ ৩০ ॥
নৌশ্চ কারয়িতব্যা তে দৃঢ়াযুক্তবটারকা।
তত্র সপ্তর্ষিভিঃ সার্দ্ধমারুহেথা মহামুনে ॥ ৩১ ॥
বীজানাং চৈব সর্ব্বানি যথোক্তানি দ্বিজৈঃপুরা।
তস্যামারোহয়ের্নাব সুসংগুপ্তানি ভাগশঃ ॥ ৩২ ॥
নৌস্থশ্চ মাং প্রতীক্ষেথা স্ততো মুনিজনপ্রিয়।
আগমিষ্যাম্যহং শৃঙ্গী বিজ্ঞেয় স্তেন তাপসা ॥ ৩৩ ॥
এবমেতত্ত্বয়া কার্য্যমাপৃষ্টোঽসি প্রজাম্যহম্।
তা ন শক্যা মহত্যো বৈ আপস্তর্ত্তুং ময়াবিনা ॥ ৩৪ ॥
নাভিশংক্য মিদং চাপি বচনং মে ত্বয়াবিভো।
এবং করিষ্য ইতি তং স মৎস্যং প্রত্যভাষত ॥ ৩৫ ॥
জগ্মতুশ্চ যথা কামমনুজ্ঞাপ্য পরস্পরম্।

সেই মৎস্য প্রবর বেগে সেই নৌকাকে টানিয়া লবণ সমুদ্রে লইয়া গেলেন এবং তিনি সেই নৌকার দ্বারা মনু ও সপ্তর্ষিগণকে সমুদ্রে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যশীল এবং জলরাশির উচ্ছ্বাসে মহা গর্জ্জনকারী সেই মহাসমুদ্রে সেই নৌকা মহাবায়ু বেগে পুনঃ পুনঃ কম্পিত এবং চপলা ও মত্তা নারীর মত ঘুরিতে লাগিল। সেই মহা বিপৎকালে আকাশ ও স্বর্গ সকলই জলময় হইয়াছিল এবং ভূমি অথবা দিগ্‌বিদিক কিছুই প্রকাশ পায় নাই; তখন, কেবল মনু, সপ্তর্ষিগণ এবং মৎস্যকেই দেখা যাইতেছিল। সেই মহা জলরাশির মধ্যে সেই মৎস্য বহুবৎসর ধরিয়া সেই নৌকাকে সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরে মৎস্য সেই নৌকাকে টানিয়া হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গের নিকট লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে মনু ও সপ্তর্ষিগণকে বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র এই হিমালয়ের শৃঙ্গে এই নৌকাকে বাঁধিয়া ফেল।' তখন ঋষিগণ মৎস্যের সেই বাক্য শুনিয়া শীঘ্রই নৌকাকে হিমালয়ের শৃঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিলেন; সেই শৃঙ্গ অদ্যাপি 'নৌবন্ধন' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তাহার পর সেই মৎস্য ঋষিদিগকে বলিলেন, 'আমিই প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞাতব্য নাই; আমি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আপনাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম। এই মনু এক্ষণে দেব, অসুর এবং মনুষ্যাদি সহিত সমুদয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিবেন।'"

ততোমনুর্মহারাজ যথোক্তং মৎস্যকেন হ ॥ ৩৬ ॥
বীজান্যাদায় সর্ব্বাণি সাগরং পুপ্লুবে তদা।
নৌকয়া শুভয়া বীর মহোর্ম্মিণমরিন্দম ॥ ৩৭ ॥
চিন্তয়ামাস চ মনুস্তং মৎস্যং পৃথিবী পতে।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা মৎস্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ৩৮ ॥
শৃঙ্গী তত্রাজগামাশু তদা ভরতসত্তম।
তং দৃষ্ট্বা মনুজব্যাঘ্রমনুর্মৎস্যং জলার্ণবে ॥ ৩৯ ॥
শৃঙ্গিণং তং যথোক্তেন রূপেণাদ্রি মিবোচ্ছ্রিতম্।
বরাটকময়ং পাশমথ মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি ॥৪০॥
মনুর্মনুজশার্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ।
সংযতস্তেন পাশেন মৎস্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥৪১॥
বেগেন মহতা নাবং প্রাকর্ষল্লবণাম্ভসি।
স চ তাং স্তারয়ন্নাবা সমুদ্রং মনুজেশ্বর ॥৪২॥
নৃত্যমান মিবোর্ম্মীভির্গর্জ্জমান মিবাম্ভসা।
ক্ষোভ্যমানা মহাবাতৈঃ সা নৌ তস্মিন্ মহোদধৌ ॥৪৩॥
ঘূর্ণতে চপলে বস্ত্রী মত্তা পরপুরঞ্জয়।
নৈবভূমির্ন চ দিশঃ প্রদিশো বা চকাশিরে ॥৪৪॥
সর্ব্বমাম্ভ সমেবাসীৎ খং দৌশ্চ নরপুঙ্গব।
এবং ভূতে তদা লোকে সংকুলে ভরতর্ষভ ॥৪৫॥
অদৃশ্যন্ত সপ্তর্ষয়ো মনুর্মৎস্য স্তথৈবচ।
এবং বহু বর্ষগণাং স্তাংনাবং সোহম মৎস্যকঃ ॥৪৬॥
চকর্ষা তন্দ্রিতো রাজং তস্মিন্ সলিল সংচয়ে।
ততো হিমবতঃ শৃঙ্গং যৎপরং ভরতর্ষভ ॥৪৭॥
তত্রাকর্ষ ততো নাবং স মৎস্যঃ কুরুনন্দন।
অথা ব্রবীত্তদা মৎস্য স্তানৃষীন প্রহসন্ শনৈঃ ॥৪৮॥
অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মাচিরম্।
সা বদ্ধা তত্রতৈ স্তূর্ণ মৃষিভির্ভরতর্ষভ ॥৪৯॥
নৌর্ম্মৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা।
তচ্চ নৌবন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরম্ ॥৫০॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, ১৮৭ অধ্যায়।

মহাভারতের এই আখ্যানের বক্তা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, শ্রোতা রাজা যুধিষ্ঠির। এই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়াই "মৎস্যপুরাণ" আরম্ভ হইয়াছে, মৎস্যপুরাণের বর্ণনাও প্রায় একই প্রকার, সুতরাং তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। এই আখ্যানকেও মহাভারতকার "মৎস্যপুরাণ" বলিয়াছেন। *

সৃষ্টির পরে জলপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থের ধ্বংস প্রাপ্তির ও বৈবস্বত মনুর দ্বারা সকলের বীজ রক্ষার আখ্যান আর্যশাস্ত্রগ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিষয় স্থূলতঃ উল্লিখিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে, অর্থাৎ প্রাচীন কালডিয়া দেশের, প্যালেষ্টাইনের এবং আরবের শাস্ত্রগ্রন্থেও প্রায় এইরূপ আখ্যানই পাওয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের হিব্রু অথবা য়াহুদী জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাতন বাইবেলে এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে জলপ্লাবন সম্বন্ধে যে প্রাচীন উপাখ্যান পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা ক্যালডিয়া দেশের প্রাপ্ত বিবরণ অনেক প্রাচীন। আমরা প্রথমতঃ ক্যালডিয়ার কথাই কহিতেছি।

"সৃষ্টির প্রথম হইতে জলপ্লাবনের সময় পর্য্যন্ত ৬, ৯১, ২০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল বলিয়া প্রাচীন ক্যালডিয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী বিশ্বাস করিতেন। এই জলপ্লাবনের সময়ে "সামাষ নপিষ্টিম" (জীবনের সূর্য) নরপতি "সুরিপ্পক" (জাহাজের নগর) নামক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই জলপ্লাবনে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই বিনষ্ট হইয়াছিল কেবল এই রাজা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই রাজা "য়া" দেবের কৃপার বলে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তিনিই পরে এই কথা তাঁহার এক বংশধরের নিকট বিবৃত করিয়া যান। ক্যালডিয়ার ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত কীলরূপা লিপি-লিখিত ইষ্টক ফলক হইতে পণ্ডিতেরা এই আখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন। একদা দেবগণ রুষ্ট হইয়া পৃথিবীর নরনারীদিগকে সমূলে নির্মূল করার প্রস্তাব করেন; সদয় হৃদয় "য়া" দেব ইহা জানিতে পারিয়া এই গুহ্য কথা "সামাষ" নপিষ্টিন রাজার নিকট ক্রমে প্রকাশ করেন। দেবগণের গোপনীয় কথা মানুষের কাছে কহিয়া দেওয়া উচিত নহে, তজ্জন্য "য়া" দেব দেওয়াল এবং বেড়াকে সম্বোধন করিয়া বলি'ত থাকেন, 'ওহে বেড়া! ওহে বেড়া! ওহে দেওয়াল! ওহে দেওয়াল! বেড়া শুন, শুন দেওয়াল বেশ করিয়া বুঝ! সুরিপ্পক নগরের মনুষ্য, উবর টুটুর পুত্র (সামষনপিষ্টিম), তুমি একটি কাঠের ঘর তৈয়ার কর, একখানা জাহাজ বানাও, তোমার ধন সম্পত্তি ছাড়িয়া যাও, প্রাণ বাঁচাও, যথা সর্ব্বস্ব ফেলিয়া দাও, জীবন রক্ষা কর, এবং ঐ জাহাজে জীবনের সকল বীজ তুলিয়া রাখ। যে জাহাজ তুমি বানাইবে, তাহার লম্বাই চৌড়াই আদি যেন ঠিক ঠিক মাপ করা হয়, ইহার আকার এবং পরিমাণ বেশ ভাল হিসাব করিয়া করা হয়, তাহার পর সমুদ্রে ভাসাইয়া দাও।' * রাজা 'য়া' দেবের কথা বুঝিলেন এবং তাঁহার কথামত কাজ করিলেন। জাহাজ গড়ার কাজ দ্রুতবেগে চলিল; জাহাজের খোল ১৪০ হাত লম্বা এবং পাটাতন ১৪০ হাত বিস্তৃত করিয়া প্রস্তুত হইল এবং পিচ ও শিলাজতু দিয়া যোড়ের সব জায়গা বেশ করিয়া

খ্যাতমদ্যাপি কৌন্তেয় তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।
অথা ত্রবাদনিমিষন্তানৃষীন্ সহিত স্তদা ॥৫১॥
অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা মৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ং চ ময়া স্মান্ মোক্ষিতা ভয়াৎ ॥৫২॥
মনুনা চ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদেবাসুর মানুষাঃ।
স্রষ্টব্যাঃ সর্ব্বলোকাশ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥৫৩॥"
(বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, ১৮৭ অধ্যায়।)

"ইত্যেতন্ মাৎস্যকং নাম পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৭॥"

---

* Prof. Maspero's "The Dawn of Civilisation"—Chapter VII pp. 564—572. "He (Ea) confided to a hedge of reeds the resolution that had been adopted: 'Hedge, hedge, wall, wall! Hearken, hedge, and understand wall, wall! Man of Shurippak, son of Ubaratutu,

বুঝাইয়া দেওয়া হইল। জাহাজ প্রস্তুত করা হইলে উৎসব করা হইল এবং তৎপরে উহাকে জলে ভাসান হইল। রাজা বলিতেছেন, 'আমার যাহা কিছু ছিল, আমার যাহা কিছু সোনারূপার জিনিষ ছিল, সব সেই জাহাজে বোঝাই দিলাম ; সমস্ত শ্রেণীর প্রাণীর জীবনের বীজ যত সংগ্রহ করিতে পারিলাম, সব জাহাজে তুলিলাম ; আমার পরিবারবর্গ, চাকর চাকরাণী, ভূচর গ্রাম্য ও অরণ্য জন্তু সব একত্রে জাহাজে লইয়া গেলাম। সূর্য্য আমাকে একটি সংকেত বলিয়া দিয়াছিলেন. 'যে দেবতা বারিবর্ষণ করান, যখন সন্ধ্যায় তিনি অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি করাইবেন, সেই সময় জাহাজে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিও.' এই সংকেত বাক্যসকল হইল, এক রাত্রিতে বৃষ্টির দেবতা অত্যন্ত বৃষ্টি করিলেন ; আমার ভয় হইতে লাগিল, বুঝি আর প্রভাত হইবে না. বুঝি আর সূর্য্যালোক দেখিতে পাইব না। আমি জাহাজে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম, এবং যাহাতে জাহাজ ঠিক ঠিক চলে সেই জন্য সেই বৃহৎ তরণী এবং তাহার সমস্ত ভার দেবতার হাতে সঁপিয়া দিলাম।" *

"যেমন উষার আলোক আরম্ভ হইল, অমনি আকাশের নিম্নভাগ (ভিত্তি) হইতে এক কাল মেঘ উঠিল। পবনদেব উহার বক্ষের উপর গর্জ্জন করিতে লাগিল, নিবো এবং মর্দক দেব দৌড়িতে লাগিলেন, যেন দুইজন সিংহাসন বহনকারী শৈল এবং উপত্যকার উপরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঐ জাহাজ যে স্তম্ভে বাঁধা ছিল, মহতী নেরা দেবতা উহাকে তুলিয়া ফেলিয়া দিল" † ক্রমশঃ বিদ্যুতের আভায় এবং ঔজ্জ্বল্যে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, পবনের ঝঞ্ঝাবায়ু আকাশের মাথায় চড়িল, আলোক অন্ধকারে পরিণত হইল, পৃথিবী জলমগ্ন হইয়া হ্রদে পরিণত হইল। সমস্তদিন ধরিয়া বাত্যার বেগ বাড়িতে লাগিল, সমতল ভূমি এবং সমুচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া ঝড় চলিতে লাগিল, সৈন্যের বেগের মত বায়ু আসিয়া মানুষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, মানুষে আর মানুষকে চিনিতে পারিল না,—ভাইও ভাইকে দেখিতে পাইল না। স্বর্গে দেবগণও প্লাবনের

---

construct a wooden house, build a ship, abandon thy goods, seek life; throw away thy possession, save thy life, and place in the vessel all the seed of life. The ship which thou shalt build, let its propertions be exactly measured, let its dimensions and shape be well arranged, then launch it in the sea." Ibid p. 567. "Shamashnapishtim" means "Sun of life" Ibid p. 566 Foot note 3.

* "All that I possessed I filled the ship with it, all that I had of silver, I filled it with it; all that I had of gold, I filled it with it, all that I had of the seed of life of every kind I filled it with it; I caused all my family and my servants to go up into it; beasts of the field, wild beasts of the field, I caused them to go up all together. Shamash had given me a sign: 'when the God who rules the rain in the evening shall cause an abundant rain to fall, enter into the ship and 'close thy door.' The sign was revealed; the God who rules the rain caused to fall one night an abundant rain. The day, I feared its dawning; I feared to see the day light; I entered into the ship and I shut the door; that the ship might be guided, I handed over to Buzur-Bel, the pilot, the great ask and its fortunes." Ibid p. 568.

† "As soon as the morning became clear, a black cloud arose from the foundations of heaven. Ramman (wind god) growled in

ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন ।‡..............."সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, এবং প্লাবন ও দুর্য্যোগ চলিতে লাগিল। সপ্তমদিন উষাকালে ঝড়বৃষ্টি একটু কম পড়িল; প্লাবন, যাহা আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের মত যুদ্ধ করিতেছিল, থামিল; সাগরও শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং ঝঞ্জাবায়ুও অন্তর্হিত হইল,--প্লাবন শেষ হইল। আমি চক্ষু মেলিয়া সমুদ্র দেখিলাম, উচ্চৈস্বরে ডাকিলাম, কিন্তু মানবজাতি একেবারে মাটিতে মিশাইয়া গিয়াছে, ক্ষেত্র অথবা অরণ্য কিছুই চিনিবার যো ছিল না। .. দ্বাদশদিনের অবশেষ কালে, জলের মধ্য হইতে একটু ভূমি বাহির হইল, জাহাজ "নিসির" ভূমি স্পর্শ করিল; "নিসিরের" পর্ব্বত জাহাজের গতি রোধ করিল এবং আর উহাকে ভাসিতে দিল না।

ক্রমশঃ— শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

its bosom; Nebo and Marduk ran before it—ran like two throne-bearer over hill and dale. Nera the Great tore up the stake to which the ark was moored." Ibid p. 568 (The author remarks in the foot note that the meaning of this is not clear).

‡ "Ninib came up quickly; he began the ateack; the Anunnaki raised their torches and made the earte to tremble at their brilliancy; the tempest of Ramman scaled the heaven, changed all the light to darkness, floaded the earth like a lake. For a whole day the hurricane raged, and blew violently over the mountains and over the country; the tempest rushed upon men like the shook of an army, brother no longer beheld brother, men recognized each other no more. In heaven, the gods were afraid of the deluge." Ibid pp. 568—569.

সাহিত্য-সংবাদ।

পাবনা কিশোরীমোহন ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর অষ্টম বার্ষিক উৎসব সম্মিলনী উপলক্ষে যিনি নিম্নলিখিত বিষয়ে বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিবেন তাঁহাকে এই পদক প্রদত্ত হইবে। সকল শ্রেণীর লেখক বা লেখিকা এই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন।

১। বীণাপাণি রৌপ্যপদক—

দাতা:—শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ।

(৫ম বর্ষ)

বিষয়:—(ক) বঙ্গসাহিত্যে বাংলার সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের ক্রম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অথবা (খ) আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য জীবনের সামঞ্জস্য।

২। সুবর্ণনন্দিনী রৌপ্যপদক—

দাতা:—শ্রীগিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার।

(১ম বর্ষ)

বিষয়:—(ক) গ্রাম্য কবিতা ও গ্রাম্য-গীতি অথবা (খ) বঙ্গীয় নারী-সাহিত্যিক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি।

প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। আগামী ১৩২৮ সালের ২০শে চৈত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। যিনি উক্ত পদক প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় নকল রাখিয়া পাঠাইবেন কারণ প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

জ্ঞানদাসুন্দরী স্বর্ণপদক (১ম বর্ষ)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ মহাশয় আর একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবেন। যিনি কোন বিপন্ন জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াও আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে তাহার জীবন রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে এই পদক প্রদত্ত হইবে। অবশ্য এই কার্য্যের উপযুক্ত প্রমাণ আগামী ১৩২৮ সালের ২০শে চৈত্রের

মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যিনি পদক প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীগিরিজাশঙ্কর জোয়ার্দ্দার,
কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, পাবনা।
শ্রীপঞ্চাননচরণ ভৌমিক, বি-এল, সেক্রেটারী,
কিশোরীমোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, পাবনা।

বিন্ধ্যাচল দর্শন।

সারাটা জীবন ভ্রমণের উনপঞ্চাশ বায়ু আমার মাথায় ঘুরিতেছে, তাই যদি কোন বৎসর দৈব কারণে ভ্রমণে বাহির হইতে না পারিলাম, তবে যেন সে বৎসরটা কষ্টে কাটাইতে হয়। অর্থব্যয় ও পথক্লেশকে ত গ্রাহ্যই করি না। বিন্ধ্যাচলে আমি কয়েকবার গিয়াছি। প্রথমবারে যখন গিয়াছিলাম, মোগলসরাই হইতে মেলট্রেনে মির্জাপুর নামিয়া কোন বাঙ্গালী বাবুর গৃহে সে বেলাটা কাটাইয়া বিকালে একা সহযোগে বিন্ধ্যাচল গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে নিদৃষ্ট কোন পাণ্ডা আমার ছিল না, কাজেই নূতন পাণ্ডা করিতে হইবে, বাঙ্গালী বন্ধু যে পাণ্ডা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহার গৃহে গিয়াই উঠিলাম। পথে আমাকে পাণ্ডারলোক গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, সাধারণতঃ উহারা রেলষ্টেশনে ট্রেণ যাতায়াতে উপস্থিত থাকে। পাণ্ডাজী আমাকে খুব খাতির যত্ন করিলেন, সেদিন আমার দেবী দর্শন ঘটিল না। শুদ্ধকাল ছিল না সুতরাং কোন পর্ব্বতিথির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এখানে দেবী অষ্টভূজার মূর্ত্তি। পরদিন মধ্যাহ্নাহার করিয়া পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। পাহাড় কাটিয়া এখানে তক্তা করিয়া গৃহ সরঞ্জাম উপযোগী নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। দালানে তীর, বরগা, থাম ইত্যাদি এখানে পাথর দিয়া প্রস্তুত হয়। কাশীতে যত পাথর ও পাথরের বাড়ী দেখিতে পাই তাহা এই পাহাড় হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাহাড়ের উপর সমতল ক্ষেতে মাঝে মাঝে পুকুর ও পাকা বাড়ী প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে জন মানব কেহই বাস করে না। সাধারণতঃ সে সকল বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসীরা বাস করে। পাহাড়ের উপরেও দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের সানুদেশে ঝরণাও আছে। বড় সুন্দর স্থান, নির্জ্জন সুন্দর, ইচ্ছা হয় এখানে কিছুদিন পর্ব্বতোপরি বাস করি। এ স্থান বড় স্বাস্থ্যকর, পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া গঙ্গা স্রোতবেগে প্রবাহিতা হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতসমষ্টি দ্বারাই বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি হইয়াছে।

পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আসিবার সময় এক বাঙ্গালী উদাসিনী রমণীর আশ্রমে গিয়াছিলাম, রমণী কলিকাতার ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন কিন্তু তিনি স্বদেশবাসীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ হিন্দিভাষায় আলাপ করিলেন। রমণীর আশ্রমটী সুন্দর, বিলক্ষণ একটী সুন্দর বাগান বিশেষ—গঙ্গারই উপর, তাহার আশ্রমের নীচে গঙ্গার একটী প্রস্তর আছে তাহাতে নাকি রামচন্দ্র দশরথের পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। এই প্রস্তরোপরি শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন রহিয়াছে। রমণী আমাকে সে দিন তাহার আশ্রমে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু পাণ্ডাজীর লোক সঙ্গে থাকায় তাহারই অনুরোধে ফিরিয়া আসিতে হইল। পরদিন প্রাতে পঞ্জিকা দেখিয়া বুঝিলাম শীঘ্র পর্ব্বতিথি নাই সুতরাং সেই দিনই আহারান্তে অন্যত্র চলিয়া গেলাম, দেবী দর্শন আর ঘটিল না।

তার পর পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময় পুনরায় বিন্ধ্যাচল যাইতে হইয়াছিল। কাশী হইতে গিয়াছিলাম। কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল খুব বেশী দুর নহে। এ বার গিয়া তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া দেবী দর্শন

করিলাম। প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি বহু প্রাচীন, এখানেই দেবীযুদ্ধ হইয়াছিল—যাহা দেবাশুরের যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। এ দেবীর অপর নাম বিন্ধ্যবাসিনী—এখানে এক ছাগশিশু ক্রয় করিয়া মায়ের পূজা দিলাম। তখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বাস্থ্যলাভার্থ বিন্ধ্যাচল বাস করিতেছিলেন। তখন কলিকাতায় রেজেষ্ট্রার ৺ প্রতাপচন্দ্র ঘোষও সেখানে বাস করিতেছিলেন। এই দুইজন আত্মীয় পরিচিত বাঙ্গালী তথায় থাকায় তাঁহাদের সঙ্গে নানা কথায় সময় কাটিত ভাল। অসুবিধা বোধ করিলেই মুজাপুর চলিয়া যাইতাম, সেখানে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন। মির্জ্জাপুর জেলার সদর ষ্টেসনে মির্জ্জাপুর সহর, উহা বিন্ধ্যাচল হইতে চারি মাইল মাত্র রেলে ও একায় যাওয়া যায়। মির্জ্জাপুরে একজন বাঙ্গালী পাথরের ব্যবসা করিয়া খুব বড়লোক হইয়াছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের ও রাজরাজরাদের পাথরের দ্রব্য সরবরাহের ঠিকাদার। আমরা যে সকল পাথর সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাই বিন্ধ্যাচলের, পাথরগুলি লাল, সাদা বা কালো পাথর এখানে জন্মে না। নিকৃষ্ট পাথর হইলেও ইহা সর্ব্বদা নিত্য সাধারণ ব্যবহার্য্য। মির্জ্জাপুরে লাহার কারবার আছে, লাহার পোকা পালন করিয়া লাহা প্রস্তুত করা হয়। লাহা কেমন করিয়া হয় আগে জানিতাম না। এখানে লাহার কারখানায় গিয়া সব দেখিয়াছি। মির্জ্জাপুর গালিচা ও শতরঞ্চের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে খুব ভাল গালিচা ও শতরঞ্চ প্রস্তুত হয়। আগে এখানে ফটিক অর্থাৎ কাচের ব্যবসা ছিল, এখন বিলাতি হালকা জিনিষের আমদানীতে সে ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে যে একটী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে তাহার সম্পাদকের সহিত পরিচয় হওয়ায় মির্জ্জাপুর গেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতাম। এখানে দেশীয় লোকেরা বহুদিন যাবত তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে কাপড় বেস মজবুত ও কিঞ্চিৎ অল্প মূল্যের। মির্জ্জাপুরে বাসন প্রস্তুতের কারখানাও আছে। তামা, পিতল, কাসার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। আহার্য্য দ্রব্য এখানে সস্তা, গঙ্গার জলে বেস পরিপাক হয়, হাওয়া বেস স্বাস্থ্যকর।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ,



প্রতিভা

১১শ বর্ষ পৌষ ১৩২৮ ৯ম সংখ্যা

পাণিনীয়যুগে ভারতীয় পণ্য।

(রাজসহা কলেজ এসোসিয়েশনে পঠিত)

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমতঃ আমরা পাণিনীয় যুগের কাল নিরূপণের চেষ্টা করিব, পরে সেই সময়কার পণ্যের বিষয়ে আলোচনা করিব।

'আমাদের প্রাচীনত্বের এলাকা' প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ খৃঃ পূঃ ৩৮,৯১,১০২ অব্দের পর্য্যন্ত তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও দেখাইয়াছি যে, আলেক্‌জেন্দারের আক্রমণকাল হইতে খৃঃ পূঃ ১৮৫০ অব্দ পর্যান্ত ভারতের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন যে একেবারে অসম্ভাব্য, তাহা নহে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় দুইটী বিষয় অপরিহার্য্য ;—

প্রথম—গ্রীক্ আক্রমণ খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ।

দ্বিতীয়—বুদ্ধদেবের তিরোভাব খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যদি খরবোলা শিলালিপি সত্য হয় তবে বুদ্ধদেবের তিরোভাব উক্ত খৃঃ পূঃ ৪৮৭ সনে না হইয়া খৃঃ পূঃ ৫৭৭ সনে (অর্থাৎ ৯০ বৎসর পূর্ব্বে) হইবে, এবং বুদ্ধদেবের আয়ুষ্কাল বাবদে অন্ততঃ ৮০ বৎসর কাল সেই সঙ্গে যোগ করিলে বুদ্ধদেবের জন্ম সাল খৃঃ পূঃ ৬৫৭ অব্দ হইয়া পড়িবে।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' 'অরুণদ্ যবনো মধ্যমিকাম্' (P. 3. 2. 111) এই দুইটী বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়—এই সাকেত বর্ত্তমান অযোধ্যার দক্ষিণে কোন নগর ছিল এবং উহা অমরের 'সাকেতঃ স্যাদ্ অযোধ্যায়াং' নহে। মধ্যমিকা ও বর্ত্তমান চিতোরের ১১ মাইল উত্তরে একটী নগরী ছিল। ('Cunninghams' Reports).

প্রত্নবিদ্‌গণের মতে এই যবন শব্দের অর্থ গ্রীক্ মিনান্দার। কথিত আছে, ইনি বৌদ্ধধর্ম্মেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং 'মিলিন্দ পঞহো' নামক বৌদ্ধ

ইহাঁরই প্রশ্নমূলক। এইরূপে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পতঞ্জলির সময়ময় গ্রীক আক্রমণের পরবর্ত্তী। কিন্তু এই 'যবন' শব্দটীকে পাণিনীসূত্রেই পাওয়া যায় (৪,১,৪৯) এবং এই 'যবন' শব্দটীর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ একটী স্পর্দ্ধিক প্রতিস্পর্দ্ধিকা চলিয়া আসিয়াছে। বেবার, ম্যাক্‌স্‌মূলার, ভি, এ, স্মিথ, ম্যাগডনেল এক বাক্যে বলিতেছেন যে, পাণিনি সূত্রে যবন শব্দটীর অর্থ গ্রীক; আবার গোল্ড ষ্টুকার, ভাণ্ডারকার, রাজেন্দ্রলাল সমস্বরে বলিতেছেন যে, ঐ 'যবন' শব্দের অর্থ কাম্বোজ গান্ধার প্রভৃতি জাতির ন্যায় কোনও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতি। (বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামমর্ষণাৎ।) বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কলহে ত্রিশঙ্কু রাজার অন্তরাল স্বর্গে অবস্থিতির ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই 'যবন' শব্দটীর অবস্থা ঠিক্ তদ্রূপই বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ যবন শব্দের অর্থ গ্রীক্ এই বাদটী পরাস্ত বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। এইরূপ নবীনচন্দ্রের 'যবন' শব্দের অর্থও সাধারণতঃ লোকে যাহা মনে করিয়া থাকেন, তাহা অশাস্ত্রীয় বটে।

কেহ কেহ সংস্কৃত নাটকের 'যবনিকা' শব্দেও গ্রীক্ গন্ধ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এই নাট্য 'যবনিকা' গ্রীক্ নাট্য শাস্ত্র হইতে ধার করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চে আদৌ কোনও রূপ পট বা যবনিকা ছিল কি না, সে বিষয়ে অদ্যাপি মনীষিগণের ঘোর সন্দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। (Encyclopaedia Britannica).

যে সমুদয় হেতুর উল্লেখ করিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাশ্চাত্য যবন বাদটীর খণ্ডন করিয়াছেন তাহাতে বেবার তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই বটে, তিনি কোনও নূতন প্রতিকূল প্রমাণেরও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, 'যবন' শব্দের কোনও অর্থ পাণিনি স্বয়ং দেন নাই, 'যবন' শব্দে যে কোনও ব্রাত্যক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেই পারে না, 'গ্রীক্'কেই বুঝাইবে তাহার কোনও প্রমাণ তিনি দেন নাই। কেবল তৎপরবর্ত্তী বার্ত্তিককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে 'যবনানী' শব্দের অর্থ যবন লিপি বা গ্রীক্ আল্‌ফাবেট।

কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া খ্যাত। তাঁহার শকুন্তলা ও রঘুবংশ এই উভয় কাব্যেই 'যবনী'র উল্লেখ আছে, ম্যাকডনেল্ বলেন ইহারা যবন-নারী। এখনে বক্তব্য এই যে, গ্রীক্ আক্রমণের কাল খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী, আর কালিদাসের কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী, এই ৮ শতাব্দী ভরিয়া যে, গ্রীক্ যবন-নারী ভারতে ছিল তাহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং মনে হয় যে, এই যবনও কোন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। 'যবন' শব্দের মত বহু ক্ষত্রিয় জাতির নাম মহাভারতের অনুশাসন, দ্রোণ ও শান্তি পর্ব্বে উল্লিখিত আছে। একমাত্র শব্দ সাদৃশ্য দেখিয়া কেবল এই যবন শব্দের অনুরোধেই পাণিনিকে আলেকজেন্দারের পরবর্ত্তী স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কারণ, কেবল যে, আলেকজেন্দারের সময় হইতেই ভারতের সঙ্গে গ্রীসের সম্বন্ধ প্রথম সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না। হোমারের কাব্য পাঠে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ৮৫০ অব্দে গ্রীস দেশে ভারত প্রসূত দ্রব্য জাত ব্যবহৃত হইত।

বস্তুতঃ জিগীষু আলেকজেন্দার ভারতবর্ষে মাত্র ১৯ মাস কাল যাপন করিয়াছিলেন। সে সময়েও তিনি রাজ্য বিস্তার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, ভারতীয় সমাজ সংস্কার বা ভারত সমাজ বক্ষে কোনরূপ গ্রীস রীতিনীতি প্রবর্ত্তন বিষয়ে তিনি কটাক্ষ পাত করিবার অবসর পান নাই। প স্ব. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, গ্রীক্‌গণ তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিতেন। এমন কি, প্রাচ্যদিগের বলবীর্য্যের কথা শুনিয়া আলেকজেন্দারের সহচরগণ ভীত হইয়াছিলেন। ভারতের যে সমুদয় স্থান আলেকজেণ্ডার বশে আনিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর ২০ বৎসর মধ্যেই তদীয় সেনাপতি সেলুকস্ সে সমুদয় রাজ্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের হস্তে প্রত্যর্পণ

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এমন কি, কাবুল কান্দাহার হিরাট্ প্রভৃতি আরিয়ানার অধিকাংশ ভূখণ্ড মৌর্য্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। হিন্দুকোষ পর্ব্বত গ্রীক্ রাজ্য (বাহ্লিক্যা) এবং মৌর্য্য রাজ্যের সীমানা ছিল। স্বদেশ প্রিয় মৌর্য্য যে, গ্রীক্ দেশীয় কোন রীতিনীতি স্বরাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। ভারতবাসিরা কদাপি গ্রীক্ দেশীয় বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই, বরং পার্শ্ববর্ত্তী পারস্য জাতি হইতেই কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে। (Megasthens) খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক্ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ হয়, আর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ বা শক রাজত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই চারি শতাব্দী কাল মধ্যে ভারত কোনও প্রকারে গ্রীক্ ভাবাপন্ন হয় নাই। (Smith) একমাত্র 'যবন' শব্দটী ব্যতীরেকে পাণিনিতে গ্রীক্‌দের আর নাম গন্ধও নাই। অথচ এই শব্দটীর বলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে পাণিনির সমসময় খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দ হইবে। খৃঃ পূঃ ৩৬১ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ প্রায় ২০২ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে নন্দ ও মৌর্য্যবংশীয় রাজন্যগণ রাজত্ব করিয়াছেন। পাণিনিতে নন্দ বা মৌর্য্য বংশের ঘুণাক্ষরেও কোন উল্লেখ নাই অথচ গ্রীক্ যবন শব্দটীর উল্লেখ থাকিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। ইত্যাদি কারণে আমাদের বিশ্বাস পাণিনীয় যুগ প্রাগ্‌খ্রীষ্টীয় বটে।

৮।২।৫০, ২।১।৭০ পাণিনিসূত্রে 'নির্ব্বাণ' ও 'শ্রমণা' শব্দের উল্লেখ পাইয়া প্রতীচ্য মনীষিগণ পাণিনিকে প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগীয় মনে না করিয়া অতি বৌদ্ধযুগীয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে এ বিষয়েই একটু আলোচনা করিব।

মৌর্য্যপৌত্র অশোক খৃঃ পূঃ ২৭২ সালে সিংহাসন আরোহণ করেন। আফগানিস্থান (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে সুবাস্তু) বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর উপত্যকা, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশ অশোকের সাম্রাজ্যান্তঃপাতী ছিল। ইনি সিরিয়া, ইজিপট্, ত্রিপোলী মেসিডনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ক্ষণস্থায়ী নন্দবংশের রাজধানী পূর্ব্বদেশে ছিল, গন্ধারবাসী পাণিনি নন্দবংশীয়দের কথা নাও জানিতে পারিতেন কিন্তু পুরাণ বিশ্রুত শিশু নাগবংশীয় রাজন্যগণ খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ৪০১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই কীর্ত্তিশালী ছিলেন।" (V. A. Smith)। বিম্বিসার মগধরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, নিজ সিংহাসন দৃঢ়ীকরণ মানসে ইনি কোশল কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র অজাতশত্রু নিজ বাহুবলে সমগ্র কোশল রাজ্যকে স্বরাজ্যভুক্ত করেন। উদয় পাটলীপুত্রের প্রতিষ্ঠাতা। শিশুনাগবংশের বিবরণ বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। 'পুরাণ' শব্দটী পাণিনিতে আছে। (৪, ৩, ১০৫) বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু, পাণিনিতে এই রাজবংশের কোনও উল্লেখ নাই। অথচ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, গাণ্ডীব, গান্ধারী (৪, ১, ১৬৯) কুন্তী, মাদ্রী, সাম্ব, বৃষ্ণি, পারাশর্য্য (ব্যাস) জনুরন্ধ (অর্থাৎ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র) কুরু, বাসুদেব, কেশব, কৌরব্য, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি বহু নাম পাণিনিতে আছে। 'জনমেজয়' ৩।২।২৮ 'অঙ্গ' ও 'বঙ্গ' শব্দের আভাসও পাণিনিতে পাওয়া যায় ৪।১।১৭০। এদিকে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি শব্দ পাণিনিসূত্রদ্বারা সাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল শব্দ পাণিনিতে নাই, অথচ ভরত সীতা (৪, ৪, ৯১) স্বীর (৪, ৪, ৮১) ঐক্ষ্বাক, কোশল ও কৌশল্য শব্দের উল্লেখ পাণিনিতে আছে। Rhys-davids অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জী, মল্ল, চেত্তী, বংশ, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গন্ধার, কাম্বোজ এই ষোলটী রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মগধ, কাশী, কোশল, কুরু, অশ্বক, অবন্তী, গন্ধার ও কম্বোজ এই আটটী রাজ্যের উল্লেখ পাণিনিতে দেখিতে

পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মহাভারতীয় যুগের পরে এবং উক্তাবশিষ্ট আটটী নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে পাণিনীয় যুগ প্রচলিত ছিল। আর, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পাণিনি চিরন্তন মুনি প্রোক্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৪, ৩, ১০৫)। কাত্যায়ন বলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ও পাণিনির নিকটে একটী পুরাণ বা চিরন্তন মুনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। মিথিলারাজ্য যাজ্ঞবল্ক্যের কর্ম্মভূমি ছিল।

আমাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, পাণিনি একজন ভাষাবিৎ ছিলেন, এবং যে সকল প্রদেশের ভাষায় ভাষাবিজ্ঞানের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়াছিল, তদীয় ব্যাকরণে পাণিনি কেবল সেই সমুদয় প্রদেশেরই নাম স্থান পাইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যে সকল শব্দ লোকমুখে ভূয়ো ভূয় উচ্চারিত হইয়া বিকৃত হইয়াছে, সেই সকল শব্দই ব্যাকরণে স্থান পাইতে পারে। এবং ইহাও সুনিশ্চয় যে, 'সহদেব' নামটী পাণিনিতে নাই, 'পঞ্চাল' নামটীও পাণিনিতে নাই, তজ্জন্যই যে উহারা অতিপাণিনীয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কারণ, সহদেবের নাম ঋগ্‌বেদে প্রসিদ্ধ এবং মহাভারতের মূল ঘটনাটী যজুর্ব্বেদোক্ত কুরু পঞ্চাল কলহে প্রতিষ্ঠিত। (Macdonell)।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, পাণিনি প্রাগবৌদ্ধ যুগীয় লোকই ছিলেন। V. A. Smith সাহেব শিশুনাগ বংশীয় রাজন্যগণের রাজত্বকাল পরিসংখ্যানে প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কাল গড়ে ২৩·৯ বৎসর করিয়া ধরিয়াছেন। শিশুনাগ হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শুনিক এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিপুঞ্জয় হইতে বার্হদ্রথ বংশীয় জয়দ্রথ পর্য্যন্ত ২৯ পুরুষ ক্ষত্রিয়ের নাম বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত আছে। সেই হিসাবে শিশুনাগ রাজার খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের সহিত ২৯ গুণিত ২৩·৯ বা ৬৯৩·১ বৎসর যোগ করিয়া খৃঃ পূঃ ১২৯৩ অব্দকে জরাসন্ধের রাজত্বকাল বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

গন্ধার ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই দেশের মধ্য দিয়া যে কেবল আলেক্‌জেন্দারই ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন এমন নহে। তৎপূর্ব্বে, খৃঃ পূঃ ৫১২ অব্দে পারসিক রাজ ডেরিয়সের সেনাপতি স্কাইলাক্‌স্ গন্ধার দেশে একদল সেনা সুসজ্জিত করিয়া, পঞ্জাবের মধ্যদিয়া নদপথে সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করেন। এই স্কাইলাকসের প্রমুখাৎ সিন্ধুপত্যকার সমৃদ্ধির কথা অবগত হইয়াই ডেরিয়স্ সিন্ধু দেশ বিজয়ে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে পারসিক রাজ জারক্‌সেজের সৈন্যে বহু ভারতীয় যোদ্ধা ছিল। তখনও ভারতীয় ধনুর্দ্ধরগণ বেত্রে নির্ম্মিত ধনু ও লৌহাগ্র বেত্রবাণ ব্যবহার করিতেন। (Syke's Hist. of Persia Vol I. P. 179)

পাণিনির নিবাস গন্ধার দেশে শলাতুর গ্রামে ছিল। ইহা সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। চীন পরিব্রাজক হিউএন্থসঙ্ এই শলাতুর দেখিতে গিয়াছিলেন। পাণিনির 'যবন শব্দে এই পারসিকগণকে বুঝাইবে না, কেবল গ্রীক্ দিগকেই বুঝাইবে, ইহার প্রমাণ অতিশয় ক্ষীণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাণিনি পারশিকদের নাম গন্ধও উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'প্রাচাং' বলিয়া পূর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত গণের এবং 'উদীচাং' বলিয়া উত্তর দেশীয় পণ্ডিতগণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 'প্রতীচাং' বা 'অবাচাং' বলিয়া কোনও পশ্চিম বা দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিতের নাম করেন নাই। পাণিনি পাঠে মনে হয় যে, তিনি এমন এক যুগের পণ্ডিত ছিলেন যে কালে পারসীক ও গ্রীক্ আক্রমণকালের সুদূর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল, যে কালে গন্ধার দেশে চির ব্রহ্মণ্য শান্তি বিরাজ করিত, যে কালে বেদ বেদাঙ্গাদি চর্চ্চার গতি অক্ষুণ্ণ ছিল। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল্ মনে করেন যে মহাভারতের কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের মূল যজুর্ব্বেদোক্ত কুরু পঞ্চাল যুদ্ধ। এই কুরু পঞ্চাল দ্বন্দ্ব মূলক আখ্যায়িকা খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে অঙ্কুরিত হইয়া পরে মহাভারত রূপে পরিণত হইয়াছে।

বাল গঙ্গাধর তিলক (Arctic Home in the Vedas) খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত ব্যাপী যুগকে ভারতের সূত্র ও দার্শনিক যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোল্ড্ ষ্টুকারের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, প্রাতিশাখ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, ঋক্ যজুঃ সাম এবং যাস্ক ভিন্ন প্রায় সকল বৈদিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারেরই পূর্ব্ববর্ত্তী খৃঃ পূঃ ১১০০০—৯০০ অব্দের কবি। (Weber P. 222 & P. 243) বেভেলকরের মতে পাণিনীয় যুগ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী. ভাণ্ডারকারের মতও ইহার অনুকূল। আমাদের বিবেচনাতে পাণিনি এমন এক যুগের ঋষি ছিলেন যখন সংস্কৃত ভাষা ভারতে কথিত ভাষা ছিল এবং যে সময়কে বৈদিক এবং লৌকিক যুগের সঙ্গম স্থল বলা যাইতে পারে। এই যুগ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী হইবে।

পাণিনিতে 'নির্ব্বাণ' (৮৷২৷৫০) শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ মুক্তি অর্থে নহে, নির্ব্বাপিত অর্থে যথা 'দীপো নির্ব্বাণো বাতেন', অগ্নি নির্ব্বাণঃ। পরে উপমাচ্ছলে উহা 'মুনীনাং নির্ব্বাণম্' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ 'শ্রমণা' শব্দটীও পাণিনিতে আছে কিন্তু 'শ্রমণ' ও 'শ্রমণা' শব্দের সন্ন্যাসী অর্থে প্রয়োগ যে বৌদ্ধ যুগেই হইয়াছে এরূপ নহে। বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শ্রমণ শব্দে সন্ন্যাসীকে বুঝাইত, বুদ্ধদেবের সময়েই শ্রমণ শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী ছিল। যখন একদা বুদ্ধদেব রাজ্য পরিদর্শনার্থ রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তিনি পথিমধ্যে একটী 'শমণ' কে দেখিতে পাইলেন। (Beal's Indian Antiquary) তিনি ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার প্রাক্‌কালেই 'শমণ' দেখিতে পাইয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় যে, সংস্কৃত 'শ্রমণ' শব্দটী বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বেই ভারতে প্রচলিত ছিল, 'শমণ' শব্দটী সস্কৃত 'শ্রমণ' শব্দের রূপান্তর মাত্র। শুক্ল যজুর্ব্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণ কাণ্ডে, বৃহদারণ্যকে (৪৷১৷২২) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২৷৭) শ্রমণ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় উহার অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উইল্‌সন্ সাহেবের মতে এই শ্রমণেরাই বাণপ্রস্থ।

পাণিনীয় যুগ নিরূপণ করিতে যাইয়া আমরা কেবল 'নেতি' 'নেতি' করিয়া ব্যতিরেক উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে, পাণিনীয় গ্রন্থে বৌদ্ধ ও গ্রীক সাহিত্যের কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে আমরা তদীয় ভাষ্যকার পতঞ্জলির যুগ আলোচনা করিয়া অন্বয়মুখে একটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সময়ের সীমানা নির্দ্ধারণ করিব, যে সীমানা অতিক্রম করিয়া পাণিনীয় যুগ অর্ব্বাচীনত্বের দিকে কিছুতেই আসিতে পারে না। 'ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ' পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই উদাহরণটী ও মৌর্য্যদিগের উল্লেখ বহুতর পাওয়া যায়। পুষ্যমিত্রের অপর নাম পুষ্পমিত্র, ইনি ৩৬ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূঃ ১৪৮ অব্দে পরলোক গমন করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র কাব্যের নায়ক অগ্নিমিত্র এই পুষ্যমিত্রেরই পুত্র। অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রই পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষিণী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলি প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাহার বাসস্থান গোনর্দ্দ আধুনিক গণ্ডোয়ানা (বিশ্বকোষ) নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ অভিমন্যু স্বরাজ্যে মহাভাষ্য পঠনপাঠন সম্প্রদায় প্রচলনের নিমিত্ত পূর্ব্বদেশ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন। (Maxr muller Hist of An. San. Lit p. 243) মহাভাষ্যধৃত কতিপয় সূত্রের উদাহরণ হইতে মনে হয় যে, পতঞ্জলি যেন নিজেও কিছুকাল কাশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন। (অভিজানাসি দেবদত্ত কশ্মীরান্ গমিষ্যামঃ তত্র সক্তূন্ পাস্যামঃ) সুতরাং খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দকে পতঞ্জলির সম সময় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাণিনি নিশ্চয়ই তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

কিন্তু পতঞ্জলির পূর্ব্বেও আর একজন ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম কাত্যায়ন। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে কাত্যায়নের নাম উল্লেখ আছে। সংস্কৃত ভাষা যে কোনও এক সময়ে ভারতের কথিত ভাষা ছিল, কাত্যায়নের ব্যাকরণ সূত্রগুলি তাহার অন্যতম প্রমাণ। পাণিনীয় যুগের কথিত সংস্কৃত ভাষা কাত্যায়নের যুগে এতই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ইনি পাণিনির প্রায় ২০০০ সূত্রের অবলম্বনে প্রায় ৪০০০ বার্ত্তিক সূত্র প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে কতদিন লাগিয়াছিল, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহাশয়ের বৌদ্ধ গান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ভাষার সহিত বর্ত্তমান বঙ্গ ভাষার তুলনা করিলে লক্ষ্য করা যাইতে পারে, সেই তুলনা না করিতে পারা পর্য্যন্ত আমরা কৌটিল্যের সময় ধরিয়া কাত্যায়নকে খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দের লোক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। পাণিনি তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।

পাণিনীয় যুগকে মহাভারতীয় যুগ এবং বৌদ্ধযুগের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী ব্যাপী বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই যুগের পণ্য দ্রব্য বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তদানীন্তন একটী সূত্রের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক, কারণ রাজসত্রে যত সামগ্রীর প্রয়োজন হয় এমন আর কুত্রাপি হয় না। শুনিয়াছি, লণ্ডন প্রভৃতি শিল্প প্রধান নগরে শিল্প দ্রব্যের কারখানার ধূম রাশিতে আকাশ প্রায়ই সমাচ্ছন্ন থাকে—উচ্চ স্তম্ভে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলে কত কারখানার চিমনী বা নল নয়নাগ্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভারতীয় কয়েকটী বন্দর ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরের সৌধচূড়া আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দেবতা মন্দিরের চূড়া ও মসজিদের গুম্বজই আমরা সমধিক দেখিতে পাই। উহারা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের ব্যঞ্জক বটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে, শৌনকাদি (৪৷৩৷১০৬) মুনিগণ নৈমিষারণ্যে স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত সহস্র বর্ষ ব্যাপী এক সত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। আবার, মহাভারতে দেখিতে পাই যে, জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে মহাভারত পাঠ বৈশম্পায়নের নিকটে শ্রবণ করিয়া আসিয়া, সৌতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে তাহা বর্ণনা করিলেন।

এইরূপ বহু সত্রের কথা আমরা শুনিতে পাই। আমার মনে হয় কাশীর ছত্র ও বৃন্দাবনের ছত্রগুলি ঐরূপ প্রাচীন সত্রেরই ছায়ামাত্র। এই সত্র শব্দের অর্থ 'সেশন' বা 'সিটিং'। (Dr. Haug) এ সেশন কৌন্সিলের সেশন, জজ আদালতের সেশন বা স্কুল কলেজের সেশনের মত 'শুষ্ক' সেশন নহে। এ অধিবেশনের ছায়া কুম্ভ মেলাতে দেখা যায়। এ অধিবেশনে রাজা রাজাধিরাজগণ সাধু সেবার্থ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। এ অধিবেশন দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞের অধিবেশন, এ অধিবেশন এমন এক রাজসিক অধিবেশনে, যে অধিবেশন অকাতরে অন্নদান চলিতেছে,—যে অধিবেশনে দেশের ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, মধ্যবিত্ত গরিব কাঙাল কখনও 'আর না' বোধ করিতেছেন না—যে অধিবেশনের দান ভোজনাদির ক্রিয়া সাতত্যের ফলে কাত্যায়নকে 'আখ্যাতম্ অনাখ্যাতেন ক্রিয়া সাতত্যে' এই সূত্রটী প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল—'খাও খাও, পিও পিও' হইতে 'অশ্নীত পিবতা', 'রাঁধো বাঁধো ভাজো ভাজো' হইতে 'পাচভৃজ্জতা' 'খাও খাও, ফুর্ত্তি কর ফুর্ত্তি কর' হইতে 'খাদত-মোদতা' 'এসো গুণ কর' হইতে 'এহীড়' 'এসো পাক কর' হইতে 'এহি পচ' 'কোঠা হইতে আন, এনে দাও' হইতে 'উদ্ধরোৎসৃজ' 'উনুন জালো, ভাল করে জালো' হইতে 'উদ্ধম-বিধম' প্রভৃতি সভাসমিতি নামের সার্থকতা বিধান করিতে হইয়াছিল।

নৈমিষে নিমিষ ক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্র সমম্ আসত॥

গোণী বা 'গাণিবাগ'পূর্ণ পাঞ্জরাশি শারি শারি অশ্ব-পৃষ্ঠে গরুপৃষ্ঠে উষ্ট্রপৃষ্ঠে অশ্বতর (খচ্চর) পৃষ্ঠে বা শকটপৃষ্ঠে চড়িয়া যজ্ঞবাটে আসিয়া পৌঁছিতেছে। কোনও বস্তায় বা চিনি, কোনও বস্তায় ময়দা আসিতেছে, কোনও গাড়ীতে বা ঘৃত (হৈয়ঙ্গবীন) আসিতেছে। যজ্ঞবাটের বহির্দ্বারে রথ্যায় ও শর্করিল কুট্টিমে (Pavement) নরপতিদের রথ শারি শারি হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কোনও রথ পাণ্ডুকম্বলে আচ্ছাদিত, কোনও রথ ব্যাঘ্র-চর্ম্মে (rug) পরিবৃত। কোন কোন সারথি পথি-পার্শ্বস্থ নিপানে ঘোড়াকে জল খাওয়াইতেছে। যজ্ঞ-সম্পাদনের আড়ম্বর উদ্দেশ্য নহে, আমরা সত্রের অঙ্গীয় পণ্য আলোচনায়ই সংযত থাকিব। এদিকে রবাহুত 'জনতা' দূরদেশ হইতে সেই যজ্ঞবাটে নিমন্ত্রণ খাইতে ও তামাসা দেখিতে আসিতেছে। কেহ বলিতেছে 'বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে, ভাই আর চলিতে পাচ্ছিনে'— আবার, কেহ কেহ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছে 'ঐ রে, ঐদিকে কাক চিল উড়িতেছে, ঐ বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ হইবে, আবার কেহ কেহ বলিতেছে 'আমি সদ্যঃ লুচি ভাজার ঘ্রাণ পাচ্ছিরে! আর বেশী দূর নেই।"

সত্রে আসিয়া কেহ বা খুব বিশদ খই মুড়ি দধি সংযোগ করিয়া হাপ্পুর হাপ্পুর ধ্বনি তুলিয়াছে কেহ বা শূলপক্ব মাংস দিয়া উখা পক্ব বাখরখানি মারিতেছে, কেহ মাংসোদন (পলাউ), কেহ বা কুল্মাষ (খিচরী), আবার কেহ বা শাণা (খিচুরী) খাইতেছে, কেহ বা অপূপ পুরোডাশ নামক চপ্ কাট্‌লেট্ খাইতেছে। কেহ বা বন্ধুর সঙ্গে ছানার (P. 4. 1. 4) সন্দেশ খাওয়া লইয়া বাজি ধরিয়া খাইতেছে। ব্রাহ্মণগণ রেশমী (পীলু ৩.২।২৪) পশমী ও (উর্ণায়া যুস্ ৫।২।১২৩) পট্টবস্ত্র দান পাইয়া যজ্ঞকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। আবার, ভূরিভোজনান্তে স্থূলকায় কোনও ব্যক্তি স্বকীয় ভুড়িতে হস্ত মর্দ্দন পূর্ব্বক বলিতেছেন 'আহা কি আরাম, বেশ ভোজনটী হইয়াছে, বেঁচে থাক বাবা রাজা বেঁচে থাক—তাঁহারই প্রসাদেই-ত এত তৃপ্তি বেঁচে থাক।' আহারান্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত কোন ব্যক্তির নাকে ডাক উঠিয়াছে, আর ভূতের ভয়ে 'এলোরে, পালারে' বলিয়া ছেলের দল দৌড়িয়া পলায়নপর হইতেছে।

বিশাল যজ্ঞবাটে কোনও সভায় নাট্যাভিনয় হই-তেছে, কোনও সভায় নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতাদি সম্পাদন করিতেছে, কোনস্থানে নদীষ্ণ ও নিষ্ণ ডুবুরিগণ সন্তান বিস্তার (water gala) র পরিচয় প্রদান করি-তেছে, কোথাও বা অক্ষক্রীড়া শলাকা ক্রীড়াদি জুয়াখেলা হইতেছে আর ধ্বনি উঠিতেছে 'এক অক্ষের জন্যে হারিলাম, এক শলাকার জন্যে জিতিলাম'। কোথাও বা পুষ্পভঞ্জিকা শ্রেনম্পাতি প্রভৃতি কৃত্রিম যুদ্ধ চলিতেছে। কোথাও বা কম্বোজ বাহ্লীক প্রভৃতি আয়ুধজীবি সঙ্ঘেরা বলি-খেলা দেখাইতেছে (৪।৩।১১৪)। কোথাও বা শস্ত্রাশস্ত্রি হস্তাহস্তি বাহবাবাহবি দ্বন্দ্বক্রীড়া হইতেছে—আর দর্শকেরা তীব্রসমালোচনাক্রমে পরস্পর আক্রোশা আক্রোশী, হাসাহাসি গালাগালি করিতেছে। (৫।৪।১২৭) কোনও সভায় উপজ্ঞা (Inventions & designs) এর জন্যে আবিষ্কারকগণ পুরস্কার পাইতেছেন। কোনও সভায় মড্ডুক ও ঝর্ঝর বাদ্য বাজিতেছে, কোনও সভায় পাণিঘ ও তাড়ঘগণ মৃদঙ্গ ও ঢোলক বাজাইতেছে, কোনও সভায় শুষির (flute) ও যন্ত্রীবাদ্য শ্রুত হইতেছে কোনও সভায় সামগান হইতেছে, কোনও সভায় বা পুরাণ পাঠ হইতেছে। আর শ্রোতারা পরস্পর বলি-তেছে—আহা, কি মধুর, যেন উপনিষদ্ আর কি (P. 1. 4. 79)।

এদিকে সাক্ষাৎ পণ্যদ্রব্যের আশ্চর্য্য মেলা মিলিয়াছে। আপণ, নিষদ্যা (৩।৩।৯৯) বা হট্টমন্দিরে আপণিকেরা দোকানদারগণ নানাবিধ পণ্য ক্রয্যরূপে প্রসারিত করিয়াছে, কোথাও বা ছাদিষেয় বা খরের মরে—শালি-ধান্য, 'হায়িয়া ধান' ব্রীহি যব মাষ তিল মুগ মসুরকে

(বস্তাক) ভঙ্গা (ভাঙ্ ও কার্পাস) উমা (তিসি) রাশি রাশি বিক্রয়ার্থ প্রসারিত হইয়াছে, কোথাও তাহা অগারেই রহিয়াছে। কেহ বা শূর্প দ্বারা তাহা ঝাড়িতেছে, কেহ বা করঙ্কর বা তুষ বিক্রী করিতেছে। কেহ বা দ্রোণ খারী আঢ়ক দ্বারা তাহা মাপিতেছে। কোন বণিক্ তুলাদ্বারা পণ্য ওজন করিতেছে কেহ বা কুতুমামর্ক চর্ম্মপাত্রে করিয়া তৈল কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। কেহ বা বস্ন (ভাড়া), (৪।৪।১৩,৫।১।৫১,৫৬) ও ক্রয়-বিক্রয় মূল্যদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। কোথাও বা গোয়ালা বিবধাখ্য ভাড়ে করিয়া দুই ভার জল আনিয়া দিতেছে।

কোথাও বা কর্ম্মকার উদ্ঘন (anvil) এর উপরে লৌহাদি রাখিয়া অযোঘন (বা হাতুড়) দ্বারা তাহা পিটাইতেছে, কেহ বা ভস্ত্রা (or bellows) দ্বারা তাহার উনুনে বাতাস দিতেছে, কেহ বা কুটিলিকা যন্ত্র দ্বারা অগ্নি হইতে লৌহ উত্তোলন করিতেছে—আর কৃষক খেদেদার কুদ্দালাদি খনিত্র নির্ম্মাণের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

সূত্রধারের দোকানে গ্রামতক্ষ ও কৌটতক্ষেরা খট্বাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। (বলা বাহুল্য যে, 'গ্রাম' শব্দ ও 'কৌট' শব্দের পরে তক্ষন্ শব্দের এত ভূরি প্রয়োগ হইত যে, উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ শেষে নকারটীর উচ্চারণ হইত না 'গ্রাম তক্ষ' ও 'কৌট তক্ষ' শব্দ দুইটী নিত্য-ব্যবহার্য্য বলিয়া অকারান্ত হইয়া দাঁড়াইল)।

বস্ত্রের বিপণিতে 'ঊর্ণায়ু' (উরভ্র বা মেষলোমজাত) পশমী, রেশমী ও মসীন বস্ত্র বিক্রী হইতেছে। গ্রাহক তন্ত্র বা তাঁত হইতে সদ্যঃ প্রস্তুত (৫।২।৭০) তন্ত্রক বস্ত্র বাছিয়া লইতেছে, বকেয়া মাল পরিহার করিতেছে। কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ উশীনর দেশীয় কম্বল বা শাল খরিদ করিতেছে। কেহ বা কম্বল ক্রয় করিতেছে।

কোথাও বা বণিক্য—বিপণি হইতে নিত্য (fast colour) ও অনিত্য রঞ্জন ভেদে লাক্ষা, রোচনা, নীল, কাল, অলক্তক (যাবক ৫।৪।২৯) লোহিতাদি রঙ্ ক্রয় করিয়া, রঞ্জন-শিল্পী বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতেছে, কেহ বা নাকে 'নস্য' টানিতেছে; কোন বিলাসী কিশর শলালু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ক্রয় করিতেছে; কেহ বা জতু (গালা) খরিদ করিতেছে, কেহ বা মালভারিনী মালিনীর নিকটে মালা ক্রয় করিতেছে। সুযোগ পাইয়া কোনও গ্রামনী কোট (বর্ম্ম), ছাতি ও বুট (অনুপদীন) ক্রয় করিতেছে কেহ বা উপানৎ বা খরম কিনিয়াই চরিতার্থ হইতেছে। (৬।৪।৯।৭৫।২১৬)। কোন সারথি চর্ম্মরজ্জু লাগাম বা প্রগ্রহ খরিদ করিতেছে। কোথাও বা হাতীর দাঁতের দোকানে দন্ত লেখক দাঁতের চুরি তৈয়ার করিতেছে, কোথাও বা কুম্ভকারের দোকানে কুলালগণ বিবিধ রঙের ভেক প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পুতুল (নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ) ৪।৪।৩৪ বিক্রয়ার্থ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা দেখিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ ফক্কিকা করিতেছে—

রামং সীতাং লক্ষ্মণং জীবিকার্থে
বিক্রীনীতে যো নরস্তং চ ধিগ্ ধিক্।
অস্মিন্ পক্ষে যোঽপশব্দং ন বেত্তি
ব্যর্থ প্রজ্ঞং পণ্ডিতং তং তক্ষ ধিগ্ ধিক্॥

আবার, কোনও কোনও স্থানে ভাস্কর শিল্পি নির্ম্মিত বাসুদেবাদি দেবতার মূর্ত্তি লইয়া দেবলকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

কোনও স্থানে শ্রান্ত যাত্রিক ডালিম কিনিয়া তাহা নিষ্কুলা করিতেছে, কোনও গোয়াল দোকানে বসিয়া বা আকণ্ঠ ঘোলের (উদশ্বিৎ) শরবৎ পান করিতেছে। কেহ বা কূপ হইতে জল তুলিয়া তাহাই পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতেছে।

কেহ বা মণিকারের নিকট হইতে লোহিতক মণি ক্রয় করিতেছে, আবার কেহ বা প্রিয়তমার জন্যে ক্রীত কর্ণিকা ও ললাটিকার মূল্যস্বরূপ শত সহস্র নিষ্ক (বা মোহর) প্রদান করিতেছে, আর তদীয় বন্ধুবর

নিকষোপলে (বা কষ্টি পাথরে) ঘর্ষণ করিয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিতেছে।

এইরূপ, চিত্রকর, দর্পণকার, সীসককারগণ নিজ নিজ ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্য সম্ভার বিপণীতে প্রসারিত করিয়াছে, ক্রীত দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ কেহ বা নৃপাঙ্কাঙ্কযুক্ত মুদ্রা প্রদান করিতেছে, আর গরীবেরা কার্ষাপণ বা কপর্দ্দকই অর্পণ করিতেছে।

কেহ কেহ মুদ্রার লেনা দেনা করিতেছে, কোন কোন উত্তমর্ণ বর্দ্ধিত হারে কুসীদ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া (৪।৪ ৩০,৩১) লোকে তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছে। আবার, কোন কোন অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতেছে না বলিয়া লোকেরা তাহাকে (২।১।৪৩) পরিশোধ করিতে বাধ্য করিতেছে। কোথাও বা অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণ বৃদ্ধি বা সুদ লইতেছে। কোথাও বা দোকানদার ক্রেতার নিকট হইতে পঞ্চ মুদ্রা 'লাভ' করিতেছে, কোথাও বা রাজপুরুষ 5.1.47 বণিকদের নিকট হইতে রাজগ্রাহ্য শুল্ক গ্রহণ করিতেছে, কোথাও বা শুণ্ডিকালয়ে 4.3.76 লোককে 'মৈরেয়' পান করিতে দেখিয়া তথা হইতে শুল্ক গ্রহণ করিতেছে। এরূপ সত্রে রাজার কি কি 4.3.75 আয়স্থান হইতে পারে, কোন কোন রাজপুরুষ তাহারই আলোচনা করিতেছে। কোথাও বা ভৈষজ্যালয় স্থাপন করিয়া চরকশিষ্য কোনও ভিষক্‌, রুগ্ন যাত্রিকের ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, কখনোবা একটী মাত্র পাকের বটিকা দ্বারা রুগ্ন যাত্রিকের উদর নিরাময় করিতেছেন; কারো জন্যে অরিষ্ট, কারো জন্যে বা 'যুষ' ব্যবস্থা করিতেছেন।

মিগ্যাস্থানিস্‌ ভারতবর্ষে একজাতীয় স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা দেখিয়া গিয়াছেন (Mc Crindle P 94-96)। অনেকে বলেন ইঁহারা তিব্বত দেশীয় স্বর্ণ-খনিকার বই আর কেহ নহেন। অধ্যাপক বল্‌ সাহেব বলেন যে, সিন্ধুনদ ও তাহার অনেক শাখানদে স্বর্ণ পাওয়া যাইত। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দুরাজাদের আমলে স্বর্ণপ্রাপ্তির জন্যে বহু পরিমাণে ভূমি খনন কার্য্য সম্পন্ন হইত এবং হিন্দুরাজগণ রাজস্ব স্বরূপে স্বর্ণ ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতেন না। ল্যাসেন্‌ হীরেন্‌ প্রমুখ মনীষিগণ বলেন যে, ভারতবর্ষে স্বর্ণ জন্মিত না, তিব্বত ব্রহ্মদেশ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী হইত। কিন্তু পাণিনিতে স্বর্ণের ও রৌপ্যের বহু নাম পাওয়া যায়, যথা জাতরূপ, রজত 'স্বর্ণময় কবচ (কোট) পরিধান করিয়া বরুণ বসিয়া আছেন, চতুষ্পার্শ্বে তাহার কিরণ ছটা বিকীর্ণ হইতেছে' এরূপ বিবরণ আমরা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই দেখিতে পাই। শোভন কর্ম্মা বরুণ সাম্রাজ্যের জন্যে বসিয়া আছেন এই কথাও আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই। আবার অষ্টমণ্ডলে বরুণের গৃহের সহস্রটী দ্বার আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (4. 1. 170) অবন্তি প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়িণীর পথ, মেঘদূতের পক্ষে বক্র বা ঘূর্ণাপথ হওয়া সত্বেও তিনি উজ্জয়িণী সন্দর্শন করিয়া যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, যথা,—

প্রাপ্যাবন্তীন্‌ উদয়ন কথা কোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্‌
পূর্ব্বোদ্দিষ্টাম্‌ অনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং লালগতাং
শেষৈঃ পুণ্যৈ হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্‌

কিন্তু, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর এ চিত্রটীর সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনায় পাণিনীয় 'অভ্রংলিহ' 'অভ্রকষ' সৌধকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় না।

পুরাকালে নর্ম্মদানদী মধ্যভারতের বাণিজ্যপোত চলাচলের এক অতি আশ্চর্য্য পথ ছিল। অবন্তির সমৃদ্ধি-শালিতার প্রধান কারণ এই নর্ম্মদা ভরু 'কচ্ছ' (৪।২।১২৬, ১৩৩) তখন একটী প্রধান বন্দর ছিল।

'প্রাচীন ভারতের বিদেশ বাণিজ্য' প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, গ্রীস্‌ রোম আশিয়া মাইনর ও মিশরদেশের অতীত অভ্যুদয়ের সময়ে ভারতবর্ষের সহিত সেই সমুদয় দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। এইমাত্র আমরা ভারতীয় আপণ, বিপণি ও পণ্যজাতের

কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে, যে পথে সেই পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত সেই পথের বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। এই বাণিজ্য স্থলপথে ও জলপথে উভয় পথেই পরিচালিত হইত। (Periplus & Lindsay) যে বাণিজ্য জলপথে চলিত, তাহা সমুদ্রোপকূলবাহী বাণিজ্যপোত (বা বড় বড় বেপারীর নৌকা) যোগে সম্পাদিত হইত। আর, যে বাণিজ্য স্থলপথে চলিত তাহা আশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া বেভেরু বেবিলন বা মেসোপোটামিয়া, মধ্য আশিয়া চীন ও ভারতবর্ষ গামী প্রশস্ত প্রশস্তি রাজপথ দ্বারা পরিচালিত হইত।

সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপিয়া কোথাও বা নিবিড় অরণ্যানীগাহী, কোথাও বা স্রোতস্বতী বক্ষঃপাতী পথে পণ্যপূর্ণ শকটশ্রেণীর নির্ব্বিঘ্ন চলাচলের নিমিত্ত মধ্য আশিয়ার যাযাবর ('যশচযঙঃ') গণ বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিতেন। মহাজনদের মালবোঝাই খচ্চর 'অনুগবম্ আয়ামে' 'তদ্বহতি রথযুগ প্রাসঙ্গম্' 'পর্ণি তল্পিতরণ নৌকা গরুর গাড়ী, (অশ্বতর ৫।৩।২) উটের গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী বা নৌকা সঙ্ঘ বা বহর বাঁধিয়া সুযোগ্য অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে চলাফেরা করিত। সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠেভারবাহী জাতোক্ষ, মহোক্ষ, বৃদ্ধোক্ষ অশ্বতর যাইত। অধ্যক্ষের অধীনে নানাশ্রেণীর নানাধিকারের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। এক এক বহরে শত শত শ্রমজীবী ব্রতিঃদলং পূগঃ 5. 2. 25 'ব্রাতেন জীবতি' পথের নাম ছিল, (কুলি) এবং শত শত গো অশ্ব ও উষ্ট্র থাকিত। দণ্ডমাথ, পদমাথ পদবী প্রভৃতি অশ্বের একাহগম্য সর্ব্বধুরীন, একধুরীন, শাকট প্রভৃতি বাহকের নাম ছিল। 'পূনাঃ সঙ্ঘা নানাজাতীয়া অনিয়তবৃত্তয়ো ধর্ম্মকামপ্রধানাঃ' শারীরিক-শ্রমজীবিত্বং ব্রাতস্ব পূনাৎপ্রভেদঃ শ্রেণি Corporation (Kantilya) সঙ্ঘ Quilds of workmen দূরত্বের পরে পরে এক একটী আস্থান, আস্তান বা আড্ডা থাকিত, তাহা সঙ্ঘারামরূপে ব্যবহৃত হইত। সঙ্ঘের সঙ্গে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী থাকিত, দুর্ব্বল মহাজনের শকটের কোনও বিঘ্ন সমুপস্থিত হইলে, যে যে সবল পুরুষ তাহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিতেন তাহারা সম্মানলাভ করিতেন ও কৃতার্থম্মন্য হইতেন। হিরোডোটাস্ 450 B. C. বর্ণিত বাণিজ্যযাত্রা পথ ২৮৩ মাইল দীর্ঘ ছিল, এবং তন্মধ্যে ২০টা ষ্টেশন আস্থান, আস্তান বা আড্ডা ছিল। উক্ত বাণিজ্যসঙ্ঘে ভারতবর্ষ একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী পিউকেলা বা পুষ্কলাবতী বন্দর পর্য্যন্তব্যাপী একটী রাজপথ অতি সুদূর প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। বিদেশের সহিত অব্যাহত ব্যবসায়প্রভাবেই ভারতমাতা এইরূপ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিলেন। তদবধি পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং কালে পাশ্চাত্য নৃপতিবৃন্দ ভারতীয় সমৃদ্ধি সন্দর্শনে এরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িলেন যে, আসিরিয়ার রাজ্ঞী সেমিরেমিস্এর সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সকলের হৃদয়েই ন্যূনাধিকক্রমে ভারত-বিজয়-লালসা জাগরূক রহিয়াছে। ইটালীবাসিগণ প্রতিবৎসর পনরলক্ষ পাউণ্ড বা সোয়াদুইকোটী টাকা মূল্যের মোশলা, মণিমুক্তা ও রেশম প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যজাত মিসর দেশ হইতে ক্রয় করিতেন। (Pliny VI. P. 101) রোমনগরীর অভ্যুন্নতিকালে রোমনাগরগণ ভারতপ্রসূত বিলাসিতার সামগ্রীকে অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন, বিলাসিতার অঙ্গীয় পণ্য মহামূল্যে ক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, ভারতীয় মণিমুক্তা ও রেশমের বস্ত্র তাঁহার অপরিমিত মূল্যে ক্রয় করিতেন।

আরিয়ানের রাজত্বকালে, মিশরদেশীয় পণ্যপোত আসিয়া প্রথমতঃ সিন্ধুতটবর্ত্তী পট্টল ('Ophier') বর্ত্তমান করাচী, Sans অপকর ? P. 4. 3. 32. সিন্ধু 4. 3 32; 93) বন্দরে পৌঁছিত। সেই সমুদয় নৌকা বিদেশ

হইতে পশমী কাপড়, সুতার কাপড়, কাচের পদার্থ, মদ্য ও সুগন্ধি দ্রব্যে বোঝাই হইয়া আসিত, এবং তদ্‌বিনিময়ে ভারতীয় নানাপ্রকারের সুতার কাপড়, রেশমী ও পশমী কাপড় মণিমুক্তা ও মোশল্লাতে বোঝাই হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান ব্রোচ্) নগরটী কালে উক্ত পটুল বন্দর হইতেও অধিকতর সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ 'পটুল' বন্দরের নাম হইতে সকল বন্দরের সাধারণ নাম 'পত্তন' হওয়া অসম্ভব নহে। উজ্জয়িনী (P. 4. 2. 127 ধূমাদিগণে পঠিত P. 4. 2. 8: বরণাদি) সুদূর প্রাচীনকাল হইতে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নর্ম্মদা ভারতমাতার কটীভূষণ স্বরূপ। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান নগরীর ব্যবসায় বাণিজ্য উক্ত ভরুকচ্ছ বন্দর দ্বারাই চলিত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুসিরস্ নামক আর একটী বন্দরও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। বেরিনিস্ হইতে নৌ-যাত্রা করিয়া হিপেলাস্ যখন ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার নৌকা আসিয়া মুসিরস্ বন্দরেই লাগিয়াছিল।

প্রাচীনকালে আশিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকার (Spekes discovery of the sources of the Nile) মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকার যে সমুদয় পরিচয় প্রদান করিয়াছি, সেই বাণিজ্য সঙ্ঘে ভারতবর্ষ যে একটী প্রধান অঙ্গ ছিল তাহাও আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাষাবিজ্ঞানধৃত শব্দ হইতে ততোধিক প্রমাণ করা দুষ্কর। বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের তপোধন পাণিনি আর্ষ ও লৌকিক ভাষার উপদেশ প্রদানচ্ছলে, ধর্ম্মোন্নতি ও নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যুগপদ্ শিল্পবাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতির পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পাণিনি এমন সকল প্রাচীন স্থানের ও লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে যাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধযুগ খৃষ্ট পূঃ ষষ্ঠ-শতাব্দীর পরবর্ত্তী। রাজা কনিষ্কের সময়ে মধ্য আশিয়ার খোটান পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ চিহ্নই বর্ত্তমান যুগে বালুকারাশি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। Dr Stein প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষও আজ ভূগর্ভে বিলীন, নলন্দেরও সেই দশা—সুতরাং প্রাচীন যুগের কীর্ত্তিধ্বজা যে আরও অতল ভূতলে লুক্কায়িত থাকিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন,)

---

৮ কামাখ্যা।

১৩২৭ বাং ১৫ই কার্ত্তিক রাত্রি ১১॥০ ঘটিকার পর কুমিল্লা ষ্টেশন হইতে গৌহাটীর টিকেট লইয়া রওয়ানা হইলাম, শরতের আকাশ, সুন্দর জ্যোৎস্না। আকাশ ও পৃথিবী জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিক নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বহুদিন যাবৎ কামাখ্যা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে মন ততোধিক প্রফুল্ল হইল। কতক্ষণ পর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে অনুমান ৮টার পর গাড়ী বদরপুর জংসনে পৌঁছিল। এইস্থান হইতে একটী শাখা রেলপথ শিলচর গিয়াছে। মেইন বা প্রধান লাইন ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। বদরপুর হইতে পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইয়া লামডিং পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। আমাদের বদরপুরে গাড়ী বদলাইতে হইল। আমরা ভিন্ন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কতক্ষণ পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এক্ষণ হইতে গাড়ী পর্ব্বতের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোথাও রেলপথে

উত্তরদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা। কোথাও নির্ম্মল সলিলা পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী। কোথাও চা বাগান। মাঝে মাঝে পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সুড়ঙ্গপথ বা টানেল (Tunnel) বদরপুর হইতে লামডিং পর্য্যন্ত। মোটের উপর ৩৬টী টানেল বা সুড়ঙ্গ আছে। রেলপথের চতুর্দ্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপীমণ্ডিত নিবিড় বন। আমরা প্রকৃতির সুরম্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের পার্ব্বত্য অংশ দেখিবার জিনিষ। রেলগাড়ী কখনও উচ্চভূমির উপর দিয়া কখনও নিম্নভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদমূল বেষ্টন করিয়া গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চ হইতে নিম্নে আরোহণ করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে "হাফলং" ষ্টেশনে আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া জলযোগ করিয়া লইলাম। অপরাহ্নে একটী ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী বাজার দেখিতে পাইলাম। পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ ষ্টেশনে আসিয়া নানাবিধ তরকারী আরোহীদের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। আদা, কাচালঙ্কা খুব সস্তা। আমরাও কিছু ক্রয় করিলাম।

রাত্রে গাড়ী লামডিং জংশনে পৌঁছিল। এখানে গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি ১১টার পর গৌহাটীর গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন প্রভাতে গৌহাটী পৌঁছিলাম। গৌহাটী হইতে পুনরায় কামাখ্যার টিকেট লইয়া আমরা কামাখ্যার গাড়ীতে উঠিলাম। অত্যল্পকাল মধ্যেই কামাখ্যা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

গৌহাটী ষ্টেশনে একটী পাণ্ডার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া কামাখ্যা লইয়া আসিলেন। কামাখ্যা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া আমরা পাণ্ডার সাহায্যে একটী কুলি লইয়া কামাখ্যা পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। কামাখ্যা পর্ব্বত আরোহণের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান আছে। এই সোপানাবলী বহু প্রাচীন। কিম্বদন্তী এই যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর কর্ত্তৃক কামাখ্যা পর্ব্বতারোহণের জন্য এই সুদৃঢ় সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সোপানের নিম্নভাগে একটী সুদৃঢ় তোরণ বা সিংহদ্বার। সোপান যে স্থানে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ কামাখ্যা মন্দিরের নিকটে আর একটী এইপ্রকার তোরণ আছে।

পর্ব্বতারোহণ করিতে আমাদের খুব আনন্দ বোধ হইল। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরে স্থানে স্থানে পর্ব্বতমালা ও স্থানে স্থানে সমতল ভূমি দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমরা পর্ব্বত আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ পাণ্ডার বাড়ীতে গমন করিলাম। কামাখ্যা পাহাড়ের উপরেই পাণ্ডাদের বাড়ী। আমরা যে পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়াছিলাম তাহার নাম শ্রীতারিণীচরণ অধিকারী। ইহার বাড়ী একটী উচ্চ শিখরের উপর। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ৺কামাখ্যা দর্শনার্থ গমন করিলাম।

৺কামাখ্যা মন্দিরের উত্তরদিকে সৌভাগ্য কুণ্ড। ইহার চারিদিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী। এই সোপানগুলি বহু প্রাচীন। কালের প্রভাবে সোপানগুলি অনেক স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। সৌভাগ্য কুণ্ডের তীরে গণেশ ও মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। সৌভাগ্যকুণ্ডে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া যাত্রীগণ প্রথমতঃ গণেশ ও মহাদেবের আরাধনা করিয়া ৺কামাখ্যা দর্শনের অনুমতি গ্রহণসূচক মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যকুণ্ডে তর্পণ ও কুণ্ডের তীরে শ্রাদ্ধ করার বিশেষ মাহাত্ম্য। আমরা সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিয়া গণেশ ও মহাদেব প্রণামান্তে ৺কামাখ্যা দর্শনে অগ্রসর হইলাম। কামাখ্যা মন্দিরের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ আমরা ৺কামাখ্যা দেবীর ধাতুময়ী মূর্ত্তি ও মহাদেব দর্শন করিলাম। অতঃপর পূর্ব্বদিকে সোপানাবলী অবরোহণ করিয়া ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে অন্ধকার। দীপালোকে আমরা ৺দেবীর পীঠস্থান দর্শন করিলাম। পীঠ স্থানের উপর ময়মনসিংহ

জিলার অনৈক ধর্ম্মশীল। জমিদার-পত্নী একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ৺ কামাখ্যা দেবীর পীঠ স্থানের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে মাতঙ্গী ও কমলার পীঠস্থান। সেখানেও দীপ জ্বলিতেছে। দীপালোকে পীঠস্থান দর্শন করিতে হয়।

কামাখ্যা পর্ব্বতের মধ্যে কালী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই নয় দেবীর পীঠ—স্থান। তারা দেবীর পীঠস্থান গৌহাটী সহরের মধ্য অবস্থিত। কামাখ্যা পাহাড়ে তারা দেবীর একটী মূর্ত্তি আছে। ভুবনেশ্বরীর পীঠ কামাখ্যা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরী শিখর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ ও ব্রহ্মপুত্রের গর্ভস্থ শৈল যাহাতে ৺ উমানন্দ ভৈরবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত তাহাও গৌহাটী নগরী ও অশ্বক্রান্ত শৈল প্রভৃতির দৃশ্য প্রাণস্পর্শী। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের নিকট দুইটী রামায়ৎ সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। একজন তুলসী দাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন।

বগলাদেবীর পীঠ একটী পর্ব্বতের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত। নিকটে একটী জলপ্রপাত আছে। বগলা-দেবীর পীঠস্থানের উপর কোন মন্দির নাই। ইহা অনাবৃত প্রদেশে অবস্থিত। অপর সমস্ত দেবীর পীঠ-স্থানেই মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত। ভৈরবীর পীঠস্থানের পার্শ্বে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত নরমুণ্ড। প্রবাদ এই যে জনৈক রাজা নিজ মুণ্ড ছেদন করিয়া দেবীর চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

অম্বুবাচীর সময় ও শারদীয় দুর্গোৎসব ও বাসন্তী পূজার সময় কামাখ্যা শৈলে বহুযাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের সময় মহাসমারোহে দেবীর পূজা হয়।

কামাখ্যা হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থস্থান। পৌরাণিক রাজা কামরূপাধিপতি নরকাসুর কর্ত্তৃক দেবীর মন্দির ও কামাখ্যা পর্ব্বত আরোহণের জন্য সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কামরূপের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কামরূপ সুবিখ্যাত পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কামরূপ কুচভূপতিগণের শাসনাধীনে আইসে। অতঃপর কামরূপ কতককাল মুসলমানগণের হস্তগত থাকিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে আহম রাজগণের শাসনাধীনে আইসে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

কামাখ্যাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির কুচবিহারাধিপতি মল্লদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহার অপর নাম নরনারায়ণ। এই সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই:—মল্লদেব ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হইয়া সসৈন্যে এই অঞ্চলে আগমন করেন। ঘটনাচক্রে তিনি তাঁহার সৈন্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং বনে বনে ভ্রমণ করতঃ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। কামাখ্যা পর্ব্বতের অপর নাম নীলাচল। মল্লদেব শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী উচ্চ স্তূপের নিকট উপস্থিত হন। এই স্থানে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পূজার উপকরণ লইয়া উপবিষ্টা ছিলেন। রাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া স্ত্রীলোক-টীর নিকট জল প্রার্থনা করিলেন ও স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে পরিতোষের সহিত পানাহার করাইলেন। স্ত্রীলোকটী কোন্ দেবতার পূজার উপকরণ লইয়া আসিয়াছেন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটী ঠিক বলিতে পারিলেন না, কিন্তু দেবীপূজার উপকরণ ইহা রাজা বুঝিতে পারিলেন। রাজা দেবীর নিকট জয় কামনা করিয়া দেবীর পূজা দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। অতঃপর রাজা মল্লদেব তাঁহার সৈন্যগণ সহিত মিলিত হইলেন এবং যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। মল্লদেব রাজধানীতে যাইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারা এইস্থান কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থান বলিয়া নির্ণয়

করিলেন। ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় কর্তৃক কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং এই তীর্থ বহুকাল লুপ্ত অবস্থায় ছিল। মল্লদেব পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং লোকজন সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমনকরতঃ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন স্তূপ খনন করিতে করিতে প্রাচীন দেবীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইল। মল্লদেব সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে জয়ী হইলে স্বর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। মল্লদেব প্রত্যেক ইষ্টকে কিয়ৎপরিমাণ স্বর্ণসংযোগ করিয়া দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে মল্লদেব এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থান মল্লদেবের পিতা বিশ্ব সিংহই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত উপাখ্যানটী কেহ কেহ মল্লদেবের প্রতি আরোপ না করিয়া বিশ্বসিংহের প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন মোট কথা কুচবেহারাধিপতিই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন মন্দির বেশ সুদৃঢ় ও সুন্দর। মন্দিরের প্রাঙ্গন বেশ প্রশস্ত।

কামাখ্যা পর্ব্বত ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের দৃশ্য অতি মনোরম। একাধারে নদী পর্ব্বত ও সমতল ক্ষেত্রের এমন মনোহর সমাবেশ খুব কমই দৃষ্ট হয়। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেইদিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

কামরূপ হিন্দু সভ্যতার একটী প্রধান কেন্দ্রস্থান। পূর্ব্বকালে কামরূপরাজ্যের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না। কামরূপ নামের উৎপত্তির কারণ কালিকা-পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"শম্ভু নেত্রাগ্নি নির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ
তত্ররূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ।

হরকোপানলে দগ্ধ কামদেব শম্ভুর অনুগ্রহে এইস্থানে তাঁহার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম কামরূপ হইয়াছে। কামরূপের সীমা কালিকাপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্যোজন বিস্তীর্ণং যোজনৈক শতায়তম্॥
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচল পূরিতম্।
নদীশত সমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

কামরূপে বহু তীর্থ আছে। তন্মধ্যে অনেক তীর্থ বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত অবস্থায় আছে।

হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, সতীদেহ ৫১ ভাগে বিভক্ত হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল তাহাই পীঠ—স্থান। কামাখ্যা যোনি পীঠ। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"নীলশৈল ত্রিকোণস্থ মধ্যনিম্নঃ সদাশিবঃ।
তন্মধ্যে মণ্ডলং চারু ত্রিংশচ্ছক্তি সমন্বিতম্॥
গুহা মনোভবা তত্র মনোভব বিনির্ম্মিতা।
মনোভব গুহা তত্র পঞ্চবামায়তা স্মৃতা॥"

কামাখ্যা পর্ব্বত সাধনার একটী প্রধান স্থান। যোগিনী তন্ত্রে কথিত আছে—

"পৃথিব্যাং ভারতে বর্ষে কামরূপং মহাফলং।
নবযোনি সমাকীর্ণং মহামুক্তি ফলপ্রদম্॥
নবযোন্যাত্মকে ব্রহ্মন্ কামরূপে মনোহরং।
কামাখ্যা তেজসা দেবি দীপ্যতে যোনিমণ্ডলং॥"

শ্রীমহাভাগবতপুরাণে কামাখ্যা মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"স এব সার্থকো জ্ঞেয়ো যো গত্বা যোনিমণ্ডল।
প্রণমেৎ পচায়া ভক্ত্যা দেবীং ত্রিপুর ভৈরবীম্॥
ক্ষেত্রে স্পর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহাপি নরঃ ক্ষণাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ কামাখ্যায়াঃ প্রসাদতঃ॥
কামাখ্যা দর্শনং বৎস দেবানামপি দুর্লভং।
তদ্ য পশ্যতি কামাখ্যাং সো দেব পরিপূজিতঃ॥"

কামাখ্যা পর্ব্বতে দুইদিন অবস্থান করিয়া আমরা তৃতীয় দিনে ৺ উমানন্দ ভৈরব দর্শনার্থ রওয়ানা হইলাম,

৮ উমানন্দ ভৈরব, অশ্বক্রান্ত ও বাশিষ্ঠাশ্রমের বিবরণ আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন।

দুঃখের অভিষেক।

শ্মশানেতে শ্যামা এলেন
কারাগারে শ্যাম,
দুইই আমার নয়ন অভিরাম।
বন্দী, জগত পিতার পিতা,
পাষাণ মায়ের বাপ
দুঃখ পীড়ন নয়রে অভিশাপ।
পদাঘাতের চিহ্ণ হরের
বক্ষ যে শোভন,
লাঞ্ছনা তোর নয় কিরে লোভন।
মণির মালা ফেলে মহেশ
ফণির মালা নিলে
সেই যে দুখের দর বাড়িয়ে দিলে।
কুব্জী যখন পাটেশ্বরী
বিশ্বের রাজার
কুৎসিতেরি দুঃখ কিবা আর।
বিদুর হরির পরম প্রিয়
খুদ চাহিয়া খান
নিঃস্ব রে তুই আদক কি চাস মান?
রাজার রাখা রাখাল যে দিন
চরায় মাঠে গাই
দুঃখ আভিজাত্য পেলে ভাই।
সুদামা কোলাকুলি
যে দিন লভিলেক,
দুঃখের হল রাজ্য অভিষেক।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যে স্বদেশপ্রেম।

(২)

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে "হৃদয়বাঁশী" বাজাইতে বলিতেছেন। এ বাঁশীতে কেবল সা রে গা মা বাজিবে না; এ বাঁশী শুনিয়া কুলবালা কুলমানে জলাঞ্জলি দেয় না, গোপাঙ্গনারা আত্মবিস্মৃত হয় না। এ বাঁশী আমাদের কবিগণের তথা কথিত 'প্রেমের বাঁশী' নয়; এ বাঁশীতে বসন্তের সাড়া নাই, জোছনায় 'চেয়ে থাকা' নাই, পিকের মূর্চ্ছনা নাই, আছে—জাগরণের কথা। আছে রুদ্রদেবের ভীষণ শিঙ্গার মৃদুমধুর অথচ কঠোর কর্ত্তব্যের আহ্বান ধ্বনি।

নিদ্রালস তন্দ্রামগ্ন	আঁজর লাগা পাঁজর ভগ্ন
চরণ তুলসী কণ্ঠলগ্ন	চির মরণ অভিলাষী।
নিরুৎসাহ নিরুদ্যম,	কর্ম্মে কেবল দেখে যম,
অধম যারা জাগুক তারা,	আত্মবলে অবিশ্বাসী॥
	ঠাকুর, বাজাও এসে হৃদয় বাঁশী॥
বাজাও সঞ্জীবনী তানে,	নূতন মন্ত্র জাগুক প্রাণে
ভীরুতা জড়তা নাশি	... ...
... ...	বাজাও ঠাকুর দীপকরাগে
... ...	যে ভীরু কাপুরুষ ক্লীব
... ...	জগতে অধম জীব
ফিরে আবার ধরুক গাণ্ডীব	কর্ত্তব্য বিমুখ উদাসী॥
বুঝুক মূঢ় তত্ত্ব গূঢ়	অমর আত্মা অবিনাশী॥

এই "অমর আত্মা অবিনাশী বলিয়া গ্রন্থকার জীবন তুচ্ছ করিয়া" কর্ত্তব্য বিমুখ উদাসীকে গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইতেছেন! তারপর দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা পাকা করিয়া দিলেন—

ব্রহ্মচারী কুমার ব্রত
নবীন ভীষ্ম শত শত

বৌক সে শরশয্যাগত
সর্ব্বত্যাগী বীরসন্ন্যাসী
বাজাও সে ভৈরব রন্ধ্রে
জাগুক বিন্ধ্য মেঘমন্দ্রে
জাগুক প্রতাপ বনে বনে
কন্যাপুত্রে উপবাসী ॥

এই মহান্ আদর্শ লইয়াই মহাত্মা গান্ধী আপনার ত্যাগ মন্ত্রে জগৎ বিস্মিত করিতেছেন আর "নবীন ভীষ্ম শত শত"র চেয়েও আমাদের "সহস্র সহস্র" কর্ম্মী যুবকদল শরশয্যায় আশ্রয় লইতেছেন। 'কন্যা পুত্রে উপবাসী' মহাপ্রাণ মতিলালও চিত্তরঞ্জন জগৎকে আবার ধন্য করিতেছেন। আমাদের জাতীয় মহাকবি সেই আদর্শে দেশবাসীকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। "সর্ব্ব-ত্যাগী বীরসন্ন্যাসী" নহিলে কি আজ এই দেশ প্রাণ নেতৃবর্গের জন্মদেশ মাতিয়া উঠে ?

"নববর্ষ" কবিতায় কবিরা কত রকম কাহিনী, কত কিছু বক্তৃতা করেন, আর গোবিন্দচন্দ্র নববর্ষের দুয়ারে ভিক্ষার্থী হন। তিনি জানেন "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" তিনি "কল্পতরু উচ্চৈঃশ্রবা হয়" চাহেন না, এমন কি

"চাহিনা অমৃত বিন্দু মন্দার ইন্দিরা ইন্দু"

বলিয়া আত্মবলে বিশ্বাসবান্ কবি নববর্ষকে সদম্ভে কহিতেছেন

"ভারত করহ তুমি ভীষণ শ্মশান ভূমি,

আমরা সমস্ত দুঃখ বিপদ জয় করিয়া 'মৃত্যুঞ্জয়' হইব। তারপর

"মৃত শক্তি স্কন্ধে করি, ভ্রমিব ভারত ভরি
... ...
জাগাইব পীঠে পীঠে ....
নবরূপে নবশক্তি দিবে দরশন।
মহাশক্তি মহাভূমা আবার জন্মিবে উমা
উজলিয়া হিমালয় ধবল কাঞ্চন।

কি চমৎকার ! কি উচ্চ আশা। কি আদর্শ চিত্র ! কবি তাহার পর বলিতেছেন হে নববর্ষ আমরা আরো করিব তাহা—

"জ্বালাময়ী মহাভাষা জাগিবে জাতীয় আশা"

কবি জানেন জ্বালাময়ী মহাভাষা না হইতে জাতীয় আশা জাগে না। আশা না জাগিলে জাতির উত্থান অসম্ভব। কবিই পর মুহূর্ত্তে সাহঙ্কারে দৃঢ়ভাবে কহিয়াছেন—

"ইন্দিরা খুলিবে রত্ন মন্দির তোরণ।"

এতখানি সাহস যাহার আছে, সে কি আর পরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষাং দেহি বলিয়া কাতর নয়নে চাহিয়া থাকে। যে দেশের ভাষা সমৃদ্ধিশালিনী নহে, যে দেশের ভাষার শক্তি নাই, সে দেশে মনুষ্যত্ব জন্মিতে পারে না। যখনই যে দেশ সমুন্নত হইয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে সে দেশেরই সাহিত্য ঐরাবত তুচ্ছকারিনী জাহ্নবীর পূতশক্তি বর্ত্তমান। সেই দেশের জন্য "ইন্দিরা কি স্বয়ং "রত্ন মন্দিরের তোরণ" না খুলিয়া পারেন ? কবি সেই কথাটাই গায়ের জোরে নয়—মনের জোরে স্বচ্ছন্দে বলিয়াছেন। এই কবি একদিন রাজ শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার "বৈজয়ন্তী" উৎসর্গ কালে এই কথাই বলিয়াছিলেন—

"ধন্য তুমি জন্ম ভূমির পুত্র পুণ্যবান্।
বঙ্গভাষার ভরসা আশা সহায় সুমহান্ ॥"

ভাষার উপর এমন অগাধ শ্রদ্ধা, এমন নির্ভর ছিল বলিয়াই কবি গোবিন্দ দাসের প্রাণে এত বড় স্বদেশ প্রেমের চিত্র ফুটিয়াছিল !

যখন লর্ড কর্জ্জনের খড়গাঘাতে বঙ্গভূমি বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দেশময় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। আবেদন নিবেদন, কাঁদা কাটা, রাগ রোষের অন্ত ছিল না। কবি গোবিন্দ চন্দ্র হাসিয়া কহিলেন—

"আমরা হরিহর।
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম, হোক্ না মোদের সহস্র নাম,
... ...

নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা ?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর !

কবি এ কথাটার কারণ নির্দ্দেশ করিতেও বিলম্ব করেন নাই।

"একই ভরসা একই আশা"

লইয়া আমরা এই দেশে বাস করিব এবং

...   .

একই মোদের দণ্ডবিধি
একই মোদের গুণের নিধি,

...   .

সবার বুকের রক্তশোষে,
গর্জ্জে প্রাণে অপমানে বজ্রভাস্কর !
এক মরণে আমরা মরি সবাই নারী নর !

দেড়যুগেরও বেশী আগে কবি এ সকল ধ্রুব সত্য কথা কহিয়া গিয়াছেন। আমরা যে এক, আমরা যে এক না হইলে বাঁচিব না, তাহা গোবিন্দচন্দ্র দেড়যুগ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"কামার কুমার জোলা তাঁতী
হাঁড়ি মুচি সকল জাতি,
মুনি ঋষি গরীব দুঃখী রাজা রাজ্যেশ্বর
নাইক প্রধান নাইক তুচ্ছ
নাইক নীচ নাইক উচ্চ
কোরাণ-পুরাণ-জেন্দাবেস্তা সবাই একস্তর,

অতএব ভবিষ্যদ্দর্শী কবি "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" এর মত ভয়ে ভয়ে মনের কথা গোপন না করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"ভাই ভগিনী তিরিশ কোটী
আমরা যদি জেগে উঠি,
আমার তুমি জন্মভূমি কারবা রাখ ডর ?"

আমরা 'জেগে উঠ্‌লে' ত্রিশকোটী ছেলের মা'র আবার ভয় ?

আমাদের যে শক্তি মরা
ছিল পড়ে ভারত ভরা
ছিন্ন অঙ্গ পীঠে পীঠে ভিন্ন পরস্পর।
যুগ যুগান্ত হল গত,
মরার চেয়ে মরার মত
রুদ্র হায় ক্ষুদ্র ছিলাম মরার অনুচর।

আমরা আমাদের নিজ শক্তি জানিতাম না। আমাদের একতা ছিল না। আমাদের রুদ্রশক্তি মরার মত পড়িয়াছিল—মরে নাই।

তাই "আমাদের মা লক্ষ্মীরাণী
কোন অভাগার পাপে জানি
সাগরজলে ঝাঁপ দিয়াছেন আজি ক'বছর।

সেখানে তাঁহাকে পাইয়া—

"কোন্ বিদেশী বণিক্ মেয়ে
নিল তাঁরে পথে পেয়ে
যত্ন করে রত্ন ঝাঁপি—নেই নি সে খবর !

আজ আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। আজ

আয় রে আমরা আগাগোড়া
ভাঙ্গা ভারত লাগি যোড়া

...   ...

আয়রে অজগর দিয়া
সপ্ত সিন্ধু মথি গিয়া

কারণ দেখিয়া লইব আমাদের

"ইন্দিরা সে বন্দী কোথায় ?"

সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠিবে নিশ্চিত ;—

ভয় কিরে ভাই, চুমুক দিয়া
উঠ্‌লে গরল ফেল্‌ব পিয়া।

আমরা চাঁদ সাগরের "সাত ডিঙ্গা" "মধুকর" উঠাইব। সাগর সেঁচিয়া "শ্রীমন্তের টোপর" উঠাইব। যাকে পূজা করিলে মা বর দিবেন। আমাদের মা বরদা। তার সাক্ষী—

"একটা পদ্ম আঁখি দিয়া
রাম পূজিল লঙ্কা গিয়া।"

তবে আর কি ?—"আমরা ত ভাই তাঁরি বংশধর ?"

আমরা "ষষ্ঠীকোটী নেত্র মনোহর" উপড়াইয়া মায়ের চরণ পূজা করিলে আমরা বর পাইব। কারণ

"অনেকদিন মা পায়নি পূজা
সাগর পরা শ্যামল ভুজা
নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙ্গা কর !
আয়রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর।

এমনই করিয়া যেদিন এ দেশের সকল জাতি নির্ব্বিশেষে আত্মত্যাগ করিয়া মাতৃপূজার জন্য—

"হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত,
আর যা লাগে সে সমস্ত"

দিতে পারিবে—সেদিন কি বলা যায় না—

"আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর ?

এই কথাই আর একদিন ভাঙ্গাচুরা ভাষায় হিন্দু মোসলমানকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। যখন বঙ্গ ভঙ্গে উল্লসিত ব্যক্তি বিশেষের উত্তেজনায় মুসলমান হিন্দুতে ঝগড়া বাধিয়া উঠে; তখন গোবিন্দ দাস লিখিলেন—

তোমরা মুসলমান !
অনেকেই হিন্দুর জাতি, অনেকেই হিন্দুর জ্ঞাতি
আমির ওম্‌রা অনেক তোমরা বেগম বিবি জান।
হিন্দুর গুড়ে মুড়্‌কী তৈয়ার তুর্কী তিহরাণ।
হিন্দুর অস্থি হিন্দুর চর্ম্ম, হিন্দুর আত্মা হিন্দুর ধর্ম্ম
মেদে মাথা বেদের ধর্ম্ম উপরে চাপকান।
পৈঁজে ঢাকেনি হিন্দুর গন্ধ, দাঁড়ি ঢাকেনি হিন্দুর ছন্দ
... ...
তোমরা যত সকল হিন্দু, তুমি তাহার বিন্দুর বিন্দু
শততম ডাইলুশনে হার্‌ছে হানিম্যান্‌।

তাই মোসলমানকে বলিতেছেন—আরে তোমরা কে ? তোমরা যে আমাদেরই ? আমরা ছাড়া তোমাদের মূলটা কোথায় শুনি !

কাদের রক্ত কাদের মাংস দেহে তোমার অধিকাংশ
ওজন করে বোঝ দেখি কার কি পরিমাণ।
ভারতের অদৃষ্ট মন্দ, তাই বোঝ না মূর্খ অন্ধ
আপনা বুকে আপনি আজি হাণ বজ্রবাণ।
... ...
হিন্দুর সাথে বিবাদ করা আপনা মরণ আপনি মরা
হিন্দু তোমার মজ্জা মগজ হিন্দু তোমার জ্ঞান।
হিন্দু ছাড়্‌লে মর্‌বে তুমি, গাছ বাঁচে কি বিনা ভূমি,
খোয়াব দেখ্‌ছ নোয়াব মিঞা বাগান বাবিলান।
... ...
আপনা বুকে মেরে ছুরি আর করো না বাহাদুরী
... ...
দুজনেতে হওহে মাল্লা মাঝি কর খোদাতাল্লা
ভাগ্যায়ে দিয়ে জীবন তরী দাঁড়ে মার টান।
নায়ের উপর পাল তুলে দাও মায়ের আঁচলখান
হিন্দু মুসলমান।

দেশহিতৈষণার কথা পাইলে গোবিন্দদাস খাতির ভুলিয়া সত্য বলিয়া বসিয়াছেন। গোবিন্দদাসের বিশেষত্বই এই। যখনই কিছু বলা আবশ্যক হইয়াছে তখনই দ্বিধাশূন্য হইয়া সত্য কথা বলিয়াছেন। যখনই দেশে আমোদ আহ্লাদের দিন আসিয়াছে, তখনই কবির বুকে হাহাকার উঠিয়াছে। ওগো, এ দেশের যে আমোদ আহ্লাদ অনেক দিন ঘুচিয়া গিয়াছে পরাধীনের আবার কিসের সুখ, কিসের আমোদ, কিসের আহ্লাদ ! পরাধীন—মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে দিন দিন অসার জাতির কিসের আনন্দ ? আনন্দের কথায় গোবিন্দদাস বড় ব্যথা পাইতেন। সৌরভ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কেদার বাবু যখন

গোবিন্দদাসকে 'সৌরভের' নববর্ষের নান্দী লিখিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন—তখন কবি তদুত্তরে দীর্ঘ কবিতা প্রেরণ করেন। কেদারবাবু ঐ কবিতার কিয়দংশ ত্যাগ না করিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। কি জ্বালাময়ী ভাষা! কি মর্ম্মঘাতী তিরস্কার!

"সৌরভে ডুবিল বঙ্গ, আবার সৌরভ?
আর এই ভস্ম ছাই চাহি না চাহি না ভাই।
চাহিনা ধ্বংসের এই পথ অভিনব।
... ...
বিলাসে বাঙ্গালা ভাসে অধঃপাতে যায়
ঘরে নাহি মুষ্টি অন্ন অনশনে অবসন্ন
বিকাইয়া ভিটা মাটি গেছে ঋণদায়,
তথাপি অটো ডি রোজ মাখা চাই রোজ রোজ
... ...
পথের মজুর কুলি অভুক্ত সন্তানে ভুলি
চায়ের পিয়ালা পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায়!
কোথা গয়া বিষ্ণুপুর কোন্ দিকে কতদূর
অম্বুরী তামাক তার চাষা কিনে খায়।
হেভেনা মেনিলা কই জানি না ত নাম বই
তার সিগারেট ছাড়া ধূম নাহি পিয়ে তারা
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায়?
... ...
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে লেস্ পেড়ে সাড়ী পরে,
সেমিজে কামিজে গাউনে উড়ে পরিমল!
... ...
এ পরী পোষিতে গিয়া কত ঘর দেউলিয়া
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রু জল!

বঙ্গের এই দুর্দ্দশার কারণও কবি নির্ণয় করিয়াছেন,—

নাহি সেই ব্রহ্মচর্য্য নাহি সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য
... ...
শান্তনু রাজার মত দিবা স্বপ্ন দেখে কত

অপর দিকে আমাদের—"স্কুলের বালিকা ছাত্রী"দিগেরও বর্ত্তমান শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।

হার্ম্মোনিয়মের গানে পিয়ানোর তানে তানে
কুটীরে কাঁপায়ে তোলে পিক কোলাহল!
তারা ও স্বপন গড়ে কেহ দীঘি সরোবরে
সাঁতারে প্রতাপ সহ——
এ পাখী পিঞ্জরে হায় আর না কি রাখা যায়?
সে নাকি পরিতে চায় চরণে শৃঙ্খল?

এত বড় কথাটা মুখ ফুটিয়া ত অনেকেই বলিতে পারেন না! বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষায় ও স্ত্রী স্বাধীনতার আভাসে দেশে যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে, গোবিন্দ চন্দ্র নির্ভয়ে তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি এহেন শিক্ষিতা নারীর পতির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"প্রীতি কুকুরের মত, প্রহরে প্রহরে কত,
ফুকারে কতুর পতি—আঁখি ভরা জল,
বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ—যায় রসাতল।

মনের দুঃখ সামলাইতে না পারিয়া কবি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

"চাহিয়া দেখে না পাছে কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা ধর্ম্মে অনুরক্তি কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি,
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন?
কোথা সেই কর্ম্মশক্তি কোথা দৃঢ়পণ?
কোথা আছে সে মহত্ত্ব কার আছে পুরুষত্ব
ক্লীবত্ব পেয়েছে পার্থ—কুন্তীর নন্দন!
... ...
এ যে গো জাতির এক বীভৎস মরণ!
... ...
সামান্য ধনের আশে বিনাশিছে অনায়াসে
জাতীয় জীবন শক্তি স্বাস্থ্য কলেবর—

কবি তাঁহার সম্পাদক বন্ধুকে লিখিলেন—

পার যদি আন বন্ধু, করিয়া চয়ন
সে দিব্য অমৃত গন্ধ—মৃত সঞ্জীবন!

তেজ বীর্য্য মহিমার, আন সেই পুষ্পসার
অতীত সে অযোধ্যার সৌভ্রাত্র জীবন,
চিতোরের গিরি ঘাটে পাইবে চিতার কাঠে—
নন্দন চন্দন গন্ধ বহে সমীরণ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মভূমি কর্ষিয়া ধর্ষিয়া তুমি—
সে বীর্য্য বীরণ মূল কর উত্তোলন।
হোম ধূম গন্ধ মাখা, কৌমুদী কলঙ্ক ছাকা
আহরিয়া আন সেই ঋষির জীবন।

আমরা কবির এই সৌরভ কল্পনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই, ধন্য হই। আর যখন ভাবি এই কবি এই অধঃপতিত দেশেরই সন্তান। তখন বাস্তবিকই গর্ব্ব অনুভব করি। কবি গোবিন্দ দাস এর পর বলিতেছেন,—

"পদ্মিনী চিতার ছাই, সুগন্ধি পাউডার তাই
রমণী রঞ্জিতে দেও চারু চন্দ্রানন।
"অকর্ম্মের" সে মর্ম্ম ঝরা সতীর গৌরব ভরা—
সৌরভে সিন্দুর রচ সীমন্ত শোভন।
যে সৌরভে যাজ্ঞসেনী বান্ধিলা বিমুক্ত বেণী
দেও সে আনিয়া পুণ্য কেশ প্রসাধন।

... ...

হে বন্ধু পারফিউমার কি কব অধিক আর
ত্যজ স্বার্থ রচ শয্যা ভীষ্মের শয়ন।

দেশোদ্ধার করিতে হইলে ইহাই আবশ্যক। দেশ হিতৈষীর যোগ্য কথা অন্যরূপ হইতে পারে না। তাই কবি বলেন,—

এ উগ্র তৃষ্ণার বারি নহে যোগ্য স্বর্ণ ঝারি
পুণ্য ভোগবতী পুনঃ কর উত্তোলন।

এ যদি করিতে পার, তবে—

যাবে দুঃখ যাবে তাপ যুগান্তের অভিশাপ
সকল সন্তাপ জ্বালা হইবে বারণ।
এ বিলাসে এ সৌরভে জাগে মৃত প্রাণ
নব আশা অনুরাগে নূতন চেতনা জাগে
জাগে সে জাতীয় গর্ব্ব স্পর্দ্ধা অভিমান।
জেগে উঠে কর্ম্ম শক্তি—
এ গন্ধ অমৃত শ্বাসে বিশল্য করণী বাসে
উঠে দণ্ডে লাফাইয়া নাড়ী মজ্জমান।

এইই কবির চির পোষিত আশা। এই আশা লইয়াই কবি জগতে আসিয়াছিলেন, এই আশা বুকে লইয়াই তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কারণ মৌখিক শিষ্টাচার, মৌখিক স্বদেশ প্রীতি তিনি সহিতে পারিতেন না। স্বদেশ হিতৈষণাকে তিনি ছেলে খেলা মনে করিতেন না। তিনি ত স্বদেশী বক্তা, নেতা, গায়ক-গণকে, স্বদেশ প্রেমে মত্তগণকে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে এ দেশ তোদের নয়,
এই যমুনা গঙ্গানদী এ দেশ তোদের হতো যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?

... ...

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা তোমার নয় ত একটী ছড়া,
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাওনা একটী মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি জগৎ ভরা জয়।

... ...

চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়।

... ...

রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়।

... ...

একশ রকম ট্যাক্স দিবা, ব্যয়ের বেলা তোমরা কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয়?

... ...

নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম অন্ধ কাণা খোঁড়া
ভিডিয়ালা পাঙ্খাকুলী পিলে ফাটার ভয়।

কার স্বদেশে সর্ব্বদেশে এমন অভিনয়!

এমনই করিয়া কবি গোবিন্দ দাস দেশবাসীকে "স্বদেশ" অর্থ বুঝাইলেন। এমনই করিয়া অকুতোভয়ে সত্যি সত্যি ঘটনাগুলি 'চুচো'খে আঙুল দিয়া' দেখাইয়া দিলেন। যারা—

"ঘুসির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়'
... এ দেশ তাদের নয়"

অনেকে 'সোণার বাংলা' 'সোণার ভারত' বলিয়া দেশকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। গোবিন্দদাস এই ভণ্ডামির চির বিরোধী। তিনি টিট্‌কারী দিয়া কহিলেন,—

"সোণা যাদু মিষ্টি ভাষে ছেলে মেয়ে কোলে আসে"

ওগো—'স্বদেশ' মত অবুঝ ছেলে মেয়ে নয়। কারণ সে কাজ চাহে। তাই কবি স্পষ্ট ভাষায় কহিলেন,—

"স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে—কাজের পরিচয়"

এর পর কবি 'স্বদেশ' দাবী এ দেশের উপর কাহারা করিতে পারিত, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

কই সে শিল্প কই সে কৃষি কই সে যজ্ঞ কই সে ঋষি
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়?
কোথায় সে ব্রহ্মচর্য্য, অসীম স্থৈর্য্য অসীম ধৈর্য্য
কৈ বা উগ্র সে তপস্যা ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম শৌর্য্য বীর্য্য অসুর পরাজয়?

আর যারা স্বদেশ স্বদেশ বলেন,—

স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি চম্‌কে উঠিস্ ভেড়াগুলি
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়?
প্রতি জনের প্রতি বক্ষে কোটী কোটী লক্ষে লক্ষে
কৈ সে তাদের দেশ ভক্তির দুর্গ সমুদয়?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নি সিন্ধু কৈ সে বুকের রক্ত বিন্দু
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রু কুল ক্ষয়!
... তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়।
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি তাইতে তারা দৈত্য নাশি
পুণ্য ভূমি ভারত ভূমি প্রথম করে জয়!
তাদের "স্বদেশ" ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

আর—

"তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।"

এমন সাফ সত্য কথা, এমন করিয়া নিজ দুঃখ দৈন্যের চিত্র অঙ্কনে কয়জন কবি সমর্থ হইয়াছেন? কবিবরের এই স্বদেশিকতা তাঁহার প্রত্যেক কবিতায় পরিস্ফুট। এখানে নকল নাই—সাঁচ্চার কাজ!

টিটানিক নিমজ্জনে যখন দেশের মানুষ সমবেদনায় হা হুতাশ করিতেছিলেন; গোবিন্দদাস তখন ইংরেজকে "আসল মানুষ" উপাধি দিয়া লিখিলেন—

বাঁচ্‌তে তোম্‌রা লজ্জায় মর মর্‌তে তোমরা গর্ব্ব কর
... ...
তোমাদের কি ডুব্‌ছে তরী! পাগলে কয়! হেসে মরি!
কাল সাগরে যাচ্ছে ভেসে কেতন বিজয়ীর।
... ...
অতীত মরা জাতির সুধা পতিত পাবনীর।
বণিক বৃটন তুমি ধন্য পুণ্যকীর্ত্তি তোমার পণ্য
আন্‌লে আজ যে দেশের জন্য জীবন মূল্যে বীর।
... ...
এক জীবনে লক্ষ জীবন রুদ্র তেজস্বীর।

তখনই কবির নিজের দেশের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। অমনি নিজের অবস্থার কথা লিখিলেন—

"আমি ত বুঝি না নিজে, তোমার কাছে আম্‌রা কি যে
ক্ষোভে লাজে বক্ষ ভিজে চক্ষে বহে নীর।"

এই পর্য্যন্ত! আর ত তাঁর ভাষায় জুয়ায় না। নিজের

অকর্মতায় কবির কণ্ঠ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে কবি পরের গুণ বর্ণনায়, পরের স্বদেশ প্রেমে এমন করিয়া স্পষ্ট ভাবিতার পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় না কি?

"নূতন ও পুরাতন" বর্ণনায় কবি—

"নব বর্ষ, নূতন হর্ষ—নূতন আশা তার,
কেবল যাচ্ঞা কেবল ভিক্ষা—কেবল হাহাকার।

চির ভিক্ষুক ত আমরা নহি! আমরা আজ কথায় কাজে, কংগ্রেসে কন্ফারেন্সে, সমাজে সমিতিতে কেবলই প্রার্থনা করি। আমরা অতীতের দিকে চাহি না,—অতীতের সাধনার সংবাদ পাই না! কেবল দেহি দেহি। কবি এই দেহি দেহির বিরোধী। তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—

"কল্পতরু পুরাতনে অভাব আমার নাই।"

তিনি অতীতের শক্তি গাথা, অতীতের সম্পদের কাহিনী, অতীতের পুরাতনের আমাদেরই ইতিহাস আবার খুলিয়া দিয়া বলিলেন—চেয়ে দেখ—

"আমার বিদ্যা আমার জ্ঞান আমার যাহা সব
চির সত্য আত্ম তত্ত্ব নিত্য অভিনব!
নাইকো তাহার ধ্বংস বিনাশ নাইক তাহার ক্ষয়,
ফুলের সঙ্গে মূলের মত বীজের ভাবে রয়।
লুপ্ত নয় সে যোগ তপস্যা সুপ্ত ভাবে আছে,
গুপ্তভাবে যোগের শিখা হিয়ায় হিয়ায় নাচে
অস্থি তাহার সমিধ কাষ্ঠ, মজ্জা তাহার হবি
জ্বল্‌ছে যজ্ঞ জাতির বুকে স্বপ্নে দেখে কবি।"

["সৌরভ।"

এই কবিতায় কবি অতি নিপুণ চিত্রকরের মত আমাদের অতীতের কাহিনী, পুরাতনের কথাগুলি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। রসজ্ঞ পাঠক ইহাতে তৃপ্তি পাইবেন; আর চির জানা কথাগুলি বিস্মৃতির গর্ভ হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চিত্ত দখল করিয়া রাখিবে। গোবিন্দচন্দ্র দেশ সেবক ছিলেন। তাঁহার অর্থ ছিল না, বিত্ত ছিল না. সহায় সম্পদ বন্ধু বান্ধবও বড় বেশী ছিল না। কারণ অর্থ থাকিলে সকলেরই দেখা পাওয়া যায়। এসব না থাকিলেও ভগবান তাঁহাকে অতি বড় বস্তুর অধিকারী করিয়াছিলেন.—তাহা "আত্মনির্ভরশীলতা।" গোবিন্দ দাস আপনার হৃদয়ের উপর আমরণ নির্ভর করিতেন। আপনার তেজস্বিতা নির্ভীকতা তাঁহার চির সঙ্গী ছিল। যাঁহারা গোবিন্দ দাসকে জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন—এই দরিদ্র কবি দারিদ্র্যের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটাইলেও দারিদ্র্যতার গলা চাপিয়া ধরিয়াই চিরজয়ী বীরের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে কি এত তেজোস্বিতাপূর্ণ কবিতা বাহির হইত। চির নির্ভীক কবি যাহাকেই স্বার্থপর, মনমুখে বিভিন্ন ভাব দেখিয়াছেন, তাহাকেই স্পষ্ট কথায় শুনাইয়া দিয়াছেন। কোন জমিদার নাকি বলিয়াছিলেন "গোবিন্দ দাসের মৃত্যুর পর তাহার চিতায় মঠ দিতে হইবে।" গোবিন্দ দাস তদুত্তরে লিখিলেন,—

"পাখীও ত গাছের ডালে
আপন বাসায় শাবক পালে
আমার নাই সে বাসা, নাই সে আশা
কেমন বিপদ কি শঙ্কট!
আমি থাকি পরের বাড়ী
নিয়ে ছেলেপিলে নারী
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি
বাপদাদার সে ভাঙ্গা ঘট!
... ...
আমি আজ
স্বদেশচ্যুত বিদেশবাসী
পরদেশে পরপ্রত্যাশী
... ...
কত বন্ধু দেশের নেতা
মুখবন্ধ স্বাধীনচেতা

কাজের বেলায় আর এক কেতা
হৃদয় ভরা ঘোর কপট!
লেখক মেরে অনাহারে
লুটবে টাকা উপহারে
সাহিত্যের সে কসাই বন্ধু
বিষম ধূর্ত্ত বিষম শঠ!
আমি মলে তোমরা আমার
চিতায় দিবে মঠ!

তারপর যাহা ঘটিবে, কবি দিব্যচক্ষে সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আগেই লিখিলেন,—

চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,
গড়বে উঁচু অর্দ্ধ দেহ
ছায়াচিত্র রাখবে কেহ
কেউ বা তৈল চিত্রপট।
করবে তোমরা শোকসভা
চক্ষে চস্‌মা শ্বেত জবা
ওষ্ঠে চুরট ধূম্রপ্রভা
করতালি চট্ চট্।

ঠিক এমনই এক শোকসভা ঢাকা'র বা'র লাইব্রেরীতে হইয়াছিল। সেখানে ত অনেক বড় বড় কথাও শুনিয়াছিলাম, কাজে কি হইয়াছে, এখনো শুনি নাই। এ সকল অপ্রিয় সত্যের স্থান এই প্রবন্ধ নহে, বারান্তরে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

১৩১৮ সনে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সম্মিলন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের কবি (যদিও তিনি ভাওয়ালের কবি নামে পরিচিত) গোবিন্দচন্দ্রকে কয়েকমাস পূর্ব্বেই ময়মনসিংহে নিয়া সাম্মলনের উদ্বোধন কবিতা এবং তৎ-সংসৃষ্ট প্রদর্শনীর জন্য সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কবি যে উদ্বোধন কবিতা লিখিয়াছিলেন; তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাক উড্‌কে কোন ভদ্রলোক সম্মিলনের পূর্ব্বে সেই কবিতা শুনাইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—এই অগ্নিবর্ষী কবিতা সভায় পাঠ করিতে দেওয়া যায় না। যদিও এই কবিতাটী গৌরবের বিষয়, তথাপি এ সম্বন্ধে সংযত হইয়া বলা উচিত। সেই কবিতার কতক অংশ পঠিত হয়—তাহাতে ভাব ও ভাষার কি তেজ!

"রোধিত কণ্ঠে বোধিত বীণা
আজ বাজবে কিনা, আর বাজবে কিনা!
মূকের যেমন বুকের বাসনা
রহে চিরদিন আঁধারে লীনা!
রুদ্ধ কণ্ঠে কেমনে সেবি
কণ্ঠবাসিনী বাক্‌দেবী,
সকলি বিফল সকলি ব্যর্থ
স্বাধীনা ভাষা ভৈরবী বাণা!

পাঠক, ইহাতেই বুঝিবেন, কবির উপর শতমণ পাথর চাপিয়া দিয়া কবিতা বাহির করা হইয়াছে,—যাহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাহা বাহির হইতে পারে নাই। তাহাও কবি স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

ত্রাসিত অন্তর ত্রাসিত অন্ত্র
বিবশ বিকল জীবন যন্ত্র
পেষিত পুরাণ ক্লেশিত তন্ত্র
কাতর মন্ত্র শকতিহীনা!

কবির অন্য গতি ছিল না। বুকের ভাব চাপিয়া মুখে আর এক কথা বলার অভ্যাস ত তাঁহার নাই। তথাপি—

"পূজিব জননী তথাপি আশা
না থাক শক্তি না থাক ভাষা
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে আকাঙ্ক্ষা পিপাসা
বুঝিবে জননী সরোজাসীনা!

এই কবিতার এইখানেই সমাপ্তি! অথবা মুখবন্ধেই মুখবন্ধ। তারপর বন্ধুবর্গের আবাহন মন্ত্র। তাহাও সেই স্বদেশ হিতৈষণার পুণ্য জাহ্নবী জলে অভিষিক্ত! জননী

জন্মভূমির হৃদয়বান সন্তান—এখানেও উধাও কণ্ঠে গাইলেন—

"মাতৃহত্যা পাপে কারো নাহি পরিত্রাণ—
নাহি প্রায়শ্চিত্ত তার, নাহিক উদ্ধার আর
অনন্ত নরকে তার চির অবস্থান।
সে যে জগতের কাছে, জীবনে মরিয়া আছে
কেবল অদৃষ্টে তার ঘৃণা অপমান।
নাহি মিলে ভিক্ষা তার, সুধু অশ্রু হাহাকার
অনাহারে অনশনে সদা যায় প্রাণ!
বাহু শূন্য রাহু যথা, ভ্রমে হায় যথা তথা
লইয়া অনন্ত ব্যথা নিশি দিনমান।

... ...

হিন্দু মুসলমানে দ্বেষ, নাহি ভ্রাতৃস্নেহ লেশ,
পরস্পর হিংসা খালি ঈর্ষা বুক ভরা,
এ বিষম ভ্রাতৃভেদ, কুঠারে হইল ছেদ
মায়ের কোমল বক্ষ—মা ইহাতে মরা!

... ...

এ কুঠার আমি তুমি ছেদিয়াছি মাতৃভূমি
জননী আনন্দময়ী শ্যামলা উর্ব্বরা!

... ...

ঘুচিবে সকল ক্লেশ, ঘুচিবে মলিন বেশ
উজলিবে দিক দেশ সারা বসুন্ধরা,
বিশ্ব দিবে জয়ধ্বনি, অলকা বর্ষিবে মণি,
দেবতা বর্ষিবে সুধা পারিজাত ভরা,
জগতে হইব ধৈন্য আবার আমরা?

ইহাই কবির চিরন্তন আশা!

এমন মন প্রাণ খোলা এমন নিঃসন্দেহে ভাব প্রকাশক কবিতা কয়জন লিখিয়াছেন? কার হাতে এমন নিছক চিত্র হুবহু ফুটিয়া উঠিয়াছে! এমন ওজস্বিনী ভাষায় মনের কথা মুখ ফুটিয়া কৈ কেহত বলে না! হেমচন্দ্রে যাহা 'ভিক্ষা' গোবিন্দচন্দ্রে তাহা উপেক্ষনীয়। তিনি ভিক্ষার বিরোধী। নবীনচন্দ্রের

"যেই মহা অগ্নি ভীষ্মের পিপাসা
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তায়
ধরিয়া গাণ্ডীব ভারতের আশা
ভারতের বক্ষ করহ বিদায়—"

এক গোবিন্দচন্দ্রের ভাষায় পাই! কারণ তিনিও শক্তির পূজা চাহেন নিজ শক্তির দাবী করিয়া,—ভিক্ষায় নহে। অন্যে ত এ পূজা করিতে ইচ্ছা করিবে না। কারণ

"কোন রাজা কোন ভক্তে পূজেনি পশুর রক্তে
এ যে পিশাচের পূজা—প্রেতের কীর্ত্তন"

এ বিষয়ে অবশ্য মত ভেদ আছে। এ কথা সত্য যে

"পশু বলে এ ভারত হবে না উদ্ধার!

কবি দেশ উদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন,—

গড় সে প্রতিমাখানি, মমতার মহারাণী
বিশ্ব বিজয়িনী শক্তি স্নেহ করুণার,
কান্তি পুষ্টি শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্মারূপা আত্মাশক্তি
স্নেহ দয়া দশ অস্ত্র দশ হাতে তার!

... ...

তারি শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁরে, পূজ আত্ম উপহারে

কবি দুই যুগ পূর্ব্বে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহে ৬ষ্ঠ সারস্বত উৎসব উপলক্ষে ১২৮৯ সালের ১লা ফাল্গুন কবি গোবিন্দ চন্দ্র একটী কবিতা পাঠ করেন। তাহাও দেশাত্মবোধের নিদর্শন। তাহার প্রার্থনাও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ!

"কোলে বীণা ছিন্ন তার, বাজেনা দীপক আর
গরজেনা মেঘে মেঘ হিমাদ্রি কটিতে।
সঞ্জীবনী শক্তিহীন, ও বীণা অনেক দিন

... ...

পারে না অমর বল মৃত দেহে দিতে!
একেই ভারত হায়, নিত্য অধঃপাতে যায়,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আরো হলাহল,

... ...

এ দেশে এ-দগ্ধ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ!

... ...

এখানে বিলাস বেশ;—নাহি প্রয়োজন!

... ...

এ দেশে তোমারে দেবি যদি কোটীযুগ সেবি
এ মূর্ত্তি হইতে আশা হবে না পূরণ!
যে গভীর উচ্চ আশা, মৃত প্রাণে যে পিপাসা
এ মূর্ত্তি পূজিয়া পূর্ণ হবে না সে পণ!

কবি যে মূর্ত্তি পূজার উদ্বোধন করিয়াছেন, আজ তাহা কলমেতে মুখে বাহির করিতে লেখক ইতস্ততঃ করিবেন, —সম্পাদক আপত্তি করিবেন। অথচ গোবিন্দ চন্দ্র নির্ভয়ে তাহা বলিয়া বাণীর পূজা শেষ করিলেন।

স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা" ও আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকারের নব-জীবনে গোবিন্দ চন্দ্রের যে সকল দেশাত্ম বোধক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই আর পাওয়ার উপায় নাই। বীণার প্রকাশিত দুর্গোৎসব কবিতায়—

"কেন আজি শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর মহারোলে
জাগাইয়া ভারতের প্রদোষ অম্বর?

... ...

হৃদয় উন্মাদ রক্ত আছাড়িয়া পড়ে।

... ...

এই দিন ভারতের কত পুণ্যময়
অনন্ত নরকে বহে মলয় বাতাস

কবি আশার স্বপ্ন দেখিয়াছেন,—

"স্বর্গীয় সৌরভে পূরিয়া দিক্
হাসিবে ভারত অমরা হাসি
মরম ভরিয়া আশা মিটাইয়া
দেখিবে ভূলোক দ্যুলোক বাসী।"

... .

"দেখলো কমলে! সে মহাভারত
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ছবি।"

যাহার হৃদয় ভরা প্রেম থাকে, সে-ই সেই উন্মুখ প্রেম যোগ্য পাত্রেই নিবেদন করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ। গোবিন্দচন্দ্র স্বদেশ প্রেমের কবিতায় যেমন অতুলনীয়, পত্নী প্রেমে পুত্র প্রেমেও তেমনই ভরপুর। আমরা সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পত্নীপ্রেমের মধ্যেও কবি আপনার দেশের ছায়া চিত্র দেখিয়া অলক্ষিতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন। প্রেমিক কবি পত্নীর আশাপথ চাহিয়া 'এ বাড়ী' 'ও বাড়ী' খুজিয়া হয়রাণ হইলেও—

"চাহি না কৈলাস কাশী দেবপুর ভালবাসি
আমি সে দেশের দাস—
আমি "তোমাকেও" শ্রদ্ধা করি কিন্তু—
তোমারে দেশের সহ, প্রাণে পূজি অহরহ"

এমন ছত্র বঙ্গ কবিতায় আর আছে কি? পত্নীকে হৃদয়ের প্রেম পুষ্পাঞ্জলি—তাহাও "তোমারে দেশের সহ" পূজা করি বলিয়া দেশ মাতৃকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাতে—

"প্রাণে পাই নব বল নবীন ক্ষমতা
ভুলে যাই রোগ শোক, পাপ পুণ্য পরলোক
দূরে যায় ডর ভয় আলস্য জড়তা।"

দেশ সেবা করিতে রোগ শোক, পাপ পুণ্য পরলোক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যেন কবি কোন অত্যুচ্চ সোপানে ধ্যান মগ্ন হইয়া আছেন; কি উচ্চ গ্রামে তাহার বক্ষ বাঁধা আমরা তাহা কি বুঝিব? কর্ত্তব্যপরায়ণ কবি "কর্ত্তব্য" নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লেখিয়াছেন,—

"শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক"।

কারণ— "অযুত আঘাতে নিত্য—
পড়িতে হইবে চিত্ত
যুদ্ধ জয়েচ্ছুক!

শিরোপরে শত বজ্র গর্জ্জিবে গর্জ্জুক
রহ হিমাদ্রির মত
হইও না অবনত
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ !
... ...
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক
দেও অস্থি মেদ মজ্জা লাগে যতটুক
শত সূর্য্য করি গুড়া
গড় সে উজ্জ্বল চূড়া
দেবতা দেখুক।

এমন কর্ত্তব্য করিতে গেলে অনেক ত্যাগ করিতে হয়। অনেক দুঃখ বিপদ আসিবে। তাই কবি সতর্ক করিয়াছেন—

সংসারের শত দুঃখ আসিবে আসুক !
ক্ষুধাতুর শিশুবক্ষে—
উপবাসী নারী চক্ষে—
চাহিয়া দেখোনা তার ম্লান অশ্রুটুক
ফিরিয়া শুনো না তার
অন্ন বিনা হাহাকার—
কাঁদিবে কাঁদুক।
বীরের সন্ন্যাস ধর্ম্ম
ছিঁড়ে ফেলা হৃদ্মর্ম্ম
কর্ত্তব্য রাখিতে জাগরূক !

দেশ হিতৈষণার জন্য এতখানি কর্ত্তব্য করিতে স্থির করিয়া পরে অগ্রসর হইতে হইবে।

"বঙ্গবাসী" যখন কংগ্রেসের উপর "পঞ্চনন্দী" ঠাট্টা করিতে গিয়া "কঙ্গরসের রঙ্গরসে দাদার আমোদ ভারী" বলিয়া চক্ষু ঠারিতে ছিলেন, তখন গোবিন্দ দাস গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কি ?—দেশের এমন মহাযজ্ঞের উপর ঠাট্টা ?

"তুমি ত বোঝ না অজ্ঞ,
এ মহা জাতীয় যজ্ঞ
ধমনী চুয়ান নাহি চিন সোমরস।
এ যে মহা মাতৃপূজা
... ...
কাণে তালা চক্ষে ঠুলি
একবার দেখ খুলি
... ...
জান না জাতীয় যাগে
অস্থির সমিধ লাগে,
হবির্ম্মেধ, মহাচরু মজ্জার পায়স !
হিমাদ্রি এ মহাযূপ
আত্মদ্রোহী পশুরূপ
... ...
এ যে সঞ্জীবনী সুরা
আগ্নেয় আনন্দ পূরা
এ যে অমরের সেব্য অমৃত সরস।
... ...
এ অনন্ত সুধা পানে, দৈববল জাগে প্রাণে
... ...
ভগ্ন অস্থি লাগে যোড়া, ভাল লাগে কাণা খোঁড়া
উল্লাসে নাচিয়া উঠে ধমনী অবশ !
যারা খায় জুতা লাথি, জাগে সেই মৃত জাতি
তাদেরি বিজয় কেতু উড়ে দশদিক্।
... ...
যুগ যুগান্তর ফিরে, পুণ্য ভাগীরথী তীরে
দেখ কি অপূর্ব্ব যজ্ঞে মুগ্ধ দিক্ দশ !
এক প্রাণে সবে মিশি, হিন্দু মুসলমান ঋষি,
গায় শোন নব ঋক্ গায়ত্রী ছন্দস্
... ...
এ মহান্ প্রজা হোমে, কবোষ্ণ শোণিত সোমে
সদা প্রীত প্রজাপতি সহস্র শিরস্।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস সম্বন্ধে গোবিন্দ চন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন কোন দেশ নেতার এত খানি বলিবার স্পর্দ্ধা ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বন-লতা।

১

আমার ঘরের জান্‌লা দিয়ে
ঢুক্‌ল এ কোন্ লতা,—
অবোড়া বালার সরমখানি
কর্‌ল কি তায় নতা?
আমার প্রিয়ার বাহুর মত
পরশটী তার কোমল কত!—
যেন সে আমায় বেড়ায় খুঁজি'
বাঁধ্‌তে হিয়ায় তেম্‌নি বুঝি
কইতে গোপন কথা!
আমার ঘরের জান্‌লা দিয়ে
ঢুক্‌ল এ কোন্ লতা!

২

আমার মনের প্রেমের রাণী
বনের রাণীর সাজে,
আস্‌ল কি আজ ভুলাতে মোরে
আমার ঘরের মাঝে।
চেয়ে তার ওই ফুলের পানে
প্রিয়ার মুখটী জাগ্‌ছে প্রাণে!—
বুকটী আমার কেমন করে
না জানি গো আজ উঠ্‌ছে ভরে
সকল বিফল-কাজে!
আস্‌ল কি মোর মনের রাণী
বনের রাণীর সাজে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

অষ্টম প্রস্তাব—দ্বিতীয় অংশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একদিন গেল, দুইদিন গেল, নিসির দেশের পর্ব্বত তরনীকে থামাইয়া দিল, আর তাহাকে ভাসিতে দিল না। তিন দিন গেল, চারি দিন গেল, নিসির দেশের পর্ব্বত তরণীকে থামাইয়া দিল, আর তাহাকে ভাসিতে দিল না। পাঁচ দিন গেল, ছয়দিন গেল, নিসির দেশের পর্ব্বত নৌকাকে থামাইয়া দিল, আর উহাকে ভাসিতে দিল না। সপ্তম দিবস প্রাতে, আমি একটি কপোতকে জাহাজ হইতে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলাম; কপোত উড়িয়া গেল, কিন্তু কোথায়ও বসিবার স্থান না পাইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। আমি একটি সোয়ালো-পাখীকে ছাড়িয়া দিলাম, সে উড়িতে লাগিল। কিন্তু বসিবার স্থান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি একটি দাঁড়কাককে ছাড়িয়া দিলাম, সে উড়িয়া গেল, এবং দেখিল যে জল সরিয়া গিয়াছে, এবং পাখা নাড়িতে নাড়িতে জাহাজের নিকটে আসিল, "কা" "কা" রবে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু আর জাহাজে ফিরিয়া আসিল

না।" এইরূপে রাজা সামাষনপিষ্টিম জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইলেন * ।

* "Six days and nights the wind continued, the deluge and the tempest raged. The seventh day at day break the storm abated; the deluge, which had carried on war-fare like an army, ceased, the sea became calm and the hurricane disappeared, the deluge ceased. I surveyed the sea with my eyes, raising my voice; but all mankind had returned to clay, neither fields nor woods could be distinguished......At the end of twelve days, a point of land stood up from the waters, the ship touched the land of Nisir: the mountain of Nisir stopped the ship and permitted it to float no longer. One day, two days, the mountain of Nisir stopped the ship and permitted it to float no longer. Five days, six days, the mountain of Nisir stopped the ship and permitted it to float no longer. The seventh day, at dawn, I took out a dove and let it go; the dove went, turned about, and as there was no place to alight upon, came back. I took out a swallow and let it go; the swallow went, turned about, and as there was no place to alight upon, came back. I took out a raven and let it go; the raven went and saw that the water had abated, and came near the ship flapping its wings, croaking, and returned no more". Shamashnapistim escaped from the deluge. Ibid pp. 569-570.

মহাভারতীয় এবং মৎস্যপুরাণীয় আখ্যানে সূর্য্যপুত্র মনু মহারাজ মৎস্যরূপী ভগবানের কৃপায় নৌকাযোগে প্রলয়প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তিনি ভগবানের আদেশমত সর্ব্বসৃষ্টির বীজ লইয়া সেই নৌকায় উঠিয়াছিলেন আর ক্যাল্‌ডীয় ইষ্টকলিপির উপাখ্যানেও "সামাষনপিষ্টিম" রাজা ("সামাষ" আরবী শব্দ অর্থে সূর্য.—জীবনের সূর্য) "য়া" দেবের উপদেশ মত সর্ব্ব-শ্রেণীর প্রাণীর জীবনের বীজ লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন এবং উভয়ের নৌকাই পর্ব্বতবিশেষের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ক্যালডীয় এই উপাখ্যান অতিশয় প্রাচীন এবং পুরাতন বাইবেলের লিখিত জলপ্লাবনের বিবরণের মূল এই ক্যালডীয় উপাখ্যান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল।

পুরাতন বাইবেলের মতে সৃষ্টির ১৬৫৫ বৎসর পরে জলপ্লাবন হইয়াছিল; ইহা সৃষ্টিবিবরণ (বা জেনিসিস) পুস্তকের সপ্তমাধ্যায়ের পার্শ্বলিপিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাইবেলের মতে খৃঃ পূঃ ৪০০৪ অব্দে সৃষ্টির প্রথম বিকাশ হইয়াছিল এবং ২৩৪৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জলপ্লাবন হইয়াছিল। বাইবেলের বিবরণ এইরূপ;—*

* 13. "And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me: for the earth is filled with violence through them: and behold, I will destroy them with the earth, 14. Make the an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. 15. And this *is the fashion* which thou shalt make it *of*: The length of the ark *shall* be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits and the height of it thirty cubits. 16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou

'ঈশ্বর নোয়াকে বলিলেন' সমস্ত জীবের অন্তিম সময় উপস্থিত, আমি দেখিতেছি; কারণ জীবগণের জন্যেই পৃথিবীতে অত্যাচারের উপদ্রব হইয়াছে; এবং দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। ১৩। তুমি গোফার কাঠের একখানি জাহাজ প্রস্তুত কর, ঐ জাহাজের ভিতর কতকগুলি গৃহ কর, এবং পিচ দিয়া উহার ভিতর বাহির বেশ করিয়া লেপিয়া দাও। ১৪। এবং এই প্রকারে তুমি ইহাকে প্রস্তুত করিবে; ঐ জাহাজের দৈর্ঘ্য তিনশত হাত হইবে, বিস্তার পঞ্চাশ হাত হইবে, এবং উচ্চতা চল্লিশ হাত হইবে। ১৫। ঐ জাহাজে একটী জানালা রাখিবে এবং উপর হইতে এক হাতের মধ্যে ইহা রাখিবে, পার্শ্বের দিকে উহার দরজা রাখিবে এবং ঐ জাহাজকে নিম্ন, মধ্য ও উপর এই তিনতলায় বিভক্ত করিবে। ১৬। এবং দেখ, আমি, এমনকি আমিও, এই পৃথিবীর উপর জলপ্লাবন আনয়ন করিব,—যাহার দ্বারা আকাশের নিম্নে এবং পৃথিবীর উপরের যতকিছু দেহধারী প্রাণী আছে, সকলেই বিনষ্ট হইবে। ১৭। কিন্তু আমি তোমার সহিত প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা করিব, এবং তুমি তোমার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূগণের সহিত এই জাহাজে প্রবেশ করিবে। ১৮। এবং প্রত্যেক দেহধারী প্রাণীর প্রত্যেকের যোড়া যোড়া হিসাবে জাহাজের ভিতর তুমি তুলিয়া লইবে এবং বাঁচাইয়া রাখিবে, তাহাদের স্ত্রী পুরুষ হিসাবে যোড়া যোড়া লইবে। ১৯। পক্ষিগণের প্রত্যেক শ্রেণীর, পশুগণের প্রত্যেক শ্রেণীর, সরীসৃপদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর যোড়া যোড়া হিসাবে তোমার নিকট আসিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবে। ২০। তাহাদের খাদ্যও তুমি লইবে।

ঈশ্বর নোয়াকে যেরূপ আদেশ করিলেন, নোয়া ঠিক সেইরূপ করিলেন এবং তিনি তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূগণ ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ যোড়া যোড়া হিসাবে করিয়া তাহাদের সকলকে লইয়া জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে উঠিবার প্রাক্কালে ঈশ্বর নোয়াকে পুনশ্চ আদেশ করিলেন, "পবিত্র পশুর স্ত্রীপুরুষ হিসাবে সাত যোড়া করিয়া, এবং যে সকল পশু পবিত্র নহে, তাহাদের স্ত্রীপুরুষ হিসাবে দুইযোড়া এবং পক্ষিগণেরও ঐ সাত যোড়া করিয়া লইবে। কারণ, সাতদিন পরে চল্লিশ দিবারাত্রি ধরিয়া আমি পৃথিবীর উপরে বারিবর্ষণ করাইব এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে, আমার সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণীকেই বিনষ্ট করিব।" * নোয়া ঈশ্বরের আদেশ যথারীতি প্রতিপালন করিলেন।

finish it above; and the door of the ark thou shalt set in the side therof: *with* lower, second, and third *stories* shalt thou make it. 17. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein *is* the breath of life, from under heaven; *and* everything that *is* in the earth shall die. 18. But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons, wives with thee. 19. And of every living thing of all flesh two of every *sort* shalt thou bring into the ark, to keep *them* alive with thee; they shall be male and female. 20. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every *sort* shall come unto thee, to keep *them* alive. 21. And taken thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather *it* to thee; it shall be food for thee and for them. Genesis Ch. VI.

* Genesis—Chapter VII verdes 1 to 5.

সাত দিন পরে ঈশ্বরের কথামত বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সমুদ্রের প্রস্রবণগুলি মুক্ত হইল এবং আকাশেরও জানালাগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল; এবং চল্লিশ দিবা-রাত্রি ধরিয়া অবিশ্রাম বারিবর্ষণ চলিতে থাকিল। জল-প্লাবন চল্লিশ দিন ধরিয়া পৃথিবীতে রহিল এবং নোয়ার জাহাজ ভাসিয়া উঠিল। ক্রমশঃ প্লাবনের জলরাশি এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত সকলও জলে ডুবিয়া গেল এবং ভূচর, খেচর, উভচর ও জলচর প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক মনুষ্য, অধিক কি জীবমাত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিবসে, প্লাবনের জলরাশি সরিয়া গেলে, নোয়ার জাহাজ "আরারাট" দেশের পর্ব্বতের উপরে গিয়া স্থির হইল। তাহার পর ক্রমশঃ জল কমিতে কমিতে দশম মাসের প্রথম দিবসে পর্ব্বতের শৃঙ্গগুলি দেখা যাইতে লাগিল। তাহার চল্লিশ দিন পরে নোয়া জাহাজের জানালাটি খুলিয়া দিলেন; এবং দাঁড়কাককে ছাড়িয়া দিলেন, এবং যে পর্য্যন্ত পৃথিবীর উপর হইতে সমস্ত জল সরিয়া না গিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত সেই দাঁড়কাক ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে জলরাশি অপসৃত হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য নোয়া একটি কপোতকে ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু সেই কপোত জলময়ী পৃথিবীর কোথায়ও বসিবার স্থান না পাইয়া পুনশ্চ উড়িয়া আসিল এবং নোয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া জাহাজের ভিতর রাখিলেন। তাহার সাত দিন পরে আবার নোয়া ঐ কপোতকে ছাড়িয়া দিলেন এবং সে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে তাহার মুখে জলপাই গাছের একটি পাতা রহিয়াছে;— তাহাতে নোয়া বুঝিলেন যে পৃথিবী জলশূন্য হইয়াছে। তাহার সাতদিন পরে নোয়া ঐ কপোতকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার পর নোয়া ঈশ্বরের আদেশে সপরিবারে সর্ব্ব-জীবের সহিত জাহাজ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। *

কোরাণের স্থানে স্থানে এই বাইবেলের কথিত জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে †। উহাতেও নোয়া অথবা নুহ পয়গম্বরের সপরিবারে প্লাবন হইতে ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পাওয়ার আখ্যান প্রায় অবিকল বাইবেলের মতই দেখিতে পাওয়া যায়। কৌতুহলী পাঠক মিলাইয়া পড়িলেই উহাদের ঐক্য দেখিতে পাইবেন। কোরাণের আখ্যায়িকা বাইবেলের অনুরূপ বলিয়া আমরা কোরাণ-কথিত উপাখ্যান বর্ত্তমান প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিলাম না।

কোরাণের বয়স অদ্য হইতে প্রায় ত্রয়োদশ শত বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে, সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের তুলনায় বয়সে কোরাণই সর্ব্বকনিষ্ঠ। যে সময়ে আরবদেশে হজরত মহম্মদের নিকট কোরাণ আবির্ভূত হয়, সে সময় ঐ দেশে পারসীক "মাগ" মত, পুরাতন বাইবেলের য়াহুদীমত এবং খ্রীষ্টকথিত খৃষ্টানমত, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মমতই প্রচলিত ছিল ‡। কোরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জলপ্লাবন তত্ত্বও তাই খৃষ্টান এবং য়াহুদী মতের অনুসরণ করিয়াছে এবং য়াহুদীমতের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জলপ্লাবন তত্ত্বও প্রধানতঃ ক্যাল্‌ডিয়াদেশের প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছে। ক্যাল্‌ডিয়া দেশের প্রাচীন ইষ্টকফলক-লিপি হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে জলপ্লাবন সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাহাই আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংকলন করিয়া দিয়াছি এবং উহার সহিত প্রাচ্যমতের তুলনার সুবিধার জন্য

---

* Ibid—Chapter VII and chapter VIII.

† She Koran, Translated by George Sale. pp 110, 160, 279, 298 &c.

‡ Ibid—The preliminary discourese.

মহাভারতের বর্ণিত প্লাবনতত্ব যথাসম্ভব আমূল উদ্ধার করিয়াছি।

মহাভারতীয় উপাখ্যানের সহিত ক্যালডিয়া দেশের প্রাচীন উপাখ্যান মিলাইয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট মিল দেখিতে পাওয়া যায়, আবার সেইরূপ উহাদের মধ্যে মহাভারতীয় আখ্যানেরই অধিকতর প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারা যায়। উভয় কাহিনীতেই সূর্য্য সম্বন্ধীয় মানবরাজ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। মহাভারত যাঁহাকে সূর্য্যপুত্র (বৈবস্বত মনু) বলিয়াছেন, ক্যালডিয়ান কাহিনী তাঁহাকেই "সামাষ নপিষ্টিম" বলিয়াছেন ‡। বৈবস্বত মনুর তরনী প্লাবনশেষে হিমবান্ অথবা হিমালয়ের শৃঙ্গে লাগিয়াছিল, কালডিয়ার সূর্য্যপুত্রের জাহাজ নিশিরের শৈলশৃঙ্গের উপর ঠেকিয়াছিল, * এবং বাইবেলের নোয়ার জলযান আরারাট দেশের পর্ব্বত শিখরে লগ্ন হইয়াছিল। ক্যালডিয়া এবং এসিরিয়া দেশের লোকে নিশির পর্ব্বতকে তাঁহাদের দেশের উত্তরে স্থাপন করিয়াছে এবং পুরাতন বাইবেল পুস্তকের আখ্যান কার উহাই আরারাট দেশের পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন †। বর্ত্তমান পরিচিত আর্ম্মেনিয়া দেশের 'আরারাট পর্ব্বত' অবশ্য বাইবেলের 'আরারাট দেশের পর্ব্বত' নহে। এই নাম নিতান্ত আধুনিক ‡। যাহা হউক, ককেশাশ পর্ব্বতমালার কোন এক শৃঙ্গে সামাষনপিষ্টিমের জাহাজ ঠেকিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে আমরা দেখাইয়াছি যে এশিয়া মাইনার দেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে সুবিশাল শৈলমালা এসিয়া মহাদেশের বক্ষের উপর দিয়া বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, উহাই পুরাকালে হিমবান্ অথবা হিমালয় নামে ভারতীয় ঋষিগণের নিকট পরিচিত ছিল এবং আরিয়ান্ ষ্ট্রাবো, ও টলেমী প্রমুখ পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণও ঐ শৈলমালার একত্ব এবং উহাই দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে

‡ The name of this individual has been read in various ways. Shamash napistim, "sun of life", Sitnapistim, "the saned" for foot note 3, p 566, Prof *M*aspero's the Dawn of Civilisation. Ancient *C*hald*ea*a.

* "The mountain of Nisir is replaced in the version of Berossus by the Gordyæan mountains of classical geography ; a passage of Assur. Nazir Pal informs us that it was siluated betweeu the Tigris and the Great Zab (between 350 and 360 N latitude.) The Assyrian speaking people interpreted the name as *Salvation*, and a play upon words probably decided the placing upon its slopes the locality where those *saved* from the delnge landed on the abating of the waters." Foot note 1, p 570 Prof : Maspero's The Dawn of bivilisation.

† "The legend about the remains of the ark has passed into the Jewish tradition concerning the Deluge. Ibid, p 572, foot note 2.

‡ The ancient name of the Country Armenia was (according to the Assyrians) 'Nain' or Urartu, the latter being identical with the Biblical Ararat. The 'mount Ararat' is a misnomer, Ararat being a region or Country (Armenia) as may be seen even from Genesis 8. 4 'The ark rested……upon the mountains of Ararat" (c f 2 kings 19 : 37. Isa 37:38 ; Jer : 51 : 27)—Nelson's Encyclopædia Vol. II. p. 110 and p. 195.

কথিত হইত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ধারণা হইতেছে যে মহাভারতের "নৌবন্ধন শৃঙ্গ", ক্যালডিক কাহিনীর "নিশির পর্ব্বত" এবং পুরাতন বাইবেলের "আররাট দেশের শৈলশৃঙ্গ" একই বস্তু; কেবল দেশভেদে পৃথক্ নাম হইয়াছে মাত্র।

মহাভারতীয় আখ্যান যে মৌলিক, এবং ক্যালডীয় কাহিনী যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাহা উভয় আখ্যান পরস্পর তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতীয় আখ্যানে মৎস্যরূপী ভগবান বৈবস্বত মনুকে আদেশ করিলেন যে 'তুমি যাবতীয় স্থবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীর বীজ তোমার সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিবে।' (৩১।৩২শ শ্লোক) ক্যালডিয় কাহিনীর 'য়া' দেব তাঁহার ভক্ত রাজাকে আদেশ দিলেন যে 'তুমি ঐ জাহাজে জীবনের বীজ সকল তুলিয়া রাখ।' 'এই আদেশের বলে তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন, 'আমার যাহা কিছু ছিল, সোনারূপার দ্রব্য, পরিবারবর্গ, চাকর চাকরাণী, ভূচর গ্রাম্য ও অরণ্য জন্তু সব একত্রে জাহাজে লইয়া গেলাম।' মৎস্য মনুকে বলিয়াছিলেন, 'আপনি রজ্জুসমন্বিত দৃঢ় একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইবেন,' (৩১শ শ্লোক) আর 'য়া'দেব সামাষনপিষ্টিমকে বলিতেছেন, "জাহাজ ঠিক ঠিক মাপ জোক বুঝিয়া শুঝিয়া বানাইবে," তিনিও জাহাজের খোল ১৪০ হাত লম্বা, ১৪০ হাত বিস্তৃত এবং পিচ ও শিলাজতু দিয়া যোড়ের জায়গা সব ঠিক করিয়া দিলেন। আবার বাইবেলের গল্পে ঈশ্বর নোয়াকে বলিলেন "গোফার কাঠের জাহাজ বানাও, এবং উহা ৩০০ হাত লম্বা ৫০ হাত চওড়া এবং ৩০ হাত উচু কর, উহা নিম্ন, মধ্য ও উপর এই তিনতালায় বিভক্ত কর ও তাহার ভিতর আবার কামরা কর। আর তুমি নিজে, পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া এবং পৃথিবীর যাবতীয় ভূচর খেচর জলচরজন্তু, পক্ষী, সরীসৃপ ইত্যাদির স্ত্রীপুরুষ যোড়া যোড়া হিসাবে লইয়া জাহাজে উঠিবে, পবিত্র পশুর ৭ যোড়া করিয়া এবং অপবিত্র পশুর ২ যোড়া করিয়া ও প্রত্যেক শ্রেণীর পক্ষীর ৭ যোড়া করিয়া তুলিবে।" স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে মহাভারতীয় গল্পের এই বীজ ক্যালডিয়ার কাহিনীতে অঙ্কুরিত এবং বাইবেলে উহা শাখাপ্রশাখায় এবং পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। মহাভারতের টীকাকার "সৃষ্টির বীজকে" দার্শনিক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ক্যালডিয়ার ভাষ্যকার ও বাইবেলের টীকাকার উহাকে পরমার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্তৃত হইতে হইতে বাইবেলে আসিয়া এই আখ্যান রীতিমত উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টান অবশ্যই বাইবেলের এই আখ্যান বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করিবেন, তথাচ আমাদের মনে হয় যে ইহা অতিশয়োক্তি দোষে নিতান্তই দুষ্ট হইয়াছে। ক্যালডিয়া দেশের উপাখ্যানে বরং এই অতিশয়োক্তি কিছু অল্পমাত্রায় ছিল। তথায় সৃষ্টির 'জীবনের বীজ' তুলিবারই আদেশ ছিল; তবে সেই আদেশ সম্প্রসারিত অর্থে গৃহীত হইয়াছে। আর বাইবেলের আখ্যানলেখক পৃথিবীর যাবতীয় গ্রাম্য ও আরণ্য পশুপক্ষী সরীসৃপাদির যোড়া যোড়া হিসাব করিয়া জাহাজে তুলিবার কথা বলিয়া উহাকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। তবে, এইরূপ বীজাকারের মৌলিকগল্প ক্রমশঃ লোকের মুখে মুখে পল্লবিত ও বিস্তৃত হইয়া অতি বিশাল আকার ধারণ করিবার উদাহরণ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

জলপ্লাবনের কাহিনীটী যে আমাদের দেশ, পুরাতন কালডিয়া ও প্যালেষ্টাইন দেশে অনেক দিন হইতে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রমাণ উপরে আলোচিত হইল। জলপ্লাবনের সময় মৎস্যরূপী ভগবানের দ্বারায় যে সমুদয় বেদের উদ্ধার হইয়াছিল এবং তিনিই বৈবস্বত মনুকে জগতের যত কিছু জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার এক অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যস্রোত আমাদের শাস্ত্রসমূহে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং মৎস্যপুরাণ নামক শাস্ত্রপুস্তকে ঐ সকল উপদেশ স্থূলতঃ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগেরও হদীস (ঐতিহ্যধারা যাহা পয়গম্বরের শ্রীমুখাৎ শুনিয়া লেখা হইয়াছিল) শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের জলপ্লাবনের সময় আরবীয় ভাষা রক্ষা পাইয়াছিল *।

* Sale's the Koran p III, Footnote x.

প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়া দেশের ঐতিহ্যেও জানিতে পারা যায় যে, সে দেশে সৃষ্টির প্রথম বর্ষেই সমুদ্র হইতে মৎস্যরূপী এক দেব অথবা দানবের আবির্ভাব হয়; তাঁহার দেহ মৎস্যের মত, কিন্তু মৎস্য মস্তকের উপর তাঁহার মনুষ্য মস্তক ছিল, এবং মৎস্যপুচ্ছের নিম্নভাগ হইতে মানুষের পদদ্বয় নির্গত হইয়াছিল, এবং তিনি মনুষ্যবাণী সাহায্যেই কথোপকথন করিতেন। তিনিই ক্যাল্‌ডিয়ার মনুষ্যগণকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। অধিক কি, তাঁহার পর, ঐ দেশে আর কোন নূতন বিদ্যা অথবা নূতন জ্ঞানের আবিষ্কার হয় নাই †।

এই মৎস্যরূপী দেবের সহিত আমাদের শাস্ত্রের মৎস্যরূপী ভগবানের ঐতিহ্যের তুলনা করিলেও অতি আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আগামী বারে আমরা দেবতত্ত্ব লইয়াই পাঠক মহাশয়গণের সমীপে উপস্থিত হইব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

† "In the first year, appeared a monster endowed with human reason named Oannes, who rose from out of the Erythraean Sea, at the point where it borders Babylonia. He had the whole body of a fish, but above his fish's head he had another head which was that of a man, and human feet emerged from beneath his fish's tail; he had a human voice, and his image is preserved to this day. He tought them (men of ancient Chaldeae) the use of letters, sciences and arts of all kinds, the rules for the founding of cities, and the construction of temples, the principles of law and surveying; he showed them how to sowr and reap; he gave them all that contributes to the comforts of life. Since that time nothing excellent has been invented"

Prof: Maspero's The Dawn of civilisation, Ancient Chaldeae, p 546.

ফরাসী বিপ্লব-যুগের কয়েকটী চিত্র।

বিপ্লবের নেতৃত্রয়।

১

প্যারিসের ক্রুস্‌ পাঁও নামক রাজপথের একটি সাধারণ পানাগার "কাফে" নামে অভিহিত হইত। এই "কাফের" পশ্চাদ্ভাগে একটি কক্ষ ছিল, যাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অনেক সময় সেখানে কোন কোন প্রসিদ্ধনামা লোক গোপনে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতেন। এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কার্য্য কলাপের উপর লোকের এতদূর প্রখর দৃষ্টি ছিল যে, তাহারা সাধারণ্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠে একটা টেবিলের তিন দিকে তিনটি চেয়ারে তিন জন লোক উপবিষ্ট ছিল; চতুর্থ চেয়ারটি শূন্য। সন্ধ্যা—৮ টা। জ্বালপের আলো তখনো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই; কিন্তু কক্ষের ভিতর অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। ছাদ হইতে দোদুল্যমান একটি ল্যাম্পের আলোকে টেবিলটি আলোকিত।

ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যুবক—গম্ভীরাকৃতি, রতাহার মুখের রং ফ্যাকাসে। তাহার ওষ্ঠ পাতলা, দৃষ্টি অপ্রসন্ন। গণ্ডদেশ মাঝে মাঝে স্নায়বিক কম্পনে স্পন্দিত হওয়াতে হাস্য করা তাহার পক্ষে কঠিন ছিল। যুবকের হাতে দস্তানা, গায়ে ফিকে নীলরঙের বোতামআঁটা কোট—সুমার্জ্জিত ও অকুঞ্চিত, পায়ে সাদা মোজা ও রূপার বক্লস্‌ওয়ালা জুতা; পরিধানে হাটু পর্য্যন্ত ফুলা পায়জামা এবং গলায় উঁচু কলার।

অপর দুইজনের মধ্যে একজন দৈত্যের মতো দীর্ঘকায় এবং আর একজন বামন—খর্ব্বকায়। লম্বা

লোকটি একটি লাল বনাতের কোট যেন তেন প্রকারে পরিয়াছে। তাহার গলদেশ অনাবৃত, বোতাম খুলিয়া যাওয়াতে কলার সার্টের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ওয়েষ্ট কোট বোতামহীন—হা করিয়া রহিয়াছে। পায়ে উচু বুট জুতা। মস্তকের কেশগুলি সজারুর কাটার মতো খাড়া খাড়া এবং অবিন্যস্ত। এমন কি তাহার পরচুলাটা কেশরের মতো দেখাইতে ছিল। মুখে বসন্তের দাগ। ভ্রূযুগল প্রভুত্ব ও ক্রূদ্ধ স্বভাবের পরিচায়ক। মুখের কোণে একটু টোল—সহৃদয়তা-ব্যঞ্জক। ওষ্ঠ পুরু, দন্ত বৃহৎ, হাতের মুঁঠা মজুরদের মতো, চক্ষু জ্বালাময়।

খাটো লোকটির গায়ের রং হলদে। বসিলে তাহাকে কুব্জ বলিয়া বোধ হয়। মাথা পেছনের দিকে হেলান, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ; বদনমণ্ডল ব্রণচিহ্ন-বহুল। ললাটদেশ তাহার নাই বলিলেই হয়। মুখবিবর প্রকাণ্ড ও ভীষণ। মাথায় খাড়া ও আটাল চুলের উপর একটা রুমাল বাঁধা। ফুলা পায়জামার পরিবর্ত্তে সে পাঁতলুন পরিয়াছিল। তাহার বিবর্ণ ওয়েষ্ট কোটটা বোধ হয় সাদা সাটিনের। ইহার উপর একটা ঢিলে জামা তাহার গায়ে ছিল। জামার ভাঁজের নীচে একটা কঠিন সোজা লাইন গুপ্ত ছুরিকার অস্তিত্ব সূচনা করিতেছিল।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি রব্‌স্‌পীয়র্‌, দ্বিতীয় ড্যান্টন্‌, তৃতীয় ম্যারাট্‌।

প্রকোষ্ঠে আর কেহ ছিল না। ড্যান্টনের সম্মুখে একটি পানপাত্র ও ধূলিধূসরিত মদের বোতল; ম্যারাটের সম্মুখে এক পেয়ালা কাফি, রবস্‌পীয়রের সম্মুখে শুধু কাগজপত্র। কাগজপত্রের নিকটে একটা ভারী, গোলাকার, শিরতোলা সীসার দোয়াত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাহারা স্কুলের ছাত্র ছিল তাহাদের সহজেই ঐরূপ দোয়াতের কথা মনে পড়িবে। দোয়াতের নিকট একটি কলম পড়িয়া রহিয়াছে। কাগজের উপর একটা বড় পিতলের শীলমোহর—ব্যাষ্টিল্‌ দুর্গের একটি অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

টেবিলের মধ্যস্থলে ফ্রান্সের একটা ম্যাপ বিস্তৃত রহিয়াছে। কক্ষদ্বারের বহির্ভাগে ম্যারাটের অনুচর লরেণ্টবাসে বসিয়া পাহারা দিতে ছিল। তাহার উপর আদেশ ছিল যতক্ষণ ম্যারাট, ড্যান্টন ও রব্‌স্‌পীয়র্‌ কথোপকথন করিবে ততক্ষণ সে দ্বাররক্ষা করিবে। এবং "কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি", "কমিউন," কি 'ইভিকের মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।

পরামর্শ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছে। টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজ পত্র সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে-ছিল। এইমাত্র সেগুলি রব্‌স্‌পীয়র্‌ কর্ত্তৃক পঠিত হই-য়াছে। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল। তিনজনের মধ্যে রাগারাগির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। বাহির হইতে ইহাদের ব্যগ্র কথাবার্ত্তার দুই একটি শোনা যাইতেছিল। লরেণ্টবাসে চাবির ছিদ্রপথে কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। সে ম্যারাটের ভৃত্য বটে, কিন্তু "ইভিকে" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২

ড্যান্টন্‌ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চেয়ারটা সজোরে পেছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

"শোনো! কেবল একটি জিনিষ আসন্ন—তা হচ্চে সাধারণ তন্ত্রের বিপদ। আমি শুধু এই জানি যে শত্রুর হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার কর্‌তে হবে, আর তা'র জন্যে সব উপায়ই অবলম্বনীয়; সবই সঙ্গত, সবই বৈধ, সবই কর্ত্তব্য। বিপদের উপর বিপদ যখন এসে পুঞ্জীভূত হয় তখন তা'র সঙ্গে যুঝ্‌তে আবার উপায়ের বাচ বিচার কি? আমার মন সিংহের মত—আধাআধি কাজে তা' সন্তুষ্ট নয়। আমার সঙ্কল্প দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন। নিয়মের শুচি বাই নাই। আমাদের নির্ম্মম হ'তে হ'বে এবং তা'হলেই আমরা সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার্‌ব।

কোথায় তা'র পা পড়ল, হাতী তা' আগে দেখে নেয় কি? শত্রুকে আমাদের একেবারে পিষে ফেলতে হবে—তা' যেরূপেই হউক''।

রবস্পীয়র শান্তভাবে উত্তর দিল—"আহ্লাদের সহিত তা' করব। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শত্রু কোথায়?—তা'ত জানা চাই।"

ড্যা। শত্রু বাইরে, আমি তাদের সেখানে অনুসরণ করেছি।

র। শত্রু ভেতরে, আমি তা'দের উপর নজর রেখেছি।

ড্যা। আমি তাদের দেশ থেকে তাড়াব।

র। ঘরের শত্রুকে ত আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ড্যা। তা' হ'লে কি করবে?

র। আমি তা'দের নিকেস্ করব।

ড্যা। বেশ আমি স্বীকৃত। কিন্তু বল্‌চি কি রবস্পীয়র, শত্রু বাইরে।

র। ড্যান্টন, আমি বল্‌চি শত্রু ভেতরে।

ড্যা। রবস্পীয়র, তারা সীমান্তে।

র। ড্যান্টন, তা'রা ভেণ্ডিতে।

এই সময় ম্যারাট বলিয়া উঠিল "তোমরা মিছামিছি তর্ক করচ, শত্রু সর্ব্বত্র—আর তোমাদের পরিত্রাণ নাই।"

রবস্পীয়র্ তাহার দিকে তাকাইয়া শান্তভাবে বলিল "রেখে দাও তোমাদের অনির্দ্দিষ্ট সাধারণভাবের কথা—আমি যা বল্‌চি তা' হাতে কলমে দেখিয়ে দিব। এই আমার প্রমাণ।"

"পণ্ডিত", ম্যারাট গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

সম্মুখে টেবিলের উপর বিস্তৃত কাগজ পত্রের উপর হাত রাখিয়া রবস্পীয়র্ বলিয়া উঠিল,—

"মার্শের প্রিউর্ যে ডেস্প্যাচ পাঠিয়েছেন এইমাত্র আমি তা' তোমাদের নিকট পাঠ করলাম। গেলেছার যে খবর দিয়েছে, তাও এইমাত্র তোমাদিগকে বলেছি। ড্যান্টন্, শোনো, বৈদেশিক সমর কিছুই নয়, অন্তর্বিপ্লবই সব। বৈদেশিক সমর গায়ে আঁচড় লাগার মতো, কিন্তু অন্তর্বিপ্লব হচ্ছে পচা ঘা, যাতে ভেতরটা একেবারে খেয়ে ফেলে। কাগজ পত্র দেখে আমি যা বুঝতে পার্‌চি তা' এই—ভেণ্ডি এতকাল বিভিন্ন সর্দ্দারের অধীনে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এখন থেকে তা'র হবে সুধু একজন কাপ্তেন"—

"কাপ্তেন না দস্যু সর্দ্দার।" ড্যান্টন অনুচ্চস্বরে বলিল।

নিজের কথার সূত্র অনুসরণ করিয়া রবস্পীয়র্ বলিল,—

এই নেতা হচ্ছে সেই লোক যে ২রা জুন তারিখে পণ্টর্সনের নিকট সমুদ্র কূলে অবতরণ করে। মনে রাখ্‌বে, এই ২রা জুন তারিখেই কেল্‌ভেডোস্ জেলার বিশ্বাসঘাতক জনগণ কর্ত্তৃক কোট-ডি-উর এর প্রিওর এবং রোমের রোমে ধৃত হয়।

"এবং তাহারা কেয়েনের দুর্গে নীত হয়"—ড্যান্টন বলিল।

রবস্পীয়র্ বলিতে লাগিল,—ডেস্প্যাচগুলির সার মর্ম্ম আমি বলে যাচ্ছি। অতি ব্যাপকভাবে আরণ্য যুদ্ধের বন্দোবস্ত হচ্চে। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডও ফ্রান্স আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্চে। ভেণ্ডিয়ান্ ও ইংরাজ একযোগে—ব্রিটন ও ব্রিটীশ পরস্পরের সহকারী। একটা চিঠী আমাদের হাতে পড়েচে তা' তোমাদের দেখিয়েচি। তা'তে আছে—"২০ হাজার লালকোর্ত্তা (সৈন্য) ইহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে আরো লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা হইবে।" কৃষক-বিদ্রোহের বন্দোবস্ত সব ঠিক হ'লে ইংরেজেরা আক্রমণ করবে। এই দেখ তার প্ল্যান—ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।"

রবস্পীয়র নক্সার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া বলিল 'ক্যানকেল্ হইতে পেম্পল পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে ইংরেজরা এসে নাব্‌তে পারে। লয়ের নদীর বামতীর বিদ্রোহী ভেণ্ডিয়ান্ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং চাল্লশটি

নর্ম্মান্ গ্রাম ইংরেজদিগকে সাহায্য কর্তে প্রতিশ্রুত। তা'রা অচিরেই প্যারিসের নগর তোরণে এসে উপস্থিত হ'বে। পনেরো দিনের মধ্যে তা'রা তিন লাখ সৈন্য তুল্তে পার্বে এবং সমগ্র ব্রিটেনী ফ্রান্সের রাজার হস্তগত হ'বে।"

"অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজার হস্তগত হ'বে," ড্যাণ্টন্ বলিল।

"না, ফ্রান্সের রাজার। আর ফ্রান্সের রাজা বলেই অবস্থাটি অধিকতর খারাপ। পক্ষকাল মধ্যে বিদেশীকে দেশ বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু দেশীয় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন আঠারো শ বচ্ছরেও হয়ে উঠে না।" রব্স্পীয়র্ উত্তর দিল।

ড্যাণ্টন পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিল এবং টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া করতল-ন্যস্তমস্তকে ভাবনাসাগরে মগ্ন হইল।

রব্স্পীয়র্ বলিল, "এখন দেখ্তে পাচ্ছ, বিপদ্টা। ভিত্রে দিয়ে ইংরেজদিগের নিকট প্যারিসের পথ উন্মুক্ত"।

ড্যাণ্টন মাথা তুলিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করিয়া বলিল—"রব্স্পীয়র্, ভার্দুনও ত প্রুশীয়ানদিগকে প্যারিসের রাস্তা খুলে' দিয়েছিল?"

"ভাল।"

"ভাল! প্রুশীয়ানদের আমরা যেমন করে' তাড়িয়েছিলাম, ইংরেজদেরও তেমনি করে' তাড়াব।" এই বলিয়া ড্যাণ্টন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

রব্স্পীয়র্ আপনার ঠাণ্ডা হাত অপরের উষ্ণ মুষ্টির উপর রাখিয়া বলিল—"ড্যাণ্টন্,—শাম্পেন প্রদেশ তখন প্রুশীয়ানদের পক্ষাবলম্বন করে নি, কিন্তু ব্রিটেনী এখন ইংরেজের পক্ষে। ভার্দুন্ পুনরায় দখল করা—সে ছিল একটা বৈদেশিক যুদ্ধ, আর ভিত্রে পুনরায় দখল করা—এটা হবে অন্তর্বিপ্লব। গুরুতর প্রভেদ।" শেষ কথা কয়টি রব্স্পীয়র্ অত্যন্ত মৃদুগম্ভীর ও হতাশা-ব্যঞ্জক স্বরে উচ্চারণ করিল। তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিল, "বসো, ড্যাণ্টন, ম্যাপ্টা হাত দিয়ে না রগ্ড়ে এটার দিকে চেয়ে দেখ।"

কিন্তু ড্যাণ্টন তখন তাহার নিজের ভাবেই বিভোর। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—

"এত নিতান্তই পাগলামি। বিপদ পূর্ব্বদিকে, অথচ চেয়ে থাকব পশ্চিমদিকে। রব্স্পীয়র, না হয় মান্লাম ইংলণ্ড সাগর থেকে মাথা তুলচে, কিন্তু দেখ্চ কি, পিরেনীজের গিরিশিখর হ'তে স্পেন আমাদের আক্রমণ কর্তে আস্চে; আল্প্স্ পর্ব্বতের উপর দিয়ে ইটালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান কর্চে। রাইণ্ নদী অতিক্রম করে' জার্ম্মানির রণ-বাহিনী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্চে? আর সকলের মূলে আছে বৃহৎ রুশ-ঋক্ষ। রব্স্পীয়র, আমাদের বিপদ হচ্ছে চক্রাকার, আর আমরা তার বেষ্টনীর মধ্যে। চক্রের বাইরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের ষড়যন্ত্র ও সমবায়, চক্রের ভেতরে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মদ্রোহ। দু'চার জন ছাড়া আর সকলেই বিশ্বাসঘাতক। তা'র ফলে ফ্রান্সের অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে জার্ম্মান পতাকা প্রোথিত হচ্ছে। এরূপ ভাবে আর কিছুদিন চল্লে দেখা যাবে ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবটা জার্ম্মাণীরই সুবিধার জন্য হয়েছিল। আমরা ফ্রান্সের রাজার জীবনহরণ করেছিলাম, প্রুসিয়ার রাজার উপকারার্থে।"

এই বলিয়া ড্যাণ্টন ভয়ঙ্কর ভাবে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহাতে ম্যারাটের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—

"তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখ্চি এক একটা বাতিক আছে। ড্যাণ্টন, তোমার বাতিক হচ্চে প্রুসিয়া; আর রব্স্পীয়র তোমার বাতিক হচ্চে ভেণ্ডি। এখন আমার বক্তব্য শোন। শোনো, তোমরা আসল বিপদটা মোটেই ঠাহর কর্তে পার্চ না। সেটা হচ্চে এই সহরের পানাগার ও জুয়া

আড্ডাগুলি। 'কাফে চয়সিউল' জেকোবিন্ * সম্প্রদায়ভুক্ত, 'কাফে পাইটু' রাজপক্ষীয়; 'কাফে রেগুেভো' ন্যাশনালগার্ড সৈন্যদলকে আক্রমণ করে, 'কাফে পোর্ট সেন্টমার্টিন' তা'দের হ'য়ে লড়াই করে; 'কাফে রেজেন্‌স' ব্রিমোর বিপক্ষে, আর 'কাফে কোব্যাজা' তার স্বপক্ষে; 'কাফে প্রোকোপ' ডিডিরোর অনুরক্ত, 'কাফে থিয়েটার ফ্রাঙ্কয়' ভলটেয়ারের অনুরক্ত; কাফে মাস্নুরিতে ময়দার কথা আলোচিত হয়, আর 'কাফে পেরণে' অর্থসমস্যার বোল্‌তা-ভীমরুলের বন্‌বন্ শুনা যায়। এই সব ব্যাপার হচ্চে আসলে গুরুতর।"

ড্যাণ্টন আর হাসিতেছিল না। ম্যারাটের মুখে তখনো ঈষৎ হাস্যের আভাস। দৈত্যের হাসির চেয়ে বামনের হাসি অধিকতর ভীষণ।

ড্যাণ্টন খুঁৎ খুৎ করিতে করিতে বলিল;—"নিজেই নিজেকে নাক সিট্‌কাচ্ছ নাকি, ম্যারাট?"

"তোমাকে আর চিন্‌তে বাকি নেই আমার, দেশবন্ধু ড্যাণ্টন! আমি নিজকে ঠাট্টা করুচি, বটে? শোনো তবে, আমি কি কি করেছি। চেজোকে আমি অভিযুক্ত করি; পিটিয়ানকে আমি অভিযুক্ত করি; কার্সে'টকে আমি অভিযুক্ত করি; মরেটোনকে আমি অভিযুক্ত করি; ভেলাজে, লিগোনিয়র, মেন্থু, বানেভিল, বাইরণ, লিডন, চ্যাম্বন—এদের সব্বাইকে আমিই অভিযুক্ত করি। আমার কি ভুল হয়েছিল? আমি বিশ্বাসঘাতকদের আঁচেই টের পাই, এবং তাদের মতলব সিদ্ধির পূর্ব্বেই ধরিয়ে দি। তুমি কিংবা অন্যেরা পরের দিন যা' বলুবে, সেটা আগের দিন সন্ধ্যে বেলায়ই বলা হচ্চে আমার স্বভাব। আরো শোনো, আমি এ যাবৎ কি কি করেছি. আমি বত্রিশটা বাক্সের শীলমোহর ভেঙ্গেছি; এবং রোল্যাণ্ডের হস্তে গচ্ছিত হীরকের পুনরুদ্ধার করেছি, আহত সৈনিকদের অনুকূলে আমি এক প্রস্তাব উত্থাপন করি; মন্‌সের ব্যাপারে ডুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতা আমি পূর্ব্বাহ্নেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। মার্সেলেজের গোলোযোগে রোলাণ্ড সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র আমি প্রকাশ করে' দি; প্যারিসীয়ানরা দেশের ভাল করেছে, এই ঘোষণা আমার গতিকেই হয়। এই জন্যেই লুভেট্ আমাকে বলে ন্যাচের পুতুল; এইজন্যেই ফিনিষ্টার আমার বহিষ্কার প্রার্থী; এইজন্যেই লণ্ডননগরী আমার নির্ব্বাসন কামনা করে, আমিয়ান্‌স্ চায় আমার মুখ বন্ধ করতে, কোবার্গের ইচ্ছা আমি ধৃত ও আবদ্ধ হই; এবং আমাকে পাগল সাব্যস্ত করবার জন্যে কন্‌ভেন্‌সনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

"আমার মতামতই যদি না জান্‌তে চাও, তবে এই মন্ত্রণার মধ্যে আমায় ডেকেছিলে কেন? আমি কি আস্‌বার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলুম? কিছু মাত্র না। রব্‌স্‌পীয়র কিংবা তোমাদের মতো 'পাল্টা বিপ্লব প্রয়াসীদের' সহিত কথোপকথনে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নেই। আগেই আমার জানা উচিত ছিল যে, তোমরা আমাকে মোটেই বুঝ্‌তে পারবে না—তুমিও না, রব্‌স্‌পীয়রও না। তোমরা কেউ রাজনীতিজ্ঞ নও। রাজনীতির বর্ণজ্ঞানও তোমাদের এখন পর্য্যন্ত হয় নি। আমি যা' বল্‌তে চাই, তা হচ্চে এই—তোমরা দুজনেই ভ্রান্ত। বিপদ লণ্ডনে নয়—যা রব্‌স্‌পীয়র মনে করচেন; বার্লিনেও নয়—যা' ড্যাণ্টন ভাব্‌চেন; পরন্তু বিপদ হচ্চে প্যারিসে। বিপদ একতার অভাবে; বিপদ তোমাদের দুজন থেকে আরম্ভ করে' সকলেই যে

* জেকোবিন ক্লাব (Jacobin club) ফ্রান্সের প্রাচীনতম ক্লাব। ইহা প্রথমে ভার্সেল্‌স্ নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়। এইখানে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদি হইত এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণ পরিচালিত হইত। 'জেকোবিন' নাম দ্বারা তদানীন্তন গরম দলকে বুঝাইত।

যার নিজের দিকে টান্‌ছে, তাতে; বিপদ বিচার-বিমূঢ়তায়, অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সংঘাতে—”

বাধা দিয়া ড্যাণ্টন বলিল, “অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা! সেটা কার, তোমার নয় কি?

ম্যারাট থামিল না।

‘রবস্‌পীয়র্, ড্যাণ্টন, আমি বল্‌চি, বিপদ প্যারিসের এই অগণিত কাফে ও ক্লাবের মধ্যে। বিপদ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বিপদ কাগজের নোটে—লোকের নিকট যার মূল্য নেই। রু ডু টেম্পলে একখানা একশো ফ্রাঙ্ক মূল্যের নোট মাটিতে পড়ে যায়; তা’ দেখে জনৈক পথিক বলে কি, ‘কুড়িয়ে নেওয়ার মজুরীও ওতে পোষায় না!’ তোমরা ব্যারণ ট্রেঙ্ককে গ্রেফতার করেছ,—তা যথেষ্ট নয়; আমি চাই এই বুড়ো ষড়যন্ত্রকারীর মুণ্ডু মটকে ভাঙ্‌তে। তোমরা প্যারিসের দিকে কিছুতেই তাকাবে না; তোমরা বিপদ খুঁজ্‌চ দূরে, অথচ বিপদ তোমাদের অতি সন্নিকটে। রবস্‌পীয়র, তোমার যে এত গোয়েন্দা, তা’তে কি লাভ হচ্চে? অস্বীকার করতে পারবে না, তোমার গোয়েন্দা রয়েছে,—কমিউনে পাজান, বৈপ্লবিক বিচারালয়ে কফিনহ্যাল, জেনারেল—সেফটি কমিটিতে ডেভিড, পাব্লিক-ওয়েল বিয়িং কমিটিতে কুথন। দেখ্‌চ, আমি সবই জানি। উত্তম, এখন আমার কাছ থেকে এইটুকু জেনে রাখ—বিপদ তোমাদের মাথার উপরে, বিপদ তোমাদের পায়ের নীচে। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র! রাস্তার লোকেরা খবরের কাগজ পড়ে, আর পরস্পর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বিনিময় করে। রুটির দোকানের সামনে লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ায়, আর বলাবলি করে, ‘কতদিনে আবার শান্তি হবে?’ শাসন-পারিষদের গৃহে বসে তোমরা যতই কেন না মনে কর যে তোমরা একাকী, তোমাদের প্রত্যেকটি কথা কিন্তু লোকে জান্‌তে পারে। প্রমাণ চাও? এই দিচ্ছি। রবস্‌পীয়র, কাল রাত্তিরে তুমি গেণ্টজাইকে এই কথাগুলি বলেছিলে, ‘বারবারুজের পেট মোটা হচ্চে;—সেটা কিন্তু তার পালানোর পক্ষে অন্তরায় হ’বে। হ্যাঁ, বিপদ সর্ব্বত্র এবং বিশেষভাবে কেন্দ্রস্থলে। প্যারিসে যখন রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে পাহারাওয়ালা ফির্‌চে তখনই বিপ্লব-বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। যে সকল আভিজাত্যবর্গকে ৯ই মার্চ্চ গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই তা’দের মুক্তি দেওয়া হয়েছে; কামানের গুলিতে সীমান্তেই যা’দের উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল, তা’রাই এখন প্যারিসের রাস্তায় আমাদের গায় কাদা ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে। চার পাউণ্ড ওজনের একটি পাউরুটির দাম হচ্চে তিন ফ্রাঙ্ক ১২ সু; থিয়েটারে অশ্লীল অভিনয় হচ্চে, আর রবস্‌পীয়র আচিরেই ড্যাণ্টনকে গিলোটিনে চড়াবে।”

“থামো, থামো, যথেষ্ট হয়েছে”—ড্যাণ্টন বলিল।

রব্‌স্‌পীয়র মনোযোগের সহিত মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সহসা ম্যারাট বলিয়া উঠিল, একজন ডিক্টেটারের * এখন প্রয়োজন। রব্‌স্‌পীয়র, তুমি জান, আমি একজন ডিক্টেটর চাই।”

রবস্‌পীয়র মাথা তুলিল, “জানি ম্যারাট। তুমি কিংবা আমি।”

“আমি কিংবা তুমি”। ম্যারাট বলিল।

ড্যাণ্টন দন্ত চাপিয়া বলিল, “ডিক্টেটর! হুঁ—দেখ না একবার চেষ্টা করে’!”

ম্যারাট ড্যাণ্টনের কুঞ্চিত ভ্রূ লক্ষ্য করিল। বলিল, “শোনো, আর একবার শেষ চেষ্টা করা যাক্। দেখা যাক্, আমাদের কোন বিষয়ে মতের ঐক্য আছে কি না। ৩১শে তারিখে গিরোণ্ডিদিগের সম্বন্ধে আমরা একমত হয়েছিলেম না কি? এখন কিন্তু বিষয়টা অধিক গুরুতর। তুমি যা’ বলছ তা’তে কতক সত্য

* ডিক্টেটর—দেশের সঙ্কটকালে অসীম ক্ষমতা সহ যে শাসনকর্ত্তা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়।

আছে; কিন্তু বাস্তবিক সত্য, সমগ্র সত্য, খাঁটি সত্য আছে আমি যা' বলছি তা'তে। দক্ষিণে ফেডারেলিজম্, উত্তরে রাজতন্ত্র; প্যারিসে কন্‌ভেন্‌সন ও কমিউনের দ্বন্দ্ব; সীমান্তে কুষ্টিনের প্রত্যাবর্তন এবং ডুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতা। এ সবের মানে কি? অনৈক্য। অথচ এখন আমাদের চাই ঐক্য। বাঁচবার উপায় আছে, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র সে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিচালন ভার প্যারিসকে গ্রহণ কর্ত্তে হ'বে একঘণ্টা সময় নষ্ট হ'লে, চাই কি, আগামী কল্যই ভেণ্ডিয়ান্‌রা অর্লিয়েঁতে এসে উপস্থিত হবে এবং প্রুসিয়ান্‌রা প্যারিসের ফটক আগ্‌লে বস্‌বে। ড্যান্টন, তুমি যা বল্‌ছ, স্বীকার করচি, রবস্‌পীয়র, তুমি যা বল্‌ছ, তাও মেনে নিচ্ছি। তথাস্তু। কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত হচ্চে এই যে, এখন ডিক্টেটরসিপ্ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই। আমরাই এই বিপ্লবের প্রতিনিধি, চল আমরা এই ডিক্টেটরসিপ হস্তগত করি। আমরা এই বিপ্লব দানবের তিন মাথা। তিন মাথার একটি বাক্যবাগীশ—সে তুমি, রবস্‌পীয়র; এক মাথা গর্জ্জন করে—সে তুমি ড্যান্টন।"

আর তৃতীয়টি কামড়ায়—সেটি হচ্চ তুমি, ম্যারাট।" —ড্যান্টন বলিল।

রবস্‌পীয়র বলিল, "কামড়ায় তিনটিই"।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই চুপ করিয়া রহিল। তারপর পুনরায় ক্রুদ্ধ কথোপকথন আরম্ভ হইল।

"শোনো, ম্যারাট। দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হ'বার পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরকে জানা চাই। তোমার সহিত যোগ দেওয়ার আগে আমি জান্‌তে চাই, সেণ্টজাষ্ট্‌কে আমি কাল কি বলেছিলাম তা' তুমি কি করে' জান্‌লে?"

"রবস্‌পীয়র, সে আমার কথা, তোমার তা'তে কি?"

"ম্যারাট!"

"আমার কর্ত্তব্য হচ্চে নিজকে সর্ব্ব বিষয়ে ওয়াকিফ্‌হাল রাখা"।

"ম্যারাট!"

"সর্ব্বপ্রকার খবর রাখা আমার স্বভাব"।

"ম্যারাট!"

"রবস্‌পীয়র, তুমি জিজ্ঞেস্ করচ, সেণ্টজাষ্টকে তুমি যা' বলেছিলে সেটা আমি কেমন করে' জান্‌লাম? কেমন করে' আমি জানি', ড্যান্টন লেক্রুয়কে কি বলে; কেমন করে আমি জানি, হোটেল লা ব্রিফ এ কি ঘটে, কেমন করে আমি জানি থিলেসের বুড়ীটার ব্যাপার—যে বাড়ীতে সাইয়ে এবং ভার্জ্জিনদ্ যেত, এবং এখন যেখানে আর একজন সপ্তাহে একদিন করে' যায়।" 'আর একজন' কথাটা বলিবার সময় ম্যারাট ড্যান্টনের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।"

ড্যান্টন চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার যদি এক কড়ারও ক্ষমতা থাক্‌ত, তা' হ'লে এর ফল বড়ই ভয়ানক হয়ে দাঁড়াত।"

ম্যারাট বলিতে লাগিল "রবস্‌পীয়র, তোমাকে যা' বল্‌চি, তা বেশ বুঝে সুঝেই বল্‌চি। জান ত, আমার অজ্ঞাত কিছু নেই। টেম্পল টাওয়ারের কারাকক্ষে তা'রা যখন ষোড়শ লুইকে খাইয়ে দাইয়ে বেশ নাদুস নুদুস করে তুল্‌ছিল তখন সেখানে কি হচ্ছিল, তা, আমি জান্‌তাম। এমনই খাওয়া খাইয়েছিল যে, সেই বাঘ, বাঘিনী * আর তা'দের বাচ্চাগুলি এক সেপ্টেম্বর মাসেই ৮৬ ঝুড়ি পিচ্‌ফল সাবাড় করে দিয়েছিল। অথচ এদিকে তখন সাধারণ লোকেরা অনশনে দিন কাটাচ্ছিল। রু দ্য লা হার্পে রাস্তার পশ্চাদ্ভাগে একটা বাড়ীতে রোলাণ্ড যে লুকিয়েছিল আমি তা' জানতাম। ১৪ই জুলাইয়ের জন্য ৬০০ বল্লম যে ডিউক অব অর্লিয়েঁর কর্ম্মকারের

* ষোড়শলুই, তাঁহার পত্নী ও তাহাদের পুত্র-কন্যাগণ।

কারখানায় তৈরী হয়েছিল, আমি তা জানতাম না কি? সিলারির মিষ্ট্রেসের বাড়ীতে কি হয়, তাও আমি জানি। ২৭ শে তারিখ সারাদিন যেখানে নিমন্ত্রণ খেয়েছিল। কা'র সঙ্গে,রব্‌স্‌পীয়র?—তোমার বন্ধু ল্যাসোর্সের সঙ্গে।"

"খামখা কথা,ল্যাসোর্স আমার বন্ধু নয়।" রব্‌স্‌পীয়র বলিল। চিন্তিতভাবে আরো বলিল, "ইতিমধ্যে লণ্ডনে ১৮ টা কারখানায় কৃত্রিম নোট তৈরী হচ্চে।"

ম্যারাট বলিতে লাগিল। তাহার স্বর তখনো শান্ত, তবে ঈষৎ কম্পিত—ক্রোধের লক্ষণ;—"আমি সবই জানি, সব খবরই রাখি।" রব্‌স্‌পীয়র, আমি হচ্চি জন সাধারণের দূরদর্শী তৃতীয় নেত্র। আমি আমার গুহার গোপনতল হ'তে সবই লক্ষ্য রাখি। আমি দেখি, আমি জানি, আমি শুনি। তোমরা অল্পে সন্তুষ্ট। তোমরা নিজে নিজের প্রশংসা নিয়েই ব্যস্ত। তোমরা মাথা উঁচু করে চল। রব্‌স্‌পীয়র মনে করেন, তিনি যে একেবারে কন্‌ভেন্‌সনে হালফ্যাসানের অলিভ-রঙের ফ্রক্‌কোট এবং আশ্‌মানি রঙের ড্রেস্‌কোট পরেন, ইতিহাস তা জান্‌বার জন্যে ব্যস্ত; তার কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে তিনি নিজের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখেন—"

বাধা দিয়া রব্‌স্‌পীয়র বলিল, "আর ম্যারাট, তোমার ছবি ত নর্দ্দামায় নর্দ্দামায়।" তাহায় কণ্ঠস্বর ম্যারাটের চেয়েও গম্ভীর।

এইরূপভাবে কথোপকথন চলিল। তাহাদের কণ্ঠস্বর যতই ধীর গম্ভীর হইতে লাগিল অন্তর্গূঢ় উত্তেজনার রুদ্ধ বাষ্প ততই ঘনীভূত হইতেছে বোঝা গেল। ক্রুদ্ধ বাক্‌বিতণ্ডায় একটা বিদ্রূপের আভাস।

"রব্‌স্‌পীয়র, যাহারা রাজসিংহাসনের পতন কামনা করে, তুমি তা'দের মানব জাতির—ডন্‌কুইক্‌সো * বলে' উপহাস করেছিলে"।

"তার তুমি, ম্যারাট, ৪ঠা আগষ্ট * তারিখের পরে "প্রজাবন্ধু" পত্রিকার ৫৫৯ তম সংখ্যায় (দেখ্‌চ সংখ্যাটা আমার মনে আছে, ভবিষ্যতে কাজে লাগ্‌তে পারে) তুমি লিখেছিলে অভিজাতবর্গের খেতাব তাহাদিগকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা উচিত। তুমি বলেছিলে, যে ডিউক সে সর্ব্বদাই ডিউক।"

"রব্‌স্‌পীয়র, ৭ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে তুমি ডায়ার্ডের বিরুদ্ধে সেই মাদাম রোল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেছিলে"।

"আমার ভাইও তো তোমার পক্ষ সমর্থন করেছিল, ম্যারাট, যখন জেকোবিন ক্লাবে তোমাকে তারা আক্রমণ করে। তা'তে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না।

"রবস্‌পীয়র, টুইলারিসের মন্ত্রণাসভায় তুমি যে গ্যারাটকে বলেছিলে, বিপ্লবে বিরক্তি ধরে' গেছে'—সে কথা আমার জানা আছে।"

"ম্যারাট, এইখানে এই পানাগারে ২৯ শে অক্টোবর তারিখে তুমি বারবারুক্সকে আলিঙ্গন করেছিলে।"

"রবস্‌পীয়র, তুমি বুজোকে বলেছিলে,—"সাধারণ তন্ত্র! সে আবার কি?"

"ম্যারাট, এই পানাগারেই তুমি তিনজন সন্দিগ্ধ লোককে নিয়ে মন্ত্রণাও করেছিলে।"

রবস্‌পীয়র, বাজার থেকে যাওয়ার সময় সর্ব্বদাই একটা মোটা লোক লাঠি হাতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

"আর ম্যারাট, ১০ই আগষ্টের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় ঘোড়দৌড়ের জকির ছদ্মবেশে মার্সেলেজে পালিয়ে

* সার্ভেন্টিসের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক ডন্‌কুইক্‌সোর মত অসম্ভব আদর্শে অনুপ্রাণিত—হাস্যাস্পদ।

* ৪ঠা আগষ্ট—১৭৮৯ খৃঃ—"মানবের স্বাভাবিক স্বত্ব" সম্বন্ধীয় ঘোষণা এই তারিখেই এসেম্ব্লিতে বিধিবদ্ধ হয়, এবং অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় আপনাদের উপাধি ও বিশেষ অধিকারগুলি স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে।

যেদেশে তোমাকে সাহায্য করবার জন্তে তুমি মুজোকে অনুরোধ করেছিলে ?"

"সেপ্টেম্বরের বিচারের সময় ত তুমি আত্মগোপন করেছিলে, রবস্পীয়র ”

"আর ম্যারাট, তুমি তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলে ”

"রবস্পীয়র, তুমি তখন লালটুপী মাটীতে ছুড়ে ফেলেছিলে।"

"হ্যাঁ, আর একজন বিশ্বাসঘাতক গিয়ে সেইটে কুড়িয়ে তুলেছিল। ডুমারিয়েজের ম ত্বুন, রবস্পীয়রের তা' কলঙ্ক ”

"রবস্পীয়র, শেটোভিউজের সৈন্তদল মার্চ্চ করে' যাওয়ার সময় তুমি ষোড়শ লুইর মাথা ঢেকে দিতে আপত্তি করেছিলে।"

"আমি তার চেয়ে ভাল কাজ করেছিলেম, আমি সেই মাথাই কেটে ফেলি।"

ড্যাণ্টন মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে থামাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে আরও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল।

ড্যাণ্টন বলিল, "রবস্পীয়র, ম্যারাট, তোমরা শান্ত হও।"

নিজের নামটা রবস্পীয়রের নামের পরে উক্ত হওয়াতে ম্যারাট ভয়ঙ্কর চটিয়া উঠিয়া বলিল, "ড্যাণ্টন আবার কথা বল্‌তে আস্‌চেন কি সম্বন্ধে ?

ড্যাণ্টন্ লাফাইয়া উঠিল।

"কি সম্বন্ধে কথা বল্‌চি ? শোনো। ভ্রাতৃহত্যা আমাদের চল্‌বে না। জনসাধারণের কার্য্যে ব্যাপৃত দু'জনের মধ্যে বিরোধ হ'তে পারবে না। বৈদেশিক যুদ্ধ রয়েছে, তাই যথেষ্ট, তার উপর গৃহ বিবাদ হ'লে আর উপায় থা‌কবে না। এই রাষ্ট্রবিপ্লব আমার হাতের তৈরী, আমি একে নষ্ট হ'তে দেবোই না। এখন বুঝলে, আমি কেন হস্তক্ষেপ করচি ?"

ম্যারাট না চেঁচাইয়া বলিল "তুমি বরং অগ্রে তোমার হিসাবের নিকাশ তৈরী কর।"

"আমার হিসাব ?" ড্যাণ্টন গর্জ্জিয়া উঠিল। "যাও, হিসাব চাওগে আর্গোনের গিরিবর্ত্মে, শত্রুহস্তমুক্ত শাম্পেনে, বিজিত বেলজিয়মে—যেখানে চার চারবার আমি শত্রুর গুলির সম্মুখে বুক পেতে দিয়েছিলেম। যাও হিসাব চাওগে' বৈপ্লবিক আদালতে, ২১ জানুয়ারীর বধ্যমঞ্চে, ভূলুণ্ঠিত সিংহাসনের নিকটে। সেই বিধবা—"

ম্যারাট বাধা দিয়া বলিল "গিলোটিন হচ্ছে বন্ধ্যা, মর্দ্দামাগী—সে ধ্বংস করে, প্রসব করে না।"

"তাই না কি ? ঠিক জান ?" ড্যাণ্টন স্নেহব্যঞ্জক-স্বরে জবাব দিল। "আমি ওকে সন্তানবতী করব ”

"দেখা যাবে।" এই বলিয়া ম্যারাট একটু ক্রুর হাসি হাসিল।

ড্যাণ্টন তাহা দেখিতে পাইল, বলিল।

"ম্যারাট, তোমার সবই গোপনে, আমার সবই প্রকাশ্যে। আমি যা' করি মুক্ত বাতাসে এবং দিনের আলোতে। সরীসৃপ-জীবন আমি ঘৃণা করি। তুমি থাক গর্ত্তের মধ্যে, আর আমি বাস করি, রাজপথে। সংসারের লোকের সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব নেই, আমার সঙ্গে যে কোন পথিক আলাপ পরিচয় করতে পারে।"

"চমৎকার লোক ! আমি যেখানে থাকি তোমার সেখানে উঠ্‌তে সাহস হবে কি ?" ম্যারাট বলিল।

তারপর তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। পরুষ কণ্ঠে পুনরায় বলিল, "ড্যাণ্টন, রাজার নামে মণ্টমরিন তোমাকে যে তেত্রিশ হাজার ক্রাউন দিয়েছিল—তোমার ওকালতী কার্য্যের খেসারতের অছিলায়—সে টাকাটার হিসাব দাও দেখি।"

উদ্ধতভাবে ড্যাণ্টন জবাব দিল, "১৪ই জুলাই আমি তার হিসাব দিয়েছিলেম।"

"আর রাজভাণ্ডারের হীরা জহরতের হিসাব ?"

"৬ই অক্টোবর আমি কি করেছিলেম স্মরণ কর।"

"আর বেলজিয়ামে তোমারই বেনামদার ল্যাক্রয়ের চুরি?"

"জান, আমি ২০শে জুনের লোক?"

"আর বণ্ট্যাম্পিয়রকে ধার দেওয়া টাকাটা?"

"আমিই জনসাধারণকে ভ্যারেনস্ হ'তে ফিরে' আসতে প্ররোচিত করেছিলেম।"

"আর সেই অপেরাহাউস্—যা তৈরীর জন্যে ভ্রাম টাকা যুগিয়েছিলে?"

"প্যারিসের জনগণকে আমিই অস্ত্র দিয়ে তৈরী করেছিলেম—সেটা ভুলো না।"

"বলি, বিচার বিভাগের গুপ্তঅর্থ, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তা'র কি হ'ল?"

"মনে রেখো, ১০ই আগষ্ট আমিই ঘটিয়েছিলেম?"

"এ্যাসেম্ব্লির গুপ্তকার্য্যের জন্য ২০লক্ষ—ম: চতুর্থাংশ তুমি নিয়েছিলে—সে টাকা গেল কো'থায়?"

"আমি শত্রুর অভিযান প্রতিরোধ করে' রাজগণের সম্মিলন বারণ করেছিলেম।"

"ঘৃণ্য আত্মবিক্রয়ী।"

"হ্যাঁ, আমি আত্মবিক্রয়ী। কিন্তু নিজেকে বিক্রয় করে আমি জগৎকে রক্ষা করেছিলেম।" রবস্পীয়র এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া নিজের নখ কামড়াইতেছিল। সে হো হো করিয়া হাসিতেও পারিতেছিল না, কিংবা বিদ্রূপের চোরা হাসিতেও যোগ দিতে পারিতেছিল না। দামিনী-ঝলকবৎ ড্যান্টনের অট্টহাস্য কিংবা তীরের খোঁচার মতো ম্যারাটের তীক্ষ্ণ ক্রূর হাস, কোনটাই রবস্পীয়রের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

ড্যান্টন বলিতে লাগিল "আমি মহাসমুদ্রের মতো—আমার জোয়ার ভাটা আছে। ভাটার সময় আমার তল দেখা যেতে পারে। কিন্তু জোয়ারের সময় দেখবে আমার তরঙ্গরাশি।"

ম্যারাট বলিল "তুমি ফেনাও বড্ড বেশী।"

"সে আমার রক্ত," ড্যান্টন উত্তর করিল।

ড্যান্টনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যারাটও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। এইবার সে বোমার মতোই ফাটিয়া পড়িল। সর্প ড্র্যাগনে পরিণত হইল।

"হুঁ" সে বলিয়া উঠিল—"রবস্পীয়র, ড্যান্টন—তোমরা কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করবে না। বেশ, আমি বলে রাখছি, তোমাদের আর কোন আশা নেই। তোমাদের যা' পলিসি, তা'তে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের আর একবার পথ নেই। তোমরা চারিদিকে দোর এঁটে বসেছ, এখন খোলা আছে, সুধু কবরের পথ।"

"সেই তো আমাদের বাহাদুরী।" ড্যান্টন জবাব দিল।

ম্যারাট ক্রুদ্ধ হইয়া চলিল "সাবধান ড্যান্টন। ভার্জিনদের মুখ বড়, ওষ্ঠ পুরু ও ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ছিল; মিরাবো এবং তোমার মতো সেও মুখেও বসন্তের দাগ ছিল। কিন্তু তাতে তা'র কর্মের কোন বাধা হয় নি। হুঁ, তুমি কাঁধ নাড়ছ। মনে রেখো, কখনো কখনো একটি কাঁধ নাড়ার জন্যেই মাথা মাটিতে লুটায়। ড্যান্টন তোমাকে আমি বলে' রাখছি ঐ উচ্চকণ্ঠ, ঢলে গলবন্ধ, উঁচু বুট, সান্ধ্যভোজন, বড় পকেট—এই সবই লুইসেটের সহিত সংসৃষ্ট।"

"লুইসেট" ম্যারাটের দেওয়া গিলোটিনের আদরের নাম।

ম্যারাট বলিতে লাগিল—

"আর তোমাকে বলছি, রবস্পীয়র, তুমি একজন মডারেট, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। যতই পাউডার মাখো, যতই কেশবিন্যাস কর, আর যতই ফর্সা কাপড় পরে' বাবুগিরি কর, তোমাকেও সেই বধ্যভূমিতে যেতে হ'বে। ব্রান্সউইকের ঘোষণাপত্র পড়েছ কি? রাজহন্তা ড্যামিয়েন্সের চেয়ে তোমাকে আর তারা কম করবে না। তুমি সৌন্দর্য্যের জাঁক কর।

কিন্তু চার ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে তোমাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।"

দন্ত চাপিয়া রবস্পীয়র বলিল "কবলেন্‌ৎজের বুলি কপ্‌চাচ্ছ।"

"আমি কারো বুলি কপ্‌চাইনে, রবস্পীয়র। আমি হচ্ছি **সকলের মর্ম্মবাণী**। আর, তুমি ড্যান্টন, তুমিত এখনো ছেলেমানুষ। কত বয়স—তোমার? মোটে তো ত্রিশ। আর আমি—আমি সেই মান্ধাতার আমল থেকে আছি—জনতা। **চির নিপীড়িতের প্রতিরূপ আমি।**—জানো, আমার বয়স ছ'হাজার বছর।"

ড্যান্টন ব্যঙ্গপূর্ণস্বরে বলিল "তা সত্য। ছ'হাজার বছর ধরে' পার্ব্বত্য ভেকের মতো কেইন * নিশ্চেষ্ট ভাবে পরিপুষ্ট হচ্ছিল। পাহাড় ভেঙেছে, আর কেইন বেরিয়ে এসে মানুষের মধ্যে ঢুকেছে। কেইনের নাম এখন ম্যারাট।"

"ড্যান্টন!" ম্যারাটের দৃষ্টি পাণ্ডুর বিবর্ণ আলোকে উদ্দীপ্ত।

"কি বল্‌তে চাও," ড্যান্টন জিজ্ঞাসা করিল।

এইরূপে তিনজন ভয়ঙ্কর লোকের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। তিনটী পরস্পর বিরোধী বজ্রের সংঘাত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

---

* বাইবেলে উক্ত আছে আদমের জ্যেষ্ঠপুত্র কেইন তাহার দ্বিতীয় পুত্র আবেলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে এবং তদ্ধেতু ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হয়।

"বিরহে সুখ।"

বড় ব্যথা বাজে বুকে, বড় ব্যথা হায়
ভুলিতে তোমারে ওগো, ভোলা নাহি যায়।
তোমার সে' মুখচ্ছবি বিশ্ব আলো করা,
তোমার সে' আঁখি-জ্যোতিঃ প্রাণ-মন হরা;
তোমার সে' কণ্ঠস্বর—তোমার সে' গান
আজিও পাগল করে বিরহী এ প্রাণ;—
কি এক আবেগ ভরা হৃদয়ের টানে
ছুটে চলে' যাই কোন্ অসীমের পানে
বাধা-বন্ধ-হীন,—সেথা আঁধার-আলোক
রচিছে স্বপন-মায়া—আনন্দ-পুলক
উথলি উঠিছে ছাপি' প্রেম-পারাবার—
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুখ করি একাকার।
অমৃত-ধারায় মোর ভরে যায় বুক,
বিরহ মাঝারে লভি' মিলনের সুখ।

বেলা গুহ।

সাহিত্য-সংবাদ। (১)

নিবেদন।

আগামী ঈষ্টারের ছুটীতে (বঙ্গাব্দ ১৩২৯ ১লা, ২রা, ৩রা বৈশাখ) মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইবে।

উক্ত সম্মিলনে যাহাতে সমগ্র বঙ্গ দেশের সাহিত্য সেবিগণ যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য আমরা প্রত্যেক সাহিত্য-সভা সমিতি ও পুস্তকাগারের নাম ও ঠিকানা জানিতে ইচ্ছা করি।

উক্ত সভাসমিতি প্রভৃতির কর্ত্তৃপক্ষগণ মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কার্য্যালয়ে যথা সত্বর এই সংবাদ প্রেরণ করিলে পরম অনুগৃহীত হইব।

শ্রীক্ষেত্রীশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকগণ।

(২)

বিজ্ঞাপন।

আগামী ইষ্টারের ছুটীতে (বঙ্গাব্দে ১৩২৯।১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখ) মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইবে।

সময় অতি সংক্ষেপ, সুতরাং বাঙ্গলার সাহিত্যসেবিগণ, যথাসত্বর ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপযুক্ত প্রবন্ধ ও কবিতাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে পরম অনুগৃহীত হইব।

প্রেরিত প্রবন্ধ ও কবিতা আগামী ১৫ই চৈত্রের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কার্য্যালয়, মেদিনীপুর পৌঁছান আবশ্যক।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদক, সাহিত্য-শাখা।
শ্রীমনীন্দ্রনাথ বসু সরস্বতী, এম, এ, বি, এল,
সম্পাদক, দর্শন-শাখা।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন,
সম্পাদক, ইতিহাস-শাখা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, এম, এস, সি, বি, এল,
সম্পাদক, বিজ্ঞান-শাখা।

---

(৩)

বীণাপাণি পদক।

(সন ১৩২৭ সাল)

পাবনা কিশোরী মোহন ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর গত সপ্তম বার্ষিক উৎসব-সম্মিলনী উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের প্রথম বার্ষিক আই-এস-সি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীগোপেশ্বর বিশ্বাস "লাইব্রেরী ও তাহার উপকারিতা" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার জন্য বীণাপাণি পদক প্রাপ্ত হন। উক্ত পদক প্রবন্ধ লেখকের উপরোক্ত ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু উক্ত নামে কোন লোক উপরোক্ত ঠিকানায় না থাকায় পদক ফেরত আসিয়াছে। সুতরাং এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, উক্ত পদক নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ৩ বৎসর রাখা হইবে। প্রবন্ধ লেখক উপযুক্ত প্রমান সহ আবেদন করিলে তাঁহাকে পদক প্রদত্ত হইবে।

শ্রীগিরিজা শঙ্কর জোয়াদ্দার।
সহকারী সম্পাদক।
কিশোরীমোহন ছাত্র পাঠাগার, পাবনা।



প্রতিভা

১১শ বর্ষ | মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৮ | ১০-১২ সংখ্যা

ভাষার শ্রেণীবিভাগ।

সবিশেষ চিন্তা করিয়া না দেখিলেও ভাষার শ্রেণীবিভাগ যে দুই প্রকারে হইতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিবার রীতি বা ভাষার আকৃতি এবং ভাষার মূল উপাদান বা শব্দসম্ভার লইয়া ভাষার শ্রেণীবিভাগের দুইটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম প্রণালীকে আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ বা morphological classification এবং দ্বিতীয় প্রণালীকে প্রকৃতি * গত শ্রেণীবিভাগ বা genealogical classifioation বলে। আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগে ভাষার আকৃতি বা বাক্য-গঠন প্রণালীর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অনুসারে ভাষার শ্রেণীনির্দ্দেশ হয় এবং প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগে ভাষার মূলীভূত উপাদান সমূহের ঐক্য বা অনৈক্য অনুসারে শ্রেণীনির্দ্দেশ হয়। যে উপায়ে ভাষার উপকরণ সমূহের সংযোগাদির দ্বারা শব্দ ও বাক্য গঠন করা হয় তাহাকে বাক্য গঠন প্রক্রিয়া (morphological process) বলে। ভাষার আকৃতি-গত শ্রেণীবিভাগে এই গঠন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসৃত হয়। ভাষার বিশ্লিষ্টতম উপাদানকে ধাতু বা ভাষার বীজ বলা যায়। এই ধাতু ও প্রত্যয়াদির সাম্যে ভাষার আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং ইহাদেরই বৈষম্যে ভাষার আকৃতিগত বৈষম্য।

উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা চীন দেশীয় ভাষার সহিত জাপান দেশীয় ভাষার তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে চীনের ভাষায় হ্রাসবৃদ্ধি বিহীন কতকগুলি একাক্ষর (monosyllabic) ধাতু বা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাদের ভাষায় আমাদের বিশেষ্যপদ, ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনামপদ বা বিশেষণপদের

---

* প্রকৃতি শব্দের অর্থ উৎপত্তি বা origin ; যথা প্রকৃতিঃ শৌরসেনী। প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত আগতং তত্র ভবং বা প্রাকৃতম্।

ভায় কোনও প্রকার পদ-বিভাগ (parts of speech) নাই। যাহা আছে তাহা ঐ কেবলমাত্র একাক্ষর (বা কচিৎ দ্ব্যক্ষর) ধাতু বা শব্দ; তাহাকে বিশেষ্যই বলুন, ক্রিয়াই বলুন আর বিশেষণই বলুন। ইহাদের ঐ একাক্ষর ধাতু বাক্য মধ্যে বিন্যাসের স্থান অনুসারে বিনা প্রত্যয়াদির যোগেই সর্ব্ববিধ পদের অর্থ প্রকাশ করে। চীন ভাষায় পৌ (pao) শব্দের অর্থ 'পালন' বা রক্ষা। সংযোগ-বিয়োগাদির দ্বারা এই পৌ শব্দ বা ধাতুর কোনওরূপ আকৃতি-গত পরিবর্ত্তন অসম্ভব। কিন্তু তথাপি বিনা পরিবর্ত্তনেই 'পৌ' ধাতুর অর্থ হইতে পারে—'পালন', 'পালিত', 'পালন করা', 'পালক', 'পালনীয়' ইত্যাদি। কিন্তু জাপানী ভাষায় ধাতু হইতে প্রত্যয়াদির যোগে শব্দ গঠন বিষয়ে কোনও বাধা নাই। এক একটী ধাতু হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ের যোগে নানাবিধ পদ ইচ্ছানুসারে গঠিত হইতে পারে। এই ভাষায় ধাতু একাক্ষরও নহে, অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে। উদাহরণ স্বরূপ কুরু (Kuru)=(আসি) আমি, কুরেবা (Kureba)=যদি আসি, কোই (Koi) =আইস (অনুজ্ঞা), কিতৈ (Kitai)=আসিতে ইচ্ছাকরি। এখানে ধাতু বা মূল উপাদানের আবশ্যক মত হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং আকৃতি-গত শ্রেণীবিভাগে চীন দেশীয় ভাষা ও জাপান দেশীয় ভাষা এক শ্রেণীর নহে।

আবার উভয় ভাষার শব্দ লইয়া তুলনা করিলেও দেখা যায় যে ভাষাদ্বয়ের মধ্যে শব্দ বা প্রকৃতিগত কোনও সাদৃশ্য নাই। কেবল মাত্র কতকগুলি চীন দেশীয় শব্দ জাপানের ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক এই ঋণগ্রহণ কার্য্য ঐতিহাসিক যুগে হইয়াছে বলিয়া আর জাপান ও চীনের ভাষায় শব্দ সাদৃশ্যের কথা লইয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণের কোনও প্রকার ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা নাই।

পক্ষান্তরে বঙ্গভাষার সহিত জাপানী ভাষার তুলনা করিলে দেখা যায় যে উভয় ভাষার মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নাই। সুতরাং আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগে বঙ্গ ভাষা ও জাপানী ভাষা একশ্রেণীর ভাষা, কিন্তু চীনদেশীয় ভাষা এই উভয় ভাষা হইতে পৃথক্। প্রকৃতিগত তুলনায় বাঙ্গালা, জাপানী ও চীনা ভাষার মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নাই, সুতরাং ইহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর ভাষা।

সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, পার্শী প্রভৃতি ভাষার সহিত বাঙ্গালার তুলনায় আমরা বুঝিতে পারি যে এই সকল ভাষা আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত; অর্থাৎ আকৃতিগত ভাবেও ইহারা একশ্রেণীর এবং প্রকৃতিগত ভাবেও এক শ্রেণীর। প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিশিষ্ট ভাষা সমূহের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদের একটী অন্যটী হইতে বা দুইটীই অপর একটী সাধারণ ভাষা হইতে উদ্ভূত।

(ক) আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ।

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে অতি সহজেই প্রতীতি হইবে যে আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগের প্রণালীতে পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে কোনও সূক্ষ্ম সীমারেখা অঙ্কিত করা অসম্ভব; এবং ইতিপূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া না গেলে বর্ত্তমান যুগের ভাষাতাত্ত্বিকগণ এ প্রকার শ্রেণী-বিভাগ লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের অপলাপ না করিয়া কোনও আদর্শ প্রণালীতে ভাষাসমূহের মধ্যে বিশিষ্টরূপ বিভিন্নতার নির্দ্দেশ করা অসম্ভব জানিয়াও পূর্ব্বকালীন ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতের সমালোচনার জন্য এ বিষয়ের অবতারণা আবশ্যক।

যদি বিভিন্ন বংশীয় ভাষাসমূহের প্রথম অভ্যুদয় কালের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইত তাহা হইলে বোধহয় নিম্নলিখিত মতত্রয়ের কোনও একটীর যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারিত। (১) কতিপয় ভাষাতাত্ত্বিক

বলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাসমূহের আদিম যুগে সকল ভাষাতেই ভাষার আকৃতিগত অভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন উপায়ে সম্পূর্ণতালাভের চেষ্টার ফলে কালক্রমে ভাষাসমূহের গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা সংঘটিত হইয়াছে। এককালে অ্যাংলো স্যাক্সন (Anglo-Saxon) ভাষা চীনদেশীয় ভাষার মধ্যে সম্পূর্ণরূপ আকৃতিগত বিভিন্নতা সত্বেও আধুনিক ইংরাজী ভাষা কতক পরিমাণে চীনদেশীয় ভাষার ন্যায় বাক্য-গঠন কৌশল প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) আবার শ্লেশার (Schleicher) প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত বলেন যে আরম্ভকালে আকৃতি গঠন বিষয়ে যাবতীয় ভাষাই এক প্রকারের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, এবং সম্পূর্ণতা লাভের চেষ্টায় সকল ভাষাই একই প্রকার প্রণালীতে অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু কতিপয় ভাষা অপর কতিপয় ভাষা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে পারিয়াছে বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এই মতে পৃথিবীর নানা ভাষায় যে নানা জাতীয় গঠন প্রণালী পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে ভাষার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক স্তরসমূহ সংরক্ষিত রহিয়াছে। (৩) আবার কেহ কেহ বলেন যে নানা ভাষা নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাদের সম্পূর্ণতার জন্যও তাহারা বিভিন্ন পথেই চলিয়াছে। কেবলমাত্র আকস্মিকভাবে তাহারা কোনও কোনও স্থলে একপথাবলম্বী হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে ইহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য নাই, এবং সামান্য সামান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলে ইহারা কখনই এক প্রণালীতে আত্মগঠন করিবে না। এই মতত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় মতটী যুক্তিসঙ্গত হইলেও, কোনওটীই গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ এ সকল মতবাদের অনুকূলে কোনও প্রমাণাদি নাই, এবং বহুকাল ধরিয়া ভাষার গতি লক্ষ্য না করিলে এ বিষয়ে চিন্তা করিবার উপযুক্ত উপকরণ পাওয়া যাইবে না।

ভাষার আকৃতির প্রণালী অনুসারে সাধারণতঃ সমগ্র পৃথিবীর ভাষাসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে,—(১) প্রত্যয়বিহীন একাক্ষরী ভাষা, (monosyllabic, isolating or radical languages) যেমন চীনের ভাষা; (২) সমাস ধর্ম্মী ভাষা, (agglutinating languages) যেমন তুর্কী ও জাপানী; (৩) প্রত্যয় ধর্ম্মী ভাষা (inflexional, organic or amalgamating languages), যেমন, সেমেটিক, গ্রীক, সংস্কৃত। এই শ্রেণীত্রয়ের প্রথমটীতে ধাতু ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। উপসর্গ বা প্রত্যয়াদির যোগে এ ধাতুর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ধাতুর পর ধাতু সাজাইয়া বাক্য গঠিত হয়। যদি 'ধ' অক্ষর দ্বারা ধাতু এবং 'প' অক্ষর দ্বারা পরিবর্ত্তন 'প্র' দ্বারা প্রত্যয় জ্ঞাপন করা যায় তবে এই শ্রেণীর ভাষার বাক্যের চিহ্ন হইবে ধধধধ। চীন দেশের ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষায় এক একটী ধাতু বা শব্দের সহিত ধাতু বা শব্দ সমাসের ন্যায় জুড়িয়া পদ গঠিত হয়। এই শ্রেণীর ভাষায় ধাতুর মূল অর্থ অন্য ধাতু দ্বারা বিশেষিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু বিশেষণ, সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের সাধনভূত (অর্থাৎ প্রত্যয় স্থানীয়) ধাতুর স্বাধীন ভাবে ব্যবহার না হইলেও তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশের শক্তি আছে। সেই শক্তি প্রভাবে ক্রিয়ার কাল, বাচ্য ও সম্ভাবনাদি এবং বিশেষ্যের কারক ব্যক্ত হয়। বীজগণিতের সঙ্কেত অনুসারে এই শ্রেণীর ভাষায় বাক্যের চিহ্ন পচধ বা ধপচ। চ=যে কোনও সংখ্যা। তুর্কী ও মাগ্যার এই শ্রেণীর ভাষা। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষায় মূলধাতু উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি দ্বারা বিশেষিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ধাতুস্থিত স্বরের গুণবৃদ্ধি প্রভৃতি পরিবর্ত্তন এবং ব্যঞ্জনাদির অপচয় হইতে পারে। সময়ে সময়ে প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়াদির এরূপ ভাবে সংযোগ ঘটে যে তাহাদের পরস্পরকে পৃথক করা যায়না। সংস্কৃত, গ্রীক, পার্সী, আরবী প্রভৃতি এই শ্রেণীর ভাষা। বীজগণিত অনুযায়ী ইহাদের বাক্যের সঙ্কেত ধপপ্রপচ।

উদাহরণ স্বরূপ যদি এই (EI) = যাওয়া এবং এন্ত (ENT) = তিনি হয়, তাহা হইলে প্রথম শ্রেণী এই এন্ত্‌ বা এন্ত্‌ এই হইবে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই এন্ত্‌ বা এন্তেই হইবে, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে এই এন্ত্‌, এইন্ত, এইন্‌, ইন্ত্‌, ইন্‌, প্রভৃতি হইবে।

এই ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগে জগতের যাবতীয় ভাষার সবিশেষ পরিচয় সম্ভবপর না হওয়ায় নিম্নোক্ত অষ্টবিধ শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

১। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের ভাষাসমূহে এক একটী বাক্য (sentence) এক একটী শব্দ (word) বা পদের ন্যায়। এই শব্দ বা বাক্যটী যতদূর ইচ্ছা দীর্ঘ হইতে পারে এবং ভাবপ্রকাশের মৌলিক উপাদান বা ধাতুসমূহ বিনা প্রত্যয়াদির যোগেই একত্র মিশিয়া যায়। অন্য ভাষায় এই ধাতু সমূহ এক একটী শব্দের কার্য্য করিত এবং পরস্পরের সহিত কারক বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তির সাহায্যে সম্পর্কিত হইত। এইসকল ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়া বলিয়া কোনও কিছুই নাই; কর্ম্মপদ বাচক ধাতু ও কর্ত্তৃপদ বাচক ধাতু ক্রিয়াপদবাচক ধাতুর সহিত মিশিয়া গিয়া একটা অবিশ্লিষ্ট সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। আমাদের বাক্যে যেমন পদসমূহ পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত হইয়া পরস্পরের সহিত যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তির যোগে সম্পর্কিত হইয়া এক একটী বাক্য গঠন করে, ইহাদের ভাষায় তাহা হয় না। বাক্যই ইহাদের ভাষায় ভাবপ্রকাশের জন্য একক বা unit স্থানীয়। বাক্যের বিশ্লেষণরূপ ভাব নিষ্কর্ষ (abstraction) ইহাদের চিন্তা প্রণালীতে সম্ভবপর নহে। তাই আমরা যেমন শব্দকে ভাষার একক স্থানীয় করিয়া প্রথমে শব্দ গঠন, ও পরে সেই শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন করি, ইহাদের চিন্তা প্রণালীতে সে প্রকার বিশ্লেষণ কার্য্য হয় না। ইহারা ভাষার মূল উপাদান স্বরূপ ধাতু সমূহের একত্র সমাবেশ দ্বারা এক একটি বাক্য গঠন করে। গ্রীন লণ্ডের ভাষায় একটী বাক্যরূপী শব্দ (sentence-word) সাধারণতঃ এই সম্পর্কে উল্লিখিত হয়—ঔলিসরিয়র্তোরসুঅর্পোক্ (aulisariartorasuarpok), 'সে সত্বর মাছ ধরিতে যাইতেছে'। এখানে ঔলিসর্ = মাছধরা, পিঅর্তোর্ (peartor) = নিযুক্ত হওয়া, পিন্নেসুঅর্পোক্ (pinnesuarpok) = সে তাড়াতাড়ি যাইতেছে। সমগ্র বাক্যটা হইল এইরূপ—মাছধরা-নিযুক্ত হওয়া সে তাড়াতাড়ি যাইতেছে। মেক্সিকোর ভাষায় নিসোৎসিল্তেমোআ (nisotsitemoa) = আমি-পুষ্পান্বেষণ করি, এবং নিকল্‌চিহুআ (nikalchihua) = আমি-গৃহনির্ম্মাণ-করি। চেরোকি (cherokee) ভাষায় নধোল্নিন্‌ (nadholinin) = আন-নৌকা-আমাদের জন্য। বিশ্লেষণ করিলে হইবে নতেন্‌ (naten) = আন, অমোখোল্‌ (amokhol) = নৌকা, নিন্‌ (nin) = আমাদিগকে। এই সকল ভাষার বিষয়ে এই কথা বলা হইয়া থাকে যে ইহাদের বাক্যের মৌলিক উপাদান সমূহের পৃথক ব্যবহার হয় না। কিন্তু এ বিধি সর্ব্বত্র খাটে না, কোনও কোনও স্থলে ইহাদের ভাষাতেও প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় এবং কর্ত্তৃপদ ও কর্ম্মপদ স্বাধীন ভাবে উক্ত হয়। মেক্সিকোর ভাষায় সোৎসিতল্‌ (Sotsitl) = পুষ্পসমূহ। এখানে তল্‌ বহু বচনের বাচক। সুতরাং এই সকল ভাষার নাম বহু-সংযোগী বা poly-synthetic হইলেও স্থানে স্থানে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ভাষার (inflexional language এর) কৌশল ব্যবহৃত হয়।

২। পীরেনীজ (Pyrenees) পর্ব্বতের পশ্চিমে যে বাস্ক (Basque) ভাষা প্রচলিত আছে আমেরিকার ভাষাসমূহের ন্যায় এক বাক্যের মধ্যে যাবতীয় শব্দের উপাদান মিশাইয়া দেওয়া হইলেও কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট আছে। এই ভাষায় কর্ত্তৃপদ ও গৌণ ও মুখ্য কর্ম্মপদ ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত হয়; অন্যান্য ভাষার ন্যায় ক্রিয়া-

পদ ও কর্ত্তৃপদ মাত্র দ্বারা গঠিত কাঠামোর মধ্যে অবশিষ্ট যাবতীয় উপাদানকে পুরিয়া দেওয়া হয় না। যেমন মেক্সিকোর ভাষায় নি-ক্‌-ত্‌লে-ওআৎসা (ni-k-tle-watsa)=আমি-ইহা—অগ্নি (দ্বারা)-ভাজি। এখানে 'আমি-ভাজি' রূপ কাঠামোর মধ্যে ইহা ও অগ্নি পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার বাস্ক্ ভাষায় যে বহু-সংযোজন হয়, তাহা কেবল সর্ব্বনাম পদ মাত্রে সীমাবদ্ধ; এজন্য ইহাকে সর্ব্বনাম-সংযোগী (Pronoun incorporating) ভাষা বলা হয়। দ-কর্-কি-ও-ৎ (da-kar-ki-o-t)=ইহা বহি-তাহাকে-আমি, অর্থাৎ ইহা আমি তাহার নিকট বহন করি। ন-কর্-সু (na-kar-su)=আমাকে-বহন কর-তুমি, অর্থাৎ তুমি আমাকে বহন কর। হ-কর্-ৎ (ha-kar-t)=তোমাকে-বহি-আমি ; হ-বিল্-কি-ৎ (ha-bil-ki-t)=তুমি-যাও-আমাকে। এই বাস্ক্ ভাষায় প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে; যেমন গিজোন্ (gizon)=মনুষ্য, গিজোনেজ্ (gizonez)=মনুষ্যদ্বারা, গিজোন্ গন্দিক (gizon-gandik)=মনুষ্য হইতে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সমূহে কি-ও (ki-o)=তাহার নিকট বা তাহাকে; কি-ৎ (ki-t)=আমাকে, বা আমার নিকটে। এখানে কি- (ki-)=ইংরেজী to. এ-ভাষার সর্ব্বনাম পদ ভিন্ন অন্য পদের সহিত বহু-সংযোগ (polysynthesis) হয় না; সেই জন্য ইহাকে সমাস-ধর্ম্মী এবং প্রত্যয়-নিষ্পন্ন (agglutinating-inflexional) দুইই বলা হয়। তবে ইহার বিশেষ নাম Pronoun-incorporating বা সর্ব্বনামসংযোগী।

৩। দক্ষিণ আফ্রিকার বান্তু (Bantu) বা জুলু-কাফির (Zulu-kafir) বংশীয় ভাষার বৈশিষ্ট এই যে এ সকল ভাষার বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ সকল সর্ব্বদাই পৃথক ভাবে থাকে, কিন্তু ঐ সকল শব্দের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য উপসর্গ সাহায্যে হইয়া থাকে। এই জন্য এই সকল ভাষাকে উপসর্গ-সমস্ত বা prefix-agglutinating ভাষা বলে। জুলু ভাষায় ঙ্-উমু-ন্তু (Ng-umu ntu)=মনুষ্যটীর সাহায্যে, ঙ্-আবা-ন্তু (Ng-aba-ntu)=মনুষ্যগণের দ্বারা; এখানে ঙ্ (ng)=দ্বারা, সহ, আবা (aba)=বহুত্ব (plurality) উমু (umu)=অ-বহুত্ব, এবং ন্তু (ntu)=মনুষ্য। ক্রিয়ার কাল ও সম্ভাবনাদিও এই প্রকার উপসর্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। বান্তু ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে বহু-সংযোগী (polysynthetic or incorporating), এবং সর্ব্বনাম কর্ম্মপদকে ক্রিয়ার সহিত জুড়িয়া লয়। সি-ম্‌-তন্দ (Sim-tanda)=আমরা ইহা ভালবাসি; সি-ব-তন্দ (Si-ba-tanda)=আমি তাহা-দিগকে ভালবাসি।

৪। হাঙ্গারী দেশীয় ভাষা, তুর্কীস্থানের ভাষা ও ঐ বংশের কতিপয় ভাষা সমাসধর্ম্মী agglutinative)। তুর্কী ভাষায় সেব্-মেক্ (sev-mek), ভালবাসা; সেব-ইন্-মেক (sev-in-mek) আত্ম-প্রীতি বা আপনাকে ভালবাসা; সেব্-ইশ্-মেক্ (sev-ish-mek), পরস্পর ভালবাসা; সেব্-দির্-মেক্ (sev-dir-mek) ভালবাসান (causative); সেব্-ইল্-মেক্ (sev-il-mek) ভালবাসা প্রাপ্ত হওয়া (to be loved); সেব মে-মেক্ (sev-me-mek) ভাল-না-বাসা, সেব্-ইন্-দির্-ইল্-মে-মেক্ (Sev-in-dir-il-me-mek) আত্মপ্রীতি না করান not to be made to love ourself, (lit. love-self-cause-acted-negatived-to be)। এইপ্রকার মাগ্যার্ (Magyar) ভাষায় জর্ (Zar)=বন্ধ করা, জর্ অৎ (Zarat) =বন্ধকরে, জর্ অৎ-গৎ (Zar-at-gat)=সে সচরাচর বন্ধ করে (frequentative causative), জরৎগথৎ (Zarat gathat)=সে সচরাচর বন্ধ করিতে পারে (potential frequentative causative).

একটী তুর্কীশব্দরূপ—

	একবচন অর্থ	বহুবচন অর্থ
কর্তৃ	এব্ (ev) গৃহ	এব্লের (evler) গৃহসকল
সম্বন্ধ	এবিন্ (evin) গৃহের	এব্লেরইন্ (evler-in)
সম্প্রদান	এবে (eve)	এব্লের্-এ (evlere)
কর্ম	এবি (evi)	এবলের্-ই (evleri)
অধিকরণ	এব্দে (evde)	এব্লের্-দে (evler-de)
অপাদান	এব্দেন্ (evden)	এব্লের দেন (evlerden)

এই প্রকার যাবতীয় উরল-আইতাই বংশীয় ভাষায় এই প্রকার সমাস-ধর্ম্মিতা (agglutination) থাকিলেও ইহাদের প্রত্যয় সমূহকে সকল স্থলে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তখন ইহাদিগকে প্রত্যয় ধর্ম্মী (inflexional) ভাষা বলিতে হইবে। ফিনিস (Finnish) ভাষায় এই প্রকার প্রত্যয় ধর্ম্মী উপাদানের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আবার মাগ্যার (Magyar) ভাষায় বর্ল্লক্ (varlak) = আমি-তোমার-অপেক্ষা করি, প্রভৃতি উদাহরণে - সর্ব্বনাম-সংযোজন প্রণালী (pronoun-incorporation) পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের কতিপয় জাতির চলিত ভাষায় আমেরিকার ভাষার ন্যায় বহু-সংযোজন-প্রণালী (polysynthesis) পরিলক্ষিত হয়। যেমন কমলুক (kamluk) ভাষায় ওগুংগদ্শি বৈনৈবি (ogungadshi balnai bi) আমি সত্বর যাইব, তাড়াতাড়ি উচ্চারণে হইয়া পড়ে ওগুংগদ্শনব্ (ogungadshanab).

৫। লাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত ও এই বংশের যাবতীয় ভাষায় ব্যাকরণের সম্পর্কাদি সমাস-ধর্ম্মী ভাষার ন্যায় প্রত্যয়ের সাহায্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে প্রত্যয় সমূহের দ্বারা মূল ধাতুর আকৃতিগত পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং প্রত্যয়সমূহে কোনও অর্থ নির্দ্দিষ্ট নাই। একই প্রত্যয় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। কোনও প্রত্যয় বা উপসর্গ কখনও স্বাধীন শব্দ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, এবং সময়ে সময়ে ধাতুর সহিত উপসর্গ ও প্রত্যয় এরূপভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে (তদ্ধিত, কৃৎ) যে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উচ্চারণের হিসাবেও ধাতু ও প্রত্যয় উভয়েরই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে এবং একই ধাতুর সহিত উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে যে শব্দ গঠিত হয় তাহার সহিত পুনরায় উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগ করিয়া অসংখ্য শব্দের সৃষ্টি ও নানাবিধ অর্থের প্রকাশ হইতে পারে। সমাস ধর্ম্মী ভাষায় প্রত্যয় সমূহের অর্থ ও প্রয়োগের ক্রম অতি-নির্দ্দিষ্ট এবং তাহার কখনও পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু প্রত্যয়-ধর্ম্মী ভাষায় এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই বলিলেই হয়। এই শ্রেণীর ভাষায় prepositions and auxiliaries এর ব্যবহার প্রত্যয় প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। ইহাদিগকে **প্রত্যয় ধর্ম্মী** (inflectional) ভাষা বলে।

৬। এই বংশীয় কতিপয় ভাষায় ভাষাগঠনের জন্য প্রায় সর্ব্বপ্রকার কৌশল পরিগৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এই সকল ভাষার মধ্যে ইংরাজী ও পারসী অপর সকল ভাষা অপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত। সংস্কৃত, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় যেমন প্রকৃতির সহিত প্রত্যয় জুড়িয়া শব্দ-গঠন ও কারক ক্রিয়াদির সম্পর্ক প্রকাশ করা হইত, ইংরাজী প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় সেস্থলে অন্যবিধ কৌশলের ব্যবহার চলিতেছে। যেমন preposition সহায্যে কারক গঠন এবং auxiliary verb এর সাহায্যে ক্রিয়া গঠন। কারকবিভক্তি সংযুক্ত প্রাতিপদিকের ব্যবহার যখন চলিত তখন বাক্যমধ্যে পদের অবস্থিতির জন্য স্থাননির্দ্দেশ আবশ্যক হইত না। কিন্তু এক্ষণে কারকের ও ক্রিয়ার অবস্থিতির স্থান অনুসারে অর্থের বিভিন্নতা ঘটে। ধাতুর সহিত সর্ব্বনাম প্রত্যয়ের উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এবং একবচন ও বহুবচনের গঠন এই সকল ভাষায় অতি-প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। a **stick-to-it-ive** man, তন্ন তন্ন করিয়া প্রভৃতি উদাহরণে আমেরিকার ভাষার ন্যায় বহু-সংযোজন প্রণালী পরিলক্ষিত হয়। এককথায় বলিতে গেলে এই সকল ভাষায় পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার

বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ পাওয়া যাইবে। বাক্যমধ্যে শব্দবিন্যাস প্রণালীতে পদবিশেষের জন্য স্থান বিশেষের নির্দ্দেশ লাটিন ভাষায় ছিল না বলিলেই হয়, কিন্তু ফরাসী ভাষায় ইহা বিধি বদ্ধ হইয়া যায়। habemus, habetis, habent প্রভৃতি এক একটী পদের স্থানে ইংরাজী ভাষায় we have, you have, they have প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন রূপ গঠিত হইয়াছে। German ভাষায় প্রাচীন কারক বিভক্তি এখনও সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ইংরাজী বা অন্য কোনও Romance ভাষায় আর কারক বিভক্তি নাই। ইংরাজী ভাষার 'I go to town every day and come back at the same hour from one end of the year to the other.' এই বাক্যটীতে একেবারেই প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই। এই ভাষায় বহুসংযোজন-প্রণালীর (polysynthesis এর) কয়েকটী উদাহরণ don't, shan't, don, doff, you're, good bye (God be wi' ye) ইত্যাদি।

(৭) চীন, আনাম, শ্যাম, প্রভৃতি দেশের একাক্ষরী (Monosyllabie), ভাষায় শব্দ বলিয়া কোনও কিছু নাই, প্রত্যয় বা সমাসও নাই। আছে কেবল অসংখ্য একাক্ষর ধাতু, তাহাদের একত্র সন্নিবেশ হইলেই বাক্য গঠিত হয়। অবশ্য শব্দ বিন্যাসের পদ সমূহের (বা একাক্ষর ধাতু সমূহের) অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তাহাতেই নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে এবং প্রত্যয়ের অভাবে কোনও বিশেষ অসুবিধা হয় না। ইহাদের শব্দ বিন্যাসের ক্রম—কর্ত্তৃপদ-ক্রিয়াপদ-কর্ম্মপদ। বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে অবস্থিত হয়। 'আমি তোমাকে প্রহার করি' এই বাক্যের অনুবাদ করিলে চীন দেশের ভাষায় হইবে ঙো তা নি (Ngo ta ni) অর্থাৎ আমি-প্রহার-তুমি। এইরূপ 'তুমি আমাকে প্রহার কর' বাক্যের অনুবাদ হইবে—নি তা ঙো (ni ta ngo), অর্থাৎ তুমি-প্রহার-আমি। বড় রাজ্য = তা ক্বোক (ta kuok), কিন্তু রাজ্যটী বড়=ক্বোক্ তা। ইহাদের ভাষায় কতকগুলি শূন্য শব্দ (empty wordrs) আছে, তাহারা প্রত্যয়ের কার্য্য করে। সুতরাং তাহাদের সাধারণতঃ ভাষায় ব্যবহার নাই। সি (tchi বা tsi) শব্দের এককালে অর্থ ছিল 'স্থান', এক্ষণে সি (tsi) সম্বন্ধ জ্ঞাপক ইংরাজী of এর তুল্য। মীন্ সি লিক্ (min tsi lik)=লোকের ক্ষমতা; min=লোক এবং lik=ক্ষমতা। সুতরাং tsi=র বা এর। এই প্রকারের কয়েকটী প্রত্যয় চীনের ভাষায় আছে।

৮। সেমেটিক ভাষাসমূহে (হিব্রু, আরবী প্রভৃতিতে) প্রত্যয় ধর্ম্মী ভাষার ন্যায়, কারক, বচন, লিঙ্গ, পুরুষ প্রভৃতির জ্ঞাপক প্রত্যয় থাকিলেও, ধাতুসমূহের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার জন্য শ্রেণীবিভাগে ইহার পৃথক স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। এইসকল ভাষায় ধাতুসমূহ প্রায় ব্যঞ্জন-ত্রয়-মূলক, এই তিন ব্যঞ্জনের মধ্যে বহু স্বরবর্ণের সমাবেশ হইয়া নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ক্‌ত্‌ল্ (qtl), হত্যা করা, ধাতু হইতে কুতিল (qutila)=সে নিহত হইয়াছিল, কতল (qutala) তিনি হত্যা করিয়াছেন, অক্‌তল (aqtala) সে হত্যা করাইয়াছে, ইয়াক্‌টুলু (yaqtulu) সে হত্যা করে, কাতিল (qatil), হত্যা; ইত্যাদি। প্রত্যয় ধর্ম্মী ভাষাসমূহে যে প্রকার গুণ ও বৃদ্ধি আছে তাহা কতকটা এই শ্রেণীর ধাতু পরিবর্ত্তনের ন্যায়। যেমন ইংরাজী swim, swam, swum; foot, feet; food, feed; সংস্কৃত অস্, আস; বিদ্, বেদ; হস্, হাস; পত্, পেততুঃ; ইত্যাদি; লাটিন fides, fido, fœdus; এবং গ্রীক peitho, epithou, pepoitha; ইত্যাদি।

এই অষ্টবিধ শ্রেণীবিভাগেও সকল প্রকার ভাষার স্থান নির্দ্দেশ সম্ভবপর হয় না। উদাহরণ স্বরূপ জাপানী, মালয়ী ও দ্রবিড়ী ভাষাকে সমাসধর্ম্মীও বলা যায় না, প্রত্যয়-ধর্ম্মীও বলা যায় না। কারণ ইহাদের মধ্যে

সর্বপ্রকার গঠনকৌশলপরিলক্ষিত হয় এবং কোনও একটীর আধিক্যও এত অধিক নহে যে তদনুসারে ইহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইতে পারে। ফলকথা এরূপ শ্রেণীবিভাগে ভাষা সমূহের পরস্পরের অন্তবর্তিতা অবশ্যম্ভাবী।

নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্রেণীবিভাগ প্রণালীর সহিত খণ্ড খণ্ড নামের সম্পর্ক আছে।

এফ. ও এ. ডব্লিউ শ্লেগেল (Schlegel)—

(১) প্রত্যয়বিহীন ভাষা

(২) প্রত্যয়বিশিষ্ট ভাষা

(৩) প্রত্যয় ধর্ম্মী ভাষা

গ্রিম্ (Grimm)—

(১) প্রত্যয়-ধর্ম্মিতাবিহীন ভাষা

(২) প্রত্যয়-ধর্ম্মী ভাষা

(৩) বিশ্লেষণমূলক ভাষা

বপ (Bopp)—

(১) অসংযোগশীল একাক্ষর ধাতুবিশিষ্ট ভাষা

(২) সংযোগশীল একাক্ষর ধাতুবিশিষ্ট ভাষা

(৩) বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনশীল দ্ব্যক্ষর ধাতুবিশিষ্ট ভাষা

পট (Pott)—

(১) প্রত্যয়-যুক্ত এবং শব্দের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ সংযোগশীল ভাষা

(২) উপাদানসমূহের বাহ্য সংযোগসম্পন্ন সমাস ধর্ম্মী ভাষা

(৩) সংযোগ শক্তিবিহীন স্বাধীন উপাদানমূলক ভাষা

(৪) বাক্য ও শব্দের প্রভেদবিহীন সংযোগশীল ভাষা

শ্লেশার (Schleicher)—

(১) ধাতুরূপ উপাদান সমূহের সমাবেশমাত্র-বিশিষ্ট স্বাধীন উপাদানমূলক ভাষা

(২) অপরিবর্তনীয় ধাতু ও পরিবর্তনসাধ্য প্রত্যয়-বিশিষ্ট বাহ্যসংযোগশীল সমাসধর্ম্মী ভাষা;

(৩) যাবতীয় উপাদান সমূহের পরিবর্তন সম্ভাব্য প্রত্যয়ধর্ম্মী বা সংযোগশীল ভাষা;

এই সকল বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্লেশারের নামযুক্ত শেষোক্ত প্রক্রিয়াই সমধিক সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে এই যে এইরূপ শ্রেণীবিভাগে সেমিতিক ও ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা এক শ্রেণীতে পড়ে। এই উভয় ভাষার মধ্যে আকৃতিগত যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও ভাষার শ্রেণীবিভাগকালে ইহাদিগকে এক শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় না।

নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে দুইটী মাত্র প্রধান ভাগে ভাষা সমূহকে ভাগ করা যায়;—

১। জড়প্রকৃতিমূলক বা Inorganic ভাষা সমূহ। এই সকল ভাষায় শব্দবিন্যাসের স্থানমাত্র দ্বারাই কারকাদির সম্পর্ক প্রকাশ পায়। ধাতুসমূহের বাহ্য বা আভ্যন্তর পরিবর্তন হয় না। মূল ধাতুর কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন অসম্ভব।

২। জীব-প্রকৃতিমূলক ভাষা (organic languages). এইসকল ভাষায় মূল উপাদানের নানা উপায়ে ও অল্পাধিক পরিমাণে নানাবিধ পরিবর্তন হয় এবং সেই সকল পরিবর্তন দ্বারা ধাতুর মূল অর্থের নানারূপ বিভিন্নতা সংঘটিত হয়।

ভাষাসমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লইয়া মোটামুটি ভাবে নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে।

ক। প্রত্যয় ধর্ম্মী

১। ধাতুর অভ্যন্তরে পরিবর্তন বিহীন সংহতিশীল ভাষা—

(ক) সংশ্লেষণ শীল—(সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, গথিক, ইত্যাদি)

(খ) বিশ্লেষণশীল—(ইংরাজী, পার্সী, বাঙ্গালা, প্রভৃতি আধুনিক ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সমূহ)

২। ধাতুর আভ্যন্তর পরিবর্তন যুক্ত সংহতিশীল ভাষা—

(ক) সংশ্লেষণশীল—(প্রাচীন সেমিতিক)

(খ) বিশ্লেষণশীল—(হিব্রু, আরবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা)

৩। সমান ধর্মী (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পরিবর্তন হয় না) ভাষা

(ক) প্রত্যয়-সমস্ত—(উরল-আল্‌তাই বংশীয় ভাষা সমূহ)

(খ) উপসর্গ-সমস্ত—(বান্টু বংশীয় ভাষা সমূহ)

(গ) প্রত্যয় ও উপসর্গ সমস্ত—(মালয় বংশীয় ভাষাসমূহ)

(ঘ) সর্বনাম-সংযোগী—(বাস্ক্‌ ভাষা)

৪। বহু-সংযোগী বা বাক্যপদী ভাষা (Polysynthetic or holophrastic)—(আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের ভাষা)

খ। প্রকৃতি-গত শ্রেণী বিভাগ।

আকৃতি-গত শ্রেণী বিভাগ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হইতে পারে না, কারণ বাক্য বা শব্দ গঠন প্রণালীর যে-সকল ধর্ম লইয়া পৃথিবীর ভাষাসমূহের শ্রেণী নির্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেই ধর্ম অল্লাধিক পরিমাণে সকল ভাষাতেই আছে। নির্দ্দিষ্ট করিয়া এমন কথা বলা যায় না যে অমুক ভাষা বা অমুক ভাষা সমূহ অমুক প্রণালীতে শব্দ বা বাক্য গঠন করিয়া থাকে, অন্য কোনও প্রণালী অবলম্বন করে না। কারণ এ পর্য্যন্ত আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ লইয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই দেখা যাইবে যে কোনও একটী ভাষা ও কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। কোনও সজীব ভাষাই কোনও বিশিষ্ট নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কেবল মাত্র সংস্কৃতের ন্যায় ব্যাকরণ প্রধান ভাষাতেই ব্যাকরণের বিধির প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়। তবে সে ভাষাতেও প্রায় প্রত্যেক বিধিরই ব্যতিরেক আছে। সে যাহাই হউক প্রকৃতিগত বা বংশগত শ্রেণী বিভাগই বিজ্ঞান-সম্মত। কি রীতিতে ভাষার প্রকৃতি বা বংশ নির্ণয় করা যায় তাহাই বর্ত্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভাষার প্রকৃতির পর্য্যালোচনা কালে ভাষার শব্দ সম্ভারই আমাদের একমাত্র সহায়। যে-সকল ভাষা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা হইতে উদ্ভূত তাহাদের সাধারণ সম্পত্তি কতকগুলি শব্দ। অর্থাৎ যখন দেখা যাইবে যে দুই তিন বা চারি পাঁচ ভাষায় ভাষার উপাদানগত ধাতু এবং দৈনন্দিন কথোপকথনে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ একরূপ, তখনই আমরা বুঝিব যে হয় ইহাদের মধ্যে কোনও একটী ভাষা হইতে অন্য ভাষাগুলি সমুদ্ভূত হইয়াছে, নতুবা ইহাদের সকলগুলি অন্য একটী ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল সাধারণ উপাদান বা ধাতু এবং শব্দসম্ভারে আমরা অতি পরিচিত যাবতীয় বস্তুর নাম, জীবজন্তুর নাম, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের বাচক শব্দ, জ্ঞাতিত্ববাচক শব্দ, সংখ্যা-বাচক শব্দ, সর্ব্বনাম শব্দ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার চিরাভ্যস্ত ভাবপ্রকাশক শব্দ পাইব। যদি এই সমুদায় পাওয়া যায় তাহা হইলে এই সকল ভাষার জ্ঞাতিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকে না। ইউরোপের রোমান্সভাষাসমূহ (The Romance languages) অর্থাৎ ফরাসী, স্পেনীয়, পোর্ত্তুগীজ, রুমানীয়, ইটালীয় প্রভৃতি ভাষাসমূহের শব্দসম্ভারের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এইসকল ভাষার মধ্যে জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক আছে, এবং ইতিহাসের প্রমাণ হইতে আমরা দেখি যে আমাদের শব্দসম্ভারের তুলনামূলক যে অনুমান তাহা ভ্রান্ত নহে। কারণ ঐ সকল ভাষা লৌকিক লাটিন বা উত্তরকালের লাটিন (Popular Latin) ভাষা হইতে

আত্মবিকাশ করিয়াছে। সুতরাং এইসকল ভাষার পক্ষে লাটিন ভাষা মাতৃস্থানীয়া এবং ইহারা লাটিনভাষার কন্যা ও পরস্পরের ভগিনী তুল্যা।

কিন্তু এই প্রকার শব্দসম্ভারের তুলনামূলক শ্রেণীবিভাগের একটী অন্তরায় আছে। পল্লীগ্রামে কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে যাইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে গৃহস্বামীর পুত্রকন্যাদি জ্ঞাতি ব্যতীত ও আরও কতিপয় লোক সেই গৃহে পশুপালন, কৃষিকার্য্য, গৃহকর্ম্ম, শিশুরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বাস করে এবং সেই-খানেই তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। ইহারা কিন্তু গৃহস্থের জ্ঞাতি নহে। সেইপ্রকার ভাষার অভিধান হইতে শব্দ বাছিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক ভাষাতেই কিয়ৎপরিমাণ বিদেশীয় শব্দ আছে। ভাষা যখন সজীব থাকে তখন যে সকল ভাষার সহিত তাহার সম্পর্ক হয় সেই সকল ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়া নিজের সম্পদ্ বৃদ্ধি করে। অনেক সময় এই প্রকারে শব্দ সংগ্রহ না করিলে নূতন নূতন ভাব প্রকাশের অসুবিধা হয়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় জানালা, গরাদে, পেরেক, পীপা (জলের), বরগা, বালতি, বোতাম, নোনা, আনারস, আলকাৎরা, কপি (শাক), কাকাতুয়া, কেদারা, কিরিচ প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ শব্দ এমনভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে যে ইহাদিগকে চেনা যায় না। আবার আধুনিক পার্সী ভাষা আর্য্য ভাষা হইলেও সেমিতিক আরবী ভাষার শব্দসম্পদ এ পরিমাণে অপহরণ করিয়াছে যে কেবলমাত্র অভিধান দেখিয়া ইহার বংশনির্ণয় করা দুষ্কর। আবার ইংরেজীভাষায় ফরাসী ও লাটিন শব্দের পরিমাণ এত বেশী যে কেবলমাত্র অভিধানের শব্দসংখ্যা লইয়া দেখিলে ইহাকে হয়ত কেহ (Romance) রোমান্স ভাষা বলিয়া ফেলিবেন। সুতরাং এরূপস্থলে কেবলমাত্র শব্দসংখ্যার অনুপাত হইতে ভাষার জাতিত্ব নির্ণয় চেষ্টা ভ্রম-প্রমাদবর্জ্জিত নহে।

এরূপ ক্ষেত্রে ভাষার যাবতীয় শব্দসম্পদ একত্র করিয়া তাহার অনুপাত লইলে চলিবে না। যে সকল শব্দ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন, কৃষক, তন্তুবায়, মজুর, মহাজন, সর্ব্বশ্রেণীর লোকে সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহার করে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বার ব্যবহার করে সেই সকল শব্দের গড় লইয়া হিসাব করিলে যে শ্রেণীর শব্দের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তাহাদের দ্বারাই ভাষার জাতিত্ব নির্ণয় হইবে। উদাহরণস্বরূপ পার্সী ভাষায় অশ্বাদি পশুর নাম, মাতা পিতা ভ্রাতা দুহিতা প্রভৃতি জ্ঞাতিবাচক শব্দ, অস্তিত্বাদি বাচক ধাতু, আমি, তুমি, সে প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দ, দুই তিন চারি পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যা বাচক শব্দ, ইত্যাদি যে সকল শব্দের দৈনন্দিন অষ্টপ্রহর ব্যবহার হয়, সে সকল শব্দ আর্য্য ভাষার শব্দ। সুতরাং পার্সীভাষা আর্য্যভাষা, সেমিতিক ভাষা নহে।

একটা কথা উঠিতে পারে যে যদি শব্দসংখ্যা লইয়া ভাষার জাতিত্ব নির্দ্ধারণ যদি দুষ্কর হয় তবে ব্যাকরণের সম্পর্কবাচক প্রত্যয়াদির তুলনা করিলেই ত চলিতে পারে। এখানেও একটা অন্তরায় আছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানি ইংরাজীভাষা ও পারস্তভাষা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা। কিন্তু এই উভয় ভাষাতেই এত অধিক পরিমাণে প্রত্যয়বর্জ্জন করিয়াছে যে ইহাদিগকে বিশ্লেষণমূলক প্রত্যয়বিহীন ভাষা বলিলেও চলে। সুতরাং এরূপ স্থলে কেবলমাত্র ব্যাকরণ সাহায্যে ভাষার জাতিত্ব নির্ণয় সম্ভবপর নহে। তবে যে সকল স্থলে এই উভয় ভাষায় প্রত্যয়াদি রক্ষা করিয়াছে, সেই সকল স্থলে দেখা যায় যে ইহাদের ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহ প্রায়শঃ সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষার ন্যায় একজাতীয়। কিন্তু আর কিছুকাল পরে যদি প্রত্যয়বর্জ্জন কার্য্য সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং ব্যাকরণের হিসাবে ইহারা চীনদেশীয় ভাষার ন্যায় শব্দবিন্যাসের স্থানমাত্র দ্বারা বাক্যমধ্যস্থ শব্দসমূহের সম্পর্ক প্রকাশ

করে, তাহা হইলে ব্যাকরণের সম্পর্ক পাওয়া যাইবে না। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের শব্দসম্ভার নিশ্চয়ই থাকিয়া যাইবে।

শব্দ সম্ভারের তুলনার সম্বন্ধেও একটী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকলেই শব্দসমূহের জ্ঞাতিত্ব কল্পনা ভ্রমাত্মক। ধ্বনিব্যত্যয়ের যে সকল বিধি ভাষাবিজ্ঞানের চেষ্টায় পরিচিত হইয়াছে, সেই সকল বিধি অনুসারে এক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অন্য ভাষায় যেরূপ উচ্চারণ হইবে, সেই উচ্চারণ ভিন্ন কেবলমাত্র শব্দ সাদৃশ্য গ্রহণ করিলে আমাদিগকে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ ইংরাজী quoth ও সংস্কৃত কথ ধাতু সদৃশ উচ্চারণ বিশিষ্ট হইলেও ইহারা এক মূল হইতে নিষ্পন্ন নহে। ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে আমরা জানি যে quoth ক্রিয়ার সহিত সংস্কৃত গদ ধাতুর জ্ঞাতিত্ব আছে। এইপ্রকার সংস্কৃত গো শব্দ ইংরাজীতে cow; সংস্কৃত গর্ভ ইংরাজী calf; সংস্কৃত গর ধাতু ইংরাজী call; ইত্যাদি। আবার সংস্কৃত সূর্য্য গ্রীক helios; সংস্কৃতে যে হেলি শব্দ আছে তাহা গ্রীক ভাষা হইতে অপহৃত শব্দ, নতুবা প্রথম হ-কারের মিল উভয় ভাষায় থাকিত না। এই প্রকার আর একটী গ্রীক শব্দ হোরা সংস্কৃতে আছে। সংস্কৃত গো, গ্রীক bous, জর্ম্মণ kuh, ইংরাজী cow হইতে মূল ইণ্ডো-ইউরোপীয় * gous; সংস্কৃত দশ, গ্রীক deka, লাটিন decem, গথিক taihun, ইংরেজী ten হইতে ইণ্ডো-ইউরোপীয় * dekin; এবং বহু শব্দের তুলনা দ্বারা মূল ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষার শব্দসমূহের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইয়াছে। এবং এই তুলনার ফলে বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহের ধ্বনির পরিবর্ত্তন যে প্রণালীতে সাধিত হয় তাহা নির্ণীত হইয়াছে। ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের কোনও ভাষার একটী শব্দ হইতে ধ্বনি পরিবর্ত্তন বশতঃ অন্য একটী নির্দ্দিষ্ট ভাষায় তাহার কিরূপ রূপ হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া যায়; আর যদি সে রূপ না পাওয়া যায় তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে শব্দদ্বয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব নাই বা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় শব্দটী অপহৃত হইয়াছে।

এ কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভাষাসমূহের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগের যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার ফলে কয়েকটী মাত্র বংশের জ্ঞাতিত্ব নির্ণীত হইয়াছে অধিকাংশ ভাষাই এ যাবৎ শ্রেণীবদ্ধ হয়। যে সকল ভাষা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইণ্ডো-ইউরোপীয়, সেমেটিক, উরল-আল্‌তাইক, মালয়-পলিনিসীয়, বান্টু ও দ্রাবিড়ী বংশই প্রধান। চীনদেশের ভাষা এবং আমেরিকার নানাভাষার বিষয়ে এখনও বহু আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সওগাত।

(১)

ফুলোৎসব।

বুদ্ধদেবের সুখ-স্মরণীয় জন্মোৎসব, জাপানে বৌদ্ধগণের নিকট ফুলোৎসব নামে পরিচিত। এপ্রিল মাসে এ উৎসব হইয়া থাকে। জাপানে ঐ সময়েই ফুলের হাসি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ৮ই এপ্রিল বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ঐ তারিখেই এ উৎসব সম্পন্ন হয়। চীনে প্রায় ৩৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে বুদ্ধের জন্মোৎসব অতীব শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। জাপানে ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে জন্মোৎসব বিধি চলিয়া আসিতেছে। ১৯১৬ সনে প্রথম এই ফুলোৎসবের প্রথা প্রচলিত হয়। সেদিন অশোক তরুর তলে বুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তিকে ফুলসজ্জায় ভূষিত করিয়া সকলেই শ্রদ্ধা নিষ্ঠার সহিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে হৃদয়-অর্ঘ্য নিবেদন করে। সেদিন বিদ্যালয়ের বালক বালিকারা ফুল বিক্রয় করে, এবং

বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোন না কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়।

(Asian Review.)

(২)

শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা।

চীনদেশীয় সম্পাদক অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইবার সময় প্রবন্ধ লেখকের নিকট কিরূপভাবে পত্র লিখিতেন তাহার নমুনা দেখুন,—

"আমরা অপরিমেয় আনন্দের সহিত আপনার রচনাটি পাঠ করিয়াছি। জীবনে এরূপ রচনা আর কখনও পড়ি নাই। যদি আমরা ইহা প্রকাশিত করি তাহা হইলে সকলেই এরূপ রচনাই সর্ব্বদা প্রকাশিত করিতে বলিবেন। যেহেতু দশসহস্র বৎসরের মধ্যে ইহার সমকক্ষ আর একটি রচনা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, সেহেতু গভীর দুঃখের সহিত আপনার পবিত্র রচনাটি ফেরৎ দিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের অক্ষমতার জন্য এক কোটি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" (Pearson's Magazine.)

(৩)

চন্দ্রলোকের বার্ত্তা।

ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ মঁসিয়ে লে মরভেন, পাঁচ বৎসর গবেষণার পর চন্দ্রের একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উহাতে পর্ব্বত ও গহ্বরাদির স্থানও প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি এ যাবৎ চন্দ্রগ্রহের নানা অবস্থার ৮০০০ আলোক-চিত্র তুলিয়াছেন এবং ঐ সকলের ফল সন্নিবেশিত করিয়া সম্প্রতি ৪৮ খানি মানচিত্র ফ্রান্সের বিজ্ঞান-সমিতিতে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, চন্দ্রগ্রহে পাঁচটি মহাসমুদ্র আছে। যথা,— "অমৃত-সমুদ্র", "বাষ্পীয়-সমুদ্র", "তুহিন সমুদ্র", "উষ্ণ-সমুদ্র" এবং "বাত্যা-সমুদ্র"।

(৪)

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

আলফ্রেড রসেল ওয়ালেস, তাঁহার "The wonderful century" নামক বিখ্যাত পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রসাদে বর্ণানুক্রমিক লিখন-পদ্ধতি, আরবীয় অঙ্ক, দিগদর্শন যন্ত্র, মুদ্রাযন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বায়ুমান যন্ত্র ও বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এক ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞান-জগতে, রেলবর্ত্ম, বাষ্পীয়পোত, বৈদ্যুতিক তার-বার্ত্তা, টেলিফোঁ, দেশলাই, গ্যাসালোক, বৈদ্যুতিক বাতি, আলোক-চিত্র, কলের গান, রঞ্জন-রশ্মি, বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ, বিষ-নিবারণের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।

(Munsey's Magazine of America.)

(৫)

চারিজন শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা।

এই "অকাল মাকালের" দেশে শত বর্ষের কথা হয়ত অনেকের পিলা চমকাইয়া যাইবে। বিলাতে এখনও অধিকাংশ স্থলেই "ভীমরতি" বৃদ্ধ পাওয়া যায়। শতবর্ষীয় যে পাওয়া যায় না তাহাও নহে, মাঝে মাঝে ২।৪ জন শতবর্ষীয় বৃদ্ধও দেখা যায়। ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী সেনেট বলিয়া এক গ্রামে চারিজন শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা আছেন।

(১) মিস্ সার্জটী মর্গান, বয়স ১০২ বৎসর; তিনি বলেন যে "মনকে কখনও ফাঁকা রাখিও না।"

(২) মিস্ এমা মেডক্স, বয়স ১০০ বৎসর; তিনি বলেন যে "সব সময়ই একটা কাজে থাকিও।"

(৩) মিসেস সার্জটী মাউন্ট ফেনেল, বয়স ১০১ বৎসর; তিনি বলেন "যে যত শক্ত কাজ করিবে ততই অধিক দিন বাঁচিবে।"

(৪) মিস্ কুর্টীশ, বয়স ১০৫ বৎসর; তিনি বলেন যে তিনি "স্বর্গীয় সম্রাট এডওয়ার্ডকে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং তাহার গায়ের প্রথম সার্ট তিনি তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন।"

(৬)

ঘুমাইবার বৈজ্ঞানিক রীতি।

বিলাতের বড় বড় ডাক্তারেরা বলেন যে যদি কেহ গালের নীচে হাত রাখিয়া নিদ্রা যায় তাহা হইলে তাহার চোখ বসিয়া যাইবে এবং মুখ থুবড়া হইয়া যাইবে। যদি কেহ কুকুরকুণ্ডলী করিয়া ঘুমাইতে অভ্যাস করে তাহা হইলে সে শীঘ্রই বক্র হইয়া পড়িবে। বেশী উচু বালিশে নাক বক্র করিয়া তুলে। উচু বালিশে ডান-দিকে শুইলে বাঁ দিকে নাক ঝুকিয়া পড়ে আবার বাঁ দিকে শুইলে ডান দিকে ঝুকিয়া পড়ে। যাহারা বাঁ দিকে কাৎ হইয়া থাকে, তাহাদের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া ভাল হইতে পারে না,—যাহারা চিৎ হইয়া ঘুমায় তাহাদের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়, শ্বাসের ক্রিয়া ব্যাঘাত হয়, বোবায় ধরে। ডাক্তারী মতে ডান দিকে কাৎ হইয়া ঘুমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রীতি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

(স্বরাজ)

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বাঙ্গলার সঙ্গীতধারা।

(২)

ভারতচন্দ্রের পরে নিধিরাম গুপ্তের গান বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সময়ে ১৯ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। ১১৪৮ সনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার গান "নিধুর টপ্পা" নামে বিখ্যাত। নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। পশ্চিম দেশীয় প্রসিদ্ধ গায়ক ও টপ্পা গানের সৃষ্টিকর্ত্তা সোরিমিঞার (গোলাম নবি) টপ্পার সুর অবলম্বন করিয়া নিধুবাবু তাঁহার উৎকৃষ্ট টপ্পাগুলি রচনা করেন। তাঁর রচনায় প্রণয়সঙ্গীতই বেশী। নিধুবাবুর গানের রচনাভঙ্গী ও ভাষা বড় সহজ সরল। সময় সময় এমন সুন্দর এক একটি তুলনা দেওয়া হইয়াছে যে শ্রবণ মাত্র গানের ভাবটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গানের ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁহার কএকটি গান দেওয়া গেল।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

"ভালবাসা ভুলিবার নয়,
প্রেম সে অমৃতময়।
মেঘে ঢাকে চাঁদের কিরণ—
বিচ্ছেদে প্রেম ঢাকা রয়॥
চকমকি-পাথর যদি, জলে থাকে নিরবধি,
ঘা মারিলে ফিন্‌কি ছোটে—
অনল বাহির হয়॥"

খাম্বাজ—মধ্যমান।

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ,
এ মহী মণ্ডলে।
গগনে শারদ শশী উদয় কলঙ্ক ছলে॥
কি সৌরভে কি গৌরবে, কে তব সমুখ হবে॥
সে কেবল তোমায় সম্ভবে—
যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে॥"

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

"সুন্দর হইলে কিবা হয়,
বলি প্রাণ তোমায়।
রস বোধ না থাকিলে
রসবতী কেবা কয়॥
তার সাক্ষী দেখ সখি, কোকিল কুৎসিত পাখী,
রূপেতে কি করে তার, স্বরেতে জগৎ জুড়ায়॥"

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি,
দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,—
দেখা দিতে আসি নে॥"

নিঃস্বার্থ প্রেমের কি সুন্দর চিত্র!

এই সময়ের পরে দেশে এক প্রকার নূতন ঢঙের গান সৃষ্ট হইল। উহা কবিগান। রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলাময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাম বসুর "বিরহ" অতি উপাদেয় জিনিস। তাঁহার ভাব ভাষা উভয়ই চমৎকার। কবিওয়ালাদের মধ্যে রামবসুর রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার নিম্নলিখিত গানটিতে লাজনম্রা তরুণী বধূর কি মনোরম অপূর্ব্ব চিত্রই না অঙ্কিত হইয়াছে। গানটি শ্রবণমাত্র ব্রীড়াবনতা তরুণীর মধুর মূর্ত্তিটি—তাহার ঢল ঢল-মুখ-কমল—তাহার ছল ছল আঁখি যুগল—তার ফুটি ফুটি—কোটেনা—বাক্য-কথন-চেষ্টা—সবই যুগপৎ মানস-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। সে সখি-সন্নিধানে কহিতেছে,—

মহড়া।

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলি বলা হ'ল না,
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নিলজ্জা রমনী বলে' হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারীজনম যেন করে না॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময় প্রাননাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,—
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না॥"

কবিওয়ালারা প্রায়ই বেশী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিত রচনা শক্তি অতি প্রখর ছিল। একবার কোন এক জমিদার বাড়ীতে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দুইটি কবির দলের গান হইতেছিল। তাহার এক দলের প্রধান নীলু ঠাকুর, অন্য দল কাহার জানা যায় নাই। দুই দলেই সওয়াল জবাব চলিয়া চমৎকার গান হইতে-ছিল। দুই দলের প্রধান গায়কই সমশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী—কেহ কাহাকে ছাড়া'তে বা জব্দ করিতে পারিতেছেন না। ঘটনাক্রমে নীলু ঠাকুর কএকবার আসরে যাইতে পারিলেন না। নিজের দলের রাম প্রসাদ নামক গায়ককে নিজের পরিবর্ত্তে পাঠাইলেন। কিন্তু রাম প্রসাদের সঙ্গে গানে যুত ধরিল না—রাম প্রসাদ তেমন পটু ছিলেন না, সরকারী ও বড় একটা করিতেন না। সমানে সমানে পাল্লা না হইলে সুখ কি? আসরে আসিয়াই অপর দলের প্রধান গায়ক গাইলেন,—

"যেমন ঢাকের পিছে বাঁয়া থাকে
বাজে না কো একটি দিন,
—যেমন লবেদার আস্তিন—
তেমনি আজ নীলুর দলে রামপ্রসাদ এক টিম্॥"
(মরি হায় রে)

অতঃপর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরমার্থ সঙ্গীত উল্লেখ যোগ্য। এ গুলির রচনা বেশ প্রাঞ্জল এবং প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট। নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটিতে অদ্বৈত ভাব অতি পরিস্ফুট—

আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

"দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়॥
হংস রূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,

সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয় ॥
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম,
প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় ॥"

রাজা রামমোহন রায় জন্মেন ১১৮১ সনে, তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই কবিপ্রবর ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় প্রাদুর্ভূত হন। তিনি জন্মেন ১২১৭ সনে। তাঁহার রচিত কবি গান এবং শ্যামা বিষয়ক গান আছে। শ্যামা সঙ্গীত যথা—

বেহাগ—একতালা।

"কেরে বামা বারিদ বরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,*
কাহার ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করন-কারণ চরণ-শরণ লয় ॥
বামা—হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকলে শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয় ॥
বামা—টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়।
কেরে—লোলিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশ বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয় ॥"

কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২১১ সনে প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথী রায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। দাশরথী রায়ের বহু সঙ্গীত আছে। তিনি রাম লীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি অবলম্বনে যে সকল পালা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট গান দিয়াছেন। আমরা দুই তিনটি উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন তখন রাণীরা অন্যান্য পুরবালাগণের সঙ্গে নয়নাভিরাম রাম লক্ষ্মণ এবং বধু সীতা দেবীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে অনুতাপানলদগ্ধা ভরত জননী রাণী কৈকেয়ী কাঁদিয়া কাঁদিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন,—

মিশ্র আলাইয়া—আড়া ঠেকা।

"তুই কি ঘরে এলিরে রাম ধন।
আমার অন্তরের যে ব্যথা তুই বিনে আর কে জানে তা,
আমি যে তোর অভাগিনী কৈকেয়ী মাতা,
কই কই দুঃখের কথা, কই কই রাম তুই কোথা,
আয় দেখিরে দেখি তোর ঐ চাঁদ বদন ॥
ভুবন জীবন তোমায় বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরই কথা জান অন্তর্য্যামী,
রাবণ বধিবারে বনে গেলে তুমি,
আমায় ক'রে বিড়ম্বন ॥
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,
বনপশু আমার দুঃখে কাঁদে কুমার,—
পাপিনী মা ব'লে মুখ দেখে না আমার
পুত্র ভরত শত্রুঘন ॥"

কি মর্ম্মবেদনার সহিত কবি এখানে কৈকেয়ীর হৃদয়ের দারুণ জ্বালা প্রকাশ করিয়াছেন। কৈকেয়ীর নাম মাত্র শ্রবণে ভারতের নরনারী আবাল বৃদ্ধ বনিতা আজও পর্য্যন্ত নিদারুণ ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, সেই কৈকেয়ীমুখ নিসৃত এই মর্ম্ম বিদারী কথা শ্রবণ করিলে সকলেই হতভাগিনীর জন্য অন্ততঃ এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার হৃদয়ের কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা। যে ভরতের জন্য তাঁর রাম নির্ব্বাসন

* সূর্য্য।

করিলেন, গঙ্গাসাগরে পতিত যাত্রিণী হইলেন, সেই নিজের রাজ ভবনের দাস দাসীরও পর্য্যন্ত ঘৃণার পাত্রী হইলেন, সেই পুত্র—তাঁহার সেই প্রাণাদপি প্রিয়তর কুমার ভরতই কিনা "পাপিনী মা বলে মুখ দেখে না!" কি বিড়ম্বনা! ইহাপেক্ষা দুঃখ আর কি হইতে পারে? কৈকেয়ীর জীবন ত শ্মশান! আজ দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে তাই রামকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা গৈরিক স্রাবের ন্যায় সবেগে নির্গত হইয়াছে।

দাশরথী রায়ের অনুপ্রাস, সময়ে সময়ে বড়ই মনোরম হইয়াছে। একটি গান দেখুন। অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ বলরাম শ্রীবৃন্দাবন আঁধার করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। কংস বধ হইয়া গিয়াছে মাত্র। বসুদেব দেবকী তখনও পর্য্যন্ত কংস কারাগারে আবদ্ধ। দুই ভাই অবিলম্বে সেই কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়া পিতা মাতার অস্থি চর্ম্ম সার কঙ্কালবৎ মূর্ত্তি দেখিয়া দ্বারদেশে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র দেবকীর নয়ন যুগল অশ্রুতে ভরিয়া গেল, স্তনে ক্ষীর ধারা বহিতে লাগিল, হৃদয়াবেগে মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ক্রমে ধ্যানস্থবৎ হইয়া—

সুরট্—ঝাঁপতাল।

"দেখিছেন দেবকী চিতে
রাম কৃষ্ণ যুগলেতে,
অমরপুর বর্জ্জিত রজত মণি মরকত।
ইন্দ্রনীল নিন্দিত, নীল নলিনী দলগত,
জল জলদ রুচি রুচির হরিহর যেন মিলিত।
কিবা শিঙ্গা শোভিত রাম কর,
বাঁশীতে শোভে শ্যাম কর,
রাকেশ বামে বিপরীত করে শোভে শ্যাম কর,
মধু মদ-মোহিত-রাম, ভৃগুপদ নিহিত শ্যাম,
রেবতী মন রমণ রাম, রাধা মোহন রাধা নাথ॥
দাশরথী কয় ও দেবকী, ও রূপের তুলনা দেব কি,
শুক নারদ যাতে বিবেকী, বিধি আদি যাতে মোহিত॥"

দাশরথী রায়ের শ্যামা বিষয়ক গানগুলি অতি চমৎকার। তিনি গাইয়াছেন,—

মূলতান—একতালা।

"দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল কাল রূপ জল,
কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী,
বিগুণ করেছি স্বগুণে,
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে,
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে,
জীবনে জীবন কাহে হয় রক্ষে,
তবে তরি চরণতরী দিলে,
ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা॥"

কবিবর দাশরথী রায়ের পরে শ্রীধর কথক মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি ১২২৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রেম সঙ্গীতগুলি বড়ই সুন্দর। একটি গান দেওয়া গেল।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

"আমার মনো বেদনা কভু জানাইও না তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়॥
সে বাসে না বাসে ভালো, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনিলে তার মঙ্গল, তবু ত প্রাণ জুড়ায়॥"

প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের গানগুলিও উল্লেখযোগ্য। একটি নমুনা দেওয়া গেল,—

কালাংড়া—একতালা।

"ভোলা যায় কি ?
কথার কথা ?—
মন যে মনে গাঁথা।
শুকাইলে তরুবর
ছাড়ে কি জড়িত লতা ?
হলে পরে বারি হীন,
থাকিতে কি পারে মীন,
ছেড়ে কভু নব ঘন,
থাকে কি বিজলি লতা ?"

ইহার পরে কলিকাতার আনন্দ নারায়ণ ঘোষ, আশুতোষ দেব, শিবচন্দ্র দাস, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং কালী মির্জ্জা প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতা মহোদয়গণ বহু উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বহু গান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সঙ্গীত কল্পদ্রুমে" পাওয়া যাইবে। উহা হইতে আনন্দ নারায়ণ ঘোষ ও আশুতোষ দেবের (প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু) দুইটি আগমনী সঙ্গীত পরম্পর দেওয়া গেল।

আগমনী এবং বিজয়া সঙ্গীত গুলিতে কোমল তুলিকা স্পর্শে বঙ্গ গৃহের আনন্দ-বিচ্ছেদ-করুণা মাখ বড়ই মনোরম কন্যা-স্নেহ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গিরিরাণী বলিতেছেন,—

ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

"ওগো জয়া বল জয়া কখন আসিবে।
মনের বিচ্ছেদ-তমঃ হেরিলে নাশিবে॥
গৌরীর মুখারবিন্দ, জিনি শত কোটি ইন্দু,
উথলে' পুলক-সিন্ধু, জীবন ভাসিবে॥
গিরী গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হ'ল আসিতে,
কখন আসি উমাশশী—অঙ্কেতে বসিবে।
গৌর হইয়ে চঞ্চল, ধাইয়ে মম অঞ্চল,
"মা বলে" এসো কুন্তলে, কুন্তলা ভাসিবে॥
গত যামিনীর শেষে, দেখেছি স্বপনা বেশে,
আমার শিয়রে বসে', শিব সঙ্গে শিবে।
সেই হতে' উৎকণ্ঠিতা, আছি ধূল্যবলুণ্ঠিতা,
স্বপন-বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে॥"

বলিতে বলিতে মায়ের প্রাণপুত্তলী উমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী গদ্‌গদভাবে উমাকে বলিলেন,—

ললিত—আড়া।

"রানী বলে এলে উমা প্রাণের নন্দিনী।
উথলিল হেরে তোমায় প্রেম-তরঙ্গিনী॥
উমা-মুখ-শশধর, নিরখিছে নিরন্তর।
পুলকেতে পূর্ণ তনু, যেন চকোরিণী॥

আলিঙ্গিলে কুতুহলে, করে ধরে' করে' কোলে,
জননি-মুখ চুম্বিলে, ত্রিলোক জননী।
না হেরিয়ে তব মুখ, তিলেক না ছিল সুখ,
দূরে গেল মম দুখ, দুখ-বিনাশিনী॥

মুখাম্বুজে ঘর্ম্মজল, শোভিছে মুকুতা-ফল,
হতেছে অতি উজ্জ্বল, ভুবন মোহিনী।
কি করি মুছাতে হয়, মুছাইলে শোভা ক্ষয়,
না মুছালে শ্রান্ত রয়, আনন্দের রানী॥

ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ নন্দী বংশের ভক্ত রামদুলাল মুন্‌সী মহাশয় কালী সাধক ছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গানটি প্রসিদ্ধ,—

"জানিগো জানিগো তারা, তুমি জান ভোজের বাজি।
যে নামে যে ডাকে তোমায়, তাইতে তুমি হওমা রাজি॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ।
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী বলে রাধিকাজি॥
শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি॥
মগে বলে ফরাতারা, গড বলে ফিরিঙ্গী যারা।
আল্লা বলে' ডাকে তোমায় সৈয়দ্,পাঠান,মোগল,কাজি॥

শ্রীরামদুলালে বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি॥"

প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও সঙ্গীত রচয়িতা ভক্ত কবি রসিকচন্দ্র রায় ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শ্যামা মাকে তিনি কেমন দার্ঢ্যের সহিত বীরের ন্যায় অটল বিশ্বাসে আহ্বান করিয়াছেন,—

মুলতান—একতালা।

"আয় মা সাধন-সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি পুণ্য মহারথে,
ভজন পূজন দুটি অশ্বযুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান,
ভক্তি ব্রহ্মবাণ বসে' আছি ধরে'॥
দেখব আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন ;
বারে বারে রণে তুমি দৈত্য জয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,
জিনব তোমায় সমরে॥"

এখানে আর একটি অজ্ঞাতনামা কবিরচিত গান না দিয়া পারিলাম না।

দক্ষমুখে স্বামিনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী তাঁহার দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রাণবিমুক্ত সোনার প্রতিমা ধূলাবলুণ্ঠিতা। সঙ্গী শিবানুচরগণ মায়ের এই শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আকুল কণ্ঠে মাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল :—

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল।

"ওঠ মা হর বনিতে, কেন পড়ে' অবনীতে।
নবনী তুল কোমল অঙ্গ লুণ্ঠিত ধূলায়॥
ওঠ মা কৈলাসের তারা, কৈলাসনাথের নয়নতারা,
পলকে প্রলয়হরা, অস্তগত তারারি প্রায়॥
মোরা কি নিয়ে কৈলাসে যাব,
কৈলাসনাথকে কি দেখাব,
কাকে মোরা মা বলিব ?
হায় জগতের মা চলে' যায়॥"

দেশে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গানের বড়ই আদর ছিল। শক্তি উপাসকগণ এখনও কমলাকান্তের ভক্তিরসাত্মক মধুর শ্যামা সঙ্গীতগুলি অতি আদরের সহিত গাইয়া থাকেন। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের মালসী গাইতে গাইতে মুগ্ধ হইয়া সমাধিগ্রস্ত হইতেন। কমলাকান্ত পশ্চিমবঙ্গের আর কৃষ্ণকান্ত বিক্রমপুরের লোক। পরমহংস দেব নিম্নলিখিত গানটি প্রায়ই গাইতেন :—

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

"মজলো আমার মন ভ্রমরা
শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হল
কামাদি কুসুম সকলে॥

মায়ের চরণ কালো ভ্রমর কালো,
কালোয় কালোয় মিশে গেল,
দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত,
রঙ্গ দেখে' ভঙ্গ দিলে॥

কমলাকান্তের মনে,
আশাপূর্ণ এতদিনে
সুখ দুখ সমান হ'ল—
আনন্দ সাগর উথলে॥"

ভাবুক কবি কৃষ্ণকান্ত নদিয়ার প্রেমিক পাগল গৌরহরির প্রতি লক্ষ করিয়া গাইতেছেন,—

বাউল সুর—আদ্ধা।

"জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে গউর হয়েছে।
উহার প্রেমানলে দগ্ধহৃদয় নয়নে নিশানা আছে॥
কারে জানি বাসত ভাল, সে মনের মতন ছিল,
সদা তাই মন ছিল ঐ রূপের কাছে।
তারে ধরবে বলে' ঝাঁপ দিয়ে,
তায় পেলে না, ন'দে এসেছে॥
নেইকো ওর দুঃখে অন্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত,
সদা তাই ভ্রান্ত নয়ন ঘুরতে আছে।
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই আর,
যাবৎ জীবন তাবৎ আছে॥"

ভগবৎ প্রেমে যার মন একবার উন্মাদ হইয়াছে মিলনের পূর্ব্বে তার শান্তি কোথায়?

গোবিন্দ অধিকারী প্রাচীন দলের বড় রসিক সঙ্গীত রচয়িতা। ১২০৫ সনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বৃন্দাদূতী কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকাকে কেমন বাক্‌চাতুর্য্যের সহিত প্রবোধ দান করিয়া সেই "নিঠুর নিদয় গোপীমন-চোর"কে আনিতে যাইতেছেন: তিনি বলিলেন,—

কীর্ত্তনের সুর—দাদরা।

"ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে ধৈর্য্যং
(তোরে এনে দিব বংশীবদন)
ধৈর্য্য কুরু ধৈর্য্যং রাধে ধৈর্য্যং কুরু,
মম গচ্ছং মথুরায়ে,আমি ঘুরিয়া ফিরিব পৃথিবীচক্র,
যথা দরশন পাব লাব॥
আগে যাইত যাইত যাইত,
মথুরাতে রাজা হয়ে, কুব্জাকে রাণী পেয়ে,
সে যশোদার নীলমণি, আমাদের নীলকান্তমণি,
সে যে ভালবাসে কাঙ্গালিনী,
ওগো রাধে তুই ফণী, তোর মাথার মণি,
সে যে চূড়ো ত্যজে পাগ বেঁধেছে,
পাখ্‌ ফেলিয়ে পাগ বেঁধেছে,
আমি তারে বাঁধব বসন দিয়ে গো তারে
বাঁধব বসন দিয়ে।—
যাব আমি সেই কারণে,
যেয়ে এক পাশে দাঁড়ায়ে রব,
যদি বলে কোন রাই তাকে চিনিনে,
কোথাকার বৃন্দাবন তা জানিনে,
ওগো কে কে তাও চিনিনে,
তখন দাস খৎ দেখায়ে বাঁধব ডুরি,
দিয়ে আনব ব্রজের পথে পথে,
যখন লোকে বলবে—
কে যায় ঐ মথুরাবাসী?
তখন গরব করে বলব রাইয়ের
পালান খাতক পেয়েছি॥"

বর্ণনাগুণে মনে হয় চিত্রটি যেন চোখের সামনে ভাস্‌ছে।

স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় ১২১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট গানগুলির অন্ততঃ একটিও না দিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে। কৃষ্ণবিরহিনী রাধা কৃষ্ণলাভের জন্য কিরূপ কঠোর সাধনা করিয়াছেন সখীসমীপে তাহাই বলিতেছেন,—

"যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলেম আগে, পাছের কাজে।
—যা যা করতে হবে গো—আমার বঁধুর লাগি—
প্রেম করে' রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে॥
—সখি, আমায় যেতে যে হবে গো—রাই বলে' বাজিলে বাঁশী—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলা চল তাহাতে করিতেম।
—সখি, আমায় চলতে যে হবে গো—বঁধুর লাগি পিছল পথে—
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতা গতি করিয়ে শিখিতেম॥

—সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো—কণ্টক কানন মাঝে—
এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে,
তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।
—কত যতন করে' গো—ভুজঙ্গ দমন লাগি—
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে কব কত,
হত বিধি সব কল্লে হত॥
—সে সব বৃথা যে হলো গো—আমার করম দোষে—
না দেখে সে বাঁকানন, কত সুখের বাঁকানন,
সে কানন কানন হয়েছে।
—প্রাণবল্লভ বিনে গো—কত শোভার বৃন্দাবন—
শুষ্ক প্রায় তরুলতা, নাহি কারও প্রফুল্লতা,
ফুল পাতা ঝরিয়া পড়েছে॥
—হায় সে শোভাইত নাই গো—যার শোভা তার সঙ্গে
গেছে—ইত্যাদি

কবি মধুসূদন কিন্নরের বহু সঙ্গীত আছে। ইনি সর্ব্ব সাধারণে "মধুকান" নামে পরিচিত ছিলেন। মধুকান ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রাম প্রসাদের মত তাঁহার উদ্ভাবিত একটি বিশেষ সুর আছে, সেই সুরেরই একটি গান দেওয়া গেল।

অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে নিয়া গিয়াছেন। সেই চিত্র মা যশোদার মনে পড়িয়াছে, অমনি মায়ের স্নেহ রাশি উথলিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

মধুকানের সুর—ঠুংরি।

"নিল মুনি নীল মণি যে দিন,আমার মনে হইল সে দিন,
ফিরে কি আর হবে এমন দিন?
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে,
জান্‌লে কিরে দিতেম ছেড়ে,
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন॥
ওমা বাই বাই বলে' কারে বা সুধায় গো,
নেরে খায়ে ক্ষীর ননী কে তারে বলে গো,
কারে বা বলে জননী, কেবা দেয় ক্ষীর ননী,
খায় কিয়ে সে ক্ষীর ননী, দুখিনীরে মনে হয় কি
এক দিন?"

অজ্ঞাতনামা কবির আর একটি গান উপভোগ করুণ। কৃষ্ণ নিরুদ্দেশ। "সুখের ব্রজধাম, শুধু মাত্র আছে নাম, অবিরাম হা হা শব্দ ভিন্ন নাই"। ব্রজ গোপীরা বিরহে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া "কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই" বলিয়া যাকে তাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিতেছেন,—

মিশ্র-ঝাঁপ।

"শ্যাম শুক্ নামে প্রিয় পাখী—
এ দেশে এসেছে উড়ে?
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতেম,
যে দেশে প্রাণ পাখী গেছে, সে দেশেতে
খুঁজে নিতেম,
পেয়েছ কি পাখীর দেখা,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
তাতে রাধার ঐ নাম লেখা,
ঐ নামে হয় সদাই সুখী॥"

আমার বিশ্বাস গানটির আরও অংশ আছে, কিন্তু আমার আর মনে নাই। কাহারও জানা থাকিলে দয়া করিয়া আমায় উহা দিলে বাধিত হইব।

বিক্রমপুরের শক্তি-সাধক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা রাজমোহন আম্বলী মহাশয়ের নিম্নলিখিত গানটিতে সংসার মায়ামুগ্ধ মনকে ফিরাইবার জন্য গতজীবনের অকার্য্যের উল্লেখ করিয়া কিরূপ কশাঘাত করা হইয়াছে।—

জংলা—কাওয়ালী।

"প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
কিমাশ্চর্য্য ধৈর্য্য, মন না ভাব উপায়।
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কুভ্রমণে,

জিহ্বা গেছে মিথ্যা কুভজনে ;
নয়ন গেছে কুদর্শনে, শ্রবণ গেছে কুশ্রবণে,
মনন গেছে কুভাব ভাবনায় ॥
দেখ যেমন দিন যায়, দিন যায় না, আয়ু যায়,
যায় রে যায় রাখা নাহি যায় ;
কেবা আসে কেবা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়।
হয় না পুনরায় যে রূপ যায় ॥
পেয়েছিস্ দুর্লভ জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম,
উত্তম হতে' হয়েছিস্ উত্তম ;
কাজে যদি হইস উত্তম, হবিরে উত্তমোত্তম,
নইলে যাবি অধমাধমতায় ॥
ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দ কার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি ;
কে শিখাল এমন রীতি, নাহি রে তোর অব্যাহতি,
রাজমোহনের ঘট্‌ল বিষম দায় ॥"

গানটীর "যায় রে যায় রাখা নাহি যায়" পদটি কি সুন্দর। মনে হয় বর্ষার ভরা নদীর স্রোতের মত আয়ুঃ যেন চোখের সমুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

বাণীর বড় পুত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের রচিত কএকটি গান আছে,তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গানটিই এখনও সাদরে গীত হয়। ইহা তদীয় সুপ্রসিদ্ধ "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের একটি পেলব কবিতা কুসুম। কাহা কর্ত্তৃক জানি না, সুরে বসাইবার জন্য ইহার মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পদ যোজনা করা হইয়াছে, এবং দীর্ঘ বলিয়া কএকটি শ্লোক ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যোজিত পদগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া দিলাম।

"ভর্ত্তৃ বিরহ বিধুরা" রাধিকা বলিতেছেন,—

খাম্বাজ—একতালা।

কেনে এত ফুল তুলিলি, সজনি,
(যতন করিয়া) ভরিয়া ডালা ?
মেঘা বৃত হ'লে (কহলো সজনি)
পরে কি রজনী তারার মালা ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার,
(কেনে লো গাঁথিলি কুসুমের হার)
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার ?
(অভাগিনী এ ব্রজের বালা)।
হায় লো (মালা) দোলাবি কার গলে,
(কে আর বসিবে তমালের ডালে ?)
প্রেমের পিঞ্জর ভেঙ্গে পিকবর
(উড়ে' গেছে আমায় শোকে আকুলা)।"

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাজরে শিঙ্গা" অতি প্রসিদ্ধ। মধুসূদনের স্বর্গারোহণের পরে হেমচন্দ্র নিম্নলিখিত গানটি রচনা করেন,—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

"কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
বধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা কমলে মোহিতে মনে ॥
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীর রসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘ নাদে গভীর গর্জ্জনে ॥
বীর মদে অম্বু নাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সতী কেলি বিপিনে ॥"

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রেমের বিচিত্র গতি সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষায় গাইয়াছেন,—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

"কেন দুখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল ;
বিদ্যুত প্রতিম প্রেম, দূর হ'তে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যু ফল।

জীবন কাননে হায়, প্রেম মৃগ তৃষ্ণিকায়
যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল;
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে কালি হবে অশ্রু জল।"

দেশে অসংখ্য বাউল সঙ্গীত আছে। উহার মধ্যে বহু গান অতি উত্তম। আমরা বিখ্যাত কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের (সাধক হরিনাথ মজুমদার মহাশয়) একটি জাতীয় সঙ্গীত, দুইটি বাউল সঙ্গীত, এবং অজ্ঞাত কবিরচিত আর একটি বাউল সঙ্গীত দিলাম। জাতীয় সঙ্গীতটি এই,—

"এই কি সেই আর্য্য-স্থান আর্য্য-সন্তান।
ও যার তপোবলে যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ॥
ও যার হেরে বীর্য্যবল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল;
দিক দিগন্তরে, শূন্য ভরে, উড়িত বিজয় নিশান॥
ও যার শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষু দান;
ও যার, বিদ্যাবলে,আকাশতলে, চলে যেত পুষ্পযান॥
ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টলমল,
রক্তময় হোত যত নদনদীর জল;
বোসে বৃক্ষোপরে, শূন্যভরে, পাখী করত রক্তপান॥
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্য-কুমার,
শৃগালের রব শুনলে বাঁধে ঘরের দুয়ার;
দেখলে রক্তজবা,শুকায় জিহ্বা,চমকে ওঠে সবার প্রাণ॥
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহ বল কল কৌশল,
ধর্ম্মবল বিনেরে ভাই সকলই বিফল;
সেইধর্ম্ম বিনে,দিনেদিনে,(ভারত) সকল হারায়ে শ্মশান॥"

ফিকিরচাঁদ ফকির রচিত একটি বিশেষ সুর আছে, নিম্নলিখিত গানটি সেই সুরেই গ্রথিত।

ফিকিরচাঁদি সুর—একতালা।

"অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে' কাঁদে
প্রাণ আমার দিবা নিশি।
কাঁদলে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে
দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ
শত শত সূর্য্য শশী॥
যদিরে চাই আকাশে, মেঘের পাশে
সেরূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়,
ঝলক লাগে হৃদে আসি॥
হৃদয় প্রাণভরে' দেখি, বেঁধে রাখি
চিরদিন সেই রূপ শশী;
ওরে তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে,
কুবাসনা মেঘ রাশি।
কাঙ্গাল কয় দয়া করে' যে জন মোরে
দেখা দেয় রে ভালবাসি;
আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে তায়
প্রাণভরে কৈ ভালবাসি॥"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননী আমাদের মা অন্তরালে থাকিয়াই আমাদের সকল অভাব পূরণ করিতেছেন। হায়, আমরা ত তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের তরেও দেখতে পাই না! মাতৃভক্ত সন্তানের এ কি আর সহ্য হয়? এই বিশ্ব দর্পণে মায়ের প্রতিবিম্বিত রূপ দেখিয়া মা-মুখো ছেলের আর কতক্ষণ চলে? তাই সে মায়ের কাছে আব্দার করিয়া বলিতেছে,—

বাউল সুর—একতালা।

"আর কত দিন রবে মাগো,
আর্শির মাঝে বসে আর?
না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে,
ওমা আমার দেখা দাও একবার।

ওমা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে,
আমার প্রয়োজন যাতে (মরি হায় রে),
লুকায়ে দাও দেখি না চক্ষেতে,
ওমা এই বড় দুঃখ আমার।
যেমন অন্ধবালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায় (মরি হায় রে),
আমি সেইরূপ দেখি নে তোমায়,
সদায় দেখ্‌তে প্রাণ কাঁদে আমার।
ওমা অবোধ বালক কভু যদি আর্শি হাতে পায়
তাতে আপনায় ধরতে চায় (মরি হায় রে)
ধরতে আপনায় না পায়, কেঁদে গড়ায়,
মা সেই দশা হয়েছে আমার।"

অজ্ঞাতনামা জনৈক বাউল গাইতেছেন,—

বাউল সুর—লোভা।

"আমি কে তাই আমি জানলেম না।
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হ'ল না॥
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি, চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি।
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কৈ গণি।
ভবের মায়া ভোজের বাজি, তাতে মন তুই হলি রাজি,
আমার মন হইল না কাজের কাজী,
মন আমার রাজি হইল না॥
খাইতে চাও দশমূলি পাঁচন, একবার আইসন'
একবার যাওন,
এখনে না খাইলে সুখের পঞ্চমূল পাঁচন।
মায়া পাশ মুক্ত করি, বদন ভরে বল হরি,
সাধু সঙ্গ করি করি, করি ব'লে আর করলেম না॥"

বিক্রমপুর বজ্রযোগিনীর কবি আনন্দ চন্দ্র মিত্র মহাশয় বহু উৎকৃষ্ট গান লিখিয়াছেন। তাহার কর্তক ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময় গাওয়া হয়। নিম্নে তাঁহার একটি বাউল সুরের গান দেওয়া গেল।

কবি তাঁর সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন এই নিখিল বিস্তৃত প্রকৃতির রূপ সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে সেই অরূপ রূপের সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া ধরিতে পারিলেন না। হায়, উহা চপলা বিজলিরই মত পলকে ঝলক দিয়া চকিতে চলিয়া গেল। কবি গাইলেন,—

বাউল সুর—দাদরা।

"দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি,ধরতে গেলাম আর পেলেম না।
বহুদিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি,
আমার হয়ে আর হ'ল না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন আর নিবে না॥
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ,
বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না॥
পথিক কয় ভেব নারে, ডুবে যাও রূপ সাগরে,
বিরলে ব'সে কর যোগ সাধনা।
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ,
ছেড়ে যেতে আর দিও না॥"*

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

জেল কয়েদী।

(১)

থেকে থেকে পড়্‌ছে মনে সেই যে শ্যামল মাঠ,
সেই যে বনের বাঁক্‌রে আমার সেই যে নদীর ঘাট,
খলুথলে মোর বলদ দু'টী নূতন-গড়া হাল,
ঝুরুরে মোর হাঁসের ছানা মুরুগী ভেরার পাল।
খাই বা না খাই তাইতে কি গো সেই তো আমার সুখ;
গাঁয়ের কোমল বুক্ রে আমার গাঁয়ের শ্যামল বুক!

(২)

থাক্‌তে পেলে এমন স্থানে খেতাম না হয় মাগি'
হায় রে কেন ভাঙ্গনু মাথা দু'হাত জমির লাগি'
রক্ত ছিল গরম তখন—করনু অবহেলে,
তাইতে আজি পাঁচটী বছর পচ্‌তেছি হায় জেলে;
খাই বা না খাই তাইতে কিগো সেই যে ছিল সুখ;
গাঁয়ের কোমল বুক্‌রে আমার গাঁয়ের শ্যামল বুক!

(৩)

কোথায় র'লে মেহের বিবি কোথায় ছেলে পেলে,
ভাব্‌তে গেলে তাদের কথা চোখ্‌ ভরে যায় জলে!
আল্লা আমায় দোয়া করো দেওগো এবার ছুটি,
সোনার ধনে দেখ্‌বো চোখে পড়্‌বো ক্ষেতে লুটি';
খাই বা না খাই তাইতে কিগো সেই সে আমার সুখ;
গাঁয়ের কোমল বুক্‌রে আমার গাঁয়ের শ্যামল বুক!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ কি অবৈজ্ঞানিক?

আজকাল দেশের যে অবস্থা, তাহাতে দেখা যায়, দেশবাসী প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্বাবলম্বন প্রয়াসী হইয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে দীর্ঘকাল হইতে আমরা এতই পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন আর অন্যের বিনা সাহায্যে আমাদের আর পাদ মাত্র চলিবার উপায় নাই। আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সাধারণতঃ অন্ন ও বস্ত্র এবং ব্যাধি হইলে তৎপ্রতীকারের জন্য ঔষধ, এই তিনটি পদার্থ বিশেষ আবশ্যক। এখন আমরা স্বাবলম্বী হইতে চাই, কিন্তু আজ যদি বিদেশী বণিক্ একবাক্যে আমাদের ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে লজ্জা নিবারণের উপায় না করেন, তবে হয়ত অনেকের অসভ্যবৎ উলঙ্গ হইতে হইবে। যদি লিভারপুলের লবণ একবারে এ দেশে না আসে তবেসম্ভব অনেককেই লবণহীন আহার করিতে হইবে। সেইরূপ যদি পাশ্চাত্য ফার্ম্মেসী হইতে এদেশে একফোটা ঔষধ না আসে, তবে আমাদের দেশে বহু এম্ বি, এম, ডি, থাকিলেও অস্ত্রহীন সেনানীর ন্যায় তাঁহারা কেবল দেশের শোভা বৰ্দ্ধন ব্যতীত আর কোন কাজই করিতে পারিবেন না।

সম্ভব আজকাল এমন অজ্ঞের সংখ্যা খুব কমই আছে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে আমরা উলঙ্গ ছিলাম বা অলাবণ খাদ্য গ্রহণ করিতাম; কিন্তু বোধহয় এমন অজ্ঞের সংখ্যা বিরল নহে, যাঁহাদের দৃঢ় ধারণা পাশ্চাত্য চিকিৎসা যখন এদেশে ছিল না, তখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা বিদ্যা এদেশে একেবারেই ছিল না। নতুবা আজ দেখিতে পাইতাম যে দেশের লোক যেমন প্রাণ দিয়া, নানা নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও দেশের অন্নবস্ত্র দেশ হইতে সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন, সেইরূপ চিকিৎসার জন্যও উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন। তাঁহাদের এটুকু জ্ঞান নাই, (যদিও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না) যে, দেশে যতই কেন বড় বড় ডাক্তার

থাকুক না কেন, 'বারোজ ওয়েল কম্' ষ্ট্রীকনাইন, বেলেডোনা না দিলে তাঁহাদের দ্বারা কুচিলা ধুতুরা দ্বারা চিকিৎসা চলিবে না। যদিও দেশে সামান্ত প্রকারে কুচিলা, ধুতুরার আরক বাহির করার কার্য্যেশী দু'একটি ক্ষুদ্র ভাবে দেখা যাইতেছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইলেও বহু বৈদেশিক উপাদানের জন্ত পরের নিকট তাহাদের হাত না পাতিয়া উপায় নাই। সুতরাং দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে যে, আমরা যতই কেন শিক্ষায় সমুজ্জ্বল হই না কেন, আমাদের ঘরের কোণের অন্ধকার এখনও ঘোচে নাই। এখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের অত্যুন্নত সভ্যতার নিদর্শন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আয়ুর্ব্বেদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিয়া যদি সেই বিদ্যার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারি, তবে হয়ত আর চিকিৎসার জন্ত পরের দুয়ারে হাত পাতিতে হইবে না। বরং দেশকাল সাত্ম্যবিরুদ্ধ পাশ্চাত্য বিষে জর্জরিত শরীরকে আবার দেশ কাল আত্মসাত্ম্য আহার, আচার, ও ঔষধের দ্বারা বলবান করিয়া লইতে পারিব।

পাশ্চাত্য ঔষধবণিকগণের দালাল পাশ্চাত্য দেশবাসী চিকিৎসকগণ স্বার্থের খাতিরে চিরকালই আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিতেছেন ও করিবেন এবং তদধীন রাজপুরুষগণও তজ্জন্তই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ—তাহার জন্ত আমাদের এই অলীক নিন্দায় কোন ক্ষোভের কারণ নাই। কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের অনুকরণপ্রিয় অস্মদ্দেশীয় ডাক্তার সাহেবগণও যে ইহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করিতেছেন না, ইহাই আমাদের অধঃপাতের চরমসীমায় পঁহুছার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এবং তাহাদের মুখে ঝাল খাইয়া যে দেশের বর্ত্তমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও 'হা হু' করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাহা কিছু নিবারণের জন্তই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইতেছে। আশা করি স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিগণ মনোযোগের সহ এই নীরস গদ্য পাঠের চেষ্টা করিবেন। এবং আমার অজ্ঞতা প্রযুক্ত যদি কোন বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইতে সমর্থ না হই, তবে আশা করি, তাঁহারা অন্যত্র তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের স্বরূপতত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদের এই বিশেষত্বটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আয়ুর্ব্বেদ কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র নহে। ইহার প্রয়োজন সম্বন্ধে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

প্রয়োজনঞ্চাস্য (১) স্বস্থস্য স্বাস্থ্যরক্ষণম্
(২) আতুরস্যচ বিকার প্রশমনম্
চরক—সূং-৩০ অং

প্রথম প্রয়োজনই হচ্ছে কি প্রকারে জনসমাজ সুস্থ থাকিতে পারে তাহার চিন্তা করা হইয়াছে, পরে যদি কোন কারণ বশতঃ ব্যাধির উপস্থিত হয়, তবে তাহার প্রশমন ও তাহার উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, আমরা এ তত্ব অবগত নহি, সেইজন্য মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিও দিল্লী আয়ুর্ব্বেদ কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "আমি এরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচারের পক্ষপাতী নাহ, আমি চাই, জগৎকে নিরোগী করিতে। জগৎ হইতে ব্যাধির নাম মুছিয়া ফেলিতে। জগতের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে।" যদি তাদৃশ মহাত্মা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করিতেন, তবে সম্ভব আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন একথা বলিতেন না।

আরও আয়ুর্ব্বেদ স্বাস্থ্য রক্ষার্থই হউক, আর চিকিৎসার জন্য হউক, যে যে বিধান করিয়াছেন তাহা সর্ব্ব প্রাণীর এক রকম করেন নাই। তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি নিয়ম পালনে বা প্রতি ব্যাধির চিকিৎসার দোষ, ভেষজ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ব, প্রকৃতি, বয়স, প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা

করিতে বলিয়াছেন। তাহারা পাশ্চাত্যদের পথ্য, প্রাচ্যদের জন্য বিধান করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"ঔচিত্যাৎ যস্য যৎসাত্ম্যং দেশস্য পুরুস্য চ।
অপথ্যমপি নৈকান্তাৎ সপ্তাজ্য লভতে সুখং॥"

ইত্যাদি চরক চিকি—৩০ অংশ ১২২ পৃষ্ঠা

আয়ুর্ব্বেদের অযথা নিন্দাকারীদের প্রথম তর্কস্থল "আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক।"————আজকাল সায়ান্স (Science) বলিতে কি বুঝায় জানি না, তবে যাহা প্রণালীবদ্ধ ভাবে সংগ্রথিত হয় না, তাহাকে অবৈজ্ঞানিক বলিতে শুনিয়া থাকি। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকও কিন্তু প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। প্রাচ্য বৈদ্য শাস্ত্র বলেন "প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণের সাহায্যে কোন বিষয়ই নির্নীত হইতে পারে না" সুতরাং তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্তবাক্য ও যুক্তি এই চার প্রকার প্রমাণের সাহায্যে চিকিৎসা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ব্যাধি নির্ণয়ের বা ব্যাধি নিগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ দ্বারা কোন ফল হইতে পারে না বলিয়া থাকেন। এবং তাহাদের প্রণালী এতই বিশুদ্ধ ও দৃঢ় প্রমাণের উপর সংস্থাপিত যে আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টির পর ২৫ হাজার বৎসর গত হইলেও তাহার কোন অংশ অপ্রমাণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হয় নাই। সেই প্রাচীনকালে মহামুনি অগ্নিবেশ যে স্বাস্থ্য হানির কারণ, আরোগ্য লাভের কারণ, এবং স্বস্থে স্বাস্থ্যানুবৃত্তির জন্য একটী মাত্র সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধি কারণং।
হ্রাস হেতু বিশেষশ্চ প্রবৃত্তি রুভয়স্যতু॥"

চরক সূঃ ১ অঃ।

আজও সেই সূত্রকে মূল করিয়াই আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বত্র সফলকাম হইতে পারিতেছে। তাঁহারা জানেন সমান গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা শরীরে তদ্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সমানাতিরিক্ত হওয়ায় তাহা দ্বারা যখন শরীরে বিকারের সৃষ্টি হইয়াছে তখন তদ্বিরুদ্ধগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা তাহার উপশম করিতে পারা যায় এবং এই উভয় প্রকার গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহারই স্বাস্থ্যের অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। এবং এই প্রণালীর সম্যক্ সহায়ক স্বরূপ তাঁহারা শরীরের ধারক রূপে ৩টী মাত্র ধাতুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা বায়ু, পিত্ত, ও কফ। তাঁহারা বলিয়াছেন—

"বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্ দেহং কফপিত্তানিলা তথা॥"

সুশ্রুত সূত্র ২১ অং।

আরও বলিয়াছেন—

"নর্ত্তেদেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্নচ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তুধার্য্যতে॥"

এখন এই বায়ু পিত্ত ও কফ কাহাকে বলে তাহার একটু আলোচনা করিব।————অনেকের ধারণা অনেক সময় প্রতিশ্যায় কাস আদি যাহা আমাদের নাক মুখ দিয়া বাহির্গত হয় তাহাই শ্লেষ্মা এবং অন্তর যকৃৎসংলগ্ন পিত্তকোষ সঞ্চিত যে হরিদ্বর্ণ দ্রব পদার্থ দেখা যায় তাহাই পিত্ত, ও যাহা সর্ব্বদা নাক মুখ দিয়া গ্রহণ করি ও পরিত্যাগ করি তাহাই বায়ু। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সব পদার্থ ধাতুসংজ্ঞক কফ পিত্ত বায়ুর বিকৃতি হইলেও ঐ সব পদার্থকে শরীরের ধারক বা উপাদান ধাতু বলা হয় না। শ্লেষ্ম ধাতু সৌম্য অর্থাৎ ক্ষিতি ও অপ্‌গুণ বহুল, যাহা শরীরের উপাদান এবং যাহা দ্বারা শরীরের পোষন হইয়া থাকে, আর পিত্ত ধাতু-শরীরের তৈজস অংশ, যাহা দ্বারা শরীরের পরিপাক ক্রিয়া ধাত্বন্তর পরিণতি আদি সাধিত হয়। আর বায়ু শরীরের ক্রিয়া শক্তি। শরীর সংক্রান্ত যাহা কিছু উচ্চাবচ ক্রিয়া অবগত হওয়া যায়, সমস্তই বায়ু ধাতুতেই করিয়া থাকে ইহাই আয়ুর্ব্বেদের অভিমত তাহাই উপযুক্ত সুশ্রুত বচন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। এবং এই বায়ু পিত্ত ও কফ

ক্রিয়াদ্বারা অনুমেয়, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত। সুতরাং প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ তত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক বলিবে, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য নাই। প্রাচ্য ঋষিগণ বলেন, মানবের জীবন মরণ একটা প্রত্যক্ষাতীত বিষয় তাহার সহায়ক চিকিৎসা কিরূপে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমরা সুন্দররূপে বুঝিতে পারি না।

পাশ্চাত্য মতে শরীরের যাহা কিছু ক্রিয়া শক্তি তাহা ধমনী বিশেষের (nerve) কার্য্য। তাঁহারা ধমনীগুলি স্বীকার করেন, কিন্তু তদুপরিস্থ শক্তি বিশেষকে স্বীকার করেন না, যে হেতু তাহারা প্রত্যক্ষ গম্য নহে। যদি তাহাই হয় তবে তাদৃশ ধমনী সত্ত্বেও অনেক স্থলে কেন যে ক্রিয়ার অভাব দেখা যায়, তাহার সমাধান আমরা বুঝিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদ ধমনীকে (nerve) মাত্র ক্রিয়াবাহক বলিয়া থাকেন। যেমন বর্ত্তমান টেলিগ্রাফের তার দ্বারা সংবাদ বহন কার্য্য হয় না, যেমন তন্মধ্যস্থ বৈদ্যুতিক শক্তি তারের পথে সংবাদ বহন করিয়া থাকে। সেই প্রকার ধমনীরূপ তারের পথে বায়ুদ্বারাই সর্ব্বশরীরে ক্রিয়া শক্তি পরিমাণিত হইয়া থাকে। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তির কোন কারণে নাশ হইলে, টেলিগ্রাফের তার সত্ত্বেও সংবাদ বহন কার্য্য হয় না; সেইরূপ বায়ু বিগুণ হইলে ধমনীর (nerve) অবিকৃত অবস্থায়ও পক্ষাঘাতাদি হইয়া থাকে। এবং তাহার চিকিৎসা ও বায়ুর সাম্যাবস্থায় আনয়ন এবং সেই চিকিৎসা দ্বারাই আবহমান কাল হইতে প্রাচ্য চিকিৎসকগণ পক্ষাঘাতাদি ব্যাধিতে পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা বিশেষ ফল দেখাইতে সমর্থ হইতেছেন। সুতরাং বায়ু স্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক কি ধমনীমাত্র (nerve) স্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। এই সব বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া প্রাচ্যগণ লিখিয়াছেন যে :—

"বায়ু স্তন্ত্রযন্ত্র ধরঃ × × × × প্রবর্ত্তক শ্চেষ্টা না মুচ্চা বচানাং নিয়ন্তা প্রণেতা মনসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়া না মুদ্যোতকঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থানা মভিবোঢ়া" ইত্যাদি চরক, সূত্র, ১২ অং।

পাশ্চাত্যগণ তাহাদের নার্ভাস সিষ্টেমের কেন্দ্রস্থান একমাত্র মস্তিষ্কেই অবধারণ করিয়া থাকেন, কি প্রত্যক্ষ প্রমাণবলে বা কি যুক্তিতে তাঁহারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু প্রাচ্য শারীরতত্ত্ববিদগণ এই ক্রিয়াশক্তিরূপী বায়ুর পাঁচটি কেন্দ্রস্থল নির্ণয় করিয়াছেন এবং সেই সেই কেন্দ্রস্থান হইতে, পৃথক্‌ভাবে বিভিন্ন স্থানের শারীরিক ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। সেই অনুসারে বায়ুকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান। ইহার মধ্যে প্রাণের স্থান মস্তকাদি, উদানের স্থান কণ্ঠ আদি, সমানের স্থান আমাশয়, ব্যানের স্থান সর্ব্বশরীর গত ত্বক্, এবং অপানের স্থান পক্কাশয়াদি। এই সব কেন্দ্রস্থান হইতে বায়ু সর্ব্বশরীরের উচ্চাবচ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য মতে অন্নের পরিপাক ক্রিয়া কয়েক প্রকার রসের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সেই রস কোন শক্তি বলে পরিপাক ক্রিয়ায় সমর্থ হয়, আহার বিবেচনা তাঁহারা করেন নাই। এবং শরীরে উত্তাপ আছে, চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি আছে, এই পর্য্যন্ত জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। যে শক্তি বলে অন্নাদির পরিপাক শরীরে উত্তাপ ও চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি সংসাধিত হয়; আয়ুর্ব্বেদ সেই শক্তি বিশেষকেই পিত্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা কীটাণু বিশেষের দোহাই দিয়া জ্বরের কারণ নির্দ্দেশ করেন না। কীটাণু গৌণ কারণ হউক, আপত্য নাই, কিন্তু যে পর্য্যন্ত পাচক পিত্ত রক্তের সহ মিশ্রিত হইয়া বহির্গত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কাহারও জ্বর হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই ম্যালেরিয়াবাহী মশককুল সমান ভাবে বহু ব্যক্তিকে

দংশন করিলেও তাদৃশ পিত্ত বিকৃতি না থাকা জন্যই সকলেরই জ্বর হয় না। এবং এই জন্যই অতি তিক্ত কুইনাইন (মধুর তিক্ত কষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ) ম্যালেরিয়া জ্বরের পাশ্চাত্য মতে একমাত্র ঔষধ নির্ণীত হইয়াছে। পিত্ত সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন ঃ—

"তচ্চাদৃষ্ট হেতুকেন বিশেষেণ পক্কামাশয় মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্ব্বিধমন্নপানং পচতি বিবেচয়তি চ রস দোষ মূত্র পুরীষাণি; তত্রস্থমেব চাত্ম শক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থানানাং শরীরস্য চাগ্নিকর্ম্মণানুগ্রহং করোতি।" সু: ২১ অধ্যায়— পিত্তের স্বরূপ ও কর্ম্ম বিশেষ ভাবে অবগত থাকায় আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণ পাকাশয়ে পিত্ত বা পাচকাগ্নির অভাব স্থির করতঃ জ্বরের আদিতে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অজীর্ণ হইলে, সর্ব্বশরীর গত পিত্তের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া, স্নান, অভ্যঙ্গ প্রভৃতি নিষেধ করিয়া থাকেন।

এই পিত্ত শরীরের পাঁচ স্থানে থাকিয়া পাঁচ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্য স্থানই পিত্তের প্রধান স্থান। তত্রত্য পিত্তকে পাচক সংজ্ঞা দেওয়া হয়, এবং সে সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক করিয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্য হইতে রস, দোষ, মল, মূত্র সেই পৃথক করিয়া থাকে এবং এই স্থানস্থ পিত্ত অন্যান্য স্থানের পিত্তের সহায়তা করিয়া থাকে। এবং সেই জন্যই পাচক পিত্তের দুর্ব্বলতা হইলে অন্যান্য স্থানের পিত্তও হীনবল হইয়া থাকে। পিত্তের দ্বিতীয় স্থান—যকৃৎ ও প্লীহা তাহার নাম রঞ্জক পিত্ত, সে রসে রং মিশাইয়া রক্তে পরিণত করিয়া থাকে। তৃতীয় স্থান হৃদয়, তত্রত্য সাধক নামক পিত্ত সত্ত্ব গুণের আধিক্য হেতু হৃদয়স্থ মনের পোষণ করিয়া থাকে। চতুর্থ স্থান চক্ষু. তাহার নাম আলোচক পিত্ত। তাহার সাহায্যেই চক্ষু রূপ গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। পঞ্চম স্থান-ত্বক্, তত্রত্য ভ্রাজক নামক পিত্ত মানবের অভ্যঙ্গ, অবগাহ দ্বারা লোমকূপ পথে শরীরে প্রবিষ্ট তৈল, জলাদি পরিপাক করিয়া থাকে ও শরীরের বর্ণ, কান্তি আদি প্রকাশ করিয়া থাকে।

এইরূপ শ্লেষ্মাও মানবের সর্ব্বশরীরগত হইলেও সাধারণতঃ পাঁচটি স্থানে তাহার কেন্দ্র আয়ুর্ব্বেদে নিরূপিত হইয়াছে। তাহার প্রথম এবং প্রধান স্থান আমাশয়। এই স্থানে থাকিয়া শ্লেষ্মা অন্যান্য শ্লেষ্মা স্থানের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এবং ভুক্ত অন্নকে নিজের জলীয় সত্ত্বা দ্বারা ক্লিন্ন করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় স্থান ফুসফুস, এই স্থানে থাকিয়া হৃদয়ের পরিপুষ্টি সাধন করে। তৃতীয় স্থান জিহ্বা মূল, এই স্থানে থাকিয়া জলপ্রধান জিহ্বেন্দ্রিয়ের সহায়তা করিয়া তাহাকে রস গ্রহণের যোগ্য করিয়া থাকে। চতুর্থ স্থান মস্তক। তত্রত্য মস্তিষ্করূপী শ্লেষ্মা সমূহ তত্রত্য ধমনী সমূহ (nerves) পুষ্ট করিয়া বায়ুর গতি অব্যাহত রাখিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণের কার্য্য যথাবৎ সংসাধিত করিয়া থাকে। পঞ্চম স্থান সন্ধি। শরীরে যত প্রকার সন্ধি আছে তাহাতে শ্লেষ্মায় সত্তা থাকায় তৈল মর্দ্দিত ধুরার ন্যায় পরস্পর সংঘৃষ্ট হইলেও ক্ষয়িত হইয়া যায় না এবং সন্ধিগুলি সুন্দররূপে খেলিতে পারে।

এই ত্রিবিধ পদার্থই শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদিগকে ধাতু বলা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারাই শরীরের স্থূল উপাদান রস রক্তাদি দূষিত হয় বিধায় তাহাদিগকে দোষও বলা হয়। এই ত্রিবিধ দোষের সাম্যাবস্থাই শরীরের সুস্থাবস্থা এবং তাহাদের স্বাস্থ্য বিরোধী ক্ষয় বা বৃদ্ধিই ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে। ইহাই আয়ুর্ব্বেদ মতে ব্যাধির অদ্বিতীয় কারণ। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধিকাংশ ব্যাধিরই কীটাণু (Bacteria) কারণ বলিয়া থাকেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহাদের পার্থক্য ও গতি আদি দেখাইয়াও থাকেন। কিন্তু প্রাচ্যগণ তাহাদের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া মনে করেন না। যেহেতু তত্তৎ ব্যাধিতে কোন

কোন স্থলে কীটাণুর উপলব্ধি হয় না এবং কোন স্থলে প্রচুর কীটাণুর সত্তা দেখা গেলেও ব্যাধির দর্শন হয় না। আমেরিকার ষ্টেট স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে তৎদেশীয় অধিকাংশ মানবের রক্ত পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে সে দেশের শতকরা ৭০।৮০ জনের রক্তে রাজ যক্ষার কীটাণু আছে; কিন্তু ঐরূপ ব্যাধি সেই দেশে শতকরা পাঁচজনেরও নাই। এ অবস্থায় যদি কীটাণুকে প্রবল হেতু মনে করা যায় তাহা বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানি না। বিচার ভার সুধীবর্গের উপর অর্পণ করা গেল।

তবে কেহ কেহ বলিবেন যে আয়ুর্ব্বেদ এই প্রকার কীটাণুর সত্তা অবগত ছিলেন না। তাহা আমার বোধ হয় না। তাঁহারা কতগুলি ব্যাধি এক শয্যা শয়ন এক পাত্রে ভোজন প্রভৃতি কারণে অন্য শরীরে সংক্রান্ত হইয়া থাকে স্বীকার করেন তাহার মধ্যে জ্বর অন্যতম। এ অবস্থায় কোন বীজ না থাকিলে যে সংক্রান্ত হইতে পারে না ইহা তাহাদের বেশ জ্ঞান ছিল (১)। তবে এই প্রকার জীবাণু তাহার বীজ হইলেও শরীর ব্যাধির উপযুক্ত না হইলে ঊষর ভূমিতে পতিত বীজের ন্যায় তাহা নিরর্থক হইয়া থাকে। এই জন্যই তাঁহারা শারীরিক অনিয়মকেই ব্যাধির হেতু বলিয়াছেন। আরও আয়ুর্ব্বেদ বলেন ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ করা অনুৎপন্ন ব্যাধির হাত হইতে নিজে সাবধান হইবার জন্য বা উৎপন্ন ব্যাধি ব্যক্তি পুনঃ কারণের উপসেবা দ্বারা যাহাতে ব্যাধি বৃদ্ধি না করে তাহার জন্যই আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ ভাবে অদৃশ্য জীবাণু কত পথ দিয়া মানবের শরীরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার নিশ্চয় করা বা তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করা মানবের পক্ষে অসাধ্য। আজকাল ভূরি ভূরি অর্থব্যয় করিয়া মশা মারিবার জন্য কামান পাতিয়াও ম্যালেরিয়ার জীবাণু হইতে মানব আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। এবং কুইনাইন প্রভৃতি পোকা মারার ঔষধ শিশিতে শিশিতে খাইয়া বাহিরের পোকা মারিলেও পোকার নির্ব্বংশ করিতে কেহ সক্ষম হইল না। সেই জন্যই কুইনাইন দিয়া জ্বর বন্ধ করিলেও দুই দিন পর আবার জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং শরীরে পোকা প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় বা প্রবিষ্ট পোকার নির্ম্মূল করার চেষ্টা একরূপ অসম্ভব ও বাতুলের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক। আয়ুর্ব্বেদ এই প্রকার বীজের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব জানিয়াই শরীরকে রোগের অননুকূল অর্থাৎ জমি ঊষর করিবার যে বিধান দিয়াছেন তাহা মানবের সাধ্যায়ত্ত। যে স্থলে দেখা যাইতেছে, ঔষধ দিয়া পোকা মারিলেও শরীর ব্যাধির উপযুক্ত থাকায় আবার বীজ কোন না কোন পথ দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাধি জন্মায়, সে স্থলে শরীরকে ব্যাধির অনুপযোগী করিবার চেষ্টাই অবৈজ্ঞানিকতা—অথবা যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া শরীরকে সমস্ত ব্যাধির উপযোগী করিয়া অদৃশ্য বীজের পাছে পাছে ঘুরিয়া হত্যা করিবার চেষ্টাই অবৈজ্ঞানিকতা—তাহার বিচার ভার সুধী পাঠক বর্গের হস্তে অর্পণ করিয়া আপাততঃ আমরা অবসর গ্রহণ করিলাম। ইত্যলম্

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

---

(১) শ্রৌত নিদান ও অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা রহিম মুন্সী।

আজ একটী অতি দীর্ঘজীবির সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত প্রদান করিতেছি। মহাত্মা রহিম মুন্সীর বাড়ী কাষ্ঠখালী গ্রামে, ময়মনসিংহ জেলার নাইন্দল থানার এলাকায় বেতাগরি গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সাধক, গুণী ছিলেন। ইঁহারা মীর বংশের লোক। বাল্যকালে ইনি উর্দ্দু ও আরবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন, বেতাগরি গ্রামের ৺ ভৃগুরাম বিদ্যালঙ্কারের নিকট। ভৃগুরাম তৎকালে

অতি বড় পাণ্ডিত ছিলেন, শতাধিক ছাত্র তাঁহার ওখানে আহারাদি পাইয়া শিক্ষা লাভ করিত। ভৃগুরাম দরিদ্র ছিলেন, বেতাগরির প্রসিদ্ধ মজুমদারের বন্ধুরা ইঁহাকে ছাত্রদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বহু জমি ব্রহ্মোত্তর ও জমায় দিয়াছিলেন। তাঁহার কাছেই তিনি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখেন। এখনও মহাত্মা মুন্সী বাঙ্গলায় যে সাধারণ ভাষায় আলাপ করেন তাহা অতি বিশুদ্ধ। তিনি অনেক স্থানে মোক্তবের মৌলবীর কার্য্য করিয়াছেন। আজীবন তিনি বিশুদ্ধ চরিত্রে অহিংসা ব্রত রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গুণাবলী দর্শন করিয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি জিলার অনেক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। উহারা প্রায় সকলেই মুসলমান। মুসলমানেরা তাঁহার আদেশ দৈববাণীর মত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমরা শিশুকাল হইতেই তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া নানা স্থানে যাইতে দেখিয়াছি, একবৎসর পূর্ব্বেও তাঁহাকে পাল্‌কীতে চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি কিন্তু এখন তাঁহার সে শক্তিও লোপ হইয়াছে। এখন শয্যা হইতে একজনে ধরিয়া তুলিয়া দিলে আপনিই কিছু দূর পর্য্যন্ত হাটিতে পারেন। তাঁহার বয়স এখন ১১৮ বৎসর, এখনও তিনি নিরোগী। তাঁহার চেহারা দেখিলে খুব বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। আমি সে দিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন তাঁহার দেহে কোন রোগ নাই, এখনও যথেষ্ট বল শরীরে পান কিন্তু তাঁহার শরীরের যন্ত্রগুলি অকর্ম্মণ্য ও অবশ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অচল হইয়াছেন, তিনি বলেন তিনি আরো অনেক দিন বাঁচিবেন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার আহার্য্য জোগাইয়া থাকে, পূর্ব্বের মতই আহার করিতে পারেন। একজন লোক শরীরে প্রত্যহ তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকে, মাথায় তিল তৈল ব্যবহার করেন। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, একজন বলিষ্ঠ যুবক তাহার গায় অতি জোরে তৈল মর্দ্দন করিয়া দেয়। একজন যুবা পুরুষকে এইরূপ সজোরে তৈল মর্দ্দন করিলে সে কাবু হইয়া পড়িবে। তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় যে আলাপ করিয়াছিলাম এমন ভাবের আলাপ কোন উচ্চ শিক্ষিতের সহিত করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

অল্পক্ষণ আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইয়া থাকিলেও ইহারই মধ্যে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। নাটোরের ৺ রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এ অঞ্চল ছিল, সে সময় লোক খুব সুখে ছিল, তারপর এ অঞ্চল ইংরেজ রাজার খাসে আইসে। ইংরাজ রাজার অধীনে ইংরাজ জমিদার ছিলেন তারপর ইংরাজেরা জমিদারী ও নীলকুঠি ছাড়িয়া চলিয়া গেলে জমিদারী এ দেশীয়দের হাতে আইসে। তখন ২০।২৫৲ টাকা ব্যয়ে খুব বড় ব্যাপার হইয়াছে। তৎকালে আমাদের বাড়ীতে আমার পিতামহ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর ১১৫০০ সাড়ে এগার হাজার টাকা ব্যয়ে এক শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এখন এরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হইলে তিন লক্ষ টাকায়ও হইবে না। তিনি টাকায় ৮।১০ মণ ধান্য ও ৪।৫ মণ চাউল দেখিয়াছেন। স্বপ্নের মত কথা, হয়ত ছেলেপেলেরা বিশ্বাসই করিবে না। সব যেন স্বপ্নকাহিনী বলিয়া মনে হইতেছিল। একবার এক টাকায় নয় কাঠা (১।৹ দেড় মণ) ধান্য বিক্রী হইতেছিল তখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেক লোক মারা যায়। উহার নাম হইয়াছিল "বারকাঠিয়া আকাল।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ জেলার ইতর মুসলমানেরা হিন্দুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠে। বহু হিন্দুর অপমান করিয়া ধন,মান মারিয়াছিল। এই সময় মহাত্মা রহিম মুন্সী মুসলমানদিগকে ঐরূপ অত্যাচার করিতে বিরত রাখিয়াছিলেন বলিয়া এতদঞ্চলে কোনরূপ অত্যাচার ঘটে নাই। তিনি তখন জীবিত না থাকিলে এ সকলও "মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইত। হিন্দু ও মুসলমানেরা ইঁহাকে অতি ভক্তি করিয়া থাকে। তিনি বহু রোগীকে কেবল হাত বুলাইয়া ভাল করিয়াছেন। উপকার ব্যতীত

তিনি এ জীবনে কাহারো অপকার করেন নাই। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন "বহুদিন হয় পৃথিবীতে আসিয়াছি, এখন চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সে ইচ্ছা ত আর আমার নহে। হয়ত এত দিন আমি আর দুই তিন জন্ম কাটাইয়া দিতে পারিতাম।" দুঃখের বিষয় তাঁহার ক্ষমতাশালী উপযুক্ত পুত্র কেহই নাই। পুত্র, কন্যারা বৃদ্ধ হইয়া প্রায়ই মারা গিয়াছে, এখন নাতি, নাতির পুত্র, পৌত্রেরা জীবিত আছে। এতগুলি পরিজন তাঁহার সম্মুখে মরিয়া গেলেও তজ্জন্য তাঁহাকে, দুঃখিত বলিয়া বোধ হইল না, সর্ব্বদা তিনি হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে কালযাপন করিতেছেন। এখনও তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখর। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ, আবক্ষলম্বিত সুদীর্ঘ শশ্রুরাজী দেখিয়া তুরস্কের পাশাদিগের কথা মনে হইয়াছিল। ইঁহার আর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার নাম ছিল কবির মুন্সী, তিনি ময়মনসিংহ দেওয়ানী আদালতে নাজির ছিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

গৃহদেবী।

আমার গৃহের সকল দৈন্য সকল অভাব যন্ত্রণায়
ধন্য করিয়া কে তুমি লক্ষ্মী প্রেমের পুণ্য শুভ্রতায়,
ঘুচায়ে সকল নিরাশ পীড়ন উদাস ব্যাকুল ক্রন্দনে,
মরুভূ মধ্যে রচিয়ে দিয়েছ নিমেষে এ নব নন্দনে?
মুক্ত করেছ আপন হাতে এ উন্মাদ কারা বন্দীরে
মানবীরূপিনী কোন দেবী তুমি বিরাজ এ গৃহমন্দিরে?

দীন ভিখারীর শ্মশান আবাসে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে
কে তুমি অন্নসত্র রচিয়া নিশিদিন ভরি স্ফূর্ত্তিতে
দশহাতে তুলি বিলাও অন্ন দৈন্যের জ্বালা চূর্ণিয়া,
বিন্ধ্যগুহার রুদ্ধ আঁধারে কে রচি দিলেগো পূর্ণিমা?
নিদাঘতপ্ত বালির বুকে কে ফুটাল যোজন গন্ধীরে
মানবীরূপিনী কোন্ দেবী তুমি বিরাজ এ গৃহমন্দিরে?

কুটীর ভবনে কোটীপতি প্রায় নিত্য দেবের অর্চ্চনা,
সন্ধ্যা প্রভাতে পূজা আরতির পঞ্চম তান মূর্চ্ছনা—
নিত্যসাধন ভজন পূজন তপজপ দান যজ্ঞযাগ
কে তুমি করিছ সাজিয়ে নিত্য সংযত চিত সংযবাক্?
পরেরে খাওয়ায়ে আপনি তৃপ্ত পরের সুখেতে নন্দিতা,
মানবীরূপিনী কোন দেবী তুমি এঘরে ভুবন বন্দিতা?

কেতুমি উষার আলো না আসিতে জ্বালাও প্রদীপ ধূপধুনা
প্রাঙ্গনতলে ছড়াইয়া দিয়া মঙ্গলজল আল্পনা
লেপে মুছে সারা বাড়ী ঘরটীরে সুন্দর করি ঝলমলা
ঠাকুরদেবের পূজার লাগিয়া ফুল নিতে আস ফুল তলা?
দশটা না হতে দশ রকমের সরস অন্ন ব্যঞ্জনে
ডাকিয়া খাওয়াযে কর্ত্তা হইতে দাসদাসী আদি জনজনে
বাকী যাহা রয় তারি দুটীখানি আপনি খাইয়ে তুষ্ট রও,
ছেলেপুলেদের শত আব্দার শত জ্বালাতনে রুষ্ট নও।
ব্যর্থ করিয়া বিপুল দুঃখ অভাব বিপদ ঝঞ্ঝারে,
কেতুমি লক্ষ্মী, লক্ষ্মীরে এনে বাঁধিলে আমার সংসারে?

সন্ধ্যার আগে গাভীগুলি যবে গোঠ হতে তুলে পুচ্ছটী
হাম্বা রবেতে ছুটে চলে আসে, সবুজ ঘাসের গুচ্ছটী,
শাকসব্জীর খোসা ভাত,ফেন,খেতেদাও নিজ হাতপেতে,
বাঘা,মিনি,হরা,তোমার কৃপায় কারেও দেখিনি বাদযেতে
বাগ্দী পাড়ার গরীব দুঃখী অনাথ আতুর অন্ধকে?
কার ঘরে আজ চুল্লী ধরেনি অনাহারে নিরানন্দ কে?
কাচ্চা বাচ্চা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিছে কাহার কোন্ ঘরে,
কেহনা জানিতে তুমি জেনে নেও ডাকায়েআসিয়ে চুপকরে
রান্নাঘরের চাতালে ব'সে ভাত খেতে দাও পাত পেতে,
দীনদুখী তারা কত সুখী হয় তোমার দয়ার যত্নেতে।

খাবার সেদিন অন্ন রোচেনা তুমি না যেদিন দেও বেঁধে
পাড়ার মেয়ের চুলবাঁধা মিছে তুমিনা যেদিন দেও বেঁধে।
রামায়ণ পড়ে তুমিনা শুনালে হয় যে ক্ষুধা মান্দ্য মার,
ঘুমপাড়ানীয়া মাসীরে ডাকিয়া তুমিনা আনিলে সাধ্য কার?
হাতের কাজটী না দিলে থাকে না ছোটবউমার মন ভাল,
এত তাড়াতাড়ি সংসারটারে করে নিলে এত আপনার?

এত কর তবু নীরব বদন কহনা উচ্চ বাক্যটি
নিয়ত করুণা কল্যাণবতী কল্যাণময়ী লক্ষ্মীটি,
সুন্দরীরাণী, সুন্দরী বলে গর্ব্ব নাহিক ক্ষণতরে,
বিলাসলীলার লেশটিও কভু জাগেনা শুদ্ধ অন্তরে।
শুধু দুখানি কঙ্কণ আর একফোঁটা শুধু সিন্দুরে,
স্নেহ ঢলঢল করুণা বিভল সুন্দর মুখ ইন্দুরে।
তীর্থ কোথায়? এখন আমার লক্ষ বৃন্দাবন কাশী,
গৃহদেবী তুমি গৃহে না থাকিলে গৃহী যে হইত সন্ন্যাসী।

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর।

ফরাসীবিপ্লব-যুগের কয়েকটি চিত্র।

ভেণ্ডির সমর।

১

ভেণ্ডির কৃষক।

ইতিহাসে সত্য আছে, জনপ্রবাদেও সত্য আছে। জনপ্রবাদ কল্পনায় গড়িয়া উঠিলেও পরিণামে তাহাতে সত্যই প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ও জনপ্রবাদ-মূলক সত্য ঠিক এক নহে, যদিও ইতিহাস এবং কাহিনীর উদ্দেশ্য একই—মানুষের বহিঃ প্রকৃতির অঙ্কন।

ভেণ্ডিকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সঙ্গে প্রবাদকাহিনীর সংযোজন আবশ্যক। ইহাকে সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য ইতিহাস, এবং ইহার খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্য প্রবাদকাহিনী, এই উভয়েরই প্রয়োজন।

ভেণ্ডির সমর এক অত্যাশ্চর্য্য অসাধারণ ব্যাপার। অজ্ঞ কৃষকগণের এই বিবেচনাশূন্য অথচ চমৎকার, হীন অথচ মহিমময় সংগ্রাম—ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকিলেও ফ্রান্স ইহা লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে। ভেণ্ডি ক্ষতও বটে, গৌরবও বটে।

মানবসমাজের মহাসন্ধিক্ষণে সময় সময় গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়। জ্ঞানীগণ সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত আলোকে আপনাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ তাহারা ইহাকে বর্ব্বরতা ও অত্যাচারে পরিণত করে। দার্শনিক সহজে কিছুর উপর দোষারোপ করেন না। এই সব সমস্যায় যে আন্দোলন ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তৎসম্বন্ধে তিনি ধীর ভাবে চিন্তা করেন। তিনি জানেন, এই সব জটিল সমস্যার কালবৈশাখী দেশের মধ্যে কিছু-কালের জন্য কৃষ্ণছায়া বিস্তার করিবেই।

ভেণ্ডিকে বুঝিতে হইলে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এই বিরোধটাকে চিত্রিত করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব; অপরদিকে বৃটেনী প্রদেশের কৃষক। একদিকে এই সব অভূতপূর্ব্ব ঘটনাপুঞ্জ—সর্ব্ববিধ কল্যাণের মহাসূচনা, পূর্ণ সভ্যতার জন্য বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা, উন্নতিপ্রচেষ্টার ক্ষিপ্রতা, ধারণা ও বুদ্ধির অতীত সংস্কার-সাধনের বিপুল প্রয়াস; অপরদিকে এই সব উপলবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বাবরীচুলওয়ালা মনুষ্য—গম্ভীর এবং অদ্ভুত। ইহাদের আহার্য্য ফলমূল, পানীয় দুগ্ধ, আবাসগৃহ তৃণ-নির্ম্মিত, এবং মন গৃহচতুঃসীমার বেড়া ও খানার মধ্যে আবদ্ধ, সংকীর্ণ; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ঘণ্টাধ্বনির পরস্পর পার্থক্য তাহাদের কর্ণে অনায়াসে ধরা পড়ে; মৃত ভাষায় তাহাদের কথোপকথন—এ যেন চিন্তার সমাধি-বাস। গরুচরান, কাস্তে ধার দেওয়া, শস্য ঝাড়িয়া লওয়া, রুটী তৈয়ার করা—এই ইহাদের জীবন। জাঙ্গল ও পিতামহী ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়; ইহারা গির্জ্জায় কুমারী মেরীর পূজা করে, আবার প্রান্তরমধ্যে প্রোথিত রহস্যময় প্রস্তরখণ্ডের অর্চ্চনা হইতেও তাহারা

বিরত নহে। সমতলক্ষেত্রে ইহারা মজুর, সমুদ্রকূলে ইহারা ধীবর, আবার সুযোগ পাইলে ইহারা বড়লোকের জঙ্গল হইতে রক্ষিত পশু চুরি করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। রাজা, ভূস্বামী এবং যাজক সম্প্রদায়ের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি। ইহারা অনেক সময় তন্ময় হইয়া ভাবিতে থাকে; জনহীন বেলাভূমিতে বসিয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর ভাবে সাগরকল্লোল শুনিতে শুনিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়।

এইরূপ অন্ধজনের পক্ষে আলোককে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া কি সম্ভব হইতে পারে?

২

ভেণ্ডির বন

এই কৃষক জীবনের নির্ভরস্থল ছিল দুইটী—শস্যক্ষেত্র যাহা তাহার আহার জুটাইত, এবং বন যাহা তাহাকে লুকাইয়া রাখিত।

বৃটেনীপ্রদেশে তৎকালে সাতটি ভয় সঙ্কুল অরণ্য ছিল। এই অরণ্যগুলির সঠিক ধারণা করা সহজ নহে। এইগুলি বস্তুতঃ নগর। এই সকল কণ্টকাকীর্ণ শাখা প্রশাখার জটিল সন্নিবেশ নিতান্তই গুপ্ত, শুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর —যেন চির-নীরবতার অচলায়তন। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা সমাধিভূমির মতোই নির্জ্জন। কিন্তু যদি বিদ্যুৎঝলকের মতো এক আঘাতে ইহার সমস্ত বৃক্ষ নির্ম্মূল করিয়া ফেলা সম্ভব হইত তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অগণিত জন সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

প্রস্তর ও বৃক্ষশাখায় আচ্ছাদিত বহু কূপ তথায় ছিল—সেগুলি বস্তুতঃ ভূগর্ভস্থ অসংখ্য অন্ধকার কুঠরীর প্রবেশ-পথ মাত্র। মিশর দেশেও নাকি এরূপ কূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তবে সেগুলি ছিল মরুভূমিতে, এগুলি অরণ্যে; আর মিশর দেশের গুহায় ছিল মৃতদেহ, কিন্তু বৃটেনীর গুহাগুলি জীবিত মনুষ্যে পূর্ণ ছিল। মিসডনের অরণ্যের একটা খুব নিভৃত অংশে খানিকটা পরিষ্কৃত জায়গা—মৌচাকের মতো সহস্র গর্ত্ত ও গহ্বরে সমাকীর্ণ—অগণিত লোক তথায় গোপনে আনাগোনা করিত—এটার নাম ছিল "মহানগরী"। এই রকম আর একটা জায়গা—উপরে নির্জ্জন, নিম্নে অধ্যুষিত—"রাজভবন" নামে অভিহিত হইত।

স্মরণাতীত কাল হইতে বৃটেনী প্রদেশে এই ভূগর্ভস্থ জীবন চলিয়া আসিয়াছে—মানুষ মানুষের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া ওইখানে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। সর্পের বিবরের মতো এই সব গুহা ও গহ্বরের অস্তিত্বের উহাই হেতু। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অভিজাতগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড; ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মের নামে সংগ্রাম; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিংশ সহস্র শিক্ষিত কুক্কুর দ্বারা মানুষের শিকার—এই সব অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে দেশের লোক নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়াছিল। কেণ্টদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ট্রগলোডাইটিসরা; রোম্যানদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেণ্ট্রা, নরম্যান্দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৃটনরা; রোমানক্যাথালিক দিগের হতে হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হ্যাগ্‌নট্‌রা; আবকারী কর্ম্মচারীদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিষিদ্ধমালের ব্যবসায়ীরা—পর পর প্রথমে অরণ্যে, তারপর ধরিত্রীর জঠরে, আশ্রয় লইয়াছে। ইহাই ব্যাধতাড়িত পশুর আত্মরক্ষার অন্তিম উপায়। অত্যাচারে জাতি সমূহের এইরূপই পরিণাম ঘটে। স্বেচ্ছাচার দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বিজিগীষা, সামন্তপ্রথা, ধর্ম্মোন্মাদ, নূতন নূতন করস্থাপন প্রভৃতি নানা আকারে হতভাগ্য বৃটেনী প্রদেশকে নির্য্যাতিত করিয়াছে। জনগণ কাজেই ভূগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফরাসী সাধারণতন্ত্র যখন ঘোষিত হইল তখন এই ভূগর্ভের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইল। এবং এই জোর করা মুক্তিতে আপনাদিগকে উৎপীড়িত বোধ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দাসত্বে অভ্যস্ত লোকদের স্বভাবতঃই এইরূপ ভ্রান্তি হয়।

৩

কবরের জীবন।

ব্রুটেনীর অন্ধকারময় অরণ্যগুলি এই বিদ্রোহের সহকারী হইল।

কতকগুলি তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায় এই বিপুল কৃষক বিদ্রোহ কিরূপ সুবন্দোবস্তের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। প্রিন্স-ডি-ট্যালমণ্টের আশ্রয়ারণ্যে মানুষের চিহ্নমাত্র ছিল না, অথচ সেখানে ভূগর্ভে ছয় হাজার লোক সংগৃহীত হইয়াছিল। মিউগ্যাকের অরণ্যেও কোন মনুষ্য নেত্রগোচর হইত না, অথচ সেখানে আট হাজার লোক বাস করিতেছিল। এই অরণ্য যেন একটা সুবৃহৎ কালো স্পঞ্জের মতো, রাষ্ট্রবিপ্লবের গুরু-পদভরে তাহা হইতে গৃহযুদ্ধের ধারাপাত আরম্ভ হইল।

এই অদৃশ্য সৈন্যগণ ওত পাতিয়া থাকিত। সময় সময় তাহারা মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া সাধারণ তন্ত্রের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিত, আবার নিমেষ মধ্যে ভূগর্ভে প্রবেশ করিত। তাহারা যেমন সহসা আবির্ভূত হইত, আবার তেমনি সহসা অন্তর্হিত হইতে পারিত। এক মুহূর্তে তুষার শৈলের মতো তাহাদের আকস্মিক আগমন, পরমুহূর্তে ধূলিপটলের মতো তাহাদের দ্রুত প্রস্থান। যুদ্ধে তাহারা দৈত্যের মতো দুর্দ্ধর্ষ, আত্ম-গোপনে বামনের মতো সুদক্ষ—এ যেন ছুঁচোর বিদ্যায় অভ্যস্ত ব্যাঘ্র।

বিভিন্ন অরণ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের গোলকধাঁধাঁয় পরিবৃত ছিল। প্রাচীন জমীদারভবন—যে গুলি বস্তুতঃ দুর্গ, পল্লী—যে গুলি বস্তুতঃ সৈন্যশিবির, গোলাবাড়ী—যে গুলি বস্তুতঃ ফাঁদ ও গোপন আক্রমণের ঘের,—এই থাগুড়া বেষ্টনের মধ্যে সাধারণ তন্ত্রের সৈন্য সমূহ ধরা পড়িল।

কোনও কোনও অরণ্যে ভূগর্ভস্থ গ্রামগুলি ছাড়া মাটির উপরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র কুটীরপরিবৃত পল্লী বিশাল বিটপী সমূহের পত্রপল্লব-নিবিড় ছায়ান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিত। সুধু কুটীরোত্থিত ধূমরাশি দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বহির্জগতে বিজ্ঞাপিত হইত। স্ত্রীলোকেরা এই সব কুটীরে বাস করিত; আর পুরুষগণ থাকিত গুহার ভিতরে।

উপরে আসিতে হইলে তাহাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। কেন না সেটা অনেক সময় বিপজ্জনক ছিল। হঠাৎ ভূতল হইতে বাহির হইয়া তাহারা হয়ত দেখিল, একদল সাধারণ তন্ত্রের সৈন্য তাহাদের একেবারে মাথার উপরে। এই ভয়ঙ্কর অরণ্যকে ডবল ফাঁদ বলা যাইতে পারে। 'নীল দলের' লোকেরা ইহাতে প্রবেশ করিতে ভীত হইত, আর "সাদা দলের" লোকেরা ইহার বাহিরে আসিতে সাহস পাইত না।

সময় সময় ইহারা এই কবরের জীবনে বিরক্ত হইয়া শতবিপদসম্ভাবনা সত্ত্বেও বাহিরে উঠিয়া আসিত এবং নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে সমবেত হইয়া নৃত্য করিত। অন্যথায় কাল কাটাইবার জন্য তাহারা প্রার্থনায় রত হইত। বুঁদোঁসু বলেন, জাঁ। চোয়া তাহাদিগকে প্রতিদিন মালাজপ করাইত।

সহসা তাহারা মৃত্যুর সন্ধানে ধাবিত হইত,—সমাধির পরিবর্ত্তে কারাগারও বুঝি প্রার্থনীয় হইয়া উঠিত, কখনো কখনো তাহারা গর্ত্ত ও গুহার আবরণ সরাইয়া কাণ পাতিয়া শুনিত, দূরে যুদ্ধ হইতেছে কি না। শুনিয়া শুনিয়া তাহারা যুদ্ধের গতি ও পরিণাম বুঝিতে পারিত। সাধারণ তন্ত্রের গোলাগুলি বর্ষণ ছিল ধারাবাহিক; আর রাজপক্ষীয়দের ছিল থেকে থেকে। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ থামিয়া গেলে—সেটা রাজ-পক্ষীয়দের পরাজয়ের চিহ্ন; আর যদি বন্দুকের আওয়াজ থেকে থেকে হইতে থাকে এবং দিক্‌প্রান্তের দিকে সরিয়া যায়, তবে তাহাদের সুবিধা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সাদার দল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিত;

নীল দলের লোকেরা তাহা করিত না—কারণ জনপদগুলি ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে।

বাহিরে কি হইতেছে—তাহারা তাহার সব খবর রাখিত। সমস্ত শকট ও সেতু তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, তবু তাহাদের খবরাখবরের কোন বাধা হইত না। আশ্চর্য্যজনক উপায়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, কুটীর হইতে কুটীরান্তরে অত্যন্ত সত্বরতার সহিত সতর্কীকরণ সংবাদ যথাসময়ে প্রচারিত হইত। বোকার মতো একজন কৃষক চলিয়া গেল—তাহারই ফাঁপা লাঠির ভিতরে সে ডেস্‌প্যাচ্ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

একজন বিশ্বাসঘাতকের মারফতে তাহারা বহুসংখ্যক সাধারণতন্ত্রের ছাড়পত্র যোগাড় করিয়াছিল। নামের জায়গাটা তাহাতে খালি ছিল। তৎসাহায্যেও তাহারা ব্রুটেনীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অনায়াসেই গমনাগমন করিতে পারিত।

৪

সামরিক জীবন

স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকায় প্রায় পাঁচলক্ষ লোক ভেণ্ডির এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। "ফেডারেলিষ্ট" ও "গিরণ্ড" সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই অনলে ফুৎকার প্রদান করিত।

এই সব লোকের অধিকাংশেরই অস্ত্র ছিল সুধু বর্শা। পাখীশিকারের বন্দুকও যথেষ্ট ছিল। লক্ষ্যভেদে ইহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব। আর একটা বিশেষত্ব ইহাদের ছিল। তাহারা দৌড়িতে দৌড়িতে বন্দুকে বারুদগুলি পুরিতে পারিত। নীল দলের লোকদিগকে আক্রমণ এবং খাদ পার হইবার সুবিধার জন্য তাহারা দশহাত লম্বা বর্শা ব্যবহার করিত। এই অস্ত্র, যুদ্ধ এবং পলায়ন উভয়েরই উপযোগী।

সাধারণ তন্ত্রের লোকদের সহিত এই কৃষকদের হয়ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়েও যদি তাহারা ঘটনাক্রমে কোন ক্রশ্ বা গির্জ্জা দেখিতে পাইত, তবে অমনি তাহারা জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিত,—শত্রুর অগ্নিবর্ষণ গ্রাহ্য করিত না। কতজন সেইখানেই চিরকালের মতো বিশ্রামলাভ করিত। কিন্তু যাহারা জীবিত থাকিত তাহারা মালাজপ শেষ হওয়া মাত্র উঠিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিত। কি বীরত্ব!

তাহাদের দলে অনেক রমণীও ছিল। নেতারা তাহাদিগকে যাহা বলিত তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিত। পাদ্রীরা অপর কতগুলি পাদ্রীর গলদেশে রজ্জুদ্বারা লাল দাগ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিত, "ইহারা গিলোটিনে নিহত হইয়াছিল. আবার ইহাদিগকে জীবিত করা হইয়াছে।" কৃষকেরা বিনাদ্বিধায় তাহা বিশ্বাস করিত।

কখনো কখনো তাহারা মহানুভবতারও পরিচয় দিত। সাধারণতন্ত্রের একজন পতাকাবাহী তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও পতাকা ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা তাহাকে সম্মান দেখাইয়াছিল।

প্রথম প্রথম তাহারা কামানকে ভয় করিত। পরে সুধু লাঠি হস্তে অগ্রসর হইয়া তাহারা অনেক কামান দখল করিয়া লইয়াছিল। বারুদের অভাব হইলে তাহারা মালা জপিতে জপিতে সাধারণ তন্ত্রীদের অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া তথা হইতে বারুদ লুঠিয়া লইত। স্বপক্ষের আহত লোকদিগকে তাহারা আপাততঃ শস্যক্ষেত্রে কি কোন জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিত; পরে যুদ্ধান্তে আসিয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া যাইত।

যুদ্ধোপযোগী বিশেষ পরিচ্ছদ (ইউনিফর্ম্) তাহাদের ছিল না। যাহা ছিল, তাহা প্রায়ই জীর্ণ, ছিন্ন। যে কোন পোষাক হাতের কাছে পাওয়া যাইত তাহারা তাহাই পরিধান করিত। একজনের মাথায় ছিল একটা থিয়েটারের পাগড়ী, আর একজন একটা ব্যারিষ্টারের গাউন পরিয়া এবং স্ত্রীলোকেরা টুপী মাথায়

দিয়া আসিয়াছিল। সাদা কোমরবন্ধ এবং উত্তরীয় সকলেরই। গ্রন্থির সংখ্যাদ্বারা পদমর্য্যাদা সূচিত হইত।

শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় তাহারা সমস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া বন, জঙ্গল, টিলা, খাদ—সকলস্থান হইতে এককালে লাফাইয়া পড়িত, এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও বিনাশকার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া যাইত। সাধারণ-তন্ত্রের অধিকৃত গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহারা "স্বাধীনতাদণ্ডটিকে" অগ্নিসাৎ করিত এবং সেই দহ্যমান দণ্ডের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিত।

অতর্কিত আক্রমণই ছিল ভেণ্ডির পদ্ধতি। ৪০।৪৫ মাইল তাহারা নীরবে কুচ করিয়া যাইত—একটি গাছের পাতা কি একটা ঘাসও নড়িত না। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তাহাদের সেনাপতিরা স্থির করিত, সাধারণ তন্ত্রীদের কোন্ ঘাটি আগামীকল্য আক্রমণ করিতে হইবে। তখন এই জনবাহিনী তাহাদের বন্দুকে গুলিবারুদ পূরিয়া, কিঞ্চিৎ প্রার্থনার পর জুতা খুলিয়া নগ্নপদে, নিঃশব্দে বনবিড়ালের মতো কানন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইত। নিশাচরের মতোই ছিল তাহাদের স্বভাব।

৫

পরিবেষ্টনের প্রভাব।

ভেণ্ডির প্রকৃত শক্তি ভেণ্ডিতেই। স্বদেশে তাহারা অজেয়, অটুট, দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু লয়ের নদী পার হইয়া প্যারিস আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না, বোঁচাম্প, লেস্কিওরর, লা রোচিজ্যাকেলিন প্রভৃতি তাহাদের খ্যাতনামা নেতারা এই বিষয়ে ভুল বুঝিয়াছিল। কৃষক-বাহিনী কর্ত্তৃক প্যারিস আক্রমণ, একদল গোপালক কর্ত্তৃক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুন্নত মহা-নগরীর অধিবাসীদিগকে আক্রমণ—বাতুলতামাত্র! ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইল। দুশ্চেষ্টার প্রতিফল পাইতে বিলম্ব হইল না। লয়ের নদী অতিক্রম করাই ভেণ্ডিয়ান সৈন্যের অসম্ভব হইল।

ভেণ্ডির বিদ্রোহ সফল হয় নাই। অন্যান্য অনেক বিদ্রোহ সফল হইয়াছে;—দৃষ্টান্তস্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের বিদ্রোহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্ব্বত্য ও আরণ্য বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কিন্তু একটা প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমোক্তেরা সর্ব্বদাই একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লড়াই করে; শেষোক্তেরা করে কুসংস্কার প্রণোদিত হইয়া; স্বাধীনতালাভই একের উদ্দেশ্য, অপরে চায় নির্জ্জনতা; ইহারা ঊর্দ্ধাকাশে উড়িয়া বেড়ায়, উহারা ভূতলে হামাগুড়ি দিয়া চলে। পার্ব্বতীয়েরা প্রচণ্ড জলপ্রপাত এবং বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রতিবেশী; আর অরণ্যবাসীদের নিয়ত পরিচয় বদ্ধ জলাভূমির সঙ্গে—যেখানে মহামারীর বিষবীজ লুক্কায়িত থাকে। একজনের মস্তক মুক্ত সুনীল আকাশে, অপরের মস্তক ঝোপের আওতায়; আলোকোজ্জ্বল গিরিশিখরে একজনের অধিষ্ঠান, অপরের বাস নিবিড় তিমিরান্ধকারে।

পর্ব্বত ও অরণ্যের শিক্ষা একরূপ নহে। পর্ব্বত হচ্চে সুরক্ষিত দুর্গ, আর অরণ্য হচ্চে গুপ্তাবাস; একে আমাদের সাহস জন্মায়, অপরে শিখায় চাতুরী। পৌরা-ণিক কাহিনীর মতে দেবতারাই পর্ব্বতের অধিবাসী, আর অপদেবতারা অরণ্যের। আপেনাইন্ আল্পস্, পিরেনীজ এবং ওলিম্পাস্ স্বাধীন দেশেরই পর্ব্বত। "মন্টব্লাঙ্ক" পর্ব্বত সুইস্‌বীর উইলিয়ম টেলের বিরাট সহকারী। মোহান্ধকারের সঙ্গে যুঝিয়া আত্মায় দিব্যা-লোক লাভের প্রচেষ্টা—যাহাতে ভারতবর্ষের কাব্য সকল পরিপূর্ণ—তাহাতেও মহান্ হিমাচলের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীস, স্পেন, ইটালী—ইহাদের শক্তির মূল পর্ব্বত; জার্ম্মেনী কি বৃটেনীর শক্তির মূল অরণ্য। অরণ্যেই বর্ব্বরতা।

মানুষের কার্য্যকলাপ তাহার দেশের প্রাকৃতিক গঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ বিষয়ে

দেশভূমি যে তাহার কতদূর সহকারী, সে হয়ত তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারে না। বন্য উদ্দাম নৈসর্গিক দৃশ্যের পরিবেষ্টনের মধ্যে লালিত মানব সন্তানের প্রকৃতিতে সেই বন্য ও উদ্দামভাবের ছাপ পড়েই। বিবেকের উপর—বিশেষতঃ জ্ঞানালোক বিবর্জ্জিত বিবেকের উপর—মরুভূমির প্রভাব অনেক সময় সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কোন কোন বিবেক অমিতবলশালী—তাহা হইতেই সক্রেটিস্ বা খ্রীষ্টের উদ্ভব; কখনো কখনো অতি দুর্ব্বল, সংকীর্ণ বিবেকও দেখা যায়—তাহারই ফল জুডাস, যে খ্রীষ্টকে ধরাইয়া দেয়। আলোকহীন বনানী, ঝোপঝাড়কণ্টক-সমাকীর্ণ সুগুপ্ত জলাভূমি—এই সমস্তই দুর্ব্বল, বদ্ধ বিবেককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং উহাতে তাহাদের মন্দপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়। দৃষ্টিবিভ্রম, দুর্ব্বোধ্য মরীচিকা, সাময়িক এবং পারিপার্শ্বিক বিভীষিকা মানুষের আতঙ্কিত মনকে সাধারণতঃই কুসংস্কারপূর্ণ করিয়া তোলে, আর উত্তেজনার সময় উহাকে পাশবিকতায় প্রণোদিত করে। এমই অস্পষ্টালোকে মানুষকে হত্যার পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক দ্বৈতার্থবিশিষ্ট। মনীষীরা উহা একভাবে বুঝিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়; জড়বুদ্ধি অসভ্যেরা উহা অন্যভাবে অনুমান করিয়া আপনাদিগকে কেবল ভ্রান্তিজালে জড়াইতে থাকে। অরণ্যের অস্পষ্ট নির্জ্জনতা অজ্ঞজনের অনালোকিত মনকে আরও অন্ধতমসাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। কোন কোন পর্ব্বত, কোন কোন গহ্বর, কোন কোন বৃক্ষসমাচ্ছন্ন অরণ্যের গভীরাবকাশ মানুষকে যেন ক্ষেপাইয়া তুলিয়া নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্ররোচিত করে। এ গুলি যেন শয়তানের আবাসস্থলী। বিশাল মুক্ত আকাশ মানুষের মনকে প্রসারিত করে, আর সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, খণ্ড আকাশ তাহাকে একদেশদর্শী করে, তাহার মনকে ক্ষুদ্র করে। সংকীর্ণ মন উদার সার্ব্বজনীন ভাবের ধারণা করিতে না পারিয়া তাহাকে বিরোধ করে। এই বিরোধই উন্নতির সংগ্রাম। গ্রাম্য সমাজ—সমগ্র দেশ। এই দুইটি কথা ভেণ্ডির সমরেতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার। স্থানীয় ভাব এবং বিশ্বজনীন ভাবের লড়াই; মূর্খ কৃষকের সংকীর্ণ স্বগ্রামপ্রীতি এবং শিক্ষিতের উদার দেশাত্মবোধের বিরোধ—ইহাই ভেণ্ডির সমর।

৬

বিদ্রোহী বৃটেনী

বৃটেনীর বিদ্রোহ নূতন নহে। গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে বৃটেনী অনেকবারই বিদ্রোহী হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদাই ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। এই শেষবারের বিদ্রোহে কিন্তু তাহার ভুল হইল। তবুও বৃটেনীর সকল যুদ্ধেরই প্রকৃতি একরূপ—কেন্দ্র শক্তির সঙ্গে স্থানীয় শক্তির সংগ্রাম।

এই প্রাচীন জনপদগুলিকে পুকুরের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বদ্ধ জলাশয়ে প্রবাহ নাই; তাহার উপর দিয়া যে বায়ু বহিয়া যায়, তাহাতে দূষিত বারিরাশি বিশোধিত হয় না, আন্দোলিত ও ক্ষুব্ধ হয় মাত্র।

ফিনিষ্টার ফ্রান্সের স্থলসীমা। মানুষের রাজ্যের ঐখানে শেষ। তথায় সাগর যেন ভূমি, সভ্যতা ও বর্ব্বরতা সকলকে বলিতেছে—"থামো"।

কেন্দ্র হইতে অর্থাৎ প্যারিস হইতে যখনই ধাক্কা আসে,—সে ধাক্কা রাজপক্ষেরই হোক্ কি সাধারণ তন্ত্রেরই হোক, স্বেচ্ছাচার প্রসূতই হোক, কি স্বাধীনতায় জন্যই হোক্—অমনি বৃটেনী আপনার দলবল লইয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া হইয়া উঠে; কেননা এরূপ ধাক্কা বৃটেনীর পক্ষে সর্ব্বদাই নূতন, আর নূতনের প্রতি অবিশ্বাস এ প্রকৃতির নিয়ম। "আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দাও। কি চায় ওরা আমাদের নিকটে"?—বৃটেনীর মনোভাব অনেকটা এই রকমের। বিধিব্যবস্থা, সংস্কারান্দোলন, দর্শনবিজ্ঞান, শিক্ষাপরিষৎ—সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা এই বিদ্রোহের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রামে গ্রামে সাঙ্কে-

তিক দামামা বাজিয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবকেই আতঙ্কিত করিয়া তোলে।

ভয়ঙ্কর অন্ধতা!

কেবল বুঝিবার ভুলে এই সাংঘাতিক ভেণ্ডির বিদ্রোহ—একটা বিরাট অন্ধ ঝন্‌ঝনা; বিচারহীন, কৌশলহীন, উদ্দেশ্যহীন আত্মহত্যা; আলোক প্রতিরোধের জন্য প্রাচীর গাঁথিবার ব্যর্থ আয়োজন। আট বৎসর ধরিয়া এই বিভীষিকা ফ্রান্সের বক্ষের উপর চাপিয়াছিল। ইহার ফলে চতুর্দ্দশটী জেলা জনশূন্য, অগণিত কৃষিক্ষেত্র বিনষ্ট, শস্যভাণ্ডার গ্রামজনপদ ভস্মীভূত, নগর চূর্ণীকৃত, আবাসভবন বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং কত নারী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। সভ্যতার ভীতিস্থল এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রী পিটের একমাত্র ভরসা—এই দারুণ গৃহযুদ্ধ। ইহা বাস্তবিকপক্ষে দেশদ্রোহীদের একটা ক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা।

পরিণামে ইহাতে উন্নতিরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহাসঙ্কটেরও একটা শিক্ষা এবং সুফল আছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

পণ্ডিত মোহনবল্লভ ভাদুড়ী।

৯৫৪ শকাব্দে আদিশূর রাজার কান্যকুব্জের কুলাঞ্চ গ্রাম হইতে আনিত পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের অধঃস্তন ১৭শ পুরুষ, বিখ্যাত কুসুমাঞ্জলী প্রণেতা ও সমাজ পতি নৈয়ায়িক পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র, বিখ্যাত কুলীন পশুপতি হইতে অধঃস্তন ১১শ পুরুষ, উদয়নাচার্য্য হইতে ১২শ পুরুষ এবং সুষেণ হইতে ২৭শ অধঃস্তন মোহন বল্লভ ভাদুড়ী বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালেটী (বালিহাটী) গ্রাম নিবাসী ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও নবগুণসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনুমান ১৬১৩ খৃঃ জাহাঙ্গীর বাদসার রাজত্বকালে ইনি বিখ্যাত হন।

মোহন বল্লভের বংশাবলী।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী।
|
পশুপতি (দ্বিতীয় পক্ষ)
|
জগাই
|
মরাই
|
দামাই
|
শ্রীধর
|
প্রভাকর
|
গকুল
|
বিষ্ণুদাস
|
কুমুদানন্দ
|
মোহন বল্লভ　　　　বিনোদ বল্লভ

এই বিনোদ বল্লভের বংশ এখনও বালেটী গ্রামে বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কিম্বদন্তী এই যে, মোহন বল্লভ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মগ্রহণ করতঃ কাশী যাত্রা কালে, (জনশ্রুতি যে, মোহন বল্লভ একদা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া ঝাড়ি হস্তে সৌচে বাহির হন এবং মনোমধ্যে ন্যায়ের তর্ক করিতে করিতে বিহ্বল চিত্তে, কত দিনে তাহার স্থিরতা নাই) একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাবনা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান চাট মহর থানার অধীন হরিপুর গ্রামে উমানন্দ নেওগীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখনকার কালে অতিথি সেবা পরম ধর্ম্ম ছিল। অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিয়া তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান ও নানা প্রকারে তাহার মনতুষ্টি সাধন ও সেবা

করা মহাধর্ম্ম কার্য্য ছিল। এবং তাহাতে মোক্ষ লাভ হয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। এখনকার ন্যায় তখন কোথাও হোটেল ছিল না, অন্ন বিক্রয় করা মহাপাপ বলিয়া তখন সকলে মনে করিত। দেশ ও কালানুযায়ী অতিথি সেবা বাঙ্গলা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এখন আর আতিথ্য গ্রহণের স্থান নাই। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কেহ কোথাও উপস্থিত হইলে, সে চোর ডাকাইত কি না, ডিটেকটিভ কি না, স্বদেশী ডাকাইত দলভুক্ত কি না এই সকল তর্কে উত্তীর্ণ হইলেও, পাকের লোক নাই, গৃহিনী অসুস্থা ইত্যাদি নানা প্রকার আপত্তোই অতিথির অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, বাধ্য হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করেন। ফলকথা খাদ্য দ্রব্যের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার লোকের আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য হইয়াছে ; তাহাতে স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করাই দুর্ঘট, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ও বিলাসিতার প্রাবল্যে গৃহিনী আর পতি-পুত্র-পরিজনের সুমিষ্ট সুব্যঞ্জন দ্বারা রসনার তৃপ্তি ও পাচক রসের উৎকর্ষ সাধনে রাজী নহেন। গতিকেই বাধ্য হইয়া অজানিত, ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন অপরিস্কৃত পাচকের অখাদ্য ও দুষিত খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া পাচক রসের ও রসনার তৃপ্তি সাধনে প্রায় সকলেই বাধ্য। তৃতীয়তঃ সভ্যতার অত্যাধিক্যে আভ্যন্তরীণ ও অন্দরের অবস্থা একে অন্যকে জানিতে দিতে লজ্জা বোধ করেন। গতিকেই কেহ কাহাকেও আশ্রয় দিতে সহজে স্বীকার করেন না। নিতান্ত নিকট আত্মীয় কুটুম্ব না হইলে কেহ কাহাকে অতিথি রূপে গ্রহণ করেন না। অনেক স্থলে নিজ ভাইপো, ভাগ্নে এমন কি জামাতাকেও হোটেলে অন্ন গ্রহণ করিয়া উকীল, হাকিম বা ডাক্তার—খুড়ো, মামা, শ্বশুরের আতিথ্য গ্রহণের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলে হইয়াছে যে, কেহ কাহাকেও অতিথিরূপে গ্রহণ করেন না এবং সহজে কেহ কাহারও আতিথ্য গ্রহণেও রাজী হন না।

যাহা হউক আমরা যে কালের কথা বলিতেছি সে কালে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ব্রাহ্মণ বিখ্যাত কুলীন ও সমাজপতি উদয়নাচার্য্যের বংশধর জানিয়া উমানন্দ, মোহন বল্লভকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। সে সময় কুলীন ব্রাহ্মণগণ কৌলিন্য গুণসম্পন্ন ছিলেন সুতরাং কুলীনগণ কুলীন ব্যতীত অন্য কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন না। তাহা হইলে তাহাদের কৌলিন্যের হানি হইত। যদ্যপি কাপ কি শ্রোত্রীয় কেহ কুলীনকে আহার করাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের লৌকিকতা (কুলমর্য্যাদা) দিতে হইত। সে লৌকিকতা বা সম্মান-আদর, সেবা, ভদ্রতা, বস্ত্র বা যৎসামান্য অর্থ মাত্র। তখন সদাচারী বিদ্বান লোক দেখিলেই তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারা যাইত সুতরাং মোহন বল্লভের চেহারা ও কথাবার্ত্তাতেই উমানন্দ তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করতঃ তাঁহার আহারের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করেন। মোহনবল্লভ কুলীন বলিয়া কাপ উমানন্দের হস্তে আহার করিতে অস্বীকার করিলেন, সেজন্যই তাঁহার স্বপাক আহারের অনুষ্ঠান অন্দরে হইতে লাগিল।

এই সময় উমানন্দের বিবাহযোগ্যা এক কন্যা ছিল। কোন ব্রত উপলক্ষে সে কন্যা সমস্তদিন উপবাসিনী ছিলেন। এদিকে মোহনবল্লভও সমস্তদিন নিরম্বু উপবাসী এবং সেদিন বিবাহেরও উপযুক্ত দিন ছিল ; সুতরাং উমানন্দের মনে এই সুযোগে এই কুলকার্য্য-করার বলবতী ইচ্ছা জাগরূক হইল।

গৌড়রাজ বল্লালসেন যে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন তাহা প্রত্যেক ছত্রিশবৎসর অন্তে এক একবার বাছনি হইবার নিয়ম হয়। বল্লালপুত্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে (১১৭৩ খৃঃ) তাহা দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচন করিয়া কৌলিন্য মর্য্যাদা দানের সময় হয়।

এই মর্য্যাদা স্থাপনের সময় নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক, রেষারেষি, গালাগালি অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ নির্ব্বাচন নিয়ম থাকিলে, প্রত্যেক নির্ব্বাচন উপলক্ষে গোলযোগ হইবে বিবেচনায় তিনি নির্ব্বাচন প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়া, নিয়ম করেন যে, সেই অবধি কৌলিন্য মর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হইবে। এবং পুত্র কন্যার বিবাহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্য্যাদা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারিবে। এই নূতন নিয়ম দ্বারা গোলযোগ শান্তি হইল বটে কিন্তু অন্যান্য অনেক দোষ ঘটিতে লাগিল। শ্রোত্রীয়গণ বহুব্যয় করিয়া অথবা কৌশল করিয়া অথবা অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া কিম্বা জোর করিয়া কুলীনে কন্যাদান করিয়া কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। তৎপর দীর্ঘ দিনান্তে রাজা কংশনারায়ণের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের বিধি ব্যবস্থা পুনঃ সংস্কারের পর কাপ ও কুলীন সমাজে ভীষণ জাতীয় হিংসা উপস্থিত হইয়াছিল। কাপ সমাজ ক্রমে প্রবল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। কুলীনের সহিত কাপের "করণ" প্রধান ধর্ম্ম বিবেচিত হইল। করণোপলক্ষে কুলীনগণ যে অপরিমিত অর্থ প্রার্থনা করিতেন, তাহাই বিনাপত্তিতে প্রদত্ত হইতে লাগিল। বহু অর্থ ও নানাবিধ প্রলোভনেও কুলীনগণ সহজে কাপ সমাজে বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইতেন না। সুবিধা ও সুযোগের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক কুলীন অপহৃত এবং বলপূর্ব্বক কাপের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। যিনি যত উচ্চ ও অধিক পরিমাণ কুলীনের সহিত করণ করিতে পারিতেন, তিনিই তত উচ্চ পদস্থ কাপ বলিয়া কুলজ্ঞগণের দ্বারা বর্ণিত হইতেন। কুলীনগণ কাপের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেই, কুলজ্ঞ গ্রন্থে উক্ত কুলীনের "টুটু" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই কুলীন অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কোন অবস্থাতেই আর কুলীন হইতে পারিতেন না।

সুতরাং উমানন্দ এ সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া তিনি আহারের অনুষ্ঠান ছলে অন্দরে বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন এবং বিবাহের উদ্‌যোগ সমস্ত ঠিক হইলে মোহন বল্লভকে ডাকিয়া লইয়া যখন বিবাহের ছাদ্না মণ্ডপে উপবেশন করাইলেন, তখন উলুধ্বনি ও বাদ্যধ্বনিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার বিবাহ লগ্ন উপস্থিত। এই সময় জোর করিলে, বা বিবাহে আপত্য করিলে, তাহা কিছুতেই খণ্ডন হইবে না এবং ইহা বিধির বিধান জানিয়া, এবং গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের উপরোধ অনুরোধ প্রত্যাহার করিতে না পারিয়া, তিনি করণ করিয়া এই বিবাহ করিলেন, এই বিবাহেই কুলীন মোহন-বল্লভ-ভাদুড়ী হরিপুরের কাপ উমানন্দ নিয়োগীর "টুটু" বলিয়া কুলজ্ঞ গ্রন্থে লিখিত আছে।

বিবাহ অন্তে পণ্ডিত প্রবর অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া আর তীর্থে বা দেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সময় পাবনা জেলার অধিকাংশ স্থান এমন কি দক্ষিনে পদ্মানদী পর্য্যন্ত সাঁতোল রাজ্যের অন্তঃর্ভুক্ত ছিল। এবং তিনি দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ছিলেন। তিনিও অন্যান্য ভৌমিক দিগের ন্যায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কিন্তু ১৬০৭ খৃঃ রাজা মান-সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া পরিশেষে দিল্লী-সম্রাটের করদ ও মিত্র রাজা হন। ঐ সময় হরিপুর নিবাসী বর্ত্তমান মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রামদেব চৌধুরী সাঁতোল রাজের মন্ত্রী ছিলেন। হরিপুরের উমানন্দ নিয়োগীর কণ্যার সহিত মোহন বল্লভের এইরূপ অবৈধ বিবাহে, সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মোহন বল্লভ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আর দেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না সুতরাং উমানন্দ লোক সমাজে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইতে লাগিলেন ; সে জন্য তিনি স্বগ্রামবাসী সাঁতোল রাজমন্ত্রী রামদেব চৌধুরীর শরণাগত হইলেন। রামদেব মোহন বল্লভকে, সাঁতোল রাজের নিকট

পরিচয় করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তখন সাঁতোল রাজ রামকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহ ও পুণ্য কীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তখন সাঁতৈল রাজ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উচ্চ সম্মান ছিল। বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাঁতৈল রাজ্যে অবস্থান করিতেন ও গুণানুসারে সম্মান ও ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইতেন। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ্ণ, দিব্যসিংহ, অনন্তরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, সাঁতৈল রাজ-সভার অলঙ্কার ছিলেন। সাঁতৈল রাজ মোহন বল্লভের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ সভা-পণ্ডিত করিয়া বৃত্তি প্রদান করিলেন। সেকালে গুণী ও বিদ্বানের সম্মান ও আদর ছিল। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেরই গুণের সম্মান ও পুরস্কার ছিল। এখনকার ন্যায় তখন অর্থ ও চাটুকারের প্রতিপত্তি ছিল না। এখনকার মত তখন আমলা তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল না। এখন যেমন অর্থ লোভী উৎকোচগ্রাহি নিম্ন হইতে উচ্চ কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত নানারূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া রাজদ্বারে সুকীর্ত্তি লাভ করিতেছে, অন্যায় ও অসঙ্গতের অযথা সমর্থন করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে রাজাও তাহাদের অন্যায় ও অযথা কার্য্য অন্ধের ন্যায় সমর্থন করিয়া নিজের ও ষ্টেটের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছেন; পূর্ব্বে তাহা ছিল না। রাজা তখন রাজ দরবারে বসিয়া গুণীর গুণ বিচার করিয়া পুরস্কার ও দোষীর দণ্ড বিধান করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন বিচার বিক্রয় ছিল না মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিচার হইত না। রাজা গুপ্তচর দ্বারা অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষ দর্শনে বিচার করিতেন, তাহাতে রাজা প্রজা সুখে রাজ্য পালন ও বাস করিত। রাজ্য মধ্যে এরূপ নিত্য দুর্ভিক্ষ ও অশান্তি বিরাজ করিত না। এই সকল কারণে পূর্ব্বকালে আমাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য ও সম্মান ছিল। যদিও আমরা সেকাল ফিরিয়া পাইব না,—সে দিন আর ফিরিয়া আসিবার মোটেই সম্ভাবনা নাই; তথাপি হতাশ হইয়া নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। কর্ম্মের দ্বারা যতটা সম্ভব নিজেকে সমাজকে, সংসারকে নিজের মত করিয়া লইতে চেষ্টা পাইতে হইবে। আমাদের কর্ম্মশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, পূর্ব্ব স্মৃতি লয় পায় নাই। ইচ্ছাশক্তি এখনও বর্ত্তমান আছে, সুতরাং এ সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় দাঁড়াইলে আমরা আত্মশক্তি লাভে সমর্থ হইব।

মোহন বল্লভ সাঁতৈল রাজ সভায় ক্রমে যে গুণবত্তা ও বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন তাহাতে সাঁতৈল রাজ তাঁহাকে নাজিরপুর পরগণার কয়েকখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করেন। এই সকল ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া মোহন বল্লভ পদ্মানদীর উত্তর পারস্থ বর্ত্তমান পাবনা জেলার থানার এলাকায় হিমহিতপুর গ্রামে বসতী স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিন বসবাস করতঃ পুত্র কন্যাদি ও বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

আমরা পরবর্ত্তী "রাজা মানসিংহের ছাওনি" প্রবন্ধে হিমহিতপুরের ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।



"বাণী-বন্দনা"

কবে কোন্ চিরাগত বাসন্তী-ঊষায়
এসেছিলে, অয়ি দেবি কুসুম-ভূষায়
ভূষিত করিয়া দেহ ;—আঁধার আলয়ে
বিকাশি আলোর পথ ;—বীণাখানি লয়ে
গেয়েছিলে কি যে গান—কোন্ মধু তানে ?
আজিও ঝঙ্কার তার যুগ এ পরাণে
জাগা'য়ে তুলিছে কত অতীতের স্মৃতি
বিচিত্র বরণে-রূপে-ছন্দে-সুরে নিতি !—
এস দেবি পূর্ণ করি' মর্ম্ম-আকিঞ্চন
এস এ হৃদয়-মাঝে ; সেবিয়া চরণ
ধন্যা হয়ে যাই ;—বড় সাধ জাগে মনে
মিলাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠ জগতের সনে
তোমার বন্দনা গাই রচি' অর্ঘ্য-ভার,—
কণ্ঠে তব দিই তুলে অশ্রু-মুক্তা-হার ।

বেলা গুহ ।

বৈশাখী চাট্‌নি ।

আমের আচার কুলের আচার প্রভৃতি নানা ফলের আচারের আস্বাদ কে না গ্রহণ করিয়াছেন ? পূর্ব্ববঙ্গে যাহা কাসন্দ বা কাসুন্দি, বর্দ্ধমান বাঁকুড়ায় তাহাও শুধু "আচার" মাত্র । এগুলি কুলকামিনীগণ কুলাচার মতে অতি নিষ্ঠা ও শুচি সহকারে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আচার-বর্জ্জিতা যে সে স্ত্রীলোকের হাতে ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম নাই ; করিলেও ভাল হয় না । এক পাড়ায় একাধিক সদাচার-সম্পন্না প্রাচীনা বিধবা না থাকিলে, সেই একজনকেই বাড়ী বাড়ী গিয়া "আচার" সম্পাদন করিতে হয় । ইহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। "সুনা দিদি, তোমার হাতে যেমনটি হয়, খেয়ে পুরুষের খ্যাত করে, আমার তেমন হয় না—ঠাকুর দেবতা কি অপরাধ ধরিয়া বসেন, বলিতে পারি না ; ছেলে পুলের ঘর, তোমাকেই আসিয়া করিতে হইবে ।" ইহার উপর আর আপত্তি চলে না। এই সদাচার হইতে অম্ল-সহচর আচার শব্দের উৎপত্তি। গৃহস্থ ঘরে তেঁতুল-গুড়ের আচারও হয় । "তিন্তিড়ি সংযোগ মাত্রেণ" ইত্যাদি। তেঁতুলের অল্পাচারই ভাল, অত্যাচারে স্বাস্থ্য নষ্ট ।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে (আমরা বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরী প্রথাই লিখিতেছি) প্রতি বৎসর বৈশাখের ১৩ই তারিখে গৃহস্থের ঘরে আচার-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । বাড়ীর ঈশান কোণে সেওড়া গাছের একটি ক্ষুদ্র ডাল পুতিতে হয়। পূর্ব্ব হইতে সরিষা ও হলুদ শুদ্ধাচারে ঢেঁকি দ্বারা গুড়াইয়া নূতন হাঁড়িতে রাখিবে। উক্ত পর্ব্ব দিবসে উহাতে লঙ্কা ও লবণ মিশাইবে। প্রাতে কাঁচা আম "কুনাইয়া" রাখিবেন । বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবগণ "কাটা-কুটি" শব্দের উপর নাটি-হস্ত। ("খড়্গ-হস্ত" বলিলাম না !) শয়ন গৃহ ব্যতীত অপর কোনও গৃহের ভিতর ঈশান কোণে নূতন বিড়ার উপর হাঁড়ি স্থাপন করিয়া স্নাতা শুদ্ধা প্রাচীনা বিধবা শচী দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও প্রণাম করিয়া থাকেন। বাড়ীর গৃহিনী দূরে আলগোছে থাকিয়া কেবল প্রণাম করিবার অধিকারিনী । প্রণামান্তে "কুনানো" আমে মসলা মাখিয়া তাহা হাঁড়ির ভিতর প্রক্ষেপ করেন । ইহার নাম আচার পাতা। আগার পাতার পরদিন হইতে এক দিন অন্তর বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত আচারে "ভোগ" দিতে হয়। অর্থাৎ হাঁড়ির ভিতর যাবতীয় দ্রব্যগুলি সময় মত তৈল ইত্যাদি দিয়া মাঝে মাঝে

নাড়া চাড়া করা। এ কর্ম্মে কৌশল আছে, কেবল শচী দেবীর উদ্দেশ্যে নুন জল প্রণাম করিয়া কল্প কাক্কায় উপর নির্ভর করিলে চলে না।

অথ পূর্ব্ববঙ্গের কাসন্দ বা কাসুন্দি। বিষ্ণুপুরের বৈশাখী "আচার" পূর্ব্ব-বঙ্গের হলুদ বর্জ্জিত "আম-কাসুন্দির" রূপান্তর। তাহা বিধবাগণের ব্যবহার্য্য। আমরা পশ্চিম-ঢাকায় হলুদ-মিশ্রিত সরিষা কাসন্দির প্রস্তুত প্রণালী লিখিতেছি। সরিষা বা mustard সাহেবদেরও মুখরোচক প্রিয় সামগ্রী; শুনিতে পাই উহা এবং সির্কা সাহেবদের খানার টেবিলে সততই বিরাজমান। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে পুষ্করিণী বা নদী তীরে দলে দলে রমনীদের স্নানযাত্রা ও সরিষা প্রক্ষালন গ্রামের মধ্যে আনন্দ কলরব উত্থিত করিয়া থাকে। গৃহিণীগণ পূর্ব্ব হইতে ভাল সরিষা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। তাহা ঢালু ভাবে অবস্থিত পিঁড়ির মসৃণ পিঠে গড়াইয়া বাছাই করিয়া লইতে হয়। ইহাতে ক্ষুদ্র প্রস্তর কণা ও অন্য আবর্জ্জনা পরিত্যক্ত হয়। যিনি যত সের পরিমাণ সরিষার কাসন্দিই করুণ তাহাতে "সোয়া" থাকা চাই। সোয়া পাঁচসের, সোয়া তিনসের ইত্যাদি। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রাতঃকালে ঘরের মেজেতে পাটি এবং তাহার উপরে একখানি কাপড় পাতিয়া সরিষা মাপিয়া লইতে হয়। সরিষার সঙ্গে পাঁচটি পাঁচ রকমের ফল ও পাঁচ রকম মসলা চাই। ফলের মধ্যে কাঁচা আম, ডালিম, লেবু, সুপারি, হরিতকি সচরাচর দেওয়া হয়। মশলা ধনে, জিরা, মৌরি, সলুপে ও কাঁচা হলুদ। মশলা সামান্যই দেওয়া হয়। কাল-ক্রমে গৃহিণীগণ অনুপাতের পরিমাণ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। সরিষার সঙ্গে এইগুলি মিশাইয়া বাড়ীর কর্ত্রী দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া "মাত্রা বৌনক্ষ বর্দ্ধবেৎ,পূর্ণং ভবতু" এইরূপ শোচের একটি প্রার্থনা বোধ হয় মনে মনে করিয়া থাকেন। তারপর স্ফুটস্বরে প্রার্থনার নমুনা, যথা "দোহাই মা কালী ঘাটের কালী, দোহাই ধামরাইয়ের যশোমাধব ঠাকুর, আমার পুত্রের বিয়ে দেখিয়ো, চাকুরী দিয়ো; তার ছেলের অন্ন প্রাশন দেখিয়ো, লোকে খাবে লক্ষ্মী থাকবে শুধু যেন ভাণ্ডার অফুরন্ত থাকে।" এইরূপে তিনি প্রত্যেক ছেলে মেয়ের নামযুক্ত অফুরন্ত ব্যাকুল প্রার্থনাগুলি মিশাল দিয়া বোঝাই করিয়া কাপড়ের পৌটলায় সরিষা বাঁধিয়া ফেলেন। এই সময় প্রদীপ জ্বালিয়া উলুধ্বনি ও প্রণামের ঘটা দেখিলে বুঝিবেন ইহা একটা সামান্য চাট্‌নি বা আমসত্বের ন্যায় নিরীহ ব্যাপার নয়, কাসন্দ বা কাসুন্দি অতি দুর্দ্দান্ত, ঝাঁঝাল, কুপিত জাগ্রত দেব বা দেবী!

অতঃপর কোন উৎসাহী বালকের মাথায় পৌটলা দিয়া রমণীদের দলে দলে শোভাময় স্নানযাত্রা। নদী বা পুকুরের কোমর জলে দাঁড়াইয়া—পৌটলা খুলিয়া তিনজন বা পাঁচজন রমণী একত্র হস্ত সঞ্চালন করিয়া সরিষা প্রক্ষালন করেন। বাড়ী আসিয়া গোময় লিপ্ত উঠানে পাটির উপর ধৌত সরিষা শুকাইতে দেবে। অপরাহ্নে ঢেঁকিতে সরিষা কুটিয়া সেই দিনই উহা গরম জলে ফেলিয়া কাসন্দ প্রস্তুত করিবার কথা। কিন্তু অধুনা অনেকেই সময়ের অভাববশতঃ অথবা সরিষা ভালরূপে শুকাইবার অপেক্ষায় অবশিষ্ট কার্য্য পরদিন সম্পন্ন করেন। সরিষা কোটা আরম্ভ হইলে নূতন হাঁড়িতে জল গরম করা হইতে থাকে সকলকেই শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়। কুট্টিত সরিষা কুলায় ঝেঁকিয়া অথবা সূক্ষ্ম চালনি দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়ার প্রয়োজন। ছাঁকিয়া রাখিবার সময় একটু একটু নুন ছড়াইয়া দিতে হয়। নূতন হাঁড়ির জল যখন কমিয়া অর্দ্ধেক হয়, তখন হাঁড়ি নামাইয়া উহার ভিতর সরিষা চূর্ণ আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিবে, আর একজন বাঁশের খুন্তি বা কাঠি দিয়া ক্রমাগত ঘাটিতে থাকিবে। সরিষা মাপিয়া বস্ত্রে বাঁধিবার সময় প্রাতঃকালে যেরূপ প্রার্থনা হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ প্রার্থনা করা হয়। বালক বালিকারা কাসুন্দি

ভাবিবার জন্ত অতি ব্যগ্র। তাহাদের গ্রাসে একটু একটু না দিলে তাহারা ছাড়িবে কেন? তখন ঝাঁজ অনেকটা তিক্ত থাকে। কিন্তু তিতো বলিতে নাই। শিকা মত 'মধু' বলিতে হয়। হারে গোপাল বেশী মধু হয় নাই তো? উত্তর—"না, ঠাকুর মা, কাসুন্দি আবার মধু হয়, (মুখ বিকৃত করিয়া) একেবারে তি—। গৃহিণীর একবাক্যে আসে।—"বলতে নাই বলতে নাই। ছিঃ, গোপাল, বলে ফেলেছিলি আর কি। পাখা টাখা করলি বটে, ঠাকুর দেবতাকে কি বলতে হয় তা কিছুই শিখলি না।"

প্রথম দিন একটু তিক্ত তো থাকিবেই, এই তো আরম্ভ, কাল "সাধ" তারপর দিন কাসুন্দির আসল জন্ম। কাল "সাধ"। ইহার অর্থ এই, সরিষা কোটা হইয়া গেলে একটু খানি অবশিষ্ট হাঁড়ির গরম জলে একটু খানি ভিজাইয়া একখানি নূতন সরাতে রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন ঐটা মিশাইয়া—অনেকক্ষণ ঘাঁটিতে হয়। অনেকে পাটিতে ঢালিয়া ঠাকুর দেবতার প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন। তৃতীয় দিন কাসুন্দি প্রকাশ্য ভাবে নিরুপাধিক ও নির্ব্বিঘ্ন হয়। কিন্তু একটী ভুল অষ্ট অপিরত্নের মধ্যে তুমিও সাধা, আর ইহার নাম রাজসভা। *

ঠাকুর দেবতার অমুক্তি অত্যন্ত নাই। কিন্তু নিজেকে নিজে আস্বাদ না করিলে ভগবান গ্রহণ করিবেন কেন? কাসুন্দিতে সরিষাই আসল, ঝাঁঝী সরিষা বিশ্বাস যেন না থাকে, উহাতেই তিক্ত হয়, চৈত্র মাসের নূতন রাই সরিষা চাই। আর সরিষার ও প্রকার ভেদ আছে। দাঁতে কাটিয়া জিহ্বাগ্রে চাখিয়া সুনিপুণা গৃহিণীগণ Connoisseur দের ন্যায়, সরিষার উপযুক্ততা স্থির করিতে পারেন। পক্ক অবস্থায় আনুপাতিক পরিমাণ বৃদ্ধাদের নিকট জানিয়া লইতে হয়। কাসুন্দি-প্রসঙ্গ পুরাতন, আর ঘাঁটিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীপরমেশ প্রসন্ন রায়।



